সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

১৫ জানুয়ারি, ২০২৫

চতুর্থ খণ্ড

সংবিধান সংস্কার কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৭ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে গঠিত
প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নম্বর ৩৩৪-আইন/২০২৪, তারিখ: ২১ আশ্বিন, ১৪৩১/০৬ অক্টোবর, ২০২৪।

সংবিধান সংস্কার কমিশন

ব্লক ১, এমপি হোস্টেল,
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

সাচিবিক সহযোগিতায়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত আলোকচিত্র: নাঈমুর রহমান, দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে

সংবিধান সংস্কার কমিশন

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ	কমিশন প্রধান	
অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের	সদস্য	
জনাব ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল	সদস্য	
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক	সদস্য	
ড. শরীফ ভূঁইয়া, সিনিয়র এডভোকেট	সদস্য	
জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল	সদস্য	
জনাব ফিরোজ আহমেদ	সদস্য	
জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ	সদস্য	
জনাব মোঃ মাহফুজ আলম - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি	সদস্য	(৭ অক্টোবর, ২০২৪ - ১০ নভেম্বর, ২০২৪)
জনাব ছালেহ উদ্দিন সিফাত - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি	সদস্য	(৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ -)।

সূচিপত্র

চতুর্থ খণ্ড (পৃথকভাবে সংকলিত)	
ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ	১
পরিশিষ্ট	
পরিশিষ্ট ১৯ - কার্যবাহ	৫

ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ

ষোলো বছরের বেশি সময় ধরে চেপে বসা ফ্যাসিবাদী শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট বাংলাদেশের জনগণ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এক অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সারা দেশের মানুষ পথে নেমে আসেন এবং সব ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতনকে উপেক্ষা করে ও সরকারি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পেটোয়া বাহিনীকে প্রতিরোধ করে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে ৩ আগস্ট জাতীয় শহীদ মিনারে আন্দোলনের নেতারা শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও বিচার দাবি করেন, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনার ঘোষণা দেন, অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করেন। এই সব দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে সারা দেশের মানুষ 'মার্চ টু ঢাকা'য় শামিল হন। জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে ৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট) শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন, তাঁর স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়।

৩৬ দিনের এই আন্দোলনে শহীদ হন প্রায় এক হাজার মানুষ এবং আহত হন কমপক্ষে পনেরো হাজার মানুষ। এই গণঅভ্যুত্থানে দল-মতনির্বিশেষে মানুষের অংশগ্রহণের পটভূমি ছিল হাসিনা সরকারের নির্বিচার হত্যা, গুম, খুন ও লুটপাটের বিরুদ্ধে এক দশকেরও বেশি সময়ে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন-সংগ্রাম। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষের ভোটাধিকার লুণ্ঠন করা হয়, রাষ্ট্রকে ব্যক্তির অনুগত পারিবারিক সম্পদের মতো ব্যবহার করা হয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, উন্নয়নের মিথ্যাচার করে একধরনের ক্লেপ্টোক্রেসি বা চোরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, দেশকে ঋণভারে জর্জরিত করা হয় এবং দেশের মানুষের অর্থ বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়। সর্বোপরি জবাবদিহিহীন এককেন্দ্রীকৃত ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে সংবিধান সংস্কার কমিশনসহ মোট ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর ২০২৪ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। ৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনে কমিশনের অন্য সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। কমিশনের সদস্যরা হচ্ছেন—রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশনপ্রধান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ড. শরীফ ভূঁইয়া, ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, লেখক ফিরোজ আহমেদ, লেখক ও মানবাধিকারকর্মী মো. মুসতাইন বিল্লাহ এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধি মো. মাহফুজ আলম। মো. মাহফুজ আলম ১০ নভেম্বর ২০২৪ উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৯ ডিসেম্বর থেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ছালেহ উদ্দিন সিফাত।

কমিশন ১৩ অক্টোবর ২০২৪ একটি ভার্চ্যুয়াল সভার মাধ্যমে তার কাজ শুরু করে এবং ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। এই প্রতিবেদন পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে মূল প্রতিবেদন তিন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে; এগুলো হচ্ছে বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, সুপারিশসমূহ এবং সুপারিশের যৌক্তিকতা। কমিশন সংবিধানের সেই সব বিষয় এবং অনুচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁদের সুপারিশ উপস্থাপন করেছে, যেগুলো কমিশনের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং কমিশনের লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সংস্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করেছে। প্রতিবেদনের অন্যান্য চারটি খণ্ডে সংযোজনী হিসেবে কমিশনের সংগৃহীত তথ্যাদি, কমিশনের অনুরোধে দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাব এবং তার সারাংশ, অংশীজনদের দেওয়া লিখিত মতামতের সারাংশ এবং কমিশনের আহ্বানে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হয়ে দেওয়া বক্তব্যের রেকর্ডকৃত বক্তব্যের অনুলিখন সংযুক্ত করা হয়েছে।

সংবিধান সংস্কার সুপারিশের পরিধি এবং লক্ষ্য

৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনের আলোকে কমিশন তার ওপরে অর্পিত দায়িত্বকে দুইভাগে ভাগ করে। এর প্রথমটি হচ্ছে বর্তমান সংবিধানের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সংবিধানকে গণতান্ত্রিক করে তুলে দেশ পরিচালনায় জনগণের অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার

লক্ষ্যে সংবিধানের সংস্কারবিষয়ক সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তৈরি করা। এই লক্ষ্যে কমিশন মোট ৬৪টি সভা করে, যার মধ্যে ২৩টি সভায় অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়।

২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কমিশনের ৫ম সভায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ঐকমত্যের মাধ্যমে সংস্কারের পরিধি এবং সংস্কারের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় । গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, "'সংস্কার'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে বর্তমান সংবিধান পর্যালোচনাসহ জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের লক্ষ্যে সংবিধানের সামগ্রিক সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্লিখন।"

সংস্কারের পরিধিতে সম্ভাব্য সকল ধরনের সংস্কারের সুযোগ রাখা হয় এই বিবেচনায় যে ইতিমধ্যে নাগরিকদের ভেতরে বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসেবে সংবিধানকে দেখতে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের উত্থানরোধের উপায় হিসেবে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে শুরু করে। জুলাই ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' এবং তাদের সহযোগী সংগঠন জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে সংবিধান পুনর্লিখনের বা নতুন সংবিধান প্রণয়নের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়, যার প্রতি সমাজের বিভিন্ন অংশের সমর্থনও প্রতিভাত হয়; গত প্রায় এক দশক ধরে যেসব সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি ও চিন্তাবিদ ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানের কারণ হিসেবে সাংবিধানিক ব্যবস্থার কথা বলে আসছিলেন, তাঁরাও বড় ধরনের পরিবর্তন ও পরিমার্জনার তাগিদ দেন। অন্যদিকে কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন এবং ব্যক্তি এই মর্মে অবস্থান গ্রহণ করেন যে, বিরাজমান সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের সংশোধনের মাধ্যমেই সংবিধানের অন্তর্নিহিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এবং ক্ষমতাকাঠামোয় অগণতান্ত্রিক প্রবণতা অবসান সম্ভব। এ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মতকে গুরুত্ব দেওয়া এবং কমিশনের কোনো ধরনের পূর্বাবস্থান নেই, তা সুস্পষ্ট করার জন্য কমিশন সংস্কারের পরিধিকে ব্যাপক রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

কমিশন সাংবিধানিক সংস্কারের সাতটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। এই উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:

১। দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতিশ্রুত উদ্দেশ্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের আলোকে বৈষম্যহীন জনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

২। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো।

৩। রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বস্তরে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা।

৪। ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার উত্থান রোধ।

৫। রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ—নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা এবং বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন।

৬। রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ ও পর্যাপ্ত ক্ষমতায়ন।

৭। রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক এবং আইন দ্বারা সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

এই উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণে কমিশন ১০ এপ্রিল ১৯৭১-এ জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকার অর্থাৎ সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের জন-আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। একই সময়ে কমিশন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধকে বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করেছে। এই সব আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামের মর্মবস্তুকে সাংবিধানিক-প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করতে কমিশন সচেষ্ট হয়। ৩ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কমিশন সংস্কারের পরিধি এবং উদ্দেশ্যসমূহ নাগরিকদের কাছে তুলে ধরে।

সংবিধানের পর্যালোচনা

কমিশন বিদ্যমান সংবিধানকে দুটি দিক থেকে পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—রাজনৈতিক এবং আইনগত। কমিশন বিবেচনা করে যে সংবিধানের পর্যালোচনায় বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডের মানুষের রাজনৈতিকভাবে গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং একটি সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক সংকল্প ও সামষ্টিক রূপকল্পের অভিপ্রায় কীভাবে গড়ে উঠেছে, তার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা জরুরি। এটা সুস্পষ্ট যে, ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলে 'জনগণ'-এর উদ্ভব একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। গাঠনিক কর্তা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্র গঠনে জনগণের সার্বভৌম অভিপ্রায় প্রকাশের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রের সাথে দ্বন্দ্বের সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। এই দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর আজও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণীত হয়েছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের সাফল্য নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সংবিধান প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রিতা এবং তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে আকাঙ্ক্ষা ও এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছিলো

তাই এই সংবিধান প্রণয়নকে ত্বরান্বিত করেছিলো। সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষকের আলোচনার সারসংকলন করে এই সংবিধানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং কীভাবে তা জনগণের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কেবল সংগতিহীনই হয়নি বরং নাগরিকদের অধিকার সংকুচিত করেছে, স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামো তৈরি করেছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া ওই সময়েই গণপরিষদের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন ছিল।

সংবিধানের পর্যালোচনার দ্বিতীয় অংশে সংবিধানের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধান যা ইতিমধ্যেই ১৭ বার সংশোধিত হয়েছে, তাতে এমন ধরনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি রয়েছে, যা জবাবদিহিমূলক এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক, যেমন অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এবং ৫৫-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাষ্ট্রপতিকে আলংকারিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া ক্ষমতাসীন দলকে সংবিধানের মূলনীতি ক্ষুণ্ন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংশোধন করার সুযোগ দিয়েছে। এর ফলে জরুরি অবস্থা এবং নিবর্তনমূলক আটকের মতো কঠোর বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করেছে এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা উৎসাহিত করেছে। সংবিধানের এই ত্রুটিগুলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছে। তদুপরি সাংবিধানিক বিধিবিধানগুলো গণতন্ত্রের একটি অন্যতম উপাদান নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষ করে সেগুলোকে অনেকাংশে অকার্যকর করে ফেলেছে। সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি থাকলেও তার কার্যকারিতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত থেকেছে, যা বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগে অধীনস্থ করে রেখেছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা কার্যত অর্থহীন এবং দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আবদ্ধ।

সংবিধানের বিস্তারিত রাজনৈতিক এবং আইনি পর্যালোচনা এই প্রতিবেদনের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিশন সকল বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে, যাতে বিদ্যমান সংবিধান অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা বোঝা যায়। কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় যেমন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, চিরস্থায়ী বিধান, জাতির জনক, কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতির বাধ্যতামূলক প্রদর্শন, রাষ্ট্রধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের সংবিধানে উল্লেখ আছে কি না এবং থাকলে কীভাবে আছে, কমিশন তার বিশ্লেষণ করে।

অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের রূপরেখা

কমিশন সমাজের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের আকাঙ্ক্ষা বোঝা এবং সমাজের সম্ভাব্য সর্বাধিক অংশীজনদের অংশগ্রহণ এবং তাঁদের প্রস্তাবগুলো শোনা এবং সেগুলোকে কমিশনের সুপারিশে প্রতিফলিত করার জন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে প্রস্তাব এবং নাগরিকদের মতামত সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়।

কমিশন এই মর্মেও সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেসব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা দল জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের সময় সক্রিয়ভাবে হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থেকেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নকে সমর্থন করেছে, ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমকে বৈধতা প্রদানে সাহায্য করেছে, কমিশন সেই সব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানকে অংশীজনদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করবে না।

রাজনৈতিক দলসমূহের মতামত

কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জানার জন্য ৩০টি রাজনৈতিক দল এবং জোটের কাছে লিখিত মতামত আহ্বান করে চিঠি পাঠায়। এই আবেদনে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এসব দল এবং জোটের মধ্যে মোট ২৫টি রাজনৈতিক দল এবং ৩টি রাজনৈতিক জোট তাদের লিখিত মতামত কমিশনের নিকট প্রেরণ করে। এর বাইরেও মোট ৬টি রাজনৈতিক দল ইমেইলের মাধ্যমে বা কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁদের মতামত জমা দেয়। কমিশনের গবেষকেরা এসব মতামতের সারাংশ সংকলন করেন।

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ

সংস্কারের সুপারিশ তৈরিতে অধিকসংখ্যক নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কমিশনের ওয়েবসাইটে মতামত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা যায়। দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে এ সুযোগ অব্যাহত রাখা হয় এবং ২৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৫০,৫৭৩টি (পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত তিহাত্তর) সংক্ষিপ্ত থেকে বিস্তারিত আকারে মতামত পাওয়া যায়।

অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়

অংশীজনদের মতামত নেওয়ার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন ১১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ থেকে বিভিন্ন সংবিধান ও মানবাধিকারবিষয়ক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সংবিধান বিশেষজ্ঞসহ সমাজের নানা স্তরের মানুষের সাথে মতবিনিময় করে। এ জন্য মোট ২১টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তিন সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত এসব অধিবেশনে ৪৩টি সংগঠনের

৯৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে তাঁদের সংগঠনের পক্ষে মৌখিক এবং লিখিত প্রস্তাব দেন। এছাড়া ২৯টি সংগঠন তাদের প্রস্তাব লিখিতভাবে জানিয়েছে। নাগরিক সমাজের ৪৪ জন ব্যক্তি কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তাঁদের মধ্যে ২২ জন তাঁদের প্রস্তাবগুলো লিখিতভাবে কমিশনের কাছে পেশ করেছেন। এর বাইরেও ই-মেইলের মাধ্যমে এবং কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ৩৪ জন তাঁদের মতামত লিখিতভাবে জানান। কমিশনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সাতজন সংবিধানবিশেষজ্ঞ এবং সাবেক বিচারপতি কমিশনের মতবিনিময় সভাগুলোয় উপস্থিত হয়েছেন। কমিশনের মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মৌখিক বক্তব্য রেকর্ড এবং প্রতিলিপি (transcript) তৈরি করা হয়েছে।

দেশব্যাপী জনমত জরিপ

বিভিন্নভাবে অংশীজনদের মতামত সংগ্রহ করলেও গৃহীত ব্যবস্থাগুলো সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামতের প্রতিফলনের নিশ্চয়তা বিধান করে না বলে কমিশনের পক্ষ থেকে সারা দেশে জরিপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে দেশব্যাপী জাতীয় জনমত জরিপ পরিচালনা করা হয়। এই জরিপ ৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালানো হয় এবং সারা দেশের ৬৪ জেলা থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে ৪৫,৯২৫টি খানার (হাউসহোল্ড) ১৮ থেকে ৭৫ বছর বয়সীদের কাছ থেকে জনসংখ্যা অনুপাতে মতামত পাওয়া যায়।

অন্যান্য কমিশনের সঙ্গে সমন্বয়

কমিশন ওয়াকিবহাল যে, রাষ্ট্র সংস্কারের অনেক বিষয় নিয়ে একাধিক কমিশন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যা সংবিধান-সংশ্লিষ্ট। সময়স্বল্পতার বিবেচনায় কমিশন সব কমিশনের সঙ্গে কাজের সমন্বয় করতে না পারলেও গুরুত্বপূর্ণ এবং সরাসরি সংশ্লিষ্ট দুটি কমিশন-নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠক করে এবং ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে। এর বাইরে ১৮ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সংস্কার কমিশনের প্রধানের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে।

কমিশনের কতিপয় পর্যবেক্ষণ

বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, অংশীজনদের মতামত এবং কমিশন সদস্যদের অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের ভিত্তিতে কমিশন সংবিধানের বিভিন্ন দিকের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছে; এর বাইরে অংশীজনেরা দুটি বিষয়ের দিকে কমিশনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যা কমিশন তার পর্যবেক্ষণ হিসেবে উপস্থিত করছে। এগুলো হচ্ছে:

১। সংবিধানের বিভিন্ন অধ্যায়ের ধারাক্রম পরিবর্তন করে প্রস্তাবনা, নাগরিকতন্ত্র, মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার পর আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগকে সন্নিবেশিত করা;

২। সংবিধানের ভাষা সহজ করা;

৩। সংবিধানের আকার ছোট করা।

কমিশন মনে করে যে, অংশীজনদের এসব মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা দাবি করে এবং আশা করে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে বীরদের আত্মদানের ফলে বাংলাদেশ স্বৈরাচারী শাসনমুক্ত হয়েছে, যাঁরা এখনো আহত অবস্থায় আছেন, তাঁদের কাছে কমিশন গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের প্রতি কমিশন আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

কমিশন এই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে নাগরিকদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছে এবং তাঁরা যেভাবে অকুণ্ঠচিত্তে অংশগ্রহণ করেছেন, সে জন্য সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন, সিভিল সোসাইটির সদস্যরা তাঁদের মতামত প্রদান করে এই প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক করে তুলেছেন এবং তাঁদের মতামতের মাধ্যমে এই প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এই প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা সম্পাদন, মতামত ও তথ্য বিন্যস্তকরণ, অনুবাদ এবং সম্পাদনার কাজে যুক্ত গবেষকদের অবদান ছিল অসামান্য। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কমিশনের সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছেন, কমিশন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) বিনামূল্যে এই প্রতিবেদনের টাইপ সেটিং এবং পৃষ্ঠাসজ্জা করে দিয়ে কমিশনকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে।

কার্যবাহ

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহ

মুখবন্ধ

জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান এবং গত ষোল বছরর ধরে কোটি কোটি মানুষের সংগ্রামের পক্ষে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ৬ অক্টোবর ২০০৪ তারিখের এস.আর.ও. নম্বর ৩৩৪-আইন/২০২৪-এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত ৯ জন সদস্য সমন্বয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে 'সংবিধান সংস্কার কমিশন' গঠন করা হয়:

১।	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক	কমিশন প্রধান
২।	অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	জনাব ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল	সদস্য
৪।	অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫।	ড. শরীফ ভূইয়া, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	সদস্য
৬।	জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল	সদস্য
৭।	জনাব মুসতাইন বিল্লাহ, লেখক ও মানবাধিকার কর্মী	সদস্য
৮।	জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক	সদস্য
৯।	জনাব মোঃ মাহফুজ আলম, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি	সদস্য

অতঃপর জনাব মোঃ মাহফুজ আলম সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেওয়ায় উক্ত পদে জনাব সালেহ উদ্দিন সিফাত কে কমিশনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সংবিধান সংস্কার কমিশন সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সংবিধান বিশেষজ্ঞ, সমাজে প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অংশীজনের (প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি) সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। জাতীয় সংসদের কেবিনেট কক্ষে এরকম মোট ১৯টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসকল মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীগণ তাঁদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। এছাড়া তাঁরা তাঁদের মতামতের পক্ষে লিখিত প্রস্তাবও দাখিল করেন। সভায় অংশগ্রহণকারী সংবিধান বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও ব্যক্তিবর্গ যে মতামত প্রদান করেন তার হুবহু কার্যবাহ (Verbatim proceeding) লিপিবদ্ধ করা হয়।

উক্ত কার্যবাহ প্রস্তুতে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের রিপোর্টিং অধিশাখার নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন—

১। জনাব ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২। জনাব এইচ.এম. আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৩। জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৪। জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৫। জনাব ফারজানা আক্তার, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬। জনাব মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সাচিবিক সহায়তাকারী:

১। জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান নুর, যুগ্মসচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২। জনাব জি. এম. আতিকুর রহমান জামালী, যুগ্মসচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩। জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল জাফরী ৬-১২-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত কমিশন প্রধানের একান্ত সচিব(উপসচিব পদমর্যাদায়) হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর জনাব মুহাম্মদ শিহাব উদ্দীন একান্ত সচিব (উপসচিব পদমর্যাদায়), হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৪। জনাব এম.এম. ফজলুর রহমান, সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটসম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৫। জনাব মোঃ সাহিনুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৬। মিজ ফাহমিদা বেগম, সিনিয়র সহকারী সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৭। জনাব মোঃ সাব্বির মাহমুদ, উপপরিচালক, গণসংযোগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় এর অব্যাহতির পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অফিসার জনাব এ কে এম ফেরদৌস জনসংযোগ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন।

৮। জনাব মোঃ হোছাইন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার এই কার্যবাহে সর্বমোট ৪২০ পৃষ্ঠা রয়েছে। ৯ কার্য দিবসে মোট ১৯টি সেশনে ১৩৭ জনের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সূচিপত্র

প্রথম সেশনের কার্যবাহ অংশগ্রহণকারী (প্রতিষ্ঠান)	১৫-২৯
১. মি. অজয় এ মৃ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম;	
২. পল্লব চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম;	
৩. এবিএম শামসুল হুদা, এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম ইন বাংলাদেশ;	
৪. রফিক আহমেদ সিরাজী, এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম ইন বাংলাদেশ;	
৫. অ্যাডভোকেট সালমা আলী, সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি;	
৬. অ্যাডভোকেট সীমা জহুর, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি;	
৭. মোহাম্মদ এজাজ, চেয়ারম্যান, রিভার এন্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টার;	
৮. ড. ইফাদুল হক, ফেলো,রিভার এন্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টার;	
৯. আশরাফুন নাহার, নির্বাহী পরিচালক, উইমেন উইথ ডিজএবিলিটিস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন;	
১০. মুজিবুল হক মুনির, হেড অফ সোসাল এমপাওয়ারমেন্ট, ক্যাম্পেইন ফর পপুলার ফাউন্ডেশন।	

দ্বিতীয় সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (প্রতিষ্ঠান)	৩০-৪৪
১. তাসলিমা ইসলাম (চীফ এক্সিকিউটিভ), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা);	
২. গীতা দাস, সভানেত্রী, নারীপক্ষ;	
৩. কামরুন নাহার, সদস্য, নারীপক্ষ;	
৪. মুহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, ব্যারিস্টার এট ল, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার;	
৫. মোঃ শহীদুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার;	
৬. ব্যারিস্টার শাহাজাদা আল আমিন কবির, সভাপতি, হিউমান রাইটস সাপোর্ট সাসাইটি;	
৭. ইজাজুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, হিউম্যান রাইটস সাপোট সোসাইটি।	

তৃতীয় সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (প্রতিষ্ঠান)	৪৫-৫৬
১. আবু আহমেদ ফয়জুল কবির, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক);	
২. মুহাম্মদ জাকির হোসেন খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী, চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ;	
৩. সৈয়দ ইরফান উদ্দীন, চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ;	
৪. খন্দকার মকছুদুল হক, সভসভাপতি, নির্বাহী পরিষদ, বাঁচতে শেখা;	
৫. মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, বাঁচতে শেখা;	
৬. অ্যাডভেকেট হুমাছুন কবীর ভুঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক, কজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব);	
৭. ব্যারিস্টার শাহরুখ কবীর ভুঁইয়া, সদস্য, কজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব);	
৮. শ্রী নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস, প্রকল্প পরিচালক, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট;	
৯. শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, উপপরিচালক, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট;	
১০. সৈয়দ শামছুল হুদা, সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট (বিআইএম);	
১১. এডভোকেট মাওলানা মুফতি আল আমীন, বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট (বিআইএম)।	

চতুর্থ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি)		৫৭-৬৫
১.	মুফতি আব্দুল মালেক, খতিব, বায়তুল মোকাররম;	
২.	খুশি কবির।	
পঞ্চম সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি)		৬৬-৮৪
১.	অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ;	
২.	সুব্রত চৌধুরী;	
৩.	মুসা আল হাফিজ;	
৪.	অধ্যাপক মাহবুব উল্যাহ;	
৫.	শাহিন আনাম।	
ষষ্ঠ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি)		৮৫-৯৬
১.	শহিদুল আলম;	
২.	মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজ	
সপ্তম সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি)		৯৭-১১৩
১.	দিলীপ কুমার সরকার;	
২.	রোবায়েত ফেরদৌস;	
৩.	ড. বদিউল আলম মজুমদার;	
৪.	মুফতি সাইফুল ইসলাম;	
৫.	মুফতি আবদুল্লাহ মাসুম;	
৬.	অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান।	
অষ্টম সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি)		১১৪-১২১
১.	মতিউর রহমান (প্রথম আলো)	
নবম সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি)		১২২-১৩৬
১.	ডা. জাহেদ উর রহমান;	
২.	জনাব মাহফুজ আনাম;	
দশম সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি)		১৩৭-১৫২
১.	ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির (ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ);	
২.	হাসান হাফিজ, (সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব);	
৩.	ডা. ফয়জুল হাকিম, সহ সভাপতি (ডক্টইরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ (ডিপিপিএইচ)।	
একাদশ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি)		১৫৩-১৬৮
১.	এড. হাসনাত কাইছুম;	
২.	কে. শামসুদ্দিন মাহমুদ;	
৩.	এ কে মোহাম্মদ হোসেন;	
৪..	বিচারপতি মোঃ আবদুল মতিন।	

দ্বাদশ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (প্রতিষ্ঠান)	১৬৯-১৮২

১. নাসরিন বেগম, চেয়ারম্যান আরবিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই);
২. চৌধুরী মকিমুদ্দিন কেজে আলী, প্যানেল আইনজীবী, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই);
৩. মোঃ জামিল উদ্দিন মিলটন, উপ মহাসচিব, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই);
৪. প্রকৌশলী মোঃ কবীর হোসেন, আহ্বায়ক, আইডিইবি, অন্তবর্তীকালীন কেন্দ্রীয় কমিটি, ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স;
৫. প্রকৌশলী মোঃ গিয়াস উদ্দিন, যুগ্ম আহ্বায়ক, আইডিইবি, অন্তবর্তীকালীন কেন্দ্রীয় কমিটি, ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স;
৬. কাদের গনি চৌধুরী, মহাসচিব, বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (বিএফইউজে)
৭. মোঃ শহিদুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (বিএফইউজে);
৮. সিনিয়র এডভোকেট মাহবুব উদ্দিন খোকন, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন;
৯. এডভোকেট মোঃ শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন।

ত্রয়োদশ সেশনের কার্যবাহ অংশগ্রহণকারী (প্রতিষ্ঠান)	১৮৩-১৯৮

১. অঞ্জন দাস, সহ সভাপ্রধান, গার্মেন্টস শ্রমিক সংগতি;
২. মিজানুর রহিম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি;
৩. সাবিনা ইয়াসমিন, কেন্দ্রীয় সদস্য, গার্মেন্টস শ্রমিক সংগতি;
৪. প্রফেসর ড. আদিল মুহাম্মদ খান, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স;
৫. প্ল্যানার সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স;
৬. প্ল্যানার এ কে এম রিয়াজউদ্দিন, সদস্য, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স;
৭. চৌধুরী আশিকুল আলম, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ;
৮. খলিলুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ;
৯. ডিভিশন প্রধান সুচিয়াং, সদস্য, বিপনেট, বাংলাদেশ ইন্ডিজেনিয়াস পিপপলস নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্ড বায়োডাইভারসিটি (বিপনেট);
১০. নবদ্বীপ কুমার, সদস্য, বিপনেট, বাংলাদেশ ইন্ডিজেনিয়াস পিপপলস নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্ড বায়োডাইভারসিটি (বিপনেট);
১১. নীরূপা দেওয়ান, সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি;
১২. হরি পূর্ণ ত্রিপুরা, সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি।

চতুর্দশ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি)	১৯৯-২২২

১. সারোয়ার তুষার;
২. সাইয়েদ আবদুল্লাহ;
৩. অরূপ রাহী;
৪. দীপক কুমার গোস্বামী;
৫. এডভোকেট আরিফ খান;
৬. মাহা মির্জা;
৭. ইমরান মাহফুজ;
৮. ড. সৈয়দ নিজার;
৯. ইলিরা দেওয়ান;
১০. আসিফ আকবর।

পঞ্চদশ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি) ২২৩-২৪৩

১. বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ;

২. ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী;

৩. প্রফেসর মঈনুল ইসলাম (ঢাবি);

৪. নুরুল কবীর;

৫. ড. মইনুল ইসলাম (চবি);

৬. প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দীন খান।

ষোড়শ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি) ২৪৪-২৭০

১. রাজা দেবাশীষ রায়;

২. প্রফেসর মোঃ রবিউল ইসলাম;

৩. রোমান উদ্দীন, সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস);

৪. আপন জহির, সেন্টার পল গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস);

৫. আখতার হোসেন খান, সাধারণ সম্পাদক, নিউজ পেপার ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব);

৬. প্রফেসর মির্জা তাসলিমা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক;

৭. প্রফেসর কাজী মারুফুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক;

৮. সানজিদা ইসলাম তুলি, অর্গানাইজার, মায়ের ডাক;

৯. মুশফিকুর রহমান জোহান, প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, মায়ের ডাক;

১০. তামান্না সিং বারাইক, প্রজেক্ট অফিসার, দলিত নারী ফোরাম;

১১. পুজা রানী, দলিত নারী ফোরাম;

১২. নাদিরা পারভীন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, নাগরিক উদ্যোগ;

১৩. সুলতান মোঃ সালাউদ্দিন সিদ্দিক, নাগরিক উদ্যোগ;

১৪. জয়া শিকদার, সভাপতি, সম্পূর্ণা;

১৫. সুদীপ কুমার দাস (শাওনী), সম্পূর্ণা;

১৬. মোঃ জুনাইদ, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন;

১৭. মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন রিসার্চ অ্যান্ড রেফারেন্স অফিসার (যুগ্ম জেলা জজ) আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;

১৮. নাজমা আক্তার, সভাপতি, সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন।

সপ্তদশ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (প্রতিষ্ঠান) ২৭১-২৭৯

১. ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাসির, জাস্টিস ফর কমরেডস (জেএফসি);

২. লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিনুর রহমান বীর প্রতীক, জাস্টিস ফর কমরেডস (জেএফসি);

৩. লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমান, জাস্টিস ফর কমরেডস (জেএফসি);

৪. কমান্ডার (বিএন) নেসার আহমেদ জুলিয়াস, জাস্টিস ফর কমরেডস (জেএফসি)।

অষ্টাদশ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (প্রতিষ্ঠান) ২৮০-২৯৭

১. জাহিদ আহসান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন;

২. তারিকুল ইসলাম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন;

৩. রফিকুল ইসলাম এ্যানি-র আনিকা তাহসিনা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন;

৪. আরিফ সোহেল, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন;

৫. আখতার হোসেন, সদস্য সচিব, জাতীয় নাগরিক কমিটি;

৬.	সামান্তা শারমিন, মুখপাত্র, জাতীয় নাগরিক কমিটি;
৭.	সারোয়ার তুষার, জাতীয় নাগরিক কমিটি;
৮.	অ্যাডভোকেট মুকুল মুস্তাফিজ, সদস্য, জাতীয় নাগরিক কমিটি;
৯.	সালেহউদ্দিন সিফাত, সদস্য, জাতীয় নাগরিক কমিটি;
১০.	আতিক মুজাহিদ, সদস্য, জাতীয় নাগরিক কমিটি;
১১.	অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম, সদস্য জাতীয় নাগরিক কমিটি।

ঊনবিংশ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (প্রতিষ্ঠান) ২৯৮-৩১৫

১.	ড. মোঃ আনোয়ার উল্যাহ, এফসিএমএ, সচিব, বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন;
২.	এ টি এম সিদ্দিকুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন;
৩.	ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন;
৪.	মোঃ আশরাফ হোসেন, যুগ্মসচিব, বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন;
৫.	কেএম বদরুল হক, বিসিএস কৃষি, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ;
৬.	মোঃ আরিফ হোসেন, বিসিএস কৃষি, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ;
৭.	মোঃ জামিলুর রহমান, বিসিএস গণপূর্ত, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ;
৮.	মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, বিসিএস সমবায়, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ;
৯.	মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন, বিসিএস প্রাণিসম্পদ, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ;
১০.	মাইকেল চাকমা;
১১.	শহীদুল্লাহ ফরায়জী।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

প্রথম সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১১ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল ৯:৩০ থেকে ১১:০০ পর্যন্ত

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:

১।	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক	কমিশন প্রধান
২।	অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল	সদস্য
৪।	অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫।	ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল	সদস্য
৬।	জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক	সদস্য

অংশগ্রহণকারী অংশীজনদের (প্রতিষ্ঠান) এর তালিকা:

১। মি.অজয় এ মৃ, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম।

২। পল্লব চাকমা, কার্যকরী সদস্য, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম।

৩। জনাব এ. বি.এম. শামসুল হুদা, অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি)

৪। জনাব রফিক আহমেদ সিরাজী, ম্যানেজার প্রোগ্রাম, অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি)।

৫। অ্যাডভোকেট সালমা আলী, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি।

৬। অ্যাডভোকেট সীমা জহুর, ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি।

৭। জনাব মুহাম্মদ এজাজ, চেয়ারম্যান, রিভার এন্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টার (আরডিআরসি)

৮। ডা. ইফাদুল হক, ফেলো, রিভার এন্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টার (আরডিআরসি)

৯। আশরাফুন নাহার মিষ্টি, নির্বাহী পরিচালক, উইমেন উইথ ডিজএবলিটিস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

১০। জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান মুনির, হেড অফ সোসাল এমপাওয়ারমেন্ট, ক্যাম্পেইন ফর পপুলার ফাউন্ডেশন

কার্যবাহ প্রস্তুতকারক:

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সম্পাদনায়:

ফ.ব.ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক, (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানের কার্যবাহ

কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনারা জানেন যে, সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেই কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র জনতার আত্মদানের কারণে। আজকে অংশীজনের মতামতের এই প্রথম সভার শুরুতে আসুন আমরা সেইসব শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করি এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি।

(এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়)

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমরা অনুমান করতে পারি যে, civil society-এর সক্রিয় অংশীদার হিসেবে সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা ১০ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে সকলের মতামত শোনার সুযোগ হবে। আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব লিখিত আকারে আজকে আমাদের কাছে দিতে পারেন অথবা আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

আপনাদের বক্তব্য শোনার আগে আপনারা যারা উপস্থিত আছেন, তাঁদের সাথে পরিচিত হবো। আমরা শুরু করব আমার হাতের বাম দিক থেকে। প্রথমে আপনাদের সংগঠনের নাম এবং উপস্থিত যাঁরা আছেন, তাঁদের পরিচয় দেবেন। পরে আমরা আপনাদের আলাদা আলাদা বক্তব্য শুনব।

(উপস্থিত অংশীজন তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, সবাইকে।

আপনাদের বক্তব্য শোনার জন্যই আপনাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে। যেমনটি আমি শুরুতেই বলেছি, আমরা জানি আপনাদের দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতার কারণে আপনাদের বিভিন্ন প্রস্তাব আছে এবং বক্তব্য আছে। সেজন্যই সংক্ষেপে সময় স্বল্পতার জন্য আপনারা ১০ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে সকলের মতামত শোনা সম্ভব হবে। আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব লিখিত আকারে আজকে আমাদের কাছে দিতে পারেন অথবা আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন। প্রথমে আশরাফুন নাহার মিষ্টি আপনি বক্তব্য রাখতে পারেন।

আশরাফুন নাহার মিষ্টি, উইমেন উইথ ডিজএবলিটিস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডব্লিউডিডিএফ): ধন্যবাদ।

আমাদের বক্তব্য খুবই সুস্পষ্ট। আমরা প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করছি। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমরা আসলে সম-অধিকার বা সমমর্যাদা পাইনি। বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবন্ধী শব্দটি উচ্চারণ করে আমাদেরকে বিভিন্ন bullying-এর শিকার হতে হয়। স্কুল-কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বাধা আছে। আমি যদি আমাদের বৈষম্যগুলোর কথা বলি তাহলে অনেক লম্বা লিস্ট হয়ে যাবে, আমি খুব সময় নিতে চাচ্ছি না, আমি খুব সংক্ষেপে স্বল্প সময়ে সংক্ষিপ্ত কথা বলব। পরবর্তীতে লিখিত বক্তব্য ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে দিব, ইনশাআল্লাহ। আমি যেটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী শব্দটি সংবিধানের মধ্যে উল্লেখ করতে হবে। এর আগে আমরা পঙ্গু বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী উল্লেখ করেছি। শব্দটি যেন স্পষ্ট থাকে। কারণ আমাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা আইন ২০১৩ আছে এবং কর্ম পরিকল্পনা বিধি আছে এবং আমাদের একটি সনদ আছে। যেখানে বাংলাদেশ সরকার স্বাক্ষর এবং rectifz করেছিল। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদ। সবকিছু মিলিয়ে আমাদেরকে আসলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী নারী, প্রতিবন্ধী শিশু শব্দগুলো যদি সংবিধানে ব্যবহার করা যায়, তাহলে আমাদের বিষয়টি স্পষ্ট হবে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র একটি শ্রেণির মধ্যে বসবাস করে না। অর্থাৎ শুধু ধনী সম্প্রদায় আছে, এরকম না। সব ধরনের শ্রেণির মধ্যে আছে। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, ধনী এবং এই শ্রেণিভেদে আমাদের প্রতি বৈষম্যগুলো হচ্ছে। আমার যেটি মনে হয়, সেটি

হচ্ছে যে equal rights এর পাশাপাশি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে তার শ্রেণি, তার সংস্কৃতি, তার অবস্থান- যেমন পাহাড়েও আছে, সমতলেও আছে, আদিবাসীদের মধ্যেও প্রতিবন্ধী মানুষ আছে, হিজরা সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রতিবন্ধী মানুষ আছে। তার যে culture-ই হোক না কেন, সে যেন তার প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন ধরনের বাধা বা বৈষম্যের মুখোমুখি না হয় এবং রাষ্ট্র যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করবে সে উদ্যোগগুলো যেন universal হয় অর্থাৎ universal হলে যা হবে, সব ধরনের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সেটির মধ্যে সম্পৃক্ত হতে পারবে। আমার এটুকুই কথা। আর একটি হলো যে, সংবিধানের ভিতরে এমন সমন্বিত কিছু বিষয় থাকা দরকার, যে বিষয়গুলো আমাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ, আমাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে। সংসদে আমাদের প্রতিনিধিত্ব নাই। সংসদেও প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতিনিধির প্রয়োজন আছে। কারণ যে জনগোষ্ঠী বেশি পিছনে সেই জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকলে সেই ইস্যুটাকে নিয়ে আসা সহজ হয়। এই বিষয়গুলো আসতে হবে। আরেকটি বিষয় হলো, আমাদের যে cultural এবং demographic ইস্যুগুলো আছে সেগুলোর ভিতরেও সব ধরনের মানুষের প্রতিনিধিত্বের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা। এটিকে আমি বলবো fruitful অংশগ্রহণ। সেই সুযোগ যেন থাকে, সে বিষয়টা ensure করার জন্য বলব।

ধন্যবাদ ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

এরপর আমরা আসবো বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের প্রতিনিধিদের কাছে।

মি.অজয় এ মৃ (বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম): সবাইকে আমার শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আদিবাসী ফোরামকে কমিশনের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমরা কমিশন গঠন হওয়ার পর পরই আমাদের নিজেদেরকে প্রস্তুত করার জন্য বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চল থেকে আদিবাসী নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আদিবাসী ফোরামের নেতৃত্বে আমরা ইতোমধ্যে একটি পরামর্শ সভা করেছি। সেই পরামর্শ সবার সুপারিশের আলোকে আমরা আজকে একটি প্রস্তাবনা নিয়ে এসেছি। আমাদের লিখিত প্রস্তাবনা আপনাদের কাছে দিয়ে যাব। সেই সাথে আরো কয়েকটি কথা বলতে চাই, আমরা বাংলাদেশের আদিবাসীরা কেন আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি চাই? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে কিন্তু আদিবাসীদের অধিকারের স্বীকৃতি চলে আসছে এবং আদিবাসীদের প্রতি যে, historical injustice হয়েছে, তা অনুধাবন করতে পেরে জাতিসংঘ বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। আইএলও, প্রথমে ১০৭, পরবর্তীতে ১৬৯ adopt করেছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় যে, ২০১৩ সালে যখন আদিবাসী বিষয়ে জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করা হয়, ৪টি দেশ বিরোধিতা করেছিল। ইউএস, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া। ৩-৪ বছরের মধ্যে প্রত্যেকটা দেশ যারা বিরোধিতা করেছিল, তারা সমর্থন দিয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্র প্রণয়নের সময় বাংলাদেশসহ ১৩টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল। কিন্তু আমরা মনে করি যারা বিরোধিতা করেছিল, তারা যদি স্বীকার করে সমর্থন করতে পারে, জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্রকে, আমাদের উচিত বাংলাদেশের এ পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আদিবাসীদের সমর্থন দিয়ে স্বীকৃতি দেওয়া।

আপনারা যদি লক্ষ্য করেন, ১৯৭২ সালে যখন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচনা হচ্ছিল, আমাদের পক্ষ থেকে তখন একমাত্র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, মানবেন্দ্র নারাছু লারমা। তখনকার সময়ে প্রবল প্রতাপশালী বাঙালি জাত্যাভিমানী আওয়ামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি তখন নিজের জাতিসত্তার স্বীকৃতি চেয়েছিলেন। কারণ যখন সংবিধানে সংযোজন করা হচ্ছিল, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তখন কিন্তু তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন এবং তিনি নিজস্ব জাতিসত্তার স্বীকৃতি দাবি করেছিলেন। ১৯৭২ সালে যা হয় নাই, এখন আমাদের বড় সুযোগ এসেছে, আমাদের সেই ভুলের সংশোধন করা। তাই এই কমিশনের প্রতি আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস আছে এবং আমরা মনে করি এই কমিশন এ বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন। আমি আমাদের এই প্রস্তাবনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করছি।

সংবিধানের ১ম ভাগের প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ-৩ এ লেখা আছে, “প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে।” কিন্তু আমরা সেখানে প্রস্তাবনা নিয়ে এসেছি, অনুচ্ছেদের শেষে, ‘‘তবে নাগরিকদের অন্যান্য ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্র সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন।’’ আমরা যৌক্তিকতাও উল্লেখ করেছি আরেকটি কলামে। আমি সেদিকে যাচ্ছি না।

দ্বিতীয় ভাগের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, জাতীয় সংস্কৃতি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ২৩ এ যা আছে তার সাথে আমরা সংযোজন করতে চাচ্ছি, ‘‘রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমূহের ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ দেশের বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক স মৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে।’’ এর যৌক্তিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই আমি পড়ছি। বাংলাদেশ বহু জাতি, বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির দেশ। বর্ণিত অনুচ্ছেদের প্রথম অংশে উল্লিখিত জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতি পরিপোষণ ও সমৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। সাথে সাথে এর মাধ্যমে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি সমভাবে ও বৈষম্যহীনভাবে রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষার প্রথা এবং ঐতিহ্য মোতাবেক তাদের আত্মপরিচয় অথবা সদস্যপদ নির্ধারণ এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠান অক্ষুণ্ন রাখার অধিকার রাখেন। অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্বশীল, অংশীদারিত্ব, পরামর্শ, সম্মতি এ সংক্রান্ত দ্বিতীয় ভাগের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ-৯। সেখানে ৭২ এর সংবিধানে যা রয়েছে তার সাথে আমরা যুক্ত করতে চাচ্ছি, ''ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিগতভাবে একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাংলাদেশি জাতি, ঐক্যবদ্ধ, সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাংলাদেশি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।'' এটি আমরা সংযোজন করতে চাচ্ছি।

দ্বিতীয় ভাগের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির মালিকানার নীতিমালা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ-১৩। এখানে শুধু উল্লেখ ছিল, "রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায় মালিকানা, ব্যক্তি মালিকানা।" এটির সাথে আমরা "(গ) অনুচ্ছেদে সমষ্টিগত মালিকানা অর্থাৎ প্রথাগত সমষ্টিগত মালিকানা, প্রথাগত আইনভিত্তিক আদিবাসীদের সমষ্টিগত মালিকানা" স্বীকৃতির দাবি জানাচ্ছি।

পঞ্চম ভাগের আইনসভা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি সংক্রান্ত ৮০ অনুচ্ছেদে যেখানে আছে, এটি আমরা একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজনের দাবি জানাচ্ছি। ২ (ক) ''রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে এবং উক্ত অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এমন আইন প্রণয়ন, সংশোধন বা বাতিল করিতে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্যজেলা পরিষদ এবং ক্ষেত্রমতো ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন।'' ২ (খ) ''অনুরূপভাবে রাষ্ট্র সমতল অঞ্চলে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে সমতল অঞ্চলে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃত্ব ও সংগঠনসমূহের সহিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আইন প্রণয়ন করিবেন।''

দশম ভাগের সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা সংক্রান্ত ১৪২ অনুচ্ছেদে আমরা দাবি জানাচ্ছি একটি নতুন অনুচ্ছেদ ১৪২(ই) সংযুক্ত করার জন্য- ''সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত দেশের আদিবাসীদের পরিচয়, স্বকীয়তা, অংশগ্রহণ ও অধিকার সংরক্ষণ করে এমন বিধানাবলি সংশোধন, সংযোজন অথবা বাতিলের পূর্বে দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, ৩ পার্বত্য জেলা পরিষদ ও ক্ষেত্রমতো ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে আলোচনার ব্যবস্থা করিবেন।''

প্রথম তফশিল অনুচ্ছেদ-৪৭ অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন। ওই তালিকায় আমরা দাবি জানাচ্ছি, প্রথম তফশিল অন্তর্ভুক্ত আইনসমূহ সংযোজন করার। আমরা আইনের তালিকা দিয়েছি। যেমন; "পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসন বিধি-১৯০০, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯, ১৯৯৮ সালের ১০ নম্বর আইনের সংশোধনীসহ ৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন-১৯৯৮, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-১৯৯৭" এগুলোকে তফসিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা।

নাগরিকত্ব যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য। প্রথম ভাগের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত অনুচ্ছেদর-৬(১) এ উল্লেখ আছে, ''বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।'' এটি ঠিক আছে। কিন্তু অনুচ্ছেদ-৬(২) এ উল্লেখ আছে, ''বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।'' এই জায়গায় আমাদের আপত্তি এবং এখানে আমরা সুপারিশ উপস্থাপন করছি আপনাদের বিবেচনার জন্য। "৬(২)। তফসিলভুক্ত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ব্যতীত বাংলাদেশের অন্যান্য জনগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।" এবং "৬(৩)। বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।'' এই দুটি অনুচ্ছেদ যদি সংযোজন করা যায়। কারণ আমরা এখানে যৌক্তিকতা উল্লেখ করেছি, বাংলাদেশে বাঙালি জাতিগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের সকল নাগরিকদের জাতীয়তার পরিচিতি বাংলাদেশী হওয়া আইনসম্মত বলে আদিবাসী ফোরাম মনে করে। আমি আর সময় নিলাম না। এই লিখিত মতামত আমরা আপনাদের কাছে দিয়ে যাব। আমরা আশা করব, আমরা বরাবরই চেয়েছি যে, বাংলাদেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমরা দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য। কিন্তু সংবিধানে স্বীকৃতি না থাকার কারণে অনেকভাবে আমাদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা হয়। নানা তকমা দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা সেই ৭২ সাল থেকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য, অখণ্ডতা বা সার্বভৌমত্বের প্রতি অবিচল আস্থা, বিশ্বাস স্থাপন করতে চাই। আমরা আশা করব, এই কমিশন আমাদের এই সুযোগ দিবেন।

আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আপনাদের লিখিত ভাষ্যটি আমাদেরকে যদি দেন, তাহলে আমাদের জন্য সংরক্ষণ করা এবং বিবেচনায় নেয়া সম্ভব হবে। এখন আমি অনুরোধ করব অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম ইন বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিদের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। রেকর্ডের সুবিধার্থে প্রথমেই যদি আপনাদের নাম এবং প্রতিষ্ঠানের নাম বলেন,তাহলে রেকর্ডিং এর জন্য সুবিধা হবে।

ধন্যবাদ।

জনাব এ. বি. এম. শামসুল হুদা (অ্যাক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি): প্রথমেই আমি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, আপনাকে এবং আপনার সঙ্গে যারা এই কমিশনে সম্মানিত সদস্য হিসেবে আছেন, সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদেরকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

আমরা খুব সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করব। লিখিত যে বক্তব্য সেটি আপনাদেরকে হস্তান্তর করব। আমি সেটারই সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

প্রথমত আদিবাসীদের বিষয়ে আমার পূর্ববর্তী বক্তা যা উপস্থাপন করেছেন, এগুলো সবই আমরা endorse করি। সবগুলো আমাদের প্রস্তাবে নেই, যেহেতু সেখানে আছে, তাই আমরা রাখিনি। কিন্তু আমরা এটির সমর্থন করি। শুরুতেই আমরা যা বলতে চাই, বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে তার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা এবং ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার দালিলিকভাবে সংরক্ষণ করা জরুরি। হাজার হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীর জীবনের বিনিময়ে এই দেশটি স্বাধীন দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯৭১ এর ১০ই এপ্রিল যে স্বাধীনতার ঘোষণা, Proclamation of Indepedence দেওয়া হয়েছিল, তার ভিত্তিতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছিল এবং তাদের নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। সেই ম্যান্ডেটের ভিত্তিতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। সংবিধানে এসবের বর্ণনা যথাযথ মর্যাদায়, যথাস্থানে উল্লিখিত থাকতে হবে। আর এই প্রজাতন্ত্রের নাম যেটি আছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, Peoples Republic of Bangladesh, এটি বহাল রাখতে হবে। দেশে যে জাতীয় সংসদ আছে, এটিকে আমরা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করার প্রস্তাব করছি। দুইটি কক্ষ থাকবে, উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষ। আমরা সবটা পড়ছি না, নিম্নকক্ষ সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। উচ্চকক্ষ, এটি আকারে তুলনামূলকভাবে ছোট হবে এবং সেখানে বিভিন্ন পেশা, সমাজের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব নির্দিষ্ট থাকবে। যেমন; শিক্ষক, ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী, নারী, আইনজীবী, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মানুষ, সাংবাদিক, শ্রমিক, প্রান্তিক কৃষক, আদিবাসী, উপেক্ষিত জনগোষ্ঠী। Excluded communities এবং প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ প্রভৃতি। তাদের নির্দিষ্ট কোটা উচ্চকক্ষে নির্দিষ্ট করতে হবে এবং তাদের নির্বাচন হতে হবে। আমরা প্রস্তাব করছি যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা এবং অন্যান্য সবকিছুর কারণে যে বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন, প্রশাসন এবং গোটা সংবিধানে সেই বিকেন্দ্রীকরণের প্রতিফলনটা আরো বেশি দৃশ্যমান হওয়া দরকার। সেজন্যে আমরা ৬ থেকে ৮টি প্রদেশে বিভক্ত করার জন্য এই সংবিধানে বিধান রাখার ব্যবস্থা করতে চাই। জাতীয় সংসদের যারা সদস্য নির্বাচিত হবেন তারা এবং প্রাদেশিক পরিষদে যারা নির্বাচিত হবেন তারা মিলে উচ্চকক্ষের এই প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করবেন। এটি আমরা প্রস্তাব করছি। আমি সবগুলো পড়ছি না, প্রাদেশিক সরকারের হাতে কি কি ক্ষমতা থাকবে সেটির ব্যাপারে আমরা কিছু প্রস্তাব করেছি। আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে কাজের নিয়মিত তদারকি এবং পরিবীক্ষণ প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, এটি প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকতে হবে। উচ্চশিক্ষা থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। শিক্ষার মান ইত্যাদি পরিবীক্ষণ করা এগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের মধ্যে থাকবে। প্রদেশের দায়িত্বের মধ্যে থাকবে নির্দিষ্ট প্রদেশের মধ্যে প্রবাহিত সকল নদী, পানির উৎস, জলাধার, হাওর, বিল, বন, পাহাড় ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ। পরিবেশের সুরক্ষা, ভূমির ব্যবস্থাপনা, ভূমির ব্যবহার, কৃষি জমির সুরক্ষা, জরিপ, দিয়ারা জরিপ এগুলি প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে। কৃষি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিও প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে। বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যেমন আদিবাসী, গ্রামীণ নারী, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের ভূমি, পানি এবং তাদের অধিকার ও প্রাপ্য পরিষেবাসমূহ প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে। পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশের সুরক্ষা প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বে থাকবে। কয়েকটি ধারা সম্পর্কে আমরা কিছু সুনির্দিষ্ট উপস্থাপনা দিতে চাচ্ছি। সংবিধানের প্রস্তাবনায় “জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা” এর বদলে “বহুত্ববাদ, সমতা, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা”কে রাখার পক্ষে আমরা মত দিচ্ছি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩ তে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় মালিকানার ক্ষেত্রে যেটি আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, সেটি আমি উল্লেখ করছি না। সমষ্টিগত মালিকানা, আমরাও এটি প্রস্তাব করছি।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪-তে বর্ণিত “রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে- কৃষক ও শ্রমিককে- এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।” এখন এ বিধানটি আছে। এর শেষাংশে “আদিবাসীসহ নারী পুরুষ নির্বিশেষে ভূমিহীন পরিবারের জন্য রাষ্ট্র ভূমি সংস্কার কমিশন গঠনের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে” এই প্রস্তাব আমরা করতে চাচ্ছি।

সংবিধানের ২য় ভাগের অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) তে বর্ণিত "অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা" বিষয়সমূহকে সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটি মূলনীতির মধ্যে আছে, এটিকে মৌলিক অধিকারে অন্তর্ভুক্তও করতে হবে।

সংবিধানের ২৩ (ক) তে "রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন" কথাগুলো বলা আছে, এর পরিবর্তে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, "আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করতে হবে।" আমরা সংক্ষেপে এটি উপস্থাপন করলাম। আমি সবটা পড়িনি। লিখিত যেটি আছে সেটি দেব। একই সঙ্গে আমি এই privilegeটা নিতে চাচ্ছি। যেহেতু অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে supplementary লিখিত দিতে। আমরা যথেষ্ট consultaion-এর ভিত্তিতে করতে পারিনি। আপনাদের কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার পর আমরা যথেষ্ট সময় পাইনি। আমরা এই কদিন সময় নেব। ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের suplimentary recommendation-গুলো আপনাদের কাছে দেব। আজকে যা পড়েছি সেটি আমরা দিয়ে যাব। বাড়তি আরেকটি দেওয়ার সুযোগ আমরা নেব।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আজকে আমরা এটি গ্রহণ করব। অপেক্ষা করব পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত যেটি সেটি ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পৌছে দেবেন।

ধন্যবাদ।

আমরা এখন বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির কাছে যাব, তাদের বক্তব্য শোনার জন্য।

অ্যাডভোকেট সালমা আলী (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): আমরা লিখিত দিয়েছি। কিন্তু এটি তেমন কিছু না। যেটি দিয়েছি প্রত্যেকটি সেকশনে যেতে হবে। International specific যে commitmentগুলো আমরা করেছি, Vienna Convention থেকে, আমি শুধু নারী নির্যাতনের বিষয়গুলো বলব, জনাব এ. বি. এম. শামসুল হুদা যা বলেছেন, সে বিষয়গুলোর সঙ্গে আমরা একমত। প্রত্যেকটি বিষয়ে কিছু কিছু জিনিস আমাদের recomedation-এও আছে। প্রথমেই বলতে চাই যে, Vienna Convention. নারীর যে মানবাধিকার, সেটি কিন্তু আমরা সেখানে প্রথম পেয়েছি। আমরা জানি যে, অনেকগুলো international commitment যেমন- CEDAW, CRC এবং অনান্য যে commitment আছে, regional level, international level এবং দেশীয়ভাবে যে সমস্ত commitmentগুলো আছে সেগুলো সংবিধানে incorporate করা হোক। এটি তাড়াহুড়া করে না, কিছুটা সময় নিয়ে। একই সঙ্গে মহিলা আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে গত ২৫ বছর ধরে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টে এ বিষয়ে কথা বলেছি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১১১ অনুযায়ী এগুলো কিন্তু আইন। সে আইনগুলো আমাদের সরকার এতদিন পর্যন্ত incorporate করেনি। অনেকগুলো আইনের ব্যাপারে আমরা কাজ করেছি, যেমন; WCA, Violence Prevention and Protection Law মানব পাচারের জন্য এবং অন্যান্য অনেকগুলো আইন। হেফাজতে মৃত্যু নিবারণ আইন, Sexual Harassment আইন এখনও হয়নি। Judgement যেটি আছে সেটির একটি আইন হতে যাচ্ছে। সবথেকে বড় কথা, এই আইনগুলোর জন্য যে পরিকাঠামো, যে support service এবং মামলা চলার সময় victim এবং witness protection, মানব পাচারে যেমন আছে একটা সেকশন আছে ১৬ অথবা ১৫। এগুলো কিন্তু হয়নি। '১৩ সালে আইন হয়েছে, সংবিধানে সেই জায়গাগুলো যেন incorporate হয় এবং monitorএর ব্যবস্থা থাকে এবং budgetary allocation থাকে। এ বিষয়ে সংবিধানেই commitment থাকবে। যখন কোনো আইন হবে, সেই commitmentটি থাকবে এটি implication এর জন্য যে কী ধরনের support service প্রয়োজন। পারিবারিক যে আইনগুলো আছে, বিবাহের সময় আমরা নারী পুরুষের সমতার কথা বলি আবার দেখি যে বৈষম্য আছে। একটি বিষয় খুবই sensitive, তারপরও বলতে হয় যে, ভারতে ৫৬ এর পর থেকে Uniform Family Court এর মত একটি আলাদা আইন আছে যেখানে সব ধর্মের লোকেরা কাজ করতে পারে। আমাদের একটি সুযোগ এসেছে, আমরা এ ধরনের রাখতে পারি কি না যে একই ধরনের Uniform Family Court এর মত একটি court থাকবে। সেখানে minimum একটি standard একটি সুযোগ পেতে পারে। ভারতে দেখা যায় যে, মুসলমানরা অনেক সময় এটি মানে না। তারা তাদের নিজস্ব আইনে যেতে চায়। সেখানে আমাদের ন্যূনতম সমতা রাখতে হবে। এখানে হুদা ভাই ভূমি অধিকারের কথা বলেছেন, বাসস্থানের অধিকারের কথা আসে। আমরা যারা বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করি। Human trafficking, victim protection- এই বিষয়গুলো সুন্দরভাবে আসা উচিত। আমাদের report-এর ভিতরে যেটি দিয়েছিলাম যে বৈষম্যবিরোধী ধারাগুলোকে শক্তিশালীকরণ। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা। নারী

ও শিশু অধিকারের জন্য তদারকির ব্যবস্থা। তদারকির ব্যবস্থা যদি থাকে, তারা neutral থাকবে, কোনো সরকারের অধীনে থাকবে না। তারা indepedently সংবিধান সুরক্ষার জন্য কাজ করবে। এছাড়া হেফাজতে মৃত্যুর কথা আমরা বলেছি, নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ইস্যুগুলো আছে। আন্তর্জাতিক convention গুলোকে মাথায় রেখে কাজ করতে হবে। প্রতিবন্ধীর কথাও বলেছি। মিষ্টি খুব সুন্দরভাবে বলেছে। আমরা একসঙ্গেই কাজ করি বিভিন্ন সময়ে। প্রত্যেকটি আইন বানানোর সময় তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করেছি। Access to Justice তারা যাতে সব জায়গায় পায়।

প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে যে বিচার চাইতে যাই, সেখানে victim support court, police station প্রত্যেকটি জায়গায় সেটি ensure করা। শুধু কাগজে কলমে থাকলে হবে না। প্রতিবন্ধীদের অধিকারের জন্য একটি সাংবিধানিক কমিশন তৈরি, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব এবং অংশগ্রহণমূলক প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি। তারপর কর্মসংস্থান ও মজুরি, লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণসহ এ ধরনের আরও অনেক কিছু আছে, এখন আমরা লিখিত কিছু দিয়েছি, সময় থাকতে থাকতে আরও কিছু recommendations আমরা দেব। আমি সীমাকে অনুরোধ করব, ২/৪টি বিষয় বলার জন্য।

অ্যাডভোকেট সীমা জহুর (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): আসসালামু আলাইকুম। আমরা যেহেতু নারী শিশু নিয়ে কাজ করছি, তার বাইরেও কিছু বিষয় নিয়ে তুলে ধরছি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৪) বলা হয়েছে, "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।" সেখানে আমি ২৮(৫) হিসেবে সংযুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করছি "ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী, পুরুষ ভেদে ভরণ পোষণের অধিকার।" দেখা যায় যে, ভরণ পোষণের বিষয়টি স্ত্রী বা সন্তানের মধ্যে limitaion করা আছে। কিন্তু দেখা যায় যে, বাবা মাকে অনেক সময় ছেলে মেয়ে ভরণ পোষণ দিচ্ছে না। এজন্য আমরা বলেছি যে, ভরণ পোষণের জন্য যদি আলাদা একটি নিয়ম থাকে তাহলে যে কোনো লোকেরাই ভরণ পোষণ পাবে। আরেকটি বলেছি, নাগরিকদের সাক্ষী সুরক্ষা ব্যবস্থা। নির্যাতনের শিকার, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার, পাচারের শিকার, ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মী ইত্যাদি ব্যক্তি ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করা, shelter support নিশ্চিত করা ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা। সকল নাগরিকের জন্য সাক্ষী সুরক্ষা নিরাপত্তা বিধান প্রণয়ন করতে হবে। কারণ সাক্ষী যদি না থাকে কোনো মামলা প্রমাণ করা যাবে না। সরকারি উদ্যোগেই তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে হাজির করতে হবে কোর্টে । আবার যোগ করেছি যে, চিঠিপত্র ও অন্যান্য উপায়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করা। এটি আছে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৪২(২)-এ চিঠিপত্র ও অন্যান্য গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দণ্ড ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছি। কারণ দেখা যাচ্ছে যে, Youtube, Social Media-তে ইচ্ছামতো harass করা হচ্ছে।

সেখানে আমাদের সরকারের কোনো control নেই। সুতরাং নিরাপত্তার জন্য সরকারকে একটি উদ্যোগের কথা বলছি। তারপর বলা হচ্ছে বিচার ও দণ্ডের ক্ষেত্রে। এখানে বলা হয়েছে, একই অপরাধে একজন লোককে দুইবার বিচার করা যাবে না। কিন্তু আমরা দেখছি, একই অপরাধে দুটি আইন আছে আমাদের দেশে। যেমন: আমি উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে, যৌতুক নিরোধ আইন এর ৩ ধারা জামিনযোগ্য নয়। আবার নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ১১ (গ) ধারা, সেখানেও জামিনের সুযোগ নেই। একই অপরাধে ২টি আইন হচ্ছে। একটি হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আরেকটি হচ্ছে নারী ও শিশুতে। Totally harassment-এর জন্য মামলাটি হচ্ছে। সুতরাং দেখতে হবে, একই অপরাধের দুইটি আইন থাকবে না। একটি আইন বলবৎ থাকা অবস্থায় অন্য একটি আইনকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। এটিই আমাদের মূল কথা।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমি প্রাসঙ্গিকভাবেই বলি, প্রত্যেকের বক্তব্যের ক্ষেত্রে কমিশনের সদস্যগণ যদি কিছু জানতে চান, তারা কিছু প্রশ্ন করবেন।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক (কমিশন সদস্য): আমি অ্যাডভোকেট সালমা আলীর কাছে জানতে চাই তিনি বলেছেন যে, বৈষম্য বিরোধী ধারাগুলোকে আরও শক্তিশালীকরণ। এটি কীভাবে? এখন যেমন সংবিধানে মৌলিক অধিকার enforce করা যায়। সব ধরনের jurisdiction আছে। নতুন কোনো চিন্তা কি আছে কীভাবে আরও শক্তিশালী করা যায়?

এডভোকেট সালমা আলী (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): না, প্রথমে আমি বৈষম্যের কথা বলব যেমন নারী পুরুষের কথাই যদি বলেন, আমাদের family, সেখানে কিন্তু সমতা নেই। হিন্দু মেয়েরা আটকে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হিন্দু মেয়েরা divorce দিতে পারে না। ইন্ডিয়াতে কিন্তু ৫৬'তে হয়ে গেছে। এই জিনিসগুলো যদি আনতে পারি। এই প্রসঙ্গে আমরা বলেছি।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক (কমিশন সদস্য): Victim এবং witness প্রসঙ্গে যা বলেছেন, এটি আমরা জানি, এ প্রসঙ্গে আমরা অনেকদিন ধরে কাজ করছি। আমরা জানি যে, এখানে lawগুলো inadequate। অন্য আইন আছে। এখানে আমরা সংবিধানে কী করতে পারি? সংবিধানে কী আমাদের কিছু করার আছে?

এডভোকেট সালমা আলী (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): Protection এর একটি জায়গা থাকতে হবে। অর্থাৎ victim support service। আমরা সুপারিশ করতে পারি।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক (কমিশন সদস্য): সংবিধানে এটি লিখে দিতে বলছেন?

এডভোকেট সালমা আলী (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): সুরক্ষার বিষয়টি তো আসতেই হবে। শুধু মহিলা না। যে কোনো কারোর সুরক্ষার জন্য যে ধরনের support serviceগুলো দরকার, সেটি সংবিধানে থাকবে। নারী পুরুষের সমতার কথা যদি আমরা বলি এখন পর্যন্ত পুরুষই কিন্তু সবকিছু কন্ট্রোল করছে। আমরা মুখে মুখে অনেক কিছুই বলি, কিন্তু আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখি সেই জায়গাটিতে accessটা থাকে না। যেমন DV Law। আমরা DV Law কেন বানালাম? আমাদের কিন্তু family law আছে। DV Law এর ভিতরে protection order আছে। এটি কিন্তু প্রতিরোধমূলক একটি আইন। এই আইনের থেকেও গভীর কিছু সুপারিশ আমরা দেব। যেটি আপনাদের সাহায্য হবে সেখানে কীভাবে incorporate করা যায়। সুপারিশ আমরা দিতে পারি। আমরা মনে করছি যে, নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আমরা যে লিখিত দেব সেখানে দিয়ে দেব।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক (কমিশন সদস্য): ছোট আরেকটি প্রশ্ন। সেটি হচ্ছে ভরণপোষণের যে কথাটি আপনি বললেন, ভরণ-পোষণের জন্য যাতে সব ধরনের লোকজন যেতে পারে। এটিতো আমাদের পারিবারিক আদালতে already আছে, চাইলে যে কেও যেতে পারে।

অ্যাডভোকেট সালমা আলী (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): পারিবারিক আইনে যে ঘরগুলো আছে সেটা ডিভোর্সের ভরণপোষণ। শুধু স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে, সেখানে বাবা মা পাবে এরকম কিন্তু নেই।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক (কমিশন সদস্য): মাতা পিতা ভরণপোষণ আইন হয়েছে ২০১৩ তে, সেখানে যেতে পারে।

অ্যাডভোকেট সালমা আলী (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): অনেকে মনে করে পারিবারিক ভরণপোষণ আইনটি শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য। আমরা যাব কোথায়, খ্রীষ্টানরা তাই বলে। এটির ব্যাপক awareness দরকার।

অ্যাডভোকেট সীমা জহুর (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): CEDAW, CRC-তে যে commitment-গুলো করা হয়েছে, সেটির বিষয়ে homework করা দরকার। এটি নিয়ে সরকার কিছু করে না, পরে যখন ৫ বছর পর report দেয় তখন একটা কিছু লিখে নিয়ে যায়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমরা এখন রিভার এন্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টারের প্রতিনিধিদের কাছে যাব।

আমি আরেকবার অনুরোধ করছি আপনাদের নাম এবং আপনাদের প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করলে রেকর্ডিং এর জন্য সুবিধা হবে।

ডা. ইফাদুল হক (রিভার এন্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টার): আমরা বলতে চাচ্ছি যে, আমাদের বর্তমান যে সংবিধান আছে সেটি যখন তৈরি করা হয় তখন বাংলাদেশ predominantly একটি rural country ছিল। সেজন্য সেটির প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের Rural Development Article আছে। কিন্তু গত ৫০ বছর বা তার বেশি সময়ে খুবই wide spread নগরাছু-এ হয়েছে। আমাদের শহরগুলো বড় হয়েছে। শুধু যে urbanization বড় হয়েছে তা না, আমাদের aspiration change হয়ে গিয়েছে। Particularly যেখানেই থাকুন না কেন। Youthদের মধ্যে বিশেষ করে সবাই urban live, urban resource, urban lifestyle, urbanization সেগুলো মানুষ আশা করে। কিন্তু সেই vision টা নেই। এই যে urbanization হচ্ছে, আমরা এখন ৪০% urban country, সামনে সেটি বেড়ে ৬০% এ যাবে এবং এটি বাড়তেই থাকবে। এই aspiration-কে guide করার জন্য এই process-গুলোকে গাইড করার জন্য আমাদের কোনো value, vission নেই। সেটি আমাদের সংবিধানে আনার একটি প্রস্তাব আমরা রাখছি আপনাদের কাছে। আমরা বলছি যে এই Context-এ আমাদের শহরগুলো অন্যায্য শহর, এখানে অনেক অসমতা কাজ করে। যারা আমরা নগরের আবাসন অধিকার নিয়ে কাজ করছি তারা জানি যে এখানে অনেক সমস্যা আছে। তাই আমাদের প্রস্তাবটি হচ্ছে যে, আমাদের সংবিধানে ন্যায্য নগর জীবনের অধিকার বলে এটিকে স্বীকৃতি দিতে হবে। right to fare urban life। এটি আমাদের সংবিধানের পার্ট ২ তে fundamental state policy হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। Right to fare urban life এ কি প্রক্রিয়াতে আমরা এই principleগুলো নিয়ে আসতে চাই সেগুলো নিয়ে আমি এজাজ ভাইকে কথা বলতে বলবো একটু পরে। আমরা বলছি যে, right to fare urban life-এর main pillar হচ্ছে participation। মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শহর তৈরি হবে, নগরাছু হবে। সেটি সবার অংশগ্রহণে তৈরি হবে। Marginalise মানুষের অংশগ্রহণে তৈরি হবে।

সেই participation টিকে একদম central feature হিসেবে ধরতে হবে। শহর তৈরি করতে গেলে participation ছাড়া শহর গড়ে তোলা যায় না। তার পাশাপাশি আমাদের যে important pillarগুলো নিয়ে principles দিতে হবে, আমাদের যে civic resourceগুলো আছে, আমাদের যে utilise system আছে, আমাদের যে serviceগুলো আছে সেগুলোতে acessable হতে হবে। বিভিন্ন এলাকার মধ্যে সেগুলোর যে একটি অসম বণ্টন হয় এটিকে আমাদের কমাতে হবে। এটিকে কীভাবে ঘোচানো যায় সেটি নিয়ে আমাদের principles দিতে হবে। Transportation Sector-এ আমাদের transportation justice-এর জায়গা থেকে জিনিসটা চিন্তা করতে হবে। শুধু good management নয়, transportation justice আমরা কীভাবে realise করতে পারি, যেখানে বয়স্ক মানুষজন, নারীরা, শিশুরা, transportation system টা acess করতে পারে। তারা যেন সেটি Safely ব্যবহার করতে পারে। আমাদের শহরগুলো কীভাবে safe হতে পারে, liveable হতে পারে, সেই safety এবং liveabilty principle থাকতে হবে। আমাদের যে বিভিন্ন রকম সামাজিক সাধারণ মুক্ত স্থানগুলো আছে play ground থেকে শুরু করে public space , canalsএগুলো কীভাবে আমরা সুরক্ষা করতে পারি। মানুষকে সাথে নিয়ে, মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এটিকে সুরক্ষা করা। সেটির একটি reflection আমাদের নূতন সংবিধানে থাকতে হবে। আমাদের শহরগুলো খুবই culturally divirse, culturally plural এই শহরগুলো। সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাথায় রাখা যে একটি বহুভাষা, বহুসংস্কৃতি, বহুচিন্তাভাবনার সমাগমে এই নগরায়নগুলো হচ্ছে। সেটির একটি reflection এই right to fare urban সিটির মধ্যে আছে। Local Urban Governmentকে empower করতে হবে। এর decision making প্রক্রিয়ার মধ্যে সেখানকার local residence যারা আছে, তাদের participation এবং অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। এগুলিই pillars of right to fare urban life। ন্যায্য নগর জীবনের অধিকার। আমরা এই principles-গুলোতে কীভাবে এসেছি এবং কীভাবে এগুলো নিয়ে কাজ করছি এই প্রক্রিয়া নিয়ে আমি জনাব এজাজকে একটু কথা বলার জন্য অনুরোধ করব।

জনাব মুহম্মদ এজাজ (রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টার): ধন্যবাদ ডা. ইফাদুল হক। ২টি জিনিস আমরা করেছি সেটি হচ্ছে, আমরা কয়েক হাজার মানুষকে এখানে সম্পৃক্ত করেছি এক ধরনের public consultation-এর মাধ্যমে। এটি চলমান, আগামী ২০ তারিখ পর্যন্ত যাবে। আমরা আশা করি প্রায় ১০ হাজারের উপরের লোকজনকে এই consultation-এ অন্তর্ভুক্ত করতে পারব। আপনারা যেহেতু শুরু করেছেন, তখন ভাবলাম যে আমরা একটি public consultation করে present করি তাহলে ভালো হবে, আগামী ১৯ এবং ২০ তারিখে সারা বাংলাদেশ থেকে। আজকে যে reflection দিয়েছি। এটি আসলে people reflection. people reflection নিয়ে আমরা কখনও expert reflection-এ যাইনি, এর ২টি কারণ। কারণ বিগত ৫৩ বছরে আমরা expert reflection করে যে বৈষম্যটি তৈরি করেছি তারই outburst হচ্ছে জুলাই অভ্যুত্থান। সুতরাং people reflectionই দরকার for constituting the nation and state. সেখানে আগামী ১৯ এবং ২০ তারিখে ঢাকায় সারা বাংলাদেশ থেকে delegateরা আসবেন। দলিত থেকে শুরু করে শিক্ষক পর্যন্ত। প্রথমে যে responseটি এখানে দিয়েছি এটি হচ্ছে, তাদের more about cognitive response. হঠাৎ করে তারা এক ধরনের ন্যায্যতা সম্পর্কে কিংবা তার state কী রকম হবে সে সম্পর্কে মানুষকে যখন আমরা *ড়ঢ়বহ-বহফবফ য়ঁবংঃরড়হ* করি তখন প্রাথমিকভাবে তাদের conventional predominant যে social narrativesগুলো আছে সেখান থেকেই answerটা করে। তারপর তার যখন brainstorming session প্রয়োজন পড়ে তখন দেখবেন যে, may be contradictory অথবা আরেকটু sharpener opinion-এ মানুষ যায়। এটি হচ্ছে human mind-এর একটি বড় বিষয়। সেজন্য আমরা ঢাকায় এদেরকে আনব। বাংলাদেশের বিভিন্ন diverse sector-এ যারা আছেন তাদের সাথে আমরা ২ দিন ব্যাপী serious dialogue করব। Dialogue করে আমরা আরেকটি reflection নেব। আমরা আজকে এটি জমা দিয়ে গেলাম। আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে আরও বিস্তারিত জমা দেব। একটা সমস্যা আমরা ফেস করেছি, সেটি হচ্ছে, যখনই আমরা constitutional বিষয় নিয়ে কথা বলছি, মানুষ অনেক দাবি দিচ্ছে। দাবি আর constitutional বিষয় এক নয়। Constitution is more about preamble. এটিকে preamble-এর ভাষায় translate করা একটি চ্যালেঞ্জ। যেটি আমরা ফেস করছি। এর মাঝখানে policy and act আছে প্রচুর। সুতরাং অনেক issue থেকে এটি হয়ে যাবে policy issue. এর মধ্যে অনেক issueই আইন, যেটি ভাইয়া বললেন। রাষ্ট্রটি কী রকম হবে at principle, গঠনিক জায়গা থেকে। এটিকে এই level-এ নিয়ে আসা, people narrative কে, এটি একটি big challenge আমরা মনে করি। আপনারাও এটি ফেস করছেন নিশ্চয়। আমরা আমাদের জায়গা থেকে এটা ফেস করেছি। alongwith fairness, সেটি নিয়ে আমরা কাজ করছি।

এছাড়াও আমাদের আরও কিছু observation আছে। সেটি হচ্ছে আমরা এরকম একটি constitution চাই যেটি আমরা west-কে সেল করতে পারব, not only the east. আমরাতো global south-এ আছি। আমরা যেন global northকেও সেল করতে পারি। জুলাই অভ্যুত্থানে আমরা যে নতুন একটি জায়গায় গিয়েছি। এখানে people perceptionটি, participationটি এরকম হয়েছে যে, রাষ্ট্র কাঠামোতে যে new liberal economic system-এর মধ্যে আমরা ultimately পৌঁছেছি বা পৌছবো। সেখানে এক ধরনের fascist system থেকে new liberal economic-এ আমরা যাব। সেখানের একটি বড় causalities হবে ultimately বা challenges হবে যে,

exclusion হবে কিন্তু ওখানের মধ্যে। সেই social exclusion এবং economic exclusionগুলোকে আমরা address করতে পারছি কিনা আমাদের সংবিধানে? আমরা মনে করি, এটি প্রথমত একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, participatory democracy আমরা কীভাবে ensure করতে পারি, শুধুমাত্র ভোটে না রেখে। excising democracy should not be limited in the voting system only. এটিকে আমরা আরও কতটুকু অংশগ্রহণমূলক করতে পারি। যেটির একটি উদাহরণ ড. ইফাদ দিলেন। সরকারের প্রত্যেকটি জায়গায় decision making এবং project development-এ এটি ensure করতে পারি কিনা? এটি আমার মনে হয়, constitution-এ reflection থাকা দরকার।

তৃতীয় হচ্ছে, এরকম নতুন কোনো constitution-এ যাওয়া উচিত হবে না যে মানুষ তার অধিকার আদায় করতে গেলে তখন constitutionকে রক্ষার জন্য মানুষকে মারা হবে। শেখ হাসিনা শুধু constitutionকে রক্ষার জন্য সে যেভাবে এটিকে তৈরি করেছে। সংশোধন করতে করতে এটিকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে এসেছে যে, এটি constitution versus people হয়ে গেছে। গত ২টি নির্বাচনে mechanism হয়েছে তা শুধু সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে গিয়ে হয়েছে এবং এতে মানুষের democratic rightকে পুরোপুরি হরণ করা হয়েছে। সুতরাং আগামীর সংবিধান যেটি হবে সেটি যেন constitution versus people না হয়। সংবিধানকে যেন ওই জায়গায় নিয়ে না যাই। সেটির একটি reflection সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের নতুন সংবিধানে থাকতে হবে। এর মধ্যে যেন colonial legacy কম থাকে। একটি আলোচনা আমার সহকর্মীরা করেছেন যে, এটি 'প্রজাতন্ত্র' কেন হবে? কারণ আমরা তো 'প্রজা' না। একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান আমরা চাই।

৩ নাম্বার বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে, এক ধরনের cultural fascism-এর element আমাদের বাংলাদেশে আছে। একটি হচ্ছে 'ইসলাম' প্রশ্নটিকে আমরা কীভাবে inclusion করতে পারি? অতীতে ইসলামকে seriously exclusion করে এক ধরনের secularism-এর নাম দিয়ে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করা হয়েছে তা রাজনৈতিক দলগুলোর narrativeকে বাস্তবায়ন করতে গিয়েই হয়েছে। কিন্তু অন্য রাজনৈতিক দলগুলো এটিকে own করতে পারেনি। সুতরাং এখানে আমরা 'ইসলাম' প্রশ্নটিকে inclusivity কীভাবে করব? এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এটি করতে হবে। এটি করতে গিয়ে আরেকটি cultural fascism যেন তৈরি না হয়। আমার মনে হয়, এটির check and balance খুবই গুরত্বপূর্ণ। আমাদের সমাজে এক ধরনের islamic cultural fascism-এরও একটি element আছে। কারণ গত ৫০ বছরে তাদেরকে আমরা exclusion করে main stream-এ আনতে দেইনি। যে কারণেও mass appraisingও হয়েছে। এটিকে তো binary করা যাবে না। কিন্তু এই inclusionary জায়গা থেকে আমরা যেন ভবিষ্যতে আরেক ধরনের ওয়াহাবি cultural fascism-এর মধ্যে না ঢুকি। কারণ ওয়াহাবি cultural fascism-এর যে element এখানে রয়ে গেছে, সেটিকে কীভাবে address করে এখানকার বাংলার বাঙালিত্ব, বাংলার culture এবং বাংলার মুসলমানের যে culture আছে এটিকে আমি address করব। একইসাথে অন্য কালচারের যারা রয়েছে তাদের অধিকারকেও আমি বাস্তবায়ন করব। এটি কোন্ narrative-এ হবে সেটি একটি বড় আলোচনার এবং বড় চিন্তার জায়গা আছে। আর political fascism যেন আর কখনও না আসতে পারে। অর্থাৎ জাতিবাদি কোনো ধরনের terminology- এটি হতে পারে political narrative, হতে পারে political science-এর যে narrativeগুলো আছে। যেমন secularism-এর বাংলা definitely ধর্ম নিরপেক্ষতা নয়। আমরা চাই, সকল ধর্মের মানুষ যেন তার ধর্মীয় অধিকার, তার ধর্মীয় কৃষ্টি কালচার ঠিকমতো পালন করতে পারে। সুতরাং শব্দগুলোর ব্যবহার ভুলভাবে হওয়ার কারণে definitely ভিন্ন political agenda এবং রাষ্ট্রীয় agenda পরবর্তীতে ভিন্ন হয়েছে। এই inclusionটা আমরা কীভাবে করব, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা।

৪ নম্বর হচ্ছে, স্থানীয় সরকার। এটিও আলোচনায় এসেছে। নগরায়নের প্রেক্ষাপটে সিটি করপোরেশন এবং সিটি গভর্নমেন্টকে স্বায়ত্বশাসন দিতেই হবে। যখন পরিচ্ছন্ন নগরের কথা বলা হয়, কিংবা একটি শহর কী রকম চাই, তখন ultimately সমন্বয়ের বিষয়টিই ঘুরে ফিরে আসে। আমরা পরিচ্ছন্ন নগরের কাঠামো নিয়ে যখন কথা বলছি, expertদের সাথে যখন solution and recommendation নিয়ে কথা বলি, সর্বপ্রথম যে metaphor আসে, সেটি হচ্ছে 'বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে'? অর্থ্যাৎ who will take the responsibility. এটি সিটি করপোরেশনের দায়িত্ব নাকি ওয়াসার দায়িত্ব। কারণ এখানে multiple stakeholders আছে, সার্ভিস হোল্ডারস আছে। তাদেরকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনো সমন্বয় নেই। এটি একটি বড় সমস্যা হচ্ছে। ফলে স্থানীয় সরকার সঠিকভাবে কাজ করছে না। Apart from these urban issues, একদম গ্রামীণ জায়গা থেকেও অংশগ্রহনমূলক স্থানীয় সরকার আমরা পাইনি। সংসদ-সদস্যগণের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন। তাঁকে উন্নয়নের কারিগর কখনই করা যাবে না।

সর্বশেষ যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে, accountability and transparency. এটি শুধুমাত্র narrative-এর মধ্যে না থেকে এটিকে কীভাবে সংবিধানের মধ্যে আনতে পারি, তা দেখা উচিত। programme-এর প্রতিটি জায়গায়, নিদেন পক্ষে যেন একটি সেন্টেসের মধ্যে থাকে by some short of mechanism. যেখানে non human interaction-এর মাধ্যমে এক ধরনের স্বচ্ছতা তৈরি করতে হবে। কারণ আমাদের

দেশের শাসনব্যাস্থার বড় সমস্যা হচ্ছে যেখানেই human interaction হয় সেখানেই দুর্নীতি হওয়ার সুযোগটি বেশি। সুতরাং কিছু non human interaction AI ব্যবহার করে যদি জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা আনয়ন করতে পারি সে জায়গাতেই আমাদের ভালো শাসনব্যবস্থা আসবে। যে কোনো ভালো শাসনব্যবস্থার জন্য যতই non human interaction করা যায়, ততই দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থা দূর হবে। এটিই মূল বিষয়। স্থানীয় কর্তৃত্বে যেন সবকিছু আমরা করতে পারি।

সর্বশেষ আমি বলতে চাই, জনগণের রাষ্ট্র, জনগণের সরকার। সকল কিছুতে আমরা এজন্য স্থানীয় অংশগ্রহণ চাই। আমরা আজকে এটি দিয়ে যাচ্ছি এবং ২০ তারিখে আরও বিস্তারিত দেব।

আমাদেরকে ডাকার জন্য এবং কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

ব্যাখ্যার জন্য, বোঝার জন্য ২/৩টি ছোট ছোট প্রশ্ন। আপনারা যে consultancy processটি করবেন আগামী ১৯ অথবা ২০ তারিখ ঢাকায়, তাতে ন্যায্য নগর জীবনের অধিকারের বাইরে অন্যান্য বিষয়গুলো কি থাকছে? অন্য যে বক্তব্যগুলো আপনারা বললেন স্থানীয়ভাবে, নাকি প্রধানত নগর জীবনের দিকেই নজর দিচ্ছেন, আপনাদের ঐ consultation-এ।

জনাব মুহম্মদ এজাজ (ডেলটা রিভার এন্ড রিসার্চ সেন্টার): এটাকে সুনির্দিষ্ট ন্যায্য নগরের জায়গা থেকে, ফেয়ার সিটি থেকে করেছি ২ উদ্দেশ্যে। কারণ ২০৩০-এর মধ্যে বাংলাদেশের ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ লোকজন নগরে থাকবে। সুতরাং এখানে বৈষম্যের কথা বা অন্য যে terminology আমরা ব্যবহার করছি সেটির people’s reflection লাগবে। আমি এখানে যে আলোচনাগুলো করলাম, যে quantitative research বিভিন্ন সময়ে সমাজে করছি, সেটার সময় তো অনেক কম। আপনারা ফর্ম করার পরে আমরাও অনপ্রাণিত হয়েছি। সময় তো আসলে কম এ কাজগুলো করতে। এজন্য চেষ্টা করছি সুনির্দিষ্ট ইস্যু ধরে আমরা কিছু করি। তারপর না হয় আমরা broader issueতে যাব। তা না হলে প্রথমেই broader issue তে গেলে আমাদের afford and capability-এর একটি চ্যালেঞ্জ আছে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আপনারা ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে যে submission দিবেন, সেখানে আপনাদের বক্তব্যে এই ন্যায্য নগরের বাইরেও কিছু বক্তব্য আছে, সেগুলো কি অন্তর্ভুক্ত থাকবে?

জনাব মুহম্মদ এজাজ (ডেলটা রিভার এন্ড রিসার্চ সেন্টার): আমরা দুটো পেপার দেবো। একটা ন্যায্য নগর নিয়ে, যেটা পুরো consultation থেকে এসেছে। আরেকটি হচ্ছে, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে যে ইস্যুগুলো আমরা পেয়েছি সেটির আরেকটি পেপার দিব।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমরা এখন ক্যাম্পেইন ফর পপুলার ফাউন্ডেশন এর প্রতিনিধির কথা শুনব।

জনাব মুজিবুল হক মনির (Campaign for Popular Education (CAMPE): ধন্যবাদ মাননীয় সভাপ্রধান। আমি এখানে যে প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধিত্ব করছি এটার বাংলা নাম হচ্ছে “গণস্বাক্ষরতা অভিযান” আর ইংরেজি নাম “Campaign for Popular Education (CAMPE). এখানে কোনো কারণে হয়ত ফাউন্ডেশন এসে গেছে।

সংবিধান নিয়ে এখানে কথা বলা বিশেষ করে সামনে যারা আছেন, তাদের সামনে এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলা বেশ কঠিন এবং ধৃষ্টতারও নামান্তর। কিন্তু এখানে কতগুলো বিষয় খুব সুনির্দিষ্ট যে, আমরা কেমন চাইছি নতুন বাস্তবতায়। আমরা মনে করি, নতুন বাস্তবতায় সংবিধানের সংস্কার খুবই জরুরি। এই উদ্যোগটি নেয়ার জন্য আমরা এই সরকারকে সাধুবাদ জানাই। প্রেক্ষাপটটা কী? কেন এই সংস্কারের উদ্যোগ? ওই প্রেক্ষাপটটি যদি আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি, তাহলে আমাদের কি করা উচিত, সে উত্তরটি আমরা সেখানে পাই। প্রেক্ষাপটটা হচ্ছে যে, আমাদের যে সংবিধান, সেটা কাগজ-কলমে গণতান্ত্রিক। কিন্তু নানা কারণে আমাদের দেশে democratic deficiency তৈরি হয়েছিল। কারণগুলো কি? এর বড় দুটি কারণ জানা যায় অনুচ্ছেদ-৭০ এবং অনুচ্ছেদ-৫৭। সুতরাং প্রথম সুপারিশ অনুচ্ছেদ-৭০ নিয়ে। যেখানে বলা আছে, “যে দল থেকে মনোনীত হবেন সে দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে তাঁর সংসদ-সদস্য পদ বাতিল হবে”। এটিতে আমরা আপত্তি জানাই। কারণ আমরা মনে করি এটা যদি বাতিল করা না যায়, তাহলে সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক সংবিধান পাওয়া সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়ত অনুচ্ছেদ-৫৭। যেখানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বা প্রধানমন্ত্রীর কথা বলা আছে। আমরা মনে করি, ২টি মেয়াদের বেশি কোনো প্রধানমন্ত্রীর থাকা উচিত না। সংবিধানের এই ২টি অনুচ্ছেদ সংশোধন করা না গেলে যেটা হচ্ছে, আমরা দেখেছি যে, একজনের কাছে সর্বময় ক্ষমতা চলে গেছে। আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হই, প্রথম যে ক্লাসটি করি, সেখানে বলা হয়েছিল যে, Power corrupts, Absolute power corrupts absolutely এটা আসলে প্রাথমিক সত্য কথা। সুতরাং সংবিধান আমরা

এমন ভাবে চাই, আমরা আশা করব যে, এখানে কারো কাছে, কোন বিভাগের কাছে, সেটি নির্বাহী বা জুডিশিয়ারি বা অন্য কারো কাছে absolute power যেতে পারবে না। এটা হচ্ছে basic criteria এবং একটা basic জবাবদিহিতায় সবাইকে থাকতেই হবে।

এটিতো প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বিষয়। কিন্তু সংসদ-সদস্য যারা হবেন, তাদের এটি থাকতে হবে। কফি আনানের একটি কথা থেকে আমি বলি, "Democracy begins with the bottom-up, not form the top-down". তার জন্য আমাদের কী করতে হবে, এখানে কেউ একজন বলছিলেন, আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা একেবারে হ-য-ব-র-ল অবস্থায় আছে। মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিবের চিঠিতে উপজেলা চেয়ারম্যানের চাকরি চলে যাচ্ছে। একজন উপসচিবের চিঠিতে একজন উপজেলা চেয়ারম্যান যিনি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত, তার চাকরি চলে যাচ্ছে। বাস্তবতা হচ্ছে, এখন হয়ত ভোট লাগেনা, কিন্তু কাগজে-কলমে তো তারা ভোটে নির্বাচিত হওয়ার কথা। জনগণের ভোটে নির্বাচিত একজন প্রতিনিধিকে কীভাবে একজন উপসচিব বরখাস্ত করতে পারেন। সুতরাং স্বায়ত্ত শাসিত স্থানীয় সরকার যদি আমরা না পাই, আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমরা এটি চাই।

আমি খুব আশা করেছিলাম, সালমা আপা এটি বলবেন, কিন্তু বলেননি। সময়ের কারণে হয়ত বলেন নাই। কিন্তু আমরা অবশ্য অবশ্যই নারী আসন চাই, তবে সেখানে নির্বাচনের ব্যবস্থা চাই। আমরা চাই প্রত্যক্ষ নির্বাচন হবে। উপজেলা পরিষদের যেভাবে হয়, ইউনিয়ন পরিষদে যেভাবে হয়। সংরক্ষিত আসন আছে কিন্তু সেখানে সরাসরি নির্বাচন হয় না। সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে যখন কোনো নারী সদস্য আসবেন, তার যে সম্মান এখন এই সংরক্ষিত আসনে মনোনয়নের মাধ্যমে সেই সম্মান তারা পান না।

আমরা মনে করি যে, সংসদ-সদস্য আমরা নির্বাচন করে দিলাম, এখন তারা যা ইচ্ছা আইন পাশ করবেন, এই জায়গাটায় একটি check and balance দিতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষ নীতিমালার ক্ষেত্রে তারা যেন আবার জনগণের কাছে যান, যেতে বাধ্য হন, একটি গণভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। ইচ্ছা করলেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সংসদে একটি বিল পাস করলেন, একটি আইন পাস করে দিলেন, জনগণের কোনো মতামত নেওয়া হয় না, এখানে অবশ্যই একটি বাধা রাখতে হবে। যাতে করে তারা পরিবর্তন করার আগে ১০০ বার ভাবেন যে, এটির জন্য আমাকে জনগণের কাছে যেতে হবে। পাশাপাশি আরেকটি বিষয়, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো সত্যিকার অর্থে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। এই জায়গাগুলোতে কাজ করা আমার কাছে মনে হয় খুবই প্রয়োজন। একটা লিখিত আপনাদেরকে দেব। আজকে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে কিছু সুপারিশ আপনাদের কাছে দিলাম।

আমাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

জনাব মুজিবুল হক মনির সাহেব আপনি বলছিলেন, গণভোটের ব্যবস্থা। একটু বুঝার জন্য যে, আপনারা যে গণভোটের কথা বলছেন, সেটি কি সকল আইনের ক্ষেত্রে, না qualifz করার কথা বলছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে।

জনাব মুজিবুল হক মনির (Campaign for Popular Education): এটি নিঃসন্দেহে qualifz সব বিলের ক্ষেত্রে যাওয়া উচিত নয়। যেসব বিলগুলো জাতীয় নীতিমালার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করবে, সেই সব জায়গায়। কতগুলো নির্দিষ্ট করা যেতে পারে যে, এই এই আইনগুলো, যেগুলো রাষ্ট্রের সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করে ফেলে। যেগুলো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে ফেলে। যেমন 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' আইনটি বাতিল হয়ে গেল, এ আইনটি বাতিল করার আগে তো আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, আমি কি সেটিতে রাজি কিনা? এরকম মৌলিক যে বিষয়গুলো রয়েছে, সেই আইনগুলো যখন পাস হবে, তখন যেন মানুষের কাছে তারা যায়, এটি আমার চাওয়া।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় আপনি বলেছেন যে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কথা, সে বিষয়ে যদি একটু বিস্তারিত বলেন যে সংসদীয় কমিটিগুলো কীভাবে কাজ করবে?

জনাব মুজিবুল হক মনির (ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন): এখন যেটি হয়, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে সরকারি দলের সদস্যরা থাকেন এবং বিরোধী দলের সদস্যরা থাকেন। তাদের ক্ষমতা খুবই সীমিত। যতটুকু আমরা জানি। তারা কী করতে পারেন, কোনো বিষয় যদি প্রয়োজন হয়, সরকারি কর্মকর্তাদের ডাকেন, জবাবদিহি চান, কিছু সুপারিশ করেন। কিন্তু সেই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা আসলে সেরকমভাবে নেই। সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো অনেক সুপারিশ করে, আমরা যদি গবেষণা করি, একটি পত্রিকায় এসেছিল, দেখা গেছে ২০ শতাংশ সুপারিশ বাস্তবায়ন হয় না সরকারের ক্ষেত্রে। তার অর্থ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বৈঠক করে, সুপারিশ করে। কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন হয় না। সেই সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা নেই। আমরা এই জায়গাটিতে একটু শক্তিশালী ভূমিকা চাচ্ছি। যাতে করে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি যে সুপারিশ করবে সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের যে আমলা বা সরকারের যে যন্ত্র, সেখানে যাতে একটি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।

অ্যাডভোকেট সালমা আলী (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাথে কাজ করে, বিশেষ করে বিগত ১২ বছর, জাতীয় পার্টির সদস্যরা কয়েক কমিটির সভাপতি ছিল। সেখানে অভিবাসনসহ বেশকিছু বিষয়ের উপর শক্তিশালী সুপারিশ করেছে, সংসদেও তুলেছে। কিন্তু সংসদে গিয়ে কোনো কাজ হয়নি। কারণ যেহেতু তারা খুব অল্প লোক। অতএব এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে, সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে মনিটর করার বিষয় যদি থাকে। তিনি বলেছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যানদের কথা। তারা ভিষণভাবে খুশি হবেন, ওখানে যারা আছে, যেমন কক্সবাজারের কথা যদি ধরি, চেয়ারম্যানগণের মধ্যে ৪-৫ জন চেয়ারম্যান শিক্ষিত, অনেক ভালো। তাদের দায়বদ্ধতার বিষয়টি খুবই contradictory. ঐ জিনিসটা একেবারে ভেঙে ফেলা দরকার। আমি বিস্তারিত লিখিত দিব, আপনিও দিবেন। তারা যেন স্বাধীনভাবে আসে। তারপরও যেহেতু সরকারি দলের লোক বেশি হয়, সেখানেও আমরা যে ভালো ফলাফল পাই তা নয়। সেখানেও সরকারের মন্ত্রীর কথামতো তারা চলে ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): এক্ষেত্রে সালমা আপা আপনি বলছেন, স্থায়ী কমিটির গঠন নিয়ে, নাকি সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের পথ তৈরি করা, নাকি কাঠামোগত কোনো প্রশ্ন আছে?

জনাব মুজিবুল হক মনির (Campaign for Popular Education): গঠন প্রক্রিয়া যেভাবে আছে আমার মনে হয় ভালো। যে সুপারিশগুলো হয়, সেগুলো খুবই চমৎকার চমৎকার। অনেক সময় এরকম হয়, একটি প্রজেক্ট নিয়ে পত্রিকায় খবর হলো । তখন কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে ঐ অফিসারদের ডেকে নিয়ে আসেন। কিন্তু সমস্যাটি কী হয়? ডেকে নিয়ে এসে বলেন, এটা এটা করেন। সেটা করা হয় না। এমনকি বৈঠকের পর পর ঐ স্থায়ী কমিটির সভাপতি ক্ষোভও প্রকাশ করছেন। তাহলে আমাদের বৈঠক করে লাভ কী? আমরা বৈঠক করছি, বাস্তবায়ন হয় না। এজন্য সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জায়গাটা শক্তিশালী করা হোক।

অ্যাডভোকেট সালমা আলী (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি) : অনেক ভালো ভালো সুপারিশ করেছিলেন এবং আমাদের প্রস্তাব মতো তিনি সুন্দর সুন্দর সাজেশন নিয়ে গিয়েছিলেন ILO-তে। কিন্তু বাস্তবে কিছু হয়নি। সেই জায়গাটিতে একটু জবাবদিহিতা থাকতে হবে।

জনাব ফিরোজ আহমেদ (কমিশন সদস্য): আমি একটি বিষয়ে জানতে চাই, বা মন্তব্যই জানতে চাই, এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম ইন বাংলাদেশ-এর জনাব শামসুল হুদা বললে ভালো হয়। আপনারা তো ভূমি নিয়ে প্রচুর কাজ করেন গ্রাম এবং শহরে। বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহারের কারণে গ্রাম অঞ্চলেও বড় একটি পরিবর্তন এসেছে, যেটি আপনারা বলেছেন। নগরায়নসহ অন্যান্য ব্যাপারগুলো ঘটছে। ভূমির ব্যবহারের ফলে যে নানা পরিবর্তন ঘটছে এবং শহরের মানুষের গ্রামের জমির মালিকানা। শ্রমিকরা ছোট ছোট আকারে গ্রামে জমি ক্রয় করছে। শহরে ভবিষ্যৎ না গড়ে গ্রামেও থাকার চেষ্টা করছে। এটা আমাদের নাগরিকত্বের ধরনে, কোথায় সে ভোট দেয়? থাকে শহরে, গ্রামে ভোট দেয়। ক্ষমতার কাঠামোতে স্থানীয় চেয়ারম্যানের সাথে তার সম্পর্ক এবং এটার সাথে আমলাতন্ত্র স্থানীয়ভাবে গেঁড়ে বসার সম্পর্কও আছে। এগুলোর বিষয়ে যদি আপনাদের গবেষণার findingsগুলো জানান, তাহলে হয়ত আমাদের নিজেদেরও উপকার হবে একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে। আপনাদের যদি কোনো সুপারিশ থাকে সেগুলো যদি জানান যে, কীভাবে আমলাতন্ত্র গেঁড়ে বসেছে। এটা শুধু সংবিধান সংস্কার কমিশনের সাথে নয়, *Administrative Reforms Commission*-এর সাথে হয়ত সম্পর্কিত। তাই এই ২টি কমিশনকেই এ বিষয়ে আপনাদের বিশেষ সুপারিশগুলো কী, তা জানালে উপকৃত হবে। আজকে না জানালেও হবে। আমরা ঐ বিষয়ে আপনাদের কাজগুলো পাব আশা করছি, অন্তত সংক্ষেপ আকারে।

জনাব এ. বি. এম. শামসুল হুদা (অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম ইন বাংলাদেশ): বিষয়টি উত্থাপনের জন্য ধন্যবাদ। যে কারণে আমি সময় চেয়েছিলাম যে এটির উপর বিস্তারিত দেব। আমরা আজকে “জাতীয় ভূমি সংস্কার কমিশন” সংবিধানে রাখার জন্য বলেছি। তা বাদে অন্যান্য যে বিষয়গুলো আপনি তুললেন, খুবই প্রাসঙ্গিক। আমাদের জমি ব্যবহার এবং জমি অপব্যবহার, আমাদের কৃষি জমির অপব্যবহারে কীভাবে আমরা জমি হারাচ্ছি এবং কীভাবে আমরা এর ক্ষতি করছি, পানির ব্যবহার এবং অপব্যবহার- এগুলোকে রক্ষা করার জন্য আমাদের কিছু সুপারিশ অবশ্যই থাকবে।

আরেকটি হচ্ছে, আমাদের তথ্য সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। এটি আমার মনে হয়, সংবিধানে বাধ্যতামূলক করা দরকার যে, এ তথ্যগুলো সংরক্ষণের জন্য বেসিক দায়িত্ব কোন্ এজেন্সি বা কোন্ প্রতিষ্ঠানের। যেমন নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো কোথায় যাচ্ছে, কোথায় থাকছে, তাদের ছেলেমেয়েরা কোথায় লেখাপড়া শিখছে, আদৌ তারা লেখাপড়া করছে কি না, কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। যারা রিসার্চ করেন তারাও জানেন যে, তাদের তথ্যের জন্য খুটজে বেড়াতে হয় যে, এই পরিবারগুলো কোথায় গেল। কিন্তু আমরা কেউ তাদের খোঁজ রাখি না। সংবিধানে এটি থাকা দরকার যে, কারও না কারও কাছে এই তথ্য থাকতে হবে। এরা নদী ভাঙার কারণে এখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে। যেখানেই গেছে তাদের identity, সেখানে তাদের নতুন করে রেজিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। কারণ এই যে ঠিকানাহীন মানুষ, যারা বস্তিতে আছে, ঢাকা শহরের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশের বেশি মানুষ বস্তিতে থাকে। এদের কোনো অধিকার

নেই। এদের কোনো নাগরিক অধিকার নেই, এদের জমির কোনো অধিকার নেই। প্রতিদিন তাদের আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয়, কখন তাদের উচ্ছেদ হতে হবে। এসব বিষয় নিয়ে আমাদের কিছু সুপারিশ থাকবে। যেটি আমরা আজকে দেইনি। আপনি যদি সময়টি ঘোষণা না করতেন, আমি আপনাকে অনুরোধ করতাম যে কিছু সময় আমাদের দেন। আপনারা কিছু সময় আমাদের দিয়েছেন, নিশ্চয় আমরা এগুলো বলব।

আমি কয়েকটি জিনিস মিস করেছি, এই সুযোগে বলতে চাই, যেটি আমাদের এক বন্ধু ইতোমধ্যে বলেছেন যে, অনুচ্ছেদ- ৭০ এর বিষয়ে। এটি আমরা অবলুপ্তি চাই। আরেকটি হচ্ছে 'সরকারের মেয়াদ'। সরকার এবং সংসদের মেয়াদ ৪ বছরের বেশি হওয়া উচিত না। প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি দুইবারের বেশি এই পদে থাকার যোগ্য হবেন না, এটিও আমাদের সুপারিশে রেখেছি। আর যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন, নিশ্চয় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা বা নেত্রী হবেন। তিনি একসঙ্গে দুইটি পদে থাকতে পারবেন না। তাকে রাজনৈতিক দলের পদ থেকে পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী থাকতে হবে। অর্থাৎ ক্ষমতার conception-কে ভাঙতে হবে। এরকম কিছু বিধান আর সংসদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে নিম্নকক্ষের ক্ষেত্রে আমরা বিলেছি যে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং তারা সরাসরি নির্বাচিত হবে। এই নারীদের মধ্যে সব ধরনের নারী, প্রতিবন্ধী নারী, আদিবাসী নারী, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নারী সকলের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। এটি আমাদের প্রস্তাবের মধ্যে আছে। পরবর্তীতে আপনি যে প্রশ্নগুলো করেছেন তার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ যে এই প্রশ্নগুলো উত্থাপন করে আপনি আমাকে provoke করলেন। আমাদের সম্পূরক সুপারিশমালার মধ্যে এগুলো থাকবে আশা করি।

ধন্যবাদ।

জনাব মুহাম্মদ এজাজ (চেয়ারম্যান, রিভার এন্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টার): আপনি যে প্রশ্ন করলেন, এটি Administrative Reforms Commission-এ যাওয়া উচিত। বেঙ্গল ডেলটার একটি বড় attribute হচ্ছে, আমাদের এখানে river erosion হয়। প্রায় ৪২টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় নদী ভাঙ্গন হয়। এটি প্রায় এক লক্ষ বছর ধরে হয়ে আসছে। এটির কারণেও মানুষ স্থানান্তরিত হয়। It is not a climatic crisis. এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি climatic বিষয় নয়, কিন্তু এখানকার জিওলজি এবং এখানকার জিওগ্রাফির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট হচ্ছে এটি। কনভেনশন আইনে যে শিকস্তি, পয়স্তির বিষয়টি রয়েছে সেই আইনে ২০ থেকে ৩০ বছর লাগে জমি পুনরুদ্ধার করতে। কিন্তু ৩০ বছরে তারাতো সিটিতে চলে আসে। সিটিতে তো তারা নাগরিক নয়। তার ভোটার আইডি কার্ডটি তো বাহিরের। সুতরাং Administrative Reforms Commission এবং election reform commission-এ আপনারা এটি বলবেন যে, শহরে যে থাকবে সে শহরেই ভোট দেবে। কারণ সেতো শহরেই সার্ভিস দিচ্ছে। সে কিন্তু মেয়র নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে না। জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে গেলে সেখানে সে যেতে চায় না, যার ঘর নেই, জায়গা নেই, সে জায়গায় গিয়ে সে কী করবে? সুতরাং এখানে একটি crisis থাকে। ঢাকায় এই মুহূর্তে যদি আমরা ধরি, আমি যেহেতু ঢাকার স্থানীয়, সেই হিসেবে আমার ওয়ার্ডের কথাই যদি ধরি, আমার ওয়ার্ডে ১২ হাজার ভোটার। এই ১২ হাজার ভোটারের মধ্যে ৮ হাজার ভোটার এখন নেই। ভাড়াটিয়া, চলে গিয়েছে। বর্তমান ঠিকানা ধরেই তার এনআইডি এবং তার ভোটিং অবস্থা এবং সিটিজেন অবস্থা update করতে পারি কি না। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সেটি না হলে তো তাকে সার্ভিস দিতে পারছি না। সিটি কর্পোরেশন সব সময় বলে যে, আমি তার বর্জ্য সংগ্রহ করতে পারি না। কারণ they are not giving us any revenue. এটি একটি বড় সমস্যা। এটি সার্ভিস প্রোভাইডারদের ক্ষেত্রেও হয়। সে ইউটিলিটি এবং ওয়াসার লাইন পায় না, বিদ্যুতের লাইন পায় না। এখন বিশ্ব ব্যাংকের কিছু প্রজেক্টের কারণে, এক ধরনের মানবিক কারণে human aid-এর মত কিছু হচ্ছে।

কিন্তু যিনি ভাসমান থাকেন, তাকে human aid-এর জায়গা থেকে আমরা দেখব না। তাকে অধিকারের জায়গা থেকে আমরা দেখব। আমি মনে করি যে, এটি আপনারা যদি সাংবিধানিক ইস্যুতে অন্য জায়গায় address করে দেন, ভালো হবে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): অ্যাডভোকেট সালমা আলী কিছু বলতে চেয়েছিলেন। আমাদের সময়ের বিবেচনায় একটু সংক্ষেপ করতে হবে।

অ্যাডভোকেট সালমা আলী (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): আমি হুদা ভাইয়ের কথা থেকে বলছি, আমরা red light area থেকে যে মেয়েগুলোকে উদ্ধার করি বিশেষ করে নেপাল এবং ভারত থেকে যে মেয়েগুলোকে উদ্ধার করি সেগুলোর ৮০% মেয়ে নদী ভাঙন, চর এলাকার। আমাদের আরও কিছু বিষয় আছে যা এখন আর বলব না। লিখিততে দেব।

জনাব মুজিবুল হক মনির (Campaign for Popular Education): পত্রিকায় খবর এসেছিল যে, বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় একটি শুল্ক স্টেশন করা হয়েছে যেখানে ভারত থেকে মালামাল আসবে। কিন্তু ঐ পাশে আগামী ১০০ বছরের মধ্যেও ভারতের কোনো শুল্ক স্টেশন করার চিন্তা ভাবনা নেই। কেন করেছেন? ঐ এলাকার একজন সচিব, পরবর্তীতে ঐ জায়গা থেকে নির্বাচন করবেন। এজন্য

তিনি এলাকার মানুষকে দেখাতে চেয়েছেন যে, আমি কাজ করছি এবং নির্বাচন করব। এই জায়গাটিতে আমি বলতে চাচ্ছি, সরকারি কর্মকর্তাদের পদ থেকে যাওয়ার পর নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য একটি বড় গ্যাপ থাকা দরকার ,যাতে করে সে এই চিন্তা না করতে পারে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। সকালের দিকে ঢাকায় বিভিন্ন রকম যানজট থাকা সত্ত্বেও আপনারা যে আমাদের এই সেশনে যোগ দিলেন, আপনাদের মন্তব্যগুলো আমরা রেকর্ড করেছি। আমরা আশা করছি, আপনাদের প্রাথমিক লিখিত ভার্সন তো আমাদের কাছে থাকছেই, তারপরও ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আপনারা বিস্তারিত দেবেন। সেগুলো আমাদের সহায়ক হবে। কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের এখনকার এই অধিবেশনটি শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

দ্বিতীয় সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১১ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : দুপুর ১২.০০ থেকে ১.৩০ পর্যন্ত

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:

১। অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক, কমিশন প্রধান

২। অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য

৩। ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল সদস্য

৪। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য

৫। ড. শরীফ ভূঁইয়া, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সদস্য

৬। ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল সদস্য

৭। জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক সদস্য

অংশীজন (প্রতিষ্ঠান) এর তালিকা

১। তাসলিমা ইসলাম, প্রধান নির্বাহী (ভারপ্রাপ্ত) বেলা

২। জনাব আসাদুল্লাহ আল গালিব, আইনজীবী, বেলা

৩। গীতা দাস, সভানেত্রী, নারীপক্ষ

৪। কামরুন নাহার, সদস্য, নারীপক্ষ

৫। জনাব বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন

৬। জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

৭। প্রফেসর ড. এ বি এম মাহবুব ইসলাম, এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

৮। জনাব মুহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

৯। জনাব ইজাজুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি

১০। ব্যারিস্টার শাহজাদা আল-আমিন কবির, চেয়ারম্যান, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সাসাইটি

কার্যবাহ প্রস্তুতকারক:

১ মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২ মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সম্পাদনায়

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানের কার্যবাহ

কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। আমার নাম আলী রিয়াজ, আমি এই কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্টের ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। অংশীজনের মতামতের এই সভার শুরুতে সেইসব শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় প্রদান করবেন।

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণসহ উপস্থিত অংশীজন তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির সক্রিয় অংশীদার হিসেবে সংবিধানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আপনারা ১০ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে সকলের মতামত প্রকাশ করার এবং আমাদের শোনার সুযোগ হবে। আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব লিখিত আকারে আজকে আমাদের কাছে দিতে পারেন অথবা আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

এখন আমরা আপনাদের বক্তব্য শুনব। আমাদের রেকর্ডিং এর জন্য অনুরোধ করব আপনারা সংগঠনের নাম এবং নিজের নাম বলে শুরু করলে যারা নোট গ্রহণ করছেন তাদের পক্ষে সহজ হবে। নারী পক্ষ থেকে শুরু করি।

গীতা দাস (নারী পক্ষ): ধন্যবাদ, আমাকে প্রথমে সুযোগ দেয়ার জন্য। সংবিধান বিষয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে একটি আলোচনাও করেছি। সংবিধান একটি বিরাট, বিস্তৃত ব্যাপার। সবগুলো বিষয় নিয়ে নারী পক্ষের দক্ষতা অথবা আগ্রহ নেই। আমরা চাচ্ছি, সংবিধান হবে মূলত ৪-৫টি জিনিসকে কেন্দ্র করে। যেমন বৈষম্যহীনতা ও সমতা এটি যেমন থাকবে তেমনি নারী-পুরুষের সমতা, লিঙ্গভেদে সমতা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমতার বিষয়টিও থাকেব। আমরা এই মতাদর্শে বিশ্বাস করি।

এটিকে যাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমার যদি কিছু গ্যাপ থাকে আমার সহকর্মী বলবেন। আমরা আরেকটি চাচ্ছি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। এখানেও আমরা চাচ্ছি অনেকগুলো বিষয়। সংক্ষেপে বলি, যেমন- বর্তমান সংসদের ৭০ অনুচ্ছেদ, এটি আমরা বাতিল চাচ্ছি।

আমরা এখানে চাচ্ছি, নারীর অংশগ্রহণ। আমরা চাচ্ছি, প্রত্যেক পর্যায়ে এক তৃতীয়াংশ নারী যেন সুযোগ পায়। যেখান থেকে এক-তৃতীয়াংশে নারীরা আসবে, সেখানে সরাসরি নির্বাচনের সুযোগ থাকবে। সংরক্ষিত আসন অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নির্বাচন করবে না। জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে নারী প্রতিনিধিত্ব হবে। এটি আমরা চাচ্ছি।

স্থানীয় সরকার চাচ্ছি, একটি স্থানীয় সরকার কমিশন গঠিত হোক, যাতে স্থানীয় সরকার স্বায়ত্তশাসনটা বেশি পায়।

আমরা চাচ্ছি, ধর্মনিরপেক্ষতা। সংবিধান এমন একটি আইনের বই, যেখানে ধর্ম দিয়ে শুরু হবে না। রাষ্ট্রধর্ম যেটি আছে আমরা এর বাতিল চাই। কারণ এখানেই সমতার প্রশ্নটি আসে। বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে বসবাসরত সকল নাগরিক সমান। সেটা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে।

আমাদের সংবিধানে আছে, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা'। আমরা চাচ্ছি, অন্যান্য ভাষাভাষীরা যারা বাংলাদেশে আছেন, বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী, তাদের ভাষার যেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও মর্যাদা থাকে। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের ভাষা বাংলা হতে পারে। কিন্তু ওই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভাষাটাকে অবজ্ঞা করছি, সেটা যাতে না হয়।

আমরা আরো চাচ্ছি যে, আমাদের মৌলিক যে চাহিদার কথা বলা আছে প্রস্তাবনায়, সেগুলো মৌলিক অধিকারের ঘরে যেন লেখা হয়। কারণ এগুলো চাহিদা না, আমরা মনে করি এগুলি মৌলিক অধিকার। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এই জিনিসগুলো।

আমরা আরও মনে করি, রাষ্ট্রীয় যে পদগুলো আছে, সেই পদগুলোতে যেন কোনো ব্যক্তি ২ বারের বেশি না আসতে পারে। এটি আইনগতভাবেই প্রতিহত করতে হবে। তা না হলে একই ব্যক্তি বার বার আসবে। আমরা দেখেছি এবং আমাদের সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এখানে বসা। ২ বারের বেশি যেন না আসে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে, সরকারের পদগুলোতে। যেমন- এমপি, উপজেলা চেয়ারম্যান হোক, রাষ্ট্রপতি হোক, এসমস্ত পদগুলোতে।

আরেকটি বিষয়, শুধু নারী হিসেবে নয়, সংবিধানের শব্দচয়নে আমাদের কিছু মতামত আছে। শব্দচয়নের মধ্যে বড় আরেকটি ব্যাপার হলো জাতীয়তা। সেখানে 'বাঙালি' বলা আছে। আমরা বলি, 'বাঙালি, না 'বাংলাদেশী'। কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, যদিও এখানে স্মরণ করা হয়নি, মুক্তিযুদ্ধ শুধু বাঙালি করেনি তবে বাঙালিদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর লোকজনেরও অনেক অবদান আছে। কাজেই সংবিধানে যেন ওই জিনিসটি আসে। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-এর চেয়ে যেন 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তা না হলে আরেকটি বিরাট গোষ্ঠী তাদেরকে আমরা অবজ্ঞা করছি। সেটি আনার জন্য আমি অনুরোধ করছি। একইভাবে শব্দচয়নে বারবার 'মহিলা' বা 'নারী' শব্দটি ব্যবহার করছি সংবিধানে। এখন যেন সবাইকে নারী হিসেবেই দেখে। কারণ নারী ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য আছে। আমি সেই তাত্ত্বিক আলোচনায় নাই বা গেলাম। 'উপজাতি' বলা আছে, 'উপসম্প্রদায়' বলা আছে, আমরা চাই না, এই 'উপ' শব্দটি থাকুক। প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ই স্বাধীন এবং তাদের স্বতন্ত্রবোধ আছে। তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আছে। কাজেই উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এগুলো না বলা। বাঙালিও ইংল্যান্ডে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। কাজেই, আমরা ক্ষুদ্র বলে তাদেরকে অধস্তন করে রাখতে চাই না। সমতার ভিত্তিতে, বৈষম্যহীনতার ভিত্তিতে যেন এটি করা হয়। এরকম আরো শব্দ আছে। শালীনতাবোধ এ শব্দগুলো। সংবিধানে একদম পরিষ্কারভাবে বলা আছে, 'জুয়া' এবং 'গণিকাবৃত্তি'কে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা। এই 'গণিকা' শব্দটি নিয়ে আমাদের আপত্তি। আর কোনো পেশাকে এইভাবে সংবিধানের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা ঠিক না। 'জুয়া' হতে পারে- জুয়া নিয়ে criminal law আছে। সেখানটায় যাবে, সংবিধানে না। এরকম আমাদের অনেক কথা আছে, বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, সময় দিলে বলবো তা না হলে এখানেই শেষ করব। কামরুন যদি একটু যোগ করেন।

ধন্যবাদ।

বেগম কামরুন নাহার(নারীপক্ষ): ধন্যবাদ। আমি ২ মিনিটে শেষ করব। আপনি রাষ্ট্রভাষার কথা বলেছেন কি না খেয়াল করিনি। আমাদের প্রজাতন্ত্রের ভাষা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে, এটি অবশ্য ঠিক। কিন্তু অন্যান্য ভাষাভাষী নাগরিকদের ভাষার যে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং মর্যাদা এটি রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করার সুযোগ রাখতে হবে। নাগরিকের সংজ্ঞাটাকে আমরা মনে করি একটু বিস্তৃত করা। সেখানে আরেকটা মতামত হলো, সুষ্ঠু নির্বাচন এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের তাগিদে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা যেটি ছিল, রহিত করা হয়েছে, সেটিকে আবার ফিরিয়ে আনার একটি সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার বলে আমরা মনে করি।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আপনারা এর একটি লিখিত ভাষ্য কি দিচ্ছেন?

আপনারা ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে দিতে পারেন। আজকে যদি হাতে থাকে সেটি প্রাথমিক খসড়া হিসেবে দিতে পারেন, অন্যথায় আগামী ২০ তারিখের মধ্যে। আপনাদের কাছে যে ইমেইল আছে, সেখানেও পাঠাতে পারেন, আমাদের কার্যালয়েও পাঠাতে পারেন।

আমরা এখন বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি, বেলার প্রতিনিধির কথা শুনবো।

তাসলিমা ইসলাম (প্রধান নির্বাহী (ভারপ্রাপ্ত),পরিবেশ আইনজীবী সমিতি, বেলা) : ধন্যবাদ। অনেকগুলো ইস্যুজ, সবগুলো হয়ত আমরা আলোচনায় আনবো না। যেহেতু আমরা অধিকার নিয়ে কাজ করি, বিশেষত পরিবেশ অধিকার নিয়ে কাজ করি, ন্যায়বিচার নিয়ে কাজ করি, সেজন্য সেই রিলেটেড কিছু কথা এখানে বলতে চাই, যেহেতু সুযোগ পেয়েছি। অন্যান্য বিষয়ে পরে আসবো। জাস্ট আমার কনসার্নগুলো আগে বলে নেই। আমরা আসলে যে সংবিধানটা পেয়েছি, ১৯৭০ ও ১৯৭১-এর প্রেক্ষাপটের কারণে, বিশেষজ্ঞ আছেন আরো ভালো জানেন, আমার বিচার-বিশ্লেষণে মনে হয় যে, specific একটা contest-এ political rightsগুলোকে খুব বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন যেহেতু সুযোগ এসেছে, economic and social rights, যেগুলো আছে, better enforcement-এর জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলোকে part-3-তে নিতে পারি কি না? একইরকম গুরুত্ব দিয়ে civil and political rightগুলোর সাথে একই রকম গুরুত্ব দিয়ে।

দ্বিতীয়ত হচ্ছে, কোনো কথা বলার বা বিতর্কের সুযোগ নাই যে, Bangladesh is very vulnerable to climate impact, তাই আমাদের বেলার অনেক বছরের advocacy-এর একটা ফসল হিসেবে আমরা সংবিধানের ১৮(এ) যোগ করতে পেরেছিলাম। এটি অনেক আগের কথা, তখন climate-কে ওভাবে চিহ্নিত করিনি। এখন climate-এর বিষয়টাতে address করার যে পলিসি এবং governance machinism, সেগুলো সংবিধানের ১৮(এ) সংশোধন করে অথবা আরেকটি clause যোগ করে climate change-এর বিষয়টাকে আনা যায় কিনা? I repeat and emphasize এগুলোকে আমরা মৌলিক অধিকারের অধীনে নিয়ে আসতে পারি কিনা?

আরেকটা জিনিস যেটা আমরা সবসময় বলি যে, Right to life- অনুচ্ছেদ ৩২। বেলারই একটা মামলার মাধ্যমে কোর্ট আমাদেরকে একটা very good interpretation দিয়েছে যে, right to life belong also include right to healthy environment. আমরা অনেক বছর শুধু এটিই বলি, কোর্ট interpretation দিয়েছে। আমরা যেহেতু সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি, আমরা কি আসলেই right to life-কে সুনির্দিষ্ট করে দিতে পারি কি না যে, right to have a healthy environment. আলাদা ক্লোজ করে যে, This is also right to life. যেহেতু কোর্টেরও একটি রায় আছে।

আরেকটি হচ্ছে, right to public participation and access to information. বেশি দিন আগের কথা নয়, আমরা সবাই জানি যে আমাদের information-এর access-এর কারণে কত ভোগান্তি হয়েছে? কাজেই এই অধিকারটিকেও যদি সমান গুরুত্ব দিয়ে সংবিধানে নিয়ে আসতে পারি, আমাদের মত সংস্থাগুলোর জন্য কাজ করা এবং সাধারণ মানুষের জন্য খুব উপকার হবে। খুব ছোট্ট করে বলতে চাচ্ছিলাম, যে I am sure যে, কমিশন এগুলো খেয়াল করছেন। যে কোনো reform, particularly যখন সংবিধানে reform হয়। It has to be done in a careful inclusive and transparent process involving a broad cross section of society.

এখানে সিভিল সোসাইটির জন্য আজকে যে স্লট, আমি কিন্তু হতাশ হয়েছি মাত্র ৩-৪টি অর্গানাইজেশনকে দেখে। আমি নিশ্চিত যে, আপনারা আরো অনেক বেশি সংখ্যক লোকদের সাথে কথা বলছেন। আমার মনে হয়েছিল যে, এই স্লটটি সিভিল সোসাইটির জন্য। বাংলাদেশে তো অনেক সিভিল সোসাইটি আছে। শুধু নারীপক্ষ, বেলা, হিউম্যান রাইটস সোসাইটি, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টারই নয়। আমি হতাশ হয়েছি। এটি শুধু আপনাদের সাথে বলার জন্য।

আরেকটা বিষয় আমরা চাই, যে কোনো ধরনের চেঞ্জ, যাই আসুক না কেন, সংবিধানের যে core principles যেমন- democracy, equality, justice, nondiscrimination এগুলোতে যাতে কোনো আঘাত না আসে। systemic ইস্যুজগুলো লক্ষ্য করে যেন সংবিধান সংস্কার কমিশন আগায়। ক্ষুদ্রক্ষুদ্র, খন্ডখন্ড, কারও কোনো স্বার্থ হাসিলের জন্য short term কোনো reform যাতে না হয়। একদম systemic issue, structural issueগুলো, particularly নির্বাচন কমিশনের structural যে ইস্যুগুলো, সেগুলো যাতে আপনাদের বিবেচনায় থাকে। সর্বশেষ আমি বলব যে, বিভিন্ন সংস্কার কমিশন হয়েছে, সবাই সমন্বয়ের মাধ্যমে করার জন্য। কারণ সংবিধানের অনেক বিষয় আছে যেগুলোর বিষয়ে আমার অনেক সহকর্মী আছে সে হয়তো ৭(বি) বা বিচার বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগ reform-এর কথা বলবে। অনেকগুলো সংস্কার কমিশন হয়েছে। ফলে কমিশনগুলোর মধ্যে যেন সমন্বয় থাকে সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সংবিধান সংস্কার কমিশন সংবিধান সংস্কারের জন্য একরকম চিন্তা করছেন। হয়তো দেখা যাচ্ছে যে, সংবিধান সংস্কার কমিশন বিচার বিভাগের জন্য যে কথাগুলো বলছি, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সেগুলো বিবেচনায় নিচ্ছে না। তাই কমিশনগুলোর মধ্যে coordination খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জনাব আসাদুল্লাহ আল গালিব (আইনজীবী, বেলা): আমি প্রথমে সুনির্দিষ্ট একটি অনুচ্ছেদ নিয়ে কথা বলতে চাই। অনুচ্ছেদ ৭(বি) amendable clause নিয়ে। আমাদের সংবিধান তো শুরুই হয়েছে we দিয়ে। অর্থ্যাৎ জনগণের জন্য এই সংবিধান। কিন্তু অনুচ্ছেদ ৭(বি) এর মাধ্যমে প্রায় ৫০টির বেশি অনুচ্ছেদ সংশোধনের অযোগ্য করা হয়েছে। এটি যদি থাকে, সেক্ষেত্রে জনগণের সময়ের চাহিদার সাথে সাথে, সাংবিধানিক যে চাহিদাগুলো বৃদ্ধি পায়, সেগুলো আমরা enforce করতে পারবো না। কুদরত-ই-এলাহী খানের মামলাতে ছিল যে, অর্থনৈতিক সক্ষমতার পরেই সংবিধানের দ্বিতীয় অংশে যে কথাগুলো বলা আছে, সেগুলো ধীরে ধীরে part-3 তে যাবে। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট দিয়ে আমরা impose করতে পারব। কিন্তু এখন সবচেয়ে বড় বাঁধা হচ্ছে অনুচ্ছেদ ৭ (বি)। আমরা যদি চাই যে, শিক্ষা, চিকিৎসাকে part-3 তে আনব, বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী পারছিনা। ফলে অনুচ্ছেদ ৭ (বি) অবশ্যই সংশোধন বা বাতিল করার প্রয়োজন আছে। সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাকেও এই অনুচ্ছেদ দ্বারা অনেক সীমিত করা হয়েছে। সংবিধান ব্যাখ্যা করার দায়িত্বই হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের অথচ সংসদ এটিকে rigid করে দিয়েছে। অর্থাৎ সংবিধানের ক্ষমতা এখানে অনেক বেশি সংকোচিত হয়ে গেছে।

আমাদের স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র ছিল, সেখানে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচারের উপর ভিত্তি করেই আমরা এই সংবিধান রচনা করেছি। কিন্তু আমরা দেখলাম যে, বর্তমান সংবিধানে সরকার প্রধানদেরকে বা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এত বেশি ক্ষমতা প্রদান করেছে যে তারা নিজেরাই স্বৈরশাসক হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং কীভাবে তাদের ক্ষমতাগুলোকে ভারসাম্য করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। আর আমরা দেখেছি যে, ইতোমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট একটি আলাদা কমিশন গঠন করেছে- সুপ্রিম কোর্টের ব্যাপারে। আপা যা বললেন, তাহলে সবগুলো কমিশনের সাথে সমন্বয় করলে দেখা যাবে যে, জুডিশিয়ারি যে অংশ আছে সেখানে সংবিধানের সাথে একসাথে কাজ করতে পারব।

এছাড়া আমরা যেটি দেখেছি যে, গত সরকারের সময়ে সবথেকে বেশি কথা হয়েছে একজন ব্যক্তির হাতে সকল ক্ষমতার বিষয়টি নিয়ে। এটি যেহেতু এই সংবিধানই প্রদান করেছিল, যে কোনোভাবেই হোক আমরা চাইব যে, এমন একটা সংবিধান রচনা করা হোক

যেখানে একক ব্যক্তির হাতে কোনো ক্ষমতা থাকবে না। We love the people. অর্থাৎ জনগণের যে সর্বোচ্চ চাহিদা, জনগণের যে অভিপ্রায়, সে অনুযায়ী যেন সংবিধান কাজ করতে পারে।

ধন্যবাদ সবাইকে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): তাসলিমা ইসলাম, আপনি যে প্রশ্নটি তুলেছেন সংখ্যার দিক থেকে, আসলে আমরা ২০টির বেশি সোসাইটি/অর্গানাইজেশনের সাথে কাজ করছি। আজকে সকালে একটি সেশন ছিল, তাতে ৬টি সংগঠন অংশগ্রহণ করেছে। আমরা ছোট ছোট সেশন করেছি, কম সংখ্যক লোকজনকে নিয়ে, যাতে করে আপনাদের কথাগুলো আপনারাও বলতে পারেন, আমরাও শুনতে পারি, রেকর্ড করতে পারি। এটাই একমাত্র সিভিল সোসাইটির সাথে আমাদের interaction নয়। আজকে বিকালেও আরেকটি সেশন আছে, আমরা ছোট ছোট সেশন করেছি এবং সংখ্যার দিক থেকে যাতে সকলের কথাগুলো শোনা যায়, রেকর্ড করা যায় এবং আপনাদের কাছে আমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আপনারা যদি ব্যাখ্যা করতে চান, সে সুযোগ থাকে। অনেককে ডেকে বড় করার চেয়ে আমরা শোনার দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি।

তাসলিমা ইসলাম: সাধারণ মানুষের কাছে পৌছেছেন? ওয়েবসাইটে তো সাধারণ মানুষের access নাও থাকতে পারে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমরা অন্যান্য পথগুলোও উন্মুক্ত রেখেছি। শুধুমাত্র সিভিল সোসাইটিই নয়, আমরা অন্যান্য *professional organisations*-এর সাথেও বৈঠক করব। আমরা সিভিল সোসাইটির প্রধানদের সাথে, eminent personalities-দের সাথে, young thinker-দের সাথে এবং cultural actors-দের সাথে বৈঠক করছি। আমরা ছোট ছোট গ্রুপ করে অনেকের সাথেই বৈঠক করছি। তার বাইরে যেটি, আপনি গুরুত্বের সাথে বলেছেন, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মানুষের কাছে ওয়েবসাইট যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে আমার মনে কোনো সংশয় নেই। আমরা এর বাইরেও যেভাবে আরো বেশি লোকজনের কাছে পৌঁছানো যায়, তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করছি। আমরা খুব আশাবাদী যে, আমরা একটা বড় সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছাব। যাদের ওয়েবসাইট access নেই, সাধারণ নাগরিক, ঢাকার বাইরে গ্রামীন জায়গাতে, তাদের কাছে আমাদের পৌঁছানোর চেষ্টা আছে। সে প্রক্রিয়াটির মধ্যে আছি। আমরা আশা করছি, কিছু করতে পারব। একটা বড় রকমের চ্যালেঞ্জ তো আমাদের আছে, সেটি হচ্ছে সময়ের স্বল্পতা। যে কারণে আমি গোড়াতেই বলেছি, আপনারা যে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ করেছি, আপনারাও উপস্থিত হয়েছেন, আপনারা বক্তব্য রাখছেন, সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব। যেহেতু স্বল্প সময়, সেহেতু আমরা বলছি যে, সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর একটু সময় নিয়ে আগামী কয়েক দিন, ২০ তারিখের মধ্যে যদি বিস্তারিত দেন, আমাদের সহযোগিতা হবে। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা হচ্ছে, আপনাদের সকলের কাছে পৌঁছানো, সকলের বক্তব্য শোনা।

ধন্যবাদ।

তাসলিমা ইসলাম: ধন্যবাদ।

সুযোগ তো আসলে বারবার আসবে না। সুযোগ পেয়েছি সংস্কারের, যা কিছু আছে সবকিছু আপনাদের কাছে দাবি নিয়ে চলে এসেছি।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): এটি অনেক প্রাণের বিনিময়ে, অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জন তো। আমাদের প্রত্যেকেরই এর প্রতি এক ধরনের আবেগ জড়িত,এক ধরনের commitment জড়িত। আমরা বুঝতে পারি যে, আপনাদের আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই আসলে। আমরা এখন শুনবো বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টারের প্রতিনিধিদের বক্তব্য।

জনাব বেলায়েত হোসেন (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার) : ধন্যবাদ, প্রফেসর আলী রীয়াজ, আমাদের ডাকার জন্য। আমরা লিখিত একটা নিয়ে এসেছি, দিয়ে যাব তবে এটি একটু সংশোধন করে যেহেতু সময় পেয়েছি। আবার পোস্ট করব। সময় কম, লিখিত দিয়ে দিয়েছি এবং আরও দেব। কয়েকটি ইস্যু আজকে শুধু highlight করি। একটি বিতর্ক হচ্ছে, এটি rewrite হবে নাকি amendment হবে। আসলে তো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য লাগবে, অংশীজন যারা আছে। আমরা মনে করি, এটি rewrite করতে হবে। কারণ এখানে preamble-এ যদি ৭১, তারপর জুলাই-আগস্টের revolution বা uprising এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই তাহলে। preamble is one of the basic structure, আমাদের জুডিশিয়াল pronouncement-এ। Preamble-এ এগুলো incorporate করার জন্য rewrite করতে হবে। আরও অনেক fundamental amendments এখানে আসবে। আরেকটি কথা হলো, fifteen amendment. Fifteen amendment, itself is a miny constitution. Fifteen amendments এ ১২টির অধিক অনুচ্ছেদকে touch করা হয়েছে। সেদিক থেকে Constitution must be rewritten.

আমাদের মৌলিক কতগুলো ইস্যু আছে, যেমন State religion etc. এগুলোতে কতগুলো sensitivity আছে, এই বিষয়টাও আমাদের লিখিত বক্তব্যে আমরা দিয়েছি। আর 'বাংলাদেশী', 'বাঙালি' এ বিষয়টি নিষ্পত্তিযোগ্য। সবাইকে বাংলাদেশী বললে, এটির সমাধান হয়ে যায়। Constitutionally আমরা বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত হতে পারি। অনুচ্ছেদ ৭(এ), ৭(বি) এগুলো অবশ্যই পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে। এগুলো বাদ করতে হবে। এগুলো consistency এবং কতগুলো fake এখানে আছে। এভাবে কোনো সংবিধানেই বলা হয় না, a list of basic structures. এটা দুনিয়ার কোথাও নাই। Bad idea, it must go.

এরপরে আমরা বলেছি যে, secularism and socialism-কে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি করা হয়েছে। যেখানে proclamation of independence-এ equality, human dignity, social justice, democracy, human rights এগুলোরই কিন্তু consonance ওখানে রয়েছে। এ বিষয়গুলো আমরা ডিল করেছি। এরপরে Article 56 (4) should be deleted. Because as it is self-contradictory.

Article 57 must have a subclause that will not allow any person to be a Prime Minister more than two terms in a row. Article 57 must have a subclause that will not allow any Prime Minister to be the head of any political party in his or her tenure.

Article 58 nonparty caretaker government.এটি অবশ্যই adopt করতে হবে পুনরায়। এটি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে পেন্ডিং আছে। সেখানে যাই হোক। এখন যেহেতু সুযোগ এসেছে General will of the people of the republic আপনারা দেখছেন। Should be reflected in our electoral system. আমাদের যে পলিটিক্যাল কালচার, বাংলাদেশের রাজনীতি, এই Political culture-এ absence of rule of law and democracy. constitutionalism বার বার এটি assaulted হয়েছে। এখানে পলিটিক্যাল কালচার সংশোধন না হলে constitution পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হবে না। পলিটিক্যাল কালচারটি করতে হলে, electoral system fare, free and credible হতে হবে। এজন্য আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন পদ্ধতিটা বাংলাদেশে আরো ৪-৫ টার্ম থাকার পক্ষে মতামত দিচ্ছি। সংবিধানে সেটি adopt করতে হবে।

আর Article 59 mast have a subclause to make sure that the members of parliament elected to the parliamentary seat cannot interfere in the local government system.

এরপর আর একটি বেসিক ইস্যু আমাদের সংসদ হবে bicameral. অর্থাৎ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। আর নারী কোটা যেটি আছে, ১৯৭২ সালে সংবিধানে ১৫টি সিট পরবর্তী ১০ বছরের জন্য ছিল। এখন তো আমাদের women empowerment হয়েছে। নারীরা engage হয়েছে with the society, with polity, with establishment. সুতরাং Reserve না করে rather upper chamber এ সংরক্ষণ করা যায়. আমাদের নারীরা সরাসরি নির্বাচিত হবেন। আর In the upper chamber 20 seat may be reserve for women to accommodate women entrepreneur, women right expert, women representative from RMG, labour market, ethnic minority group etc.

Article 70 Floor crossing. আমরা মনে করি না হুট করে এটি বাদ করে দিলে ভালো হবে। এটি আবার Parliamentary democracy-তে that would cost terrible problem. আমরা যেটি বলেছি, রাজনৈতিক দলগুলো রিফর্ম হলে পলিটিক্যাল কালচার যদি আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে এবং এখানে যদি গণতন্ত্র সুসংহত হয়, in that case পরবর্তীতে floor crossing এ সংশোধনী আনা যেতে পারে। এখনই উঠিয়ে দিলে এখানে কেনাবেচা হয়, এই কালচারটা আছে, সেটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

আর Article 76 parliamentary standing committees should be headed by the opposition parties.

আর Ombudsman যেটি Article 77 এ, 72 constitution এ ছিল এবং ১৯৮০ সালে আইনও হয়েছে। কিন্তু it is not functioning. আর Ombudsman এখনো appointment-ই হয়নি। এ ব্যাপারে Article 77 amendment করে যাতে দ্রুত নিয়োগ হয়, সে বিষয়টি এখানে আনা যেতে পারে।

Anti-corruption Commission should be made a constitutional body.

Recently in last 10 or 15 years, আমরা দেখেছি যে, অনেকগুলো International treaty ও contract হয়েছে। কিন্তু Parliament was not aware of those arrangement. So draft of international treaties to be placed before the relevant standing committees than to the Parliament on execution and should also be place before the ombudsman. এই হলো আমাদের প্রধান ইস্যুজ। বাকিটা আমরা লিখিততে দিয়ে দিব।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। একটু clarification-এর জন্য। আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহালের কথা বলছিলেন এবং সে ক্ষেত্রে ৪-৫ বারের কথা বলেছেন। আপনারা কি sunset provision এর কথা বলছেন?

জনাব বেলায়েত হোসেন (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): আমরা সংবিধানে টার্মটা উল্লেখ করতে চাই না। একটি স্থায়ী প্রভিশন থাকতে পারে, ১৩তম সংশোধনীর মতো।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): তাহলে আপনারা বলছেন, নির্বাচনকালীন সময়ে এক ধরনের অন্তবর্তী বা কেয়ারটেকার গভর্মেন্ট স্থায়ীভাবে সংবিধানে থাকবে।

জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম(নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): আমাদের দেশের যে সার্বিক অবস্থা তাতে দেখতেই পাচ্ছি, বারবার এ নিয়ে পেরেশানি হতে হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): না মানে শোনার সময় হয়তো মনে হল যে ৪-৫ বারের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এজন্যই স্পষ্টীকরণের জন্য জিজ্ঞাসা করা।

জনাব বেলায়েত হোসেন (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল এন্ড রিসার্চ লিগ্যাল এইড সেন্টার):

বলেছিলাম যে, এটি যদি constitution এ provision থাকে তাহলে ৪-৫ টার্মস এর পরে than people will decide. আমাদের নির্বাচন পদ্ধতি, গণতান্ত্রিক অবস্থা, তারপর পলিটিক্যাল কালচার যদি উন্নত হয়। it should be there as before ১৩তম সংশোধনীর মতোই।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আরো দুটো প্রশ্ন আছে আমার জাস্ট জানার জন্য। এক নাম্বার হচ্ছে যে, আপনাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে অনুচ্ছেদ ৭০ এই মুহুর্তে তুলে না দিয়ে যেভাবে আছে সেভাবে রাখার জন্য এবং ভবিষ্যতে কি হবে সেটি ভবিষ্যতের বিষয়। এই মুহূর্তে যেকোনো ধরনের সংস্কারের মধ্যে অনুচ্ছেদ ৭০ as it is রাখার পক্ষেই বলছেন আপনারা। আপনি সংরক্ষিত আসনের বিষয়ে যেটি বলছিলেন, সেক্ষেত্রে লোয়ার চেম্বারে কী সরাসরি নির্বাচনের কথা বলেছেন? সরাসরি নির্বাচন কি নারীদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে যে, ৩০ বা ৫০টি আসন।

জনাব বেলায়েত হোসেন (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): লোয়ার চেম্বারে সরাসরি নির্বাচন আর আপার চেম্বারে ২০ আসন অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। লোয়ার চেম্বারে রিজার্ভ থাকবে না। তাদের স্বাধীনতা থাকবে to choose any constituency like male politicians.

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (কমিশন সদস্য): অনুচ্ছেদ ৭০ সম্পর্কে কেনাবেচার কথা বলেছেন, একটু যদি খুলে বলতেন, what do you mean by this?

জনাব বেলায়েত হোসেন (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): এখন তো ফ্লোর ক্রোসিং করলে তারা তাদের সদস্য পদ হারান। অথবা দল থেকে চলে গেলে, অথবা দলের কোনো প্রস্তাবের বিপক্ষে গেলে তাদের সদস্যপদ থাকে না। এটি একটি check and balance. সংসদীয় গণতন্ত্রে কেন দেওয়া হয়েছিল বা আমাদের intention of the legislature is to make sure that the MPs are not sold. আমাদের যে পলিটিক্যাল কালচার, এটি থাকলেই বরং একটা ভয় থাকে। আমি পার্টিতেই থাকতে পারব না।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক(কমিশন সদস্য): Can you address your concern by modifzing Article 70 rather than written in Article 70 in current form.

জনাব বেলায়েত হোসেন (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): প্রথমটা রাখা যেতে পারে যে, if he resign from his party.

জনাব মুহাম্মদ ইকরামুল হক(কমিশন সদস্য): ধরেন যে, ট্রাফিক ল'। ট্রাফিক ল'-তে যদি একজন এমপি, he wants to vote against the party position should he or she not be allow to take that position, নাকি সেটি হলেও তার আসন কূন্য হয়ে যাবে?

জনাব বেলায়েত হোসেন (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): I think that may be addressed. Should be a freedom to express his or her opinion.

ড. শরিফ ভূইয়া (কমিশন সদস্য): আপনার concern হলো সরকারে স্থিতিশীলতার বিষয়, তাই না। কাজেই যে ধরনের ভোট সরকারকে অস্থিতিশীল করতে পারে সেটি ছাড়া অন্য ভোটের ব্যাপারে তো নিশ্চয় আপনার আপত্তি থাকবে না।

জনাব বেলায়েত হোসেন (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): At the moment. কালচারতো উন্নয়ন হয়নি, এখন এটিই আছে একটি পথ। যখন পলিটিক্যাল কালচার উন্নয়ন হবে, নিয়মিত সুষ্ঠু নির্বাচন হবে, সংসদ বসবে, quality candidate will be coming তখন এগুলো reform হবে, in course of time.

ড. শরিফ ভূইয়া (কমিশন সদস্য): আমার আরেকটি প্রশ্ন ছিল, আপনি যে ২০টি আসন আপার হাউজে সংরক্ষণ করার জন্য বলেছেন, এটির ভিত্তি কী? ২০টি আসন নাকি ২০%। I am just trying to get an idea of percentage. So that in 100 seat upper house 20 seat would be 20% , but in a 200 seat it would be 10%. So if you can address that. আপনারা যা চিন্তা করেছেন এ বিষয়ে।

জনাব বেলায়েত হোসেন (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): In the upper house 20 seat from women entrepreneur, women right expert, লোয়ার হাউজে আমরা সুনির্দিষ্ট নাম্বারটা প্রস্তাব করিনি। এ বিষয়টি আমরা লিখিত বক্তব্যে স্পষ্ট করে দেব।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): জনাব এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম আপনি কিছু বলতে চেয়েছিলেন।

এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম (বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): Thank you, Assalamu Alaikum wa Rahmatullah. I am professor Dr. A B M Mahbubul Islam, representing the Law Research Center as adviser. Basically, I am a academician. My Ph.D. also in constitutional law. I was an Academician in International Islamic University, Malaysia. Presently I am in the Uttara University working as a Joint Faculty. Thank you very much for inviting me to the committee. My discussion is not to be organized because I have already worked here Alhamdulillah. I have revised the entire constituent. I will send it to you and revise each and all article almost and sometime it is Chapter by Chapter and also came up with proposal reformation act. This a one thing. Second think is that it is already published in the daily newspaper. So I will submit that things to you also. I will try to summarize it.

Fast af all I discussed about the basic idea of the constitution. The needs of the constitution. No need to discuss here. আমাদের বর্তমান যে constitution, it is consisting 1053 articles as you know. So far এখানে ১৭টি সংশোধনী হয়েছে, তাও আমরা জানি।

বলা হচ্ছে যে, আমাদের যে বর্তমান বাংলাদেশ এর সীমানা হচ্ছে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান। আমার প্রস্তাব হচ্ছে, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান বললে এটি সঠিক হবে না। ১৯৭৪ এ ভারতের সাথে যে enclave exchange হয়েছে এর পরে আমাদের সীমানা পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং নতুন করে আমাদের সংবিধান পুনর্লিখন হোক অথবা সংশোধন করা হোক সেখানে ১৯৭৪ থেকে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। otherwise it will be lying to the nation.

এরপরে প্রস্তাবনায় “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম” বলা হয়েছে, ভাল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম” যদি রাখতেই হয় তাহলে এর তো একটি significant থাকতে হবে। আমি বিসমিল্লাহ পড়ে তো কোনো খারাপ কাজ করতে পারি না। আমাকে ভালো কাজ করতে হবে। সুতরাং somewhere it should be written, remain ‘Bismillah’ than each and every action of republic should be permissible which we can start with the ‘Bismillah’. It is not ok. So বর্তমান সংবিধানে বিসমিল্লাহ-এর ২টো অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় যে অনুবাদটি এটির বিষয়ে আমার আপত্তি। এটিকে আমি সংশোধনের প্রস্তাব করছি। প্রথম অনুবাদ ঠিক আছে। তারপরে প্রস্তাবনায় আরো বলা হয়েছে যে, আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা ’৭১ সালে তারা যে inspired হয়েছে, সেখানে আমাদের আলোচনা হয়েছে, ১৯৭১-এর ১৭ এপ্রিল, প্রবাসী সরকার আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হোক অথবা মুক্তিযুদ্ধের মূলনীতি হোক, সেখানে তারা বলেছেন equality, human dignity and social justice. অথচ জাতিকে না জানিয়ে secularism, socialism, nationalism এগুলো হঠাৎ করে সংবিধানে যোগ করা হয়েছে। যেটি totally contradict to the declaration of Independence-এর যে বিষয়গুলে ছিল সে দিক থেকে। এর পর রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এটিও সংশোধনযোগ্য। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বেসিক একটি পরিবর্তন এসেছে। আমি মনে করি যে, এই পরিবর্তনটি ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিলের যে ঘোষণা এর কাছাকাছি। সুতরাং my proposal is that we should go back to the fifth amendment. পঞ্চম সংশোধনীতে অনেকগুলো ভালো কথা আছে যেগুলোকে পরবর্তীতে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পূর্ণ remove করা হয়েছে। সেখানে ‘বিসমিল্লাহ’ সংযোগ করা হয়েছে। Absolute trust and faith in almighty Allah shall be the basis of all actions. I strongly propose, we are independent here in 1947. we are independent because our believe. যদিও আমরা ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয়েছি। এখানের ৯০% লোকের বিশ্বাসকে যদি আপনি বাদ দেন তাহলে

this country has no independence existents. সুতরাং এটিকে ধরে রেখেই আমাদের অস্তিত্বকে বিচার করতে হবে। যেহেতু পুরো সংবিধানই I revised. আমি বেশি যেতে পারছি না। অনুচ্ছেদ ৭ এর ব্যাপারে বলা হয়েছে, It should not be amended এবং এটিকে offence করা হয়েছে। এমনভাবে বলা হয়েছে যে, secularism, socialism এর বিরুদ্ধে কথা বললেই আপনি রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে যাবেন। সুতরাং this article 7 should be thoroughly revised. article 12 ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতির কথা বলা হয়েছে। নিরপেক্ষতা বলতে, I could say it is meaningless. Nobody can be নিরপেক্ষ, independent is on of religion সুতরাং আমাদের কথা হবে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর নিজ নিজ ধর্ম পালনে স্বাধীন। এটিই থাকতে হবে। নিরপেক্ষতা বলতে কোনো কথা নেই। সেক্যুলারিজমের বাংলা কোন জীবনেও ধর্মনিরপেক্ষতা নয় এবং এটি হতে পারে না। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু আমার সময় কম, আমি পরবর্তী বিষয় মৌলিক অধিকারের বিষয়ে যাচ্ছি। এখানে আর্টিক্যাল ২৬ থেকে ৪৭ এ আলোচনা করা হয়েছে। লং ডিসকাশন। রেটসোসফেকটিভ ইফেক্ট দিয়ে আমাদেও দেশে যে ট্রাইব্যুনালে বিচার করা হয়েছে। ৪২ বছর পর আমাদের এখানে নতুন করে নিরাপরাধ মানুষকে অপরাধী হিসেবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। because of this article 35. এই অনুচ্ছেদ ৩৫ এর মাধ্যমে অনেকগুলো মৌলিক অধিকারকে অকার্যকর করা হয়েছে। সুতরাং it should be thoroughly revised. I propose it strongly. অনেক লেখা আছে, ইনশাআল্লাহ we will send it to you. অনুচ্ছেদ ৩৬ এ আমাদের চলাফেরার স্বাধীনতা কথা বলা হয়েছে। we have the movement each and every places. on the other hand পার্বত্য চট্টগ্রাম যে চুক্তি করা হয়েছে সেই চুক্তির বলে আমরা হলাম বাংলাদেশী আর ওরা হলো পার্বত্যবাসী। এক দেশের নাগরিক দুই ভাগ। সেখানে যাওয়ার আমাদের অধিকার নেই, বসতি স্থাপনের অধিকার নেই। যে চুক্তিটা করা হয়েছে, সেই চুক্তিকে I have written also during those day. I said that is unconstitutional. Fortunately our present high-court also declared it is unconstitutional. সুতরাং এ বিষয়টিকে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে।

এরপর আমাদের নির্বাহী বিভাগের কথা বলা হয়েছে। নির্বাহী বিভাগে আর্টিক্যাল ৪৮ থেকে ৬৪ পর্যন্ত ১৬টি অধ্যায় আমরা সামারাইজ করার চেষ্টা করছি। প্রস্তাবও সেখানে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের অন্য এক ভাই এটিকে বলেছেন যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ৫ বছর করে ২ বারের বেশি না হওয়া।

এটি খুব জরুরি হয়ে পড়েছে আমাদের জন্য। এটিকে আমি আবার পুনরায় এড্রেস করেছি। এর পর স্থানীয় সরকারের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, প্রতিরক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ডিফেন্সের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটর্নি জেনারেলের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি এটর্নি জেনারেলের ব্যাপারে বলতে চাই, এটর্নি জেনারেলকে সরাসরি সরকারি কর্মকর্তা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে একটু চিন্তা করা দরকার যে সরকারি কর্মকর্তা It is his duty bound to act for the government, either right or wrong. এখানেও I feel there should be some clause or some ideas.

অধ্যাপক আলী রিয়াজ (কমিশন প্রধান): সম্মানিত অতিথি, আপনি যদি একটু সংক্ষিপ্ত করেন তাহলে অন্যান্য সংগঠন বক্তব্য রাখার সুযোগ পবে। কারণ সময়ের স্বল্পতা রয়েছে।

এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম (বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): আমি সংক্ষেপ করছি।

বিচারকদের নিয়োগের বিষয়ে যেটি আলোচনা হয়েছে, বিচারকদের নিয়োগ পদোন্নতি- এটিও সংশোধন হওয়া জরুরি বলে আমি মনে করি।

নির্বাচনের ব্যাপারে আমার প্রস্তাব আছে, প্রত্যেক বছর নির্বাচন কমিশন করতে গিয়ে আমাদের একটি সমস্যায় পড়তে হয়। সুতরাং এখানে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনার কোথা হতে আসবে সে বিষয়ে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১১৮ থেকে ১২৬। কোথা হতে কয়জন কমিশনার নেওয়া হবে। আমার প্রস্তাব হচ্ছে, এটি ৫ থেকে বাড়িয়ে ৭ জন করার বিষয়ে। যেহেতু সময় আমার কম আমি সবগুলো বিষয়ে মতামত দিতে চেষ্টা করেছি।

সংবিধান সংশোধনের বিষয়, জরুরি অবস্থায় বিষয় আলোচনা করেছি। জরুরি অবস্থার বিষয়টি এমন যেন না হয় নিজের জনগণকে শাস্তি করার একটি ব্যবস্থা। এখানে strongly কিছু কথাবার্তা থাকা দরকার।

মোট কথা হচ্ছে যে, আমি বলব আমাদের এই সংবিধান eighter rewrite or reform, it should be gone to uor believe. আমাদের বিশ্বাসের সাথে, আমাদের জনসংখ্যার সাথে। আমি এটিও বলতে চাই, আমাদের এখন ৯২% মুসলিম বলা হয়ে থাকে। এই মুসলিম জনবিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা যদি সংবিধান প্রণয়ন করতে পারি তাহলে শুধু এটি মুসলিমদেরকে রক্ষা করবে না, এই মুসলিম ল', ইসলামিক ল' এটি সমস্ত মানব জাতিকে, সমস্ত জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। So we follow

islamic law stricly. সুতরাং আমি মনে করব, ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে যে পরিবর্তন এসেছে, এর অতিরিক্ত হিসেবে এটিকে আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে নিয়ে যেতে পারি, এ ব্যাপারে কাজ করার জন্য আমি বিনয়ের সাথে সংবিধান সংস্কার কমিশনকে অনুরোধ করব।

ধন্যবাদ, আস্‌সালামু আলাইকুম।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির প্রতিনিধিগণ এখন তাঁদের বক্তব্য রাখবেন।

জনাব শাহজাদা আল আমিন কবির (সোহেল) (সভাপতি, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি): প্রথমেই আমি হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংবিধান সংস্কারের সুপারিশ তৈরির জন্য অংশীজন হিসেবে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি একটি মানবাধিকার সংগঠন। এই সংগঠনটি মানবাধিকার সমুন্নত, বৈষম্যহীন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ পুনর্গঠনে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে আমরা নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা পেশ করছি। আপনারা সংবিধান সংস্কার বা পুনর্লিখন করবেন সেটি আপনাদের বিষয়। কিন্তু আমরা একদম গোড়া থেকে কিছু প্রস্তাবনা দিচ্ছি।

প্রথমে সংবিধানের যে 'প্রস্তাবনা', সেখানে আমাদের একটি প্রস্তাবনা আছে। এই প্রস্তাবনায় ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ২০২৪ সালের ছাত্র জনতার বৈষম্যবিরোধী গণআন্দোলনকে সামনে নিয়ে একটি প্রস্তাবনা দিয়েছি। প্রস্তাবনাটি এরকম যে, বাংলাদেশ ভুখন্ডের ঐতিহাসিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ২০২৪ সালের ছাত্র জনতার বৈষম্যবিরোধী গণআন্দোলনের চেতনা এবং লক্ষ্য অনুযায়ী সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈষম্যহীন সমাজ গঠনই হবে এই সংবিধানের প্রিয়াম্বল"। আমরা এটি প্রস্তাব করছি, আপনারা বিবেচনা করতে পারেন।

আমরা এখন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কিছু প্রস্তাবনা দেওয়ার চেষ্টা করব। সংবিধানের প্রথম ভাগে অনুচ্ছেদ ১ এ "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ", এই 'প্রজা' শব্দটি আমাদের কাছে বৈষম্যপূর্ণ মনে হচ্ছে।

আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, এই 'প্রজা' শব্দটি বাদ দিয়ে "People's Republic" এর একটি জুৎসই বাংলা শব্দ প্রয়োগ করা যেতে পারে। আমরা সরাসরি সে প্রস্তাবটি দিচ্ছি না, কী শব্দ। But, you will think about it, which would be that appropriate Bangla meaning of Republic of Bangladesh, except প্রজা।

অনুচ্ছেদ ৬ (১) সম্পর্কে বলতে চাই, নাগরিকত্বের বিষয়ে। সংবিধানে আছে, "আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত"। আমরা এখানে একটু সংশোধন চাচ্ছি। আমরা বলছি, নাগরিকত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে "আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত" এর পরিবর্তে "জন্মসূত্রে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে"। we proposed you to include by birth as well. জন্মসূত্রটিও সংযুক্ত করার জন্য আমরা প্রস্তাব করছি।

অনুচ্ছেদ ৬(২)তে আমাদের পরিচিতির বিষয়ে অন্যদের মত আমাদেরও একই মত যে, "বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত হইবেন"। এটি আমাদের প্রস্তাব যে আমরা বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত হতে চাই। যেহেতু এখানে জাতিগোষ্ঠী আছে আমরা distinguish করতে চাই না। We are one nation. We are Bangladeshi. This is our identity.

অনুচ্ছেদ ৭(১) এ একইরকম "প্রজাতন্ত্র" শব্দটি পরিবর্তন করে "বাংলাদেশের সকল ক্ষমতার মালিক এই রাষ্ট্রের নাগরিক" বলা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৭ (ক), (খ) এ দুটিই আমরা বাদ দেওয়ার কথা বলছি। যেহেতু সংবিধান সংশোধন যোগ্য। কেননা সংবিধান হচ্ছে জনগণের জন্য। জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সময়ের প্রয়োজন সংবিধান সংশোধন করতে হবে। সেক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের জন্য উভয় কক্ষে দুই তৃতীয়াংশ ভোটে এবং গণভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন হতে পারে। তাই সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ (ক) এবং (খ) এর মধ্যে যে আমরা অপরিবর্তনশীল বলে ফেলেছি, this is the contradictory to the whole concept of the constitution. আমরা এটি বাদ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করছি।

দ্বিতীয়ভাগ-এ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। এখানে দুটি বিষয়ে আমরা আলোকপাত করার চেষ্টা করছি। একটি হচ্ছে, যেহেতু আমরা প্রস্তাবনায় একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করেছি সেহেতু সেই আলোকে অনুচ্ছেদ ৮(১)কে আমরা একটু modigy করার জন্য প্রস্তাব করছি এভাবে, "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈষম্যহীন সমাজ গঠন"। এই শেষের শব্দগুলো ২০২৪ সালের আন্দোলন থেকে এসেছে। আমরা বৈষম্যের শিকার হয়েছিলাম বিগত ১৫ বছর ধরে। এই

অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই শব্দগুলো যুক্ত করার জন্য অনুরোধ করছি।

অনুচ্ছেদ ২৩(ক) তে "উপজাতি ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা" শব্দসমূহ বাদ দিয়ে "রাষ্ট্র সকল নৃগোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ঠপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিকাশের ব্যবস্থা করিবে"। এই শব্দগুলো যোগ করার জন্য আমরা অনুরোধ করছি।

এখন তৃতীয়ভাগে- যেহেতু স্বাধীনতার ৫২ বছর পেরিয়ে গিয়ে আমরা অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে বিশ্বাস করি অনেক উন্নয়ন হয়েছে। সেই বিশ্বাস এবং বাস্তবতার আলোকে আমরা মনে করছি, এই ৪টি অতিরিক্ত মৌলিক অধিকার যেগুলো আইনের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

১। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

২। শিক্ষার সকল স্তরে নৈতিক ও মানবাধিকার শিক্ষা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩। স্বাস্থসম্মত ও দূষণমুক্ত পরিবেশে বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৪। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমরা ২০২৪ এর অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, অনুচ্ছেদ ৩৯(এ)-তে যুক্ত করা যেতে পারে, "নাগরিকদের নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট ব্যবহারের অধিকার" যুক্ত করিতে হইবে। পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে, মৌলিক অধিকার হিসেবে।

চতুর্থভাগ-এ আমরা প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করার প্রস্তাব করছি। কীভাবে হবে আমরা পরের আলোচনাতে বলছি।

অনুচ্ছেদ ৪৯-এ আমরা একদিকে বলছি ভারসাম্য করতে, আরেকদিকে তার arbitrarinessটাও বন্ধ করার প্রস্তাব করছি। কীভাবে? মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিজ ক্ষমতাবলে দণ্ডহ্রাস ও স্থগিত করার ক্ষমতা থাকবে বলছি। অন্যদিকে মওকুফ করার ক্ষমতা বিলুপ্ত করা প্রয়োজন বলে প্রস্তাব করছি। কারণ কেউই আইনের উর্দ্ধে নয়। আইনের এই মূলনীতি বাস্তবায়ন এবং গুরুতর অপরাধী যাতে শাস্তি থেকে রেহাই না পায় তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের এই প্রস্তাবনা।

অনুচ্ছেধ ৪৬ (৪) আমরা বিলুপ্ত করতে বলছি। কারণ এটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈপরিত্ব।

অনুচ্ছেদ ৫৭-এ দুটি জিনিস আমরা সংযোজনের কথা বলেছি। যথা-

১। কোনো ব্যক্তি ২বারের অধিক প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হতে পারবেন না।

২। একই সাথে একজন ব্যক্তি দলীয় প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না।

অনুচ্ছেদ ৫৮(ক) যেহেতু বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন আছে, আমাদেরও প্রস্তাব নির্দলীয় তত্তাবধায়ক বা অন্তবর্তীকালীন সরকার যেটিই হোক সেটি পুনর্বহাল করতে হবে।

স্থানীয় সরকার বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রয়েছে। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী এবং কার্যকর করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন এবং উন্নয়নে সংসদ-সদস্যের কোনো ভূমিকা থাকবে না।

পঞ্চমভাগ-আইনসভায় আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সংসদ হবে 'দ্বিকক্ষ' বিশিষ্ট। নিম্নকক্ষের সদস্য হবে ৩০০ জন, যারা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। আর উচ্চকক্ষে আমরা বলছি ১০৫ জন হবেন। যার ১০০ সদস্য নিম্নকক্ষের প্রতিনিধি নির্বাচনের সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে নির্বাচিত হবেন। আর উচ্চকক্ষে কারা নির্বাচিত হবেন- অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, সচিব, উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যেমন শ্রম, শিল্প, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, বিনিয়োগ, বাজার অর্থনীতি, জলবাছু, পানি, নদী, মানবাধিকার এবং ধর্মীয় বিশেষজ্ঞগণ এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে উচ্চকক্ষ গঠিত হতে পারে। আর আমরা বলেছিলাম যে, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য। এজন্য এখানেই এসেছে যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ জন সদস্যকে টেকনোক্র্যাট সদস্য হিসেবে উচ্চকক্ষে মনোনীত করতে পারবেন। তিনি বিভিন্ন সুবিধা বঞ্চিত সম্প্রদায় ও বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে পারবেন। উচ্চকক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি ১০ জন সদস্যের মধ্যে অন্তত তিনজন নারী সদস্যকে মনোনীত করবেন। এক তৃতীয়াংশকে আমরা এখানে গুরুত্ব দিচ্ছি।

Article 70(b) which is very much debatable article. আমরা ৭০(খ)-তে modification-এর মাধ্যমে মাঝামাঝি একটি অবস্থানে আসতে চাই। একটিতো আছে যদি তিনি পদত্যাগ করেন, তাহলে তাঁর সংসদ-সদস্য পদ থাকবে না। এখানে আপত্তি নেই। ৭০(খ)তে আমরা একটু modification এনেছি, "আইন পাসের ক্ষেত্রে সংসদ-সদস্যগণ স্বাধীন মতামত ও ভোট প্রদান করতে পারবেন।

কিন্তু রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পীকার নির্বাচনে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোট প্রদান করবেন”।

অনুচ্ছেদ ৭১ (১) এ আমরা বলছি, “একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ একটি সংসদীয় আসনে প্রতিদন্দ্বিতা করতে পারবেন”। আর অনুচ্ছেদ ৭১(২) বাতিল করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৭৪ (১) এ উভয় কক্ষে স্পীকার সরকারি দল থেকে এবং ডেপুটি স্পীকার বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত হবে।

Article 77- we have the ombudsman but it is not effective. Our proposal is to make some mechanism so that the ombudsman is functioning. এই প্রস্তাবটি আমরা করছি। পঞ্চমভাগ- অনুচ্ছেদ ৮০। সংসদের নিম্নকক্ষ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবনা উচ্চকক্ষে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস করতে হবে। কোন প্রস্তাব যদি নিম্নকক্ষে পাস হয় তা উচ্চ কক্ষেও পাস হতে হবে।

বিচার বিভাগ নিয়েও আমাদের প্রস্তাবনা রয়েছে। বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিচার বিভাগের সচিবালয় সুপ্রীম কোর্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচার নিয়োগ আইন প্রণয়ন করতঃ তদানুযায়ী নিয়োগ করতে হবে। At the moment there is no rules for appointment the Judges. It should be under the rules.

নির্বাচন সংক্রান্ত আমাদের কিছু প্রস্তাবনা, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে পৃথক স্বাধীন নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সচিবালয় আছে কিন্তু এটি স্বাধীন নয়। নির্বাচন কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোকে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রস্তাবনা। আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা উত্তর দিব।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আপনারা একটি লিখিত আজকে জমা দিচ্ছেন। নোট নিয়েছি, রেকর্ড আছে। স্পষ্টীকরণের জন্য কিছু আমার কলিগরা জিজ্ঞাসা করবেন।

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (কমিশন সদস্য): ধন্যবাদ। Elaborate and specific recommendation দিয়েছেন। ছোট একটি প্রশ্ন, আমরা সব সময় কিন্তু কমিশনগুলোর স্বাধীনতা চেয়েছি, সেটি মানবাধিকার কমিশন হোক, নির্বাচন কমিশন হোক, দুর্নীতি দমন কমিশন হোক। আপনারা বলছেন, তারা যাতে স্বাধীন হতে পারে। আমাদের এই মন্ত্রটি দেন যে, কীভাবে তারা স্বাধীন হবে? How do you ensure the commission is headed by people who are independent of political and other influences?

জনাব শাহজাদা আল আমিন কবির (সোহেল) (সভাপতি, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি): নির্বাচন কমিশনের বিষয়ে আমরা যা বলতে পারি, নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রে এখন যেটি প্রচলিত আছে, নির্বাচনের সময় ডিসি সাহেব থাকে রিটার্নিং অফিসার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল হওয়াতে সরকার যেভাবে নির্দেশনা দেন তারা সেভাবেই কাজ করেন। যদি রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং প্রিজাইডিং কর্মকর্তাগণ সরাসরি নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা হতেন তাহলে তারা অধিক স্বাধীন হতেন। ক্রান্তিকালীন সময়কালে ডিসি সাহেবদের ডেকে না এনে যদি তাদের স্থায়ী কর্মচারী-কর্মকর্তা থাকে আমার মনে হয় অনেকটা সহজ হবে।

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (কমিশন সদস্য): আমি একটি কাউন্টার প্রশ্ন করি। যারা সিভিল সার্ভিসে আছেন বা যারা নির্বাচন দেখাশোনা করেন তাদের একটি কথা হলো যে, তারা বলছেন যে, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাগণ অতটা সক্ষম না। যেভাবে প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের দেশজুরে কর্মকর্তাদের structure, আছে, framework আছে, labour force আছে, নির্বাচন কমিশনের সেই পরিমাণ দক্ষ, অভিজ্ঞ কর্মকর্তা আছে কি না?

জনাব শাহজাদা আল আমিন কবির (সোহেল) (সভাপতি, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি): এটি একদিনে সম্ভব নয়। আমরা যদি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন রাখি, গঠনটি রাখি, নীতিমালাগুলো যদি বলে দেই, তাহলে হয়তো দিন দিন এটি উন্নতি করবে।

জনাব ফিরোজ আহমেদ (কমিশন সদস্য): ধন্যবাদ, আমি দুটি প্রশ্ন করতে চাই, জানার সুবিধার জন্য।

নারীপক্ষের প্রতিনিধিগণ এক তৃতীয়াংশ নারী সদস্যের প্রস্তাব করেছেন। আরও কেউ কেউ করেছেন। এই এক তৃতীয়াংশ আসলে কীভাবে নির্ধারণ করা যাবে। দলগুলো কীভাবে করবে, সেটি আশা করি আপনারা আপনাদের লিখিত প্রস্তাবে পরিষ্কার করবেন। এখনও চাইলে করতে পারেন। আরেকটি প্রশ্ন, এটি হচ্ছে হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির কাছে। উচ্চকক্ষের ক্ষেত্রে যখন আপনারা বলছেন যে, এই এই ধরনের মানুষরা, যেমন সাবেক বিচারপতি, সামরিক বাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তা বা সাবেক সচিব এ ধরনের বিশিষ্ট নাগরিক বা বিশেষজ্ঞ তাদেরকে আনা হবে। এটির বাছাই বা নির্বাচন কীভাবে ঘটবে সে বিষয়ে আপনাদের কোনো প্রস্তাব আছে কি না? সেটিও আপনারা আশা করি লিখিতভাবে দিবেন বা এখনও বলতে পারেন।

জনাব শাহজাদা আল আমিন কবির (সোহেল) (সভাপতি, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি): আমরা বলেছি আপার হাউজে

প্রতিটি রাজনৈতিক দল তার প্রতি ১০ জনের ৩ জন নারী প্রতিনিধি দিবেন। এটি বাধ্যগতভাবেই তারা দিবেন। এক্সপার্ট নির্ধারণের বিষয়ে নিশ্চয়ই দলগুলোর এক্সপার্ট থাকবে এবং নির্বাচন কমিশনও এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারবে তাদের যোগ্যতা অযোগ্যতা নির্ধারণ করার বিষয়ে।

ড. শরীফ ভূঁইয়া (কমিশন সদস্য): আমি একটি সম্পুরক প্রশ্ন করি। দলগুলো যে মনোনয়ন করবে এটি কি নিম্নকক্ষের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে করবে?

জনাব শাহজাদা আল আমিন কবির (সোহেল) (সভাপতি, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি): জি। এটি সরাসরি ভোট হবে না। নিম্নকক্ষে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে হবে। আমরা এ দুটির একটি সমন্বয় করেছি। আমরা নিম্নকক্ষে বলছি সরাসরি ভোট আর উচ্চকক্ষে proportional representation.

গীতা দাস(নারী পক্ষ): আমরা এ বিষয়টি বিস্তারিত বলিনি। কারণ আমরা ভেবেছি নির্বাচন সংস্কার কমিশন হয়তো বিস্তারিত কিছু করবে তখন হয়তো বলা যাবে। আমরা বলেছি যে, সকল স্তরে এক তৃতীয়াংশ নারী মনোনয়ন। কারণ আমরা অতীতে দেখেছি যে, দলীয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব থাকলেও পরের স্তরে নারীর কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। আমি যদি এক তৃতীয়াংশ বলি, আসবে কোথেকে। দলের ভেতরেইতো নেই। সেখানেই তো আসতে পারছে না। আর এক তৃতীয়াংশ যে বাছাই করতে হবে সেটি নির্ভর করতে আপনারা কীভাবে designটা করবেন। যদি আনুপাতিক হারে হয়, সেটি হলো এক ধরনের। সে হিসেবে কোনো দল যে ভোট পাবে সে ভোটের ভিত্তিতে প্রার্থী আসবে। সেখানে একজন নারী, একজন পুরুষ। যদি এক তৃতীয়াংশ হয়, সেক্ষেত্রে দুইজন পুরুষ দিলে একজন নারীর নাম আসবে। এটি নির্ভর করবে কীভাবে আমরা যাব? স্থানীয় সরকারে এখন কিন্তু এক তৃতীয়াংশ আছে। ৩জন মহিলা মেম্বার কিন্তু আছে। ৩জন মহিলার আবার ভৌগলিক অবস্থানটি সমান নয় ঐ ৯ জন পুরুষের সাথে। এগুলোতে সমতা আনতে হবে। ঐটি আবার সংরক্ষিত আসন হয় না, হয় সরাসরি নির্বাচন। আমরা চাচ্ছি, সরাসরি নির্বাচন হবে। ঐ সংরক্ষিত আসনটিতে পুরুষের বিপরীতে নারী যাবে না। নারী পুরুষ ভেদেই আসনটি আমরা চাচ্ছি। দল থেকে যদি লিঙ্গভেদে মনোনয়ন দেওয়া হয়, সেখানে সংরক্ষিত আসন থাকবে না, পুরুষরা প্রতিদন্দ্বিতা করতে পারবে না, সেরকম না। সমতা আনতে গেলে সবটা আনতে হবে।

যেহেতু সুযোগ পেয়েছি আরেকটু বলি, আমরা চাই মানবিক রাষ্ট্র। বেলা সুন্দরভাবে বলেছেন right to live. আমরা একটি মানবিক রাষ্ট্র চাই। বৈষম্যহীন রাষ্ট্র চাই যেখানে ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণের কোনো পার্থক্য থাকবে না। আমি ধর্মকে এনে এখানে কোনো দ্বিধা সৃষ্টি করতে চাই না। ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞার মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। এটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। ইহজাগতিকতা আর ধর্মনিরপেক্ষতা ২টি ভিন্ন জিনিস। সেটির পার্থক্যটি স্পষ্ট হওয়া উচিত। তা না হলে সংবিধানে এটি নিয়ে আবারও দ্বিধা সৃষ্টি হবে।

ধন্যবাদ।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): ছোট্ট একটি জানার বিষয়। Proportional representation-এ আপনাদের মতামত কি পপুলার ভোটের ভিত্তিতে, নাকি আসন সংখ্যার ভিত্তিতে।

জনাব ইজাজুল ইসলাম(নির্বাহী পরিচালক, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি): আমরা যে প্রস্তাবনাটি দিয়েছি, নিম্নকক্ষে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে। কিন্তু দলগুলো শতকরা হারে যে ভোট পেয়েছে, যদি ২% পায় তাহলে উচ্চকক্ষে ২জনকে সে মনোনয়ন দিতে পারবে। আর যদি ১০% বা এর উপরে যদি কোনো দল ভোট পায় তাহলে তাকে ১০ জনের মধ্যে অন্তত ৩ জন নারী দিতে হবে। সে আরও বেশি দিতে পারবে। কিন্তু কেউ যদি ১%, ২% ভোট পায়, তাহলে সে ইচ্ছামত- একজন পুরুষ বা একজন নারী দিতে পারবে। আমরা শতকরা প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্য নির্ধারণের বিষয়টি বলছি।

তাসলিমা ইসলাম (প্রধান নির্বাহী (ভারপ্রাপ্ত) বেলা): আমি একটু অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের আপার কথায় ফেরত যেতে চাচ্ছিলাম। আপনি যে মন্ত্রের কথা বললেন, মন্ত্রতো আছেই। আমি স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলি। মানবাধিকার কমিশনের সাথে আমার অনেক লম্বা সময় কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি ৩টা টার্ম দেখেছি কীভাবে চেঞ্জ হয়েছে। স্পষ্ট করে বলা আছে, তাদের selection process, accountability সবকিছু একদম আইন করে বলে দেওয়া আছে। কিন্তু যেভাবে তাদের selection process হবার কথা, even একদম বেসিক জিনিস যে, পেপারে একটি বিজ্ঞপ্তি যাবে, সেটি আমি গত ৯ বছরে একবারও দেখিনি। সেজন্য বলছি, মন্ত্র আমাদের কোথাও না কোথাও আছে। ব্যবাহর করতে হবে, এটিই হচ্ছে কথা। কালচার চেঞ্জ হতে হবে। আমাদের mindset চেঞ্জ করতে হবে। অন্যথায় কোনো মন্ত্রই কাজ করবে না।

জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার):

একটু supplement করি। আমরা বলেছি উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষ। নিম্নকক্ষে আমরা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের কথা বলেছি সেটি

আসন সংখ্যার ভিত্তিতে। আর উচ্চকক্ষে আমরা বলেছি এক্সপার্ট-এর কথা। সেখানে আইনেই নির্ধারণ করবে, যেমন entrepreneurs nominated by BGMEA, FBCCI. They will be nominated people for upper chamber. IGP, Chief of Army staff এই ধরনের গ্রুপগুলো থেকে মনোনয়ন নিয়ে তারা এখানে আসবেন। এ বিষয়ে আমরা লিখিত বক্তব্যে বিস্তারিত দিব।

দ্বিতীয় হলো, right to education এটি আমাদের এখানে মৌলিক অধিকার। এটি আমাদের সংবিধানে নেই। তৃতীয় হলো, যেহেতু সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং Political philosophy expert আমাদের সামনে আছেন। আমাদের constitutionalism বার বার ব্যর্থ হয়, কাজ করে না, এটি তৈরি হয়নি। অন্যতম কারণ হলো, bureaucracy. পিএসসি সংক্রান্ত যে প্রোভিশনগুলো আছে সেগুলোতে সুনির্দিষ্ট প্রোভিশন দিয়ে empower করতে হবে। যেমন- নিয়োগ পদ্ধতি, ক্যাডার বিন্যাস এবং সাবজেক্ট বা ডিসিপ্লিন একম অনেককিছুর সংস্কার দরকার। এগুলো যদিও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কাজ। তারপেরও এগুলো সংবিধান সংস্কার কমিশনের সাথে সম্পর্কিত। পিএসসির সেখানে সংস্কার আনতে হবে। আমলাতন্ত্র যদি আমরা ঠিক করতে পারি তাহলে ৬০ শতাংশ কাজ হয়ে যাবে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ব্যারিস্টার বেলায়েত, আমি আপনার কাছে আসব। তার আগে নারী পক্ষের একটি সামান্য ব্যাখ্যা বুঝার জন্য। আপনারা রাষ্ট্রীয় পদে ২বারের বেশি না আসার কথা বলেছেন। সেক্ষেত্রে এমপি থেকে উপজেলা চেয়ারম্যান পর্যন্ত বলেছেন। এটি কি আমি ঠিক শুনতে পেলাম যে উপজেলা চেয়ারম্যান পর্যন্ত নাকি আরও নিচ পর্যন্ত এরকম চান?

গীতা দাস (সভানেত্রী, নারীপক্ষ): উপজেলা চেয়ারম্যান পর্যন্ত বলেছি। এর নিচে আর যাইনি। সেখানেও হতে পারে। কারণ আমরা দেখেছি, অভিজ্ঞতায় বলে, ইউনিয়ন পরিষদে গত টার্মে অনেকখানি রাজনীতিকীকরণ করা হয়েছে। এর আগে আমরা দেখেছি ভোট মোটামুটি সুষ্ঠু হতো। এখানে যদি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি, ওখানে সমস্যা নেই। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে এবং উপজেলা পর্যন্ত এজন্য বলা হয়েছে যে এগুলোতে মনোনয়ন দেওয়ায় দলীয়ভিত্তিক হয়ে যাচ্ছে। যতই আমরা নিয়ন্ত্রণ করি না কেন, প্রকাশ্যে দলীয়করণ না করা হলেও ভবিষ্যতের কথা বলছি, হয়ত একটা মনোনয়ন থাকবে। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, ঐভাবেই আসছে। কারণ পরিবারতন্ত্র বলতে পারছি না, তবে এটি আসলে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। খুব বেশি করেই করা উচিত। কিন্তু ২ বারের অধিক যদি না বলি ঐটি কিছুটা হলেও রদ করতে পারব। তাই উপজেলা পর্যন্তই চাচ্ছি, আমরা আর নিচে চাচ্ছি না।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ব্যারিস্টার বেলায়েত, আমাদের একটু বুঝার জন্য, রেকর্ডের জন্যই বলতে পারেন। আপনাদের সংগঠন থেকে ৩ জন প্রতিনিধিত্ব করছেন আপনারা। আপনারা যেটি উপস্থাপন করেছেন, সেটিই কি প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান বা সংগঠনগত? কারণ কিছু কিছু মতপার্থক্য মনে হয় লক্ষ্য করা গেছে।

জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): লিখিত ফর্মে আমাদের মতামতটি করা আছে। আমরা আপনাদেরকে লিখিত দেব। আজকে খসড়া নিয়ে এসেছি। যেহেতু সময় কম পেয়েছি এবং সময় একটু বাড়িয়ে দিয়েছেন, আমরা আজকে প্রাথমিক খসড়াটি দিয়ে যাব। এরপর সম্পুরক আরও একটি দেব।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): এটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আপনাদের কাছ থেকে অর্থাৎ সংগঠন হিসেবে সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন হিসেবে আপনাদের পক্ষ থেকে আমরা একটি খসড়া পাব, তাইতো? আচ্ছা ঠিক আছে। যে কোনো ব্যক্তিই আসলে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সেটির কোনো বিধিনিষেধ নেই।

জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন : আমরা আপনাদেরকে যেটি লিখিত দেব সেটিই আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক মতামত।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ওয়েবসাইটসহ বিভিন্নভাবে প্রত্যেকটি নাগরিকেরই আমরা অংশগ্রহণ চাচ্ছি। ফলে যে কেউ মতামত দিতে পারে, সেটি নিয়ে আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই। যেহেতু আমরা সাংগঠনিকভাবেও চেয়েছি। আমরা সুনির্দিষ্ট করব যে, সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে এধরনের বক্তব্য এসেছে, সিভিল সোসাইটির লিডারশিপ থেকে এসেছে বা ধরুন প্রফেশনাল থেকে এসেছে। যাতে আমাদের representationটি proper হয়, সেজন্য এ প্রশ্নটি করলাম।

এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম (বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): আমরা বলেছি যে, আমাদের পক্ষ থেকে এটি চূড়ান্ত করব। আর আমি যেটি বলেছি এটি আমার ব্যক্তিগত মতামত। এটির ব্যক্তিগত কপি হয়ত পাঠাব। We sit together and give one single proposal. ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয়ত আমাদের প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন যে, শিক্ষিত হয়ে বেকার থাকা এটি আমাদের জন্য অভিশাপ। এ ব্যাপারে আমরা বলতে চাচ্ছি, বিসিএসসহ যে সমস্ত পরীক্ষাগুলো হয় সেখানে আপনার আত্মীয়, আমাদের আত্মীয়স্বজন পরীক্ষা দেয়, তারা ৭ থকে ৮ বছর পর্যন্ত ফলাফলের অপেক্ষায় বসে আছে। এ বিষয়েও আমাদের একটি প্রস্তাব, আমরা লিখিত দেব। আর আমার ব্যক্তিগত একটি

প্রস্তাবও আছে। বিসিএস পরীক্ষার তারিখ, তার ফলাফল প্রকাশের তারিখ এবং নিয়োগের তারিখ সঠিক সময়ে হলে, তাদের হতাশা, ব্রেইন ড্রেন যেটি হচ্ছে এ থেকে রক্ষা করতে পারব। সুতরাং এ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আমাদেরকে নিতে হবে। আমাদের সংবিধানে বিসিএস সংক্রান্ত কথা আছে।

আরেকটি কথা অনেকেই বলেননি, আমাদের 'জাতীয় সঙ্গীত'-এর বিষয়ে। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত রবিন্দ্রনাথ লিখেছেন। আমরা তাকে সম্মান করি। কিন্তু তার মৃত্যুর ৩০ বছর পর আমরা তার লেখনিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করেছি। আর জাতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে যদি আপনি যান, এটি আমাদের এই বাংলার, এই অঞ্চলের স্বার্থ বিরোধী। পূর্ববঙ্গ যখন হয়েছিল, আপনি এটি ভালোভাবে জানেন। এর বিপক্ষে তিনি বলেছেন। সুতরাং আমরা জোরালোভাবে প্রস্তাব করছি এবং আমরা লিখিততেও দেব, জাতীয় সঙ্গীতের বিষয়ে আমাদের সকলের দাবী, বিশেষ করে ৫ আগস্ট যে বিপ্লব হলো, এই বিপ্লবকে সামনে রেখে এগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা করা দরকার বলে আমি মনে করি।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, যেহেতু গণতান্ত্রিক দেশ, রাজনৈতিক দলের মধ্যে যদি গণতন্ত্র না থাকে, আমি অনেক সময় আপনার বক্তব্য শুনেছি, দলের মধ্যে যদি গণতন্ত্র না থাকে আমরা কীভাবে সারা দেশে গণতন্ত্র কায়েম করব। এজন্য এমন একটি বিধান থাকা দরকার যে, দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র থাকতে হবে। তাদের নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে। এটিকে যদি না করা যায় তাহলে গণতন্ত্র লিখিত থাকবে, গণতন্ত্র রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে না।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): সবাইকে ধন্যবাদ।

আপনারা কষ্ট করে এসেছেন। ঢাকায় যান চলাচলই একটি দুরুহ কাজ। তারমধ্যে দুপুর বেলা, আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আপনাদের লিখিত একটি ভাষ্য যদি আজকে দিয়ে যান, পরবর্তী সময়ে সেটির পরিবর্তিত ভাষ্য ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের দিলে আমরা বিবেচনায় নিয়ে সংযুক্ত করতে পারব। আপনাদের অনুমতি সাপেক্ষে এই অধিবেশনটি আজকে শেষ করছি।

আপনাদের সবাইকে আবার আন্তরিক ধন্যবাদ।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

তৃতীয় সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১১ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : দুপুর ০২:৩০ থেকে ৪. ০০ পর্যন্ত

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:

১। অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক, — কমিশন প্রধান
২। অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, — সদস্য
৩। ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল — সদস্য
৪। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। — সদস্য
৫। ড. শরীফ ভূঁইয়া, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট — সদস্য
৬। ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল — সদস্য
৭। জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক — সদস্য

অংশীজন (প্রতিষ্ঠান) এর তালিকা

১। জনাব আবু আহমেদ ফয়জুল কবির, আইন ও সালিশ কেন্দ্র
২। জনাব শাহিনুজ্জামান, আইন ও সালিশ কেন্দ্র
৩। জনাব মুহাম্মদ জাকির হোসেন খান, চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ
৪। জনাব মোঃ সালমান চৌধুরী, যুদ্ধ, সংঘাত ও আন্তর্জাতিক অপরাধ তদন্তকারী
৫। আলহাজ্ব মোঃ মকছুদুল হক, সহসভাপতি, নির্বাহী পরিষদ, বাঁচতে শেখা
৬। জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ, নির্বাহী পরিষদ, বাঁচতে শেখা
৭। অ্যাডভোকেট হুমাছুন কবীর ভটুইয়া, সাধারণ সম্পাদক, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)
৮। ব্যারিস্টার শাহরুখ কবীর ভূইয়া, সদস্য, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)
৯। শ্রী নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১০। শ্রী প্রশান্ত কুমারর বিশ্বাস, উপপরিচালক, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১১। সৈয়দ শামছুল হুদা, বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট (বিআইএম)
১২। অ্যাডভোকেট মাওলানা মুফতি আল আমীন, আইন সম্পাদক,বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট (বিআইএম)

কার্যবাহ প্রস্তুতকারক:

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সম্পাদনায়

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, বাংলাদেশ উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানের কার্যবাহ

কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ, আমি এই কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা ছোট ছোট আকারের অধিবেশনে আপনাদের সঙ্গে আলোচনায় বসছি সে কারণে যাতে করে সকলের কথা শোনার সুযোগ হয়। সকাল থেকে ইতোমধ্যে আমরা আরও দুইটি অধিবেশনে আরও বেশ কয়েকটি সিভিল সোসাইটির অর্গানাইজেশনের সাথে কথা বলেছি। ফলে আকার ছোট হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এখানে সবাই উপস্থিত নেই। দুটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা পথে আছেন, আশা করি তারা শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগ দিবেন। আপনারা জানেন যে, আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। অংশীজনের মতামতের এই সভার শুরুতে সেইসব শহিদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় প্রদান করবেন।

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির সক্রিয় অংশীদার হিসেবে সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আপনারা ১০ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে সকলের মতামত শোনার সুযোগ হবে। আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব লিখিত আকারে আজকে আমাদের কাছে দিতে পারেন অথবা আগামী ২০ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

সকলের বক্তব্যের আগে আমরা বিভিন্ন সংগঠনের উপস্থিত প্রতিনিধিদের অনুরোধ করব, আপনাদের নাম এবং সংগঠনের নাম বলে পরিচয় দেবার জন্য, যাতে করে আমাদের পক্ষে রেকর্ডিং এ সহায়ক হয়।

(উপস্থিত অংশীজন তাঁদের পরিচয় প্রদান করেন)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, আমরা আজকে আলোচনা শুরু করি কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর পক্ষ থেকে।

ব্যারিস্টার শাহরুখ কবীর ভূইয়া (সদস্য, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব): প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি কমিশনকে আমাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। সিভিল সোসাইটির মতামতটি এখানে আমরা প্রস্তাব করতে পারব বিভিন্ন দিক থেকে। প্রথমেই আমাদের যে সুপারিশ, যেটি বর্তমানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু। সেটি হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যু। আমরা সবাই জানি যে smooth transition-এর জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সোসাইটিকে আপনারা যদি জনগণের আস্থার প্রতীক হিসেবে রাখতে হয় তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি যেহেতু পূর্ববর্তী fascist সরকার এটিকে বাতিল করে দিয়েছিল, এটির পরবর্তীতে আমরা দেখেছি যে, তত্ত্বাবধায় সরকারের অনুপস্থিতি কীভাবে অপব্যবহার হয়েছিল, আলটিমেটলি এটি একটি অবৈধ নির্বাচনের পথ সুগম করেছিল। তাই আমাদের প্রথম সুপারিশ হচ্ছে, তত্ত্বধায় সরকারকে সংবিধানে পুনস্থাপন করা।

দ্বিতীয় যে ইস্যুটি বলতে চাই, সেটি হচ্ছে অনুচ্ছেদ ৭০ এ বলা আছে যে, দলীয় অনুগত্যের বাইরে গেলে সংসদ-সদস্য পদ কূন্য হয়ে যায়। এর মাধ্যমে তাদেরকে এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করা হয়। এই জায়গাটায় আমাদের মনে হয় সংস্কার আনা প্রয়োজন। যাতে জনপ্রতিনিধি জনগণের হয়ে কাজ করে, সেই স্বাধীনতা যাতে তারা পায়। তাদের ওপর যেন দলীয় এজেন্ডাকে বাস্তবায়ন করার চাপ যেন না থাকে। ক্যাবের বাকি বক্তব্য আমাদের সাধারণ সম্পাদক উত্থাপন করবেন।

অ্যাডভোকেট হুমাছুন কবীর ভটুইয়া (সাধারণ সম্পাদক, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)): ধন্যবাদ। আমার কলিগ যেভাবে বললেন, আমি শুধু একটি কথা বলব যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে ক্ষমতা, এ ক্ষমতাটাকে রাষ্ট্রপতির সাথে ভারসাম্য করার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। আমরা আরও মনে করি, যারা এমপি হয়ে সংসদে আসেন, সুযোগ সুবিধা হিসেবে তাদেরকে

শুল্কবিহীন গাড়ী ক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। তারা এটিকে অপব্যবহার করে। যার যে গাড়ির প্রয়োজন নেই, সেই গাড়িও সে নিয়ে আসে এবং এটি অন্যের কাছে বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। এটি একটি দুর্নীতি আমরা মনে করি। দেশের সাধারণ মানুষ যেভাবে গাড়ি আনলে শুল্ক দিয়ে আনে, এমপিরাও যেন শুল্ক দিয়েই গাড়ি আমদানী করে।

ক্যাবের পক্ষ থেকে আরেকটি জিনিস থাকবে সেটি হলো, নির্বাচনে পেশি শক্তি এবং কালো টাকার ব্যবহার হয়। সেক্ষেত্রে সংখ্যানুপাতে নির্বাচন যদি করার সুযোগ থাকে তাহলে পেশি শক্তি এবং কালো টাকার মালিক যারা নির্বাচনে যায়, সেখানে দেখা যায় যারা যোগ্য ব্যক্তি তারা নির্বাচন করতে পারে না। অযোগ্য ব্যক্তিরাই নির্বাচিত হয়ে আসে। আসার পর যেটি হয় তারা জনগণকে dominate করতে চেষ্টা করে। আমরা দেখেছি যে, সরকারের পক্ষ থেকে যে বরাদ্দ দেওয়া হয় সাধারণ মানুষ সেই বরাদ্দ সম্পর্কে অনেক সময়ই জানতে পারে না। অথচ দেখা যায় তাদের নামে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হয়, সেই বরাদ্দের কথা আমরা জানতে পারি না। এক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে, এ ব্যাপারটি দেখার দরকার আছে। যেহেতু সংস্কারের প্রশ্ন এসেছে, সেহেতু এ বিষয়টি সংস্কারের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

ধন্যবাদ, সবাইকে। কি

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ব্যাখ্যার অর্থে, আমাদের জানার স্বার্থে, আপনারা অনুচ্ছেদ ৭০ সংস্কার আনার কথা বলছেন, সুনির্দিষ্ট কী কোনো প্রস্তাব আছে আপনাদের যে কীভাবে সংস্কার আনা যেতে পারে।

ব্যারিস্টার শাহরুখ কবীর ভূইয়া(সদস্য,কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ক্যাব): আমরা সুনির্দিষ্টভাবে চাচ্ছিলাম যে, কমিশনে যেন একটি ধরাবাঁধা রেডটেপ প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, কেউ যেন দলীয় প্রতীককে গুরুত্ব না দেয়। একটি এলাকার যে ইশতেহার থাকে, সে অনুযায়ী কাজ করার বাধ্যবাধকতা যেন তার উপর দেওয়া হয় বা চেক এন্ড ব্যালেন্সের ব্যবস্থা করা যে, তার প্রতিশ্রুত ছিল সে কাজটি সে করতে পারছে কি না। এ ধরনের একটি ফর্মেশন যদি এখানে সংযুক্ত করা যেতে পারে, তাহলে মনে হয় এটি এনফোর্স করা সুবিধা হবে। একটি একাউন্টিবিলিটির ব্যবস্থা আমরা করতে পারব।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

আমরা এখন চেইঞ্জ ইনিশিয়েটিভের বক্তব্য শুনব।

জনাব মুহাম্মদ জাকির হোসেন খান (চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ): ধন্যবাদ। আস্‌সালামু আলাইকুম।

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, বিজ্ঞ কমিশন প্রধান এবং কমিশনের সম্মানিত সদস্য যারা আছেন, আমাদেরকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। Particularly আমাদের প্রস্তাবগুলো আমরা লিখিত পাঠাব। এখানে সংক্ষিপ্ত কিছু পয়েন্ট বলতে চাচ্ছি। আমাদের প্রস্তাব নিয়ে আগেও আলোচনায় এসেছি বা আমরা নিজেরাও আলোচনা করেছি যে, এই সংবিধান রেখে 'বাংলাদেশ-২' যেটি আমরা বলছি, যে নতুন বাংলাদেশ, আমরা কোনো অবস্থাতেই মনে করি না যে, আমাদের যে principle, inclusiveness, equity জাস্টিসের কথা বলছি বা আমাদের বাংলাদেশকে উন্নতির দিকে নিতে চাই সেটি এই সংবিধান রেখে সম্ভব নয়। আমরা মনে করি যে, এই সংবিধান বাতিল করে দিয়ে নতুনভাবে লেখা উচিত। এটি হলো আমাদের প্রথম প্রস্তাব। সেই লেখার ক্ষেত্রে যদি বৈশ্বিক, আঞ্চলিক এবং আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষিত বিবেচনা করি, বৈশ্বিকভাবে আমরা এখন দেখছি সারা পৃথিবীতে তিনটি বড় ইস্যু আমাদেরকে প্রচন্ডভাবে সমস্যা সৃষ্টি করছে।

প্রথম কথা হলো যে, জলবাছু পরিবর্তনের কারণে আমরা সারা পৃথিবীতে এখন রাষ্ট্রীয় সীমানেত যে সমাধানগুলো করতে চাচ্ছি, সেগুলো কিন্তু কোনটিই কাজ করছে না। কারণ প্রকৃতিক সম্পদগুলো কোনো রাষ্ট্রের সীমানাকে অনুসরণ করে না। এটি তাদের নিজস্ব একটি সেটআপ হিসেবে কাজ করে। সুতরাং যখন আমাদের কোনো দুর্যোগ হচ্ছে, যে জায়গাতেই দুর্যোগ হচ্ছে না কেন, আমরা যখন সেই দুর্যোগের মোকাবেলা করতে যাচ্ছি, তখন কিন্তু আমরা যে অধিকারের কথা বলছি। সে অধিকারটি মৌলিক অধিকার এবং যখন আমাদের নাগরিকদের দিতে যাচ্ছি, সেটি কিন্তু আমরা পারছি না। কারণ cross border disaster-এর কারণে সেটি অর্জন করতে পারছি না। যেমন ভারত থেকে যখন পানি চলে আসছে তখন কিন্তু আমি চাইলেও আমাদের মানুষকে রক্ষা করতে পারছি না। This is fundamentally new extraordinary global situation. তাই natural resourceকে নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে। Natural resource anti governanceকে আমাকে মাথায় নিতে হবে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটি হলো, অনুচ্ছেদ ২১ এর (১) বা (২) এ আছে, সেটি হলো যে, রাষ্ট্র কোন অবস্থাতেই দুর্নীতি করার সুযোগ করে দেবে না। অবৈধভাবে যা যে কোনো ভাবেই হোক। কিন্তু এটি কখনই জিরো টলারেন্সটা যখন গ্লোবাল কানেক্টিভিটিতে আসে দেখিনি। বাংলাদেশ থেকে যখন টাকা চলে যাচ্ছে বিদেশে, তখন কিন্তু চাইলেও বাংলাদেশের সংবিধান সেটিকে প্রতিরোধ করতে

পারছে না। Because there is a global system. সুতরাং এই corruption এর যে situation, its a globalize situation rather than country specific.

Finally, state to state conflict, within the society conflict. এই তিনটি phenomena যদি দেখি, তাহলে আমাদের বর্তমানে যে সাংবিধানিক কাঠামো আছে বা সংবিধানে যে প্রেক্ষিতে আছে, সংবিধানের প্রেক্ষিতে মানবাধিকারকে যদি আমরা priority দেই, বা আমরা যদি obligatory না করি, সেই জায়গাটাতে এসে যদি আমরা equity, justice বা prosperityকে যদি আমরা on record principle যদি obligatory না করি, ঐটির আলোকে যদি আমরা সংবিধানকে না লিখি তাহলে it would be really difficult. মানুষের শুধু না, অন্যান্য eco সিস্টেমের যে অধিকার, সেটি না হলে আমি ultimately সুন্দরবন দুই সাইডে বিভক্ত কিন্তু eco সিস্টেম এক। তার মানে আমাকে natural rights, আমরা বলছি যে, বাংলাদেশের সংবিধানে natural rights কে, naturalism কে আমাদের benchmark করা উচিত এবং obligatory করা উচিত। সেখানে natural rights এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে চাচ্ছি, ৩টি major issues। একটি হলো যে মানুষের জীবন যতদিন আছে ততদিন sustain করবে, এটি তার natural rights। জন্মগতভাবে সে অক্সিজেন পাবে, এটি তার natural rights। আমি যে কোনোভাবেই হোক রাষ্ট্রের নাম দিয়ে আমি তার natural rights-কে curtail করতে পারি না। তাই এটি zero tolerance-এ নিয়ে যাওয়া উচিত। আমার universal status বা আমি যখন একজন মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করি, access to non adulteration বা fresh food, এটি আমার natural rights। রাষ্ট্র কী বলল, সেটি বিষয় নয়। যখন আমি রাষ্ট্রের কাঠামোতে যাচ্ছি, তখন আমি রাজনৈতিকভাবে কীভাবে যুক্ত হবো সেটি হলো social contract. As a human being আমার natural rightsকে রাষ্ট্র protect করতে হবে। এমন না যে হিন্দু, মুসলমানের জমিতে ভিন্ন মাত্রায় বৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যখন naturally আমার resourceগুলো আসবে, এর সবকিছু access করার সুযোগ দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আমি যখন গণহত্যা করব, তার বিচার কিন্তু রাষ্ট্রের সাথে related। আমি রাজনৈতিক অধিকার পাব, সেটি রাষ্ট্রের সাথে related. এ দুটো জিনিসকে আমাদের ভিন্ন আঙ্গিকে চিন্তা করা উচিত। সংবিধানকে সে আলোকে সাজানো উচিত বলে আমরা মনে করি। এটি যদি আমরা না করি, তাহলে দেখা যাবে যে, রাজনৈতিক অধিকারের নামে natural অধিকারকে যারা curtail করছে, তাকে আমরা Perview তে নিয়ে আসার সুযোগ করে দিচ্ছি। রাজনৈতিক অধিকার আর natural rights একই নয়। distinguishটি আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট করে থাকা উচিত। আমি মনে করি এখানে zero tolerance থাকা উচিত। ১৮(ক) অনুচ্ছেদে আছে যে, রাষ্ট্র সব ধরনের natural resource কে protection দিবে। কিন্তু obligatory না, এটি optional। আমি মনে করি এটিকে obligatory করা উচিত এবং zero tolerance হওয়া উচিত। আমি চাইলেই হাওড়ের মধ্য দিয়ে রাস্তা করে ফেলব এটি ঠিক নয়, এটিকে zero tolerance হতে হবে। দরকার হলে আমি ২০ কিলোমিটার রাস্তা ঘুরিয়ে নিয়ে যাব, কিন্তু আমার natural resource mountain হোক, hill হোক, নদী হোক, খাল হোক, বিল হোক এ গুলোতে touch করা যাবে না। আজকে পদ্মা সেতুর নামে development করলাম, কিন্তু ১০ বছর পর দেখা যাবে পদ্মা ব্রীজের ভাটিতে হাজার খানেক চর জেগে যাবে, সারা এলাকাই বিধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং ground water এর ক্ষতি করছি। আমি আর সময় বেশি নিতে চাচ্ছি না, আমি এটুকু বলেই শেষ করতে চাইছি যে, আমাদের সমাজে যদি আমরা এটির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে চাই তাহলে natural rights কে আমাদের fundamental principle করতে হবে। Including not only human being but also all being. একটি পশুরও বাঁচার অধিকার আছে। যদিও আমরা সংবিধানে সেটির অগ্রাধিকার দেইনি। কিন্তু এটিকে solve করে, এই জায়গাটিতে আমাদের আসা উচিত। আর secularism এর যে কথাটি বলা হচ্ছে, আমাদের এখানে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার দিকে যাওয়া উচিত। ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। That is fundamentally very important understanding. Secularism western concept and South Asian concept is not the same. ধর্ম ব্যবসাটাও যেন না হয় সেটির চিন্তাও আমাদের আসা উচিত। ধর্মভিত্তিক যে ব্যবসা, সেটির tropical ধারনা হলো যে, রাজনৈতিক দল অর্থাৎ ইসলামি দলগুলো ধর্ম ব্যবসা করে। কিন্তু গত ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা হলো যে, নন ইসলামিক দলগুলোই বেশি ধর্ম ব্যবসায় involve ছিল। সুতরাং এই জিনিসটা আমাদের চিন্তায় আসা উচিত যে, এটির bottom line, কোনো individual বা entity ধর্মকে ব্যবহার করতে পারবে না ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে। সুতরাং আমি মনে করি ঐ জায়গাটিতে স্পষ্ট হওয়া উচিত।

Finally, আমি এটি বলেই শেষ করছি যে, naturalকে আমাদের constitution rights- এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং এটিকে recognition দেওয়া উচিত। আমাদের প্রত্যেকটি resourceকে constitutionally recognition করা উচিত। সুন্দরবনকে UNESCO recognise করবে আর আমাদের constitution recognise করবে না এটি যেন না হয়। UNESCO heritage site বলে আমি এটিতে touch করব না, তা নয়। It is natural given। আমি কোনো অবস্থাতেই environmental impact assessment এর নামে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদকে আমি touch করতে পারব না, যেভাবেই হোক। আমরা কয়লা বিদ্যুৎ করি বা যে কোনো কিছুই করি না কেন, naturally setup যেখানে সেখানে touch করতে পারব না। দরকার হলে extra investment করে আমি অন্য জায়গায় যাব। এই জায়গাটিতে আমাদের একটি bottom line বা benchmark নিয়ে আসা উচিত বলে আমি মনে করি। আমাদের আরও বিস্তারিত প্রস্তাব রয়েছে, পরবর্তীতে আমরা মেইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেব।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমরা আশা করছি ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত আপনারা আপনাদের বিস্তারিত বক্তব্য দিতে পারবেন। একটু clarification এর জন্য একটি প্রশ্ন। শুরুর দিকে আপনি বলেছেন যে, এই সংবিধান রেখে সমাধান হবে না, অর্থাৎ ঠিক কী অর্থে আপনার মনে হয়েছে যে এই সংবিধান রেখে সম্ভব হবে না?

জনাব মুহাম্মদ জাকির হোসেন খান (চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ): ধন্যবাদ।

আমি প্রথমেই ব্যাখ্যা দিচ্ছি যে, আমাদের আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে যে নূতন একটি extraordinary situation হয়েছে এটির geographical সীমানার ভিতরে আমরা যে সংবিধান তৈরি করি সেটি আসলে properly কাজ করবে না। আমাদের আসলে focus হতে হবে people and planed। এটিকে focus করতে গেলে এই সংবিধান redundant হয়ে যায়। এভাবে আমরা চিন্তা করিনি যখন সংবিধান তৈরি করা হয়েছিল ঐ সময় এটি emergent ছিল না। কিন্তু এটি এখন emergency।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, গত ১৫-১৬ বছরে সংবিধানে যে পরিবর্তনগুলো করা হয়েছিল, zero mandate of the people. মানুষের ভোটের অধিকার ছাড়া যে সংবিধান করা হয়েছে, মানুষের মতামত ছাড়া যখন সংবিধানের সংশোধনী আনা হয়েছে এবং একটির সাথে আরেকটি এমনভাবে contraditory করা হয়েছে যে, এটিকে যেমনভাবেই আমরা reform করতে যাই না কেন, finally আমরা ঐ principle ধরে যেমন natural rights বা equity justice এটি আসলে achieve করা সম্ভব নয়। একটি defective constitutionকে রেখে যদি ঐটিকে rectifz করতে যাই, finally সেটিও defective হবে। আমি এটি মনে করি এবং finally যা তা হলো, আমরা prosperity দেখতে চাই। সেই prosperity যদি আমি achieve করতে চাই, তাহলে এই সংবিধানের বেশিরভাগ জিনিসই contradictory হবে। এই prosperityতে যদি আমরা যেতে চাই, সংবিধানকে একেবারে fresh mind এ, open mind এ নতুন outlook, next generation এবং inter generationকে চিন্তা করে যদি আমরা আগাতে চাই, তাহলে সংবিধান লেখার পর আমরা দেখব যে, বিদ্যমান সংবিধানের কোন অংশগুলো fit to our principle সেগুলো আমরা রেখে দিতে পারি। অথবা সেগুলোকে আমরা redundant করে দিতে পারি। এটিই আমার মতামত।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : আমরা এখন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বক্তব্য শুনব।

শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস (উপপরিচালক, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট) : ধন্যবাদ।

আমি হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টে প্রেষণে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করি। কাজ করতে গিয়ে আমি দেখেছি যে, সারাদেশে আমাদের ৭ হাজার ৪০০ শিক্ষাকেন্দ্র আছে। বিভিন্ন এলাকায় আমাদের হিন্দু কমিউনিটির মধ্যে এই কেন্দ্রগুলি পরিচালিত হয়। এখানে বাচ্চারা পড়ে, বয়স্করা পড়ে। এই কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন এলাকার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, বিদ্যমান সংবিধানের কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে আমি অবহিত হয়েছি। এ ব্যাপারে আমি আমার বক্তব্য উপস্থাপন করব। এখন যেহেতু প্রশ্ন এসেছে যে, প্রচলিত সংবিধান বহাল রেখে আমাদের সংবিধান হবে নাকি নতুন করে আমাদের সংবিধান হবে। এ বিষয়ে আমি মনে করি যে, আমাদের বিজ্ঞ কমিশন যেভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন সেভাবে হবে। কাজ করতে গিয়ে বিদ্যমান সংবিধানের যে সকল জায়গায় conflict করে, এরকম বিষয়ে দু'একটি remark আমি রাখছি। সে বিষয়ে আমি একটু আলোকপাত করব।

আমাদের সংবিধানের প্রথমভাগে এ আছে 'প্রজাতন্ত্র'। প্রজাতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ২৩(ক)-এ "ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়" কথাগুলো সংযোজনের জন্য আমি সুপারিশ করছি। তারপর অনুচ্ছেদ ২৪-এ "ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো" সংযোজন করা এবং এই অনুচ্ছেদটি বিচারিকভাবে কীভাবে প্রয়োগযোগ্য করা যায় সে বিষয়ে আমি মতামত রাখতে চাই। অনুচ্ছেদ ২৮(১) এবং (৩) এ 'কেবল' একটি শব্দ আছে, এই 'কেবল' শব্দটি আমি রাখতে চাচ্ছি না।

এই 'কেবল' শব্দটি যদি আমি তুলে দেই সেক্ষেত্রে আমার অন্তর্ভুক্তির পরিমানটা বাড়ানো যায়। অনুচ্ছেদ ২৮(৪) বিষয়ে আমার মতামত 'ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘু' অংশটি সংযোজন করা যায়। আমি এটি বার বার repeat করছি কারণ একটি কমিউনিটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমার নিকট এ বিষয়গুলো প্রতিফলিত হচ্ছে। অনুচ্ছেদ-৩৮ এ ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। যে ব্যাখ্যাটি এখানে নেই। এই ব্যাখ্যাটি করা প্রয়োজন যাতে এর অপব্যাবহার রোধ করা যায়। অনুচ্ছেদ ৪১(১) এ আরেকটি শব্দ আমি সংযোজন করতে চাচ্ছি যে, "রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে"। এখানে আছে, ধর্মীয় স্থাপনা সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি। রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, এই কথাটুকু সংযোজন করার জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি। আমাদের এ বিষয়ে যে লেখাটি রয়েছে এটি আপনাদের নিকট পৌঁছে দেব।

ধন্যবাদ সবাইকে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

আপনারা চাইলে আজকে এটি জমা দিতে পারেন, অথবা ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদেরকে ই-মেইলে পাঠাতে পারেন অথবা আমাদের অফিসে জমা দিতে পারেন। আমরা এখন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের বক্তব্য শুনব।

জনাব আবু আহমেদ ফজলুল কবির (আইন ও সালিশ কেন্দ্র): ধন্যবাদ স্যার।

আমি কমিশন প্রধান এবং কমিশনের সদস্যবৃন্দসহ সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রকে ডাকবার জন্য।

আমি শুরুতেই বলেছি যে আইন ও সালিশ কেন্দ্র একটি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান। আইন ও সালিশ কেন্দ্র অত্যন্ত সম্মানিতবোধ করছে যখন আমরা সংবিধান সংস্কার কমিশন থেকে ডাক পেয়েছি। আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে সকলে মিলে একটি লিখিত বক্তব্য জমা দেওয়ার কাজ চলছে। নির্ধারিত ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের মতামত, আমাদের কাঙ্খিত চাওয়া ই-মেইল যোগে বা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে জমা দেওয়ার ব্যাপারে আমি আশা ব্যক্ত করছি। যেহেতু আমরা লিখিত দেব, এ বিষয়ে আর বলতে চাই না। আমরা চেষ্টা করব আমাদের মতামতটি আপনাদের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য। একটি কথা শুধু বলতে চাই, আইন ও সালিশ কেন্দ্র সংবিধান পুনর্লিখন চাচ্ছে না। বর্তমান সংবিধানের মধ্য থেকেই আমাদের মতামতটি কী হতে পারে বা আমরা যেরকম চাই, সেটি নিতান্তই আমাদের মতামত। আমরা মনে করি যে, সেটি অবশ্যই জনকল্যাণ এবং সামগ্রিকভাবে বিপুল জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক যে অধিকার থাকা দরকার, যেটি আমরা মনে করছি সেটি আমরা চেষ্টা করব কমিশনকে পৌঁছে দিতে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

আমরা আপনাদের লিখিত প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করব। ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছালে আমরা খুব খুশি হব। এখন আমরা বাঁচতে শেখার প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনব।

আলহাজ্ব মোঃ মাকছুদুল হক (সহসভাপতি, নির্বাহী পরিষদ, বাঁচতে শেখা) : ধন্যবাদ।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের সম্মানিত প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ স্যার এবং সংস্কার কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ এবং উপস্থিত মহোদয়গণ। যশোরের একটি এনজিও বাঁচতে শেখার পক্ষ থেকে সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে আমি কতগুলো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বা অভিমত ব্যক্ত করছি। পরবর্তীতে এটি লিখিতভাবেও পেশ করব।

সংবিধানকে নূতন করে লেখার পক্ষপাতি আমরা না। সংবিধান যেটি আছে সেটিকে পরিবর্তন বা সংশোধন করার পক্ষে আমরা। সেই লক্ষ্যে আমি কতগুলো প্রস্তাব এখানে রাখছি।

১ নম্বর প্রস্তাব হচ্ছে, সংবিধানে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থাটি পুনঃপ্রবর্তন করা হোক। জাতীয় সংসদের মেয়াদ পূর্তির ৩ মাস পূর্বে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে দেশ পরিচালনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবেন একজন বিচারপতি।

২ নম্বর প্রস্তাব হচ্ছে, একজন প্রধানমন্ত্রী পর পর ২ মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবে না।

৩ নম্বর প্রস্তাব হচ্ছে, সংসদের মেয়াদ হবে ৪ বছর। প্রত্যেকবার একটি নির্দিষ্ট তারিখে নির্বাচন দিতে হবে।

৪ নম্বর প্রস্তাব হচ্ছে, একদিনে জাতীয় নির্বাচন না করে সমগ্র অঞ্চলকে ৪ ভাগে বিভক্ত করে ৪ দিনে নির্বাচন পরিচালনা করা হবে। এতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে এ রকম একটি পদ্ধতি করা যায় কি না তার প্রস্তাব রাখছি।

৫ নম্বর প্রস্তাব হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাস করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখাছি।

৬ নম্বর প্রস্তাব হচ্ছে, সংসদের কোনো সদস্য যদি ফ্লোর ক্রসিং করে বক্তব্য দেয় তাহলে তাকে দল থেকে বহিস্কার করা হবে, এরকম আইনকে প্রত্যাহারের প্রস্তাব রাখছি।

এগুলো মোটামুটি মোটাদাগে সংবিধান পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব রাখা হলো। বর্তমান সরকারের পরে যদি নির্বাচিত সরকার আসে, সেই সরকার যদি প্রয়োজনীয় সংস্কার করে সেক্ষেত্রে সেই নির্বাচিত সরকার পরিবর্তন করবে। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে এই মোটাদাগের পরিবর্তনগুলোর প্রস্তাব করছি।

সবাইকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

আপনাদের ৫ম প্রস্তাবটি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব কী আপনাদের আছে, কীভাবে এটি করা হবে?

আলহাজ্ব মোঃ মাকছুদুল হক(সহসভাপতি, নির্বাহী পরিষদ, বাঁচতে শেখা): ধন্যবাদ।

প্রধানমন্ত্রীর যে একক ক্ষমতা সেটি না দিয়ে জবাবদিহি হিসেবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে একটু বাড়াতে বলেছি। এই প্রস্তাবটি হতে পারে যে, তার যে নির্বাহী ক্ষমতা এটিকে কমাতে বলা হচ্ছে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমরা এখন বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনব।

অ্যাডভোকেট মাওলানা মুফতি আল আমীন (আইন সম্পাদক, বাংলাদেশ ইন্ট্যালেকচুয়াল মুভমেন্ট (বিআইএম): বাংলাদেশ intellectual movement-এর পক্ষ থেকে আমি অধ্যাপক আলী রীয়াজ স্যারকে ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের কয়েকটি প্রস্তাবনা আপনাদের সামনে পেশ করছি। তা হলো, আমরা এই সংবিধান বাতিল চাচ্ছি না, সংস্কার চাচ্ছি। তবে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীটি বাতিল চাচ্ছি। কারণ এই পঞ্চদশ সংশোধনীর কারণে অনেকগুলো জটিলতা তৈরি হয়েছে এবং বিশেষভাবে এই দেশের মুসলমানদের মনে বিরাট একটি কষ্টের সৃষ্টি হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর আগে সংবিধানের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহিম' এর যে অনুবাদ, 'দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে', কিন্তু পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত এটিকে অবলিগ দিয়ে আরেকটি তরজমা বানিয়েছেন যে "পরম করুনাময় সৃষ্টিকর্তার নামে"। অর্থাৎ "পরমকরুনাময় সৃষ্টিকর্তার নামে" এই লাইনটি আগে ছিল না। এটি নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে পঞ্চদশ সংশোধনীর পরে।

পঞ্চদশ সংশোধনীর আগে ছিল না, ছিল সেটি ৭২ এর সংবিধানে। এর পরে জিয়াউর রহমান এটি পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করেছিলেন। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা চাচ্ছি যে, সংবিধানের preamble এ "Absolute trust and faith on the almighty Allah." এটি পুনর্বহাল হোক। এর পর অনুচ্ছেদ ২(ক), "রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্ম শান্তিতে পালন করা যাইবে।" এটি ছিল পঞ্চদশ সংশোধনীর আগে। সেটি পুনর্বহাল চাচ্ছি। এরপর অনুচ্ছেদ ৮(১) (ক) তে ছিল যে, "Absolute trust and faith on the almighty Allah shall be the basis of all actions." পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এই লাইনটি মুছে দেওয়া হয়েছে। এটি পুনর্বহাল চাচ্ছি। অনুচ্ছেদ ১২ এ "ধর্ম নিরপেক্ষতার" মতবাদ আনা হয়েছে, এটিকে বাতিল চাচ্ছি। যা পঞ্চদশ সংশোধনীর আগেও বাতিল ছিল। এরপর ২৫ (২) এ ছিল যে, "মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে একটি সংহতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে রাষ্ট্র চেষ্টা করবে।" এটি পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে মুছে দেওয়া হয়েছে। এটি আমি পুনর্বহাল চাচ্ছি। অনুচ্ছেদ ৩৮ এ "Freedom of Association" এর মধ্যে নতুনভাবে ৪টি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ শর্তগুলো পঞ্চদশ সংশোধনীর আগে ছিল না। আমি আগে যা ছিল সেটি চাচ্ছি। এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহাল চাচ্ছি। অনুচ্ছেদ ৭০ যেটি বলা হয়েছে, "দলের বিপক্ষে ভোট দিলে তাঁর সংসদ সদস্য পদ বাতিল হবে", এটি আমি চাচ্ছি না। আমি চাচ্ছি দলের বিপক্ষেও সে ভোট দিতে পারবে। তাঁর মত প্রকাশ হিসেবে দলের বিপক্ষেও তার বলার অধিকার থাকবে। অনুচ্ছেদ-৭৭ এ এরপর ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা চাচ্ছি। আমাদের মত দেশে ন্যায়পালটি খুবই দরকার। তাহলে দুর্নীতি কমে যাবে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আপনারা অনুচ্ছেদ-৭০ কি সম্পূর্ণ বিলোপ চাচ্ছেন?

অ্যাডভোকেট মাওলানা মুফতি আল আমীন (আইন সম্পাদক, বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট (বিআইএম): দলের বিপক্ষে ভোট দিলে আসন কূন্য হওয়ার বিধানটি পরিবর্তন চাচ্ছি। পুরোটা পরিবর্তন চাচ্ছি না। আর ন্যায়পালের বিষয়ে strictly চাচ্ছি যে, এদেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা হোক।

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (কমিশন সদস্য): ন্যায়পালের কথা অনেক বছর ধরেই সবাই বলে এসেছে। আমাদের political culture যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে ন্যায়পাল কতটুকু কার্যকর হবে বলে আপনারা মনে করছেন?

অ্যাডভোকেট মাওলানা মুফতি আল আমীন(আইন সম্পাদক, বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট (বিআইএম): এখন আমাদের

নতুন স্বাধীনতা, আমরা নতুন চিন্তা করছি। আগের কোনো কিছু চিন্তা করছি না। আলী রীয়াজ স্যারের নেতৃত্বে এমন একটি সুপারিশ চাচ্ছি। নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি আমরা। বিশেষভাবে "Absolute trust and faith on the almighty Allah." এদেশের মুসলমানদের চিন্তা চেতনার প্রতিফলন। সংবিধানে থাকবে না তো কোথায় থাকবে। এটি ছিল, বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনের আগে preamble এ ছিল, আরও কয়েকটি জায়গায় ছিল। এটি নিয়ে এদেশের মুসলমানদের মনে কষ্ট আছে।

জনাব ফিরোজ আহমেদ (কমিশন সদস্য): জানার সুবিধার্থে কিছু প্রশ্ন করে রাখছি। আপনারা অবশ্যই আমাদের যে বিস্তারিত লিখিত document দিবেন সেখানে সেগুলো পরিষ্কার করা থাকবে। প্রথমেই ঈড়হংঁসবৎ অংংড়পরধঃরড়হ ড়ভ ইধহমষধফবংয (ঈঅই), আপনাদের অনেকগুলো পেপার আমি দেখেছিলাম, বিশেষ করে জ্বালানি নিরাপত্তা, জ্বালানি সরবরাহ বা জ্বালানি অপরাধ। এ বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা কাজ করেছিলেন। এগুলোর সাথে নাগরিক হিসেবে ক্রেতার আইডিয়াগুলোকে, নাগরিকদের যে একটি ক্রেতার চরিত্র আছে, সেটির একটি আইনগত স্বীকৃতি বা সাংবিধানিক অধিকার, সেগুলো নিয়েও আপনাদের মতামত এক সময়ের কাগজপত্রে আমি দেখেছিলাম। আমি জানতে চাচ্ছি, আমি হয়তো কিছুটা আশাও করেছিলাম যে, ঐ বিষয়টির কোনো সাংবিধানিক প্রকাশ সম্ভব কি না এবং সেটি যদি আপনাদের থাকে, আশা করি যে আপনারা যে লিখিত দিবেন সেটিতে ক্রেতা হিসেবে নাগরিকদের যে একটি সত্তা থাকে তার সাংবিধানিক কোনো বহিঃপ্রকাশ সম্ভব কি না? কারণ সংবিধানে তো আইন থাকবে না। যেখানে থাকবে এর একটি আকাঙ্খা বা ধারণার প্রকাশ সেটি একটি ব্যাপার। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আপনাদের আলোচনায় আমি পরিষ্কার হতে পারিনি যে, আপনারা যে অনুচ্ছেদগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন সেটি মোটামুটি পরিষ্কার, লিখিত আসলে আশা করি যে, বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। সংবিধানে ধর্মীয় বিষয়ে অন্যান্য জাতিসত্তার যে কথা বলা হয়েছে, এখনকার ভাষা অনুযায়ী যে ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর কথা, সেখানে আপনারা সংখ্যালঘু যুক্ত করতে বলেছেন। ঐ অনুচ্ছেদে বাঙালি ব্যাতিত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কথা আলোচনা করেছিল, সেখানে আপনারা চাচ্ছেন যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু। অর্থাৎ জনগোষ্ঠীগতভাবে না দেখে ধর্মীয় বিশ্বাসটাকে সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা।

শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস (উপপরিচালক, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট): ধর্মীয় সংখ্যালঘু, হোক হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, ethnic জাতিগোষ্ঠীর সাথে এরাও যাতে include থাকে। কারণ এই সংখ্যাটাও যেহেতু এক সময় ৩২-৩৩% ছিল, এখন ৮-৭% হয়ে গেছে। এই সুযোগটি সব জায়গায় যাতে practice করার সুযোগ থাকে। এই শব্দটি আমি include করার জন্য বলেছি।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): চেইঞ্জ ইনিশিয়েটিভের জনাব জাকির হোসেন সাহেবের কাছে আমার একটি প্রশ্ন ছিল, আপনি যেহেতু একটি climate change বিষয়ে expert, আজকে সকাল বেলাও একটি suggesions এসেছে যে, Article 18(a) should be amended to address climate change concern. আপনারা যখন আপনাদের লিখিত বক্তব্য দেবেন, তখনও বলতে পারেন যে climate change এর যে চ্যালেঞ্জগুলো how can we specifically address those challenges in the constitution?

জনাব মুহাম্মদ জাকির হোসেন খান (চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ): Thanks. You will consider on that. এখানে একটি বিষয়ে আমি সুযোগ নিচ্ছি। Nature base যে solution এর কথা বলি, সারা পৃথিবীতে এখন বলা হচ্ছে, এটি আসলে nature base localise solution. Community ledge solutions. এটি কিন্তু আমাদের সংবিধানে করা উচিত। অনেক সময় দেখা যায় climate solution এর নামে adoption এর নামে হোক, mitigation এর নামে হোক এমন কোনো প্রযুক্তি চলে আসে, যেগুলো আমাদের eco system এর সাথে contradict করে। আমাদের food security এর নামে এমন কিছু জিনিস এখন হচ্ছে, যেগুলো আমাদের food adulteration বাড়াচ্ছে, health risk বাড়াচ্ছে। এগুলো আমাদের সংবিধানে আসতে পারলে ভালো। কারণ food security যতটা গুরুত্বপূর্ণ, food safety আসলে তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর জন্য public health cost বেড়ে যাচ্ছে। যদি আমরা oportunity health cost হিসাব করি। যখন আমরা public health এর কথা বলি, public health আর nutrition more on আমার মনে হয় যে, আরেকটি জিনিস perspective হলো যে, curative measure এর চেয়ে prevention এর দিকে যত বেশি আমরা নজর দিতে পারব এবং constitution protection দেবে preventionকে তত বেশি আমাদের cost of investment বা আমাদের oportunity cost এর পরিমাণ কমে যাবে। সুতরাং সেটি কীভাবে incentivise করা যায়, রাষ্ট্র কীভাবে incentivise করতে পারে, যারা prevention এর দিকে investment করবে, আমাদের কৃষকরা যারা করবে বা যারা এ ধরনের organic food করবে, সেই জায়গাগুলোতে আমাদের রাষ্ট্রের একটি protection দরকার। constituional obligation থাকলে দেখা যাচ্ছে যিনি organic food করছে তাকে কিন্তু আমি protection দিচ্ছি না। পক্ষান্তরে যে chemical fertilizer দিয়ে production করছে তাকে আমি অন্যভাবে tax incentive দিচ্ছি। অন্য ধরনের কোনো incentive দিচ্ছি। আমি যদি এখন বলি renewable energyতে বর্তমানে আমরা কোনো ধরনের incentive দিচ্ছি না। পক্ষান্তরে এর উপর duty দিচ্ছি। একই সময়ে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র যারা করছে, তাদেরকে আমরা corporate tax exemption দিয়ে দিচ্ছি আগামী ২০ বছরের জন্য। তাই আমরা যখন বলছি nature base solution এর কথা তখন রাষ্ট্রের অন্যান্য কাঠামোতে যারা আছে তারা কিন্তু এটি instigate করছে না। এটি obligatory করা

উচিত। আমি যখন plastice polution এর কথা বলছি, পরিবেশ মন্ত্রণালয় বলছে, এটি state এর একটি responsibility. সেটি কিন্তু অন্য মন্ত্রণালয়গুলো যেমন শিল্প মন্ত্রণালয় অথবা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিল immediately plastic এর alternative যে productগুলো, এগুলোকে মার্কেটে available করা।

আমি মনে করি যে, Natural right কে protection দেওয়ার বিষয়টি সরকারি কর্মচারীদের এসিআর-এ include করা উচিত। এখন প্রধান উপদেষ্টার অফিসে, ক্যাবিনেটে জগে পানি দিচ্ছেন, তাহলে অন্য মন্ত্রণালয়ে কী হচ্ছে? সেটি কি তারা অনুসরণ করছে। এটি obligatory করা উচিত। যখন একজন সিদ্ধান্ত দিচ্ছে যে, তুমি খালের উপর ব্রিজ করে দিবা, কালভার্ট করে দিবা এই সিদ্ধান্তটিকে পরে আর আমরা accountable করছি না। যার ফলে দেখা যায় যে, পানি আটকে যাচ্ছে। এবারে ফেণীতে যে বন্যা হলো, এই বন্যা লক্ষ্মীপুরে হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। প্রধান যে কারণে হয়েছে যে, এলজিইডি নির্বিচারে রাস্তা ও কালভার্ট করার ফলে লক্ষ্মীপুরে পুরো জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। তাই এলজিইডির কর্মকর্তা যারা ঐ সময়ে ঐ সকল রাস্তা, কালভার্ট করেছে তাদের accountability কোন জায়গায়? সুতরাং constitutionally zero tolerant করতে হবে। যারা nature কে, natural flow কে, natural resource কে এরকম প্রতিবন্ধকতায় ফেলবে তাদেরকে accountability এর zero tolerance এ আনা উচিত। আমরা মনে করি, হাইকোর্টের dedicated court এবং প্রত্যেকটি জেলায় dedicated environmental or green tribunal থাকা উচিত। যেটি এখন আমাদের নেই । natural tribunal বলি বা environmental court বলি। যার ফলে দেখা যায়, আমরা যখন মামলা করেছি, রামপালের কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে সেটিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, বছরের পর বছর সেটির কোনো হদিস নেই। এই যে বিষয়গুলো, যেমন-কার্বন taxing এর বিষয়টি আমাদের চিন্তায় আসা উচিত। আমাদের equity তে আসা উচিত। যেমন- carbon footprint যার আসবে। এখন আমরা বলি, carbon tax করা যাবে না, পরিবহনের যাতায়াত খরচ বেড়ে যাবে। কিন্তু আমার বাসায় ৯টি রুমে ৯টি এসি লাগিয়ে রেখেছি, এমনও আছে যে টয়লেটেও এসি আছে আমার জানা মতে। এখন তাকে যদি equal rate এ বিদ্যুতের সুযোগ দেই, তাহলে করাইল বস্তিতে যে থাকে তাকেতো subsidised rate এ বিদ্যুৎ দিতে পারব না। সুতরাং প্রশ্নটি হলো, যে বেশি কার্বন নিঃসরণ করবে, একটি কার্বন লিমিটের ওপর, যেটি carbon footprintএর অতিরিক্ত হলে তাকে কিন্তু progressive রেটে সব জায়গায় amenities সরকারের নিতে হবে। So this is fundamental equitable issue, justice issue. সংবিধানে যদি এ জিনিসগুলোর একটি বেঞ্চমার্ক না করে দেই, বার বার কিন্তু right এর আন্দোলন হবে। এই যে corruption করা, হয়তো একটি রাজনৈতিক দল আসলো, প্রফেসর সুমাইয়া খায়ের, she is very knowledgeable on that. Natured anti governance যদি আমরা focus না করি যে nature কে কোনো অবস্থাতেই touch করা যাবে না, তা না হলে কিন্তু হবে না। যেমন আমাদের বাংলাদেশে সব সময় আমরা মনে করি যে, এখানে বোধ হয় যা ইচ্ছা তাই করা যাবে। বাংলাদেশ কিন্তু নদীর ওপর দেশ, এটি দেশের ওপর নদী না। আমরা পাহাড় কাটছি, আমরা নদী ভরাট করছি, এতে রাষ্ট্রটি কি আদৌ টিকবে কি না? সংবিধান থাকবে, রাষ্ট্র নেই। Finally কী দাঁড়াল? আমার মনে হয়, এই জিনিসগুলো seriously চিন্তা করা উচিত। কিছু জিনিস আছে সংবিধানে যদি বেঞ্চমার্ক দিয়ে দেওয়া হয় যে, এটি untouchable। তা না হলে হবে না। আমরা জানি, কোনো একসময় political দলগুলো একসাথে হয়ে যায়, সেখানে মানুষের protection আর থাকে না। সেই জায়গাটাতে আমার মনে হয় balance একটা থাকা উচিত।

ধন্যবাদ।

ড. শরিফ ভূঁইয়া (কমিশন সদস্য): এটি হয়ত আমাদের কাজ, এটি আমরা জানি। তবুও আপনি যে জিনিসগুলো এনেছেন, এগুলো interesting। এখানে যে বিষয়গুলো আনা হয়েছে, সবগুলোই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশের এই যে বিষয়গুলো আপনি বলছেন, সংবিধানে আনা প্রয়োজন। একটি আর্টিকেল লিখা আর সংবিধানে এই ধারণাগুলো আনা একটু ভিন্ন। এগুলো কীভাবে সংবিধানে সন্নিবেশিত হতে পারে। সেই বিষয় কী আপনি চিন্তা করেছেন? আমাদের তো একটা বড় চিন্তা যে এগুলোকে আনা উচিত। কিন্তু এগুলোকে কী form এ সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, সেই বিষয়ে আপনি কোনো চিন্তা করেছেন কি না? আপনি হয়ত আমাদের এখনকার সাংবিধানিক কাঠামোর ভিত্তিতেও বলতে পারেন। আপনি অবশ্য নূতন চাইছেন, সেই হিসাবেও বলতে পারেন।

জনাব মুহাম্মদ জাকির হোসেন খান (চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ): আমরা চাচ্ছি natural rights হিসেবে এটি আসুক। আমরা বলছি সাংবিধানিক অধিকার না, natural rights। জন লক এর এই philosophy টি আমরা যদি দেখি ১৩০০ শতক থেকে তিনি বলেছেন।

আমি নতুন বলছি বিষয়টি তা নয়, এটি ছিল। যখন ultra capitalism টি সামনে চলে আসে, তখন এটি surface এর বাইরে চলে যায়। আমরা বলছি এই natural rightsকে যদি আমরা define করি ইন্যাট, universal এবং elinable. এই তিনটি frameworkকে আমরা যদি বলি। ইন্যাট বলা হচ্ছে যে, This rights are acquired with a birth of an individual our being. Universal হচ্ছে যে, they apply to human and beings regardles of there status of circumstance. In elinable they can not the taken away or given up. এই তিনটি criteria কে ধরে যদি আমরা ব্রেঞ্চমার্কটি create করতে পারি natural rights কে এবং সেটি আমরা বলেছি

যে, যেমন-law of reason. জন লকের কথা ছিল, Natural law is the law of reason. এটি not law of the need, actually. কেন সেটি বলেছে, Human can not understand. Can understand using the rational facilities. This law obliges every one not to harm others with respect to their life, liberty and property and reason least to individual to recognized their rights equal to rights of others creating a moral obligation to respect to those rights. এই জিনিসগুলোর যে ব্যাখ্যাটা আমরা রেডি করেছি,আমরা কিন্তু দিয়েছি যে কীভাবে এটি করা সম্ভব। এটি যদি আমরা বেঞ্চমার্কে দেই, আমি আসলে বলতে চাই, কোনো বিষয়ে যখন বলি যে আপনার এটি অধিকার আছে, এই অধিকারটি কী? বেঞ্চমার্কটি কোথায়? সাংবিধানিক অধিকারের নাম দিয়ে আমরা যে কথাটি বলি, সংবিধানে এই বেঞ্চমার্কটি আসলে কোন জায়গায় cut off করব। সে জায়গাটির কিন্তু বার বার milestoneটা change হতে থাকে রাজনৈতি দলের principle অনুযায়ী। আমরা universal natural rightsকে protection এর বেঞ্চমার্ক ধরি, তাহলে কিন্তু deviate করবে না বা করলে কতখানি deviate করছে তা নাগরিকরা বুঝতে পারে যে রাষ্ট্র বা সোসাইটি কতখানি deviate করছে। So this is our understanding.

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): ড. শরীফ ভূইয়ার প্রশ্নটিই আমার প্রশ্ন। তবে আমি একটু ভিন্ন আঙ্গিকে জানতে চাচ্ছি, আপনার ব্যাখ্যাটি আমি বুঝেছি, আপনার theme হচ্ছে সংবিধানের rights base জায়গাটি territory নির্ভর। অর্থাৎ আমরা territory দিয়ে confine করেছি। nature এবং people কে ignore করে। People এবং natureকে highlights করে constitutional right based frame হওয়া উচিত ছিল। আমরা এটি territory এর মাধ্যমে মাতৃভূমি বা এই concept এর ওপর base করার কারণে অনেক জায়গায় জিনিসগুলোকে limit করে ফেলেছি, বা properly reflect করিনি। If I understand correctly. আমার প্রশ্ন, যেহেতু আপনারা এ জায়গাতে অনেক কাজ করেন যদি নির্দিষ্ট কিছু referenceসহ আমাদেরকে হেল্প করেন, লিখিততে যে এই এই clauseগুলোতে এই এই angle থেকে languageটি হওয়া উচিত। তাহলে আমাদের জন্য পরবর্তী আলোচনা সহজতর হবে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ক্যাব এর প্রতিনিধিদের কাছে ছোট্ট একটি প্রশ্ন। আপনারা সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের কথা বলেছেন। এটি কি পুরো সংসদের জন্য আপনারা বলছেন সংখ্যানুপাতিক, নাকি বিশেষ অংশের জন্য। ধরুন আগামী নির্বাচনের জন্য ৩০০ আসনে যেটি হবে, সেটি পুরোটাই আপনারা সংখ্যানুপাতিক ভোটের কথা বলছেন?

ব্যারিস্টার শাহরুখ কবীর ভূইয়া (সদস্য, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব): আমরা পুরো নির্বাচনটিই সংখ্যানুপাতিক হওয়ার কথা বলছি। তাহলে muscleman আর কালো টাকা ব্যবহারের যে সুযোগ, সেটি কোনো পার্টি বা কোন প্রার্থী করতে পারবে না। কারণ সে জানেনা যে সে এখানকার এমপি হবে কি না? এজন্য যদি party basies-এ আসে, সমস্ত নির্বাচনেই এটি করা, যা আমাদের প্রস্তাব। আর আপনি যেটি বলেছিলেন, জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি, আমরা আজকে শুধু এটি নিয়েই কাজ করেছি। আপনারা ঠিকই বলেছেন যে, আমাদের একজন জ্বালানি উপদেষ্টাই আছে ক্যাবের পক্ষ থেকে, আপনারা হয়ত জানেন, ড. শামসুল আলম স্যার। জ্বালানি নিয়ে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে আমাদের দুই দুইটি মামলা এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের গণশুনানির যে ব্যবস্থা ছিল, সেটিতে আমরা শুনানি করার কারণে আমরা যুক্তি দেখানোর কারণে এক পর্যায়ে গিয়ে সরকার সেটিকে বাতিল করে দিলেন। যার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা এখনও pending আছে। সুখের বিষয় হলো বর্তমান অন্তবর্তী সরকার আমাদের এই দাবিটি ইতোমধ্যেই মেনে নিয়েছে।

গণশুনানি করার জন্য বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমাদের যিনি জ্বালানি উপদেষ্টা, জ্বালানি সম্পর্কে তিনি বিশেষজ্ঞ এবং তিনি এটি deal করছেন, প্রফেসর শামসুল আলম সাহেব, তিনি এটি নিয়ে কাজ করছেন। এবং জ্বালানি মন্ত্রণালয় সম্পর্কে যে কমিশন করা হয়েছে সেই কমিশনে ইতোমধ্যেই আমরা ভোক্তাদের স্বার্থে ডিজিটাল যে সুবিধাগুলো আছে, যেগুলো করা দরকার সেগুলো ইতোমধ্যেই আমরা সেখানে দিয়েছি। পরবর্তীতে কমিশনের একটি মিটিংয়েও আমরা উপস্থিত হয়ে বক্তব্য প্রদান করেছি। আমাদের বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন জন কাজ করেন। আমি সাধারণভাবে বলব যে ইতোমধ্যেই বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আমাদের কিছু কিছু দাবী মেনে নিয়েছে। ভোক্তা স্বার্থেই এ কাজটি করা হয়েছে। বাংলাদেশে ক্যাবই একমাত্র সংগঠন যারা ভোক্তার স্বার্থে কাজ করে থাকে। সরকারের যে সেক্টরগুলোতে আমাদের কাজ করা প্রয়োজন সেগুলোতে আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করছি।

ধন্যবাদ।

ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক (কমিশন সদস্য) ঃ আমি ছোট্ট একটি বিষয় বোঝার জন্য প্রশ্ন করছি, আপনি বলেছেন যে, পুরোটাই পার্টি মনোনয়ন দিবে, আপনি কি মনে করেন না যে, এই পদ্ধতিতে আবার একটি serious dictatorship জন্ম নিতে পারে। তখন দলীয়

প্রধান তার slaveদেরকে মনোনয়ন দেওয়ার চেষ্টা করবে। যে তার বেশি দাসত্ব করে এ ধরনের লোকদেরকে দিবে। এরকম একটি নতুন dictatorship তৈরি হতে পারে না? যদি ঐ ধরনের system করেন।

ব্যারিস্টার শাহরুখ কবীর ভূইয়া (সদস্য, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব): এটি হতে পারে না, সেটি আমরা বলছি না। পেশি শক্তি দমানোর ব্যবস্থা হিসেবে এ রকম করার জন্য। যেহেতু যিনি প্রার্থী হচ্ছেন ঐ এলাকাতে, যেমন ধরেন ঢাকা-১৮ নম্বর আসনে। সেখানে এরকম অবস্থাটি তৈরি হয়েছে। পেশি শক্তি দিয়ে ভোট করে ফেলেছে, আর একজন ভোট করতেই পারেনি। এটিকে দমানোর জন্য অন্য আর কোনো রাস্তা নেই। কারণ আমি যখন জানব যে, আমি এ এলাকাতে নির্বাচিত হচ্ছি, আমি এ এলাকার এমপি হব। তাই আমি এখানে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করব, আমার muscleman দের ব্যবহার করার সুযোগ নিব। এটি যেন করতে না পারে। যদি আমি না জানি যে, আমি এ এলাকায় এমপি হবো কি না? এজন্যই আমরা ক্যাবের পক্ষ থেকে এই চিন্তাভাবনা করেছি। আরেকটি বিষয়, আমরা এই সংবিধান পুনর্লিখন সমর্থন করি না। যেহেতু সংস্কারের প্রশ্ন এসেছে, এটি সংস্কার করা যেতে পারে। নতুন করে লেখার পক্ষে আমরা না।

ড. শরীফ ভূইয়া (কমিশন সদস্য) ঃ এ বিষয়ে আমি আইন ও সালিশ কেন্দ্রকে এবং আপনাদেরকে বলতে চেয়েছিলাম এবং আরও যারা বলেছেন। আপনারা যদি সম্ভব হয় আপনাদের লেখনিতে এটি দিবেন। আপনারা যদি একটু ব্যাখ্যা করতে পারেন যে কেন আপনারা মনে করছেন নতুন সংবিধান প্রয়োজন নেই, বর্তমানটাকেই সংস্কার করা যেতে পারে? আপনারাতো বলেছেন, এটির কারণটি যদি ব্যাখ্যা করেন। তাহলে কাজে লাগতে পারে।

জনাব আবু আহমেদ ফজলুল কবির (আইন ও সালিশ কেন্দ্র) : ধন্যবাদ। আপনার পরামর্শটি আমরা নিচ্ছি। আমরা যেটি জানি যে, সংবিধান সংস্কার কমিশন, স্বাভাবিকভাবেই আমরা এই টার্মটিকে মাথায় রেখেই আমাদের বক্তব্য বা অন্যান্য বিষয়গুলো করব। যেহেতু আইন ও সালিশ কেন্দ্র একটি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান, আমরা চেষ্টা করছি যে, আমাদের এই কাজের অভিজ্ঞতা, এই contest এ একটি সরকারকে function করানোর জন্য সংবিধান একটি guideline। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ১৭ কোটি বা ১৮ কোটি মানুষতো এটির মধ্যে থাকতে চাই। সে ধরনের বিষয়গুলোকে আমরা মাথায় রাখতে চাচ্ছি। পুনর্লিখন বা সংশোধনের যে বিষয়গুলো আসছে, আমাদের অবস্থানটা আমরা শুরুতেই বলেছি যে, আমরা পুনর্লিখন চাইছি না। সেইভাবে আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের মতামতটি উপস্থাপন করার জন্য। নিশ্চয় কমিশন বিবেচনা করবে, বা আরো অনেকেই আসবেন, মতামত দিবেন। সেখানে আমরা সুনির্দিষ্টভাবেই আমাদের মতামত দেওয়ার চেষ্টা করছি।

ধন্যবাদ।

ড. শরীফ ভূইয়া (কমিশন সদস্য): আমার অনুরোধটি কিন্তু vise versa। যারা পুনর্লিখন চাইছেন, কেন চাইছেন। আপনি কিছুটা ব্যাখ্যাও করেছেন। যারা চাইছেন না তারাও ব্যাখ্যা করবেন, যারা চাইছেন সেটিও ব্যাখ্যা করলেন। তাহলে আমরা কারণগুলোও বুঝতে পারব।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমাদের ওয়েবসাইটেও গেলে দেখবেন যে, আমরা কমিশনের পক্ষ থেকে যেটি বলেছি সেটি হচ্ছে, সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পুনর্লিখন সবই আছে।

সাংবাদিক সম্মেলনেও কমিশনের পক্ষ থেকে যেটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেটি হচ্ছে সবগুলো অপশনই আমরা রাখছি। কারণ আমরা তো জানিনা আপনারা কী বলবেন? আজকে আপনারা বলছেন পুনর্লিখন চান না, আপনার পাশেই চেইঞ্জ ইনিশিয়েটিভের একজন বলছেন যে, পুনর্লিখন চাই। আমাদের পূর্ব কোনো ধারনা নেই। আমরা শুনতে চাই, যাতে করে আমরা বুঝতে পারি আমাদের অংশীজনদের মতামত। সেক্ষেত্রে ড. শরীফ ভূইয়া বলেছেন যে, আমরা যুক্তিগুলো যাতে আপনাদের কাছ থেকে পাই। এটি পুনর্লিখন দরকার, এই জায়গায় সংশোধন দরকার, ঐখানে সংযোজন দরকার, ঐখানে বিয়োজন দরকার। বড় আকারে তো এই বিষয়টি এসে দাঁড়িয়েছে সংশোধন না পুনর্লিখন, আপনাদের যৌক্তিকতা পেলে আমরা তাতে স মৃদ্ধ হবো এবং যুক্তিটা বুঝতে পারব।

ক্যাবের প্রতিনিধি কিছু বলতে চাইছিলেন।

ব্যারিস্টার শাহরুখ কবীর ভূইয়া (সদস্য, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ,ক্যাব): আমরা লিখিত বক্তব্যে বলেছি যে, আমরা কেন পুনর্লিখন চাচ্ছি না, আমরা সংশোধন বা সংস্কার চাচ্ছি। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিনিধি যেভাবে বললেন যে, সংস্কার wordকেই আমরা priority দিচ্ছি। পুনর্লিখনের বিষয়ে আমাদের কোনো intention বা চিন্তাই নেই। আমাদের প্রধান কথা হচ্ছে foundationটাই তো হচ্ছে আমাদের ৭২ এর সংবিধান। এটিকে বাতিল করে যদি এখন পুনর্লিখন করতে হয়, আমার মনে হয় যে, it will be a big question

to our origin. এখন আমদের যেটি দরকার সেটি হলো, সময় অনেক বদলেছে, সেই অনুযায়ী আমাদের যে সংশোধনগুলো দরকার, যা যে বিষয়গুলো মনে হচ্ছে, বা যে particular অনুচ্ছেদগুলো দেখা যাচ্ছে আমাদের public interest এর পরিপন্থী, সেগুলো আমরা সংস্কার বা সংস্থাপনের প্রস্তাবনা দিয়েছি। এটিই হচ্ছে আমাদের ব্যাখ্যা যে কেন আমরা পুনর্লিখনের পক্ষে না। আমরা আমাদের foundation কে নড়াতে চাচ্ছি না। এটির উপর ভিত্তি করে এত বছর আমাদের যা যা অর্জন ছিল বা যা আমাদেরকে এতদিন সামনে এগোতে দিচ্ছে না সেগুলোকে আমরা চাচ্ছি যে সংশোধন করা হোক। স্যার যেমন বললেন যে right to nature এর কথাটি। যে rightগুলো বা right to clean energy একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এগুলোকে আমাদের যে basic rightগুলো আছে সেগুলোতে include করা যেতে পারে। কিন্তু পূর্বের সবকিছু বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি জিনিস আনতে গেলে সেই red tape বা সেই bureaucracyতে দেখা যাবে যে আমরা আরও পিছিয়ে যাব, আগানোর চেয়ে। তাই foundationটি ঠিক রেখে আমাদের প্রস্তাবনা হচ্ছে, সংশোধন করা হোক। পরিবর্ধন, পরিমার্জন যেটিই হোক।

ধন্যবাদ।

জনাব মুহাম্মদ ইকরামুল হক (কমিশন সদস্য): Just একটু জানার জন্য। আপনি যেটি বললেন যে, right to clean energy, এটি আমরা সংবিধানে দিতে চাই, বর্তমান সংবিধানের তৃতীয়ভাগে right to clean energy দিতে চাইলেও, বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী এটি তো দেওয়া যাবে না। কারণ অনুচ্ছেদ ৭(খ) অনুযায়ী তৃতীয়ভাগে তো কোনো সংশোধনী আনা যাবে না। একটি বিষয়। দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে, কেউ যদি তারপরেও দিতে চায়, তাহলে অনুচ্ছেদ ৭(ক) অনুযায়ী এটি একটি অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। এ বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন?

ব্যারিস্টার শাহরুখ কবীর ভূইয়া (সদস্য, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব): অসলে এখন পুরো সংবিধান রিফর্মের যে explanation সেই expertism আমার নেই। আমি শুধু প্রস্তাবটি দিলাম যে এটি কীভাবে করা যেতে পারে। আমার আশা থাকবে যে, এই প্রস্তাবটি আসলে কীভাবে এই জিনিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সে বিষয়ে হয়তো আরও expert opinion নেওয়া যেতে পারে। আর যে particular issue টি বললেন, আমাদের তো আসলে সংবিধানের বিষয়ে সে রকম concentrate বা principle নেই। এটিকে যদি পরিবর্তন করে করা যেতে পারে সেই rightগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার, সেটি করা। কারণ আমি যেটি বলতে চাচ্ছি, পুনর্লিখনটি আমার মতে আনা উচিত নয়। আমাদের মূল সংবিধানটিকে রেখেই সেটি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আসলে ব্যাখ্যার জন্য জানতে চাওয়া।

সবাইকে ধন্যবাদ।

আমরা আজকে সারাদিন ধরে বিভিন্ন civil society organisation এর সাথে কথা বলেছি, আপনাদের মতামত শুনেছি, রেকর্ডিং এর সুবিধার জন্যই আমরা এই কক্ষে বসেছি, যাতে করে আপনাদের প্রত্যেকের বক্তব্য রেকর্ড করা যায়। আমাদের note taker গণ আছেন, আমাদের গবেষকরা আছেন, তারা এগুলো নোট নিয়েছেন। আপনাদের এ মন্তব্যগুলো, আপনাদের প্রস্তাবগুলো এবং আপনারা যারা ইতোমধ্যেই লিখিত প্রস্তাব দিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। আমরা আপনাদের পরবর্তী প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করব। ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাদের কাজটি করতে হচ্ছে। আপনাদের অত্যন্ত ধন্যবাদ। আপনাদের অনুমতি পেলে আজকের অধিবেশন আমরা এখানেই শেষ করব।

ধন্যবাদ।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

চতুর্থ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১২ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল ৯.৩০ থেকে ১১.০০ পর্যন্ত

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা

১।	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক	কমিশন প্রধান
২।	অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	ব্যারিস্টর ইমরান সিদ্দিকি, বার-এট-ল	সদস্য
৪।	অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫।	ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল	সদস্য
৬।	জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক	সদস্য

অংশীজনের তালিকাঃ

১। মুফতি আব্দুল মালেক (খতিব, বায়তুল মোকাররম)
২। খুশি কবির।

কার্যবাহের রিপোর্ট প্রস্তুতকারক ঃ

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সম্পাদনায়ঃ

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহের রিপোর্ট

কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনারা জানেন যে, সংবিধানের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেই কারণে, আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা ছোট ছোট আকারে অধিবেশনে মিলিত হচ্ছি যাতে করে সকলের কথা শুনার সুযোগ পাই এবং এগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সংগ্রহ করা যায়।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। ফলে আজকে এই প্রথম সভার শুরুতে আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই সেই সব শহিদদের প্রতি, যাঁদের আত্মদানের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে এবং আমরা আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় দিবেন।

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন খুশি কবির। আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে সংবিধানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আমরা অনুরোধ করব, আপনি ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে পরে আমরা অন্যদের মতামত শোনার সুযোগ পাব। তাছাড়া আপনার বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব চাইলে লিখিত আকারে আজকে অথবা আমাদের কাছে আগামী ২০নভেম্বও ২০২৪ তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

(অতঃপর অংশীজন তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

প্রথমে বক্তব্য রাখার জন্য আহবান জানাচ্ছি জনাব খুশি কবিরকে।

জনাব খুশি কবির (অংশীজন): আমি দেখছি, আমি এখানে একাই উপস্থিত আছি। আমি মনে করেছিলাম, আরো কয়েকজন উপস্থিত থাকবে। এতে আলোচনায় আরও বেশি সুবিধা হতো।

আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় আমি মনে করেছি, আমার আসা প্রয়োজন এবং বক্তব্য দেওয়া প্রয়োজন। আমি লিখিত বক্তব্য পরেই দিব। আপনারা ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে বলেছেন। আমি ২০ তারিখের মধ্যেই পাঠিয়ে দিব।

আপনারা আমন্ত্রণ পত্রতেও লিখেছেন, এই প্রেক্ষাপটটি হচ্ছে, একটি গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, আন্দোলন হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে অনেক প্রাণের বিনিময়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চাচ্ছে শুধু একটি নির্বাচন নয়, কিছু কিছু সংস্কারও করা দরকার। সেই সংস্কারের মধ্যে আপনাদের কমিশনটি হলো সংবিধান সংস্কার কমিশন । এই কমিশন নিয়ে অনেক আলোচনা, debate আছে। আমি মনে করি, যে সংবিধানই থাকুক না কেন সংস্কার সবসময় প্রয়োজন। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে সময়ের সাথে সাথে কিছু কিছু জায়গায় পরিবর্তন, সংশোধন বা কিছু সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। আমার মনে হয়, এটি একটি ভালো সময়। সার্বিকভাবে পুরোট দেখে করা যাবে। কারণ এটি কোনো রাজনৈতিক বা দলীয় সরকার না। এখানে জনগণের ভোট পাওয়ার, তারা কি চাচ্ছে, ভোট পাচ্ছে কি পাচ্ছে না, সেই বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে না। আমরা আশা করি, এখন যে সরকার আছে, তারা বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয়তা দেখবেন। সবচেয়ে বেশি হচ্ছে "প্রয়োজনীয়তা"। আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট করে বলাই আছে, "জনগণই হচ্ছে সব ক্ষমতার উৎস"। আপনারা হলেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ। আমি বিশেষজ্ঞ নই। আমি একজন মাঠ পর্যায়ের কর্মী, মাঠে কাজ করি। বিশেষ করে গ্রামীণ খেতমজুর, ভূমিহীন নারী এবং পুরুষের সাথে কাজ করি। এটিই হলো, আমার ৫ দশকের কাজের জায়গা। ঢাকায় থাকি বলে আরো অনেকগুলো পরিষদের সঙ্গে যুক্ত আছি। আমার মূল কাজ এবং মূল বিষয় হচ্ছে, গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে।

এদের সাথে কাজ করতে গিয়ে যেহেতু তাদের মানবাধিকারের বিষয়গুলো চলে আসে, মানুষের অধিকারের বিষয়গুলো চলে আসে এবং সবার অধিকারের বিষয়গুলো চলে আসে। সংবিধান হচ্ছে সবার জন্য। দেশের সকল নাগরিকের স্বার্থে, তাদের সুবিধার্থে যেন একটি রাষ্ট্র চলতে পারে, এটিই সংবিধানের মূল বিষয়। সংবিধানে এই বিষয়গুলো reflected হওয়া উচিত। বর্তমান সংবিধানে আমাদের এই বিষয়গুলো সার্বিকভাবে সবকিছুতে reflected করছে কি, করছে না- আপনারা বুঝবেন। আপনারা অনেকেই আইন বিষয়ে পড়ান বা আইন পেশার সাথে জড়িত আছেন। আইন বিষয়ে না পড়ালেও রাষ্ট্র বিষয়ে পড়ান।

আমি এখানে সংবিধানের কয়েকটি বিষয়ে কথা বলব। আমি সংবিধানটি আবার পুরো পড়েছি। আমি সংবিধানের detail-এ যাব না। কারণ আমি মনে করি, বিভিন্ন সেক্টরে যারা আছেন, তারা দেখবেন কোন clause-টি কোন জায়গায়। একটি মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে সংবিধান রচনা করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিরাট একটি বিষয় ছিল, পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের বাঙালিত্ব আর বাঙালি সংস্কৃতি। তারা বাঙালির বিষয়টি দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল, রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ করেছিল। আমরা ভাষার বিষয়ে "ভাষা আন্দোলন" করতে দেখেছি। সেখানে বাঙালিত্বের বিষয়টি চলে এসেছিল। বর্তমান বাংলাদেশের অধিকাংশই আমরা বাঙালি। প্রথম থেকেই যেটি চলে আসছে, আমাদের জাতিগত পরিচয় বাঙালি, আর জাতীয়তা বা citizenship বাংলাদেশি। প্রথম থেকেই এটি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারণ আমাদের দেশে অনেকেই আছেন যারা বাঙালি নয়, তারা সংখ্যায় খুবই কম। কিন্তু তারা এদেশেরই নাগরিক। তাদেরকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাদেরকে ignore করাটা ঠিক হবে না। যারা বাঙালি নয় আদিবাসী, অন্যভাষী বা অন্য জাতি। সে কারণেই আমি মনে করি, জাতিগত পরিচয় বাঙালি না থেকে আমার নাগরিকত্ব হচ্ছে আমি "বাংলাদেশী"। এটি আমার প্রথম একটি বিষয়।

দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি পরবর্তীতে নিয়ে আসা হয়েছিল, রাষ্ট্রধর্ম। এখন যদিও আমরা বলি, আমাদের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরে এসেছে। কিন্তু আমার মতে ও আমার চিন্তায় একটি রাষ্ট্রের ধর্ম থাকার প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্র সবার জন্য। ঠিক আমি যেভাবে বলেছি জাতি হিসেবে বাঙালি থাকা উচিত নয়, ঠিক একইভাবে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। সবাই যেন মনে করে, এই সংবিধান তাকেই reflect করছে। তার বিষয়টি আনছে। তাকেই অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এ দেশের নাগরিক হিসেবে। আমি মনে করছি, এখানে রাষ্ট্রধর্ম থাকার প্রয়োজন নেই। আমি খুব সুস্পষ্টভাবে মনে করি, সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম রাখার দরকার নেই। সংবিধানের প্রথমেই বিস্মিল্লাহির-রহ্মানির রহিম লিখে থাকি। আমার মনে হয় এটিও প্রয়োজন নেই। সংবিধান সবার জন্য থাকা উচিত। এদেশের অধিকাংশ মানুষ যে ধর্মে বিশ্বাস করে, তা কমেও যাচ্ছে না, হালকা হয়েও যাচ্ছে না। ধর্ম কোনো দিকে উপেক্ষাও হচ্ছে না। ব্যক্তিগতভাবে যে ধর্ম বিশ্বাস করে, তার বিশ্বাসটি যেন স্পষ্টভাবে থাকে। এটি সংবিধানে থাকলে বা না থাকলেও যে-যেভাবে চলছে, সেভাবেই চলবে।

আরেকটি বিষয় এখানে আনা দরকার। যেটি হলো আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা আছে ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সবার জন্য সমান অধিকার আছে এবং প্রত্যেকটি স্তরে এটি সব জায়গায় আছে। এটি উল্লেখ নাই কিন্তু আমাদের আইনে আছে। পারিবারিক আইন ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হবে। সংবিধানে পারিবারিক আইনটি নেই। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় আছে। প্রতিটি জীবনের সবার সমান অধিকার থাকবে। যা রাষ্ট্রের আইন দ্বারা পরিচালিত হবে। কিন্তু ব্যক্তি বা পারিবারিক বিষয়টি সংবিধানে নেই। এই বিষয়টি আমি কয়েকবার সংবিধান পড়ে দেখতে চেয়েছি এটি সংবিধানে আছে কি না? এ বিষয়টি সংবিধানে নেই। কারণ আমার একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, সংবিধানে বলেছে, তবে পারিবারিক আইন হবে ধর্ম দ্বারা পরিচালিত–এ বিষয়টি সংবিধানে নাই। আপনাদের সামনে বলছি, এটি আইনে আছে কিন্তু সংবিধানে নাই। আমি মনে করি, সংবিধানে যদি স্পষ্ট থাকে সর্বক্ষেত্রে যেন ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবনটিও নিয়ে আসা হয়। ধর্ম দ্বারা যেন এটি পরিচালিত না হয়। আমাদের যেমন Civil Law আছে, Criminal Law আছে, এগুলো কোনো ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হয় না। এজন্য রাষ্ট্রের আইন আছে এবং এই আইনের দ্বারা পরিচালিত হয়। আমাদের সবকিছুই সেভাবে চলে। আমি পারিবারিক আইনটিকে আলাদাভাবে চাওয়ার কারণ হচ্ছে , এতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়। এটি নিয়ে আমরা অনেকবারই অনেক সময় আলোচনা করেছি। আমার মনে আছে ৮০-র দশক থেকেই আমরা চেষ্টা করেছি একটি অভিন্ন পারিবারিক আইন করতে। মূল বিষয়টি হলো, এটি করতে গেলে ধর্মের সমস্যা চলে আসতে পারে। আমার বক্তব্য এখানে খুবই স্পষ্ট। সম্ভবত ১৯৬১ সালে আইয়ুব খান "মুসলিম পারিবারিক আইন" প্রবর্তন করেছিল। সেটি এখনো বিরাজমান। আমি আরো যদি বলি, বাংলাদেশ হওয়ার পরে "হিল্লা" নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনেকগুলো পারিবারিক আইনের পরিবর্তন হয়েছে। সেক্ষেত্রে তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তার অর্থ আমি শরীয়া আইনের মধ্যে reform আনছি। আমি কিছু reforms এনেছি, আনা দরকার। আমি এগুলোকে বলি যে, যুগের সাথে অবশ্যই দরকার। একজনের মানবাধিকার রক্ষা করার জন্য সবকিছুই সংবিধানে আনা দরকার। আমরা যেন এগুলো করতে পারি। আমাদের লিখতে কেন এতো অসুবিধা? সবচেয়ে বড় খটকাটা আসে দুটো জায়গায়, মূল একটি জায়গা হলো inheritance. হিন্দু পুরোহিত বিশেষ করে পুরুষ হিন্দু পুরোহিত নেতা যারা আছেন, তারাও এটিকে সমস্যা মনে করে। অথচ পাশের দেশ ভারত, হিন্দু প্রধান দেশ এবং সেখানে হিন্দুদের জাগরণ অনেক বেশি। সেখানে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ওদের দেশে মুসলমানদের পরিবর্তন আসেনি বা কম এসেছে। ভারতের

তুলনায় আমাদের দেশে মুসলমানদের পরিবর্তন এসেছে। Major religious যেখানে থাকে, তারা একটা সাহস পায়। আমি মনে করি, এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার populist কোনো agenda নিয়ে আসেনি। দেশের স্বার্থে এসেছে। এটি হলো, উত্তম সময়। আমাদের এখানে একটি অভিন্ন পারিবারিক আইন চলে আসতে পারে। আপনারা হয়ত বলবেন যে, এটি আপনাদের জন্য relevant নয়। আমি বলব, এটি relevant. কারণ Constitutions-এ যদি এটি চলে আসে that it also includes personal law. কিন্তু personal laws-এর জায়গায় এই বিষয়টি চলে আসলে অভিন্ন পারিবারিক আইন করাটা অনেক বেশি সহজ হবে।

যেটি আমরা সবাই ৪ দশকের বেশি এটি নিয়ে আলোচনা করছি, আন্দোলন করছি, কথা বলে যাচ্ছি। আমাদের Constitutions-এ Ombudsman-এর কথা আছে। আমি খুব specific বলছি, ৭২ থেকে আজ ২০২৪ সাল পর্যন্ত এটির কোনো প্রতিফলন ঘটতে দেখিনি। তাঁর ভূমিকাগুলো কী, সেটিও করা হয়নি। এটি খুবই প্রয়োজন। এরকম একটি যদি Constitutional Post যারা Government-এ থেকে আসবে। তারা দেখতে পারবে, আসলে দেশের সবকিছু সঠিকভাবে চলছে কি না? আমার মনে হয়, আপনারা এ বিষয়টি দেখতে পারেন। আর এটিকে কীভাবে আরেকটু যুগোপযোগী করা যেতে পারে। এটিতে খুবই অল্প দু-তিনটা লাইন আছে। সেটিকে আমরা কীভাবে করতে পারি পরবর্তীতে যখন পার্লামেন্ট বসবে, আইন পাস হবে। তারা যেন সেখান থেকে করতে পারে। আমরা এগুলো দেখতে পারি। অনেকগুলো জায়গায় লেখা আছে, যেমন- emancipation, কৃষক-শ্রমিকদের জন্য কাজ করা, নারীদের জন্য কাজ করা। স্থানীয় সরকারের ভূমিকাগুলো আছে। আমার মনে হয়, এগুলোকে আরেকটু বেশি শক্তিশালী করা দরকার। আর আবার যদি আমি Ombudsman-এ ফিরে যাই, সেখানে আমাদের National Human Rights Commission-কে শক্তিশালী করা অথবা Ombudsman-কে শক্তিশালী করা দরকার। National Human Rights Commission একটি Constitutional Commission. এটি যেন independent থাকে, সরকারের সাথে যুক্ত নয়। অনেকগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটেছে, ঘটে। সেগুলো থেকে কিন্তু রেহাই পেতে পারে। সেখানে একটি ভূমিকা থাকতে পারে। তাদেরকে আরও বেশি শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে হবে। আমার মনে হয়, Election Commission-এরও অনেক বেশি ভূমিকা থাকা দরকার। আমরা সবসময় বলি যে, Election Commission-এর দাঁত নাই। তারা আছে শুধু election করার জন্য। Election করা শুধু গণতন্ত্র না। একদিন আমরা ভোট দিয়ে আসলাম, সেটি গণতন্ত্র না। কীভাবে হলো, ঠিকভাবে হলো কি না? মানুষ সঠিকভাবে তাদের নিজের মতামত দিতে পারল কি না? এ বিষয়গুলো দেখতে হবে। এর পরবর্তীতে আমি নিয়ে আসছি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করা। স্থানীয় সরকারকে আরো শক্তিশালী করার বিষয়টি আমাদের সংবিধানে আছে। সংবিধানের এই জায়গায় detailed out করার তো কোনো scope নাই। সংবিধান দিকনির্দেশনাগুলো দেয়। এটি আরেকটু শক্তিশালী করতে হবে। পরবর্তীতে যখন এগুলো আইন ও পলিসি হিসেবে আসবে।

আমাদের অভিজ্ঞতায় এবং আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বলছি, যখনই একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বা যে কোনোভাবে একটি non-party সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে, কিছু ইলেকশনের সময় rigging হয় না যে, সেটি না। মাস্তানি হয় না যে, সেটি না। সেগুলো কিছু হয়। কিন্তু তারপরেও তুলনামূলকভাবে একটা unbiased ভাবে চলে আসতে পারে। আমি দেখছি ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। ১৯৯০ সালে যখন শাহাবুদ্দিন ক্ষমতায় আসলেন, তাঁর অধীনে প্রথম '৯১-তে নির্বাচন হয়েছিল। তারপরে '৯৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে partisan সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়েছিল, যেটি প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তারপর ১৯৯৬ সালের জুন মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করা হয়েছিল। ২০০১-এ করা হয়েছিল। আর ২০০৯-এ করা হয়েছিল। তখন দেখা গেছে, কিছু মানুষ ভোট দেওয়ার একটি উৎসাহ পেয়েছিল। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল করার পরে মানুষের উৎসাহটাও কমে যায়। আমি জানি না, এটি Constitution-এর মধ্যে পড়ে কি না বা এটি Election Commission-এ পরে। আমি এখানে ফ্লোর পেয়েছি বলেই বললাম। আমি মনে করি, আনুপাতিক হারে যে সংসদগুলো আছে যেমন: আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলঙ্কা বা নেপাল। এ দুটো দেশে ভিন্ন ভিন্ন টাইপের আছে। কিন্তু শ্রীলঙ্কা, নেপাল, সাউথ আফ্রিকা এবং ইউরোপের অনেকগুলো দেশে আছে। এর বাহিরেও অনেক দেশে আছে। আমি এগুলো সম্পর্কে জেনেছি। এটি হলে অনেক ক্ষেত্রে যেমন কিছু কিছু ব্যক্তিদের voice-ই আসতে পারে না সেখানে এগুলোর একটা balance পাওয়া যায়। আমি এই বিষয়টা আনতে চাচ্ছিলাম। এখানে এটা নিয়ে আসা দরকার। আমার মনে হয়, আনুপাতিক হারে হলে, each party- র মধ্যেও থাকতে পারে যে কত শতাংশ কোন কোন sector থেকে আসতে পারে, তাহলে অনেক বেশি representative হয় এবং আরো মানানসই হয়। Problem সবগুলোতেই আছে, সব ধরনের পদ্ধতিতে আছে। কিন্তু এগুলোতে আমরা দেখতে পারি Who is the best possible? আমার ১৫ মিনিট সময় শেষ হয়েছে কি না; আমি জানি না।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : আরো দু-একটি বিষয় থাকলে আপনি যুক্ত করুন।

খুশি কবির (অংশীজন): আমি ধর্ম নিরপেক্ষতার বিষয়ে কথা বলেছি। সেখানে কিন্তু freedom of religion আছে। সেটি সবার

জন্য প্রযোজ্য। আমাদের constitution-এও freedom of religion আছে। সেখানেও সবার জন্য সমান বলা হয়েছে। Islamic State Religion-এর দেশগুলোতেও বলা হচ্ছে , অন্য সব ধর্মকে সমানভাবে সমিহ করা। কিন্তু এটি হয় না। সমানভাবে ধর্ম পালন করতে পারবে কিন্তু কোনোভাবে কোনো বৈষম্য বা কিছু থাকবে না। এটি কিন্তু সবসময় হয় না। এই বিষয়গুলো আছে। আমি আরো details যদি point পাই, সেটি পরবর্তীতে আমি লিখিত আকারে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিব। আমি মনে করছি, এই বিষয়গুলো সবচেয়ে প্রাধান্য পাক। এগুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এগুলো আপনারা দেখবেন। আজকে আরো অংশীজন থাকলে তাদের মতামত কী ছিল। আর অন্যান্য গ্রুপ বা গোষ্ঠীদের সাথে যে বসেছেন, তাদের কাছে কী কী আসছে, সেটাও জানি না। আমি দেখেছিলাম, জাতীয় পর্যায়ের একটা পলিসি তৈরি করার পরে আইন করা হয়েছিল। সেটি আমার কাছে সবচেয়ে বেশি participatory মনে হয়েছিল। আপনারা যদি সময় দেন, তাহলে আমি দুই মিনিটে বলতে পারি। সেটি ছিল ভূমি সংস্কার কমিশন। আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, আপনারা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সবার মতামত চাচ্ছেন। আপনারা সবার কাছে থেকেই মতামত পাচ্ছেন। আরও কয়েকজন হয়ত আপনাদের কাছে প্রস্তাব দিতে পারেন বিভাগীয় পর্যায়ে আলোচনা করা। বিভাগীয় পর্যায়ে আলোচনা খুবই প্রয়োজন। সঠিকভাবে কারা আমন্ত্রণ পাচ্ছেন সেটি যদি ঠিক না থাকে এবং আর conduct কীভাবে করা হচ্ছে, এখানে manipulateও হতে পারে। যেহেতু আমি অনেকগুলো প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রাম চালাই। আমি সেখানে দেখেছি, আমি যেটি আনতে চাচ্ছি সে জায়গায় সবাইকে নিয়ে আসতে পারি। এটি আমার manipulative.

আপনাদের কমিশনে এটি নিশ্চয়ই চাচ্ছেন না। কীভাবে সবাইকে আনা যেতে পারে, সবার মতামত যেন স্পষ্টভাবে বলতে পারে, সেটি যেন আপনারা জানতে পারেন। ১৯৮৩ সালে যখন Land Commission করা হয়েছিল। আমি এতে খুবই জড়িত ছিলাম। আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ খানের নেতৃত্বে মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী। তাঁরা কয়েকটি ধাপে কাজ করেছিলেন। তাঁরা একটি ফর্ম করেছিলেন। কারণ তখন তো ইন্টারনেটের যুগ ছিল না। Social media-সহ অন্যান্য connectivity গুলো ছিল না। তখন ১৭টি কৃষক সংগঠনের মধ্যে সাংঘাতিক ইউনিটি ছিল। আমরা বুঝতে পেরেছি। তারা এই ফর্মগুলো নিয়েছিল। সব এনজিও-তে তখন মাইক্রোক্রেডিট ছিল না। এনজিওদের ভূমিহীন সংগঠন ও ভূমিহীনদের সাথে কাজ করারও একটি বিরাট প্রক্রিয়া ছিল। আমরাও অনেককে নিয়েছিলাম গবেষক হিসেবে। বিশেষ করে যারা ভূমিহীন কৃষক। এছাড়া শুধু অর্থনীতি না ইতিহাস বিষয়েও অনেকে ছিল। এই ফর্মগুলো সবার মধ্যে বিতরণ করে, মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করে প্রচুর আলোচনার মাধ্যমে ফর্মগুলো পূরণ হয়েছিল। অনেক ফর্ম এসেছিল। যেটি আপনাদের হয়তো এখন অনলাইনে চলে আসছে। এটি খুবই ভালো। ফর্ম থাকলে ওটি random বা rumbling হয় না। একটি সুনির্দিষ্ট পয়েন্ট আকারে সবাই নিয়ে এসেছিল। আপনারা যেটি করছেন, পৃথক সব সেক্টরের সাথে বসা। সেটিও তাঁরা করেছিলেন। আলাদা আলাদা সেক্টরের সাথে বসেছিলেন তাদের মতামতের জন্য। পরে মাঠেও গিয়েছিলেন একদম গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত। শুধুই বিভাগীয় পর্যায়ের সম্মেলন না, মাঠ পর্যায়ের একদম কায়িক শ্রমজীবীদের সাথে আলাপ করেছিলেন। ভূমি সংস্কার বলতে তারা কী চিন্তা করছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় তারা গিয়েছিলেন। এটি খুবই অংশীদারিত্বমূলক ছিল। আমার কাছে মনে হয়, এটি সবচেয়ে বেশি অংশীদারিত্বমূলক ছিল। আইনের মধ্যে অনেক ফাঁক আছে, অনেক দুর্বলতা আছে। এগুলো পরিবর্তন হওয়া দরকার। এটি ভিন্ন একটা বিষয়। আমরা চেষ্টা করছি সব জায়গায় বলতে যে, ভূমি নিয়েও একটি কমিশন করা উচিত। কারণ এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি, জলাশয় ও বন নিয়ে ভূমি। এটি প্রক্রিয়া হিসেবে বলছি। আর আমরা করেছিলাম National Environment Management Action Plan, সেখানেও আমরা স্কুলসহ সব জায়গায় ফর্ম পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সম্ভবত ১৯৯৪ বা ৯৫ সালের দিকে। সেখানেও আমাদের সরকার অংশগ্রহণ করেছিল। সেখানে সবার মতামত ছোট বাইট করা হয়েছিল। তখন শুধু বিটিভি ছিল। সরকারের অর্থ থেকে করা হয়েছিল। প্রত্যেকটা ইউনিয়ন পরিষদ, স্কুলসহ সব জায়গায় ফর্ম পাঠানো হয়েছিল। আর আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। বিভিন্ন সেক্টর থেকে আমরা এটি করেছিলাম। এটিতেও আমরা খুব অংশীদারিত্বমূলক একটি action plan নিতে পেরেছিলাম। আমি কিছু উদাহরণ দিলাম। আপনারা এটি অবশ্যই করছেন। আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সংবিধান সম্পর্কে আমার মূল বক্তব্য হলো নতুন করে সংবিধান রচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো সময় হয়ও না। কোনো দেশের সংবিধানে যেটি থাকে, নিশ্চয়ই সংস্কার করা হয়। নিশ্চয়ই কিছু যোগ করা হয়। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে যেখানে পরিবর্তন করা দরকার, করবেন।

আমাকে শুনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, খুশি কবির।

আপনারা কেউ প্রশ্ন করতে চান?

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): ধন্যবাদ আপা।

আমার ছোট্ট একটি জিজ্ঞাসা ছিল জানার জন্য।

National Human Rights Commission নিয়ে যেটি বললেন, এখন তো সংবিধানে কিছু লেখা নাই। আপনি National Human Rights Commission-এর independence চেয়েছেন. যাতে strongly কাজ করতে পারে।

আপনি কী কোনো পরামর্শ দেবেন যে, সাংবিধানিক কোনো পদ করে দেওয়া বা সাংবিধানিক কোনো বিধান করা। দুটো পদ্ধতি হতে পারে। একটা হতে পারে যে Human Rights Commission নিয়ে কোনো provision দেওয়া অথবা এই post-টিকে Constitutional Post করা বা এ ধরনের কোনো কিছু আছে কি না?

খুশি কবির (অংশীজন) : আমি যেটি আগেই বলেছি যে, Ombudsperson -এর role-টিকে যদি আমরা clear করতে পারি, যেটি সংবিধানে আছে। কিন্তু ১৯৭২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত এই ৫২ বছর আমরা ভুলেই গেছি যে, এটি আমাদের সংবিধানে আছে। যদি আমরা সেটি করি তাহলে Ombudsperson-এর সাথে সাথে National Human Rights Commission independent হতে পারে Constitution-এ। আমি শুধু মনে করছি যে, Constitution-এ না থাকার জন্য আমরা Ombudsperson করিনি। আর যেটি করেছি, একটা National Human Rights Commission. আসলে সেটিতে তাদের কোনো ভূমিকা আমি দেখছি না। ওদের সাথে কাজ করার সুযোগের চেষ্টা করেছি অনেকবার। কিন্তু তারা কিছু একটা রিপোর্ট বা কিছু একটা পরামর্শ দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই এবং কোনো ভূমিকাও তেমন রাখে না।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক (কমিশন সদস্য)**:** আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন যে, আপনি proportional representation-এ বিভিন্ন sectorial representation- এর কথা বলেছেন। What do you mean by this? Political process-এ আপনি cross section-কে means করছেন কি না?

খুশি কবির (অংশীজন): Representation একটি পার্টি দিবে। এটি সংবিধানে থাকতে পারবে না। কিন্তু আমি just বলছি as a porcess. Proportional representation হলো যে পার্টি যত শতাংশ ভোট পায়, সে অনুপাতে তার আসন থাকে পার্লামেন্টে। এখন যদি আসন থাকে, যেটি আমি অনেকগুলো দেশে দেখেছি। বিশেষ করে নেপালে আমি খুব ভালোভাবে দেখেছি। জার্মানিতেও আমি খুব ভালভাবে দেখেছি। সুইডেনেও দেখেছি। ওখানে যেটি করে যে, পার্টি থেকে women representation কত থাকবে? আমরা জানি যে, অনেক জায়গায় প্রায় ৫০ শতাংশ women representation নিয়ে আসে। তারপর Indigenious Communities, যে কমিউনিটিগুলো সবচেয়ে বেশি, যে-সব গোষ্ঠী পিছিয়ে আছে যাদের কথা বলার অধিকার নেই। সংসদে তারা যেন এই issues-গুলো উঠাতে পারে যখন আইন-প্রণয়ন করা হয়। সবকিছু যেন উপেক্ষা করা না হয়, ভুলে না যাওয়া হয়। মাথায় নেই দেখে যেন এটি বাদ পাড়ে না যায়। এটি পার্টি থেকেই করতে হবে proportional representation-টি। Constitution-এ এটি থাকতে পারে না কিন্তু এটি Election Commission-ও নির্ধারণ করতে পারে। কিছু কিছু বিষয় কিন্তু merge হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি মনে করছি যে, proportional representation-টি থাকলে এটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তখন চপা প্রয়োগ র করা যেতে পারে দলগুলোকে যে, তোমরা যতগুলো আসন পাচ্ছ, তার মধ্যে যেন এরা এরা representation পায়। এটিই আমি বলতে চেষ্টা করেছিলাম।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান)**:** ধন্যবাদ, আমরা এখন শুনব মুফতি আব্দুল মালেক-এর কাছ থেকে। তিনি খতিব, বাইতুল মোকার্‌রম-এর। আমি আশা করছি, ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন। আপনি প্রস্তাবগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে আজকে অথবা ২০ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবেও জমা দিতে পারবেন।

মুফতি আব্দুল মালেক (অংশীজন) : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

আমি প্রথমেই একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আসলে যে কোনো কারণেই হোক আমি দাওয়াত নামাটা পেয়েছি একদিন আগে। আর একদিন সময় ছিল সেদিন পূর্বনির্ধারিত এবং নতুন করে কাজ এসেছে। দেশি-বিদেশি অনেক মেহমান এসেছিলেন, যাঁর জন্য আমি সময় পেয়েছি মাত্র একরাত। অতি সংক্ষেপে আমি কিছু মৌলিক প্রস্তাব লিখে এনেছি। এটি জমা দিব ইনশাল্লাহ। যেহেতু সময় দিলেন, ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ কাছাকাছি। আরেকটু সময় পেলে আমি বিস্তারিত লিখিত দিব।

প্রথমই আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন-এর শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদেরকে এই মহৎ কাজের, এই নেক কাজের নিয়ত করার তৌফিক নসিব করেছেন যে, একটি সংস্কার দরকার। এরপর সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে আমাদের কমিশন প্রধান মহোদয়ের শোকর আদায় করছি। আল্লাহতায়ালা সবাইকে তৌফিক দান করেন, হিম্মত দান করেন এবং এই জিম্মাদারী ভালোভাবে আদায় করার তৌফিক দান করেন, আমিন।

যে কথাগুলো এখানে লেখা হয়েছে, আমি শুধু দু-একটি কথা বলছি। সেটি হলো আমাদের স্বাধীনতার ৬০ বছরের কম সময়ের মধ্যে অনেকগুলো সংশোধনী সংবিধানে আনতে হলো। এত সংশোধনীর প্রয়োজন হলো কেন? এরপরও আবার এখন সংস্কারের প্রয়োজন

মনে হচ্ছে। এজন্য সংবিধানে কী কী দুর্বলতার দিকগুলো আছে, ওগুলো চিহ্নিত করে যদি সংস্কার কাজটা করেন, ইনশাল্লাহ আশা করি, সংবিধানে এত বেশি হাত দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। এমনি তো মানুষের রচনার মধ্যে পরিবর্তন, পরিবর্ধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এত বেশি পরিবর্তন হবে না, যদি মৌলিক বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা হয়। কোনো সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে, সংস্কারের ক্ষেত্রে মৌলিক নীতি যাই লিখিত থাকুক বা অলিখিতভাবে স্বীকৃতগুলোকে যদি লক্ষ্য রাখা হয়, এত সংশোধনের প্রয়োজন হওয়ার কথা না। যেমন: একটি বিষয় হলো সংবিধানের মধ্যে অস্পষ্ট কথা না রাখা। কোনো ধারা, কোনো পরিভাষা শব্দ যদি অস্পষ্ট ব্যবহার হয় এটি নিয়ে পরে কথা উঠে, বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সেজন্য আবার সংশোধনী দরকার হয়। এরকমভাবে সংবিধানে যদি দলীয় কোনো চিন্তা, ব্যক্তিগত কোনো চিন্তা এবং জনগণের চিন্তা-চেতনার সাথে যায় না, এমন কিছু চাপিয়ে দেওয়া হলে বিতর্কের সৃষ্টি হবে এবং পরিবর্তনের কথা আসবে। তখন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। সংবিধানে খুঁটিনাটি বিষয় প্রবেশ করানোর দরকার নাই। মৌলিক বিষয়গুলো যেন থাকে। খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর জন্য তো অন্য ব্যবস্থা আছে। যেটি পরিবর্তনশীল, যখন প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হবে তখন আবার পরিবর্তন করতে হবে। এ ধরনের কয়েকটি আমি লিখেছি। মূলনীতিগুলো যেন ভালোভাবে লক্ষ্য করা হয়। বিশেষ দল, বিশেষ ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা থেকে, তাদের সীমিত মতামত থেকে তো সংবিধানকে ঊর্ধ্বে রাখতেই হবে। এটি খুব জরুরি। এটি একটা আমার খেয়াল। আর আরেকটা হলো, যতদূর আমার মনে পড়ে ২০১৭ সালে সম্ভবত আমাদের কমিশন প্রধানের তত্ত্বাবধানে একটা জরিপ চালানো হয়েছিল এ দেশের জনগণের উপর যে, তারা কী চায়? দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় সেপ্টেম্বর মাসেই রিপোর্ট এসেছিল শরিয়া আইন এবং গণতন্ত্র দুটিই চায় জনগণ। এটি একটি বাস্তব কথা। যেখানে ৯১ ভাগের বেশি মুসলমান, তারা শরিয়া আইন এবং গণতন্ত্রকে চাইবে এটি হতেই পারে। স্বাভাবিক বিষয়। ওই রিপোর্টটিকে যদি আমরা সামনে রাখি, যেটি সংবিধানের মূল থাকা দরকার, যে-সব বিষয় কোরআন সুন্নাহর মধ্যে স্পষ্টভাবে বক্তব্য আছে, ওটাই হলো সংবিধানে লেখা থাকুক বা না থাকুক, এটিই হলো মূল। কোনো মুসলমানদের, মুসলিম দেশের সংবিধানে এটিই হলো মূল। এর আলোকে সবই হবে। এখন অনেকের ইসলাম শব্দ শুনলে, শরিয়া শব্দ শুনলে অমূলক একটি ভীতি অনেকের মধ্যে কাজ করে। তাহলে অন্য ধর্মের লোকদের কী হবে? অন্য ধর্মের লোকরা সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা, সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা ইসলামি হুকুমত যে দেশে আছে পাবে, যদি বাস্তব ইসলাম হয়। বলি না যে, খণ্ডিত ইসলাম। যেখানে বাস্তব ইসলাম, ইসলামি শরিয়া বাস্তবায়িত হবে।

এমনকি যদি পুরোটা বাস্তবায়ন না করে শুধু অমুসলিমদের হক, অমুসলিমদের অধিকারের অংশটুকু ইসলামি শরীয়তে যা আছে তা প্রয়োগ করে দেওয়া হলে ওই দেশে সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা, সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা পাবে অমুসলিমরা। আমি ইচ্ছে করে সংখ্যালঘু শব্দটি বলিনি। সংখ্যালঘু কেন? যদি সংখ্যায় তারা বেশিও হয় আপনি ইসলামের ইতিহাসে দেখেন, মুসলিম দেশ এবং যেখানে মুসলিমদের হাতে ক্ষমতা যেখানে মুসলিমদের সংখ্যা কম, অমুসলিমদের সংখ্যা বেশি। এই সংখ্যালঘু মুসলিম যারা ক্ষমতায় আছে, তাদের হুকুমত, নেতৃত্ব সবই মেনে নিচ্ছেন অমুসলিমরা। কারণ তারা দেখছে যে, অমুসলিমরা পিছনে থাকলে সবসময় তারা শান্তিতে আছে, নিরাপত্তায় আছে সব সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। সেজন্য আমি মনে করি, ওই জরিপটির যে ফলাফল এসেছে, ওটি সামনে রাখা উচিত। আল্লাহতাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন।

কোনো একটা দেশ যে অস্তিত্বই এটি লাভ করুক, যে প্রেক্ষাপটেই অস্তিত্ব লাভ করুক, যে শিরোনামেই অস্তিত্বতেই লাভ করুক এটি আমাদের জানা থাকতে হবে যে ভূখণ্ডের খালেক, মালেক হলেন আল্লাহতায়ালা এবং যারা শাসক, তারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি। তারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করবে। সেই বান্দা মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক। তাদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করবে। এটি হলো রাষ্ট্রের শাসকের কাজ। দস্তুর আরবি শব্দ আমি বললাম। তার মানে সংবিধান। সংবিধানের মধ্যে ওই বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। সূরা নিসার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন, "ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রসুল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম"। অর্থ-"আল্লাহর আনুগত্য কর। আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য কর। ওলিল-আমরের আনুগত্য কর"। ওলিল-আমর কারা? ওলিল-আমর হচ্ছে দুই গ্রুপের লোক। এক হলেন, যাদের কাছে এলেম আছে, ওহির এলেম আছে, কোরআন-সুন্নাহর তারা। আরেক গ্রুপ হচ্ছে, যাদের হাতে শাসন ক্ষমতা আছে, তারা। কোনো সময় দু-পক্ষেই এক হয়ে যায়। যেমন: ইসলামের শুরুর দিকে খেলাফতের সময় যিনি খলিফাতুল মুসলিমিন, যিনি শাসক, তিনি কোরআন সুন্নাহর আলেম। কখনো এরকম দেখা যায়, যিনি শাসক, তিনি কুরআন সুন্নাহর বিজ্ঞ আলেম না। তখন তিনি বিজ্ঞ আলেমদেরকে সঙ্গে রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। যে-কোনো মুসলিম দেশের ভিত্তি হবে আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য। অতঃপর এই দুই আনুগত্যের গণ্ডির ভিতর থেকে, যারা ওলিল-আমর ক্ষমতাশীল, যাদের হাতে ক্ষমতা, ক্ষমতাবান তাদের আনুগত্য করা। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে যেন সেই তৌফিক দান করেন। ওয়া আখেরি দাওয়না আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

অনেক ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, মুফতি আব্দুল মালেক।

আপনি আজকে একটা লিখিত দিয়ে যাচ্ছেন। আপনি ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আরো বিস্তারিত পাঠাবেন। আমরা এতো স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজ করছি। সরকারের পক্ষ থেকেই আমাদের খুব বেশি সময় দেওয়া হয়নি। আমাদের সময় এবং সুযোগ থাকলে দীর্ঘ সময় নিয়ে আরো বিভিন্ন দিক দেখা যেত।

মুফতি আব্দুল মালেক (অংশীজন): আমি কি একটি প্রশ্ন করতে পারি? কমিশনকে কী পরিমাণ authority দেয়া হয়েছে? এ বিষয়ে কোনো লিখিত কিছু আছে, কতটুকু সংস্কার বা সংস্কারের ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে কি না বা সীমিত একটি গণ্ডি ঠিক করে দেওয়া হয়েছে কি না?

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : সরকারের পরিপত্রে সুস্পষ্টভাবে যেটি বলা হয়েছে, আমরা সংস্কারের ব্যাপারে কমিশনের পক্ষ থেকে কিছু recommendation দিব। ফলে আমরা যেটি করছি কমিশনের পক্ষ থেকে সকলের মতামত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিচ্ছি। গতকালও আমরা বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আজকে সারা দিন বিভিন্ন সিভিল সোসাইটির ব্যক্তিদের ও অন্যান্য গ্রুপগুলোর সাথে কথা বলব। তার ভিত্তিতে আমরা কিছু recommendation দেওয়া। সরকার আমাদের কাছে সেটাই চাচ্ছেন এবং আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে recommendation-গুলো সরকারের কাছে দিব। বাস্তবায়নের পথ সরকারের, এটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সেটার দায়িত্ব কমিশনের নয়।

জনাব ফিরোজ আহমেদ (সদস্য) : ধন্যবাদ।

আপনাদের দুজনের কাছেই জানার জন্য দুটি প্রশ্ন করব। মুফতি আব্দুল মালেক বলেছেন যে,

মৌলিক নীতি অটুট থাকলে সংবিধান অত ঘন ঘন পরিবর্তনের দরকার পড়ে না।

আপনি যদি একটু স্পষ্ট করে বলতেন মৌলিক নীতির বিষয়গুলো কী কী হতে পারে? একটু সংক্ষেপে যদি আমাদেরকে বলতেন। জনাব খুশি কবির, আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে কথা বলেছেন। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে যদি সুস্পষ্ট করে বলতেন বা লিখিত বক্তব্য দিতে পারেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে বিধিটি ছিল এবং যেটি বাতিল হয়েছে, সেটি কি যথেষ্ট? নাকি আসলেই এটিতে আরো কিছু গুণগত পরিবর্তন দরকার?

মুফতি আব্দুল মালেক (অংশীজন): আমি এ বিষয়ে লিখিত আকারে দিব।

জনাব খুশি কবির (অংশীজন): ওটিতে তো পরিবর্তন দরকার। কেননা অতীতে যে অভিজ্ঞতাগুলো হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে। তারা যে কী করেছে তিন মাসের জন্য এবং মূল ছিল নির্বাচনটি কীভাবে তারা করেছে। সেটির অভিজ্ঞতার আলোকে তো কিছু Rules of Business-এ তাদের Rule-গুলো আরো clear করতে হবে। এ বিষয়টি দরকার। তাদের হাতে কতটুকু কোন ক্ষমতা থাকতে পারে। ইলেকশন কমিশন যদিও ইলেকশনটা করে কিন্তু এটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করলে ইলেকশন কমিশন যদি independence থেকে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে তাহলে হয়ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে এই ৫০ বছরের অভিজ্ঞতায় যেটি দেখেছি যে, Election Commission independent হয় না, আর করতেও দেওয়া হয় না। এটিকে ঠিক করতে হবে। আমি অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যখনই নির্বাচন হয়, তখন একটি change আসে। আর যখন পার্টির অধীনে ইলেকশন হয়, তখন change আসে না। আমি একটি খুব simple বিষয় দাগ দিলাম। কিন্তু অবশ্যই এগুলো নিয়ে আলোচনা অনেক করতে হবে, আরো গভীরে দেখতে হবে এবং এটি বুঝতে লাগবে। আমি জানি যে, আরো একটা কমিশন আছে। যাঁরা Election Commission নিয়ে কাজ করছে। Election Commission কতটুকু একেবারে independent হতে পারবে, আর কত স্বাধীন বা শক্তিশালী হবে, এটি অনেকটা নির্ভর করে Election Commission-এর উপর। আমি ভারতের উদাহরণ সব সময় দিতে চাই না। কিন্তু যখন Election Commission-এ একজন Justice ছিলেন, তখন তিনি একটি ভূমিকা নিয়েছিলেন। এখনকার ভূমিকার কথা বলছি না। তিনি তখন একটি ভূমিকা নিয়েছিলেন। সে-সময় Election Commission দেখিয়েছে যে তারা independent। সব সময় এটি হয় না। এই কারণেই আমি এই প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম যে পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং আমাদের বর্তমানে যে পদ্ধতিটি এখন বিরাজমান, সেখানে কেবল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দেখেছি change এসেছে। আর না হলে কোনো সময় change আসেনি। আমি যদি বলি change আসেনি কেন, কেউ চায়নি। এটি যদি ঠিক থাকতো তাহলে গণঅভ্যুত্থানটি হতো না। আর গণঅভ্যুত্থানে সবাই অংশগ্রহণ করত না। অবশ্যই manipulated হয় যখন Partyism Government থাকে। আমি জানি না, আমি উত্তর দিতে পেরেছি কি না; এটি পড়ে আমি আরেকটু details লিখে দিব।

জনাব ফিরোজ আহমেদ (সদস্য): আমি শুধু জানতে চাচ্ছি যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানটি যে ছিল, সেটি যথেষ্ট কি না:

জনাব খুশি কবির (অংশীজন): না, সেটি যথেষ্ট না।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): মুফতি আব্দুল মালেক, আপনার অগাধ জ্ঞান ইসলামিক বিষয়ে। আপনার থেকে কিছুটা আমার নিজের eclarification এবং কিছুটা বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে জানার জন্য। সেটি হলো, আপনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন। বহু অতীতে আমাদের ইসলামের ইতিহাসে বহুদেশে মুসলমানরা শাসক হওয়ার পরেও majority অন্য ধর্মালম্বীদের উপরে ন্যায়বিচার করেছেন এবং বিভিন্ন দেশেও এটির বাস্তবায়ন হয়েছে এবং আমরা দেখেছি, নিরাপত্তা বিধান করতে তাঁরা strictly অনেক জায়গায় সমর্থ হয়েছেন। আপনি আবার একটা কথা বলেছেন, যেহেতু আমরা মুসলিম majority দেশ। Muslim majority হওয়ার কারণে আমাদের শরিয়া আইনটি হওয়া প্রয়োজন বা সংবিধানে ওভাবেই reflect হওয়া উচিত।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, Majority-Minority কি একমাত্র criteria কি না- আমাদের দেশের সংবিধানে শরিয়ার বিষয়টি incorporation করার জন্যে। আমি example-টি আপনার পয়েন্টে বললাম।

দ্বিতীয়ত হচ্ছে, আমাদের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে অবস্থানে আছি, সেখানে ইসলামিক বিধিবিধানগুলো সামাজিকভাবে এবং সবার মধ্যে গ্রহণযোগ্যভাবে একদম straight শরিয়া principal না হয়ে অন্য কোনো পন্থায় incorporation করা যায় কি না; যাতে আপনার aspiration of general population ধর্মীয় contest-এ এবং অন্য ধর্মাবলম্বী যারা আছেন, তারাও যেন ফিল করেন আমাদের এখানে বৈষম্যের কোনো সুযোগ নেই। একটা হল ধর্মীয় নাম থাকলেই এক ধরনের মানুষের মধ্যে ভয়ভীতি কাজ করে। আরেকটা হলো, বিধানগুলো এমনভাবে আছে যে, বিধানের উপর কোনো আপত্তি নেই। সংবিধানে আমরা এমনভাবে চিন্তা করতে পারি কি না; ছোট্ট একটি example দেই। ইনসাফ ইসলামের একটা মৌলিক বিষয়। কিন্তু ন্যায়বিচার শব্দটি আমাদের সংবিধানে আছে সামাজিক ন্যায়বিচার হিসেবে। এভাবে শব্দগত অনেক বিষয় দিয়ে আমাদের সংবিধানকে সার্বজনীন করার সুযোগ আছে কি না; ইসলামি বিধানগুলো।

মুফতি আব্দুল মালেক (অংশীজন) : জাযাকাল্লাহ।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি আগে বলি। শব্দের বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শব্দ নিয়ে কথা না। কিন্তু অস্পষ্ট শব্দ নিয়ে আপত্তি আছে। অর্থাৎ এমন শব্দ যদি প্রয়োগ করি যেটির একদিকে ইসলামের পরিভাষায় আছে, আবার এর পশ্চিমা কোনো পরিভাষাও আছে। এখন কে কোনটা নেবে। এরকম অস্পষ্টতা ঠিক না। বিষয়টি clear করা ভালো এবং ইসলামের সৌন্দর্য এমন যে, ইসলামের বিধান যদি যথাযথ পেশ করা হয়, তাহলে কোনো ধরনের কোনো ভীতি, কোনো আপত্তি থাকবে না। কিন্তু আমরা নিজের থেকে যদি ওটার কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করাই, নিজে থেকে ইসলামের ভাষার জায়গায় অন্য ভাষা প্রয়োগ করি, তখন ঝামেলা সৃষ্টি হবে বেশি। এটি মৌলিক কথা। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা, সেটিতো সময় সাপেক্ষ বিষয়। আর প্রথম যে কথাটি বলেছেন, এর মূল বিষয় হলো শাসক যদি মুসলিম হয়, তাহলে তার সংবিধানের প্রথম কথাই কোরআন-সুন্নাহ।

দ্বিতীয় কথা, যেখানে শরিয়ত বিষয়টাকে ছেড়ে দিয়েছে মানুষের আকল এবং অভিজ্ঞতার উপর। তাদেরকে আমরা বলি আকল এবং যাদের উপর শরিয়ত ছেড়ে দিয়েছে, ওখানে মানুষের চিন্তাভাবনা, মাশওয়ারা; এসব কিছুই এখানে চলে। সেখানে গণতন্ত্র চালানো যায়। গণতন্ত্র কথাটি এখানে এসেছে, যেহেতু আমাদের গণতন্ত্রের কথাটি উচ্চারণ হয়। অন্যরা উচ্চারণ করে গণতন্ত্র মনে হয় একটা শরিয়ত, একটা দিন। এটিতো কোনো মুসলিম কখনো মেনে নিতে পারে না। আমরা যখন গণতন্ত্রের কথা বলি শুধু এতটুকুই যে, এটি একটা পদ্ধতি। কোনো আদর্শ এবং বিধান গণতন্ত্র থেকে কোনো মুসলিম নিতে পারে না। কোনো মুসলিম সমাজ, মুসলিম দেশ, মুসলিম শাসক গণতন্ত্র থেকে আদর্শ নিবে, এটি হতে পারে না। ওখান থেকে নিবে শুধু পদ্ধতিটি। যেমন: রাষ্ট্রপ্রধান নির্ধারণ করা, রাষ্ট্রের শাসক কীভাবে নির্ধারিত হবে, এটির একটি পদ্ধতি। ওখান থেকে যদি নেওয়া হয়, আমাদের কাছেও পদ্ধতি আছে। কিন্তু মানুষ এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে, আপনি যেটি বললেন, পদ্ধতি গ্রহণ করা হলো কিন্তু শাসন পরিচালনা করবে কীভাবে, এটি গণতন্ত্র থেকে নেওয়া যাবে না। এটি নিতে হবে শরিয়ত থেকে এবং শরীয়তই মানুষকে ওই ফল দিতে পারবে, ফায়দা দিতে পারবে। মানুষ যেটি ধারণা করে গণতন্ত্র থেকে পাবে। এ দেশের পিছনের ইতিহাস থেকে এটি স্পষ্ট যে গণতন্ত্র থেকে পাচ্ছে না। আরবিতে একটা কথা আছে, যেটি পরীক্ষিত ওটাকে আরেকবার পরীক্ষা করতে হয় না। পশ্চিমা সভ্যতা, চিন্তা-চেতনা, আদর্শ, নীতি, ইজমগুলো বৎসরের পর বৎসর পরীক্ষা হয়ে গেছে। নতুন করে পরীক্ষা করার দরকার নেই।

আমাদের কাছে ইসলামি খেলাফতেরও পিছনের ইতিহাস আছে। দুটোকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হোক। তখন দেখা যাবে যে, নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা নাগরিকদের কোথায় আছে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, মুফতি আব্দুল মালেক এবং খুশী কবির। আপনাদের অনুমতি পেলেই আমরা এই অধিবেশনটি এখন সমাপ্ত করছি। আমরা আশা করছি যে, আপনারা আগামী ২০ তারিখের মধ্যে বিস্তারিত লিখিত আমাদের কাছে জমা দেবেন। যাতে করে আমাদের পক্ষে এই বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়।

সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আজকের অধিবেশন শেষ করছি।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

পঞ্চম সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১২ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : দুপুর ১২.০০ থেকে ১.৩০ পর্যন্ত

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:

১।	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক	কমিশন প্রধান
২।	অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল	সদস্য
৪।	অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫।	ড. শরীফ ভূইয়া, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট	সদস্য
৬।	ব্যারিস্টার এম. মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল	সদস্য
৬।	জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক	সদস্য

অংশীজনের তালিকা:

১। জনাব সুব্রত চৌধুরী

২। জনাব মুসা আল হাফিজ

৩। অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ

৪। জনাব শাহিন আনাম

কার্যবাহের রিপোর্ট প্রস্তুতকারক :

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সম্পদনায়:

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহের রিপোর্ট

কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমার নাম আলী রীয়াজ। আমি এই কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে, সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে, আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা ছোট ছোট আকারের অধিবেশনে মিলিত হচ্ছি এবং এরকম আরো একাধিক অধিবেশন করছি যাতে সকলের মতামতগুলো শুনতে পারি এবং আলোচনা করতে পারি।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। এখনকার এই অধিবেশনের শুরুতে আমি সেই সব শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং যারা আহত হয়েছেন, তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় দিবেন।

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান)ঃ ধন্যবাদ।

আজকে আপনারা যাঁরা উপস্থিত আছেন, আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে সংবিধানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা প্রত্যেকে যদি ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরেন তাহলে আমরা সকলের মতামত জানতে পারব এবং ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন হলে ২/১টি প্রশ্ন আপনাদের কাছে রাখতে পারব। তবে আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব থাকলে লিখিত আকারে আজকে অথবা আমাদের কাছে আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে পারেন। তাহলে আমাদের জন্য কাজের সহায়ক হবে।

(অতঃপর অংশীজনগণ তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান)ঃ ধন্যবাদ।

জনাব মুসা আল হাফিজ, আপনার বক্তব্য দিয়েই শুরু করি।

জনাব মুসা আল হাফিজ (অংশীজন) : সময় যেহেতু অল্প এবং বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু আমি শুরুতেই যে কথাটি বলতে চাই, সংবিধান নিজেকে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে দাবি করেছে যে যুক্তির ভিত্তিতে সেটা হলো, সেই জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি হিসেবে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। এখন আমরা যখন সংবিধান সংস্কারের কথা বলছি, তখন আমাদের বৈধতার জায়গাটা কী? সেটা হচ্ছে, গণবিপ্লব। গণবিপ্লব গণইচ্ছার যে সূত্রসমূহ নিয়ে হাজির হয়, সেটাই হচ্ছে বিদ্যমান পরম অভিপ্রায়। সেই অভিপ্রায় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন রচনা করবে, এটাই সাংবিধানিক বক্তব্য এবং তার দাবি।

১। আমরা যখন সংবিধান পরিবর্তনের কথা বলছি বা সংস্কারের কথা বলছি, তখন তার ক্ষেত্রগুলো কী হতে পারে? তারমধ্যে আমরা কতিপয় জায়গায় এমন দেখতে পাচ্ছি যেখানে সরাসরি ভুল বক্তব্য রয়েছে। যেমন: একেবারে শুরুর দিকে যদি একটু দৃষ্টি দেই, সংবিধানের শুরুতে “বিসমিল্লাহির-রহ্মানির রহিম” লেখা আছে। এটা কুরআনের আয়াত এবং সেটা ভুলভাবে লেখা হয়েছে। আসলে হবে, “বিসমিল্লাহির-রাহ্মানির রাহিম”। অর্থ হিসেবে লেখা হয়েছে “দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে”। এটা বাক্য হিসেবে ভুল। সঠিক তর্জমা হবে যে, “দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে” এবং যেহেতু “বিসমিল্লাহির-রাহ্মানির রাহিম” কুরআনের আয়াত, তাই শুরুতে আরবিতে লিখে ব্রাকেটে বাংলা লিখে অর্থ উল্লেখ করা যায়। এটাই উত্তম হবে।

২। সংবিধানের প্রস্তাবনায় দাবি করা হয়েছে, “...যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিত উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল ...”-সেগুলো হচ্ছে, “জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার”। এই দাবি ইতিহাস সম্মত নয় সর্বাংশে। প্রথমত, জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম একমাত্র একাত্তরের সংগ্রাম নয়। আবার একাত্তরের সংগ্রামের কোনো ঘোষিত আদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রামাণ্যতা নেই। বরং সেটা হচ্ছে ১৯৭২ সালের প্রণীত বয়ান। প্রকৃত অর্থে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম হয়েছিল, “সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শে”। একে সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখের সুপারিশ করছি।

৩। সংবিধানের প্রস্তাবনায় "শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা-"র লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ একটি মতাদর্শিক প্রত্যয়। যাকে আকাঙ্ক্ষা করে না বাংলাদেশের সমাজ জীবন। বরং আমাদের দরকার শোষণমুক্ত সমাজ। যেখানে সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়ের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।

৪। আমাদের সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে"। এখানে সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ স্বীকার করা হলেও ক্ষমতা প্রয়োগের মালিকানা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের চতুর্থ ভাগ থেকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, জনগণের ক্ষমতাকে কারা, কীভাবে কতটুকু প্রয়োগ করবে। ক্ষমতার সেই প্রয়োগ দিনশেষে জনগণের ক্ষমতাকে অর্থাৎ সক্ষমতাকে সমর্থন করে না। ৫ বছর পরে একবার ভোট দিয়ে দেবার নাম জনগণের সকল ক্ষমতার মালিকানা নয়। বস্তুত এটা একটা কথার কথায় পরিণত হয়েছে। প্রয়োগের অর্থে যা "সোনার পাথর বাটি"-এর অর্থ গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মবিশ্বাসী জনগণ বিশ্বাস করে না যে, জনগণ সকল ক্ষমতার সার্বভৌম মালিক। বরং জনগণ প্রজাতন্ত্রের কর্তা, সত্তা, সাংবিধানিকভাবে একে নিশ্চিত করা যেতে পারে। জনগণের বিশ্বাস ও বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে এই পরিবর্তন জনতার পরম অভিব্যক্তিকে উচ্চকিত করবে।

৫। অনুচ্ছেদ ৭ (১) "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ," সকল ক্ষমতার মালিক না বলে আমরা বলতে পারি, "প্রজাতন্ত্রের কর্তাসত্ত্বা এবং প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতাদানকারী হলো জনগণ"। ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতাদানকারী হিসেবে জনগণকে স্পষ্টতা দিতে হবে। এতে রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এটি মনে রাখতে বাধ্য থাকবেন যে, জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করলে তা আইনের নামে আপাত ন্যায্যতা পেলেও, যদি সেটা জনগণের ক্ষতি করে তাহলে তা অবৈধ হয়ে যাবে ভবিষ্যতে এবং তারা ফ্যাসিবাদী হওয়া থেকে বিরত থাকবেন।

৬। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের শিরোনাম হলো, "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি"। এতে "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা" এই চার মূলনীতিকে বাংলাদেশ পরিচালনার মূল সূত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আইনের ব্যাখ্যা দানে একই পথের প্রদর্শক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং একে রাষ্ট্র ও নাগরিকের কাজের ভিত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে। এসব মূলনীতির সাংবিধানিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে-

(ক) বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাও বাংলাভাষী এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের পরিচিতি অন্তর্ভুক্তিকে উপেক্ষা করে। সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, অবাঙালি জনগোষ্ঠীকে স্বস্তি দেবে।

(খ) ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমানের সরকার সংবিধান থেকে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে খারিজ করেছিল। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে একে পুনরায় ফিরিয়ে আনে হাসিনা সরকার ২০১১ সালে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজ বা অর্থনীতি, আসলে কি প্রাসঙ্গিকতা বহন করে? যেখানে রাষ্ট্রের সর্বত্র মুক্তবাজার অর্থনীতির চর্চা হচ্ছে। সেখানে রাষ্ট্রের মূলনীতি অংশে সংবিধানে বলা হচ্ছে, "সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে" অনুচ্ছেদ ১০-এ সেটা বলা হয়েছে। বস্তুত নাগরিক মধ্যবিত্তের একটি অংশের সমাজতান্ত্রিক লিপ্ততার স্মৃতিদর্পণ ছাড়া এর কোনো মূল্য সংবিধানের সমাজতন্ত্রকে মূলনীতির মহিমা দিতে আমাদেরকে বাধ্য করছে বা আমাদের কাছে দাবি করছে, এ বিষয়টি অবোধগম্য। একে বাদ দেয়া দরকার। কারণ এটি একটি ব্যর্থ মতবাদ হিসেবে প্রমাণিত।

(গ) ধর্মনিরপেক্ষতা এদেশে islamophobia হয়ে হাজির হয়েছে বৃহত্তর অর্থে। ধর্মীয় ভাবাবিক ও চর্চার বিরুদ্ধে যা অনবরত স্বৈরাচার জারি রেখেছে। রক্তচক্ষু প্রদর্শন করেছে এবং ইসলামি অনুশীলনকে marginalized করেছে, প্রান্তিকীকরণ করেছে এবং নানাক্ষেত্রে অপরাধীকরণ করেছে। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার এই স্বৈরাচারী ব্যবহার জনগণের অন্যান্য সাংবিধানিক অধিকারকে নানা ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ন করেছে। বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষতা প্রকৃত অর্থে ধর্মীয় কারণে নাগরিকদের প্রতি কোনো ধরনের বৈষম্যহীনতাকে নির্দেশ করে। সেটাই মুখ্য এবং এর কল্যাণে ব্যবহার নিশ্চিত করবার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব করছি। যেমন: ধর্মীয় কারণে বৈষম্যমূলক; এ ধরনের বিষয় প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়। যেখানে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় নিপীড়ন এবং ধর্মের অপব্যবহারের পথ রুদ্ধ করা হবে।

৭। অনুচ্ছেদ ১০-এ "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে"। "সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার" বদলে "ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার" প্রস্তাব করছি।

৮। অনুচ্ছেদ-৭০। তথা দলের বিপক্ষে ভোট প্রদান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ বাতিল করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৭০ এবং কার্যপ্রণালী-বিধি এবং স্থায়ী কমিটির ক্ষমতা সংস্কার করে সংসদকে কার্যকর করা হবে।

৯। সংবিধানে আল্লাহর উপর গভীর আস্থা ও বিশ্বাস অব্যাহত রাখার বিষয়ে জনমতের প্রতিফলন ঘটানো দরকার।

১০। মানুষের মৌলিক অধিকারের পুনর্বিন্যাস জরুরি। মানুষ দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত সত্তা হিসেবে যে মৌলিক অধিকার দাবি করে, আমাদের সাংবিধানিক বয়ানে তার প্রতিফলন পূর্ণ নয়। মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অধিকার ও চাহিদাকে নিশ্চিত করতে হবে।

১১। অনুচ্ছেদ ৪ (ক)। কোনো ব্যক্তির ছবি নয় বরং জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং শহীদ মিনারের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারি-আধাসরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয় সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে।

১২। "জাতির পিতার" বদলে "রাষ্ট্রের স্থপতিবৃন্দ" ব্যবহৃত হবে।

১৩। অনুচ্ছেদ ৭(ক)। এখানে যুক্তিপ্রদান করতে হবে, কেনো এই সংবিধান সংস্কার করতে হবে? এবং

৭(খ) সেখানে দেখাতে হবে, কেনো এবার মৌলিক বিধানাবলি সংশোধন করতে হবে এবং ভবিষ্যতে মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন করতে হলে গণভোটের বিধান রাখতে হবে। কেবল ৭৫ শতাংশ ভোট পেলেই মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন করা যেতে পারে।

১৪। অনুচ্ছেদ ১২ (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে; কিন্তু এটা সমস্যা ও অপব্যবহারের অনুকূল। বরং নিষিদ্ধ করা উচিত ধর্মের সহিংসতামূলক অপব্যবহার। সহিংসতা শব্দটি যোগ করতে হবে। কারণ শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার বিলোপ করবার অজুহাত দিয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জবরদস্তি হাজির হয়।

১৫। অনুচ্ছেদ ১৫। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের উন্নতি সাধন। শুধু "বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক" নয়। বরং "আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক" মানোন্নয়নের দিকটিও যোগ করতে হবে।

১৬। পার্লামেন্টে বিরোধী দল যেন নিষ্ক্রিয় না থাকে, সে জন্য বিরোধীদলের সদস্যদের দিয়ে একটি shadow cabinet তৈরির বিধান রাখা এবং সংসদে তাদের কথা বলার বাড়তি সুবিধা দেওয়া। যেন সরকারিদলের নীতির বিরুদ্ধে বিরোধী দল যুক্তিসংগত উন্নত নীতি দিতে বাধ্য হয় এবং জনগণ বিরোধীদলের মেধা যাচাইয়ের সুযোগ পায়। ব্রিটেনে এবং ওয়েস্টমিনিস্টার মডেলে এই বিধান রয়েছে।

১৭। আইন, অর্থ, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধীদলের সদস্যদের বাধ্যতামূলক মনোনয়ন দিতে হবে। যেন এই মন্ত্রণালয়গুলো সঠিক নজরদারিতে এবং জবাবদিহিতায় থাকে।

১৮। সংসদে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং নীতিনির্ধারণী বিতর্কগুলোতে সেরা roleplay করবার জন্য, সেরা এমপিদের পুরস্কৃত করা উচিত। তাহলে সংসদে বিতর্কের মান আরো বাড়বে এবং জনগণের ট্যাক্সের টাকায় চলা সংসদ জনগণকে ফায়দা দেবে। ইন্ডিয়াতে উদাহরণ রয়েছে।

১৯। ইলেকশন কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে সার্চ কমিটির প্রধান সংসদীয় বিরোধীদলের মতামতের ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া উচিত। বাকি সদস্যদের ক্ষেত্রে একটি নিরপেক্ষ নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে।

২০। ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন ভোটার দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে মেইলে যা আমেরিকায় রয়েছে কিংবা তার জন্য তুলনামূলক সুবিধাজনক যে কোনো ক্ষেত্র থেকে ভোট দিতে পারার বিধান রাখা দরকার। এটি হলে, কোনো বিশেষ এলাকায়, বিশেষ প্রার্থীর যদি অতিরিক্ত প্রভাব ও বিশেষ শক্তি থাকে, তাহলে সেই প্রভাব কম ক্রিয়াশীল হবে। কারণ ওই এলাকার ভোটার দেশের যে কোনো প্রান্তে থাকা সেন্টার থেকে তার সংসদীয় এলাকায় ভোট দিতে পারবে।

২১। জাতীয় নিরাপত্তা ও বৃহত্তর স্বার্থে গণস্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুতে গণভোটের সুযোগ ফিরিয়ে আনতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন হবে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দলীয় সরকার জনগণের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হবে। গত ৫০ বছরে আমরা দেখেছি, অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি দল এবং বিরোধী দল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারে না বা চায় না। যার জন্য গণভোটের সুযোগ রাখা খুবই জরুরি। একটি রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কারণে ৭০ শতাংশ বা তার কাছাকাছি সংসদে আসন পেয়ে যেতে পারে। তার মানে এই নয় যে, জনগণ সব ইস্যুতেই সেই দলকে সাপোর্ট করছে। তাই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে গণভোটের সুযোগ রাখা জরুরি।

২২। বিভিন্ন ইস্যুতে সংসদে ভোটাভুটির ক্ষেত্রে এমপিদের Floor Crossing করার সুযোগ দিতে হবে। যেন তারা তাদের দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়েও সংসদে ভোট দিতে পারে এবং এজন্য তারা যেন বহিষ্কৃত না হন। তাছাড়া তাদের ইচ্ছে হলে, তাদেরকে সরকারি বা নিজ দল থেকে সরে এসে স্বতন্ত্র সংসদ-সদস্য হিসেবে থাকার সুযোগ দিতে হবে।

২৩। তথ্য জানার অধিকার এবং মেধার সংরক্ষণ মৌলিক অধিকার ও মূলনীতির ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেন ভবিষ্যতে মেধার ভিত্তিতে দেশকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যায়।

২৪। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রাধান্য নীতির প্রয়োগ রাষ্ট্রীয় ও সরকারি মর্যাদার মানক্রমান্বয়ে প্রতিফলিত করতে হবে।

২৫। আইনসভার সদস্য, জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষের সদস্য, জনপ্রতিনিধির বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্টকরণ করতে হবে, পৃথকীকরণ করতে হবে।

২৬। আইনসভার সদস্য ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হওয়ার যোগ্যতা নির্দিষ্টকরণ করতে হবে।

২৭। দলীয় প্রধান ও প্রধানমন্ত্রীর স্বেচ্ছাচার নিরোধের উপায়, প্রক্রিয়া চিহ্নিতকরণ জরুরি। দলীয় প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী পদ একইসাথে চলমান থাকবে না।

২৮। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে নির্বাহী ক্ষমতার একটা ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো স্থির করা। যাতে রাষ্ট্র, সরকার এবং সরকারি দল পৃথক থাকে।

২৯। প্রধানমন্ত্রী পদে একই ব্যক্তি পরপর ২ বারের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারবে না মর্মে বিধান করা।

৩০। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা, পুনর্বহাল করা।

৩১। প্রেসিডেন্ট নির্বাহী ক্ষমতার আংশিক দাবিদার হলে জনগণের ভোটে তা নির্বাচিত হওয়ার বিধান করতে হবে।

৩২। আইনসভার সদস্যগণ পৃথক নির্বাচনি এলাকাভিত্তিক বা প্রচলিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবেন, না আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বতা দলভিত্তিক নির্বাচিত হবেন, তা স্থির করতে হবে।

৩৩। যে কোনো নির্বাচনে নির্বাচিত হওয়ার জন্যে সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠতার নীতি অব্যাহত থাকবে, না ৫০ শতাংশ ভোটের শর্তযুক্ত প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হবেন তার সমাধান দরকার।

৩৪। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার, আইনসভার সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ প্রভৃতি পদের জন্য যোগ্যতার শর্ত নতুনভাবে গ্রহণ করা জরুরি।

৩৫। সংবিধানের ৫৯ ও ৬০-এ স্থানীয় শাসনের বদলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা, যা কার্যকর অর্থে জনগণের সরকার হয়ে উঠবে।

৩৬। সব সেবা ও পণ্যের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য বিকেন্দ্রীকরণ করা।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): জনাব মুসা আল হাফিজ সময়ের স্বল্পতার জন্য আপনি একটু সংক্ষিপ্ত করে বলবেন। যেহেতু আপনি এটি লিখিতভাবে জমা দিচ্ছেন। এর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বললে অন্যদেরও কথা বলার সুযোগ হবে।

জনাব মুসা আল হাফিজ (অংশীজন): আমি আর কয়েকটি বিষয়ে বলতে চাচ্ছি।

যেমন: অনুচ্ছেদ ২(ক)। "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সম-অধিকার নিশ্চিত করিবেন" এতটুকু সংবিধানে বলা আছে। তবে এটা যুক্ত করা যেতে পারে যে, "ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো আইন পাস করিবে না। এমনতর আইন বাতিলের ক্ষমতা থাকবে সুপ্রিমকোর্টের"। ইসলামি বিষয়ে আদালত ৩জন বিশেষজ্ঞ ফকি তথা ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞ তাদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেবেন। অন্যান্য ধর্মের প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট প্রাজ্ঞজনের মতামত নেবেন। ইসলামি ব্যাংক, যাকাত ও বীমা সংক্রান্ত বিষয়ে আলাদা আইন-প্রণয়ন জরুরি। বার অ্যাসোসিয়েশনগুলোতে একই ধাঁচের গঠনতন্ত্র অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের পাঠক্রম বার কাউন্সিলের সাথে পরামর্শ করে যুগোপযোগী করা দরকার।

আমি আর সময় নিতে চাচ্ছি না। বরং যে পয়েন্টগুলো আমি লিখেছি, সেগুলো জমা দিয়ে দেব এবং আরেকটু সম্প্রসারণের দরকার পড়বে। সেটা পরবর্তীতে আমি জমা দিব, ইনশাল্লাহ।

ধন্যবাদ, সবাইকে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, জনাব মুসা আল হাফিজ।

আপনার লিখিত বক্তব্যটি আমাদের কাছে থাকবে। পরবর্তী সময়ে সকলের বক্তব্য শোনার পরে যদি কোনো প্রশ্ন ব্যাখ্যার জন্য কমিশনের সদস্যগণ প্রয়োজন মনে করেন, জিজ্ঞাসা করবেন। এবার আমরা জনাব সুব্রত চৌধুরীর বক্তব্য শুনব।

জনাব সুব্রত চৌধুরী (অংশীজন): সংবিধান সংস্কার কমিশন আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আসলে এ সংস্কার কমিশনের Terms of Reference আমরা পাচ্ছি না। যে গেজেটটি হয়েছে তাতে

আপনাদের কী কার্যপরিধি, আপনারা কী করবেন, সেটা একটু সুনির্দিষ্টভাবে থাকলে সবার জন্য সুবিধা হতো।

যেমন: বড় ধরনের একটা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান বা বিপ্লব যেটাই বলি না কেন, তারপরেই আমাদের দেশের সংবিধান নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

আমার তো মনে হয়, এটা খুবই ভালো দিক যে, আমরা জনগণ আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের ব্যাপারে সকলেই কথা বলি এবং জনগণের মতামত নিয়েই আমাদের সংবিধান কাঠামো আমরা নির্দিষ্ট করি।

আমাদের Proclamation of Independence ১০ এপ্রিল যেটা আছে, এটা আমাদের সংবিধানের একটা অন্যতম বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। Proclamation of Independenceটি সংবিধানের part of the Constitution-এ রাখার পক্ষে আমি মত দিচ্ছি। কারণ এটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পরিচয়। তারপরে তো ১৯৭২-এর সংবিধান আসলো। ব্যাপক আলাপ-আলোচনা সংসদে হয়েছে এবং ৪ নভেম্বর Constituent Assembly এটা পাস করেছে।তারপরে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ১৭টি সংশোধনী হয়েছে। এখন আমরা কি ১৮তম সংশোধনীর জন্য প্রস্তুতি নেব? আপনারা কি সেভাবে কোনো প্রস্তাব দেবেন? সেটাও তো আমাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া উচিত। কারণ ইতোমধ্যেই বক্তব্য আসছে যে, '৭২-এর সংবিধান ছুড়ে ফেলে দিতে হবে বা কেউ কেউ বলছে নতুন সংবিধান লিখতে হবে, আবার কেউ কেউ বলছেন, না যুগোপযোগী করতে হবে। অর্থাৎ সংশোধন করতে হবে। এই বিষয়গুলো যদি আপনারা পরিষ্কার করতেন, তাহলে আমাদের পক্ষে সুপারিশ দেওয়া বা বক্তব্য দেওয়া সুবিধা হতো। তারপরও যেহেতু আজকে সুযোগ পেয়েছি কিছু কথা তো বলতেই হবে। যেমন : '৭২-এর সংবিধানকে বিভিন্নভাবে অনেক কাটাছেঁড়া করা হয়েছে। সেটা আমরা সকলেই জানি। তিনি সবকিছু উল্লেখ না করলেও যেমন ধরেন "বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম"-এর কথা বলেছেন। এটা তো কোনো জাতীয় mandate ছিল না। কোনো দল বলে নাই যে, আমরা ক্ষমতায় গেলে এই কাজটি করব। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে, মার্শাল ল অর্ডারে সংবিধানের মধ্যে হাত দেওয়া হয়েছে। পরে অবশ্য এগুলোর বৈধতা দেওয়া হয়েছে পঞ্চম সংশোধনী, সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে। সংবিধানের শুরুতেই যদি কোরআনের আয়াত থাকে, তাহলে এখানে যে অন্য ধর্মাবলম্বী আছে, তারা কীভাবে শুরু করবে? হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা আছেন। সেই ব্যাপারে আমাদের কাছে মনে হয়েছে সংবিধানটাতো সার্বজনীন হওয়া উচিত। আবার কেউ কেউ ব্যাখ্যা দেন, ওটা part of the Constitution না। আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা তো কোনো কাজ শুরু করার আগে এই শব্দটা ব্যবহার করেন, খাওয়ার আগেও হয়তো বলেন। এভাবে শুরু করতেই পারে, বলতেই পারে, নাও বলতে পারে। এভাবেও কেউ কেউ ব্যাখ্যা দেন যে, এটা সংবিধানের অংশ না। এমনকি বিচারপতি খায়রুল হক-এর জাজমেন্টেও এই কথাগুলো আসছে এবং তৎকালীন আইন মন্ত্রী শফিক আহমেদ এই ব্যাখ্যাটা দিয়েছিলেন। এটা আপনাদের বিবেচনার জন্য বলছি। তারপর হচ্ছে, রাষ্ট্রধর্ম। রাষ্ট্রধর্ম আনার ব্যাপারেও কোনো দল কখনো তার নির্বাচনি ইশতেহারে বলে নাই। যিনি করেছেন, তিনি কী কারণে করেছেন, আমরা সবাই জানি। রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্মকে নিয়ে আসা এবং ধর্মকে রাজনীতিতে অপব্যবহার করা। তিনি নিজেও করতেন। তিনি যেভাবে এনেছিলেন, সেটা হলো ১৯৮৮ সালের আরেকটি ভোটারবিহীন সংসদ। এটি পাসে সংসদে বিরোধী দল বা অন্য কোনো দল অংশগ্রহণ করেনি। আমি সেনাশাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের কথা বলছি।

রাষ্ট্রধর্ম করার ফলে কী হলো? একটি ধর্মকে এখানে সাংবিধানিকভাবে মর্যাদা দেয়া হলো। এখানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা আছে, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করা হয়। সুতরাং সংবিধানে বলা হচ্ছে, সবাই সমান অধিকার পাবে। সবাই সমান সুযোগ পাবে। ধর্ম-বর্ণের কারণে কারো প্রতি কোনো বিমাতাসুলভ আচরণ করা হবে না, ইত্যাদি বলা হচ্ছে। কিন্তু সংবিধানে যখন রাষ্ট্রধর্ম; একটি বিশেষ ধর্ম চলে আসে, তখন সবাই বৈষম্যের শিকার হয় এবং এর প্রয়োগ আমরা দেখেছি '৮৮ সালের পর থেকে। এটা ভয়াবহ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী থাকে, যারা প্রশাসনে থাকে, তারা যে সমস্ত উক্তি করে, তাদের কাছে যখন জনগণ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যায়, খুবই অপমানজনক কথাবার্তা বলে। সংবিধানেই তো তোমাদেরকে denationalize করেছে। এই ধরনের আচরণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায় থেকে করা হয়। সুতরাং এখানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সব সময় সংক্ষুব্ধ থাকেন নানান কারণে। এমনকি আদালতেও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়।

আমি পরবর্তী পয়েন্টে যাচ্ছি। আপনারা জানেন যে, আমাদের সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদে বলা হলো, "time to time session of the Highcourt বসবে" বা যে-কোনো জায়গায় বসবে। কিন্তু জনাব হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ করল কী? প্রত্যেকটি বিভাগীয় শহরে স্থায়ী বেঞ্চ করে দিল। যেটা অষ্টম সংশোধনীতে। সেই স্থায়ী বেঞ্চ নিয়ে ১০০ অনুচ্ছেদে হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হলো। হাইকোর্ট ওটা valid দিয়ে দিল আনোয়ার হোসেনের মামলায়। আমরা সকলে মিলে সুপ্রিমকোর্টে গেলাম। সুপ্রিমকোর্টে

আমাদের বিখ্যাত আইনজীবীরা অ্যাপেয়ার করলেন। আপিল বিভাগ থেকে বলল, এই যে স্থায়ী বেঞ্চটা করা হলো, এগুলো অবৈধ, Ultra biased to the constitution. তাহলে দেখা যাচ্ছে, এখানে আইনজীবী এবং বিচারপতিদের একটা common interest ছিল। বিভিন্ন বিভাগে ফাইলপত্র নিয়ে যেতে চায় না। আবার হাইকোর্ট বিভাগের জজদেরও বিভিন্ন বিভাগে যেতে হবে, সেই ব্যাপারে তাদের মধ্যে দ্বিমত ছিল। এগুলো নিয়ে সে-সময়ে অনেক ঘটনা ঘটেছে। অষ্টম সংশোধনীর একটা পার্ট হাইকোর্ট ডিভিশনে পাঠিয়ে দেওয়া, সেটাকে আমরা সবাই মিলে ফেরত আনলাম। বিশেষত আইনজীবীরা ও বিচারপতিরা। কিন্তু কথা হচ্ছে, অষ্টম সংশোধনীর আরেকটি অংশ ছিল রাষ্ট্রধর্ম। সেটাকে চ্যালেঞ্জ করা হলো। দেশের প্রায় ১৫ জন শীর্ষ পর্যায়ের বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন, কে এম সোবহান, সুফিয়া কামাল, কলিম শরাফী, আনিসুজ্জামান, জেনারেল দত্ত, এখন আছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরি, বদরুদ্দিন ওমর; এরকম ১৫ জন। এটা চ্যালেঞ্জ করা হলো আলাদাভাবে। সেটার ব্যাপারে কী বলল হাইকোর্ট, আপনি অষ্টম সংশোধনীর একটা পার্ট অনুচ্ছেদ ১০০ অবৈধ করে হাইকোর্ট ফিরিয়ে আনল। আর রাষ্ট্রধর্ম নিয়ে যখন মামলায় গেল, হাইকোর্ট বলে দিল যে, এই যে ১৫জন এখানে মামলাটি করল, তাদের মামলা করারই কোনো অধিকার নেই এবং সেভাবে হাইকোর্ট থেকে একটা রায় চলে আসল। তাহলে বিচার বিভাগেও বৈষম্য হচ্ছে। কোনো ইস্যুতে তারা তাদের activism দেখতে পায়, আবার কোনো কোনো ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে নীরব ভূমিকা পালন করছে। যেহেতু হাইকোর্ট বিভাগ থেকে এই ধরনের একটা রায় আসল, পরস্পরবিরোধী রায় অষ্টম সংশোধনের ব্যাপারে। সে বিষয়টিও আমরা আপনাদেরকে বিবেচনা করার জন্য বলব। এর বাইরে '৭২-এর সংবিধানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, সেগুলো বিভিন্ন সরকারের সময় আমলে নেয়নি।

যেমন-আমাদের স্বাধীন বিচার বিভাগ, এ বিষয়ে আইনজীবীরা বহুদিন ধরে লড়াই-সংগ্রাম করেছে। জেল-জলুমসহ অনেক ভোগান্তি তাদের হয়েছে। আপনারা জানেন যে, মাসদার হোসেন মামলার আলোকে আমরা আশা করেছিলাম, উচ্চ আদালত থেকে হয়তো একটা পরিপূর্ণ রূপ পাওয়া যাবে এবং সেটা হচ্ছিল কিন্তু। প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাকে কীভাবে অপদস্থ করে এখান থেকে বের করা হয়েছে, তা আপনারা জানেন। ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করার কারণে। তিনি হয়ত এটি করে যেতে পারতেন। তাঁর হাত দিয়ে এটা হলো না। এরপরে এলো প্রধান বিচারপতি মোঃ আব্দুল ওয়াহহাব মিঞা। যে কোনো কারণেই হোক ওহাব মিয়ার সাথে সরকারের সাথে একটা সম্পর্ক হয়ে গেল। হয়তো তাঁকে বলা হয়েছিল ভবিষ্যতেও তাঁকে কিছু করা হবে। তিনি এক পর্যায়ে গিয়ে এটা থামিয়ে দিল। আর অগ্রসর করতে দিল না। সুতরাং এটা মাঝপথে থেমে আছে। মাসদার হোসেন মামলার পরিপূর্ণতা পায়নি। সুতরাং এখন মাসদার হোসেন মামলার পরিপূর্ণতা দিতে গেলে এবং বিচার বিভাগের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আনতে গেলে, সেখানে আমাদের কতগুলো অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা দরকার- ১১৫ এবং ১১৬, যেটা ১৯৭২-এ ছিল। সেই অনুচ্ছেদটি যদি আপনারা restore করার প্রস্তাব দেন, আমার মনে হয়, মাসদার হোসেন মামলাও পরিপূর্ণতা পাবে এবং তাহলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হয়ত আমরা অনেকাংশেই ফিরে পাব। ভবিষ্যতে আমার বক্তব্য লিখিত আকারে পাঠিয়ে দিব।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, জনাব সুব্রত চৌধুরী।

আমাদের সাথে এখন অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ যোগ দিয়েছেন। প্রত্যেকের বক্তব্য সংক্ষেপ আকারে শুনছি ১৫ মিনিটের মতো। আমি এখন অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহকে অনুরোধ করব তার বক্তব্য রাখার জন্য।

অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ (অংশীজন) : প্রথমেই বলা দরকার, এই কমিশনের সামনে বক্তব্য দেওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে যে চিঠি, সেটা গতকাল রাতে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পেয়েছি। সেখানে লেখা ছিল যে, লিখিত আকারে পেশ করা। কীভাবে পেশ করা হবে, সুনির্দিষ্টভাবে জানতাম না বলেই সেটি লিখিত আকারে পেশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমার দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে, বাংলাদেশে আমি অনেকদিন থেকে বলে আসছি, লিখে আসছি নতুন করে একটা social contract তৈরি হওয়া দরকার। এই পুরোনো social contract দিয়ে আর চলছে না। এই অবস্থায় social contract-এর একটা বড় দলিল হচ্ছে সংবিধান। এই সংবিধানকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম আবর্তিত হবে। এটাই একটা গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকের কাম্য। আবার কেউ কেউ বলছেন নতুন বন্দোবস্ত। নতুন বন্দোবস্ত ব্যবস্থাটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই বন্দোবস্ত আনতে গেলে যেটা আমরা দেখছি সমাজে এখন শক্তির ভারসাম্য নাই এবং শক্তি বিভিন্ন জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। এই শক্তি বা পাওয়ারের কেন্দ্রীয় ভবন ভাঙতে হলে যেটা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে ruralisation-এর মাধ্যমে আরো অনেকগুলো শক্তির কেন্দ্র তৈরি করা। এটা একটা social exercise. এই কাজটি শুধু একটা সংবিধান লিখে হবে না। এই কাজটি ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক চর্চার মধ্য দিয়ে আসতে হবে।

আমি এখন তাৎক্ষণিকভাবে আমার কিছু পরামর্শ এখানে দিতে চাই। সেগুলো হচ্ছে, আমাদের সামনের দিকে এই সংবিধানে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ চাই। এই দ্বি-কক্ষ কীভাবে গঠিত হবে, সেটা সুনির্দিষ্টভাবে সংবিধান দলিলে লেখা থাকবে।

অনেক জায়গায় রাষ্ট্রপতিকেও আপার হাউসের নির্বাচিত করার ক্ষমতা থাকে। সেই ক্ষমতা দেওয়া হবে কি না; সেটা চিন্তাভাবনা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ যেটা বিদ্যমান আছে, এর ফলে সরকারদলীয় সদস্যরা মন খুলে কথা বলতে পারেন না। শর্তাধীনে অনুচ্ছেদ ৭০ পুরো সংস্কার দরকার। সেখানে শুধু সরকার পরিবর্তন এবং অর্থ বিল ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে সংসদ-সদস্যরা প্রাণ খুলে কথা বলবেন, কোনো রকমের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না, এটা নিশ্চিত করতে হবে।

তৃতীয়ত: অনেকে আলোচনা করছেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি রাজনৈতিকভাবে, প্রশাসনিকভাবে একেবারে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। এটা ঢাকা কেন্দ্রিক। এটাকে বদলাতে হবে এবং বদলানোর জন্য বাংলাদেশকে আটটি প্রদেশে বা তার চাইতে কম বা তার চাইতে বেশি প্রদেশে বিভক্ত করতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এই ধরনের বিধান করা হলে বাংলাদেশের জন্য খুব বিপদ সৃষ্টি হবে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জাতীয় নিরাপত্তায় বিপদ সৃষ্টি হবে এবং বাংলাদেশের একটি অংশ হয়ত এই কারণেই বিচ্ছিন্ন হওয়ার অবস্থায় দাঁড়িয়ে যাবে। আমরা ইতোমধ্যে লক্ষ্য করছি, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের যারা এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, তারা আমাদের দেশের মূল ভূখণ্ডের কিছু কিছু অংশকে নিয়ে ভিন্ন রাষ্ট্র, ভিন্ন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা তুলছেন। সেখানে প্রদেশ গঠন করা হলে সেই প্রচেষ্টা আরো শক্তিশালী হবে, আরো জোরদার হবে এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক হবে। এই কেন্দ্রীভূত অবস্থা পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে নিজের থেকেই। সেটা হচ্ছে, এখন আমরা যেটা বলি গ্রাম এবং শহরের যে পার্থক্য, সেই পার্থক্য ঘুচে যাওয়ার পথে এবং একটা Rural-Urban Continuum সৃষ্টি হয়েছে। যাতায়াত, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান মফস্বলের বিভিন্ন জায়গায় হওয়ার ফলে বিশেষ করে হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। আমার মনে হয়, উন্নয়নের এসব প্রক্রিয়া যেহেতু শুরু হয়েছে এবং একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসেছে, সেটা ভবিষ্যতে আরো জোরদার হবে। সুতরাং প্রদেশ গঠন করে যেই সুবিধাটি আমরা পাব বলে চিন্তা করছি, সেটা অলরেডি আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

এখানে যদিও নানান রকম তথ্য আছে তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে খুক ছোট রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে আরো প্রদেশ করা যুক্তিসংগত হবে না।

রাষ্ট্রধর্মের বিষয়টি একটি বিতর্কিত বিষয়। তবে এই বিতর্ক জনসাধারণের মধ্যে নয়। এই বিতর্ক সমাজের উচ্চশ্রেণির মধ্যে। রাষ্ট্রধর্ম রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে কী না সেটা কমিশন বিবেচনা করে দেখবে। রাষ্ট্রধর্ম যেই সময়ে করা হয়েছিল সেই সময়ে হয়ত একটি উদ্দেশ্য ছিল যে, একজন স্বৈরাচার, জনাব এরশাদ এই দেশ শাসন করছিলেন। তার শাসনকে আরো দীর্ঘতর করার জন্য এই ধরণের একটি populist বিষয় সংবিধানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে পৃথীবিতে অনেক দেশ আছে যেখানে রাষ্ট্রধর্ম আছে। যারা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করেন তারা অনেকেই মনে করেন এখানকার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম অন্য ধর্মের প্রতি বৈষম্য না করে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তাকে সংহত করবে। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে খুব গভীর চিন্তার দরকার আছে এবং কোনো রকম অভিমান বা রাগ বা বিরাগের ভিত্তিতে এটা নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়।

সংবিধানের মূলভিত্তি বা মূলনীতিগুলো কী হবে? এখন যেটা আছে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি এর পরিবর্তে আমার সুপারিশ হলো, “সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং ন্যায় বিচার” এই ৩টি জিনিসকে সংবিধানের ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করব।

“বিসমিল্লাহ” নিয়ে এখানে কথা উঠেছে। বিসমিল্লাহ কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারও বাদ দিতে পারে নাই। তাতে বোঝা যাচ্ছে, এটা বাদ দিলে দেশে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে।

যে প্রতিক্রিয়ায় আমাদের বাকি যে সমস্ত কাজকর্ম বা উন্নয়নের যে কাজকর্ম, সেগুলোকে ব্যাহত করবে।

Ombudsman-এর একটি বিধান সংবিধানে আছে। ১৯৭২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কোনো Ombudsman নিয়োগ করা হয়নি। আমি মনে করি, Ombudsman নিয়োগ বাধ্যতামূলক করে সংবিধানে স্থান দিতে হবে। Ombudsman এমন একজন ব্যক্তি হবেন এবং এমন একটি প্রতিষ্ঠানের হবে যে প্রতিষ্ঠানটি continuous vigilance only performance of the government এটি পরিচালনা করবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছিল। বাংলাদেশের যে আর্থসামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনে যে ধরনের কারচুপিগুলো হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান নির্বাচনকালে, এটা সংযোজিত হওয়া উচিত। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্য কারা হবেন। প্রধান উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টা করা হবেন। সেখানে অনেকেই উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের আনার বিরোধিতা করেছে। আমরা যেটা সহজভাবে করতে পারি, রাষ্ট্রের কিছু ব্যক্তি যাঁরা সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং এই পদে থাকার মত যোগ্যতা ও নিষ্ঠা যাদের আছে, সেরকম লোককে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনার জন্য ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার শর্তে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। যেভাবে এবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হয়েছে, অনেকটা অনুরূপ। এখানে কিন্তু কোনো মানদণ্ড দেখে এই সরকারে কারা থাকবেন, না থাকবেন; সেটা বিবেচনা করা হয়নি।

আরেকটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে এসেছে। আমাদের যে সংবিধান, সেই সংবিধানকে বলা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর সংবিধান। প্রধানমন্ত্রীর হাতে এত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকা বিপজ্জনক। কতটা বিপজ্জনক হয়, সেটা আমরা শেখ হাসিনার ১৬ বছরের শাসনামলে দেখেছি। সুতরাং এখানে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির আওতা, ক্ষমতা বা জুরিডিকশন যাই বলি না কেন, সেটা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া। রাষ্ট্রপতি কী কী ক্ষমতা পাবেন, প্রধানমন্ত্রীর হাতে কী কী ক্ষমতা থাকবে, সেটা নিশ্চিত করা।

সাংবিধানিক পদগুলোতে কীভাবে নিয়োগ হবে এবং কীভাবে এর মধ্যে স্বচ্ছতা আনা যায়, সে ব্যাপারে সংবিধানে নির্দেশনা থাকতে হবে। এখানে জাতির পিতার কথা এসেছে সংবিধানে। এই জাতির পিতা নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত মত ও বহু বছর আগেও আমি বলেছিলাম, we should have founding father's এবং আমরা কাউকে অস্বীকার করব না, কারো অবদানকে ছোট করব না, এই spirit-এর ভিত্তিতে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা হতে পারেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমরা যে সাংবিধানিক সংস্কারের কথা বলছি, এর ভিত্তিতে হয়ত একটা চূড়ান্ত সুপারিশ আসবে। হয়ত একটা খসড়া সংবিধান দলিলও লেখা হবে। তবে নির্বাচিত সরকার গঠন হওয়ার আগে, এই খসড়া সংবিধানকে অনুমোদন দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে না। অনেকেই মনে করেন, একটা গণভোটের মাধ্যমে এই সংবিধানটা পাস করে নেওয়া যায়। গণভোট নিঃসন্দেহে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ব্যাপার। কিন্তু সংবিধানের মতো একটা বড় দলিল, এই দলিল শুধু গণভোটে ছেড়ে দিলে আমার মনে হয়, সেটার প্রতি সুবিচার করা হবে না। সেজন্য আমার পরামর্শ হলো সামনে যে নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচন একাধারে হবে জাতীয় সংসদ গঠনের জন্য। অন্যদিকে এটা হবে একটা গণপরিষদ। যেই গণপরিষদ এই খসড়া সংবিধান আবার পাঠ করবে এবং বিচার বিশ্লেষণ করে, সমালোচনা করে আরও পরিশুদ্ধ করে পাস করিয়ে নিবে সংসদে। যে নিয়ম আছে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। তার আগে যদি সংবিধান চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, সেটা জাতির জন্য খুবই বিপজ্জনক হবে। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ১৯৬২ সালে নিজেরই পছন্দের সংবিধান তিনি করেছিলেন, সেটা পাকিস্তানের জন্য কিন্তু ভালো হয়নি।

সংবিধানে বাংলাদেশের ইতিহাস সংক্রান্ত কিছু অনুচ্ছেদ বা প্যারাগ্রাফ লেখা থাকবে। এটা এমনভাবে লেখা হবে যেখানে একদিকে জনগণের অবদান, অন্যদিকে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিভিন্ন সময়ে, তাদের অবদান আমরা সংক্ষিপ্তভাবে সংবিধানের অংশ করব।

এখন প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ যে অবস্থায় আছে, একজন প্রধানমন্ত্রী ১০ মেয়াদেও পরপর নির্বাচিত হতে পারেন। সেজন্য কথা উঠেছে কেউ প্রধানমন্ত্রী হলে পরপর দুবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আবার প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য তিনি প্রতিযোগিতা করতে পারবেন না। এখানে আরেকটু স্পষ্ট করা দরকার, সেটা হচ্ছে যে, কয়েক মেয়াদ পরে আবার তিনি পারবেন কি না, বা একটি মেয়াদ শেষ হয়ে বা দুটি মেয়াদের মাঝখানে তিনি পারবেন কি না; এটা চিন্তা করে দেখার বিষয়। কারণ বাংলাদেশে আমরা এখন দেখছি, এখনও নেতৃত্বের যে অবস্থা, সেখানে দেখা যাচ্ছে একজন কিংবা দুজন ব্যক্তি খুব প্রাধান্যে চলে আসে। এটা আমাদের political process-এর product. এটাকে হঠাৎ করে অস্বীকার করা যাবে না। আবার এটার ফলে যে-সব অন্যায়, অবিচার হয়, সেটাকেও কিন্তু মেনে নেওয়া যায় না। এই পরিস্থিতিতে ২ মেয়াদ আমরা চিন্তা করতে পারি। এই ২ মেয়াদের বাইরে তৃতীয় মেয়াদের মাঝখানে ২/১টি মেয়াদ কূন্য থাকবে, অন্যজন প্রধানমন্ত্রী হবে।

বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছে। তারা মনে করে, তারা খুব অবহেলিত, শোষিত এবং বঞ্চিত। ভারতীয় সংবিধানে যে-রকম আছে scheduled caste, scheduled tribe. আমরা আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট করে উল্লেখ করে দিতে পারি যে, কোন কোন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা সকলের নাম সংবিধানে উল্লেখ থাকবে। যাতে এই গোষ্ঠীগুলো অনুভব করবে যে, তারাও এই রাষ্ট্রের মালিক। এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিলে তারাও এই রাষ্ট্রের অংশীদার এবং তাদের মনে যে সন্দেহ ও ক্ষোভ আছে, সেটা কিছুটা হলেও প্রশমিত হবে।

রাষ্ট্রকে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচন কমিশন এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করার জন্য সার্চ কমিটি গঠন করতে হয়। কিন্তু সার্চ কমিটির ব্যবহার আমরা যেটুকু দেখেছি, সেটা মোটেও স্বচ্ছ নয়। সেই জন্য সার্চ কমিটি কীভাবে গঠিত হবে, তার একটা সাংবিধানিক ভিত্তি তৈরি করে দিতে হবে এবং নিয়মটা স্পষ্ট করে দিতে হবে যাতে এটা নিয়ে আর বিতর্ক না হয়।

একইভাবে উচ্চতর আদালতের বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে সাংবিধানিক নির্দেশনা থাকতে হবে, যাতে উচ্চতর আদালতগুলো যেটাকে বলা যায় দলমন্য ব্যক্তিদের দ্বারা আক্রান্ত না হন।

আরেকটা বিতর্ক এসেছে সেটা হচ্ছে- নির্বাচনি ফলাফলের পর কীভাবে সরকার গঠন হবে, এটা কী সিম্পল মেজরিটির ভিত্তিতে হবে, নাকি আনুপাতিক হারে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, এখনও বাংলাদেশে আনুপাতিক হারে সরকার গঠনের সময় আসে নাই। আনুপাতিক হারে সরকার গঠন করতে গিয়ে দেখা যাবে যে, এখানে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না। ফলে আমরা নতুন করে

বিশৃঙ্খলা, নতুন করে ঝামেলা আমন্ত্রণ করব। সেই জন্য আমি মনে করি যে, এখন যেভাবে চলছে যে, একটি নির্বাচনি এলাকায় যিনি বেশি ভোট পান তিনি সংসদ-সদস্য হবেন, এটা চালু থাকবে, চালু থাকা উচিত। এখানে আনুপাতিক হারে যে দাবি উঠেছে বা কথা উঠেছে সেটা বিপজ্জনক বলেই আগের নিয়মটা বহাল রাখা উচিত।

আরেকটি কথা সেটা হচ্ছে যে, বিতর্ক এখন চলছে সংবিধানকে সংস্কার করা না নতুনভাবে লেখা। এ ব্যাপারে আমার মত হচ্ছে এই সংবিধান এতই ভারাক্রান্ত বিভিন্ন সংশোধনীর দ্বারা এবং এত জটিলতার মধ্যে এসে গেছে,

এই ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত মত- সংবিধান পুনর্লিখিত হওয়া উচিত। যেটা গত আন্দোলনের, অভ্যুত্থানের যে spirit, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে spirit এবং আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোর যে spirit, সেগুলোকে যেন ধারণ করে।

জরুরি অবস্থা জারি- এটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। '৭২ এর সংবিধানে জরুরি অবস্থার বিধান ছিল না। যেটা পরে '৭২ এর সংবিধানকে সংশোধন করে চালু করা হয়েছে। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও জরুরি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। উন্নত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও জরুরি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং জরুরি অবস্থা জারি করার শর্তগুলো কী হবে, সেটা সংবিধানে সুচিহ্নিত করতে হবে। যাতে জরুরি অবস্থা জারি করে জনগণের ন্যায্য আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে যেন টুটি চেপে ধরতে না হয়। সেই ক্ষেত্রে একদিকে জরুরি অবস্থার বিধান রাখা রাষ্ট্রের স্বার্থে, অন্যদিকে গণতন্ত্রের স্বার্থে এটাকে শর্তসাপেক্ষ করে দেওয়া। কীভাবে করব, সেটা সংবিধানে উল্লেখ থাকতে হবে।

বাংলাদেশে কতগুলো বিতর্ক আছে। সেটা হচ্ছে রাজনীতি এবং ধর্ম নিয়ে। আমার মনে হয় এখনও সময় আসেনি যে, এই বিতর্কের অবসান হয়েছে। বরং এই বিতর্কের সূচনা হয়েছে বলা যায়। এই অবস্থায় যারা সংবিধান প্রণয়ন করবেন, তারা স্পর্শকাতর বিষয়গুলো যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যাবেন। সামনের দিকের রাজনীতিতে যাতে এগুলো আরো আলোচনা হয় এবং সেই আলোচনার মধ্য দিয়ে যাতে একটা ঐকমত্য তৈরি হয়।

জাতীয় সংগীত নিয়ে কথা উঠেছে। যে জাতীয় সংগীত ছিল সেটা বজায় রাখা। আরেকটা হচ্ছে নতুন করে কোনো জাতীয় সংগীত লেখা।' ৭২ সালে আমাদের বড় ভুল হয়ে গেছে। যখন এটা গৃহীত হয় তখন আমাদের দেশে বড় বড় কবি ছিলেন। বিখ্যাত দুজন কবি ছিলেন। একজন আল মাহমুদ, একজন শামসুর রাহমান- এঁরা আমাদেরকে একটি চমৎকার নতুন রাষ্ট্রের নতুন জাতীয় সংগীত উপহার দিতে পারতেন। কিন্তু সেটা করা হয়নি। যেকোনো কারণেই হোক, মুহূর্তের উত্তেজনায় আমরা তো অনেক জিনিস করে ফেলি। আসলে ওই '৭১ সালে যে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, সেই উত্তেজনার মধ্যে এই জাতীয় সংগীত ঢুকে গেছে। "আমার সোনার বাংলা" ইত্যাদি। এটা অত্যন্ত বিতর্কিত একটা ব্যাপার। যারা এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন, তারা এই জাতীয় সংগীত বদল চান না। আবার নতুন করে যারা সমর্থন করেছে, তাদের অনেকে এই পরিবর্তনটা চায়। আমার মনে হয়, এই কমিটির জন্য এটা হবে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এটা নিয়ে আরো একটু আলোচনা হওয়া উচিত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, অন্য কোনোভাবেই বা প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে হোক, এই আলোচনাটা চলা উচিত।

সর্বোপরি বিচার বিভাগের যে স্বাধীনতা, সেটা নিশ্চিত করা। সেটা নিশ্চিত করার শর্তগুলো কী হবে, সেটা আমরা যে সংবিধানের কথা চিন্তা করছি, সেই সংবিধানে যেন সেটা লিপিবদ্ধ থাকে। এটা খুবই জরুরি। কারণ এই আন্দোলনের পর দাবি উঠেছে হাইকোর্টের ৫০-এর অধিক বা ৬০-এর কাছাকাছি বিচারপতির পদত্যাগ করতে বলা। এটা কেন হবে? একটা স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে যারা আদালতের বিচারপতি হন নিঃসন্দেহে তারা উপযুক্ত ব্যক্তি, নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবেই হন। কিন্তু ওই যে রাজনৈতিক দল দিয়ে এদেরকে বসানো বা এদেরকে ক্ষমতা দেওয়া বা এদেরকে হাইকোর্টের জজ করা, এটার ফলে সমস্যাগুলো হচ্ছে। একসময় মনে হয় এটা বিএনপ্রির হাইকোর্ট। একসময় মনে হয়, এটা আওয়ামি লীগের হাইকোর্ট। এটি পরিহার করার জন্য কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। সেটা করলে পরে বাস্তবায়ন করা সহজ হবে। এই ধরনের সাজেশন এই কমিশনের কাছ থেকে আসতে পারে।

আমার শেষ কথা হচ্ছে যে, বাংলাদেশ এখন একটা fluid অবস্থার মধ্যে আছে। জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি কথা বলার স্বাধীনতা বা চিন্তার স্বাধীনতা-এই স্বাধীনতা আছে বলেই অনেক বিষয় এখন সামনে আসছে। যেটা চাপা ছিল। সংবিধান কমিশন এইসব দিকেও একটু নজর রাখবেন এবং নতুন কী কী ইস্যু এই আগস্টের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এসেছে। আর কী কী ইস্যু একেবারে '৭২ থেকে এখন পর্যন্ত চালু আছে। সব মিলিয়ে একটা সংবিধান- যেটা সর্বজন গৃহীত হবে এবং সর্বজনমান্য হবে। সেরকম একটা সংবিধান যাতে আমরা রচনা করতে পারি এবং জনগণকে উপহার দিতে পারি, সেটাই হবে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্য, এটুকুই আমার সাজেশন।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ।

আমরা অত্যন্ত স্বল্প সময়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আপনি আমাদের নিজেদেরই একজন। সে জন্য আমরা দুঃখিত। আপনার বক্তব্য রেকর্ড হয়েছে। আপনি যদি আরও বিস্তারিতভাবে আমাদের জানাতে চান, তাহলে ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে জানালে আমাদের কাজে সহায়ক হবে। এটা রেকর্ড হয়েছে। এটার কার্যবাহ হবে। প্রত্যেকটা বিষয় পর্যালোচনা এবং বিবেচনা কমিশনের থাকবে। তারপরও অতিরিক্ত যুক্ত করতে চাইলে আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি যে, ২০ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছানো যায়, তাহলে আমাদের জন্য সহায়ক হবে।

এখন আমি অনুরোধ করব, শাহিন আনামকে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য।

শাহিন আনাম (অংশীজন): আমাকে ডাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আরম্ভ করছি। ৩জন বক্তব্য রেখেছেন। আমার পাশে অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ বসে আছেন। সবাই এত সুন্দর technical to the point সব কথা বলেছেন। আমি কিন্তু খুব সাদামাটা কথা বলব। আমি একজন মানবাধিকার কর্মী, নারী অধিকার এবং প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করি। এটা আমার দীর্ঘদিনের আন্দোলনের মতো আপনি বলতে পারেন।

আমার আগের বক্তা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ প্রায় শেষের দিকে আমাদের "জাতীয় সংগীত" নিয়ে কথা বলেছেন। আমি এখানে কিছু বলতে চাই। এই গানটা কে লিখেছে, এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ না। কিন্তু এই গান আমরা সবাই প্রাণে ধারণ করি। এই আমাদের "জাতীয় সংগীত"। এই গান করে করে দেশ স্বাধীন, অবশ্য তখন এটা জাতীয় সংগীত ছিল না। কিন্তু এই গানটাকে আমরা ধারণ করি। এই গানের এমন প্রভাব যে গান করলে এখনও আমাদের চোখে পানি আসে। "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি", এটা আমরা emotionally দেখি। কিন্তু আমার মনে হয়, কয়েকটা বিষয় বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকা উচিত। আমাদের জাতীয় সংগীত এমন একটি বিষয়। এটা আমার মতামত। এটার হয়তো কারণ যে, আমাদের প্রজন্মই দেশ স্বাধীন করেছিল। হয়তো ওই আবেগই আমাদের অন্য রকমের হতে পারে। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী একটি যুদ্ধের পরে লাখো লাখো মানুষের আত্মত্যাগের পর এ দেশটা স্বাধীন হয়েছিল। অবশ্যই কিছু রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করেছে নিজেদের ফায়দার জন্য। এটার এই অর্থ না যে, মুক্তিযুদ্ধ ভুল ছিল বা মুক্তিযুদ্ধকে আমরা খাটো করে দেখব। আমার বিনীত অনুরোধ, এটা মনে রাখা যে, মুক্তিযুদ্ধে কোনো গলদ ছিল না। এটা পরবর্তীকালে যেভাবে ব্যবহার হয়েছে, সেখানে গলদ আছে। সেখানে একটা পরিবার, এটা হরফ করে নিল। 'জয় বাংলা' বলে কিন্তু আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু এটা পড়ে কী হলো; একটা রাজনৈতিক দলের স্লোগান হয়ে গেল। সেটা তো হওয়ার কথা ছিল না। এটা তো সবার স্লোগান হতে পারত। আমি এটা বলে শুরু করলাম। একটা কথা আমি আগে বলতে চাই যে, ওই বিতর্ক যে, নতুন করে সংবিধান লেখা হবে না সংশোধন করা হবে। অবশ্যই এটা একটা বিতর্ক। আমার গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুরোধ, please, *don't throw the baby* out with the bathwater. আমাদের সংবিধানে অনেক ভালো কিছু আছে। অনেক কিছু আছে। ওই সময়কার এটা কিন্তু বিশ্বনন্দিত, একটা recognize, একটা ভালো সংবিধান বলে পরিচিত ছিল।

তারপরে যেটা সুব্রত চৌধুরী বললেন ১৭টি সংশোধন করা হয়েছিল। কেন সংশোধন করা হয়েছিল? প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল নিজের ফায়দা populist করার জন্য এটার মধ্যে সংশোধন এনেছে। আনার কারণে এখানে একটা ছেরাবেরা অবস্থা, যেটা ভাষায় বলে। এই অবস্থা চলে এসেছে। এখন কী আছে, কী নাই; এখান থেকে খুঁজে বের করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কয়েকটা বিষয়ের কারণে আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম। এটা হলো ন্যায়বিচার, বৈষম্যহীন সমাজ, ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এইতো ৪টি স্তম্ভ। আমি জানি, এটা নিয়েও এখন বিতর্ক হচ্ছে। সবচেয়ে বড় বিতর্ক হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে। আসলে তখন ভুল হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতা ভালো করে ব্যাখ্যা করা হয়নি। এটা নিয়ে একটা ভালো আলোচনা, একটা জনসচেতনতা যে, আসলে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থটা কী? ধর্মনিরপেক্ষতার মোটেও অর্থ না যে অন্য কোনো ধর্মকে হেয় করা যাবে বা ইসলাম বাদ দেওয়া যাবে। এটা যদি কেউ মনে করে থাকে, এটা সাংঘাতিকভাবে একটা ভুল হয়ে গেছে। আমি successive political partyগুলোকে দোষ দিব। ধর্মনিরপেক্ষতাটা কিন্তু মনে হচ্ছে একটা চাপানোর মতন বিষয়টা হলো। কিন্তু ভালো করে ব্যাখ্যা করা হয়নি। এখানে আমি একটু বলছি নজর দিতে। সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার–এই সবগুলো কিন্তু আমাদের সংবিধানে অলরেডি আছে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া, এটাও এই সংবিধানে আছে। আমি যেটা বারবার বলছি, এই ভালো বিষয়গুলো যেটা আমাদের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এরমধ্যে যে আন্দোলন হয়েছে, গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, এটা কোনোমতে পরিপন্থি না। গণঅভ্যুত্থান করে তো বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মুখে আজকের এই অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে। যেগুলো পরিপন্থি না, সেটা আমরা বাদ দিব কেন? পুরাটা বাদ দিয়ে দেওয়ার কথা বলছে, নতুন করে লেখা। নতুন করে লেখার একটা ভয়ভীতি কিন্তু আছে যে, একটা it might open a ponderous box, যেটা সামাল দিতে আমাদের একটা অসুবিধা হতে পারে। জাস্ট ওয়ার্ড অফ কোশ্চেন অন দিস। আমি যেটা বলব, এমন সংবিধান হওয়া উচিত যে, এটার মধ্যে এমন চেকস্ এন্ড ব্যালান্স থাকবে যাতে আমরা আগের জায়গায় ফিরে না যাই। আমরা ১৬ বছরের যে experience করলাম। এখানে যেন চেক এন্ড ব্যালেন্স থাকে

নিরংকুশ ক্ষমতায়, যেটা অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর নিরংকুশ ক্ষমতা কীভাবে ঠেকানো যায়? আমি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি না। আমি কিন্তু এটা বলতে পারব না। কিন্তু অনেক দেশে যেমন বিরোধী দলকে যেমন "ছায়া মন্ত্রিসভা" বলা হয়। একটা shadow -এর মতো এখানে ও রকম কিছু নাই। একজন বিরোধীদলীয় নেতার যে সম্মান, সে তো একটা ছায়া প্রধানমন্ত্রী। যেটা UK-তে আছে। এরকম কিন্তু ব্যবস্থা আমাদের এখানে নাই। সুতরাং সবসময় বিরোধীদলকে হেয় করার প্রবণতা আমরা দেখি। একটা Toxic relationship between different political parties, এটা আমরা সংবিধানে কীভাবে বাদ দিতে পারব। এটা আপনারা চিন্তা করতে পারেন।

আরেকটা হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠের বিষয়ে জনাব সুব্রত চৌধুরী ও অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেছেন। আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিষয় আমাদের দেশে খুব fair থাকে না। কিন্তু মনটা একটু ছোট নিয়ে থাকে। প্লিজ, এটা বিশ্বাস করেন। আমি কেন বলছি? আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই। আমার অফিসের এক কলিগ যে অন্য ধর্ম অবলম্বন করে। সে বলে যে, আপা এমন না যে আমাদেরকে সব সময় কেউ মারতে আসছে। এমন নাই বাংলাদেশে। কিন্তু আমাদের মধ্যে ভয় আছে যে, মারতে পারে।

সুতরাং সংখ্যালঘুদের আমরা কীভাবে আস্থা ফিরিয়ে আনব, এই সংবিধানের মাধ্যমে যেটা অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেছেন। আমাদের যতগুলো আদিবাসী আছে, তারা তো সব সময় বলে আমাদের সাংবিধানিক কোনো পরিচয় নাই। সবাই বাঙালি। তাদের নাম উল্লেখ করে তাদের জন্য সমান অধিকার। সম-অধিকারের অর্থ কী? নাগরিক অধিকার, তাই না। এই দেশে যারা জন্ম নিয়েছে, সে যেই কাজই করুক, যে ধর্ম থেকে আসুক, যেই কাজ তার হোক, সে পাহাড়ে বা সমতলে থাকুক, নারী-পুরুষ, সবার অধিকার এক। এটা তো একটা মৌলিক বিষয় আমরা আমাদের সংবিধানে রাখব কি রাখব না? এটা চিন্তা করেন। তারপরে আসে আন্তর্জাতিক সনদ, মানবাধিকার UNHCR. যেটাতে আমরা সবাই সাইন করেছি, আমরা বিশ্বাস করি। মানুষ হওয়ার দরুন সে কিছু অধিকার নিয়ে চলে আসে। তার কাছ থেকে এটা নেওয়া যাবে না। It is individual inheritance. সুতরাং আমরা কি এটা বিশ্বাস করি নাকি? এটাই হলো প্রশ্ন যে, আমরা কতদূর যাব একটি মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্য। সে যেই হোক না কেন, এদেশে জন্ম নিয়েছে, সে এদেশেরই নাগরিক এবং সে একটা মানুষ। এটা আমাদের সংবিধানে কীভাবে আনা যাবে, একটা culture of the fair কথা বলতে গিয়ে ভয় যে, আমার কী হবে? আমি ছোট্ট উদাহরণ দেই। গত সরকার আমার সমস্ত funding বন্ধ করে দিয়েছিল "মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের"। আমি কেন মানবাধিকারের কথা বলি, আমরা দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছি ইত্যাদি। এই কালচার অফ ফিয়ার থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। আমাদের সংবিধানে freedom of thought and freedom of expression আছে। কিন্তু মূল কথা হলো যে, আপনি একদম সোনা দিয়ে মোড়ানো একটা সংবিধান করেন, সেটার প্রয়োগ হয় কি, হয় না; কে মনিটর করবে।

তিনি Ombudsman-এর কথা বলেছেন। এটা খুবই ভালো একটা প্রস্তাব। আমি জানি না, who will be the ombudsman. যে একটা oversight role play করবে যে, এই সংবিধান যখন গ্রহণ করা হবে, এটা যেন বাস্তবায়ন হয়। আমরা প্রতি মুহূর্তে, প্রতিনিয়ত সংবিধানের লঙ্ঘন করেছি এবং successive political parties, সরকার মিলে সবাই এটা করেছি।

আমাদের পাশে স্থানীয় সরকারের একজন বিশেষজ্ঞ বসে আছেন। আমি এটা নিয়ে কিছু বলব না। কিন্তু স্থানীয় সরকার বিকেন্দ্রীকরণ মনে হয়, আমাদের agenda থেকে বাদ পড়ে গেছে। It is not even discuss any more. কিন্তু স্বায়ত্বশাসন, এটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য, এটা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের অনেক অনেক সমস্যা সমাধান হতো। আস্তে আস্তে কী হলো? বিকেন্দ্রীকরণ তো বাদই হয়ে গেল। আমি ১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করব। পুরো বিষয়টি রাজনীতিকরণ হয়ে গেল। ১৬ বছর আগেও যে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন হতো, তাতে মনে হতো যে, না তারা একটু স্বাধীন। তারপরে আস্তে আস্তে সবকিছুই রাজনীতিকরণ করা হলো এবং একটা রাজনৈতি দল সেটাও হরফ করে ফেলল।

আপনি যে জাতির পিতার কথা বলেছেন, এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দেশে আছে। ইউএসএতে আছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ।

তত্ত্বধায়ক সরকারের বিষয়টি খুবই ভালো একটা প্রস্তাব। যেটা ulterior motive-এ বাদ দেওয়া হয়েছিল। dianastick rule কীভাবে বন্ধ করা যায়। সেটা নিয়ে একটু চিন্তা করেন। আর এটা খুব ভালো প্রস্তাব যে, একজন প্রধানমন্ত্রী আমেরিকায় যেমন হয়, ২বারের বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। সেটা করলে হয়তো dianastick rule কিছুটা address হতে পারে। এটাও আপনারা চিন্তা করতে পারেন।

আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): এখন আমরা শুনব অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ-এর কাছ থেকে।

অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ (অংশীজন): আসসালামু আলাইকুম।

অনেক ধন্যবাদ, আমাকে আমন্ত্রণের জন্য। আমি দেশে ছিলাম না। আমি কালকে রাত সাড়ে বারোটার দিকে এসেছি। আমার সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হয়েছিল। আমি কিছু লিখতে পারি নাই। কিছু লেখা আছে আমার। সেগুলো available করব। তবে এখানে এসে যে কথাগুলো আমি শুনলাম দুজনকে অন্তত শুনতে পারিনি। বিশেষ করে মাহবুব উল্লাহ ভাই বলেছেন। আমি প্রায় সবগুলোর সাথে একমত। এখানে আমার কিছু পুনরাবৃত্তি হতো। আমি আর এগুলো বলছি না। শুধু এটুকু বলব যে, আজকাল অনেকে প্রদেশের কথা বলেন। আমিও কঠোরভাবে এর বিরোধীতা করছি। কারণ বাংলাদেশ এক ভাষার দেশ। ভূখণ্ডগতভাবে ওই রকম বড় ধরনের কোনো separation নাই। সেজন্য এখানে হয়তো এখানে যে জিনিসটা নাই, সেই জিনিসটা আনতে গিয়ে একটি বিপদ করে ফেলতে পারি। সেজন্য প্রদেশের এই বিষয়টা আমি গভীরভাবে অনুধাবন করি যেটা বোধহয় খুব বাস্তব সম্মত হবে না। তবে ওটার একটা বিকল্প হিসেবে আমরা স্থানীয় সরকার পদ্ধতিকে যদি শক্তিশালী করি তাহলে তাতে কিছুটা কাজ দিবে। সে বিষয়ে আমি পরে বলব।

তত্ত্বাবধায়কে ফিরে আসা-এটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক কিছুর সমাধান একটি সিঙ্গেল বিষয় করে দিতে পারে। বিশেষ করে দীর্ঘদিন আমাদের দেশে নির্বাচন হচ্ছে। ওটার কারণে খারাপ বিষয় আমাদের সমাজের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। সেজন্য এটাও খুব গুরত্বপূর্ণ। বিশেষ করে শাহিন আনাম যা বলেছেন। মানবাধিকার সংক্রান্ত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংক্রান্ত এগুলোর সাথে আমি একমত। আমার নিজের কথা বলতে গেলে আমি মনে করি এই কমিশনটা অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিশন। কারণ অন্য যে কমিশন কাজ করছে, সে কমিশনগুলোর কাজের সাথে এই কমিশনের কাজের গভীর সম্পর্ক রয়ে গেছে। এগুলো এখানে support না আসলে বাকি কমিশনগুলো সুপারিশ দিলেও তা সুপারিশ হিসেবে থাকবে না। সেই হিসেবে সংবিধান সংশোধনের জন্য যে কমিটি বা উন্মুক্তভাবে লেখার জন্য যে কমিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে আমাকে ডাকাতে আমি সম্মানিত বোধ করছি। অনেকগুলো কথা বলতে পারব বলে মনে করছি।

প্রথমত একটা বিতর্ক এখন শুরু হয়েছে 'প্রজাতন্ত্র' হবে, না অন্য কোনো শব্দ হবে। যেহেতু 'Republic' হয়েছে। Republicটা হয়েছে রাজার বিরুদ্ধে movement প্রয়োগ করে। আমরা রাজার বিরুদ্ধে movement করি নাই। তাহলে আমাদেরটা কী হবে; কী নাম হতে পারে। একটা পরামর্শ এরকম আসতে পারে বা 'জনগণতান্ত্রিক' শব্দটা খাপ খায় কি না, আমি জানি না। আমার প্রজাতন্ত্র নিয়ে ব্যক্তিগত আপত্তি নাই। যদি আমরা sense বুঝি যে, একটা জনগণতান্ত্রিক sense নিয়েই প্রজাতন্ত্র। সেজন্য শব্দগত যে বিষয়টি সেটি বিবেচনার বিষয় থাকতে পারে।

সাবভৌমত্বের বিষয় নিয়ে তাত্ত্বিক কথা অনেক রকম আসতে পারে। আমার মনে হয়, কমিশনের একটু ভেবে দেখা দরকার। আমরা সংবিধানে 'সাবভৌমত্ব' যেভাবে ব্যবহার করেছি বা যেভাবে বুঝে থাকি, এটি হচ্ছে বহিরাগত। বাইরের আগ্রাসন থেকে নিজেদেরকে নিরপদ রাখার জন্য যেটা সেটাকে সার্বভৌমত্ব বুঝি। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব বিষয়ের মধ্যে সাবভৌমত্বের কিছু প্রভাব থাকতে পারে। যেমন বৃটেনে পার্লামেন্টকে সার্বভৌম বলা হয়। এখন আমাদের এখানে কী পার্লামেন্ট সার্বভৌম, না সংবিধান সার্বভৌম, না জনগণ সার্বভৌম? এই বিষয়টার মধ্যে একটা operational কিছু ব্যাখ্যা বোধহয় আনার দরকার আছে। আসল sovereignty lies with the people. জনগণ তার অভিব্যক্তি কীভাবে করবে? প্রভাব কী এটার। সেটা হয়তো তার প্রতিনিধির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে। সেই ক্ষেত্রে সংসদ যেমন কিছুটা আংশিক সার্বভৌমত্ব experience করবে, সংসদে যারা নির্বাহী, তারা সার্বভৌমত্বের কিছু অংশ apply করবে। ঠিক বিচার বিভাগও এটা ধারণ করবে এবং বিচার বিভাগও apply করবে। একই রকমভাবে অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে। যেমন- যদি স্থানীয় সরকারের কথাই বলি এটা এখন যেভাবে আছে। ওখানে হয়তো অনেক রকমের reform দরকার হবে। কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি বিভিন্ন পর্যায়ে থাকে, ওখানেও sharing এর প্রশ্ন আসবে। সেই ক্ষেত্রে এখানে একটা balancing act কীভাবে হবে? কারণ অন্য কোনো সংবিধানে এরকম কোনো উদাহরণ নাই।

সার্বভৌম বললে আমরা রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এতদিন ধরে যা বুঝে আসছি সেখানে এখন বোধহয় এই সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞায়িত করার একটা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এটা হয়তো আরো অনেকের জন্য অগ্রহণীয় হতে পারে। এটি তাত্ত্বিক দিক থেকে বললাম। অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেছেন। তারাও বলেছেন। সেটা হচ্ছে যে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ৪টি যে বলা আছে, সেই ৪টির প্রয়োগ তো এখন হয় না।

এটা কীভাবে রাখব? যেমন- সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো জিনিস আছে। সেই জিনিসগুলো বর্তমান বাজার পদ্ধতির মধ্যে যে সমাজব্যবস্থা চালাচ্ছি, যে অর্থনীতি চালাচ্ছি তাতে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। সেই জন্য এগুলো পরিষ্কার করার দরকার আছে। এগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ করার দরকার আছে। যেমন- ব্যক্তিমালিকানার ৩টি খাত বলা আছে। অনুচ্ছেদ ১৩ এ আছে, রাষ্ট্রীয় মালিকানা, ব্যক্তি মালিকানা, সমবায় মালিকানা। সমবায় মালিকানা এখন কিন্তু কোনো কার্যক্রমের মধ্যে নাই। সমবায় কোনো নীতি কাঠামোর মধ্যেও নাই। এটা নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা হচ্ছে না। কিন্তু বড় বড় ডিপার্টমেন্ট আছে। তারা কিন্তু রাষ্ট্রের বড় একটা পয়সা

খরচ করে। সবকিছু করে। কিন্তু ওইভাবে সমবায়ের কোন কাঠামো নাই এবং এটা নিয়ে কোনো নীতি চর্চাও নাই। তাই এই বিষয়গুলো দেখার আছে।

অনুচ্ছেদ ২১ ও ২২ আমরা যদি দেখি। ২১ এর মধ্যে বলা আছে যে, "সকল সময় জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির কর্তব্য।" কিন্তু এটার প্রভাব কোথায় কোথায় যেতে পারে? সংবিধানের মূল নীতিগত দিক আর operational দিক, এটির মধ্যে একটা সমন্বয় ব্যবস্থা, এটা কিন্তু দেখার বিষয় আছে। মূলনীতিতে নীতি কাঠামোতে অনেক কিছু বলা হয়েছে। এটা যখন বাস্তবায়নের দিকে যাচ্ছি তখন এটার প্রতিফলন কোথায় হয়েছে?

ঠিক একইরকমভাবে অনুচ্ছেদ ২২ এ আছে- "রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।" এটি ঠিক আছে এটা মাসদার হোসেন মামলার কথা সুব্রত চৌধুরী বলেছেন। আমি যখন আসলাম তখন শুনতে পাচ্ছিলাম। এখানে আমি একটা জিনিস যুক্ত করতে চাই। আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ৩টির সমন্বয় যেমন থাকবে, তেমনি পৃথকীকরণও থাকতে হবে। আমাদের আইন বিভাগ কিন্তু কোনো পৃথকীকরণ মানে না। আমাদের আইন বিভাগ কিন্তু সবকিছুর মধ্যে হাত দিতে চায়। সেজন্য এখানে আইন বিভাগের কথাটা থাকা দরকার আছে। কারণ অনেক সময় তারা conflict of interest হচ্ছে। আইন বিভাগের লোকজন গিয়ে প্রশাসন বিভাগে কাজ করছেন। যেমন- তারা স্থানীয় সরকারকে হস্তক্ষেপ করছে। উন্নয়ন করার জন্য তারা টাকা চাচ্ছেন। সেটা নিচ্ছেন এবং স্থানীয় উন্নয়নের পুরোটাই তারা মোটামুটি swallow করে ফেলেছেন। শুধু পৃথকীকরণের জায়গার মধ্যে শুধু বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ না। এখানে আইন বিভাগেরও নিজস্ব সীমার মধ্যে সংবিধান যেভাবে নির্ধারণ করে দেয়, তারা যেমন তাদেরকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে পারে। কিন্তু সে গিয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অপারেশনাল সাইডে গিয়ে এই জায়গাটা পরিষ্কার করা দরকার। কারণ সরকারকে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখার দায়িত্ব সংসদ-সদস্যদের। আইন-প্রণয়ন আছে ও আইনের সংশোধন এরকম ক্ষেত্রে সরকারকে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখা। ঠিক একই রকম স্থানীয় পর্যায়ে যারা প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকারের জবাদিহিতার ক্ষেত্রেও তাদের একটি ভূমিকা থাকতে পারে। কিন্তু সরাসরি কাজ করা না। সেজন্য অনুচ্ছেদ ২২ এর মধ্যে আইন বিভাগকে কোনোভাবে আনা যায় কিনা; সেটা একটু চিন্তা করতে হবে। আমি একটু অপারেশনাল কথা বেশি বলব। তাত্ত্বিক কথা যতটুকু বলা দরকার, ততটুকু বলে শেষ করে দিচ্ছি। তারপর

রাজনৈতিক সংগঠন করার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, এগুলো তো ঠিক আছে। কিন্তু অন্যান্য সংগঠনের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের এই সংবিধানে রাজনৈতিক দল সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা দেওয়া ছাড়া আর কিছু নাই। অনুচ্ছেদ ১৫২ তে ব্যাখ্যার অংশে শুধু বলা আছে, "অধিসঙ্ঘ এবং কিছু মিলিত ব্যক্তির একটি কাজ এটাই রাজনৈতিক দল"। না, এটুকুর মধ্যে আমি সন্তুষ্ট না। পার্লামেন্ট এবং আমার সরকার যেহেতু দল দ্বারা চালিত হয়, তাহলে রাজনৈতিক দলের একটা পরিষ্কার সংজ্ঞা সংবিধানে থাকা দরকার আছে। রাজনৈতিক দল হলে তার কী করতে হবে? তার কী কী দরকার আছে? তার দায়িত্ব কর্তব্য কী? এসব জিনিস কোনো একটা জায়গায় পার্লামেন্টের আগে হোক বা পরে হোক, কোনো একটা জায়গায় রাজনৈতিক দলকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। শুধু অনুচ্ছেদ ১৫২ এর যে ব্যাখ্যা আছে অতটুকুর মধ্যে থাকলে চলবে না। এটাকে আরো বিস্তারিত করতে হবে। তবে সংবিধানে সবকিছু থাকতে হবে এমন কোনো কথা না। এতে মূলনীতির নির্দেশনাটা তো থাকতে পারে। তবে আমাদের এই উপমহাদেশ ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ। যেমন আমেরিকার সংবিধান খুব ছোট। সুইজারল্যান্ডের সংবিধান খুব ছোট। শুধু মূলনীতি কাঠামো থাকে। আমাদের এখানে মূলনীতি কাঠামোর সাথে কিছু operational side না থাকলে আমরা এই সংবিধান বাস্তবায়ন করতে পারব না। সে কারণে এসব দিকেও কিছু কাজ করার আছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক দলকেও সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার বিষয় আছে। অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহর একটি কথার বিষয়ে একটু দ্বিমত পোষণ করছি। নির্বাচিত পার্লামেন্ট আসবে।

এরমধ্যে আমি কী এরকম গণপরিষদ নামক একটা জিনিস করে সংবিধানকে অনুমোদন করে নির্বাচনে যাব কি না; আমি এটা চিন্তার জন্য বলছি। গণপরিষদ আলাদা থাকুক। গণপরিষদ সংবিধানকে পরিচালনা করবে। তারপর এটা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। একটা গণপরিষদ গঠন করে সংবিধানকে adopt করার পরেই পূর্ণাঙ্গ নির্বাচন। কারণ নির্বাচিত সরকার যখন আসবে তাদের লক্ষ্য থাকবে সরকার করা। তাদের দলের নেতৃত্বে সরকার হওয়া। সংবিধানের মধ্যে তখন সরকার আর সংবিধানকে গুলিয়ে ফেলবে। সেজন্য একটি গণপরিষদ করে সংবিধানকে adopt করার পরে ওই সংবিধানের অধীনে নির্বাচন হোক। এটা কী আনুপাতিক হারে থাকবে কি থাকবে না, এককক্ষ, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হবে কি না; সেটা আগে ঠিক হয়ে যাক। তারপরে নির্বাচন হোক। অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহর বক্তব্যের সাথে একটি বিষয় যোগ করলাম।

তারপর বিচার বিভাগ সম্পর্কে আমার শুধু ২টি কথা। এটা কোনো বিশেষ ধারা সম্পর্কে না। একটা হচ্ছে- দেশে যে জনসংখ্যা বেড়েছে। প্রশাসনের মধ্যে অনেক গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। সমাজ জীবনের পরিবর্তন, যেটি অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেছেন। নগরায়ন

aggressively সম্প্রসারিত হয়েছে, ruralisation এটি সংকোচন হয়েছে seriously. আমি গ্রামীণ এলাকার কথা বলি। তাদের জীবিকা, তাদের মনোভাব, তাদের কালচার কিন্তু গ্রামীণ না এবং remote rural তো না-ই। সুতরাং এখানে একটা বিষয় আমরা লক্ষ করছি যে, ব্রিটিশ আমলের কোনো এক সময় একটা সালিশ কেন্দ্র করা হয়েছিল। এটা এখনো আমি ইউনিয়ন পরিষদকে গ্রাম আদালত বলছি। এটা আসলে আদালতও না গ্রামও না। আর নির্বাচিত একটা ব্যক্তির অধীনে মার্কা নিয়ে হোক বা মার্কা না নিয়ে হোক আমি এরকম কোর্ট রাখতে পারি না। সেজন্যই এখানে খুব পরিষ্কারভাবে আমাদের উপজেলা পর্যায়ে নিম্নআদালতে যাওয়া দরকার আছে। উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে হবে। কারণ উপজেলাতে সবকিছু আছে। অন্য সব বিভাগ আছে। সবকিছু আছে। কিন্তু আদালত ব্যবস্থা নাই। উপজেলা পর্যায়ে আদালতের প্রয়োজন। এখন দেশে এটা কোনো সমস্যা না। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ল' ডিপার্টমেন্ট হয়েছে। প্রচুর ল' গ্র্যাজুয়েট তৈরি হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে প্র্যাকটিস করার মতো লোকের কোনো অভাব হবে না। আমাদের কতজন মানুষের জন্য একজন বিচারক আছে সেটা যদি দেখেন এটা খুবই অসমানুপাতিক। আর যদি উপজেলা দেখেন, কোনো কোনো উপজেলার জনসংখ্যা ১০ লক্ষের অধিক। কিন্তু সেখানে কোনো আদালতই নাই। জেলায় যেতে হচ্ছে। এগুলোর বিষয়ে মানুষের সত্যিকার অর্থে ভোগান্তি আছে। আদালত না থাকার কারণে আমি আজ থেকে ১০ বছর ধরে চিৎকার করছি। কেউ কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না। আমি জানি না, কেন হয় না? একটা জাতির আদালত নাই অথচ বিচার হচ্ছে। কোথায় হচ্ছে? জায়গা-জমির বিচার, টাকা পয়সা না দেওয়ার বিচার, মারামারির বিচার এমনকি criminal মামলা- এগুলো থানা করে। সাভারে আমাদের ঘরের কাছে। চট্টগ্রামে আমি কয়েকটি থানাতে গিয়ে দেখেছি যে, একজন এসআই এর নেতৃত্বে রাতে ৭/৮টি সালিশ বসে। তাদের নিয়োজিত ল্যান্ড সার্ভেয়ার আছে। আমিন আছে। তারা দিনের বেলায় জমি মেপে আসে। রাতে বিচার করে। সব থানা এগুলো করে। এটা করার থানার কী অধিকার আছে? সব বিচার বিভাগের লোকজন দেখতেছেন। যারা legal mind-এর আছেন, তারা দেখতেছেন। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছেন না। থানাতে কিন্তু বিচার হতো। থানার অবস্থা খারাপ দেখে এখন হয়তো হচ্ছে না। থানাই সব চূড়ান্ত করছে। ভারসাম্যের জন্য হলেও উপজেলায় যেহেতু শক্তিশালী নির্বাহী আছে, রাজনীতিবিদরা আছে, পুলিশ তারও চেয়েও শক্তিশালী। একজন এমপি উপজেলাতে ৩টি জায়গায় গিয়ে বসেন। একটি বসেন এলজিইডি অফিসে। একটি হচ্ছে ওসির অফিসে গিয়ে ওসির চেয়ারে বসেন। আরেকটি হচ্ছে ইউএনও অফিসে। তাহলে থানাকে আমরা একটা লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছি, এগুলো করার জন্য। সেজন্য ওখানে বিচার বিভাগ না হলে ভারসাম্য আসবে না। ম্যাজিস্ট্রেসি বা কোর্ট দেওয়ানি ও ফৌজদারি নিম্নআদালত উপজেলায় যাওয়া দরকার। এটি এরশাদের আমলে গিয়েছিল। বেশ কিছুদিন কাজ করেছে এবং হাসান আব্দুল হাই আমাকে নিয়ে একটি study করেছিলেন। আমরা এটার মধ্যে অনেক ভালো জিনিস দেখেছি। বিশেষ করে মেয়েদের মামলাগুলো। খোরপোষের মামলা। এগুলো দেখা গেছে একদম ক্লিন হয়ে গেছে। তারা জেলা শহরে গিয়ে অনেকে করতে পারে না। আর ওখানে সাক্ষী আনতে কোনো অসুবিধা হয় না। তারপরে মীমাংসা অনেক সময় কোর্টে করে না। এটা এডিআরের মতো করে গ্রামে দিয়ে দেয়। কোনো স্কুলের টিচারক দিয়ে দেয়। কাউকে দিয়ে দেয়। এভাবে করেছে। আমি দেখেছি যখন লাঙ্গলকোট এবং চান্দিনার কোর্টকে আমরা study করেছিলাম। প্রথম যখন কোর্ট শুরু হলো প্রায় ১২ শত, ১৫ শত মামলা হয়েছে। একটা হচ্ছে, মহকুমা হাকিমের ওখান থেকে মামলা চলে আসছে। জেলা থেকে মামলা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে মামলার সংখ্যা বেড়ে গেছে।

আরেকটা হচ্ছে, মানুষ কোর্ট-কাঁচারিতে মামলা করেছে। কিন্তু কোর্টে তো মানুষের access নেই। দ্রুত বিচার হয়েছে, পরে দেখা গেল যে কয়েকশ মামলার বেশি আর নাই । আমি জানি না, আমাদের আইনজীবি কমিউনিটি এবং জাজ কমিউনিটির মধ্যে একটা রক্ষণশীলতা কাজ করে যে, নিচের দিকে কোর্ট দেওয়া যাবে না। এই কমিশনকে এটা একটু দেখার জন্য বলব।

আরেকটা হচ্ছে হাইকোর্ট। অনেকে যুক্তি দেন এটা federal country না। সে কারণে হাইকোর্টকে বিকেন্দ্রীকরণ করা যাবে না। কিন্তু সংবিধানে থাকলে আমি পারব না কেন? আমার পদ্ধতি এককেন্দ্রিক। আমি মনে করি যে, অন্তত দেশের ৪টি পুরোনো বিভাগের মধ্যে ঢাকাতে তো আছেই- বাকি ৩টি বিভাগে সার্কিট কোর্ট বা হাইকোর্টের বেঞ্চ বলুন, এটা স্থায়ীভাবে করার দরকার আছে। কারণ সব মানুষকে ঢাকায় আসতে হবে কেন? শুধু বিচার বিভাগ সম্পর্কে এই দুইটা বিষয় আমি বললাম। এটা কীভাবে adopt করা যায়, এটা আপনারা দেখতে পারেন।

আর আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হওয়ার দরকার আছে। আমাদের এই অঞ্চলে এক কক্ষবিশিষ্ট, আমরা ছাড়া আর কেউ নাই। যেহেতু আমাদের পদ্ধতি নাই। আমাদের দ্বিকক্ষটি কোন প্রকৃতির হবে, সেটা একটু ভাবার বিষয় আছে। তবে এটাতে একটা ভারসাম্য আনতে হবে। পুরোটা রাজনীতিবিদের ওপর দিয়ে দেওয়া যাবে না। পুরোটা যেন আবার সিভিল সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে। তাহলে সিভিল সোসাইটি আর থাকবে না। সবাই political side হতে চাইবে। সবাই সদস্য হতে চাইবে। এখানে একটি ভারসাম্য দরকার আছে। কারণ আমাদের সিভিল সোসাইটির অনেকেই মনে করছে যে, আমি তো এখানে যেতে পারি না। আমার মনে হয়, ওখানে একটি জায়গা সৃষ্টি

হচ্ছে। NO, this is not true. এটা রাজনীতিবিদদের জায়গাই। তবে হ্যাঁ, কোন ধরনের রাজনীতিবিদ হবে? এটি একটু ভারসাম্য আনার দরকার আছে। এখানে নারী প্রতিনিধিত্ব নিয়ে ভাবার দরকার আছে। ওই দ্বিকক্ষটি কতটুকু নির্দলীয় হবে। তার একটি ব্যালেন্সিংয়ের দরকার আছে। বিদেশে এক্ষেত্রে অনেকগুলো অভিজ্ঞতা আছে। এগুলো দেখে নতুন করে মনোযোগ দিয়ে হবে।

আপনি অনুচ্ছেদ ৬৫ যদি দেখেন। আমি অনুচ্ছেদ ৬৫-তে একটি বিষয় উল্লেখ করব। এটা আইন সভা। অনুচ্ছেদ ৬৫-র শুরুর প্রথম প্যারাটি ঠিক আছে। দ্বিতীয় প্যারাতে যদি দেখেন "তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন- দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকারিতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।" পার্লামেন্টেকে খাটো করে দেওয়ার জন্য এই বিষয়টিই যথেষ্ট। কারণ পার্লামেন্টকে ক্ষমতা দেওয়ার পরে আবার এখানে তবে শর্ত দিয়ে সব ক্ষমতা নিয়ে নেয়া হয়েছে। সব ক্ষমতা নির্বাহীর কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরকম একটা পদ্ধতি আমাদের সংবিধানের বিভিন্ন জায়গাতে আছে। মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রেও আছে। আরো অনেক ক্ষেত্রে আছে। স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে আছে যে, পার্লামেন্ট যেভাবে নির্ধারণ করিবে সেই রূপে হইবে। পার্লামেন্ট কিরুপ নির্ধারণ করে আমরা দেখেছি। সুতরাং এখানে guaranty clause থাকা দরকার আছে। স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে আমি বলব, ইন্ডিয়াতে ৭৩, ৭৪ সংশোধন যেটি হয়েছে, এটি দীর্ঘ সময় আলোচনার পড়ে হয়েছে। ৭৩, ৭৪ সংশোধনগুলে রাজীব গান্ধী উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি পারেননি। ভিপি সিং চেষ্টা করেছেন, হয় নাই। এটি আল্টিমেটলি গিয়ে নরসিমা রাও-এর সময় হয়েছে। তখন সকল দলের সম্মতিতে হয়েছে। সকল দলের সম্মতি হয়েই কিন্তু ৭৩, ৭৪ সংশোধনী পাস করেছে। ইন্ডিয়ান সংবিধানে আগে স্থানীয় সরকার ছিল না। কারণ গান্ধীজি এবং ভীম রাও আম্বেদকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। আম্বেদকার বলছেন যে, এমনিতেই আমরা কোনো ক্ষমতা পাই না। স্থানীর সরকার করলে আমাদেরকে একেবারে শেষ করে দিবে। সুতরাং আমি স্থানীয় সরকার চাই না। এসব নীচু ও সংকীর্ণ মনের মানুষগুলো এসে এখানে সমস্ত ক্ষমতা exercise করবে। তখন আমরা থাকতেই পারব না। তিনি কোনোভাবে আর আগান নাই। তারপরও নেহারু ভিন্ন পন্থায় কার্যকর করেছেন। পঞ্চায়েত পদ্ধতি গান্ধীর খুব প্রিয় বিষয়। নেহেরু এটির মধ্যস্থতা করেছেন এবং একজন বাঙালি এসকে দে, তার নেতৃত্বে কমিটি গঠনের মাধ্যমে এটিকে ফিরিয়ে এনেছেন। এই জিনিস রাজীব গান্ধী সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালার অভিজ্ঞতা থেকে আত্মস্থ করার পড়ে এই বিষয়টি নিয়ে আসছেন। ওখানে guaranty clause-এ অনেক কিছু দিয়েছে। যেহেতু এটা ইন্ডিয়ার state subject অর্থাৎ state subject হলো এক এক রাজ্যে এক একরকম করে ফেলবে। সেটাকে তারা protectionদেওয়ার জন্য অনেকগুলো guaranty clause দিয়েছে। যাতে করে সারা ভারতের পদ্ধতিটা একীভূত রূপে থাকে। সেজন্য সেখানে শর্ত দেওয়া আছে। এখানে গ্যারান্টিযুক্ত করা দরকার। শর্ত না। এটা আমার একটা বক্তব্য। সংসদের দ্বিতীয়কক্ষ কী হবে সেটিতো গেলই।

তারপর অনুচ্ছেদ ৭০ নিয়ে মাহবুব উল্লাহ ভাই বলেছেন। আমি তার সাথে একমত।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): সময়ের স্বল্পতা রয়েছে। একটু দৃষ্টি রাখবেন।

অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ (অংশীজন): দুঃখিত। আমিতো সবার পরে। আমার সময় কমই হবে, সেটি আমি জানি।

আমি স্থানীয় শাসন নিয়ে বলি। এটা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮, ৫৯, ৬০-এ একই কথা, ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। বাসের উদাহরণের মতো। বাসে আগের দিনে যেটি লেখা ছিল এটি করা যাবে না, ওটি করা যাবে না। ধূমপান করা যাবে না। কোনো অভিযোগ থাকলে ড্রাইভারকে জানাবেন। মারামারি করবেন না। ড্রাইভারের কাছে গিয়ে দেখি লেখা আছে যে, চলন্ত অবস্থায় চালকের সাথে কথা বলা নিষেধ। ঠিক এখানে একই রকমের বিষয়গুলো আছে। স্থানীয় সরকার অনুচ্ছেদ ৫৮-এ সব ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আবার বলা হয়েছে, "আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন-" সেভাবেই হইবে। এতে করে হচ্ছেটা কী? এজন্য এখানেও guaranty clause লাগবে।

তিনি বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন। বিকেন্দ্রীকরণের একটি নীতির জন্য সংবিধানে বলতে হবে এবং বিকেন্দ্রীকরণ কার্যকর করার জন্য কিছু guaranty clause থাকতে হবে। এগুলো ওখানে নিয়ে নেয়া যাবে না আরেকটি শর্ত দিয়ে। আমি ওখানে আর বেশি কিছু বলব না।

এখন বলছি, নির্বাচন কমিশন বা নির্বাচন নিয়ে আমাদের দেশের মানুষ মনে করে যে, খুব শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন দরকার। শক্তিশালী বলতে বলতে কেমন হয়ে গেছে, শক্তির জায়গাটা চলে গেছে। খালি শালীটা আছে। এত শক্তিশালী করার দরকার নাই। সব জায়গায় জবাবদিহি থাকতে হবে। এখন নির্বাচন কমিশনের মধ্যে আমি ২টি অনুচ্ছেদেও কথা বলব। অনুচ্ছেদ ১১৯-এ যে ক্ষমতার কাজগুলো দেয়া হয়েছে, সেখানে একটা বাক্য যুক্ত করতে হবে যে, "স্থানীয় নির্বাচনগুলো নির্বাচন কমিশন করবে"। এটা কিন্তু বলা নাই।

এটা বলা না থাকাতে কী হচ্ছে? স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কখন নির্বাচন হবে বা হবে না। এটা চিরতরে চলে যাক, তাতে কিছু যায় আসে না। তাই নির্বাচন কমিশনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে কখন তফশিল দিবে। একটা বাক্য যুক্ত করলেই হবে। স্থানীয় নির্বাচন করাটাও আমাদের নির্বাচন কমিশনের কাজ।

সর্বশেষ হচ্ছে, অনুচ্ছেদ ১২৬-এর মধ্যে আছে যে, "সহায়তা করিবে"। সহায়তা না করিলে কী হইবে তা নাই। এই জায়গাটা পরিষ্কার করতে হবে। কারণ তারা সহায়তা করছে না। তখন নির্বাচন কমিশন বা সরকার এটাকে কীভাবে মোকাবেলা করিবে। অনুচ্ছেদ ১২৭-এর মধ্যে আসবে কি না নাকি ১২৬ এর মধ্যেই থাকবে এটা। এই বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

আরেকটা কথা বলব যে, আমাদের সাংবিধানিক কমিশনগুলো আছে। সাংবিধানিক কমিশনের মধ্যে এখন ইলেকশন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, এটর্নি জেনারেল অফিস, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অফিস, এগুলো আছে। আরো ২-৩টা সাংবিধানিক কমিশন হিসেবে আনা যেতে পারে। একটি হচ্ছে- দুর্নীতি দমন কমিশন, এটাও সাংবিধানিক কমিশন হওয়া ভালো। কারণ এটা না হলে সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না। আরেকটা হচ্ছে- স্থায়ী একটি "স্থানীয় সরকার ও শাসন কমিশন"। এটার কারণটা হচ্ছে মন্ত্রণালয় কাজ করবে তাদের এলজিইডি আছে, ডিপিএইচই আছে, ওয়াসা আছে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য। কিন্তু এটাতো একটি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান-Local Government Institution. এখানে একটু পৃথকভাবে দেখার বিষয় আছে। এখন তারা সবাই একসাথে করে এটাকে দেখে। তারা ইচ্ছে মতো টাকা দেয়, ইচ্ছে মতো টাকা নেয়। এখন যদি আপনি ঐতিহাসিকভাবে দেখেন জিডিপির ১ শতাংশে কম বরাদ্দ স্থানীয় সরকারকে দিয়েছে। কাজেই যেহেতু কমিশন নাই, এগুলো বলার কেউ নাই। মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত করে দেয়। টাকা দিয়েও টাকা রেখে দেন। রেখে দিয়ে তারা আবার চূড়ান্ত করে যে, কী প্রকল্প হবে, কী প্রোগ্রাম হবে। এরা ওদেরকে করতে দেয় না। সেজন্য একটি কমিশন থাকার দরকার আছে। সারা দেশে ইউনিয়ন পরিষদ প্রায় সাড়ে ৫ হাজার, পৌরসভা ৩২৮, সিটি কর্পোরেশন ১২টি, জেলা পরিষদ ৬১টি, পার্বত্য চট্টগ্রাম মিলে ৬৩টি- এসব মিলিয়ে প্রায় ৬২ হাজার নির্বাচিত প্রতিনিধি এখানে কাজ করে। তারা আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি কমিশন থাকলে power zone থাকে। এখানে মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা থাকবে না তা না। কিন্তু এটার একটি কমিশন থাকার দরকার আছে। আমি বেশি সময় নেব না।

অনেকগুলো বিষয় অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ এবং শাহিন আনাম বলেছেন। শেষে একটু বলব যে, এককেন্দ্রীক দেশ- যদি প্রদেশ না হয়, সেক্ষেত্রে পাবলিক অ্যাডমিস্ট্রেশন কমিশনের জন্য অনেক প্রাসঙ্গিক। আমাদের প্রশাসনকে একটু পুনর্বিন্যাস দরকার আছে। এখানে হয়তো স্থানীয় সরকার নিয়ে যেটুকু বলার এই কমিশন সেটা বলবেন। কিন্তু এখানে প্রশাসনিক বিন্যাসের মধ্যে যদি আসতে হয় যেমন: এখন সংবিধান মতে যদি স্থানীয় সরকার করতে হয়, তাহলে কিন্তু বিভাগীয় স্থানীয় সরকার থাকার কথা। বিভাগতো একটি একক। বিভাগে কিন্তু স্থানীয় সরকার নাই। এখানে শুধু বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় এবং ডিআইজির কার্যালয় আছে। আর এই সুযোগে সব বিভাগগুলো বিভাগীয় অফিসে একজন অফিসার দেয়। বিরাট একটা কাঠামো। কিন্তু এদের কোনো সেবা নেই। কারণ মানুষের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নাই। আর অফিসগুলো মনিটর করারও কোনো দরকার নেই। কারণ যখন বিভাগ করা হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে, তখনতো দেশে সরাসরি এবং ভার্চুয়াল যোগাযোগ কিন্তু অনেক দুরূহ ছিল। কারণ দিল্লি থেকে জেলা মনিটর করা সম্ভব না। তখন তারা একটা পোস্ট অফিস করেছিল বিভাগকে। এ বিভাগের কিন্তু এখন আর প্রয়োজন নাই। কারণ এখন ভার্চুয়াল কমিউনিকেশন এমন হয়ে গেছে গ্রাম-শহরের পার্থক্য ঘটুচে গেছে। ঢাকা শহর থেকে ৬-৭ ঘণ্টার মধ্যে বাংলাদেশের যে কোনো গ্রামে পৌঁছানো যায়। এরকম একটি সময়ে এই বিভাগ নামে যে স্তর, এটির কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিভাগ করেছে, এটা কোনোভাবেই শেষ করতে চায় না। কারণ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান এটা। এখানে কিন্তু প্রচুর অর্থ খরচ হচ্ছে, প্রচুর জমি নষ্ট করে বিল্ডিং করা হচ্ছে এবং আরো বিভাগ করার জন্য আন্দোলন আছে অনেক। দেশের কোনো লাভ হচ্ছে না। কিন্তু রাজনীতিবিদরা চায় আমার শহরের গুরুত্ব বাড়বে। তারপর আমি একটা সিটি করপোরেশন চাইব। এগুলোতে অন্যরকম সুবিধা কাজ করে। অযথা প্রশাসনিকভাবে জনবল বৃদ্ধি হয়। আমরা জেলা পর্যন্ত প্রশাসন রেখে এখন জেলা পরিষদ নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে, এটা কোনো প্রতিষ্ঠানই না। এগুলোকে পূনর্গঠনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। হয়তো স্থানীয় সরকারের একটি কমিশন হতে যাচ্ছে। যদি হয় তাহলে ওখানে কিছু বিষয়গুলো আসবে। কিন্তু সংবিধানে পরিষ্কারভাবে নির্দেশনা থাকলে কাজ করতে সহজ হবে। অন্য কমিশনের পক্ষেও। আমি খুব দ্রুত বললাম। আমি আর সময় নিতে চাই না। অনেক কথা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ কমিশন রিপোর্ট কীভাবে adoption হবে আমরা জানি না। তবে আমি খুশি এতটুকুর মধ্যে দেশে একটা কমিশন হয়েছে। আমাদের কাছে একটা রিপোর্ট থাকবে। এইরকম সুপারিশ ছিল। এজন্য আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করি। যেভাবে সহায়তার দরকার আছে, ইনশাঅল্লাহ ভবিষ্যতেও করব।

ধন্যবাদ সবাইকে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ, আপনার এই বক্তব্যগুলোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা

কমিশনের পক্ষ থেকে আশা করছি, আপনি লিখিতভাবে আমাদেরকে দেবেন। এতে আমাদের কাজে অত্যন্ত সহায়ক হবে। আপনি গোড়াতেই বলেছেন যে, এর গুরুত্ব অনেক বেশি। সে বিবেচনায় আমরা একটু দাবি জানিয়ে রাখলাম।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (সদস্য): আমি এম মঈন আলম ফিরোজী। আমরা ছোট্ট দুটো মতামত আশা করব। সত্যিকার অর্থে স্থানীয় সরকারের সম্প্রসারণের যে কথাই বলি না কেন, আসলে মূল সমস্যাটা হয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অথবা অর্থের উৎসের ক্ষেত্রে। ফেডারেল সিস্টেমটা এখন আমাদের সংবিধানে নেই। আপনাদের অনেকেরই পরামর্শ তাই। Unitary system, সংসদীয় পদ্ধতিতে এখনকার দিনে অবশ্যই বরাদ্দগুলো আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে আসে। যদিও মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নেয়। এখানে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করার কোনো সুযোগ আছে কিনা এবং অর্থের উৎসগুলো স্থানীয় করের কাঠামোয় বা অন্যান্য কোনো পন্থায় কিছু করা যায় কিনা- এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ লাগবে।

আরেকটা হচ্ছে যে, সংসদীয় পদ্ধতিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, যেহেতু আমাদের নির্বাহী এবং আইনি দুটো ভূমিকা পালন করে। যারা নির্বাচিত হয়ে আসে। একই সাথে তারা আইন সভায় থাকে। আবার তাদের মধ্য থেকে নির্বাহীকে determined করা হয়। সেজন্যই perceptionটা চলে আসে যে এমপিরাই অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাহী কর্তৃপক্ষ ধারণ করে। এখানেই ব্যালেন্সিংটা বিশেষ করে স্থানীয় সরকারের আঙ্গিকে কীভাবে সুনিশ্চিত করা যায়, এটার একটু বিস্তারিত আপনার কাছে আশা করব। কারণ এই জায়গাটা আমাদের খুব delicate জায়গা। যেখানে সংবিধানে সুনির্দিষ্ট কিছু ইস্যু থাকা উচিত।

অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ (অংশীজন): আমি আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কিছু কথা বলি। আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অনেক চিন্তা করেছি, অনেক দেশের উদাহরণে দেখেছি এককেন্দ্রিক সিস্টেম এবং আমাদের যে tradition হয়ে আসছে, আপনি স্থানীয় কর ব্যবস্থাপনায় হাত দিলেও স্থানীয়ভাবে তারা কর আদায় করতে পারবে না। ঐ traditionটি আসেনি। আমাদের কর ব্যবস্থাপনা খুব কেন্দ্রীভূত। এই কেন্দ্রীভূত কর ব্যবস্থাপনার মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে এটা কীভাবে ঐ কেন্দ্রীয় কর আদায় কার্যক্রমকে সাহায্য করতে পারে তার একটি প্রক্রিয়া লাগবে। তারপর কর ভাগাভাগি হবে ওখানকার পদ্ধতিতে। যেমন ধরেন আমি গ্রামে থাকি। ইউনিয়ন পরিষদে আছি, পৌরসভাতেও আছি। I am paying telephone bill there. এই টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে নিচ্ছে। এখানে কি আমার ভাগ থাকতে পারে না?

তারপরে সড়ক ও জনপথ-এ যে লাইসেন্স ফি দিচ্ছি আমি, সেটাতো কেন্দ্রে চলে যাচ্ছে। আমার এলাকার উপর দিয়ে সেই রাস্তা গেছে না, বিদ্যুতের খুটিটি গেছে, আমি এর ভোগান্তিতে পড়েছি। কিন্তু বিলটি তো আপনি কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ে যাচ্ছেন। এগুলোকে repulse করা খুব কষ্টকর হবে। সেজন্য বলছি, কর আহরণ প্রক্রিয়া যেভাবে হচ্ছে সেটা থাকুক। কিন্তু স্থানীয় ভাগ নিশ্চিত করতে হবে। সেটা হতে পারে এমন আমার মোট বাজেটের ১০ শতাংশ থেকে শুরু করব প্রথম। এটা আস্তে আস্তে ৩০, ৪০ শতাংশে চলে যেতে পারে। যেটা স্থানীয় উন্নয়নে খরচ করতে হবে। ঐ রকম বরাদ্দ দেন। এদেরকে জবাবদিহি করেন এবং একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে আনেন। পরিকল্পনা প্রণয়নকেও বিকেন্দ্রীকরণ করেন। কারণ এখন সকল পরিকল্পনা ঢাকার শেরে বাংলা নগর থেকে হচ্ছে। এটা কি আসলেই পরিকল্পনা কি না, আমি জানি না। কিন্তু স্থানীয় কোনো পরিকল্পনা নেই। টাকা দিচ্ছে। টাকাটা শুধুশুধুই তছরুপ হচ্ছে। এটা খরচ হচ্ছে ঠিকই। যেমন : জেলা পরিষদ কী করছে? প্রত্যেক জনগণ এখানে কর দেয়, কোনো পরিকল্পনা নেই। উপজেলা পরিষদের কোনো পরিকল্পনা নেই। পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদের কোনো পরিকল্পনা নেই। সেবার পরিকল্পনাও নেই, উন্নয়ন পকিল্পনাও নেই। এই বিষয়গুলোতে reinforcement দরকার আছে। টাকার উৎস আছে এক জায়গায়। কিন্তু টাকার বিতরণ কোথায় করব? ঐ যে এখানে লোকাল গভর্নমেন্ট কমিশনের কথা বললাম। তারা অর্থনৈতিক কমিশনের কাজও করবে। স্থানীয় সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনাটা কী হবে? তারা দেখে দেখে প্রত্যেক ৩ বছর, ৫ বছর পরপর প্রতিবেদন দিবে। এক্ষেত্রে আর্থিক সাইডটিও ভাগ করা যাবে। ইন্ডিয়াতে রাজ্য পর্যায়ে শুধু Finance Commission আছে। General Commission নাই। কিন্তু ওরা আবার ক্ষমতাগুলোকে বিকেন্দ্রীকরণ করেছে অনেক আগে থেকেই। কিন্তু আমাদের এখানে বিকেন্দ্রীকরণ কার্যক্রমটি হয়নি। আর Finance Commission না করে আমরা যদি Commissionটা করি স্থায়ীভাবে, ওই কমিশনই Finance Commission-এর কাজ করবে। তারা সরকারকে সাহায্য করবে কীভাবে পল্লী এলাকার জন্য টাকাগুলো দেওয়া হবে।

আর আপনি দ্বিতীয় কথাটি বলেছিলেন যে, সংসদীয় পদ্ধতি নিয়ে। এটা ঠিক আছে। এটা ব্যালেন্সিংয়ের মধ্যে আসতে হবে। ইন্ডিয়াতে যেটা করেছে তারা, সংসদ-সদস্যগণ জেলা পরিষদের সদস্য। তারা কিন্তু এটা আপত্তি দেয় না। তাদের কিন্তু সদস্য পদ আছে। আমাদের দেশের সংসদ-সদস্যদেরকে জেলা পরিষদের সদস্য হতে বললে তারা মনে করবে যে, আমাকে ছোটো করা হলো। বিষয়টি কিন্তু তা না। আপনি ওখানে বসেন না? ওদের সাথে কথা বলব। এটা না করে আমি ওদের সাথে কথা বলব না, ওদের চিনি না, আমি ডিসি এবং ইউএনওর মাধ্যমে কাজ করব। এই প্রক্রিয়াটি খারাপ। সুতরাং যে ফোরামগুলো আছে, সে ফোরামের সাথে সমন্বয় করেন। অসুবিধা নেই, কাজ করুক। কিন্তু স্বার্থের সংঘাত হচ্ছে, ওখানে টাকা বরাদ্দ করে দিলেন। তিনি ইচ্ছামতো উন্নয়ন কাজ করবেন। তিনি কিন্তু তখন জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদের আর ধার ধরছেন না। এটা বন্ধ করতে হবে। আর হচ্ছে মন্ত্রণালয়

থেকে সার্কুলার দেওয়ার সময় যেমন: ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে সার্কুলার দিল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য টাকা দিয়েছি, সেটা বণ্টনের সময় আপনি এমপির উপদেশ গ্রহণ করবেন। ঠিক কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে সার্কুলার দিচ্ছে, ওখানে লিখে দিয়েছে এমপির উপদেশ গ্রহণ করবেন। এখানে উপদেশ/পরামর্শ অর্থাৎ তার নির্দেশনা। এই বিষয়গুলো বন্ধ করতে হবে। নির্বাহী এবং আইনসভার সদস্যদের মধ্যে যে পার্থক্যটা আছে, ভাগটা আছে, বিচ্ছেদটা আছে, সেটা maintain করতে হবে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : একটা ছোট্ট প্রশ্ন অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ। আপনি বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমানো এবং রাষ্ট্রপতির হাতে কী কী থাকবে, সেটা সুনির্দিষ্টকরণের কথা। আপনার কী এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট পরামর্শ আছে?

অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ (অংশীজন): আমাকে একটু ভাবতে দিন। আমি লিখিতভাবে জানাব।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

এই বিষয়গুলো আলোচনার মধ্য দিয়ে উঠে আশার ফলে যেটা আমরা আশা করছি যে, আপনারাও একটু সহায়তা করবেন যে, আরেকটু সুনির্দিষ্ট করে বললে আমাদের জন্য কাজগুলো আগানো সম্ভব হবে। যেহেতু আমাদের হাতে অনেকেরই পরবর্তী সময়ের কাজ আছে। আমরা একটু দীর্ঘ সময় নিলাম। শুরুতে একটু দেরি করার কারণে আমি কমিশনের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের অনুরোধ, আমাদের কাজে সহায়তার জন্য যদি লিখিতভাবে দেন সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্টভাবে, তাহলে সেটা আমাদেরকে বড় রকমের সহায়তা করবে। আমরা সেটাই প্রত্যাশা করি। আপনাদের অনুমোদন নিয়েই এখন অধিবেশনটি শেষ করতে চাচ্ছি।

ধন্যবাদ।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

ষষ্ঠ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১২ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : বিকাল ২:৩০ থেকে ৪:০০ পর্যন্ত

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:-

১।	**অধ্যাপক আলী রীয়াজ**, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক	কমিশন প্রধান
২।	অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল	সদস্য
৪।	অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫।	ড. শরীফ ভটুইয়া, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট	সদস্য
৬।	ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল	সদস্য
৭।	জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক	সদস্য

অংশীজনের তালিকা:

১। ড. শহিদুল আলম

২। মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী

কার্যবাহের রিপোর্ট প্রস্তুতকারক:

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সম্পাদনায়:

ফ. ব. ম. রহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহের রিপোর্ট:-

কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ। আমি এই কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আমরা জানি যে, সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেই কারণে, আমরা আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা ছোট ছোট আকারের অধিবেশনের আয়োজন করেছি। স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির উপস্থিতিতে সকলের সাথে কথা বলা, আলোচনা করা সহজ হয় এবং সকলের কথা শুনা যায়। আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। সভার শুরুতে আমি সেই সব শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় দিবেন।

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আজকে আপনারা যাঁরা উপস্থিত আছেন, আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে সংবিধানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা প্রত্যেকে যদি ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরেন তাহলে আমরা সকলের মতামত জানতে পারব এবং ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন হলে ২/১টি প্রশ্ন আপনাদের কাছে রাখতে পারব। তবে আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব থাকলে চাইলে লিখিত আকারে আজকে অথবা আমাদের কাছে আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে পারেন তাহলে আমাদের জন্য কাজের সহায়ক হবে।

(অতঃপর অংশীজনগণ তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন ড. শহিদুল আলম। আমি তাঁকে অনুরোধ করব তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য।

ড. শহিদুল আলম (অংশীজন): প্রথমে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ। আমি সাংবাদিকতা করি, ছবি তুলি, লেখি সেই জায়গা থেকে বলি। আমি এখানে সাইকেলে করে এসেছি, স্যান্ডেল পড়া এবং স্বাভাবিকভাবেই গেটে যারা দায়িত্বরত, তারা খুব আতঙ্কিত হয়ে গেল। সাইকেলে করে, স্যান্ডেল পড়া একটা মানুষ এখানে আসছে, তাদের অনেক উত্তেজনা কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি? কার্ড আছে কি না, জিজ্ঞাসা করা হলো। অনেক কিছু করার পরই পেছনের গেট দিয়ে কোথায় যেতে হবে বলা হলো। সেখানেও তিনি একটু বিরক্ত হয়ে গেলেন, এরকম একটা মানুষ তার কাছে এসেছে। সে তালিকায় তার নাম দেখে তখন একটা সালাম দিলেন। কারণ হচ্ছে, আমি এখানে যা দেখছি। আপনারা সকলে বোধহয় নেই। কমিটির ৯ জন সদস্য হওয়ার কথা। যাঁরা আছেন, তাদের কথাই বলি। এখানে অনুমান করি, সকলেই মুসলমান। একজন ছাড়া বাকিরা পুরুষ এবং মধ্যবিত্ত। কাজেই আমরা যেই অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের কথা বলছি, সেটা আপনাদের চেহারা দেখে কতটা হচ্ছে সেখানে আমার প্রশ্ন আছে। আমি যখন আসলাম, তখন যে ঘটনাটা ঘটল সেটাও কিন্তু একটা ইঙ্গিত দেয়। কারণ সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব আপনারা করেন, সেটা ভাববার কোনো কারণ নেই। আমি অনেক আগের কথা বলি। আমার প্রথম প্রদর্শনী হয়েছিল জার্মান কালচারাল সেন্টারে। সেখানে যখন প্রদর্শনী হয় আমি আমন্ত্রণপত্র আমার যারা যারা মক্কেল তাদেরকে দিয়েছিলাম, যারা বড় বড় কোম্পানির মালিক তাদেরকে দিয়েছিলাম। আবার যে জায়গায় আমি কাজ করি, সেখানে আমি চাপরাশিদের, দারোয়ানদেরও দিয়েছিলাম। পরে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনারা কি গিয়েছিলেন? একজনও জায়নি। জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের আমন্ত্রণ দিলাম, গেলেন না। তখন তারা বলল, আমাদের ঢুকতে দিত। এখন জার্মান কালচারাল সেন্টারের যে দারোয়ান, সে হয়ত মনে করত একজন লুঙ্গিওয়ালা মানুষ গেলে তার দায়িত্বই হচ্ছে তাকে ঠেকানো। নিয়ম কোথাও নেই কিন্তু এটার একটা অলিখিত নিয়ম হয়ত আছে। যদি সে ঢুকতে দিত। সেই লুঙ্গি পরিহিত মানুষের সাথে আমরা যে আচরণ করতাম, তাতে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত এটা তার জায়গা না। এই সংসদ ভবনটা তো আমি অনুমান করি আমাদের সকলের জন্য, সকল নাগরিকের জন্য এবং এখানকার বেশিরভাগ নাগরিকই লুঙ্গিওয়ালা বা নিলফামারীর ফাতেমা, জোহরা বা সেরকম কেউ। এখন আমি প্রশ্নটা তুলছি এজন্য যে, আমরা সত্যিকারার্থেই বাংলাদেশের জন্য যদি একটা সংবিধান বানাই, সেটা আপনার আমার জন্য সংবিধান বানাচ্ছি, না এদের জন্য সংবিধান বানাচ্ছি। এই

প্রশ্নটা আমাদের করা বোধ হয় দরকার। তার বাইরে ছোট্ট কয়েকটি বিষয় আছে procedural, যেটা আমার মনে হয় ভাবা দরকার আমার জায়গা থেকে বলছি। আমি বিশেষজ্ঞ নই। আমি সংবিধান সম্বন্ধে তেমন কিছু জানি না।

আইন সম্বন্ধে তেমন কিছু জানি না। কিন্তু নাগরিক হিসেবে আমি যে বিষয়গুলো মনে করি, devolution একটা ব্যাপার থাকার কথা। যেখানে distribution power, central government থেকে regional, local সরকারের মধ্যে localized decision-making কতটা হবে, সেটা খেয়াল করার ব্যাপার রয়েছে। Public participation কতটা হয়, সেটা নিয়ে ভাববার বিষয় রয়েছে এবং সাধারণ জনগণকে আমরা কতটা অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি সেটা। আমাকে আপনারা ডেকেছেন, আমি খুশি। ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমিতো সকল মানুষের প্রতিনিধি না। আপনারা সকলের সাথে আলোচনা করতে পারবেনও না। কিন্তু সকল মানুষের আকাঙ্ক্ষা কী, সেটা বুঝতে পারার একটা পদ্ধতি কোনো না কোনোভাবে থাকা দরকার।

আমরা যে সকল সংবিধানের কথা শুনি, তারমধ্যে সাউথ আফ্রিকার সংবিধানটি অসাধারণ। আমি জানি না, হয়তো বা সেটা ভালো। কিন্তু অন্তত যারা এই ধরনের অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে গেছেন, তারা কী করেছেন সেটা জানার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু কয়েকটা বিষয় আমার মনে হয় এখানে শুরু থেকে ভাবা দরকার। আবার আমি সাংবাদিকতা করি, লোকের সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করি এবং সেটার কারণে আমি যে জিনিসটা মনে করি যে, আমি যদি সংবিধানটা দেখি, যেই সংবিধান আছে সেটা পড়ে আমার কাছে খুব বোধগম্য কিছু না। আইনি ভাষায় লেখা, জটিলভাবে লেখা। অনেক শব্দ ব্যবহার করা যেগুলো আমার কাছে অর্থবহুল না। এই ভাষাটা এমন একটা ভাষা হওয়া উচিত, যেখানে সাধারন মানুষকে স্পর্শ করে, বুঝতে পারে যে তাকে প্রতিনিধিত্ব করছে।

আমার মনের কিছু কিছু জায়গায় সংক্ষেপের একটা ব্যাপার রয়েছে। সেখানে একটা ছোট বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য বিশাল একটি বাক্য ব্যবহার করা হচ্ছে। সেটিকে হয়তো এড়ালেও চলে। তবে আরেকটি বিষয় হচ্ছে comprehensiveness, এই সংবিধানে সরকারের অনেকগুলো দিকনির্দেশনা আছে। তার মধ্যে সরকারের গঠন, ক্ষমতার বিভাজন, দায়িত্ব, অধিকার, সাধারণ নাগরিকের অনেকগুলো বিষয় আছে। এগুলো যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, সেটা তো আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আমি মনে করি, flexibility একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এই সংবিধান আমরা বানাচ্ছি কিন্তু এটা তো দুদিন পরে out-of-date হয়ে যাবে, সেটা ভাববো না নিশ্চয়ই। এটি লম্বা মেয়াদে যাতে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করে, সেটা ভাববো। সেটা যদি করতে হয়, তাহলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ঢালাওভাবে সংবিধানকে পরিবর্তন না করে এটাকে আবার কী করে যুগোপযোগী করা সম্ভব, সেটা বোধহয় ভাবা দরকার। একটা বিষয় যেটা এখনকার সংবিধানে রয়েছে, যদিও কিছু কিছু জায়গায় সংশোধন করার ব্যাপার রয়েছে, সেটা হচ্ছে Protection of Rights এবং এটা নিশ্চয়ই আপনাদের থাকবে। Bill of rights থাকবে, অন্যান্য ধর্মের বিধানও থাকবে, Fundamental rights, Freedom- এগুলো থাকবে আমি অনুমানই করি। Separation of powers-এর কথা বলা আছে। কিন্তু করা হচ্ছে কিনা; আমি জানি না। করা যাতে হয়, প্রয়োগ যাতে হয়, সেটার প্রয়োজন রয়েছে। সেখানে Clear delegation of powers and responsibilities of the executive, legislature and judicial branches উল্লেখ থাকবে। পুরো বিষয়টি থাকার একটা প্রয়োজন রয়েছে। Judicial independence লেখা আছে, থাকবে আমি আশা করি। কিন্তু এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। যেটা বলা আছে ঠিকই কিন্তু প্রয়োগ নেই। অন্তত ছিল না। এখন আমরা আশা করি থাকবে। Public participation-এর কথা আমি আগেই বলেছি। আমি শেষ করব একটা বিষয় দিয়ে যে, Directive Principles যে Principles of Guidance-গুলো সরকার অনুসরণ করবে শাসনের ক্ষেত্রে এবং এখানে আমি মনে করি, একটা বিষয় থাকা দরকার। The Spirit of the Constitution কী, সেটা সকলের কাছে পরিষ্কার থাকা দরকার এবং দিনের শেষে আমরা যখন যেটাই করছি, it is in keeping with spirit of the constitution, এটি বোধহয় ভাববার প্রয়োজন আছে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

প্রথমত আপনার ঢোকার সময় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এটা খুবই অপ্রীতিকর এবং অনাকাঙ্খিত কমিশনের পক্ষ থেকে আমি ক্ষমা চাইছি। আমরা অন্যদের মতামত নেয়ার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চেষ্টা করছি। আমরা সিভিল সোসাইটির সংগঠনগুলোর সাথে কালকে সারাদিন বসেছিলাম। আজকেও আগের দুটো সেশনে এরকম যারা সিভিল সোসাইটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আছেন, তাদের সাথে আলোচনা করেছি। এছাড়া ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করছি। আমরা প্রফেশনাল গ্রুপগুলোর সাথেও বসব।

এর বাইরে young cultural activists, constitution নিয়ে যারা কাজ করেছেন আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন অংশের মতামত নিতে। এছাড়া সাধারণ মানুষের মতামত সংগ্রহের জন্য আমরা একটা জরিপের কথাও বিবেচনা করছি যাতে তাদের মতামতগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়। সেদিক থেকে আপনার এই বক্তব্যগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছি। ২/১টি বিষয়ে জানতে চাচ্ছি। আপনি Bill of rights-এর কথা বলেছেন। সেক্ষেত্রে কী আপনার দীর্ঘদিনের যে অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে নাগরিক অধিকারের বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্ত থেকেছেন বিভিন্নভাবে।

সেক্ষেত্রে আপনার কি কোনো পরামর্শ আছে আমাদের জন্য Bill of rights তৈরি করার ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রক্রিয়া বা কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

ড. শহিদুল আলম (অংশীজন) : আমার এ ব্যাপারে জ্ঞান খুব কম। আপনারা আমার থেকে অনেক বেশি ভালো জানেন। কিন্তু আমি শুধু হারিয়ে যাতে না যায়, সেই কারণে উল্লেখ করলাম। তার বেশি কিছু নয়।

ড. শরীফ ভটুইয়া (সদস্য) : ধন্যবাদ, আপনি কষ্ট করে এসেছেন।

আর আমি কমিশনের পক্ষ থেকে আবারও ক্ষমা চাচ্ছি আপনার ঢোকার সময় যে সমস্যাগুলো হয়েছে, সে জন্য। আপনার কাছ থেকে আমার একটি বিষয় জানার ছিল। আপনি সংবিধানের ভাষার ব্যাপারটি বলেছেন। যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি। আমি আপনাকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটি চাপিয়ে দিতে চাই না। কিন্তু এই ভাষার বিষয়টি কী আপনি ভেবেছেন যে, এটি কী আমরা বর্তমান সংবিধান রেখেই ভাষাটাকে সংশোধন করতে পারি, নাকি এই ভাষাটা address করতে গিয়ে আপনি মনে করেন যে, নতুন করে একটা খসড়া করার প্রয়োজন হতে পারে। এটা আপনি ভেবেছেন কিনা;

ড. শহিদুল আলম (অংশীজন) : আমি যেভাবে বলি, সেটাই বলছি। JB Priestley একটি খুব মজার উক্তি আছে, আনেক পুরোনো। "A man who shouts, your house is on fire may not be albe to define exactly. What he means by 'your' and 'house' and 'is' and 'on' and 'fire'. But he still might be saying something quite important". এখন আমরা এই ভাষাগত বিষয়ের মধ্যে এতটা আবদ্ধ হয়ে যাই যে কী বলা হচ্ছে, সেটাকে অত গুরুত্ব দেই না এবং এক্ষেত্রে আমি যদি বুঝে থাকতে পারি, সেটি নিয়ে আমার কী করণীয়, সেটির কথা না ভেবে protocol নিয়ে আমি এত মাথা ঘামাই যে, আসল কাজটা অনেক সময় হারিয়ে যায়। আমি সেটুকুই বলছি। আমি সংবিধান যতটা পড়েছি, দেখেছি, আমি পড়াশোনা করি, বিচরণ করি, সাধারণ মানুষের সাথে চলাফেরা করি। আপনাদের মতোন জ্ঞানী-গুণী মানুষের সাথে চলাফেরা করি। কিন্তু আমার কাছে অনেক ক্ষেত্রেই কী বলা হচ্ছে, বোধগম্য হয় না। আমি এটুকুই বলছি যে, একজন সাধারণ মানুষ এটা পড়ে যাতে বুঝতে পারে বলা হচ্ছেটা কী। সেটার জন্য যদি পরিবর্তন করতে হয়, করব। যদি আপনারা মনে করেন যে ওখান থেকে বোঝা যায়, তাহলে হবে। সংবিধান কিন্তু সংবিধান বিশেষজ্ঞদের জন্য না, জনগণের জন্য। এটি যদি আমি মনে রাখি, তাকে উদ্দেশ্য করে যদি লেখা হয় আমার কোন সমস্যা নেই।

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (সদস্য): ধন্যবাদ।

আমরা অনেকগুলো সেশন করেছি। সবাই কিন্তু inclusiveness-এর কথা বলেছেন। আপনার perspective থেকে একটা Constitution-কে inclusive করতে হলে আমরা প্রায় সময় যে discussion শুনেছি এটি হচ্ছে minorities, religion minorities, "so on and so forth". আপনার perspective, inclusiveটা কী হতে পারে? এটা বললে বোধহয় কমিশনের জন্য একটু সাহায্য হতো, এটা এক নম্বর।

আর দুই নম্বর হচ্ছে, You talked about public participation. এটা কিন্তু অনেক often used, but probably under researched term. Constitution-এর ক্ষেত্রে আপনি public participation-টি কোন perspective থেকে বলতে চাচ্ছেন? এটি কী Policy making, Decision making, রাষ্ট্রপরিচালনা। কোন perspective-এ exactly?

ড. শহিদুল আলম (অংশীজন): প্রথমটি দিয়েই শুরু করি। আপনারা তো ৯ জন সদস্যের মধ্যে একজন নারী ও ২ জন অনুপস্থিত, তাই না। এটা আমার কাছে সমস্যাজনক মনে হয়। নিশ্চই আমাদের দেশে যথেষ্ট নারী আছেন, যারা যোগ্য, যাদের এখানে থাকা দরকার ছিল এবং এতটা ভিন্নতা এটা চোখে লাগে।

আর কিছু হোক না হোক চোখে লাগে। আপনাদের সেটা প্রতিনিধিত্ব করে কি না; আপনাদের ভাবতে হবে। তার বাইরে এটা ঠিক যে, আমাদের ক্ষুদ্রজনগোষ্ঠী হয়তো এক শতাংশ। আমরা তো মানুষকে আর ভাগ করতে পারি না। যদি ১ শতাংশ রাখতেই হবে, ওরকম পুরোপুরি হিসাব অনুযায়ী হতেই হবে, সেটা আমি মনে করি না। কিন্তু এমনটি অবশ্যই হওয়া দরকার , যারা বাইরে আছে তারা মনে করে আমার প্রতিনিধিত্ব আছে। এই জায়গায় কেউ একজন আছে যে, আমার কথা ভাবে, আমার কথা খেয়াল করে, আমি এদের হিসাবের বাইরে না। সেই জায়গায় যদি বলি, আমি এখানে বন্ধ দরজার মধ্যে বলছি। তবে বাইরে বললেও কোনো সমস্যা নেই। আমি যা বলি, প্রকাশ্যেই বলি। আমাদেও কেবিনেটে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিটি একেবারেই প্রশ্নবিদ্ধ। সেটা যে নেই তা না; কিন্তু যেটি আছে, তার ক্ষেত্রেও প্রশ্ন আছে এবং থাকার কারণও রয়েছে। এটি আমার কাছে ভীষণ আপত্তিজনক যেখানে আমরা ভাষার জন্য আন্দোলন করে একটি দেশ পেয়েছি। আমাদের দেশে যারা ভিন্ন ভাষাভাষী, তাদের সাথে সরকার ৫০ বছর পরেও এরকম আচরণ করে এবং চালিয়ে যাচ্ছে।

এটা ভীষণ চিন্তার বিষয়। তাদের প্রতিনিধিত্ব সত্তা নেই, এটা আমার কাছে খুব সমস্যাজনক। একজন থাকলে statistical কিন্তু যা থাকার কথা তার চাইতে বেশি রয়েছেন। কিন্তু তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন কি না; সেটা প্রশ্ন। কাজেই আমি আপনার প্রশ্নে অংকের জায়গায় যাচ্ছি না। যদিও নয়-এর মধ্যে এক একটা অংকেও সমস্যা। কিন্তু তার বাইরেও আমি বলছি, যে মানুষগুলোর রয়েছেন তারা সত্যিকার অর্থে ধারণ করেন কিনা? এই অন্তর্ভুক্তিমূলক চিন্তাটিকে ধারণ করেন কি না? সেটা হলে আমার কোনো সমস্যা থাকতো না। ১০ জন পুরুষ বা ১০ জন নারী থাকলেও আমার কোনো সমস্যা থাকত না। Public participation-এর ক্ষেত্রে আমি অন্তত মনে করি যে, এমন একটি discord চালু থাকা উচিত, যেখানে ভিন্নভাবে যারা ভাবছেন তাদের কথা শোনার একটি জায়গা রয়েছে। সেই পদ্ধতি অনেক রকমের হতে পারে। আমার কাছে সহজ কোনো কিছু নেই। কিন্তু এটাতো পরিষ্কার। আমি যদি একেবারে ভিন্ন জায়গা থেকে বলি, আমাদের গণমাধ্যম সম্পূর্ণভাবে ফেল করেছে এত বছর ধরে। তাদের যা করার কথা ছিল, সেগুলি তারা করেনি। ৫ তারিখের পরে হঠাৎ করে অনেকে পল্টি খেয়েছে, সেটা ভিন্ন বিষয়। আমি তারমধ্যেও যাচ্ছি না। কিন্তু একটা মাধ্যম রয়েছে বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন; যেটি আপনার আমার পয়সায় চলে এবং জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার কথা। সেটি বহু বছর ধরে সরকার ছাড়া আর কারো কথা বলেনি। আজকে নতুন সরকার হওয়ার পরেও কিন্তু সেটি সরকার ছাড়া আর কারো কথা বলে না। এটি যদি হয়, তাহলে তো আমার কঠোর আপত্তি রয়েছে। তাহলে জনগণের কথাটি কোথা থেকে আসবে, তার জায়গাটি কোথায়? তাদেরকে যদি আমরা ওই জায়গাটি তৈরি করে দেই এবং আমি মনে করি, আসলেই আমাদের public interest in broadcasting-এর একটি জায়গা তৈরি করা দরকার। যেটির মাধ্যমে আমরা হয়তো একটা mechanism তৈরি করতে পারি। যার ভেতর দিয়ে কোনো-না-কোনোভাবে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাটি প্রকাশ পায়।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (সদস্য): আমি আপনার অভিজ্ঞতার বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছি। আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া না, আপনার সাথে একমত হয়ে আমি নিজেও ক্ষোভ প্রকাশ করছি এজন্য যে, ফ্যাসিবাদ চলে গেলেও তার রেশ কাটতে বোধহয় আরও সময় লাগবে এখান থেকে বের হতে। আমাদের এখানে কমিশনের কার্যালয় হলেও, সীমাবদ্ধতার কারণে এই premises systemটি মন্ত্রনালয়ের অধীনে হওয়ায়, এটা কোনো সমস্যা না একজনকে থামানো। কারণ সিকিউরিটির জন্য থামাতে পারে। কিন্তু আপনি যে বর্ণনা দিলেন, এটার বাস্তবতা আমি নিজেই দেখেছি। আমরা যারা Public transport-এ আসি। আমার নিজের গাড়ি আছে। কিন্তু যখন কেউ যদি Public transport-এ আসে, তাদের সাথেও একটু বিরূপ আচরণ হয়। Underestimate করার একটা tendency. এই practiceটি দীর্ঘদিন ধরে অভ্যস্থ হয়ে যাওয়ায় এখান থেকে এখনো বের হতে পারেনি। সুতরাং আমাদের এই জায়গাতেই কাজ করা জরুরি এটি এক নম্বার।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ইস্যুভিত্তিক একটি প্রশ্ন আপনার কাছে। এই ফ্যাসিবাদী সময়ের আপনি একজন সরাসরি victim ব্যক্তি হিসেবে আমরা দেখেছি। দীর্ঘদিন ধরে আপনি victimised হয়েছেন। আমাদের সংবিধান সংস্কারের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভবিষ্যতে এখান থেকে বেরিয়ে আসার একটা ব্যবস্থা তৈরি করা। আমাদের উদ্দেশ্য হিসেবে আমরা কমিশন থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং সেখানে এটি clearly বলা আছে যে, true aspiration of the people, এটা rhetoric না, মুখের কথা না। এটা reflection হওয়া। ফ্যাসিবাদি পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে victim বলেন, একজন activist বলেন, professional বলেন, আপনার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে কী ধরনের সাজেশন আসতে পারে?

ড. শহিদুল আলম (অংশীজন): আমি আবারও অভিজ্ঞতার জায়গা থেকেই বলি। কারণ আমার মনে হয় ওটার থেকে বুঝতে সুবিধা হয়। আমি সাধারণত ৬টি কলা কিনতাম ৯০ টাকায়। ৫ তারিখ সকালেও আমি ৬টি কলা ৯০ টাকায় কিনেছি। ৫ তারিখ বিকেলে আমি ৬টি কলা কিনলাম ৬০ টাকা। একই কলা বিক্রেতার কাছ থেকে। আমি অবাক হলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম। বলল যে, এখন তো চাঁদা দিতে হয় না। সময়ের পরিবর্তন খুব বেশি না কিন্তু একটা পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। সেটার কারণে আমি খুব খুশি। আমি তখন একটু ভুল করেছি। তার একটি সাক্ষাৎকার নেয়া উচিত ছিল, নেইনি। পরে চিন্তা হলো সাক্ষাৎকার তো নেওয়া দরকার। তার কাছে গেলাম ভাই আপনার সাক্ষাৎকারটি নিতে চাই। বললেন, না ভাই থাক। বলা তো যায় না, কয়দিন এরকম আছে। আমার তো এখানেই থাকতে হবে। সাক্ষাৎকার দিয়ে যদি বিপদে পড়ি। সেটি সমস্যার বিষয়। আমি পরেও গিয়েছি। এখনো ৬টি কলা ৬০ টাকায় কিনি, সেটি ভালো। কতদিন থাকবে জানি না। তার কিন্তু মনের মধ্যে একটি সংশয় রয়েছে যে, কতদিন এই পরিস্থিতি থাকবে এবং কবে পাল্টে যাবে? আপনি তো আমার পাশে থাকবেন না, যখন পাল্টে যাবে তখন এই বিষয় হবে। তবে একটি কথা সে বলেছে যেটি আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে, সে বলেছে, এখন কিন্তু আমি সত্যি মনে করতে পারি পুলিশ জনগণের বন্ধু। সে বলে এত বছর ধরে দাবড়ানি দিয়েছে, তুই তুই বলেছে, পিটুনি দিয়েছে। এখন পুলিশ আমারে আপনি কয়। জীবনে এটা হয়নি। এখন কী কারণে হয়েছে, সেটা আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে। পুলিশ এখন নিজেরাই হয়ত ভয়ের মধ্যে আছে। যে ঘটনা ঘটেছে, তারা তো অনেকে যোগও দেয়নি। অনেক রকমের ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেই পুলিশ এই ফলওয়ালাকে আপনি বলে ডাকে। আমরা তো রিকশাওয়ালাকে আপনি বলে ডাকি না।

ওই খালি, যাবি নাকি। আমাদের ভাষাটাইতো এরকম। প্রত্যেকটি জায়গাতেও ওরকমভাবে আমরা দাঁড়িয়ে গেছি। কাজেই এই বিষয়টি সত্যিকার অর্থে প্রতিফলন তখনই হবে যখন আমরা সাধারণ মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখব এবং সেই বিষয়টি আমরা শিখিনি। সেটি না আসা পর্যন্ত এটা হচ্ছে ভাববার কোনো কারণ নেই।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ড. শহিদুল আলম, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য। আমরা সকলকেই যে অনুরোধটি করি, আপনাকেও আমি সেই অনুরোধটি জোর দিয়ে করব। সেটি হচ্ছে, আগামী ২০ তারিখ পর্যন্ত যে কোনো সময় আপনার বক্তব্য লিখিতভাবে আমাদের দিতে পারেন। এগুলো রেকর্ডেড রয়েছে। কিন্তু যেটি আপনি বলেছেন, সেটির একটা বিশেষ গুরুত্ব হচ্ছে আপনি যেই perspective থেকে দেখছেন, আমরা অনেকেই সেটি দেখি না। এটিই হচ্ছে বাস্তবতা আমরা যাদের সাথে কথা বলেছি। ফলে আপনার এই বাস্তবতার নিরিখে যদি আপনি আমাদেরকে সহায়তা করার জন্য লিখিতভাবে দেন তাহলে আমরা খুব আনন্দিত হব এবং আমাদের কাজে সহায়তা হবে। আগামী ২০ তারিখ পর্যন্ত যে কোনো সময় ই-মেইল করে দিতে পারেন আমাদেরকে। তাহলে আমরা সেটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করব। আমাদের আমন্ত্রণপত্রের যে চিঠিটি আছে, সেই চিঠির নিচে একটি ই-মেইল আছে, ওখানে যদি আপনি পাঠিয়ে দেন, আমরা পাব।

ড. শহিদুল আলম (অংশীজন): আমার অনানুষ্ঠানিক একটি প্রশ্ন আছে। একেবারেই অপ্রাসাঙ্গিক। আমি অনেক বছর পরে এই ভবনে ঢুকলাম। এই জায়গাটির অন্তত একটি photo graphics documentation থাকা দরকার। কারণ সাধারণ মানুষতো এখানে আসতে পারে না। অন্তত কোনো একটিভাবে তারা যাতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে- সেটি প্রদর্শনী হোক, video tour হোক, যে কোনোভাবেই হোক। যদি সবাই যেতে পারত তাহলে কথা ছিল না।

ক্যানবেরার সংসদ উপরে ঘাস দিয়েছে যাতে জনগণ উপর দিয়ে যেতে পারে। এটি প্রতীকি হলেও আমি মনে করি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একসময় এখানে ক্যারাতে হতো। লোকজন চটপটি বিক্রি করত, আমরা ভোর বেলায় আসতাম। দেয়াল বানানোর পূর্বে আমরা প্রতিবাদ করলাম। প্রতিবাদ বেশিদিন টিকে না, ওরা জানে। কারণ কিছুদিন চুপ থেকে দেয়াল ঠিকই বানিয়ে দিয়েছে। সাধারণ জনগণ এখানে এখন ঢুকতে পারে না। জনগণ ঢুকতে পারে না, কিন্তু জনগণের যোগসূত্র তৈরি করার যদি কোনো কিছু থাকে আমি আগ্রহী হবো সেরকম কিছু করতে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): শহিদুল ভাই, আমরা তো এখানে এসেছি সাময়িক। আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে। সত্যিকার অর্থে এমপি হোস্টেলের একটি জায়গায়। এখানে সভা করার কারণ হলো রিকর্ডিং-এর ভালো সুবিধা আছে। আমি নিজে এই ভবনে সর্বশেষ কবে ঢুকেছিলাম, সেটা আমি নিজেও জানি না। অন্ততপক্ষে গত ২০ বছরে তো নাই। কাছে ধারেও ভেড়া যায়নি, আমার নিজের অবস্থার কারণে। আমরাই আছি আশ্রয়ে। তারপরেও আপনার এই বিষয়টি সংসদ সচিবালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করব। যেহেতু কাজ করার সুবিধার্থে তাদের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে। এই প্রতিশ্রুতিটি দিতে পারে আপনাকে।

ড. শহিদুল আলম (অংশীজন): ১৯৯২ সালে museum of contemporaries Aly-তে আমাকে কমিশন করেছিল লুই আই কানের স্থপত্যের ওপরে কাজ করতে। তারমধ্যে এটাতো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেপিআই- ৫টি মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি নিতে হয়। আমি এক একবার আসতাম অনুমতি নিতে। যখনই আসতাম কিছু ছবি তুলতাম। অনেক সময় লেগেছে অনুমতি পেতে। যতদিনে আমি অনুমতি পেয়েছি ততদিনে আমার কাজ মোটমুটি শেষ। কারণ ছবি আমি পেয়ে গেছে। মমাতে এই প্রদর্শনীটি দেখানো হয়েছিল, *the Realm of Architect*-এ। অসাধারণ একটি ভবন। এটা কে কিন্তু সাধারণ মানুষ দেখেনি। এই দূরত্বের তো কোনো অর্থ নেই।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আপনার ঐটার কিছু কিছু ছবি আমি দেখেছি। লুই আই কানের স্থাপত্য যেখানে অবস্থিত সেখানকার মানুষই সবচেয়ে কম জানে। বাইরের লোকজন অনেক বেশি জানে এই স্থাপত্যের কথা। এটা খুব অদ্ভুত একটি ব্যাপার। আমাদের জিনিস আমরা জানি না, আর কি!

ড. শহিদুল আলম (অংশীজন): আমাদের দিক থেকে যতটা সহযোগিতা দরকার সম্পূর্ণ পাবেন। কারণ এই সুযোগ আমরা আরেকবার পাব, আমি মনে করি না। তাই এই সুযোগটি হারালে বড় একটি ক্ষতি হয়ে যাবে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী। ধন্যবাদ, যোগ দেওয়ার জন্য।

আপনি জানেন যে, অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমরা ছোট ছোট অধিবেশন করছি যাতে করে আপনাদের কথাগুলো আমরা শুনতে পারি এবং মত বিনিময় করতে পারি। সে অর্থে আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে, আপনি সময় ব্যয় করে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আমরা প্রত্যেকের কাছে যে অনুরোধটি করছি, সেটি হচ্ছে আজকে ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপনের পর আজকে যদি লিখিত থাকে, আপনি দিতে পারেন অথবা আগামী ২০ তারিখের মধ্যে যদি আমাদেরকে লিখিতভাবে দেন, তাহলে আমাদের সহযোগিতা হবে। আপনি এখন বক্তব্য রাখবেন। আমরা আশা করছি ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনি সংক্ষেপে বক্তব্য রাখতে পারবেন।

মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী (অংশীজন): নাহমাদুহু ওয়া নুছল্লি আলা রছুলিহিল কারীম। আম্মাবাদ।

প্রফেসর আলী রীয়াজ, আপনার সাথে আগে থেকেই জানা-পরিচয় আছে আমার। আপনার সাথে আরও যারা আপনার সহযোগী আছেন, সকলের সঙ্গে সেভাবে আমার পরিচয় নেই। তারপরেও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করি। আমি আমার বক্তব্যও সংক্ষেপে রাখব। হয়তো বা এত সময় নিব না। আর আজকে একটি সংক্ষিপ্ত নোটও আমি নিয়ে এসেছি। আপনাকে সেটি দিয়ে যাব। মূলত আমার সংক্ষিপ্ত নোট সামনে রেখে আমি কয়েকটি প্রস্তাবনা পেশ করতে চাই।

সংবিধান একটা অনেক বড় একটা বিষয়। এর সংস্কার কিংবা পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা পুনর্লিখন; এ বিষয়গুলো অত্যন্ত জটিল এবং কাজটি অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ। সংবিধান নিয়ে অনেকেই তো প্রস্তাব দেবেন, অনেকেই সংস্কার প্রস্তাবনা আপনাদের সামনে রাখবেন। আমি একজন মৌলভি এবং ওলামা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করি। আমি ইসলামি দল বা হেফাজত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছি। এছাড়া একজন মুফতি এবং মুহাদ্দিস হিসেবে আমার প্রস্তাবনার জায়গা জুড়েই থাকবে আমাদের অঙ্গনের দাবি এবং বিভিন্ন সময় যখন সংবিধান সংশোধনীর কাজ হয়েছে, যে আপত্তিগুলো ছিল, সেই আপত্তিগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি দাবিগুলো উপস্থাপন করা। ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪ বার সংবিধান সংশোধন করেছিলেন। গত বারের সেই সংশোধনী নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলব না। একনায়কতন্ত্র কিংবা বাকশাল তিনি কায়েম করেছিলেন। আমি মূলত পঞ্চম সংশোধনী নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। পঞ্চম সংশোধনীতে "বিস্মিল্লাহির-রহ্মানির রহিম" এবং "আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস"-এর বিষয়টি মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে স্থাপন করা হয়েছিল। এরপরে অনেকগুলো সংশোধন হয়েছে। সর্বশেষ পলাতক সরকার, পতিত সরকার, ফ্যাসিবাদী সরকার ২০১১ তে একটি সংশোধনী এনেছেন। আমরা পঞ্চদশ সংশোধনী বলি। সেই পঞ্চদশ সংশোধনীতে আমাদের জন্য এতটাই মর্মাহত হওয়ার বিষয় ছিল যে, সেখানে ধর্মীয় অনুভূতি কিংবা জন-আকাঙ্ক্ষা কিংবা জনমতকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করা হয়েছে। পঞ্চম সংশোধনীতে বিস্মিল্লাহির-রহ্মানির রহিম এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করার বিষয়টি কোনো ঠুনকো বিষয় ছিল না।

আমি যদি আরেকটু পেছনের দিকে যাই, ১৯৭২ সালের সংবিধানে secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি কোত্থেকে আসছে? অথচ '৪৭-এর সংগ্রাম, '৪৭-এর স্বাধীনতা। এর পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের লড়াই, নানা জায়গায় আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি ছিল না। বরং '৪৭-এর স্বাধীনতায় আমরা একটা ভূখণ্ড পেয়েছি ইসলামের নামে। আলাদা ভূখণ্ডের কী প্রয়োজন ছিল? আলাদা ভূখণ্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, এখানে কোরআন-সুন্নাহর বিধি, কোরআন-সুন্নাহর আইন প্রণয়ন করবে মুসলমানগণ এবং কোরআন-সুন্নাহর বিধি মোতাবেক পরিচালিত হবে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থা, যেটি আমরা '৫২-র ভাষা আন্দোলন বলি কিংবা ৬ দফা বলি, '৬৯-এর গণ-আন্দোলনে বলি, '৭০-এর নির্বাচন বলি, কোথাও secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ছিল না। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি '৭২ এর সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি চলে এসেছে। পঞ্চম সংশোধনীতে মূলত দেশের মানুষের মতামত কিংবা দেশের মানুষের আবেগ, দেশের মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ, এটিকে শ্রদ্ধা জানিয়েই "বিস্মিল্লাহির-রহ্মানির রহিম" এবং "আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস"-এর বিষয়টি মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে স্থান দেওয়া হয়েছিল। "আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" এটি মূলনীতি হিসেবে ২০১১ সাল পর্যন্ত ছিল। কারো কোনো প্রশ্ন ছিল না। কেউ কোনোদিন আপত্তি করেননি কিংবা এই বিষয়টি সংবিধানের মূলনীতি থাকার কারণে কোনো জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোনো ধরনের অবজ্ঞার স্বীকার হয়েছে এমন কোনো বিষয়ও ছিল না।

এরপরেও একতরফাভাবে সেই সরকার ২০১১-তে "আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস" এই মূলনীতিটি তুলে দিল। অনেক কথাই তো বলতে হয়। সব কথা আসলে বললে এগুলো আপনাদের নোটে থাকবে, এমন নয়। লম্বা কথা সেজন্য আমি বলব না। আমাদের ইসলামি অঙ্গনের, ওলামা কেরামের তৌহিদি জনতার মুসলমানদের মূল দাবির জায়গাটি এটাই থাকবে। তাছাড়া, পঞ্চদশ সংশোধনী থেকে বাদ দেয়া হয়েছে "বিস্মিল্লাহির-রহ্মানির রহিম"-এর যে অনুবাদ রাখা হয়েছে সেটিও বিকৃত। যথাযথ অনুবাদ নয়। আমরা মনে করব, "বিস্মিল্লাহির-রহ্মানির রহিম" পঞ্চম সংশোধনীতে যেভাবে এটাকে স্থাপন করা হয়েছিল, সেভাবে নিয়ে আসতে হবে। আর আল্লাহর

উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস মূলনীতি হিসেবে থাকবে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ যাবে। আমার সঙ্গে আপনারা দ্বিমত করতে পারেন। যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষতা, এটা তো আসলে প্রত্যেক ধর্ম পালনের একটি স্বাধীনতা। বাস্তবতা হচ্ছে, আসলে তাই না। পৃথিবীতে যে সমস্ত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা আছে, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকলেও, সেখানে সংখ্যালঘুরা সবচাইতে বেশি নির্যাতনের শিকার। বাংলাদেশে যতদিন বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম ছিল, রাষ্ট্রধর্ম ছিল। আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল- কই কোথাও তো এ কারণে সংখ্যালঘরা নির্যাতনের শিকার হয়নি। আমি মনে করব, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ধারনার কিছু জায়গাটায় ত্রুটি আছে। অন্য ধর্মের কাউকে জোর করে ইসলামে গ্রহণ করবার কোনো অনুমতি নেই (লা ইক্রাহা ফিদ্দীন)। এটাই পরিষ্কার ইসলামী ধারনা। ইসলাম এমন একটা ধর্ম যে অন্য ধর্মের লোকদেরকে তার ধর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। এ ব্যাপারে ইসলাম যথেষ্ট সহনশীল। ওমাইয়া শাসনামল ও আব্বাসীয় শাসনামল, ওসমানী শাসনামল, মোঘল শাসনামলে আমরা স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছি, যদি কেউ ইসলামের নামে অন্য ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করে, এটা ব্যক্তির ভুল, ব্যক্তির চিন্তার জায়গা থেকে। এটা ইসলামের concept নয়। ইসলামের কনসেপ্টের জায়গা হচ্ছে অন্য ধর্ম, সে তার ধর্ম তার মতো করে স্বাধীনভাবে পালন করবে। তাহলে ইসলাম যদি এই সুযোগ দিয়ে থাকে, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার দরকার কী? বলে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকলে সমস্যা কী? ধর্মনিরপেক্ষতা ভিন্ন একটি ধর্ম। ধর্মনিরপেক্ষতা পশ্চিমা বিশ্বের জন্য ঠিক আছে। তাদের কোনো ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এখন নাই বললেই চলে। এক্ষেত্রে আপনারা আমার সঙ্গে দ্বিমত করতে পারেন। পশ্চিমারা বা গির্জা এবং রাষ্ট্রের যে দ্বন্দ্ব সেটা কেন ছিল? যে কারণে secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ওদের প্রতিষ্ঠা করতে হলো। গির্জা থেকে যখন রাষ্ট্রপরিচালনা বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হতো সেই গির্জাওয়ালাদের কাছে যে ধর্মীয় গ্রন্থ ছিল, সেটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে দেড় হাজার বছর আগে ইঞ্জিল বলেন আর তাওরাত বলেন। এগুলো মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের মাধ্যমে সর্বশেষ সংশোধন হয়েছে কোরআন দিয়ে। অর্থাৎ কোরআনে কারিম সংশোধনী আনায় বাকি পূর্বের সকল সংশোধনী বাতিল হয়ে গেছে। আমাদের সংবিধান যদি এবার কোনো সংশোধনী নিয়ে আসে তাহলে আগেরগুলোর তো আর কোনো মূল্য থাকবে না। কেউ চাইলেও আগেরগুলো মানতে পারবে না। আল্লাহু তাবারাকুতায়লা যুগে যুগে নবি পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) আরবে এসেছেন। তাঁকে তিনি ঐশী বাণী বা ওহি হিসেবে আল-কোরআন দিয়েছেন, যেটিই আল্লাহর তরফ থেকে সংশোধনী। ওই সংশোধনীর কারণে পূর্ববর্তী কিতাব যেগুলো আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন, সেগুলোর মেয়াদউত্তীর্ণ হয়ে গেছে।। গির্জা থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ নির্দেশনা দিয়েই মূলত রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিধায় তখন রাষ্ট্র উন্নতি, জনগণের উন্নয়ন, বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্য দরকার ছিল গির্জাগুলো থেকে রাষ্ট্রকে মুক্তি দেওয়া। কিন্তু কোরআনে করীম বা আমাদের এই ধর্ম কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আর কোনো নতুন ধর্ম আসবে না। কোরআন আল্লাহু বরকতুয়ালা এটি এমনভাবে সন্নিবেশন করেছেন বিজ্ঞান বলেন, রাষ্ট্র বলেন, ব্যক্তি বলেন; ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্র জীবন, সবকিছু ইনশাল্লাহ সমস্যাগুলো কোরআন থেকে বের করতে পারব। ধর্মনিরপেক্ষতার মতো মানব রচিত যে চিন্তা, কোরআনের উপর প্রাধান্য দেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। আমি মনে করব যে, এই জায়গাটিতে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। দেখেন আমরা ছোটখাটো কাজে আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখি। ঘর থেকে বের হই "তাওয়াক্কালতু আল্লাল্লাহ" বলি। ঘর থেকে বের হই "বিসমিল্লাহ্" বলি। ঘরে ঢুকে "বিসমিল্লাহ্" বলি। একটি রাষ্ট্রের ১৮ কোটি জনতা যে সংবিধান দ্বারা পরিচালিত হবে, এত বড় একটা কাজে আল্লাহর উপর আস্থা বিশ্বাসের জায়গা থাকবে না; আমি তো ক্ষুদ্রজ্ঞানের একজন মানুষ। রাষ্ট্র রক্ষণাবেক্ষণ করা, রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা থেকে শুরু করে তাদের জীবন-জীবিকা সর্বত্রই। আমাদের নিয়ন্ত্রণ কোনোভাবেই সম্ভব না। সুতরাং আমি যদি মনে করি যে, না আমি আমার জায়গা থেকে দায়িত্ব পালন করব। এক আল্লাহ'র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের তো কোনো বিকল্প নাই।

সেজন্য যৌক্তিকভাবে হোক বা যেকোনো জায়গা থেকে হোক কিংবা যদি জনসমর্থনের প্রয়োজন হয় আমি এতটুকু আশ্বস্ত করতে চাই, ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে এ দেশে কখনো কোথাও সমাগম হয়েছে, সমাবেশ হয়েছে, দাবি তুলেছে আমার জানা নেই। কিন্তু মুসলমানরা এটা বিশ্বাস করে যে, আমার প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গা থাকতে হবে। দুই নম্বরটি ছিল আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। তিন নম্বর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, এটার কোনো প্রয়োজন নেই বাংলাদেশে।

চার নম্বর যে বিষয়টি এসেছে, আমরা দেখেছি রাজনৈতিক দলগুলো যখনই নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করে, একটা কথা প্রায়ই বলে থাকে এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী আওয়ামী লীগও বারবার নির্বাচনের আগে একটা কথা বলে থাকে যে, কোরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন কিছু করা হবে না। বাংলাদেশের বাম ঘরোনার রাজনৈতিক দল ছাড়া মূল যে রাজনৈতিক দলগুলো যারা বাংলাদেশে নানা সময় রাষ্ট্রপরিচালনা করেছে, বা নানা সময় ক্ষমতায় ছিল-তাদের একটি কথা বারবার আমরা বলতে শুনেছি, কোরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন কিছু তারা করবেন না। এই কথাটি রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, ইসলামিক ব্যক্তিত্ব, সবার কথা। তাহলে কেন এই কথাটা সংবিধানের কোথাও এভাবে উল্লেখ থাকবে না যে, কোরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় গ্রহণযোগ্য নয়। যে কথাটি সবাই বলেন, সেই কথাটিই তো আমার সংবিধানে আসা উচিত। আমি মনে করি যে, কোরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন কিছু বিষয়

মুসলমান কোনোদিনও মানতে পারবে না। সেক্ষেত্রে যদি এই ধরনের বিষয় সংবিধানে চলে আসে, এই যে নানাভাবে নানা সময় আমরা নানা সংঘাতের দৃশ্যমান অবস্থা দেখতে পাই, এটা থাকবে না। সবাই চিন্তা করবে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার মত কোনো কাজ করা যাবে না। সেটি করলে রাষ্ট্রই ব্যবস্থা নেবে। রাষ্ট্র যখন ব্যবস্থা নিবে তো জনগণ কোথাও নিজের হাতে নিজের আইন তুলে নেওয়া বা নিজেকে কোথাও এতটা আগ্রহী বা আবেগী করার প্রয়োজন হবে না যে উল্টাপাল্টা কাজ করে ফেলবে। এই বিষয়টি আমি মনে করি সব রাজনৈতিক দলও তাদের বক্তব্য বা বক্তৃতায় ইশতেহারে প্রদান করে থাকে বা চলে আসতে পারে।

আমার সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনার সর্বশেষ বিষয়টি হচ্ছে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, শান্তির দূত বিশ্বনবি, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করার মত একটি বিষয় আমরা নানা দেশেই দেখতে পাই। বাংলাদেশেও হয়। এগুলোর পেছনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কী আছে সেটি ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে যে, এর কোনো যৌক্তিক অবস্থান আছে কি না; বিগত সরকার যদি তাদের নেতার বিরুদ্ধে কটূক্তি রোধ করার জন্যে ৯ বছরের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে তাহলে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী (সঃ) সম্পর্কে কটূক্তি রোধে আমরা কেন এই ধরনের কোনো আইন করতে পারব না? ইউরোপের নানা দেশে Blasphemy একটি আইন আছে। ধর্ম অবমাননা আইন বা ধর্ম অবমাননার শাস্তি। আমরা ঠিক সেভাবে Blasphemy আইনের অনুকূলে কোনো আইন চাচ্ছি না। আমরা যেটি চাচ্ছি, মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশে এটি আছে। আর যাই হোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করা যাবে না। যদি রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করা হয়, সাধারণ মুসলমান এতটাই আবেগতাড়িত হবে যে আইনশৃঙ্খলা বলেন, আর যত রকমের ভয়-ভীতি দেখান না কেন, তারা সেটি পরোয়া করবে না। ফলে দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কোনোভাবে, কোথাও কোনো কটূক্তি করা হবে না–এই বিষয়টি যেন স্পষ্ট থাকে। আমি মনে করি যে, একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর যে একটা ঝামেলা থাকে নানা জায়গায়, এটা আর থাকবে না। কেন? আমি আবারো ইসলামের একটা মৌলিক ধারণার দিকে যাই। সেটি হচ্ছে ইসলাম অসাম্প্রদায়িক ধর্ম। ইসলাম মোটেও শুধু কোনো একটা সম্প্রদায়ের কথা বলেন না, ইসলাম সব সম্প্রদায়ের কল্যাণের কথা বলে, সকলের উন্নতি, অগ্রগতির কথা বলে। যেটি পশ্চিমারা বা islamophobia-রা কাজ করছে পশ্চিমাজগতে বা ইহুদি মিডিয়ায়। যেটিকে বারবার প্রচার করবার চেষ্টা করছে যে ইসলাম কিংবা ইসলামের নীতিমালা কিংবা মৌলভী বা আলেমদের হাতে অমুসলিম কিংবা সংখ্যালঘুরা অনিরাপদ- এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট বিষয়। এটি একটি অসত্য বিষয়। ইসলাম অসম্প্রদায়িক ধর্ম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে গিয়ে সর্বপ্রথম যে state বা রাষ্ট্রের ভিত্তি ইসলামের আলোকে স্থাপন করেছিলেন, সেখানে সব সম্প্রদায়ের লোকজনই ছিল। কেউ কেউ আবার ইতিহাস থেকে টানতে পারেন যে পরবর্তীতে ইহুদিরা থাকতে পারেনি। মূলত যারা অপরাধ করেছিল, তারা থাকতে পারেনি।

মদিনার নিরাপত্তার জন্য তাদেরকে মদিনা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। সেটা তো এই রাষ্ট্রে, ইসলামের নামেও যদি কেউ কেউ এই ধরনের অপরাধ করে সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটায়, তাহলে সে শাস্তির মুখোমুখি হবে। আমি ছোট্ট একটি নোট আজকে দিয়েও যাব। একটু বিলম্বে আসছি, হয়ত অনেকেই আসবেন। আপনাদের কাছে আমার আকুল আবেদন, আমার এই বক্তব্যগুলো যেন শেষ পর্যন্ত থাকে এবং আপনারা নজরে রাখবেন। যদি কোনো প্রশ্ন এমন হয় যে, আমার কোনো কথা বা বক্তৃতার উপরে, আমি সেটিরও উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি ইনশাআল্লাহ।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী। আমরা সকলের কাছ থেকে আজকে যেমন লিখিত বক্তব্য নিচ্ছি, যদি বিস্তারিত থাকে এমন মনে হয় তাহলে এই মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত আমরা বিস্তারিত নিচ্ছি। প্রথমত এখানে যে বক্তব্যগুলো হচ্ছে, সেগুলো recorded হচ্ছে, transcribe হবে। এর বাইরে সমস্ত বক্তব্যই কিন্তু record করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি বক্তব্য আমরা পর্যালোচনা করব, কমিশনে বিবেচনা করবে। এর ভিত্তিতে যে সমস্ত recommendation আমাদের কাছে থাকবে, সেগুলো পাঠ করার পরেই নিঃসন্দেহে আমি আশ্বস্ত করতে পারি যে, এই বক্তব্য record হচ্ছে এবং আমাদের কাছে থাকবে। মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজী, আপনার কাছে আমার একটি ছোট্ট প্রশ্ন। আপনি উল্লেখ করেছেন, ব্যাখ্যার জন্য। আপনি বলেছেন পশ্চিমা দেশগুলোতে Blasphemy আইন যেটি আছে, আপনারা সেরকম আইনের কথা বলছেন না। শুধু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কটূক্তি রোধের বাইরে যে কোনো ধরনের কথিত ধর্মীয় অবমাননার ব্যাপারে আপনাদের এই আইন প্রযুক্ত হবে না। এইরকমই প্রস্তাব। বোঝার জন্য আমি স্পষ্ট করে নিলাম।

মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী (অংশীজন): যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদা এবং সম্মানের বিষয়টা সর্বজনস্বীকৃত। পশ্চিমা বিশ্বের টুকটাক অবমাননা বা কটূক্তির বিষয়টি আমরা দেখেছি। তবে শিক্ষিত মহল, ধর্মীয় মহলসহ নানা মহলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদা, সম্মান এবং তার সংস্কারকাজ স্বীকৃত, সবার কাছে

গ্রহণযোগ্য। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদাটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করা দরকার। Blasphemy আইনের ভিন্ন একটা অবয়ব আছে। সেটি নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং সেটির কিছু প্রভাবও আছে। এটি হয়ত বাংলাদেশে সেভাবে করা যাবে না। Blasphemy আইনটি পৃথিবীর যে জায়গায় আছে, সেখানেই আইনটি বিতর্কিত। নানারকমের আলোচনা-পর্যালোচনা হচ্ছে এবং বাকিও আছে। আমি মনে করি, ওই বিতর্কের জায়গায় না গিয়ে আমরা এমন একটি বিষয় সংবিধানে নিয়ে আসতে পারি যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লামকে নিয়ে কেউ কটূক্তি করতে পারবে না।

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (সদস্য) : আপনার কথার সূত্র ধরেই জিজ্ঞাসা করছি। আমরা মনে হয়, সবাই গ্রহণ করি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী। সংবিধানে এটিকে কী আবার re-established করার দরকার আছে।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আর এটি যদি সর্বস্বীকৃত হয় তাহলে তো এটির দালিলিক কোনো recognition-এর দরকার নেই। যখনই আপনি এটিকে একটি দলিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবেন, তাহলে কি আপনি তাঁর বিরুদ্ধে কটূক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছেন না?

মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী (অংশীজন) : কেন প্রয়োজন এটিই আমি বলি। সর্বজন স্বীকৃত হলেও এজন্যই প্রয়োজন, বাংলাদেশে নানা সময়ে আমরা নানা প্রেক্ষাপটে দেখেছি যখন কোথাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ফেসবুকে, মিডিয়াতে কটূক্তি হয়- তখন জনসাধারণ আইন হাতে তুলে নেন। কেন? যেহেতু ওই অপরাধীকে গ্রেফতার করা কিংবা তাদের শাস্তির মুখোমুখি করার মতো সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নাই। সেহেতু জনগণ মনে করে সে আমার নবীকে নিয়ে একথা কেন বলবে? একটি দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগবার একটি সুযোগ থাকে। আইন যখন থাকবে, রাষ্ট্র যখন কোনো উদ্যোগ নেবে বা কাউকে শাস্তি দিবে তখন সেটি একটি যৌক্তিক জায়গা থেকে হবে। জনগণ কিন্তু যোক্তিক জায়গা থেকে কোথাও পদক্ষেপেও নেয় না, কাউকে শাস্তিও দেয় না। সেটি আঘাত, পাল্টা আঘাতের পর্যায়ে চলে যায়।

আমি আপনাকে ধন্যবাদ।

ড. শরীফ ভূঁইয়া (সদস্য): আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। এই শাস্তির বিধানটি আইনের মাধ্যমে করাকে যথেষ্ট মনে করছেন না কেন?

মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী (অংশীজন): আসলে বিষয়টি এতো বড়, সাধারণ আইনে এই বিষয়টিকে সংকুলন করা যাবে না। এখানে কয়েকটি বিষয় আছে। আমরা যদি সকলেই মনে করি তিনি শ্রদ্ধেয়, মর্যাদার অধিকারী, তাহলে তো এমন একটি জায়গায় থাকতে হবে যেখানে রাখলে আমার যে অনুভূতি, আমার যে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানেই তো রাখতে হবে। মুসলমান হিসেবে কেউ এড়িয়ে চলতে পারবে না। সবার সম্মানের জায়গা যেখানে, সেটি তো একটু উঁচু জায়গাতেই থাকবে। সেটি সাধারণ আইনে কেন থাকবে?

ড. শরীফ ভূঁইয়া (সদস্য): এটি একটি ভিন্ন কথা। আরেকটি কথা আপনি যেটি বলেছিলেন যে, এটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিতে পারে না। শাস্তির বিধান করা যায় না। সাধারণত এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কিন্তু ভিন্ন আইন থাকে।

মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী (অংশীজন): এখানে যদি যুক্তির প্রসঙ্গ আসে, পৃথিবীর নানান দেশের নানা সংবিধানে ব্যক্তির আলোচনা আছে। আমি অবশ্য আপনাদেরকে কোনো reference দিতে চাই না। বিভিন্ন সংবিধানে বিভিন্ন ব্যক্তির আলোচনা কেন এসেছে? সে ব্যক্তির গুরুত্ব এবং সেই ব্যক্তির মর্যাদার জন্যে। তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাইতে মর্যাদাবান কে? শাস্তির বিধান যখন আপনি করবেন, তখন তো এটি বাংলাদেশ কোর্টে চলে আসবে। এটি সাধারণ আইনের মধ্যে চলে আসবে। কিন্তু মর্যাদার জায়গাটি সুরক্ষিত রাখবার জন্যে সংবিধানের মতো একটা বড় জায়গায় তাঁকে স্থান দিতে হবে। আইন তো করতেই হবে। সাধারণ আইনের মতো একটি আইন করে অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (সদস্য): আপনি একটি specific point-এ বলেছেন, কোনো আইন তৈরি করা যাবে না কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে। এরকম একটি বিষয় সংবিধানে নেয়া উচিত। প্রথমত হলো যে, এখানে দুটো প্রশ্ন। একটি দাঁড়ায় কোরআনের বিষয়ে মোটামুটি একক একটি অবস্থান আছে সবার মধ্যে। কিন্তু সুন্নাহর বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। মাজহাবসহ ভিন্ন ধরনের ধারণা যাচ্ছে। এখন সুন্নাহ সম্পর্কে আমি ক্ষুদ্রজ্ঞানে যতটুকু জানি যে, সুন্নাহর interpretation জায়গাটি অনেক প্রশস্ত রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে development গুলো accommodate করা যায়। ইসলাম তো সার্বজনীন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর ব্যবহার থাকবে। আপনি যদি unless you specifz, কারণ সংবিধান তো আসলে fake জায়গা না। সংবিধানে generalization সম্ভব না। এটি specific হতে হবে। আপনি যদি specific না করতে পারেন, সেক্ষেত্রে এরকম কোনো provision রাখা উচিত কিনা; যেটি আবার নতুন বিতর্ক জন্ম দেবে বা সুন্নাহর ব্যাখ্যায় একেক গ্রুপ থেকে একেকভাবে বিষয়টিকে দেখবে। অন্য ধর্মের এই বিষয়টিতে একটি objection থাকার সম্ভাবনা তো আছেই। এমনটি মুসলমানদের মধ্যেও অনেক বিষয়ে এটি নিয়ে একটি জটিলতা তৈরি করার সুযোগ আছে কিনা?

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যেহেতু আপনার মূল আলোচনা হচ্ছে মূলনীতি নিয়ে। সংবিধানের মূলনীতির পাশাপাশি জায়গায় আপনি কথাবার্তা বলেছেন। সংবিধান, রাষ্ট্রব্যবস্থা, ব্যক্তিগত অধিকার, সামষ্টিক অধিকারের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে যখন যাব, সেখানে আপনার সুনির্দিষ্ট কোনো পরামর্শ আমরা দেখিনি। যদি আপনি লিখিত দেন, তাহলে তো আমাদের জন্য ভালো হয়। এভাবে যদি generalization থাকে, তাহলে এতে আমাদের জন্য কাজ করার কতটুকু সুযোগ আছে তা বোধগম্য নয়।

ধন্যবাদ।

মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী (অংশীজন): প্রথম বিষয় হলো, আমি কিন্তু কোরআন-সুন্নাহ বলেছি, কোরআন-হাদীস বলিনি। আমি বলেছি, কুরআন এবং সুন্নাহ। হাদিসে সনদের মান যাচাই করতে গিয়ে, হাদিসের যে সনদ আছে, সনদ বলতে আমি কার কাছে, তিনি কার কাছ থেকে, আবার সে কার কাছ থেকে এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত আমরা হাদিসের সনদ বর্ণনা করে থাকি। সেই সনদ বর্ণনা করতে গিয়ে সহী এবং জোয়াইফ। আমরা বলি, জারহু, তাদীল নানা বিষয় আসে। সুন্নাহ হচ্ছে যতগুলো হাদিস আছে কোনো বিষয়ের সেই হাদিসকে সামনে রেখে একটি সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয়, একটা স্থিরকৃত বিষয়কে আমরা সুন্নাহ বলি। বিধায় সুন্নাহ নিয়ে মাঠে মতানৈক্য আপনি দেখবেন না। তবে ইসলামের নামে অনেক শাখা, উপদল আছে। মৌলিক আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ। অনেক দল, উপদল তো দুনিয়ার প্রত্যেকটি তন্ত্রে, মন্ত্রে আছে। কিন্তু মূল একটি হচ্ছে সুন্নাহ। আমরা যেটিকে বলি, কোরআন এবং সুন্নাহ। কোরআন-সুন্নাহর মধ্যে বড় কোন বিবেধ বা মতানৈক্য নাই। এই বিষয়টি যখন আসবে, এই বিষয়টি নিয়ে মাঠে অন্তত মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য তৈরি হবে না।

জনাব ফিরোজ আহম্মেদ (সদস্য): আমি মঈন ভাইয়ের সাথে যুক্ত করে প্রশ্নটি আরেকবার করি। আপনার আলোচনা মন দিয়ে শুনলামও ও অনেক নতুন কিছু শিখলামও। আমার প্রশ্নটি সংক্ষেপ করলে এটি দাঁড়ায় যে, আমি কোরআন-সুন্নাহবিরোধী আইন থাকবে না বলছি। বাংলাদেশ বা পাকিস্তান আমলের ইতিহাসেও আমরা নানান সময় দেখেছি যে, অনেক রাষ্ট্রীয় আইন নিয়েও আলেমসমাজ আপত্তি করেছেন, এটি কোরআন-সুন্নাহবিরোধী। যেমন : পারিবারিক আইনের সংশোধনটি হয়েছিল আইছুব খানের আমলে কিংবা বিয়ের বয়স নিয়ে, চার বিয়ের অধিকার নিয়ে বা আরও এরকম অনেক বিষয় আছে, যেগুলোতে নানা সময় আলেম সমাজ বলেছেন যে, আইনগুলো কোরআন-সুন্নাহবিরোধী। সংবিধানে তো এতো বিস্তারিত থাকে না। Spirit আকারে চাইলে আপনি এখনো বলতে পারেন বা আপনার লেখার সময় দিতে পারেন যে, বাংলাদেশের কিছু উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যে, এই ধরনের বিষয় আপনারা চাচ্ছেন এবং এই ধরনের বিষয় আপনার চাচ্ছেন না।

মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী (অংশীজন): এখানে ছোট্ট একটি কথা আবারো বলি যে, কোরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। একটি বিষয় দেখেন কোরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এমন কোনো বিধি-বিধানের বিষয়ে আপত্তি তুলেছি। অনেক বিষয় আছে কোরআন-সুন্নাহে সরাসরি উল্লেখ নাই। কিন্তু আপনার সুযোগ আছে কী করতে পারবেন। আমরা সংঘর্ষের জায়গাটি বলেছি এবং আমি সেটি ব্যক্তির জায়গা থেকে বলছি না। এ দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের কথা কিন্তু এটি। আইছুব খানের পারিবারিক আইনটি কিন্তু এখন বাংলাদেশে কার্যকর নয়। আপনি আমাদের দেশের আদালতে যখন আইছুব খানের আইন দিয়ে বিচার কামনা করবেন, আদালত থেকে পাঠিয়ে দেবে মুফতি সাহেবের কাছে যে, এটা নিয়ে আপনি সেখানে যান। তালাকের এই বিষয়টা নিয়ে আমরা মুফতি সাহেবের কাছে ফতোয়াটি শুনতে চাই। আইছুব খানের পারাবারিক আইনটি ততটা কার্যকর না। যদিও সেটি আমরা পুরোপুরি বাতিল করতে পারিনি বা এর বিপরীতে অন্য কোনো আইনও তৈরি করতে পারিনি। সেটি কার্যকর নয়। এর বাইরে বিয়ের বয়সসহ নানা সময় নানা আপত্তি আমরা যেখানে তুলেছি, যারাই সরকারে ছিল, তারা অবশ্যই আমলে নিয়েছে। যেমন : সর্বশেষ আপনি ফতোয়াবিরোধী একটি রায়, যেটি হাইকোর্ট থেকে দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে আমাদের আপত্তি এবং আমাদের আইনি লড়াই দুটো একসঙ্গে চলে। আমরা চূড়ান্ত বক্তব্য হচ্ছে যে, "যোগ্য মুফতি" ফতোয়া দিতে পারবেন। সুপ্রিম কোর্ট থেকে এ ধরনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। মুসলমান হিসেবে কখনোই তো কেউ কোরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয়কে গ্রহণ করবে না। তাহলে এটি আমার কাছে একেবারেই স্পষ্ট যে, সাংঘর্ষিক কোনো বিষয়ে আমি যাব না। আমিও যেতে পারব না, আপনিও যেতে পারবেন না। আমি বলছি, সাংঘর্ষিক কোনো বিষয়ে আমরা যেতে পারব না।

জনাব ফিরোজ আহম্মেদ (সদস্য): বুঝার সুবিধার্থে আপনি প্রথম বাক্যে যেটি বলেছিলেন, সাংঘর্ষিক না হয়ে উন্নতির সুবিধার্থে বা যদি উন্নতির সুযোগ থাকে বা নতুন নিয়মকানুনের সুযোগ থাকে বা কোনো একটা দেশের নির্দিষ্ট বাস্তবতা বিবেচনায় নেওয়ার সুযোগ থাকে, এগুলো বিষয়ে কিছু বলবেন।

মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী (অংশীজন): হ্যা, সেই সুযোগ ইসলামে আছে। সেই সুযোগ কোরআন-সুন্নাহে আছে। জনকল্যাণে, জনগণের স্বার্থে, মানুষের কল্যাণে। আমি তো বলি ইসলাম এমন একটি ধর্ম আল্লাহু তাবারকু তায়ালা আমাদের দিয়েছেন, আপনার এখানে

বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সব আছে। সর্বত্রই মানুষের কল্যাণে অনেক কিছু করার সুযোগ আছে। কিন্তু সাংঘর্ষিক জায়গাটি বলতে আমি যেটি বুঝাতে চাই, কোরআন-সুন্নাহর অনেক বিষয় অনেকের বুঝে আসে না। কিংবা অনেকে তার ব্যাখ্যা বুঝেন না বা অনেক ভিন্ন চিন্তার মানুষ হয়ে থাকেন বা অনেকে কোরআন-সুন্নাহ মানেন না। আজকাল তো এমন হয়ে গেছে যে, বস্তুবাদ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গেছি আমরা। কিছু ধর্মের নাম পশ্চিমা বিশ্বে থাকলেও ধর্মটি মানে কয়জনে। অথচ আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ, আখেরাতের মুক্তি ধর্মের ভেতরেই এবং ইসলামের ভেতরেই। ইসলাম আল্লাহর তরফ থেকে সর্বশেষ সংশোধন হওয়া ধর্ম।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী ।

আমি আগেও বলেছি, যদি আরও বিস্তারিত আমাদের জানাতে চান, তাহলে ২০ তারিখের মধ্যে জানাতে পারেন।

মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী (অংশীজন): আলহামদুলিল্লাহ, অবশ্যই আপনারা আমাদের চেয়ে ভালো জানেন। সংবিধানের নানান বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, সংসদ-সদস্যদের ক্ষমতাসহ নানান বিষয়ে আপনাদের সাথে অবশ্যই আমরা সাথে একমত হব। সে বিষয়ে অবশ্যই আমরা আপনাদের মতামতকে গুরুত্ব দিব। সে বিষয়ে আপনাদের পড়াশোনাও বেশি, অভিজ্ঞতার জায়গাও বেশি। কিন্তু ধর্মসংক্রান্ত যে বিষয়গুলো আছে, সেই বিষয়গুলোতে আমাদের ওলামাদের মতামত আপনারা নিবেন। যদি এর পক্ষে কোনো যুক্তির দরকার হয়, ইনশাআল্লাহ আমরা যুক্তি, প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। নানান বিষয়ে আল্লাহু তাবারাকাতুয়ালা আপনাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিয়েছেন, নানা দেশ আপনারা দেখেছেন। নানা দেশে কাজ করেছেন, অভিজ্ঞতা আপনাদের আছে। সেই বিষয়ে অবশ্যই আমরা আপনাদের কথাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি এই অধিবেশন আজকের জন্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

সপ্তম সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল ৯.৩০ থেকে দুপুর ১২.০০ পর্যন্ত

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:

১। অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক, কমিশন প্রধান
২। জনাব সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য
৩। ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল সদস্য
৪। ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল সদস্য
৫। জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক সদস্য

অংশীজনদের তালিকা

১। ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন
২। জনাব দিলীপ কুমার সরকার, নির্বাহী সদস্য, সুজন।
৩। অধ্যাপক ওবায়েদ কুদ্দুস, নির্বাহী সদস্য, সুজন।
৪। অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, নির্বাহী সদস্য, সুজন।
৫। অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান
৬। মুফতি আবদুল্লাহ মাসুম
৭। মুফতি সাইফুল ইসলাম (খতিব, মসজিদ-উত-তাকওয়া)

কার্যবাহ প্রস্তুতকারক:

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সম্পাদনায়:

ফ. ব. ম. রহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানের কার্যবাহ

কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক আলী রিয়াজ (কমিশন প্রধান): সবাইকে ধন্যবাদ।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রিয়াজ, আমি এই কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে, সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা গত ৩ দিন যাবৎ বিভিন্নভাবে ছোট ছোট আকারের অধিবেশনে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করছি যাতে করে সকলের কথা শোনার সুযোগ হয়। আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকের এই অধিবেশন শুরু করার আগে সেইসব শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় প্রদান করবেন।

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে এবং বিভিন্ন সংগঠনের যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আপনারা ১০ থেকে ১২ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে সকলের মতামত শোনার সুযোগ হবে। আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব লিখিত আকারে আজকে আমাদের কাছে দিতে পারেন অথবা আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ, বক্তব্যের শুরুতে আপনাদের নাম এবং আপনি যদি কোনো সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করেন তবে সংগঠনের নাম বললে আমাদের জন্য নোট গ্রহণ এবং রেকর্ডিং এ সহায়ক হবে।

আমরা আজকে শুরু করব সুজনের প্রতিনিধিদের দিয়ে। আপনারা আপনাদের পরিচয় দিয়ে বক্তব্য শুরু করুন।

ধন্যবাদ।

জনাব দিলীপ কুমার সরকার (কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী, সুজন): শুভ সকাল। আমার সাথে এখানে উপস্থিত আছেন সুজনের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার এবং আরেকজন নির্বাহী সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ওবায়েদ কুদ্দুস। সুজনের পক্ষ থেকে যে লিখিত প্রস্তাব দিয়ে যাব সেটি আমি এখন উপস্থাপন করছি।

আমরা শুরুতেই যা বলেছি যে, ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী শাসনের অবসানের পর অন্তবর্তীকালীন সরকার এখন দেশ পরিচালনা করছে। সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংস্কারের যে আকাঙ্ক্ষা সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের পর একটি অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করে নির্বাচিত সরকারের কাছে তারা ক্ষমতা অর্পণ করবে। জন আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সংস্কারের পথেই দেশ যাত্রা শুরু করেছে। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে, ৬টি সংস্কারর কমিশন তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কমিশন হচ্ছে সংবিধান সংস্কার কমিশন। আরও ৪টি সংস্কার কমিশনের কথা আমরা শুনেছি। কমিটির প্রধানদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তীতে শুনেছি যে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠিত হবে। যাই হোক। আমরা সংবিধান সংস্কার কমিশনের কাছে সুজনের পক্ষ থেকে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনায় আসতে পারে আমাদের সুপারিশমালায় সেরকম কিছু বিষয় তুলে ধরছি।

প্রথমেই আমরা বলেছি যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন। এক্ষেত্রে কিছু পয়েন্ট আমরা দিয়েছি যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারে যেন বিচার বিভাগকে সম্পৃক্ত না রাখা হয়, যুক্ত না করা হয়। আর এই সরকারের মেয়াদ এর আগে ছিল ৩ মাস, আমরা বলেছি এটি অন্তত ৬ মাস করার। রুটিন কাজের বাইরেও তাদের কিছু কর্মপরিধি এখানে সুনির্দিষ্ট করা, অন্য ক্ষেত্রেও বিস্তৃত করা।

দুই নম্বর পয়েন্ট আমরা বলেছি যে, সংসদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও নারীদের আসন সংরক্ষণের বিষয়টি। এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব এখন যেটি ৩৫০ আছে এটি ৪০০তে উন্নিত করা। এই ৪০০ আসনের মধ্যে ১০০ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ এবং সেটি ঘূর্ণায়মান

পদ্ধতিতে সংরক্ষণ। এটির যদি ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয় আমাদের সম্পাদক মহোদয় আছেন, তিনি বলবেন। সকল ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, নারী আসনেও।

দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে, উচ্চ কক্ষের জন্য একটি নির্বাচন পদ্ধতি প্রণয়ন করা কোন পদ্ধতিতে এটি হবে। আরেকটি বলেছি যে, উচ্চ কক্ষে যাতে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায় সেটি ভাবা।

৪ নম্বর আমরা বলেছি যে, প্রধানমন্ত্রীর জন্য Term Limit. এটি দুই term-এর বেশি না, এটি নির্ধারণ করা। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য। আমরা আলাদা করে কোনও পয়েন্ট দেইনি। সেটি আপনাদের বিবেচনার জন্য রেখেছি।

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংস্কার। এখানে আমরা বলেছি যে, আস্থা ভোট বা বাজেটের ক্ষেত্রে হয়ত ফ্লোর ক্রসিং নিষিদ্ধ করা যেতে পারে, বাকি সকল ক্ষেত্রেই যেন দলের প্রস্তাবে সমালোচনাসহ দলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারে পার্লামেন্ট মেম্বাররা।

সর্বস্তরে জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে আমরা বুঝিয়েছি যে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ যে ইস্যু, এটি সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের যে আকাঙ্ক্ষা, এখানে স্পষ্ট করে লেখা। ৫৯ ও ৬০ এ কিছু কথা আছে। আইনের বিধানাবলি এরকম কিছু কথাবার্তা আছে আমরা বলেছি এটি স্পষ্ট করতে। যাতে করে প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। স্থানীয় সরকারের কর্মকাণ্ডে সংসদ সদস্যদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনগুলোতে নির্দলীয় ভিত্তিতে সংসদীয় পদ্ধতিতে একটি নির্বাচনের আয়োজন করা। জেলা পর্যায়ের নির্বাচন যেটি হচ্ছে মৌলিক গণতন্ত্রের আদলে, সেটি না করে সাধারণ ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে আয়োজন করা। স্থানীয় সরকারেও ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারীদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা।

৮ নং পয়েন্টে আমরা বলেছি যে, সকল জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বীকৃতিসহ সংবিধানকে প্রকৃত অর্থেই একটি অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য দলিলে পরিণত করা। সেখানে সাংঘর্ষিক কোনো ব্যবস্থা যেন না থাকে। এ একটি প্রস্তাব ছাড়াও আমরা কিছু বিবেচ্য বিষয় এখানে তুলে ধরেছি। একটি হচ্ছে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন প্রসঙ্গ।

এখানে বলেছি যে এই উপরের বিষয়গুলো ছাড়াও রাষ্ট্র সংস্কারের আলোচনায় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির বিষয়টি রাজনৈতিক দলসহ সচেতন মহলে জোরেশোরেই এটি আলোচনায় এসেছে। ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি প্রবর্তন করা যায় কি না তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে বলে আমরা মনে করি। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি হচ্ছে সম্পূর্ণ আনুপাতিক পদ্ধতিভিত্তিক নির্বাচন হবে সারাদেশে, নাকি মিশ্র পদ্ধতির। আবার মিশ্র পদ্ধতি হলে এরকম হতে পারে ৪০০ আসনের মধ্যে ২০০ আসনভিত্তিক হবে, বাকিগুলো হয়ত আনুপাতিকভাবে ভোট প্রাপ্তিরভিত্তিতে বণ্টন করা। আবার এমন হতে পারে যে সারা দেশকে কিছু ইউনিটে বিভক্ত করে সেই ইউনিটগুলোতে ভোটেরভিত্তিতে আনুপাতিক পদ্ধতির দ্বারা। তাতে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে। আর সাধারণ আসন এবং সংরক্ষিত আসনের জন্য পৃথক প্রার্থী তালিকা প্রণয়ন করা। যাতে করে এমন না হয় যে, একটি অগ্রাধিকার তালিকা থাকলে নারীরা পিছনে পড়ে যেতে পারে। দুইটি অগ্রাধিকার তালিকা থাকলে হয়তো দুই তালিকা থেকেই অগ্রাধিকারভিত্তিতে আসতে পারে।

মনোনয়ন বাণিজ্য পরিহার ও কর্তৃত্ব বাণিজ্য অবসানের জন্য বিশেষ সম্মেলন আয়োজন করে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন পদ্ধতির কথা আমরা বলতে চাচ্ছি, যাতে দলীয় প্রধানের কর্তৃত্ব সেখানে প্রতিষ্ঠিত না হয়।

আমরা সংবিধানকে সমুন্নত রাখার বিষয়েও প্রস্তাব রাখছি। আমরা সংবিধানকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন মনে করি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল এবং এটিকে সমুন্নত রাখা উচিত। তবে জনস্বার্থে সংবিধান পরিবর্তন হতেই পারে। এটি চলমান একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু যতক্ষণ একটি বিষয় সংবিধানে সন্নিবেশিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি অনুসরণ করা। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ক্ষমতাবানরা সংবিধানে একটি বিষয় থাকলেও এটি তারা লঙ্ঘন করে। কয়েকদিন আগেও যেমন দেখলাম যে, গণমাধ্যমে রিপোর্ট এসেছে অনেক মন্ত্রী, এমপি যাদের দ্বৈত নাগরিকত্ব ছিল। এরকম প্রায় পঁচিশ জনের নাম এসেছে, অথচ সংবিধানে নিষেধাজ্ঞা আছে এ সম্পর্কে।

পরিশেষে আমাদের প্রত্যাশা, এই সংবিধান সংস্কার কমিশন জনগণের দীর্ঘদিনের যে আকাঙ্ক্ষা সে আকাঙ্ক্ষাকে তাদের সুপারিশমালায় অন্তর্ভুক্ত করে যথাসময়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করবে সরকারের কাছে। পরবর্তীতে সরকার অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে তাদের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবে। যদি এমন হয় যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংবিধান সংশোধনের সুযোগ থাকছে না, এমনটি যদি হয় সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারকের উদ্যোগের কথা আমরা বলেছি। এই স্মারকে শর্ত আরোপ করতে হবে যাতে যে দলই ক্ষমতায় আসুক তারা সংবিধান সংস্কার কমিশন যে সুপারিশগুলো দেবে সেই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে বাধ্য হয়। বিরোধী দলে যারা বসবে তারা তাতে যেন সমর্থন দেয়। আর উপরের যে বিষয়গুলো আছে, সেটির সবগুলোর ক্ষেত্রেই সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে না। কিছু কিছু বিষয় আছে যেটি আইন প্রণয়ন এবং আইন সংশোধন করেও পরিবর্তন করা সম্ভব। সেটি হয়ত

সেই আইনি প্রক্রিয়ায় করা যাবে। তারপরেও আমরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য উপস্থাপন করেছি। এই ছিল আমাদের মোটামুটি প্রস্তাব। এখানে যদি সম্পূরক বক্তব্য থাকে তাহলে রুবাইয়াত ভাই বা ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার বলতে পারেন।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস (সুজন): আমি ছোট একটি বিষয় যোগ করতে চাই, সেটি হলো কমিশন যে গঠন হয়েছে, এটি তো একটি historical ব্যাপার। এই গঠনটিই একটি বিতর্কিত হয়ে থাকবে এই কারণে যে গঠনটিই itself inclusive হয়নি। বাংলাদেশে যে বাঙালি ছাড়াও আরও অন্য জাতির মানুষ বাস করেন, অন্য ধর্মের মানুষ বাস করেন, তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব এখানে থাকছে না। কাজেই এই কমিশনের রিপোর্ট কতটা প্রতিনিধিত্বমূলক হবে এই ঐতিহাসিক প্রশ্ন মোকাবেলা করেই কিন্তু সামনে এগোতে হবে, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হলো এই সংবিধানের মধ্যে একটি নৃবিজ্ঞানিক মিথ্যা এবং ভুল তথ্য আছে যে বাংলাদেশের সকল জনগণ বাঙালি বলে চিহ্নিত হবে। বাংলাদেশের সকল জনগণ বাঙালি না। কাজেই এখানে কি করা দরকার? এখানে আদিবাসী শব্দটিও বিতর্কিত। আমার প্রশ্ন হচ্ছে অন্তত প্রত্যেকটি জাতি, ২৭টি জাতির নাম সরকারের তালিকাভুক্ত আছে, চাকমা, মারমা, পাংখোয়া, লুসাই, গারো, হাজং তাদের নাম ধরে ধরে বলা যায় কি না? আমি খুব অবাক হয়ে যাই, আজকাল তো অনেকে "মদিনা সনদ"-এর কথা বলছেন, এত বছর আগে মদিনা সনদে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে যে চুক্তি হয়েছে, চুক্তিতে প্রত্যেকটি গোত্রের নাম উল্লেখ। ৮টি বড় জাতি এবং ৩৩টি ছোট ট্রাইবাল গোষ্ঠী, প্রত্যেকের নাম। বানু হুনাইযা, বানু কুনাইফা সবার নাম আছে। কাজেই কেন এই জন জাতিগোষ্ঠীগুলোর নাম থাকবে না। এটি একটি নাম থাকতে হবে। এছাড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ব্যবহার করা হয়েছে। তারা মনে করছেন যে, এটি তাদের সঙ্গে insulting। যেহেতু আমি তাদের সঙ্গে কাজ করি। এই যে বড় আর ছোট একটি majoritarian apoliticism এই শব্দগুলো কিন্তু সংবিধানের মধ্যে আছে। আর হচ্ছে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি আছে, অন্য ভাষার স্বীকৃতি নেই। বাংলা যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হয়েছে এটি বাংলা ভাষার স্বীকৃতি না। বরং বাংলাকে মাতৃভাষা করবার জন্য এই জাতিগোষ্ঠীর যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের স্বীকৃতি। এর মানে হচ্ছে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মাতৃ ভাষাকে equally সম্মান করতে হবে। কাজেই বাংলাদেশে বাংলা ছাড়াও যে আরও ভাষা আছে, যতটি পাড়া যায়, অন্তত ২০টি ভাষার নাম সংবিধানে নাম আকারেই যুক্ত করা যায়। আমাদের সংবিধানে বলা হচ্ছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং অন্য ধর্মও শান্তিতে পালন করা যাবে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, অন্য ভাষা শান্তিতে চর্চা করা যাবে কি না সংবিধান নিঃস্ব। আর ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রকে বিযুক্ত করা যায় কি না সেই প্রশ্নও আমরা রাখছি। আরেকটি শঙ্কা, স্যার জবাব দিতে পারবেন, structural change তো অনেকবার হয়েছে। Care Taker Government-এ কি হয়নি structural change। পরের সরকারতো সেটি মানেনি। কাজেই structural change- কে কীভাবে cultural change-এ রূপান্তরিত করা যায় সেটি কিন্তু একটি বড় প্রশ্ন। আমি নির্বাচনে হেরে গেলে পরাজয়কে মেনে নেওয়ার যে সাংস্কৃতিক যোগ্যতা, সেই political culture-এর standard আমরা কীভাবে বাড়াব, আর এই structural change যেগুলো আপনারা প্রস্তাব করবেন, cultural change না হলে পরে যে দল আসবে তারা এটি totally change করে ফেলতে পারে। কাজেই structural এবং cultural change-এর সম্মেলনটি কীভাবে ঘটানো যায়, সেটি একটি বড় ব্যাপার।

আর দ্বৈত নাগরিকত্ব ব্যাপারে আমি ইউনিভার্সিটিতে কথা বলেছি, তারা খুব সিরিয়াস। কোনো অবস্থাতেই যার দ্বৈত নাগরিকত্ব আছে, যা আমাদের সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে আছে, সে এমপি হওয়ার অযোগ্য হবে। কারণ তার loyalty দ্বিবিভাজিত আসলে। সে কার কাছে loyal হবে। কোন্ সংবিধান মানবে। আপনি মিয়ানমারে যান, অংশান সুচির হাজবেন্ড ফরেনার, এজন্য সে পদটিই পায়নি এখানে। কাজেই এটিকে খুবই সিরিয়াসলি নেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। আমার এটুকুই বলবার ছিল।

আমাকে শুনবার জন্য ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আমরা সুজনের বক্তব্য শুনলাম।

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (কমিশন সদস্য): অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌসকে একটু জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি। আপনার এই প্রস্তাবটি কালকেও এসেছে। প্রত্যেকটি আদিবাসীর আলাদা আলাদা করে নাম include করা। সরকারের স্বীকৃত যে তালিকাটি আছে, আমার ধারণা যে সেটি কিন্তু লিমিটেড। এর চেয়ে অনেক বেশি আছে। সেটি কীভাবে reconcile করব।

অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস (সুজন): আমার মনে হয়, যারা আদিবাসী জনজাতির প্রতিনিধিত্ব করে তাদের সাথে আপনাদের বসা উচিত। ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় থেকে শুরু করে- তিনি আইনও বুঝেন আবার এই জাতিকে representও করেন। কিংবা সমতলে সঞ্জীব দ্রংরা আছেন, গারোরা আছে, এদের সঙ্গে আপনাদের বসা দরকার। তারা কীভাবে চায় কতগুলো জাতির নাম তারা চায়, তাদের কথা শুনা দরকার। ৭২ এ কিন্তু তাদের কথা শুনা হয়নি। এবারের কমিশনেও কিন্তু কেউ নেই। এটি যেন মিস করে না যান, এটিই বলবার জন্য আর্জি। তাদের সঙ্গে একটু বসা দরকার।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমরা হয়ত আবার এই প্রশ্নগুলোতে ফিরে আসব। ছোট ছোট ব্যাখ্যার জন্য, আমাদের পক্ষ থেকে তো বক্তব্য নেই। আমরা আপনাদের কথা শুনার জন্য আপনাদের প্রস্তাবগুলো ব্যাখ্যার জন্য আমরা হয়ত আবার ফিরে আসব। আমরা অন্যদের বক্তব্যগুলো এখন শুনি।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): জনাব দিলীপ কুমার সরকার, আপনার কাছে একটু প্রশ্ন ছিল, clarification-এর জন্য। আপনি বলছিলেন যে, Lower House-এ হবে direct election, Upper House by proportional representation and nomination, এটি বলেছেন নাকি?

জনাব দিলীপ কুমার সরকার (কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী, সুজন): Upper House-এ কী হবে বা পদ্ধতিটি কী হবে, সেটি আপনাদের বিবেচনার জন্য রেখেছি। তবে আপার হাউজে যেন বিভিন্ন শ্রেণিপেশার প্রতিনিধিত্ব ensure করা যায়, এটিই ভাবনার জন্য বলেছি। আর Lower House সরাসরি ইলেকশনে, জনগণের ভোটে। আর এই ইলেকশন পদ্ধতি state guard পদ্ধতি হতে পারে কি না, যে ৪ বছর হয়ে গেল National Parliament, আর দুই বছর পর Upper House. আবার দুই বছর পর Lower House . প্রতিমুহূর্তেই বুঝবে যে আমার জনপ্রিয়তা কমছে বা বাড়ছে কি না।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ(কমিশন প্রধান): সেক্ষেত্রে একটি ছোট প্রশ্ন, আপানারা কি সংসদের মেয়াদ কমানোর কথাও বলছেন, এখন যেটি আছে সেটিতো ৫ বছরের। state guard-এর জন্য সেটি কি ৪ বছর হবে?

জনাব দিলীপ কুমার সরকার (কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী, সুজন): আমরা এখনও এটি স্পষ্ট করে কিছু বলিনি। ৪ বছর নিয়ে অনেক কথা হয়েছে বদিউল আলম মজুমদার, আপনি কি এটি নিয়ে কিছু বলবেন। আচ্ছা ঠিক আছে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমরা এখন শুনব এখানে উপস্থিত আছেন মুফতি আহমদ উল্লাহ মাছুম, তিনি আসলে শায়েখ আহমদ উল্লাহর পক্ষ থেকে উপস্থিত হয়েছেন। একটি লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। মুফতি মাছুম আপনার কাছে অনুরোধ সংক্ষেপে ১০-১২ মিনিটের মধ্যে উপস্থাপনের জন্য। আর লিখিত বক্তব্যটি যাবার আগে যদি আমাদের কাছে দিয়ে যান,আমাদের জন্য সহায়ক হবে।

ধন্যবাদ।

মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম (Centre for Ethical Research & Thoughts-CERT): বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু আসসালাম ....।

ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংস্কার কমিটির প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজসহ অন্যান্য যারা আছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার দুইপাশে বিজ্ঞজন বসে আছেন, আমার আগেও অনেকে বক্তব্য রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমার পূর্বজন করেছেন।

আমি ৩টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করছি। আস্‌সুন্নাহ ফাউন্ডেশন, শায়েখ আহমদুল্লাহ সাহেব, আমি তাঁদের শরিয়া কনসালটেন্ট মুফতি আবদুল্লাহ মাছুম এবং আরেকটি কনসালটেন্ট শরিয়া কনসালটেন্সি ফার্ম আমি সেটির প্রতিষ্ঠাতা এবং Centre for Ethical Research & Thoughts-CERT, আমি এটির ডাইরেক্টর। আমরা যে প্রস্তাবনা পেশ করছি সেই প্রস্তাবনা ৩টি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আমি এবং জনাব আহমদউল্লাহ সাহেব যৌথভাবে এই প্রস্তাবনা তৈরি করেছি। এটি শুধু পাঠ না এটি দীর্ঘদিনের গবেষণা, আমি নেতৃত্ব দিয়েছি এই গবেষণার পিছনে। আমরা এই গবেষণা করতে গিয়ে পৃথিবীর গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রায় ৮ থেকে ৯টি রাষ্ট্র, তিউনিশিয়া, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া এই রাষ্ট্রগুলের সংবিধান আমরা দেখেছি। আমরা যেটি দেখেছি সংবিধানের জন্য যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো মেজরিটি কনসার্ন সেখানে উঠে আসা। বাংলাদেশ ৯০ শতাংশের বেশি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ, সেই হিসেবে মুসলিমদের অন্যতম যে দাবি এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের যে দাবি সে দাবিগুলোকে সামনে রেখে আমরা মোট ২১টি সংশোধনী প্রস্তাবনা রেখেছি। আমাদের দীর্ঘ গবেষণার আলোকে ৬টি নতুন ধারা সংযোজনের প্রস্তাবনা রেখেছি। ৪০ পৃষ্ঠার একটি গবেষণা যেটি আমরা প্রায় কয়েক মাস যাবত করেছি। সবগুলো পড়ার সময় না থাকায় আমি শুধু গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা এখানে তুলে ধরব।

১ নম্বর প্রস্তাবনা। আমাদের বর্তমান সংবিধানে "আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া " এটি শুরুতে বলা আছে। ভূমিকার মধ্যে। সেখানে লেখা আছে যে,"[জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি"। আমাদের এখানে দুটো প্রস্তাবনা। একটি হলো, পবিত্র মুক্তিযুদ্ধ যেটি

হয়েছিল সেটি হয়েছিল 'জুলুম থেকে জাতিকে হেফাজত করার জন্য, মুক্তির জন্য' । সেজন্য ব্রাকেটে 'জাতির মুক্তির জন্য' এর ক্ষেত্রে আমরা বলেছি '' জুলুম থেকে জাতির মুক্তির জন্য'' । আর দ্বিতীয় হলো 'মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে' এর পরে আমরা যুক্ত করেছি, ''আল্লাহ তায়ালার করুণায় স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী'' যেহেতু আল্লাহ তায়ালার করুণায় হয়েছে সেহেতু আমরা এটি যুক্ত করেছি। এটি হলো আমাদের এক নম্বর প্রস্তাবনা।

আমি স্কিপ করে গুরুত্ব বিবেচনায় ৫ নং প্রস্তাবনা পড়ছি। সেখানে বিদ্যমান সংবিধানে অনুচ্ছেদ-৭(১) এ বলা আছে, ''প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।'' আমাদের প্রস্তাবিত বাক্যটি হবে এরকম। ''সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ তায়ালা, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক (আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি জনগণ) যারা রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের অনুগত হইবে।'' আমরা দুটি কারণে এই শব্দ দুটি উল্লেখ করতে চেয়েছি যে, ক্ষমতার উৎস জনগণ হতে পারে না। ক্ষমতার উৎস জনগণ হওয়াটা নানাভাবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের আকিদা ও বিশ্বাসের সাথে পরিপন্থি। সকল ক্ষমতার উৎস হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা। আর প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক মানুষ মূলত আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে। এ বিষয়টি এখানে যুক্ত করা হয়েছে।

প্রস্তাবনা-৯। অনুচ্ছেদ-১৯(৩) এ বলা আছে, ''জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।''

আমাদের প্রস্তাবনা হলো যে, ''জাতীয় জীবনে নানা অঙ্গনে যথাযোগ্য স্থানে ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবে।'' আমরা চাই সকল ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে আসুক। তবে সেটি যেন ন্যায়ানুগ হয়, যথাযথভাবে তাদের মর্যাদা, তাদের সক্ষমতাকে নিশ্চিত করে হয়। ঢালাওভাবে যেন না হয়।

প্রস্তাবনা-১১। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে। অনুচ্ছেদ-৩৯ এ "চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা"। এখানে (ক) তে বলা আছে, নাগরিকদের বাক-স্বাধীনতা থাকবে। (খ) তে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। আমরা প্রস্তাবনা দিয়েছি যে, এখানে তৃতীয় আরেকটি উপধারা (গ) যুক্ত করতে। আমাদের প্রস্তাবনায় আছে, "(গ) বাক-স্বাধীনতার নামে ধর্ম অবমাননা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া যাবে না। এমনটি হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হইবে।'' এ বিষয়টি বিভিন্ন মুসলিম দেশের আইন ও সংবিধানে যুক্ত আছে।

এরপর প্রস্তাবনা ১৫। মাঝখানে স্কিপ করে যাচ্ছি। প্রস্তাবনা ১৫ তে 'ন্যায়পাল' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এখানে অনুচ্ছেদ-৭৭ এ, 'ন্যায়পাল'-এর কথা আছে। বিস্তারিত পড়ছি না। আমরা এখানে যুক্ত করতে চাচ্ছি, '' ন্যায়পালের সদস্যদের মধ্যে দেশের সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি আলেমদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা হইবে।'' এটি আমাদের প্রস্তাবনা।

এরপর প্রস্তাবনা-২০। বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩৭ এ বলা আছে যে, "আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাইবে।'' বিস্তারিত পড়ছি না। আমাদের প্রস্তাবনা হলো, সংক্ষেপে-"রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের মূল্যবোধ এবং তার যে আবেদন সেটিকে রক্ষা করার জন্য একটি ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা কমিশন বা ইসলামি মূল্যবোধ রক্ষা কমিশন গঠন করা"। রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের যে মূল্যবোধ সেটি যেন সুরক্ষিত থাকে।

আমাদের প্রস্তাবনায় আরেকটি বিষয় উঠে এসেছে, এটি নতুন যুক্ত হবে। সেটি হলো "শারিয়া কোর্ট গঠন করা-যে কেউ আদালতের যে কোনো বিচারিক রায়কে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বলে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত উচ্চতর শারিয়া কোর্ট নিজেও তা যাচাই করার অধিকার রাখবে এবং অন্যান্য বিচারকগণ ধর্মীয় বিষয়ে উক্ত উচ্চতর শারিয়া কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবেন। উক্ত উচ্চতর শারিয়া কোর্টে বিজ্ঞ মুফতিগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে।" আমরা দেখেছি, আদালতে নানা সময়ে শারিয়া ইস্যু যখন আসে তখন আমাদের মুফতিগণকে কল দেওয়া হয়। যদি এরজন্য বিদ্যমান একটি ব্যবস্থা থাকে, তাহলে সেটি সুন্দর হবে।

আমাদের বিদ্যমান সংবিধানের ভূমিকাতে বলা আছে যে, ''আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;'' এখানে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা হলো, উক্ত শব্দগুলোর ক্ষেত্রে ৫ম সংশোধনীর সময়ে যেটি ছিল সেটি ফিরিয়ে আনা। সেখানে ছিল, "সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস", বাঙালি জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে 'বাঙালি' শব্দটির পরিবর্তে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ', এবং নতুন করে 'জুলুম ও বৈষম্যমুক্ত দেশ গড়া' এই কথাগুলো যুক্ত হবে। গণতন্ত্রের আগে 'সুষ্ঠু গণতন্ত্র' এ কথাটি যুক্ত হবে। মোটামুটি এই ছিল আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব। অনেকগুলো আমি

পড়তে পারিনি। আমি আশা করছি যে, সম্মানিত কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনায় নিবেন। আমি পুরো লিখিত প্রস্তাব আপনাদের কাছে দিয়ে যাব, ইনশাআল্লাহ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। লিখিত ভাষ্যটি আমাদের কাছে থাকলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির কাছ থেকে যে সমস্ত প্রস্তাবগুলো আমরা সংগ্রহ করছি পরবর্তী সময় সকলের অবগতির জন্য সেগুলো উন্মুক্ত করার পরিকল্পনাও আমাদের আছে।

আমি এখন অনুরোধ করব ড. বদিউল আলম মজুমদারকে তাঁর বক্তব্য দেওয়ার জন্য।

ড. বদিউল আলম মজুমদার (সুজন): ধন্যবাদ। আমার খুব একটা বক্তব্য নেই। আমার অনুরোধ থাকবে আমরা একটি বিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র যেন প্রতিষ্ঠা করতে পারি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ৫৯ এ সাংবিধানিক একটি বলিষ্ঠ অঙ্গীকার ছিল এটি বাস্তবায়িত হয়নি। আমাদের যে দুর্বৃত্তায়িত রাষ্ট্র ব্যবস্থা, রাজনীতি এতে দায়বদ্ধতার কোনো সংস্কৃতিতো নেই। বিকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় পর্যায়ে যারা নির্বাচিত তাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে দায়বদ্ধতার আওতায় আনা সম্ভব। Decentralization, devolution-এর ব্যাপারে আমি আশা করি আপনারা যে প্রস্তাব করবেন সেখানে যেন বলিষ্ঠ প্রস্তাব থাকে। আর গণতন্ত্র মানে সর্বস্তরের জনগণের শাসন। যেটির একটি উপরের খোলস আছে কিন্তু নিচে আমলাদের শাসন, এটির পরিবর্তন করতে হবে। আরেকটি বিষয় নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে, এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখিত দেব বা আরও আলাপ হবে। নারীদের প্রতিনিধিত্বের কথা যেটি দিলীপ বলেছেন, আমাদের বর্তমান যে পদ্ধতি সেটি কোনোভাবেই নারী নেতৃত্ব বিকাশ বা নারীদের ক্ষমতায়িত করে না। এখন ৫০টি আসন আছে, এটিকে ১০০ আসনে উন্নীত করলে ভালো হতো যদি অর্ধেক বা অন্তত এক তৃতীয়াংশ করা যেতো। রাজনৈতিক বাস্তবতায় করা যাবে কি না আমি নিশ্চিত নই। ১০০টি আসন যদি করি, তাহলে ৪০০ টি আসন করে লটারির ভিত্তিতে হতে পারে, ১০০ আসনে প্রথমবার শুধু নারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল, বাকী ৩০০ আসনে নারী পুরুষ উভয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল। পরের বার অন্য ১০০ আসনে, তারপরের বার অন্য ১০০ আসনে। এভাবে ৪০০ আসনের প্রত্যেকটি আসনে একজন নারী সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ পাবে। এতে যে সকল নারীর নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা আছে, তারা পরবর্তীতে সংরক্ষণে চলে যাবে, তখন পুরুষদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসার সুযোগ পাবে। ৪টি term-এর প্রত্যেকটি আসনে অন্তত একবার সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে একঝাঁক নারী নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ পাবে। ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে একসময় তাদের এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ ছিল এখন অনেক রাজ্যেই ৫০ শতাংশ সংরক্ষিত। এক তৃতীয়াংশ যখন ছিল তখন নারীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল ৪০%, ৫০% কিংবা তারও বেশি। কারণ সরাসরি আসনে পুরুষদের সাথে নারীরা নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ পেয়েছে। এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার জন্য আমি অনুরোধ করি। আপনারা সংবিধান পুনর্লিখন করেন বা সংবিধান সংশোধন করেন কিন্তু আমাদের নষ্ট রাজনীতির যদি অবসান না ঘটে তাহলে কী হবে? আমাদের টাকার যে প্রভাব, কয়দিন আগে খবরের কাগজে একটি আর্টিকেল বের হয়েছিল যে, একজন নারীর কাছ থেকে চাওয়া হয়েছিল ২৫ কোটি টাকা। সংরক্ষিত আসনের জন্য। তিনি ৮ কোটি টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি স্পীকার মহোদয়ের কাছে এসেছিলেন তদবির করার জন্য। তার দলের প্রধানদের কাছে। এই হলো বাস্তবতা। এখন রাজনীতি হয়ে গেছে জনকল্যাণ নয়, অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার একটা সুযোগ, ব্যবসা। আমরা কী এখন চিন্তা করতে পারি যে আগামীতে যে নির্বাচন হবে, জনকল্যাণের জন্য যারা রাজনীতি করেন তাদেরকে মনোনয়ন দিবেন। এটি পুরোটাই এখন টাকার খেলাতে পরিণত হয়েছে। এই টাকার খেলা, অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার যে সুযোগ, এজন্যই কিন্তু সবকিছু নষ্ট করা হয়েছে, সব প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হয়েছে। এখন এই নষ্ট রাজনীতি নিয়ে আমরা কী করতে পারব, আমাদের কমিশন কী করতে পারবে। যেমন আমাদের আরপিওতে কিছু খাতে ব্যয় চিহ্নিত আছে। কিন্তু এর বাইরে এই মনোনয়ন বাণিজ্যের জন্য, ভোট পাওয়ার জন্য যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়, এটি কীভাবে আমরা বন্ধ করব? শুধু তাই নয়, আমরা এই যে রাজনৈতিক দলগুলোর গণতন্ত্রের কথা আলোচনা করছি, আমেরিকাতে যে প্রাইমারি পদ্ধতি, যদি রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রাইমারির মত করে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা প্যানেল তৈরি করে, সেখানে যে টাকার খেলা হবে না, আমরা কীভাবে তা রোধ করব? সেখানেতো সীমিত সংখ্যক ব্যক্তি নির্ধারণ করবে- দলের যারা সদস্য। আমরা যদি আমাদের অভিজ্ঞতার দিকে তাকাই, যেমন জেলা পরিষদ। একটি সীমিত সংখ্যক indirect election-এর মাধ্যমে হয়েছে। প্রত্যেকটি ভোটার টাকা নিয়ে ভোট দিয়েছে। কয়েকশত ভোটার ছিল প্রত্যেক জেলাতে। প্রত্যেক প্রার্থীই টাকা দিয়েছে। এর মধ্যে কেউ কেউ ভোট পেয়েছে, কেউ কেউ ভোট পায়নি। সীমিত সংখ্যক যখন নির্বাচক হয়, যেখানে নষ্ট রাজনীতি, টাকাই সবকিছু, সেটিই একমাত্র গুরু। এই হলো সংস্কৃতি। we need to transform our politics, জনকল্যাণে আমাদের পাবলিক সার্ভিসের বর্তমানে যে অবস্থা। আমরা নির্বাচনের ব্যাপারে অনেক কিছু বিবেচনা করছি। আপনারাও সংবিধানে অনেক কিছু পরিবর্তন করবেন কিন্তু আমরা যদি সংস্কৃতি বদলাতে না পারি, তাহলে কী হবে? আমি তো মনে করি এই স্বৈরাচার সৃষ্টির একটি বড় কারণ হলো পুরো রাজনীতিটাই নষ্ট রাজনীতি। শুধু টাকা। অর্থবিত্তের মালিক হওয়াই প্রধান অগ্রাধিকারে পরিণত হয়েছে। আমার মনে হয়, আমাদের গভীরভাবে একটু ভাবা

দরকার, চিন্তা করা দরকার। আমরা যতই সংবিধানে কিংবা আইনে সুন্দর সুন্দর কথা লিখি, কিন্তু আমরা কীভাবে এই transformtion ঘটাব যেখানে রাজনীতি বর্তমানে অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার মাধ্যমের পরিবর্তে এটিকে পাবলিক সেবা, জনসেবায় রূপান্তরিক করা, টাকার খেলা বন্ধ করা। এটি বন্ধ করতে না পারলে we are really grappling with this. I don't know what to do about this অদৃশ্য যে অর্থকরী ভূমিকা রাখে নির্বাচনে এটি কীভাবে বন্ধ করব?

আমি আর কথা বাড়াব না, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, ড. বদিউল আলম মজুমদার।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): আপনার সাথে exchange-এর মতো, প্রশ্ন আকারে না। সেটি হলো, টাকার খেলায় কেউ কেউ আছে ক্ষমতার একটি জায়গায় যাওয়ার জন্য। কিন্তু majority-এর ক্ষেত্রে এটি একটি investment. In return এখান থেকে সে কিছু পাবে এবং ব্যাপক আকারে পাবে সেই আশায় করা হয়। এভাবে চিন্তা করা যায় কিনা যে, বিশেষকরে Legislative Organ নিয়ে যদি কথা বলি। আমি Local Government-এ পরে আসি। Legislative Organ-এর মূল কাজ হচ্ছে legislation-এ মনোযোগ দেওয়া। সেটি থেকে তাদের মূল ফোকাসটি হয়ে গিয়েছে Executive Power, অনুরূপভাবে Financial Management-এ তাদের একটি বিশাল involvement-এর জায়গা। আমরা যদি তাদেরকে legislation-এর function-এ ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি, তাদের সেই জায়গাটুকু যদি আমরা লিমিট করে দিতে পারি যে তারা Local Government-এর বাজেট বা Local Government-এর বিভিন্ন জায়গায় প্রধান হয়ে বসে থাকে, এমপির যে একটি কোটা থাকে, এই জিনিসগুলো থেকে তাকে যদি আমরা পুরোপুরি আইন বানানোর মধ্যে মনোনিবেশ করার সুযোগ যদি সংবিধানের মাধ্যমে করা যায়, তাহলে কি কালচারটা পরিবর্তনের একটি সুযোগ হবে কি না? একটি way আরকি।

ড. বদিউল আলম মজুমদার (সুজন): infact এটিই করতে হবে। কিন্তু কীভাবে করবেন? সব ব্যবসায়ীরা, শিল্পপতিরা, এই ব্যক্তিরাই তো আসবেন। তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ। আমরা দেখছি, conflict of interest. তারা কি ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে আসবে, আপনি কি পারবেন যে, তারা শুধু ৫ বছর যে এই সুন্দর বিল্ডিংটাতে বসবে, তারা কোনো অসুন্দর কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে না। এটি কীভাবে করবেন? এ বিষয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করেছি। তাদের ব্যবসা বাণিজ্য কি ট্রাস্ট সৃষ্টি করে ট্রাস্ট পরিচালনা করবে, তারা ব্যবসা বাণিজ্যে ফিরে যাবে না? কিন্তু তারা তো ব্যবসায়ী। তাদের ঘোষণা অনুযায়ী দুই তৃতীয়াংশ ব্যবসায়ী। আমরা এসব তথ্যগুলো একত্রিত করি। কিন্তু বাস্তবে তারা এর চেয়ে অনেক বেশি। অনেকে এই বিল্ডিংটিতে এসে ব্যবসায়ী হয়ে যায়। তারা বলেন যে, ইনি হলেন আমাদের গরীব এমপি। এই গরীব এমপিকে কীভাবে ধনাঢ্য এমপিতে পরিণত করা যায় সেটি তাদের সবারই প্রচেষ্টা থাকে। এখন যে স্থানীয় সরকারে ভূমিকা পালন করছে এটি কিন্তু অসাংবিধানিক। এ ব্যাপারে একটি রায় আছে, এই রায়টি বিখ্যাত বিচারপতি খায়রুল হকের। বিচারপতি খায়রুল হক এবং ফজলে কবির রায় দিয়েছেন যে, বিএনপি আমলে প্রজ্ঞাপন করে জেলা মন্ত্রী করেছিলেন, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সেটিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। হাইকোর্টের রায়। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেছিল যে আমি ভান্ডারিয়ার এমপি, জেলা মন্ত্রী হওয়ার কারণে আমি আমার ভূমিকা পালন করতে পারছি না স্থানীয় উন্নয়নে। খায়রুল হক এবং দুই বিচারক ঐ প্রজ্ঞাপনটিকে বাতিল করেছে এবং বলেছে যে সেটি অসাংবিধানিক। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে আমরা একটি মামলাও করেছিলাম। এটির হিয়ারিংও হয়েছিল। হিয়ারিং হয়ে এটি রায়ের অপেক্ষায় আজ বহু বছর। একজন বিখ্যাত জজ নাম বলব না, তিনি এখন ছুটিতে আছেন, তাঁর আদালতে আমি কালাম সাহেবকে নিয়ে গিয়েছিলাম, আরও অনেককে নিয়ে গিয়েছিলাম। Clearly অসাংবিধানিক এবং আদালতের রায়ে অসাংবিধানিক। এগুলো কেন হচ্ছে? এগুলো হচ্ছে কারণ এগুলো ব্যবসা। ব্যবসায়িক স্বার্থে এগুলো পরিচালিত হচ্ছে বলে সবকিছু তছনছ হয়ে যায়। আমি অত্যন্ত নেতিবাচক কথা বলছি, আমি আশাবাদী মানুষ। আমরা আমাদের সাধ্যমতো পদ্ধতি পরিবর্তনের বা আরও অন্যান্য বিষয়ে আমরা সুপারিশ করব। কিন্তু দিনশেষে এই fundamental change যদি না হয়, আমাদের মধ্যে যদি রূপান্তর, transformation না হয়, এটি public service, not for self service, আপনি ব্যবসায়ীকে ঠেকাবেন কীভাবে? তারা তো টাকা দিয়ে মনোনয়ন কিনে নেবেন। গতবার একজনের কাছে আমি শুনেছি ৬০ কোটি টাকা দিয়ে মনোনয়ন কিনেছে। ২০২৪ সালে। কেউ কেউ হয়ত আরও বেশি দিয়ে কিনেছে। শতশত কোটি টাকা, হাজার হাজার কোটি টাকার খেলা।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, ড. বদিউল আলম মজুমদার। এখন আমরা ড. সলিমুল্লাহ খানের বক্তব্য শুনব।

অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান : ধন্যবাদ, আমিও সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব।

আমি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস-এ পড়াই। মাঝে মাঝে আমি লিখি। সংবিধান বিষয়ে আলোচনা করতে হলে তো অনেক সময় লাগবে। আমি সংবিধান ও তার সংশ্লিষ্ট দুএকটি প্রশ্ন আগে পরিষ্কার করি, তারপর যদি আপনারা

কিছু জিজ্ঞাসা করেন আরও specific বলতে পারব।

আমি প্রথমে সংবিধানের প্রস্তাবনা নিয়ে শুরু করি। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল যে স্বাধীনতার ঘোষণা, আমি মনে করি সেটিই হচ্ছে আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনা। সাম্য, মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার। এটি যদি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি, সংবিধান যদি সেটি শুরু করে তাহলে অন্যানা আলোচনাগুলো সহজ হয়। আমরা সামাজিক সুবিচার বলে কি মনে করব? আমরা যদি সামাজিক সুবিচার থেকেই শুরু করি, গণতন্ত্রের মধ্যে সাম্য এসে যাবে। সম্প্রতি যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন হয়েছে সেটি হচ্ছে সাম্য কথাটারই নতুন অনুবাদ মাত্র। সাম্য কথাটির যেহেতু সংজ্ঞা দেওয়া খুব কঠিন, কাজেই বৈষম্য বিরোধিতা সাম্যের একটি দিক বা একটি aspect. সেই হিসেবে যদি আমরা সংবিধানে যাই, আমরা শুরু করি যে মার্কিন দেশের সংবিধানে মার্কিন দেশের রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি এটি লেখা নেই। তাতে ইংরেজি সেদেশের জাতীয় বা রাষ্ট্রভাষা হতে কোনো অসুবিধা হয়নি। সেখানে ফরাসি ভাষী, জার্মান ভাষী, স্প্যানিশ ভাষী এবং আরও অন্যান্য ভাষী আছে। জাতিসংঘে এখন ৬টি ভাষা আছে। তারমধ্যে ১৯৭০ এর দশকে আরবি যোগ হয়েছে। এর আগে চীন, রাশিয়া,ফরাসি, স্পেন ও ইংরেজি আছে। বাংলাদেশে একাধিক ভাষা রাখলে দোষ নেই। আমি শুরু করি আমাদের সংবিধানের ৩ নং অনুচ্ছেদে আছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা। যেটির কথা রুবাইয়াত ফেরদৌস বলেছেন। আমাদের কতগুলো কথা আছে জনসাধারণকে তোষামোদ করা যায়, কিন্তু কাজের কাজ হয় না। ভারতে এখন ২২ বা ২৩টি ভাষা। অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে লেখা আছে। কিন্তু সেখানে হিন্দিকে প্রতিষ্ঠা করার যে লড়াই তারা করেছে সেটি সফল হয়নি। ভারতে এখনও কার্যত ইংরেজিই রাষ্ট্রভাষা রয়েছে। যদিও সেটি শতকরা এক জনের ভাষা কিনা সন্দেহ। যদিও ভারতের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান দাবি করে শতকরা ১৫ জন লোক সেখানে ইংরেজিতে কথা বলতে সক্ষম, সেটি আমার মতে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। বাংলাদেশে সে অবস্থা আরও করুন। কিন্তু বাংলাদেশে কার্যত রাষ্ট্রভাষা ইংরেজিই রয়ে গেছে। বাংলাদেশের বর্জোয়া শ্রেণি, যারা এই রাষ্ট্রের মালিক, তারা যদি দাবি করত যে ইংরেজিও রাষ্ট্রভাষা হবে তাহলে তারা সৎ সাহসের পরিচয় দিতেন। কিন্তু তারা যেটি করেছেন এটিকে ইংরেজিতে বলে 'hypocrisy'. মুফতি সাহেব পাসে আছেন, তারা এটিকে বলে 'মুনাফেকি'। অথবা আমাদের খারাপ বাংলায় বলে 'বিশ্বাস ঘাতকতা'। আমি একটি কথা আপনাদের বলতে চাই যে সংবিধানে লেখা থাকলে কী হবে যদি এটির বাস্তবায়ন না হয়। আমি শীঘ্রই আসছি উচ্চ আদালতের রায় সম্পর্কেও। দেশে বিচারপতিদের যোগ্যতা সম্পর্কে (ক), (খ), (গ)-এ আছে, রাষ্ট্র অন্য যে কোনো যোগ্যতার কথা বলতে পারবেন, বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া, ১০ বছর হাইকোর্টের উকিল থাকা বা ১০ বছর নিম্ন আদালতের বিচারক থাকা ইত্যাদির পর অন্য যে কোনো যোগ্যতার কথা বলতে পারবেন। যে বিচারকেরা নিজেরাই বলেন, আমরা স্ব ঘোষিত খুনি একটি কথা বলিনা, সেটিওতো স্বঘোষিত যে আমি বাংলায় লিখতে পারি না। তার empirical প্রমাণ হচ্ছে শতকরা ৯৯ বা তার কিছু কম রায় ইংরেজিতে লেখা হয়। আমি এমন ঘটনাও জানি, উকিলেরা যখন ইংরেজিতে বলেন, argument করেন, তখন জজ বলেন যে বাংলায় বলেন, কিন্তু রায় লেখার সময় ইংরেজিতে লেখেন। এগুলো যদি বাস্তবায়ন করা না হয়, মাছের পচন মাথা থেকে শুরু হয়, সুতরাং আদালত থেকে যদি আমরা বাংলা প্রচলন না করি, তাহলে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে না। আদালতই একমাত্র ক্ষেত্র তা বলছি না। ১৯৫৪ সনের ২১ দফার যে দাবি ছিল যে পাকিস্তানের অন্যতম ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। তার ব্যাখ্যা করে তারা বলেছিলেন, মানেটা কী? ভারতে তর্ক আছে, ওরা বলে official language, আমরা বলি state language. এটি পাকিস্তান আমলের ভাষা আমরা পেয়েছি। সেটি কী? সরকারি চাকুরির পরীক্ষা বাংলায় দেওয়া যাবে। money order form শুধু উর্দু আর ইংরেজি নয় বাংলাতেও ছাপাতে হবে। তারপর আদালতের ভাষা বাংলা হবে। উচ্চ শিক্ষার ভাষা বাংলা হবে। এই তিনটি ক্ষেত্রে যদি পরিষ্কার না করেন, আমি রুবাইয়াত ফেরদৌস এর সাথে একমত, আমরা যদি ৪৫টি ভাষাকে উচ্চ আদালতের ভাষা করতে পারি, বিদ্যালয়ের ভাষা করতে পারি, এরচেয়ে ভালো গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি আর হবে না। কিন্তু আপাতত আমি উদাহরণস্বরূপ বলছি, অন্যকে exclude করার জন্য নয়, বাংলাকেইতো আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম না গত ৭৮ বছরে। ১৯৪৭ সাল সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি আমি জানি না। ১৯৪৭ সালে যখন ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলো, তখন থেকেই আমরা এক ধরনের স্বাধীন। অন্তত কোনটা রাষ্ট্র ভাষা হবে সেই তর্ক শুরু হয়েছে। পাকিস্তান ১৯৫৬ সালে সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরেও বলেছিল ১৯৭৬ পর্যন্ত, ইংরেজিই কার্যত রাষ্ট্রভাষা থাকবে পাকিস্তানের। তার আগে পাকিস্তান ছোট হয়ে গেল, আমরা বাংলাদেশ হলাম, আমাদের এখানে বাংলা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা, এই সংক্ষিপ্ততম ধারাটা রয়েছে, কিন্তু এটির বাস্তবায়ন হয়নি। তার প্রমাণ দেখা যায়, সরকারি কাজে হলেও আপনারা সবাই লিখেছেন কমিশন প্রধান, সদস্য। সুন্দর হয়েছে। এখানে সমস্ত বেসরকারি বিশ্ববিদালয় ইংরেজি নামে চলে। এটি যে সংবিধানের লঙ্ঘন সেটি কেউ বলছে না। আমি মনে করি এগুলো করা দরকার। তারপর শ্রম আইনের লঙ্ঘন আছে।

আমি আগে সংবিধানের কথাই বলছি। সংবিধানে যদি রাষ্ট্রভাষা বাংলা হয়, তাহলে যেটিকে আপনারা সিভিল সোসাইটি বলেন, আমাদের বাংলার অবস্থা যে করুন লোকে এটিকে সুশীল সমাজ অনুবাদ করে। এটি না বোঝার জন্য করে। সিভিল সোসাইটি হচ্ছে জাতীয়

সমাজ, নাগরিক সমাজ। বর্তমানে নগর মানে পুরা রাষ্ট্র। সুতরাং জাতীয় সমাজ। লোকে পলিটিক্যাল ইকোনমি অনুবাদ করতে পারে না। বলে রাজনৈতিক অর্থনীতি। এটিতো জাতীয় অর্থনীতি। আমাদের বাংলা ভাষার এরকম করুন দশার জন্য আমরা দায়ী। জাতিগতভাবে আমরা দায়ী। আমরা সিভিল সোসাইটির বাংলা অনুবাদ করতে জানি না, পলিটিক্যাল ইকোনমির বাংলা অনুবাদ করতে জানি না, যারা স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ তারাই পারে না। তার মানে তারা জিনিসটা বুঝে না। তার মানে গাজর ঝুলিয়ে বলে এটি কী, বলে মুলা। গাজরও চেনে না, মুলাও চেনে না। ব্যাপারটা হচ্ছে তাই। আমি মনে করি ভাষা থেকে যদি শুরু না করি, তাহলে গণতন্ত্র হবে না। এই যে ইংরেজি মিডিয়াম শিক্ষা বাড়তে শুরু করল, KG-1, KG-2 এটি সংবিধানকে লঙ্ঘন করছে। কারণ এটি শিক্ষাকে বৈষম্যমুলক করছে এবং গণতন্ত্রহীনতা করছে। আমি দুটো প্রস্তাব দেব। প্রথম হচ্ছে সর্বস্তরে গণতন্ত্র করা, এই কথাটির অর্থ কী। কথা হচ্ছে কী কারণে আমরা স্বৈরশাসনে পড়লাম। despotism, একনায়কতন্ত্র, fascism যে শব্দগুলো ব্যবহার করছি, শুধু গত ১৭ বছর নয়, আমি বলি বাংলাদেশ শুরু হওয়ার পর থেকেই। আওয়ামী লীগের প্রথম সাড়ে তিন বছর শাসন সম্পূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক। তারপর কখনও পূর্ণ গণতান্ত্রিক হয়ে উঠেনি। জেনারেল এরশাদের সময়, জনাব আলী রীয়াজেরও মনে আছে, আমাদের মনে আছে, সেই কঠিন দিনগুলো এখন পার হয়ে আমরা যদি একটি সত্যিকার গণতন্ত্র করতে চাই, আমি বলছি শর্ট টাইমে মানুষ কেন ভোট দিতে পারে না? ব্যাংকে যখন আমার টাকা আমি তুলতে যাই, কেউ আমার নামে personification করে আমার টাকা তুলে ফেলতে পারে, তখন আমরা মামলা করতে পারি, আমার টাকা আরেকজন তুলবে কীভাবে? আমার স্বাক্ষর, আমার ছবি সব মিলিয়েইতো আমাকে টাকা দেয়। আপনি যদি পাঁচ লাখ টাকার চেক দেন, ব্যাংক তিনবার কল করে যে আপনি সত্যি চেক দিয়েছেন কি না? করা যায়। তাহলে ভোটের ক্ষেত্রে এটি করা যাবে না কেন? আমরা বলছি হয়তো যে বিশাল ভোটার। তবে আমরা যখন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে পার হই, আমরা তিনবার চেকের মধ্যে পড়ি। আমি বিমানে রিপোর্ট করি, বুকিং করি তারপর আমাকে ইলিগ্রেশন চেক করা হয়, আমাকে আবার বোর্ডিং চেক করে। অর্থাৎ আমি আমি কিনা, নাহলেতো সাদেকা হালিমকে ফেরত দিতে পারত না। ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে গেছে। তাহলে ভোটের সময় কেন এই জালিয়াতি হয়। একটি ব্যাপারে আমরা আন্তরিক হই, যদি মুনাফেকি না করি, যার ভোট সে দিতে পারবে, আপনি ভোট একদিন কেন, ভোট মাসব্যাপী নেন। দিনে ১০০ জনের করে ভোট নেন। তাতে জালভোট না দিতে পারে, এটি হচ্ছে প্রথম কাজ। দ্বিতীয় হচ্ছে ড. বদিউল আলম মজুমদার যেকথা বললেন, আমি সেটি সমর্থন করি। যদি আপনি নির্বাচনে কে, এমন কি কত টাকা খরচ করতে পারবে, এইসব বিষয়ে সংস্কারের কথা আমরা না বলি, তাহলে এটি কোনো কাজে আসবে না। যেমন যে যার রেলি করছে, পোস্টার করছে, এগুলো লিমিট করে। যারা যারা দাঁড়াবে সরকারিভাবে তাদের সকলের জন্য একটি অভিন্ন পোস্টার হবে। ৫ জন বা ১০ জন দাঁড়াল, তাদের একই পোস্টার হবে। ১০ জনের নাম ও ছবি থাকবে। বিভিন্ন অর্ডারে করা হবে। alphabetic order, তাদের জন্ম তারিখ অনুসারে, ছোটকে আগে, বড়কে আগে এভাবে নানাভাবে পোস্টার করা যেতে পারে। খরচ সীমিত করে দেওয়া। নির্বাচন কমিশনই সমস্ত খরচ বহন করবে। কেউ এক পয়সা খরচ করতে পারবে না। তার কাজ জনগণের কাছে যাওয়া যে আমি প্রার্থী হয়েছি। এভাবে করা যেতে পারে। নির্বাচনে ভোট প্রথার সংস্কার করা সম্ভব এবং সেটির সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা আমি লিখিতভাবে দিতে পারি। আমি বলব যে, আপনি ভোটার পাসপোর্ট করলেন, তিনি স্থানীয় সরকারে ভোট দিবেন, ভোট যে দিয়েছেন সেগুলো সিল করা হবে। এখন যে হাতে কালি লাগানো হয় এগুলোতো মস্করা। এ কালিতো মুছে ফেলা যায়। অমুছনীয় কালিও তো মুছনীয়। মানুষ ভোট দিতে পারে না, গুন্ডামি করে। প্রত্যেক মানুষ যদি তার ব্যাংকের টাকা তুলতে পারে, বাংলাদেশ ব্যাংকের এক সাবেক গভর্নর, আমি তার নাম বলব না, বলছে না যে ১০ টাকা দিয়ে কৃষকদের অ্যাকাউন্ট খোলা হবে। আপনি ভোটার, ব্যাংকের মত অ্যাকাউন্টতো খুলতে পারেন, দেশেতো ব্যাংকের অভাব নেই। এটি ভোটে সংস্কার করা দরকার। তারপর কে ভোটে দাঁড়াবে, তা সংস্কার। আগে নিয়ম ছিল ২৫ লাখ টাকা খরচ করতে পারবে। এগুলো হাস্যকর। কোনো টাকাই খরচ করার দরকার নেই। রাষ্ট্র খরচ বহন করবে, এই সামর্থ্য রাষ্ট্রের আছে। আমি এটি সংক্ষেপে বলছি এখন। এটি সংস্কার হলে পরে এখন আমি দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের কথা বলি। আজকে যে শিশু স্কুলে যাচ্ছে, ১৬ বছর পর তার বয়স যখন ২১ হবে বা ২০ হবে, তখন সে শুধু নাগরিক হিসেবে প্রত্যাবর্তন করবে, সিভিল সার্ভিসে যাবে, জুডিশিয়ারিতে যাবে, কিছু আগে সামরিক বাহিনীতে যায়, সেই শিক্ষা ব্যবস্থার যদি গণতান্ত্রিক না করি, অর্থাৎ শিক্ষা যদি সবার জন্য অবাধ ও অবৈতনিক না করি, শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি বৈষম্য দূর না করি, তাহলে রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক হবে না। গণতন্ত্র বলতে শুধু legislature তা নয়, গণতন্ত্র মানে executive-ও। অর্থাৎ সিভিল সার্ভিস, তাহলে সিভিল সার্ভিসকে কীভাবে accountable করবেন? আপনি কী ইলেকশন দিবেন সচিব হওয়ার জন্য? তাতো না। মার্কিন দেশের মত দেশে মাঝে মাঝে জাজদেরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইলেকশন মোকাবেলা করতে হয়। কিন্তু আমাদের এখানে জুডিশিয়ারিকে কীভাবে accountable করবেন।

যদি তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে accountable না করেন। সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক loophole আছে, আমাদের অনেক পেছনে খোলা দরজা আছে। এগুলো বন্ধ করার পথ হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণ গণতান্ত্রিকীকরণ। তার মানে কী? সারা পৃথিবীতে এটি স্বীকৃত হয়েছে, একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের শিক্ষা যে গণতান্ত্রিক নয়, আমাদের হাজার রকমের প্রাইমারি স্কুল। তখন লোকে দ্রুত মাদ্রাসা দেখিয়ে

দেয়। অর্থাৎ অনেক দিন থেকেই colonial আমল থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা, স্কুল শিক্ষা আলাদা হয়েছে, এটা colonial ঐতিহ্য। কিন্তু এখন colonial যে এডুকেশন, তার মধ্যে ইংরেজি মিডিয়াম, বাংলা মিডিয়াম, সরকার কেন এটি চালু করবে? আমি এটি বুঝতে পারি না যে দেশীয় সিলেবাস, ইংলিশ ভার্সন। কী প্রয়োজন দেখা দিল? যদি চাকমা ভার্সন করত, তাহলে খুশি হতাম। কিন্তু ইংলিশ ভার্সন করছে কেন? তারপর আপনি যে বিদেশি নাগরিকত্ব নিয়ে বড় অহংকার করছেন এবং বলছেন যে, এমপি হওয়া যাবে না দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে। কিন্তু দ্বৈত শিক্ষা ব্যবস্থা, ত্রৈত শিক্ষা ব্যবস্থা এখানে। এখানে কেন অক্সফোর্ডের A level, O level পরীক্ষা দেবে? কেন বাংলাদেশের প্রচলিত পরীক্ষার সাথে অন্য দেশের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার স্কুল থাকবে? একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, A national system of public education upto twelve years of schooling. I would not say compulsory right now. কেননা সেই বাস্তব অবস্থা হয়ত হয়নি। Free and generally available. এটি কোনো নতুন কথা নয়। এটি জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ২৬ নম্বর ধারাতে আছে। তাঁরা বলেছে Elementary and fundamental education should be free and elementary education should be compulsory. সেটি আমরা নাই বা বললাম। আরেকটি সংশোধনী আমি বলি, এই যে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক বলে একটি জিনিস করেছি, এটি অপ্রয়োজনীয়। প্রাইমারি শিক্ষা পৃথিবীর সব দেশে ৬ বছর। উল্লেখযোগ্য দেশের মধ্যে ভিয়েতনাম, জাপান, কানাডা আপনারা বাকিগুলো সব জানেন। শুধুমাত্র পুরোনো কলোনিয়াল দেশগুলোতে ৫ বছর করেছিলো তারা। এটির মধ্যে একটি বর্ণবাদি অভিক্ষেপ আছে। প্রজেকশনটি হচ্ছে গরীব লোকদের বেশি পড়ালেখা প্রয়োজন নেই। সেই racism এখন চালু হয়েছে আমাদের এখানে Nonformal Education-এর নামে। চার বছরের বাচ্চাকে আপনি কাজ করার লাইসেন্স দিচ্ছেন। BRAC শুদ্ধ অধিকাংশ এনজিও এবং সরকারও এটিকে প্রমোট করছে। এটি বৈষম্যমূলক এবং সংবিধানে এটি নিষিদ্ধ করা উচিত। সবার জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে ৬ বছর, পরবর্তী ৬ বছর হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষা। ১২ বছরের শিক্ষা, এর জন্য কোনো পয়সা নেওয়া বৈধ হবে না। জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা যদি আপনি গণতান্ত্রিক করতে পারেন এবং শিক্ষা হবে যার যার মাতৃভাষায়। বিদেশি ভাষায় নয়। এই জিনিসটি যদি বাস্তবায়ন করতে পারেন তাহলে দীর্ঘমেয়াদি গণতান্ত্রিক সংস্কার করা সম্ভব। আমি আপনাদের মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি না, তবুও যেহেতু রেকর্ড করছেন তাই বলছি, প্লেটো বলেছিলেন, তাঁর 'Republic' বইটি হচ্ছে একটি 'book on education'. তাঁর ৪টি যে allegorical category, ৪ পদার্থ দিয়ে, ৪ ধাতু দিয়ে তিনি যে শ্রেণি নির্দেশ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, Justice is a square. যেখানে যে যার ভূমিকায় অভিনয় করবে। আমি শ্রেণি বৈষম্য দূর করতে পারব, এই দুরাশা করছি না। তবুও আমাদের সংবিধানে লেখা উচিত অনেকে মনে করেন যে এটি হয়ত মার্কস এর প্রিন্সিপল, সেটি হচ্ছে প্রত্যেকের কাছ থেকেই তার সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা নেব। কিন্তু এই সামর্থটা কী? এটি আমাকে তৈরি করতে হবে। এটি হচ্ছে শিক্ষা। তার বুনিয়াদি শিক্ষা, যেটির সঙ্গে তার প্রফেশনালি কোনো সম্পর্ক নেই। যেটি আমি বলি মানুষ হওয়ার শিক্ষা। আমরা তিনজন একসাথে মানুষ হচ্ছিলাম, মানে হলো আমরা শিক্ষার আনন্দে শিক্ষা লাভ করছিলাম মানবসন্তান হওয়ার জন্য। তারপর আমি আমার পেশায় যাব। কে ডাক্তাব হবে, কে আইনজীবী হবে, কে ইঞ্জিনিয়ার হবে, কে কৃষিবিদ হবে। দুনিয়ার নানা বৃত্তিতে আমরা ছড়িয়ে পড়ব। এই বৃত্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রেও মেধার প্রশ্ন জাতিসংঘ তুলেনি। আপনারা দেখেন অনুচ্ছেদ ২৬-এ সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায়, কোথাও মেধার প্রশ্ন নেই। সেটি বলেছে, technical and professional education shall be generally available without discrimination, asto raise sex and etc. যদিও ক্লাস কথাটি সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে খুঁজে দেখেনতো কোথাও ক্লাস শব্দটি আছে কি না? এখন যে সংবিধান রয়েছে। যদিও এটিকে অজ্ঞান সংবিধান বলা হয়, বদরুদ্দিন ওমরের ভাষায়। শ্রেণি, লিঙ্গ, বর্ণ নির্বিশেষে বৈষম্য করা যাবে না ভোটার তালিকায়। কিন্তু শ্রেণি কথাটি নেই। নেই মানে যেহেতু এটি conspicuous। যেহেতু শ্রেণিবিভক্ত সমাজ। আমি বলব শ্রেণি বিভক্ত না করে সকলের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী নেব। কিন্তু প্রত্যেকেই আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী দেব। এখন প্রয়োজন অনুযায়ী দিতে পারব না। আমার তো সর্বোচ্চ উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রয়োজন। কিন্তু রাষ্ট্র হয়তো সেটি আমাকে বিনা পয়সায় দেবে না। শুধু উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ বলেছে মেধার প্রশ্ন তোলা যাবে। কিন্তু আমাদের যত ছেলে-মেয়ে কলেজে ভর্তি হতে চাচ্ছে, তাদের জন্য এটিতো দম বন্ধ করার পরীক্ষা। আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যদি আমরা চালু রাখতে চাই, এটির ফলাফল একদিনে পাওয়া যাবে না।

তবে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বৈষম্যহীন, সম্পূর্ণ অবৈতনিক মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত, এখন যেটি উচ্চ মাধ্যমিক বলি সে পর্যন্ত করার বিধান থাকতে হবে। এখন প্রশ্ন উঠবে, সংবিধানে কি এসব বিষয় লেখা যাবে? সংবিধানে যেটিকে আমরা মৌলিক অধিকার বলি সেটি হচ্ছে রাষ্ট্র কী কী করতে পারবে না, সেটি বলে দেওয়া। বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারবে না, বিনা বিচারে কাউকে জেলে পাঠাতে পারবেন না, ইত্যাদি। আবার মুভমেন্টকে নিষিদ্ধ করা যাবে না। সংগঠন এবং সমাবেশের অধিকার হরণ করা যাবে না। জীবন স্বাধীনতা, এগুলো আমরা জানি। কিন্তু ঠান্ডা যুদ্ধের সময় জাতিসংঘে universal declaration-এর ১৮ বছর পর আমরা দুটো covenant করলাম, 'Civil

and Political Rights' and 'Economic, Social and Cultural Riths'. সেটি হচ্ছে রাষ্ট্র কী করবে, কয়েকটি commitment দিতে হবে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। তারপর যেখানে ব্যতিক্রম আছে, যারা বিদেশ থেকে পড়ে এসেছে, তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা থাকতে পারে। কিন্তু একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা করা উচিত, যেটি জাতীয় অথবা মাতৃভাষা আপনি যে শব্দই বলেন করতে হবে। এটি করতে পারলে আমি মনে করি দীর্ঘ মেয়াদি গণতন্ত্রের একটি ভিত্তি তৈরি হবে। এখন 'Form' সম্পর্কে আমি বলি, যেহেতু সময় কম। আমাদের বর্তমান যে সংবিধান আছে সেটি এদেশ থেকে ওদেশ থেকে নকল করেছে এরকম একটি গুজব আছে, এ গুজবে কান দেওয়ার দরকার নেই আমাদের। একটি সরল সংবিধান লেখা যায়। সংবিধানে দুটো অংশ থাকে। সংবিধানের theoretical concept হচ্ছে আমি বর্জোয়া সংবিধানের কথাই বলছি, ইংল্যান্ডে সপ্তদশ শতাব্দি থেকে যে আইডিয়া চালু হয়েছে যে, এটি একটি চুক্তি- জনগণের সাথে জনগণের। এখানে কনসেপ্টটি হচ্ছে জনগণের সাথে রাজার নয়, জনগণের সাথে জনগণের। অনেকের কাছে এটি বুঝা খুব কঠিন। আমার সাথে আমি কীভাবে চুক্তি করি। এই চুক্তির পরবর্তী ধাপ হচ্ছে আমরা যাকে সরকার নিয়োগ করছি তাদের ক্ষমতাকে limit করা। এটি হচ্ছে সংবিধানের প্রথম কাজ। আর জনগণ যে ক্ষমতা কখনও দেয় না, চিরদিনের জন্য নিজের কাছে সংরক্ষণ করে এটি হচ্ছে বিল অফ রাইটস। এক্ষেত্রে একটি কথা শুধু আপনাদের সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বলব, মার্কিন 'Bill of Rights'-এর ৯ নম্বরে একটি খুব মজার কথা আছে সেটি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এটি আমাদের নজরে আনা দরকার। 'Bill of Rights'- এর ৯ নম্বরে বলেছে, "এখানে আমরা যত অধিকারের তালিকা করেছি সেটিই শেষ তালিকা নয়, আরও অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে"। অর্থাৎ এটি হচ্ছে সারমর্ম। যেটি হচ্ছে amendment-9। এটি বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। যে কথাগুলো আছে আমাদের সংবিধানে, আমি অনেকগুলো রাইটের কথা লিখলাম, পরে কি নতুন Fundamental Rights তৈরি হবে না? তৈরি হতে পারে, সেটি যেন আমরা শেষ না করি। আরও কথা আসবে। The enumeration in the constitution of certain rights shall not be construed to deny or disparage others written by the people. আমি তো rights বলতে সেটিই বুঝি those rights which are written by the people তার একটি তালিকা করা হয়েছে-তারা Bill of Rights-এ, ১০ টি করেছে। আমরা হয়ত ২৫টি করেছি, কিন্তু ভবিষ্যতে আরও যোগ করা যাবে। তাহলে এটি একটি open constitution. এখন আমি limitation সম্পর্কে বলি। আমাদের সংবিধানের form হচ্ছে এটি executive based constitution. যদি গণতন্ত্রই আমাদের ভিত্তি হয়, তাহলে জনগণের সরাসরি ভোটে যে নির্বাচিত হয় সেটি আপনি এক কক্ষ না দ্বিকক্ষ করবেন সেটি সময় থাকলে পরে বলব। আমি আগে এক কক্ষ দিয়েই বলি। এটি সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে। এটিইতো হবে সংবিধানের প্রথম অংশ। যেমন মার্কিন সংবিধানে আছে। আমি মার্কিন সংবিধানের কথা বলছি কারণ এটি ২০০ বছরের উপর টিকে আছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফর্ম তার জন্য। কারণ তার formটি flexible. মাত্র ৭টি আর্টিকেল। এক নম্বর অনুচ্ছেদে বলেছে, রাষ্ট্র কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবে না এবং সকল ধর্মের অধিকার নিশ্চিত করবে। এজন্য আমাদের মুসলিম সমাজের মেজরিটির যে উদ্বেগ যে রাষ্ট্রধর্ম যদি ইসলাম না করি তাহলে ইসলাম বোধ হয় ভেসে যাবে। ইসলামকে এত অবমাননা করার প্রয়োজন আমাদের নেই। ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম। বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা না করলে ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না বলে আমি মনে করি। বরং বাংলাদেশের সংবিধানে যদি ইসলাম নিজেকে বেশি গৌরবান্বিত করতে চায়, ইসলামের মূলনীতি, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেন। সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেন, মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাম্য প্রতিষ্ঠা করেন। কোনো 'Islamic Philosophy' বিরোধিতা করবে না। কাজেই আমরা মর্মে না গিয়ে কথা টানব না। আমি প্রথমেই বলব, আপনি যদি সংবিধান পুনর্লিখন করেন, আমি অধ্যাপক আলী রীয়াজের কথার প্রতিধ্বনিত করে বলছি, যদি আপনি পুনর্লিখনই করেন, তাহলে আপনাকে legislature প্রথমে আনতে হবে। মানে legislature-এর ক্ষমতা symbolicও বটে। Not only real. তারপর প্রেসিডেন্ট ও executive-এর ক্ষমতা। তারপর judiciary. তিনটিকে কী করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে আনতে হবে? জাজদেরও হয়ত নির্বাচনের মুখোমুখি হওয়ার দরকার হতে পারে। কিন্তু minimum একটি বিষয় বলব, যে জাজ বাংলা ভাষায় রায় লিখতে পারেন না তিনি নিজেকে অযোগ্য ঘোষণা করুন। তাহলে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বলি, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনি ইংরেজি মিডিয়ামে আইন পড়াচ্ছেন কেন? বলে যে হাইকোর্টে যারা ইংরেজি বলে তাদের দাম বেশি। আমি বলি হাইকোর্টের যদি ঐ দামটি কমাতে পারি, তাহলে উচ্চ শিক্ষায় বাংলায় আমরা আইন করতে পারব। সেটির জন্য রাষ্ট্রকে পজিটিভ উদ্যোগ নিতে হবে। Economic, Social and Cultural Riths-এর রেফারেন্স দিয়েছি এ কারণে যে, আমাদের এমন অধিকার ঘোষণা করতে হবে যে, যেখানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি আছে যেটি judicially enforceable নয়, সেটি enforceable rights হিসেবে আমরা দিতে পারি। আমি বুঝতে পারছি, জনাব আলী রীয়াজের লাইট জ্বলছে, আমি আপাতত থামলাম।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমাদের সময়ের স্বল্পতার বিবেচনায়। আমি আশা করছি যে, যেটি আপনি উল্লেখ করেছেন যে, আপনি লিখিতভাবে এ বিষয়গুলো দেবেন। তাতে করে আমাদের পর্যালোচনা করা, বিবেচনা করা সহজতর হবে। এগুলো অবশ্যই ঐতিহাসিক ডকুমেন্টস হিসেবে থাকবে।

আমাদের সঙ্গে আছেন মুফতি সাইফুল ইসলাম, তিনি খতিব, মসজিদ উত তাকওয়া। সময়ের স্বল্পতার বিবেচনায় আমরা সবাইকে ১০ মিনিটের কথা বলছি। সংক্ষেপে আপনার বক্তব্যের পরে যদি লিখিত বক্তব্য থাকে আজকে দিতে পারেন অথবা আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছে দিলেই হবে। মুফতি সাইফুল ইসলাম।

মুফতি সাইফুল ইসলাম (খতিব, মসজিদ উত-তাকওয়া): আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারকাতুহু। বাংলাদেশ সংবিধান সংস্কার কমিটি কর্তৃক এই আয়োজিত সংলাপে অংশীজন হিসেবে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেজন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ সোবহানু তায়ালা আল কোরআনে বলেছেন, ''আল্লাজিনা ইম্মাকারনাহু ফিল আরদে আকিমুস সালাহ, ওয়াতা উয যাকাহ, ওয়া আমর বিল-মারুফ, ওয়া নাহি আনিল মুনকার, ওয়ালিল্লাহি আকিবাতুল ওমর।" একটি রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তাদের মৌলিকভাবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কিছু বিধান আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। এর মধ্যে যদি আমরা খেয়াল করি দেখব ৪টি বিধানের মধ্যে ৪টি বিধানই মুসলিমদের জন্য পালনীয়। আর ২টি বিধান সবার জন্য আল্লাহ তায়ালা প্রযোজ্য করেছেন। সেটি হলো, "ওয়া আমর বিল-মারুফ, ওয়া নাহি আনিল মুনকার"। রাষ্ট্রের জন্য যেটি কল্যাণকর একটু আগে যেটি ড. সলিমুল্লাহ খান বলেছেন চমৎকারভাবে যে আমাদের রাষ্ট্রের জন্য, সমাজের জন্য জনগণের জন্য যেটি কল্যাণকর, সেটি আমাদের বিধান হিসেবে থাকবে। যেটি অকল্যাণকর সেটির মূলোৎপাটন করা হবে। সেই আলোকেই আমরা যখন একটি রাষ্ট্রে বসবাস করি, তখন রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণকর জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের যে সকল বিধান প্রযোজ্য করা বা আইন হিসেবে যেটি আনয়ন করা জরুরি সেটিই রাষ্ট্র করবে। এক্ষেত্রে আমরা যা বলতে চাই, এ বিষয়ে আমরা কিছু হোমওয়ার্কও করেছি। আমাদের আলেম ওয়ালামাদের মাধ্যমে আমরা কিছু কাজ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। এখানে আবদুল্লাহ মাছুম সাহেব আছেন, আমরা একসাথে বেশকিছু কাজ করেছি সংবিধান সংস্কার নিয়ে। প্রস্তাবনা আকারে আমি কিছু পেপার ও নিয়ে এসেছি। সেটি আমি ইনশাআল্লাহ আপনাদের কাছে দিয়ে যাব। আরেকটি বিষয় যেটি আপনাদের কাছে বলতে চাই সেটি হলো যে, আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের বাংলাদেশে আরও বিজ্ঞ আলেমে দিন আছেন, আপনার যদি তাদেরকেও ইনভাইট করেন, তারাও এক্ষেত্রে অংশীজন হিসেবে সহযোগিতা করতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। এখানে যে প্রস্তাবনা লিখিত আকারে আমি নিয়ে এসেছি এটি আপনাদের কাছে জমা দেব। যেহেতু সময়ের স্বল্পতা আছে, আমি বিস্তারিত এ মুহূর্তে কিছু বলতে চাচ্ছি না। আর আমাদের বিশ্বাস হলো যে, এমন একটি রাষ্ট্রের আমরা স্বপ্ন দেখি, যে স্বপ্ন আমরা বলব যে বাংলাদেশে যারা বসবাস করেন তাদের সবারই সেটি স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। এ আন্দোলনের ফলে নতুন বাংলাদেশ আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি, আমরা সবাই চাই যে একটি ইনসাফ পূর্ণ রাষ্ট্র হবে যেখানে সবার অধিকার থাকবে এবং সবাই সবার অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবেন। ইসলাম আমাদেরকে সেই ইনসাফের কথাই বলেছে। কোরাআনুল কারিমের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "ইন্নালাহা ইয়ামুরুবিল আদলি ওয়াল এহসান"। প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার আছে। এমনকি আমাদের সামনে যে একটি সবুজ পাতা দেখতে পাচ্ছি তারও একটি অধিকার আছে।

একটি সবুজ পাতাকে ছিঁড়ে ফেলার অধিকার ইসলাম আমাকে দেয়নি বিনা কারণে। তাহলে কীভাবে আমাদের অধিকারকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এটিই হলো আমাদের স্বপ্ন, আমাদের চাওয়া, বিশেষ করে যদি আমরা আমাদের কথা বলি, আমরা ৭১ পরবর্তী প্রজন্ম, আমরা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি কিন্তু নতুন আরেকটি বাংলাদেশ ২০২৪ সালে দেখেছি। সেই স্বপ্নে নিয়ে আমরা সবাই অগ্রসর হয়েছি সেই স্বপ্ন নিয়েই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আমরা সবাই মিলে আমাদের যতটুকু দেবার আছে আমরা দেবার চেষ্টা করব এবং আপনারাও সবাই তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবেন। সেই প্রত্যাশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি আমার পেপারটা ইনশাআল্লাহ দিয়ে যাব।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ওয়ালাইকুম আসসালাম। মুফতি সাইফুল ইসলাম আমরা আশা করছি আপনার লিখিত প্রস্তাবে সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলো থাকবে যেগুলো আমরা বিবেচনা করব। ২/১টি ব্যাখ্যার জন্য। বিশেষ করে আমি মি. সরকার, আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি। আপনাদের একটি প্রস্তাব, যেটি আমরা অন্যদের কাছেও শুনেছি। বাইরে এটি নিয়ে ব্যাপক আলাপ আলোচনা হচ্ছে। সেটি হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর টার্ম লিমিট দুইবার করা। যেটি আপনাদেরও প্রস্তাব আছে। সেক্ষেত্রে ধরুন প্রধানমন্ত্রীকে টার্ম লিমিট করার পর অন্য কেউ এক টার্ম থাকলেন, তারপর ঐ একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীত্বে ফিরে আসার ব্যাপারে কোনো রকম প্রস্তাব কী আছে আপনাদের। সেটি কি আপনারা ভাবছেন যে দুবারের পর যেন সে আর কখনই প্রধানমন্ত্রী হতে না পারেন। বা এক টার্ম পরেই ফিরে আসতে পারেন। তার পথ খোলা রাখার ব্যাপারে আপনাদের কোনো প্রস্তাব আছে কি না?

জনাব দিলীপ কুমার সরকার (কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী, সুজন): আমরা এটিই বুঝাতে চেয়েছি যে, দুই 'term'-এর বেশি কখনই আসতে পারবে না। Gap দিয়ে হোক বা না হোক।

অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস (নির্বাহী সদস্য, সুজন) : অর্থাৎ দুই termই fixed and final. ভাষার ব্যাপারে ২/১টি প্রস্তাব। আমাদের সংবিধান কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক। যেমন রাষ্ট্রপতি বলেন, এটিকে রাষ্ট্রপ্রধান বলা যায় কিনা? আমাদের সংবিধান কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক, গণপ্রজাতন্ত্রী। এই প্রজা শব্দটি উঠিয়ে দেয়া যায় কিনা ? জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশের সংবিধান। Peoples Republic of Bangladesh, এই বাংলা করার ক্ষেত্রে একটু ভাবা দরকার। আর যে প্রশ্নটি আপনি করেছিলেন যে, এমপি পদের মধুটা কি? এই মধুটা কমাতে হবে। শুরুতেই একটি tax free গাড়ি পাচ্ছে। ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পাচ্ছে। এমপির কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা। স্থানীয় সরকারের রাস্তাঘাট করার কাজটি এমপি কোনো অবস্থাতেই করতে পারবে না। এটি যদি বন্ধ করতে পারেন। এই মধুটি কমাতে হবে আসলে। আর যে কোনো ক্ষমতার ঝোঁক হচ্ছে স্বৈরাচার হওয়া। সম্পূর্ণ western democracy টিকে আছে এই চোখে চোখে রাখার মধ্য দিয়ে। একটি প্রতিষ্ঠান আরেকটি প্রতিষ্ঠানকে চোখে চোখে রাখে। কাজেই সংবিধানে এমন ব্যবস্থা করতে হবে একটি হলো vertical accountability, আরেকটি horizontal accountability. Parliamentary Standing Committee, Judiciary এবং মিডিয়ার কাছে সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে। সারাক্ষণ একটি accountability-এর structure তৈরি করতে না পারলে এটি কিন্তু ব্যর্থ হবে। কাজেই এটিকেই পাহাড়া দিতে হবে। আর যেটি বললাম, এই সংবিধান খালি বাঙালির, মুসলমানের এবং পুরুষের। এখান থেকে বেরিয়ে একটি বহুত্ববাদী সংবিধান করেন। বাংলাদেশ শুধু বাঙালির নাম, এটি বহু জাতির, বহু ধর্মের, বহু ভাষার, বহু সংস্কৃতির রাষ্ট্র। এই যে polarism, that is the beauty of democracy. এর reflection কিন্তু আমাদের সংবিধানে নেই। এটি থাকতে হবে। বলা হচ্ছে, সবচেয়ে ক্ষুদ্র, সংখ্যায় কম, সবচেয়ে সভ্য রাষ্ট্র হচ্ছে তারা যারা এটিকে recognize করে। যদি recognize না করা যায়, অন্তত যেন respect করা হয়। যদি respect না করা যায়, অন্তত যেন tolerate করেন। আমরা কিন্তু tolerate করি না। অন্য ধর্মকেও না, অন্য জাতিকেও না। নারী পুরুষের বাইরে যে হিজড়া আছে তাদেরকেও না। এই বহুত্ববাদের reflection এই সংবিধানে নেই। এটি থাকা দরকার। একটি monotheistic/monolithic রাষ্ট্রের ঝোঁক কিন্তু আমাদের সংবিধানে রয়ে গেছে। আর ক্ষমতাকে কীভাবে পাহারা দেওয়া যায়, চোখে চোখে রাখা যায়। নাহলে এর ঝোঁকই হচ্ছে স্বৈরাচারী হয়ে যাওয়া। সমস্ত political philosopherদের চিন্তাই ছিল কীভাবে এটিকে আটকে রাখা যায়। কনটেন করা যায়, সেটি একটু ভাববেন।

ধনাবাদ।

জনাব ফিরোজ আহমেদ (কমিশন সদস্য): আমি ছোট দুটি প্রশ্ন করতে চাই, সকলেই উত্তর দিতে পারেন। একটি বিষয় যেটি গত কয়েকদিনের আলোচনায় বার বার এসেছে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা অন্তর্বর্তী সরকারের বিধানটি আমাদের সংবিধানে আবারও ফেরত আনার বিষয়ে অনেকেই বলেছেন। এটিতে দুইটি প্রশ্ন আসে, একটি হচ্ছে যে, এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা অন্তর্বর্তী সরকার কি আগের মত হবে নাকি পরিবর্তন আসবে। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পুরোনো একটি প্রশ্ন এখানে এসেছে যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নির্বাচন কমিশন বা বিচার বিভাগ কিংবা দুর্নীতি দমন কমিশন এগুলো যদি শক্তিশালী হয়। অর্থাৎ সর্বস্তরে যদি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় সেক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা অন্তর্বর্তী সরকারের আদৌ প্রয়োজন পরে কি না? আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে, যেটি অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান বলেছেন যে, সংবিধানের প্রথম কাজ হবে যে সরকারের ক্ষমতাকে সীমিত করা। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, আমাদের সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর যে অবারিত ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবেই তৈরি হয়েছিল, অন্য দিকে সরকারকেতো আবার কার্যকরও থাকা দরকার। অনেকগুলো দেশে যেটি ঘটে যে, নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের বাইরেও অনেকগুলো শক্তি থাকে যারা সরকারকে নানাভাবে চাপ তৈরি করার চেষ্টা করে। এ দুটোর ভারসাম্যটা আসলে কীভাবে হতে পারে? আপনারা এখানেও আলোচনাটা করতে পারেন কিংবা পরবর্তীতে আপনাদের যে লিখিত কাগজগুলো থাকবে সেখানেও সেটি আসতে পারে। কিন্তু আমার ধারণা যে, এটি হয়ত চিন্তা করার বেলায় আমাকে গুরুত্বপূর্ণ inside দেবে।

ধন্যবাদ সবাইকে।

অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান: আমি একটু এ ব্যাপারে বলতে চাই যে, সরকারের ক্ষমতা সীমিতকরণের বিষয়টি যেন কোনো বাঁধার সৃষ্টি না করে কাজের জন্য। এটির ভালো উদাহরণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা। সেখানে যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত থাকলেও রাষ্ট্রপতি সেখানে সবকিছুর ব্যবস্থা নিতে পারেন। এখনই নয়। সেটা হচ্ছে, Federalist Papers-এ Madisonরা আলোচনা করেছেন, তাতে এগুলো আছে। আমরা সেটি কনসাল করতে পারব, এখন সেটি বলছি না। যেমন ধরেন অনেকের মধ্যে ধারণা আছে, প্রচার করতে চায়, যদি আমরা রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে একটি ভারসাম্য আনি, এটি একটি জনপ্রিয় কথা এখন। এতে বোধহয় স্বৈরাচারের অবসান হবে। এটা যদি স্বৈরাচারের উৎস হতো তাহলে আমরা এটি বলতে পারতাম। কিন্তু স্বৈরাচারের উৎস অন্য জায়গায়। সেই জায়গাতে যদি আমরা হাত না দেই, ড. বদিউল আলম মজুমদার একটু করে বলার চেষ্টা করেছেন, এটি হচ্ছে অর্থের ছড়াছড়ি। আসলে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যে কতিপয় অলিগার্কিকের ওপর নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেটিতে যদি আপনি হাত দিতে না পারেন, তাহলে এটি হবে না। এটিতো ফর্মাল ব্যাপার। আরেকটি ব্যাপার হলো, আমিও কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে

মনে করি যে, আমাদের সংসদের মেয়াদ ৪ বছরের বেশি হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশের যে অবস্থা, তাতে ৪ বছর পর পর নির্বাচন হলে প্রধাসনমন্ত্রী যখন দুবার হবে তাহলে ৮ বছর হবে। যদি আপনি ৫ বছর রেখে দুবার করেন তাহলে এটি ১০ বছর হবে। এটি হলো সীমিতকরণের একটি ধরন। কিন্তু ক্লাসিকেলি ইউরোপে সরকারের ক্ষমতাকে সীমিতকরণের যে দুটো বিধান রেখেছে একটি হলো মৌলিক অধিকারে হাত দিতে পারবে না সরকার। এই যে আমাদের দেশে নিরন্তর special power act, RAB গঠন থেকে শুরু করে উরমরঃধষ ঝবপঁৎরঃু অপঃ হয়েছে, এগুলোতো Blood and flagration of constitutional right. সে ব্যাপারে আমরা কী ব্যবস্থা নিতে পারি যদি implementation না হয়। আমিতো বললাম, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা থাকা সত্ত্বেও সুপ্রিম কোর্টে কী করে ইংরেজি চলে? এটিতো সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। কিন্তু কেউ তো কিছু বলছে না। অথবা আপনারা যারা এখানে কয়েকজন lawyer আছেন দেখতে পাচ্ছি, বিচারকদেরকে যে 'my lord, my lord' বলা হয়, এটিতো সম্পূর্ণ Republican constitutional বিরোধী। my lord বললে তারাও আনন্দ পান, আমরাও বলে বলে কাজ আদায় করি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কৃতি এগুলো, হয়ত এ থেকে আকাশ পাতাল পরিবর্তন হবে না। আরেকটি হলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি আমরা ঠিক না করি গণতন্ত্রে আমরা যেতে পারব না। আমি সেই কথায় না গিয়ে বলছি, তিনটি যে বিভাগ সরকারের তাদের পরস্পরের মধ্যে যে ব্যালেন্স করা, যেমন এখন সবাই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কথা বলছেন, বিচারপতিদের অভিশংসন কী করে হবে, সেটি যদি পার্লামেন্টে আসে, তাহলে লোকে মনে করে যে পার্লামেন্টের ক্ষমতা বেড়ে গেল। একইভাবে জুডিশিয়ালের কাছে কিন্তু ক্ষমতা আছে, সংবিধানে কোনো সংশোধনও যদি করে, এটি যদি basic structure-এর সাথে অসংঘাতিপূর্ণ হয়, তাহলে এটিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার ক্ষমতা জুডিশিয়ারির হাতে এখনও আছে। সেদিক থেকে পরস্পর পরস্পরকে ব্যালেন্স করছে। মাঝখানে executive. আমাদের সংবিধানে আপনারা লক্ষ্য করেছেন, সংবিধানে নির্বাহী বিভাগ দিয়ে শুরু করেছে। কেন? আপনি কি মনে করেন এটি দুর্ঘটনা? এটি দুর্ঘটনা না। আমাদের এটি সংস্কার করতে হবে যে symbolically আইনসভার অধিকার হবে সবার চেয়ে বেশি। তারপর আইনসভার দ্বারাই নিয়োজিত বা অনুমোদিত না হলে কেউতো প্রধানমন্ত্রী হয় না। তারপর জুডিশিয়ারিকেও সেইভাবে আইনসভার কর্তৃত্বে আনতে হবে। আবার আইনসভা এবং প্রেসিডেন্টও যদি সংবিধান বিরোধী কোনো পদক্ষেপ নেন, সেটি বলবার ক্ষমতা জুডিশিয়ারির হাতে থাকবে। এটি classic ব্যবস্থা। আমরা ব্রিটিশ সংবিধান বা ব্রিটিশ কাস্টম থেকে পেয়েছি। সেটি প্রত্যাখ্যান করার কোনো কারণ নেই। যেখানে মূল ঘটনা হচ্ছে কোনো রকমের মৌলিক অধিকারকেই রাষ্ট্রের কোনো ব্রাঞ্চই সম্মান করছে না। জুডিশিয়ারিও করছে না। যেমন আমি বললাম, আমার মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার আছে। এটি মৌলিক অধিকার কি না এটি পরিষ্কার নেই। আমরা বলি যে শিক্ষা হবে সবার অধিকার। কতটুকু শিক্ষা মৌলিক অধিকার ? class 5 পর্যন্ত, class 4 পর্যন্ত, ব্রাক এর স্টাইলে। কতটুকু ? এটি কিন্তু define করেনি, জাতিসংঘও define করেনি। প্রত্যেক বিষয়ে সংবিধানে define করতে হবে। এজন্য বলছি যে, আমরা কতগুলো red, herring false issueকে নিয়ে আলোচনা করছি। তারপর শেষ কথাই বলি। এককক্ষ, দ্বিকক্ষের কথাই বলি। পেশাভিত্তিক হলে হাজার সমস্যা হবে। কোন পেশা স্বীকৃতি পাবে, কোন পেশা স্বীকৃতি পাবে না। কিন্তু আমাদের দেশতো খুব ছোট দেশ নয়। জনগণের হিসাব করলে প্রায় ১৮ কোটি, ২০ কোটি লোকের দেশ। আমাদের ৬৪টি জেলা আছে। classic form-এ যদি দ্বিতীয় একটি পার্লামেন্ট করতেই চান, দ্বিতীয় কক্ষ, এটি জেলাভিত্তিক করলে অসুবিধা কী? এক জেলা থেকে দুজন করে সদস্য নেবেন। তাহলে বড় জেলা, ছোট জেলার কোনে পার্থক্য থাকবে না। ধরেন ৬৪ জেলায় ১২৮ জন সদস্য নিয়ে উচ্চ কক্ষ হবে। সেটি কারা হবে? আমেরিকার মত এটির নাম 'senate'ও দিতে পারেন। আমি এটি নিয়ে কোনোরকম আর্গুমেন্টও করছি না। এটির possibility আমি বলছি। এই পেশাভিত্তিক,আনুপাতিক এ সমস্ত যদি হিসাব নিতে চান, আরও ১০টি সমস্যা দেখা দেবে। সেজন্য একটি simple সমাধান হচ্ছে দ্বিকক্ষ করতে চাইলে direct election- এ প্রথম কক্ষ হবে। এই যে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ১০০ ইত্যাদি বলা, এগুলো আরও বহু সমস্যার জন্ম দেবে। সেজন্য আমার মনে হয় এ বিষয়ে আমাদের পৃথক অধিবেশনে বসা দরকার।

ধন্যবাদ।

জনাব দিলীপ কুমার সরকার (কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী, সুজন): আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে বলতে চাচ্ছি। আমরা প্রেক্ষাপটটি সকলেই জানি যে নির্বাচনের সময় দলীয় সরকার যদি থাকে তবে সে নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। প্রভাবিত করার মূল বিষয়টি হচ্ছে আমাদের দেশে জনপ্রশাসন বলি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন যেটিই বলি না কেন সবখানে দলীয়করণে প্রভাব। সেক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি কতদিন থাকবে সেটি না বলে এটি সংবিধানে include করাই উচিত। যদি আমরা দেখি যে অন্যান্য সংস্কার কমিশনগুলোও কাজ করছে, আমরা যদি দেখি যে আমরা সত্যি সত্যি জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ মুক্ত করতে পেরেছি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীসহ অন্যান্য যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান সবগুলোকে আমরা দলীয়করণ মুক্ত করতে পেরেছি, তাদেরকে রাষ্ট্রের কাছে দায়বদ্ধ করতে পেরেছি, এরকম অবস্থা যদি কখনও আমাদের মনে

হয় তখন আমরা হয়ত এই তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি অর্থাৎ যখন এরকম একটি আস্থায় আমরা আসব যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক, বিভিন্ন অর্গানগুলোকে তারা প্রভাবিত করতে পারবে না এবং নির্বাচন কমিশন তখন আইনিভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে নৈতিকতার সঙ্গে, সাহসিকতার সঙ্গে সঠিকভাবে তার role play করতে পারবে, এরকম অবস্থা যদি হয়, প্রয়োজনে তখন বিবেচনায় নিয়ে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার উঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই মুহূর্তে আমরা চাচ্ছি এটি সংবিধানে সন্নিবেশিত হোক, কোন লিমিট না করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি স্থায়ী বিধান হিসেবে চাইছি এই কারণে এই structural change যদি political partyগুলো বহুদিন থেকে চর্চা করে তাহলে এটি একটি cultural change-এ রূপান্তরিত হবে। রাস্তায় থুথু ফেলা যাবে না বাংলাদেশে আইন করতে হয়। ইউরোপে আইন করতে হয় না, ওরা কেউ থুথু ফেলে না। কালচারাল চেঞ্জ এই ৩০০ বছরে নিয়ে এসেছে। কাজেই এটি একটি স্থায়ী বিধান যেটি এক সময় গিয়ে কালচারাল চেইঞ্জে রূপান্তরিত হবে। তখন হয়ত লাগবে না। এখন স্থায়ী বিধান চাইছি। আর সংরক্ষিত নারী আসনের কথা বলি, এর স্পিরিডটা ছিল যে নারীরা politics এ পিছিয়ে আছে, তাদের একটি প্রতিনিধিত্ব। কিন্তু এখানে urban, elite, শিক্ষিত, সচ্ছল সেইসব নারীদেরকেই নেওয়া হতো, সুবর্ণা মুস্তফা, আরমা দত্ত। না, এটির মধ্যে intersectionality করতে হবে, যদি আপনি পিছিয়ে পড়াদের আন্তে চান। কেন একজন দলিত নারী নেই, কেন চা বাগানের নারী নেই, কেন আদিবাসী নারী নেই। পিছিয়ে পড়াদের যদি আনতে চান, শুধু ৫০ জন নারী হলে হবে না। intersectionality, প্রান্তিকদের মধ্যে কারা আরও প্রান্তিক, তাদেরকে তুলে আনতে হবে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান: আমি একটু যোগ করতে চাচ্ছি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে আলোচনাটা উঠে এসেছে, এক্ষেত্রে আমাদের একটি চিন্তা যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন গঠন করতে যাচ্ছি, এক্ষেত্রে আমাদের নীতিমালাটি খুব strong হওয়া উচিত। পূর্বের মত যে সকল অনৈতিক কাজগুলো যুক্ত হয়েছিল সেগুলো যেন না হয়। ২ নম্বর, সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে আমি যুক্ত করব এ বিষয়টি যে, হ্যাঁ, আমাদের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উঠিয়ে নিয়ে আসা উচিত। পাশাপাশি তাদের যোগ্যতা, তাদের যে capability-এর ব্যাপার আছে, সে দিকটিও যেন উঠে আসে। শুধু পিছিয়ে পড়াদের কারণে আমরা এমন কাউকে নিয়ে আসলাম, আসলে যে যোগ্য নয়। যোগ্যতার বিষয়টি আমি যুক্ত করার প্রস্তাবনা দিচ্ছি কারণ এই গণঅভ্যুত্থানের পেছনের কারণ কিন্তু এ বিষয়টিও ছিল যে যোগ্যতার বাহিরে গিয়ে অনেক কিছু করে ফেলেছি শব্দের মারপ্যাঁচের কারণে। যোগ্যতাটিকে যদি আমরা যুক্ত করি, আমি মনে করি যে আরও justice হবে। শুধু নারীর জন্য নয়, সবার জন্যই যোগ্যতা।

৩ নং বিষয়টি আমি শেষ করছি, হিজড়া সম্প্রদায় নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে। আমি শুধু বলব, আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে তৃতীয় লিঙ্গ বলে আমরা অভিহিত করি। আসলে তৃতীয় লিঙ্গটিই হলো আরও বেশি কোণঠাসা, আরও বেশি পিছিয়ে দেওয়ার কারণ। তাদেরকে আমাদের মূল যে লিঙ্গ আছে নারী, পুরুষ সেই দুই লিঙ্গের মধ্যে নিয়ে আসা। তাদেরকে সরকারিভাবে অপারেশন বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আমাদের মূল সমাজে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। তৃতীয় লিঙ্গ বলা মানেই তাদেরকে আরেকটি ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ।

মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম (Centre for Ethical Research & Thoughts-CERT)**:** বাংলাদেশ সরকারের যে গেজেট, সেখানে তৃতীয় লিঙ্গ শব্দটি নেই। হিজড়াকেই লিঙ্গ ধরেছে। নারী, পুরুষ এবং হিজড়া। তৃতীয় লিঙ্গ শব্দটি বাংলাদেশ সরকারের গেজেট নেই। এটি commonly সবাই বলছে। হিজড়াকেই লিঙ্গ ধরেছে। just এটুকু কারেকশন দিচ্ছি আমি।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান)**:** ধন্যবাদ।

আমাদের সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমরা অধিবেশনটি এখানেই শেষ করছি।

অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান: একটি বক্তব্যে আমি নোট দিচ্ছি। Note of descent. আমার বন্ধু রুবায়াত ফেরদৌস বলেছেন, প্রজা শব্দটি একপক্ষীয়। এটি হচ্ছে বাংলা ভাষা সম্পর্কে একটি misunderstanding. প্রজা শব্দের অর্থ subject to be law, not subject to a king. এমন কি আনু মুহাম্মদ সাহেবকেও আমি প্রবন্ধ লিখতে দেখেছি যে, আমরা কার প্রজা। আমাদের তো রাজা নেই। কিন্তু It is a misunderstanding. প্রজা হচ্ছে subject to the supreme law. Constitution আমি মেনে চলি, এজন্যই প্রজা। কোনো ব্যক্তির প্রজা নই আমি। আগে রাজার আমলে প্রজা বলা হতো, এটিতো Continuation. এই যে আমরা অনেকেই সভা প্রধান বলছি, সভাপতি বলছি না। এগুলো হচ্ছে নবযুগের সচেতনতা। একইসাথে অনেকেই ভাষা না বোঝার কারণে betray করছে। এরকম অনেক শব্দ আছে। যেমন পুরুষ, আমি চৌদ্দ পুরুষক্রমে বলছি। আমাদের সমস্ত ভাষাই কিন্তু gender based. যেমন: Men বলতে Human being-ও বোঝায়। mankind যখন বলি। আবার Men বলতে female. একটি শব্দ যে একাধিক অর্থ বহন করতে পারে, এটি ভাষার প্রাথমিক law. Law of metaphor and law of metonymy. এটি না বুঝার ফলে আমাদের অনেক পন্ডিত কিন্তু অনেক কথাবার্তা

বলেন যেগুলো আমার জন্য বেদনাদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এতে কোনো অসুবিধা নেই। প্রজাতন্ত্র কথাটির অর্থ হচ্ছে people republic রিপাবলিক। Republic মানে কী? Respublica-এর অনুবাদ। It is public which is translated in as Ôপ্রজা'। এটি লেটিন শব্দ, Respublica, জনগণের মাল। জনগণ বলতে যদি আমরা প্রজা বুঝি, এটি কোনো রকমের অপমান বুঝায় না। কারণ এটি বুঝায় obedience of the law. সেই অর্থে The king is not above the law. রাজতন্ত্রের বেলায়তে The King is above the law. ঐ অর্থে রাজাও একজন প্রজা। আমার ঘর খানায় কে বিরাজ করে। এই রাজা বিরাজ করে- who ever exists being অর্থে। এর প্রমাণ হচ্ছে এসপারান্ত ভাষায় চেষ্টা করা হয়েছিল, সেটি ব্যর্থ হয়েছে। এরকম ভাষা হয় না। ভাষা স্বাভাবিক।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমি বুঝতে পারছি যে, এ নিয়ে আমরা আরও ব্যাপক আলাপ আলোচনায় যুক্ত হতে পারি। Accademic and public policy দুই অর্থেই। শেষ পর্যন্ত ঘড়ি আমাদেরকে তাড়া দেয়। সকলকে আবার ধন্যবাদ। আপনাদের অনুমতি নিয়ে অধিবেশনটি এখানেই শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

অষ্টম সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় :দুপুর ১২.০০ থেকে ২.৩০ টা পর্যন্ত

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:

১।	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক,	কমিশন প্রধান
২।	অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,	সদস্য
৩।	ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল	সদস্য
৪।	ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল	সদস্য
৫।	জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক	সদস্য

অংশীজনদের তালিকা

১। জনাব মতিউর রহমান

কার্যবাহ প্রস্তুতকারক:

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সম্পাদনায়:

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানের কার্যবাহ

কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): সবাইকে ধন্যবাদ।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনি জানেন যে সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আপনাকে অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে। আপনি তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা অংশীজনদের সাথে এই আলোচনা ছোট ছোট আকারে রেখেছি যাতে করে সকলের মন্তব্য ও বক্তব্য আমরা শুনতে পারি ও আলোচনা করতে পারি। আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকের এই অধিবেশন শুরু করার আগে সেইসব শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় প্রদান করবেন।

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে আপনার অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনার প্রতি আমাদের অনুরোধ, ১৫ থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে সকলের মতামত শোনার সুযোগ হবে। আপনার বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব লিখিত আকারে আজকে আমাদের কাছে দিতে পারেন অথবা আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

জনাব মতিউর রহমান (প্রথম আলো): কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজসহ সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আমি সংবিধান নিয়ে খুব বড় কিছু বলতে পারব, তা না। আমি আপনাদেরকে কিছু পয়েন্ট বলব। কালকের মধ্যে লিখিতটা পৌছে দিব। বড় আলোচনা হলো, সংবিধান পুনর্লিখন বা সংশোধন। সে সব বিষয়ে না গিয়ে অবশ্যই সংশোধন দরকার। অবশ্যই কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুনর্লিখন প্রয়োজন। যত কথা বাজারে আলোচনা হচ্ছে, তাতে কিন্তু বাদ দেওয়ার প্রশ্নটি একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা, প্রয়োজন ইত্যাদি মিলিয়ে আপনারাই এটি ঠিক করবেন। আমার মনে হয় যে, পুনর্লিখন যে অর্থে বুঝি যে নতুন করে লেখা এদিকে থাকলেই মনে হয় ভালো হয়। তাতে সংশোধনও করতে হয় আবার পুনর্লিখনও করতে হয়।

মূল কথা আমরা গণতন্ত্র চাই, একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চাই। সেজন্য একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান চাই। যাতে করে দেশের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের অধিকার রক্ষা হয়। এটি না থাকলে আর কোনো কিছুই কোনো কাজে দেয় না। এই যে বইটা, এত বড়, এতসব বিষয় আছে এখানে রাষ্ট্র, সরকার পরিচালনার বিষয় অনেকগুলো ব্যাপার আছে। আমার মনে হয় যে, এখানে না থাকলেও চলে। Comptroller and Auditor General (CAG)-এর কাজ, কর্ম কমিশনের কাজ-এ ধরনের অনেকগুলো বিষয় আছে, যেগুলো অনেক বেশি চলে এসেছে। আমার ধারণা হয় যারা ছিলেন বিগতকালে তারা শাসন ব্যবস্থাটিকে পাকাপোক্তভাবে নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্য সংবিধানের মধ্যে যতকিছু সম্ভব সবকিছু ঢুকিয়ে নিয়েছে, যুক্ত করেছে যাতে করে তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। গণতান্ত্রিক সংবিধানের মৌলিক ভিত্তিই হবে জনগণের স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তার বিকাশ উপযোগী কিছু সাধারণ নীতি নির্ধারণ করা। এগুলোর ওপর দাঁড়াবে বিধি-বিধান, আইন-কানুন এবং রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ৩টি অঙ্গ। আমরা জানি যে, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে একটি ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করা দরকার। কিন্তু আমরা দেখলাম বিগত বছরগুলোতে যিনি আইন বিভাগ অর্থাৎ সংসদের নেতা তিনিই নির্বাহী বিভাগের প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি এরকম দ্বৈত শাসন থাকায় সরকারের ভেতর থেকে নানা প্রভাব বিস্তার করে। বিচার বিভাগের ওপরও তাঁর প্রভাব পরিপূর্ণভাবে অক্ষত্ন রাখেন। তার অর্থ প্রধানমন্ত্রী যিনি ছিলেন বা এখনও সংবিধানে যেভাবে লিখিত আছে এটি একটি ভয়ঙ্কর ক্ষমতার অধিকারী। একজনের হাতে এত ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া, এটি রেখে কোনভাবেই গণতন্ত্রের শাসন, বিধি বা সংবিধান হতে পারে না। আমরা দেখলাম যে, বিগত বছরগুলোতে বিচার বিভাগ কার্যত নির্বাহী বিভাগের ইচ্ছা পূরণের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন। নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে উচ্চ আদালত পর্যন্ত। সবক্ষেত্রেই বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে। সেটি হয়ত বিশেষ আলোচনার বিষয়। আমি আশা করি, বিশ্বাস করি, বর্তমান অন্তবর্তী সরকার সেটি করবেন। করার দিকেই তাঁদের লক্ষ্য। এখানে কিছু কিছু মামলা মোকদ্দমা সুপ্রীম কোর্টে, হাইকোর্টে এখন আছে। সেগুলোর রায়ের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করবে। তারপর আমি মনে করি যে, এই জায়গাগুলোতে আপনারা নিশ্চয় বিবেচনা করবেন।

সংসদকে সীমাহীন ক্ষমতা দেওয়া আছে। একটি বিষয় ভাবা যায় কি না যে, সংবিধানে এমন নিশ্চয়তা দেওয়া যায় কি না যাতে নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণ করে বা সীমিত করে কোনো সংশোধনী বা কোনো আইন করা যাবে না। মার্কিন সংবিধান, ঐতিহাসিক বিষয়গুলো বললে একটু বেশি শুনায়। তারপরও এভাবে কিছু একটা করে এটিকে রক্ষা করা না যায় তাহলেতো আবারও যিনি সরকারে আসবেন তিনি চাইলে এগুলোকে উল্টে দিতে পারেন। আমরা দেখলাম বিগত সরকারের আমলে এবং এর আগেও সবাই মিলেমিশে নির্বাচন ব্যবস্থাটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো। এখন সংবিধানের মধ্যে এমন কোনো পরিবর্তন আনা যায় কি না যে সুষ্ঠু নির্বাচন বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে।

আর এটি বহুদিন ধরে আলোচিত যে, অনুচ্ছেদ ৭০ । এ ব্যাপারে আমার মনে হয়, জাতীয় ঐকমত্য না হলেও একটি জাতীয় সমঝোতার মত পরিবেশ আছে, যদিও বর্তমান একটি বৃহত্তম দলের অবস্থানটি আমার ঠিক মনে পড়ছে না, তাদের অবস্থানটা কী? এটিও একটি বিশেষ দাবি ছিল, আছে। অনুচ্ছেদ ৭০ বাদ দেওয়া বা এটিকে সংশোধন করা যাতে সংসদ-সদস্যগণ স্বাধীনভাবে তাঁদের ভোট দিতে পারেন। সে অধিকারটি দেওয়া উচিত।

আর ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাজনৈতিক দলগুলো যেভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করেন, যেভাবে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকট তৈরি করে এবং যেভাবে তারা স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী ব্যবস্থা নিয়ে আসে- এ ধরনের অবস্থা চলতে থাকলে জনগণ বা আমরা কী করব? আমাদের কী করার থাকে। কিছু করার না থাকলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার এই ৫৩ বছরে ১০ বছর অন্তর অন্তর হয় সামরিক অভ্যুত্থান বা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করতে হয় রাস্তায়। অন্য কোন ব্যবস্থায় এটি করা যায় না। এটি নিয়ে আপনারা ভাববেন। একটি মধ্যবর্তী নির্বাচনের বিষয়েও এখানে ভাবা যেতে পারে কি না? কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তো সেটিতে সম্মতি দিবে না। এরকম কোনো একটি অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা বা কী ভাবা যায়? আমি আরেকটু ভেবে যদি কিছু বলার থাকে তাহলে বলব। মধ্যবর্তী নির্বাচনের সুযোগ/সম্ভাবনাটি উল্লেখ করতে চাই। আর সংবিধানে একাধারে ধর্মনিরপেক্ষতা, রাষ্ট্রধর্ম উভয়ই সন্নিবেশিত আছে। এই অসংগতিপূর্ণ সহাবস্থানকে সঙ্গতিপূর্ণ কীভাবে করা যায়? এখানে আমার কোনো মতামত নেই। তবে বিষয়টি নিয়ে আপনারা ভাববেন এবং এটি নিয়ে কথা বলবেন। যদিও বিগত সময়ের চেয়ে বিষয়টি হয়ত এখন নানামত, নানা চিন্তা আছে। এ কাজটা খুব কঠিন হবে। তারপরও আমার মনে হয় যে, কোনো না কোনো ভাবে এটিকে বিবেচনায় নিয়ে কথা বলে, একটি সঙ্গতিপূর্ণ জায়গায় যাওয়া দরকার।

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। বিগত ৬০-৭০ বছর ধরে লড়াই-সংগ্রাম চলছে। আমাদের সংবাদপত্রে সবসময় আমরা এটি নিয়ে লিখতাম। যে শব্দগুলো লিখতাম, সেটি আমরাতো লিখতে পারি না। শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্র জাতিসত্তা লিখতে হয়, আরও অন্যান্য শব্দ দিয়ে দিতে হয়। দেশের শসস্ত্র বাহিনী বা সেনাবাহিনী এ বিষয়ে এতই স্পর্শকাতর যে সত্যি কথাটা বলা যায় না। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে শব্দ, বাক্য ব্যবহার করা হয় সেটিতে এখানে কী করবেন, কিছু পরিস্কার অবস্থান নেওয়া দরকার। এরাতো ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং নিপীড়িত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি হয়ে যাওয়ার পরতো ২৫-২৬ বছর হয়ে গেল। এটি একটি বিষয়।

আর আমি একটু আগে যেটি বললাম সংবিধানে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং এগুলোর দায়িত্ব ও মেয়াদ। আরও অনেক কিছু আছে। আমার মনে হয় যে, এগুলো সংবিধানে রাখার বা উল্লেখ করার বিষয় না। এ অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে বাদ দেওয়াই ভালো হবে।

বহুল আলোচিত বিষয়, এ নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগে মনে হয় রায় হয়েই যাবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফেরত আনার পক্ষেই আমার মত। এটি দরকার। অন্য কোনো বিকল্প পথ বা রাস্তা হয়নি বা অদূর ভবিষ্যতে হবে বলেও আমার মনে হয় না।

আরেকটি কথা খুব আলোচিত বিষয়, আনুপাতিক হারে আসন ব্যবস্থা। দ্বিধার মধ্যে আছি। এখন দুটো মতই খুব আলোচনার মধ্যে আছে। আবার এটিও ঠিক যে, আনুপাতিক হারে ভোটের বিষয়টি আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে কতটুকু বোধগম্য। কারণ ৭০ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে আমরা একটি ব্যবস্থার মধ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, পরিবর্তন করা সম্ভব কি না? তারপরও আমার মনে হয় যে, আনুপাতিক হারে আসন ব্যবস্থার দিকেই আমার মত যায়। খুব জোড়ালো বলতে পারছি না। কারণ এটি দেখি যে, যে দল জিতবে, মেজরিটি হয়ে যাবে সেইতো সব নিয়ে নিচ্ছে, নিয়ে যাবে। আবার অনেকেই বলে যে, আনুপাতিক হারেও তো স্বৈরতন্ত্রের সুযোগ থাকে। এসব বিষয়ে কিঞ্চিত দ্বিধার মধ্যেও বলব যে, আমার মত আনুপাতিক হারের দিকেই যায়।

একই সঙ্গে দ্বিকক্ষ সংসদের বিষয়টিও বেশ আলোচনার মধ্যে। যুক্তি থাকলেও আমি বলব যে, এত বড় বড় পরিবর্তন করার জন্য আমরা ঠিক জায়গায় আছি কি না? সে চিন্তা থেকে দ্বিকক্ষ বিষয়টি অনেক ভাবনা-চিন্তার পরও আমার মনে হয় যে, আপাততঃ এর মধ্যে না যাই। কারণ ভারত এত বড় একটি রাষ্ট্র, এত ভাষা, এত জাতি, এত রকম সংস্কৃতি, অনেক দিন হয়ে আসছে একটি ব্যবস্থা। আর এখানে ৩০০ জন, তার সাথে ৫০ জন, তার সাথে যদি আরও ১০০ জন হয় তাহলেতো সংখ্যা, প্রভাবশালী, শক্তিশালী হয়, সংখ্যা আরও বেড়ে যায়,

সেদিকে একটি ভয় লাগে। আমার মনে হয় এর পক্ষে অনেক যুক্তি থাকলেও এ ব্যাপারে আমি মত দেওয়া থেকে বিরত বা বিরুদ্ধেই বলছি।

একটি বিষয় খুব আলোচিত প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য। এটি খুব জরুরি বিষয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটি ভারসাম্য ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু মুশকিল হলো আমাদের সংবিধানের ভিত্তিতে যারা বড় দল বা বিজয়ী দল হবে তারাইতো রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করবে। সেখানে এই ভারসাম্যের জায়গাটা কতটা কার্যকর হবে। সবচেয়ে ভালো সুযোগ ছিল ১৯৯৬ থেকে ২০০৭ সাল। যখন রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ প্রেসিডেন্ট ছিলেন। দলীয় হলেও তাঁর একটি স্বাধীন অবস্থান ছিল। তাঁর হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে তিনি নিশ্চিতভাবে কিছু অধিকার রক্ষা, কিছু ভালো কাজ করার চেষ্টা করতেন। এখন দলীয় সরকার, মেজরিটি সরকার এবং যে সরকারের পক্ষ হতেই রাষ্ট্রপতি হবেন তিনিতো সরকারের কথাই শুনবেন, দলের কথাই শুনবেন। এই জটিলতা থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতির হাতে কিছু ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন। এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাষ্ট্রপতি সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। এখন রাষ্ট্রপতির হাতে কি সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া যায় কি না? যদি সর্বাধিনায়ক তিনি হন, তাহলে তাঁর হাতে এই দায়িত্বটা থাকবে না কেন? কেন তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে বাবস্থা নিতে হবে। এ ব্যাপারটি ভাবা যায়। আমি বলব যে, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য, কিছু দায়িত্ব, কর্তব্য ও কাজ রাষ্ট্রপতির হাতে থাকা দরকার। তা না হলে সেই আবার প্রধানমন্ত্রীর হাতে সকল শক্তি, ক্ষমতা আগের সরকারগুলো যেভাবে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেছে, অন্যান্য শৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবহার করেছে, বিশেষ করে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করেছে, সেখানে একটি দেয়াল তৈরি করা দরকার। যাতে করে সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী তাঁর মতো করে, ইচ্ছামতো করে এই সমগ্র সশস্ত্রবাহিনী বলেন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলেন, তাদেরকে পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করতে না পারে। এখানে একটি check and balance যদি করা যায়, এটি একটি বিষয়, আমার মনে হয়।

আরেকটি বিষয় আলোচিত সরকারের মেয়াদ। ৫ বছর খুব লম্বা। আমি খুব জোড়ালোভাবে বলব ৪ বছর। কেউ কেউ বলেন যে, কিছু করতে গেলে, পরিবর্তন করতে গেলে ৫ বছর দরকার। কিন্তু ৫ বছর থাকতে গিয়ে, এত লম্বা সময়, মানুষের কাছে এক পর্যায়ে বিরক্তি লেগে যায়। সেখানে যদি ৪ বছর করা হয়, একটি সহনশীল সময়, সরকারও সময় পেল, জনগণও দেখল, ৪ বছর পর আবার নির্বাচন। আমি ৪ বছরের নির্বাচন ব্যবস্থা বা সরকার পরিবর্তন ব্যবস্থা রাখার পক্ষেই বলব।

সবশেষে সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন, অন্য কোনো আইনের সাথে এটি তুলনীয় নয়। সেজন্য একটি দার্শনিক রাজনৈতিক ভিত্তি দরকার। একটি ছিল, আছে। আবার নতুন করে ২০২৪ সালের গণআন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান বা পরিবর্তন, যে সমস্ত শক্তির যুক্ততার মধ্য দিয়ে এটি হয়েছে মানুষের যে আশা আকাঙ্খা, সেখানে কিছুটা নতুন করে ভাবার সুযোগ আছে। রাজনৈতিক, দার্শনিক ভিত্তিটা। যদিও সম্পাদক পরিষদের সাথে, ছাত্র নেতাদের সাথে প্রথম দীর্ঘ বৈঠকে তারা বলেছিলেন যে, আমরা ৭১ এর ভিত্তিকে রেখে, ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা এটিকে রেখে আমরা দেখে ভবিষ্যত সংবিধানের বিষয়গুলো আমি ভাবতে চাই। অনেকটা না বুঝেই আমার এদিকে মত যায়। ৭১ এর ভিত্তিটা রেখে। মুক্তিসংগ্রাম বা মানুষের অংশগ্রহণ এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সেটি রেখে আমাদের বিগত ৫০ বছরের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থান, ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণ, পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধারাবাহিকতা এবং ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান থেকে একটি রাজনৈতিক দার্শনিক ভিত্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এটি অভিহিত করেন। আমাকে বললে আমিও এটি খুব বলতে পারব না। কিন্তু এরকম একটি ভিত্তি, আমি একটু আগে বললাম যে, রাষ্ট্রধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার অসঙ্গতির যে একটি সমস্যা আছে। সেজন্য রাষ্ট্রীয় সংবিধান, প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন, রাজনৈতিক দার্শনিক ভিত্তি, আপনারা ভাবেন। আমাদের দিক থেকে কিছু বলার থাকলে আমরাও বলার চেষ্টা করব। আমার বক্তব্যগুলো আমি বললাম। আমি এগুলো গুছিয়ে আগামী কালকের মধ্যে আপনাদের কাছে দিয়ে দেব।

সময় দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, জনাব মতিউর রহমান। একটু ব্যাখ্যার জন্য একটি ছোট প্রশ্ন। আপনি বলেছেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার কথা। এটি অতীতে যেমন ছিল তার থেকে কি পরিবর্তন প্রয়োজন। সংশোধন, নাকি যা ছিল সেই কাঠামো রেখেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনরায় সংযুক্ত করা যায় সংবিধানে।

জনাব মতিউর রহমান (প্রথম আলো): কাঠামোগতভাবেতো ১৯৯৬ সালে ভালই কার্যকর ছিল। ২০০১ সালেও কিছু কিছু সমস্যা ছিল, এখন ভাবলেতো মনেই নয়। তারপরওতো কার্যকর ছিল। যেটি কার্যকর ছিল, যেটি হয়ে গিয়েছিল, যেটি আমরা মেনেই নিয়েছিলাম, সেটিইতো থাকতে পারে। তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে সেইসময়, সেই ব্যবস্থাতে সশস্ত্রবাহিনী রাষ্ট্রপতির অধীনে ছিল। যেটি স্বাভাবিক সময়ে কিন্তু রাষ্ট্রপতির অধীনে না। এটি একটি ব্যতিক্রম ব্যবস্থা ছিল। একটি ছিল যে, চলমান জরুরি কাজ ছাড়া তারা অন্য কিছুতে হাত দিবেন না। তাদের মূল কাজ হবে নির্বাচন। এই লক্ষ্যতো ঠিকই ছিল। আবার ছিল যে, সাবেক প্রধান বিচারপতি হবেন।

এখানে এসে ভালো গোলমাল শুরু হয়ে গেল। যদি বিচার ব্যবস্থা ঠিক থাকে, যদি ঠিক হয়, আমরা সবাই মিলে যদি বিচার ব্যবস্থাটিকে স্বাধীন একটি ব্যবস্থা হিসেবে তৈরি করতে পারি, তাহলে সাবেক বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন সেটি মেনে নিতে বোধহয় আপত্তি হওয়ার কোনো কারণ থাকবে না। এর বাইরে গেলেই সমস্যা। আর সার্চ কমিটি পরে হলেও সেই সরকারের আজ্ঞাবহ সার্চ কমিটি। এ ব্যাপারে নতুন করে খুব একটা ভাবনা নেই। যদি কিছু মনে হয়, আমার লিখিত বক্তব্যে আমি উল্লেখ করব সেটি।

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (কমিশন সদস্য): একটি supplementary প্রশ্ন। প্রধান বিচারপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করা নিয়ে একটি ডিবেট করেন যে, culture of supersession, কোর্টে যে supersede করে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ, ব্যাপারটি কিন্তু এসেছিল যেহেতু তত্ত্ববধায়ক সরকারের প্রধান immediate past প্রধান বিচারপতি হবেন। আপনি কি মনে করেন, independent judiciary না হলে প্রধান বিচারপতি tainted হবেন, আবার প্রধান বিচারপতিকে রাখলে পরে Caretaker Government will not be complete transparent or independent. যদি আমরা ঐ বিতর্কে যাই। এটি একটি। আরেকটি হচ্ছে, আপনি অনেকগুলো কথা এখানে বলেছেন যে, fundamental principleগুলোকে, judicial independence কে ensure করা, governanceগুলো ঠিকভাবে রাখা, fundamental rightগুলোকে ঠিকভাবে রাখা। আমরা যদি দেখি, আমাদের আইন-কানুন অতটা flop না। আছে কিছু repressive laws. By and large আইনকানুন কিন্তু আছে। আমরা একটি culture, একটি eraতে ঢুকে গেছি, যেখানে Complete disregard for the rule of law. Constitution is the supreme law of the land. সেটিও totally disregarded. এখানে আপনার কাছে কোনো formula আছে কি না, how do we get over this. আমরা যত ভালো কথাই বলি না কেন, যত সিস্টেমই বলি না কেন, the person behind the machine, the person behind the system matters. যে culture of corruption বলেন accountability এর বাইরে থাকা এগুলো যে development করে গেছে over the years এটি থেকে বের হব কীভাবে?

জনাব মতিউর রহমান (প্রথম আলো): দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারব না। আমি এ বিষয়গুলো যে খুব বিস্তারিত চিন্তা করি তা না। আপনি প্রথম যে বিষয়টি উত্থাপন করলেন, দেখেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার, তারপর সামরিক বাহিনীর সরকার, দ্বিতীয় সামরিক বাহিনীর সরকার, তারা নানাভাবে আইন বা বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। আইন-কানুন ও নীতির রদবদল করেছে। শাস্তি প্রদান করেছে। হাইকোর্টকে বিভক্ত করে ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। ইত্যাদি তারা করেছে, to control the system. কিন্তু তারপরও দেখেন, এই ব্যবস্থার মধ্যেও যতটুকু সীমিত ব্যবস্থাটা ছিল, তার মধ্যে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ প্রধান উপদেষ্টা হলেন, বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান হলেন, ৩য় যিনি হলেন, বিচারপতি লতিফুর রহমান, তিনিও কিন্তু বিচার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হলেন। অর্থাৎ অনেক চেষ্টার পরেও যেটুকু ছিল সেটি দিয়েও চলছিল। কিন্তু more or less very strong and independence Justice Shahabuddin Ahmed and Justice Muhammad Habibur Rahman. বিচারপতি লতিফুর রহমান সাহেবের একটু ১৯-২০ ঝামেলা ছিল। যাই হোক, এটিতো সম্ভব, বাস্তব। সেজন্য আবারও সেই মুল জায়গাটায় ফিরে যাওয়াটাই হয়ত সমাধান। বিচার ব্যবস্থাকে সত্যিকার অর্থে একটি স্বাধীন জায়গা তৈরি করে দেওয়া। বর্তমান যে প্রধান বিচারপতি, আমার পরিচয় নেই, আমি জানিও না তাঁর background, অতীত, ইত্যাদি। আমি subjectly বলতে পারি, তিনি যদি কোনো কারণে, কোনো সময়ে সবকিছু মিলিয়ে তিনি যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হন, আমি তো আশা করি তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার সাথে এটিকে পরিচালিত করতে পারবেন। That depends on the system. এটি যদি ঠিক হয়। আমিতো বলি এটি যদি ৫০-৭০ ভাগ ঠিক হয়, তাহলে কিন্তু লোক তৈরি হয়ে যায়, ভিতর থেকে চলে আসে। এটুকু আশা থেকে বলা আরকি।

জনাব ফিরোজ আহমেদ (কমিশন সদস্য): একটি প্রশ্ন, just পরিস্কার হওয়ার জন্যই করা। আপনি বলেছেন যে, আপনি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের পক্ষে না। একই সাথে আপনি বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে check and balance আনা, পার্লামেন্টকেও ভারসাম্যে আনা, প্রধানমন্ত্রীর, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মাঝে একটি ভারসাম্য আনা। ঐটি করার বেলায় কি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট একটি বাড়তি বিষয় হিসেবে থাকতে পারে কি না?

জনাব মতিউর রহমান (প্রথম আলো): আমি পক্ষে না, এটি নিয়ে ভাবি, কিন্তু খুব জোরালোভাবে বলতে পারি না। কারণ একটি নতুন জিনিস নিয়ে আসলে মানুষকে খাওয়ানো, বুঝানো, গ্রহণ করানো, কার্যকর করাটা একটু কঠিন।

জনাব ফিরোজ আহমেদ (কমিশন সদস্য): একই সাথে আপনি বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে একটি check and balance আনা, পার্লামেন্টকেও ভারসাম্যে আনা, প্রধানমন্ত্রীর, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মাঝে একটি ভারসাম্য আনা। ঐটি করার বেলায় কি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট একটি বাড়তি বিষয় হিসেবে থাকতে পারে কি না?

জনাব মতিউর রহমান (প্রথম আলো): এটিও থাকতে পারে। আবার অন্য দিক থেকে মাঝে মাঝে মনে হয়। এটি নিয়ে খুব গভীর কোনো ভাবনা চিন্তা করিনি যে, দেশে ১৭ কোটি মানুষ, ঢাকা একটি কেন্দ্র, এখান থেকে সারা দেশ পরিচালনা করা। যেখানে আমাদের

রাজনৈতিক ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা, এত নষ্ট হয়ে গেছে, স্থানীয় সরকারের বলতে কোনো কিছু নেই। সেখানে ঐ যে কথাটি প্রাদেশিক বা যে কোনো formই হোক, কথাটি কিন্তু আলোচিত। এখনও কথাটি মাঝে মাঝে উঠে।

অর্থাৎ এটিকে কি বিভক্ত করা যায় কি না। ৫টি, ৬টি, ৭টি, কোনো ভাবে। এই চিন্তাগুলো কিন্তু আসে। আমি বলব যে, এটি আপনারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা আইনজ্ঞ বা অন্যরা করলে আমার মানতে কোনো আপত্তি নেই। আমার সাদামাটা চিন্তা থেকে কথাগুলো বললাম। আমার খুব জোড়ালো বিরোধীতা নেই, যদি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হয়। এগুলোর বিরোধীতা হবে। প্রধান বিরোধী দলগুলো যদি বিরোধীতা শুরু করে, তখন আপনারা তো আছেন, অন্তবর্তীকালীন সরকার কতটুকু stand নিয়ে এটি করে যেতে পারবে, বাস্তবতাতো সত্য। এটিকে নিয়েই হয়ত আপনাদের বিবেচনা করতে হবে। আমি জানিনা, আপনারা তো এই বিবেচনা রাখবেন অবশ্যই। সামগ্রিক পরিস্থিতি, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক দলের অবস্থান এগুলো নিয়ে। আমি প্রথমত বিরোধীতা করব না দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ নিয়ে। যদি আপনারা এটি করেন। আমি বললাম যে, একটু difficult. এত নতুন কিছু মানুষকে অভ্যস্ত করে নিয়ে করানোটা। এই আরকি।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আপনি বলেছেন যে, প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য। আবার এটিও বলছেন যে, যদি এই একই ব্যবস্থা থাকে তাহলে রাষ্ট্রপতি যে হবে, তিনিতো প্রধানমন্ত্রীর লোক। সেক্ষেত্রে কি রাষ্ট্রপতিকে অন্যভাবে সরাসরি নির্বাচন বা অন্য কোনো পথ পদ্ধতির কথা কি বিবেচনা করা যেতে পারে? নাকি সেটিও একটি নতুন কিছু হবে অগ্রহণযোগ্য।

জনাব মতিউর রহমান (প্রথম আলো): এক সময় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্যদের ভোটে। আসলে এই জিনিসটি চিন্তা করার খুবই ভালো একটি সুযোগ। স্থানীয় সরকার যদি ভালো কাজ করে, এখন তো এই নির্বাচনটি হবে কি হবে না বুঝতে পারি না। তাদের ভোট, সংসদের ভোট, মিলে মিশে যদি রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হয়, অবশ্য রাষ্ট্রপতি অনেক বেশি স্বাধীন হবেন। আপনি বলাতে বলি যে, এরকম একটি ব্যবস্থা হতে পারে। চিন্তা করতে পারেন আপনারা। যদিও আবার একই প্রশ্ন, রাজনৈতিক দলগুলো গ্রহণ করবে কি না?

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): গ্রহণযোগ্যতার বিপদ তো থেকেই যাচ্ছে। প্রত্যেকটি বাক্যেরই। এই কারণেই প্রশ্নটি তুললাম যে, বড় dilemma তৈরি হয় প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর power sharing এর ক্ষেত্রে। একদিকে সকলেই প্রায় কমবেশি বলেন এটি। কমবেশি অর্থাৎ গত কয়েকদিনে আমরা অংশীজনদের সাথে যে আলোচনা করেছি, প্রায় প্রত্যেকেই বলেছেন যে, ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হবে। ক্ষমতার ভারসাম্যের একটি জায়গা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট। যেটি আপনিও বলেছেন। তবে এই বিপদটি তৈরি হওয়ার আশংকা মৃদুভাবে হলেও কোথাও না কোথাও থাকে যে, ক্ষমতার ঐ দুই ভরকেন্দ্রের মধ্যে ক্রমাগতভাবে টানাপোড়েনের মধ্যে সরকারের কার্যকারিতাই দুর্বল হয়ে পড়ে কি না। এই বিপদটিই একভাবে ভাবে। আমি দুটো scenerio বলছি যাতে করে আপনার insideটা আমরা বুঝতে পারি। আরেকটি হচ্ছে, প্রেসিডেন্টের হাতে যদি সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া হয়, তার নিয়ন্ত্রণাধীন, তাতে এই আশংকাও কেউ কেউ করেন যে, শেষ পর্যন্ত এই গোটা legislative bodyকে bypass করে প্রেসিডেন্ট এবং সশস্ত্রবাহিনী এক ধরনের ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে পারে। ক্ষমতা দখল পর্যন্ত। পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা খুব উদ্বেগ তৈরি করে অনেকের মধ্যে। এই জায়গাটিতে আপনার কোনো পরামর্শ আছে কি না?

জনাব মতিউর রহমান (প্রথম আলো): অতি সম্প্রতি যে সমস্যাটি গেল, রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করতে হবে। যারা দাবী করেছেন, যথেষ্ট প্রভাবশালি বর্তমান অবস্থায়। তারমধ্যে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরাও ছিলেন। সবচেয়ে প্রভাবশালী যে ছাত্রসমাজ তারা ছিলেন। আরও অনেকে এটি সমর্থন করেছিলেন। দেখেন জিনিসটা হলো না। একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, দূর্বল একজন রাষ্ট্রপতি, বিতর্কিত। কিন্তু জিনিসটা কার্যকর হলো না। মানুষের মধ্যে যখন একটি স্বকীয়তা থাকে, একটি অংশগ্রহণ থাকে, একটি আলোচনা থাকে, একটি জনমত তৈরি করার সুযোগ থাকে- তখন কিন্তু অনেক সময় অনেক কিছু হয়ে যায়। কিন্তু তারা এটি করতে পারে না বা হয়ে উঠে না। ঐটিই আস্থা, ঐটিই বিশ্বাস। ঐটিই হয়তো আমাদের জন্য কিছুটা আস্থার জায়গা। তা না হলে অতীতের অভিজ্ঞতায় যদি দেখি, আমরা কোনো কিছুই ভাবতে পারব না। যত ধরনের কূটকৌশল হয়েছে, সেনাবাহিনী, রাজনৈতিক দল, ব্যাক্তি, প্রতিষ্ঠান মিলে মিশে কোনো formula বের করা মুশকিল। সব formula নিয়েই প্রশ্ন জাগরিত হবে। এখানে আবার সেই বিষয়টি নির্ভর করে যে, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদেরকে কতটুকু পরিবর্তন করতে পারবে তার ওপরে। বর্তমান অবস্থা থেকে নতুন রাজনৈতিক শক্তি যেটি গড়ে উঠার সম্ভাবনা আমরা দেখছি সেটি কার্যকর হয় আর মানুষ কতটুকু উদ্যোগী থাকে। এটির ওপর নির্ভর করেই আমাদের ভাবতে হবে। সব বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে আপনি এ পথে যেতে পারবেন না।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): আপনি proportional representative-এর একটি idea দিয়েছেন। আমি যদি সঠিক বুঝে থাকি সেটির পক্ষে আপনার একটি যুক্তি আছে। বিগত দিনগুলোতে আমাদের অংশীজনদের সাথে কথায়,

আলোচনায় এসেছে। Proportional representation-এর suggestion-এ অনেকেই দ্বিকক্ষ হলে Upper House-এর prefer করছে। এটি অনেক জায়গায় আলোচিত এবং অনেকেই বলছে যে, যদি এক কক্ষ বিশিষ্ট proportional representation থাকে তাহলে unstable government- এর chance থাকে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে people representation lacking হয় কারণ তখন selection-এর সুযোগ তৈরি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আপনার ideaটির একটু clarification চাচ্ছি। শেষের কথাটি হলো যে, করছে। এটি অনেক জায়গায় আলোচিত এবং অনেকেই বলছে যে, যদি এক কক্ষ বিশিষ্ট ignore হওয়ার scope থাকে। কারণ সরাসরি তখন পাবলিক ভোটে আসে না।

জনাব মতিউর রহমান (প্রথম আলো): আমাদের মধ্যে আসলে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব,সংঘাত, বিভক্তি, প্রশ্ন, সন্দেহ, অবিশ্বাস এত যে আপনি যত রকম ভাবেই চিন্তা করেন না কেন কিছু না কিছু প্রশ্ন আসবেই। রাজনৈতিক দলগুলো যদি এই ৫৪ বছর পর এবং বিগত ১৫ বছরের শাসন আমল এবং ছাত্রদের নেতৃত্বে এই গণঅভ্যুত্থানের পরেও যদি বোধদয় না হয়, কিছু একটা সহনশীল জায়গায় না যায়, তাহলে তো আর কিছু করার থাকে না। সেজন্য কিছুটা আশা, কিছুটা জনমত তৈরি করার চেষ্টা অব্যাহত রেখে এই তর্ক বিতর্ক সমাজের মধ্যে করে আমরা, আপনারা সবাই মিলে যেটি ভালো মনে করব সেটির পক্ষে দাঁড়িয়ে কার্যকর করার চেষ্টা করব। এর নিশ্চয়তাতো আপনাকে কেউ দিবে না। বিগত সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): আমি একটু স্পষ্ট জানতে চাচ্ছি, আপনার favourite justification কোনটি।

জনাব মতিউর রহমান(প্রথম আলো): কিছুতো একটা, দলগুলোর মধ্যে, মানুষের মধ্যে, চিন্তা চেতনা, ছাত্র সমাজ যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে, তারা যদি একটি রাজনৈতিক অবস্থান নিতে পারে, আন্দোলনের যে শক্তিটা, রাজনৈতিক, দার্শনিক ভিত্তি ছাড়া তো কিছু বলার নেই। যে বিশাল একটি coalition হয়েছে, এটিতো পুরোটা নেই বা হয়ত থাকবে না, যতটুকু রক্ষা করে এই দাবির পক্ষে, এই পদক্ষেপগুলোর পক্ষে আমরা তাদেরকে নিয়ে আসতে পারি। কাজটা কঠিন, কাজটা হয়তো কঠিনই বলব। তারপরও চেষ্টা করি, দেখি।

ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক (কমিশন সদস্য): Freedom of speech নিয়ে আমার একটি প্রশ্ন। যেহেতু মিডিয়াতে আপনারা অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতা ফেস করেন, আমি যদি উদাহরণ দেই যে, ৫ই আগস্টের পরে যেভাবে আয়নাঘর সম্পর্কে আমরা প্রতিবেদন দেখেছি, বিস্তারিত প্রতিবেদন, আপনাদের কাছে হয়ত এটির তথ্য ছিল, আপনারা publish করতে পারেননি। Freedom of speech ছাড়াতো আসলে গণতন্ত্র কখনই হবে না, impossible. Constitution যেহেতু আমরা একপ্রকার revisit করছি, সুযোগ এসেছে। আমাদের যে বিল অব rights সেটিও revisit করার সুযোগ এসেছে, আমাদের দেশে আপনি জানেন যে, Freedom of speech restricted, অনেকগুলো restriction দেওয়া আছে। এ ব্যাপারে আপনার opinion কী? Midia freedom-কে protect করার জন্য, promot করার জন্য কী ধরনের চিন্তা করতে পারি আমরা।

জনাব মতিউর রহমান (প্রথম আলো): আমিতো বললাম, হয়ত সাদামাটাভাবে, অর্থাৎ মতপ্রকাশের চিন্তা বা মত প্রকাশ, সাংবাদিকতা বা যে কোনো বিষয় এটি নিশ্চিত করা যাতে এটির ওপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না। এটি আইনগতভাবে কীভাবে করা যায়, করা যায় না, এটিতো আপনাদের বিবেচনার বিষয়, বা করবেন। তবে এটিতো চলে আসে সাধারণভাবে। তাহলে কী স্বাধীন সাংবাদিকতা মানে যা ইচ্ছা তাই করবে? এই প্রশ্নটি সব সময়ই উত্থাপিত হয়। আমাদের এখানে যেটি যদি বলেন যে, আমাদের সংবাদপত্রতো সব সময় যে খুব ভালো ভূমিকা পালন করে বা করেছে বা উদ্দেশ্যমূলক, ভুল, মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেনি, ক্ষতিকর কার্যক্রম করেনি সেটিতো না। একটি কথা আমরা সব সময় এ প্রশ্নের সম্মুখিন হই যে, আপনাদের অবস্থান কী? আমার মনে হয়, এই ক্লজটা রেখে যে উদ্দেশ্যমূলক, ক্ষতিকর সংবাদকে আমরা কীভাবে পরিহার করতে পারি, কীভাবে বন্ধ করতে পারি- বিষয়টিও থাকা দরকার। নাহলে এটির সুযোগ আমরাও নিতে পারি, অন্য পক্ষও নিতে পারে। বিরুদ্ধ পক্ষ এটি কাভার করতে পারে। ঐদিন থেকেও একটি বিষয় রয়েছে। অন্যদেরকেও এটি মানতে হবে যে, আমরা সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে যেন সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কিছু করতে না পারি। এটি বললে এখন অন্য রকম মনে হয়। কিন্তু এটি সত্য। এটি আমরা বিবেচনা করি কিন্তু আমরা এ কাজটি করি। যেন এটি রাষ্ট্রের জন্য, সমাজের জন্য ক্ষতিকর না হয়। নারীর জন্য, শিশুর জন্য বা সমাজের জন্য,এ একটি বিবেচনাতো থাকতেই পারে, থাকা উচিত। আমি আপনার উত্তরটি হয়ত সরাসরি দিতে পারলাম না। এ নিশ্চয়তা থাকবে। পাশাপাশি এ নিশ্চয়তাও থাকা উচিত যে আমরা যেন স্বাধীনতার অপব্যবহার না করি। এখন আমেরিকাতে নেই, আমেরিকাতে তারা যা খুশি তা করতে পারে। আমাদের সমাজে আমরা এতটা সহ্য করতে পারব কি না, নিতে পারব কি না সে একটি প্রশ্ন আছে। সেদিক থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো একটি ক্লজ বা কোনো একটি ধারা থাকার বিরুদ্ধে না। আজকে যেমন social media বা online সাংবাদিকতা, social media যে ধরনের কথা বলা বা বক্তব্য হীন প্রচার, সাম্প্রদায়িক প্রচার, খুন খারাবি প্রচার, এগুলোতো মেনে নেওয়া, গ্রহণ করা কঠিন। সেখানে ঐ স্বাধীনতা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখোমুখি হবে। আপনি কি সেটি চান? তখন আমরা স্বাভাবিকভাবেই বলি যে, না। আমরা সেটি চাই না। যখন আমরা অনলাইন পত্রিকার অনুমতি নিতে গেলাম, একটি শর্ত ছিল এরকম যে ক্ষতিকর কিছু আমরা করব না। যেটি আমাদের পত্রিকার অনুমতি নেওয়ার সময় এ ঘোষণা দিতে হয়। এটি আমাদের মানতে

হয়। এই ধারা বা চিন্তাটাসহ ঐ অধিকার রক্ষা করা।

জনাব ফিরোজ আহমেদ (কমিশন সদস্য): পরামর্শের জন্যই আপনার কাছে আরেকটি বিষয় জানতে চাই। সেটি হচ্ছে এর আগের প্রায় সবগুলো সেশনেই একটি বিষয়ে আলোচকবৃন্দ কথা বলেছেন। কেউ কেউ একটি আদর্শিক উপস্থাপনা হিসেবেই রাষ্ট্রধর্ম রাখার পক্ষে বলেছেন। ধর্ম কিংবা নবীকে কটুক্তি করার বিরুদ্ধে আইন করার কথাও বলেছেন। আবার অনেকে এর বিরোধীতাও করেছেন। কী কী কারণে এটি ঠিক না, সেটি আলোচনা করেছেন। এ বিষয়গুলো আপনি কীভাবে দেখার জন্য পরামর্শ দেবেন।

জনাব মতিউর রহমান (প্রথম আলো): আমি আমার মতামতটি লিখিতভাবে যখন দেব, তখন তাতে উল্লেখ করব।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আপনার লিখিত মতামতে এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখলে আমাদের সহায়ক হবে। কারণ আমরা অংশীজনদের কাছ থেকে বিভিন্ন মতামত পাচ্ছি। পরস্পর বিরোধীই আসলে। কেউ বলছেন এটি থাকতেই হবে। কেউ বলছে না। সেইক্ষেত্রে আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বিবেচনায় আপনার পরামর্শটি থাকলে এটি আমাদের জন্য অনেকটা সহায়তা করবে।

ধন্যবাদ, জনাব মতিউর রহমান। আপনি যথেষ্ট সময় ব্যয় করলেন আমাদের সাথে। আপনার লিখিত ভাষ্যটির জন্য আমরা অপেক্ষা করতে থাকব। আমরা এই অধিবেশন এখানেই শেষ করছি।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

নবম সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : দুপুর ২:৩০ থেকে ৪:০০ পর্যন্ত

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:

১।	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক	কমিশন প্রধান
২।	অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল	সদস্য
৪।	অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫।	ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল	সদস্য
৬।	জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক	সদস্য

অংশীজনদের তালিকা:

১। জনাব জাহেদ উর রহমান

২। জনাব মাহফুজ আনাম

কার্যবাহ প্রস্তুতকারক:

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সম্পাদনায়:

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানের কার্যবাহ

কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): সবাইকে ধন্যবাদ।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ, আমি এই কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে, সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা ছোট ছোট আকারের অধিবেশনগুলো করছি। যাতে করে আপনাদের সাথে আলোচনা করা সহজ হয় এবং আপনাদের কথা শোনা সম্ভব হয়। আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্টের ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকের এই অধিবেশন শুরু করার আগে সেইসব শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় প্রদান করবেন।

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে সংবিধানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে সেটি আমরা অনুমান করতে পারছি। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ ২০ মিনিটের মধ্যে তুলে ধরলে সকলের মতামত শোনার সুযোগ হবে এবং কিছু প্রশ্ন থাকলে আমরা তা উপস্থাপন করতে পারব। আজকে আপনারা যে বক্তব্য দিচ্ছেন তা রেকর্ড করা হচ্ছে। আপনারা চাইলে লিখিত আকারেও তা দিতে পারেন এখন অথবা আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে।

[এ পর্যায় অংশীজন নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন]

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমরা শুরু করব জনাব মাহফুজ আনামের বক্তব্য দিয়ে। জনাব মাহফুজ আনাম।

জনাব মাহফুজ আনাম : অনেক ধন্যবাদ। আমি খুবই কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে। আমার মতো সাংবাদিককে আপনারা দাওয়াত করেছেন। প্রথমেই আমি যে উপলব্ধিটা শেয়ার করতে চাই, সাংবাদিক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা হলো, দেশের যত সুন্দর সংবিধানই হোক না কেন, রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটা যদি সেই ধরনের আইনী প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়, তাহলে আপনি যতই ভালো সংবিধান করেন না কেন, সেটি রাজনৈতিক কালচারে হাবুডুবু খাবে। আমি একটি উপমা দেই। এক সময় আমাদের দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথা আসলো। সেখানে রাখা হলো, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবেন যিনি সর্বশেষ প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়েছেন। অথবা এর পূর্বে যিনি ছিলেন। কিন্তু ২/১ টার্মের পরই দেখা গেল ঐ সময় যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তারা বিচারকদের অবসরের বয়সসীমা বাড়িয়ে দিলো। সেখানে দেখা গেলো, যিনি প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার কথা, তার জায়গায় আরেকজন হবেন। এই যে, tinkering with the process আমি মনে করি যে, সংবিধান গড়া এবং সংবিধান সংরক্ষণ করার দায়িত্ব হচ্ছে সংসদের। Majority party in the Parliament, his behavior, I think in a great way impacts on the governance process. পার্লামেন্টে যে দল মেজরিটি পায়, সে দল চেষ্টা করে কীভাবে আইনগুলোকে বদলাবে তার পক্ষে যেতে। যদি কোনো কারণে সে দল দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যায় তাহলেতো সংবিধানকে তছনছ করে ফেলে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায়। আমরা দেখেছি, যে দল তত্ত্বাবধায়কের জন্য শত শত দিন হরতাল করল, সেই দলই পরে এসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বাতিল করে দিল। So, my first point of attention to you is the nature of our political culture followed by our political parties. সাংবিধানিকভাবে বা অন্য কোনোভাবে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর কালচারের ওপর প্রভাব আনা যায় কি না? তাদেরকে কোনো না কোনোভাবে আইনের পদ্ধতিতে আসতে হবে। তাদের মূল শক্তি হচ্ছে, জনগণের সমর্থন। কিন্তু সেই সমর্থন পাওয়ার পরে তারা সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় কি না; সেটিকে কীভাবে সে পাশ কাটাবে, কীভাবে সে destroy করবে, কীভাবে সে তার সুবিধা নেবে সেই ধরনের কালচারের দিকে যায়। তাই আমার প্রথম অনুরোধ থাকবে যে, আপনাদের চিন্তার মধ্যে ঐরকম কিছু আসে কি না? রাজনৈতিক দলগুলোর আরও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। Politics is for the people and not only for the ruling party. এই ধরনের মানসিকতায় আসা যায় কিনা?

প্রথমে যে প্রস্তাবটি করতে চাই, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথাটি পুনস্থাপন করা উচিত। The election that we have had under the Caretaker Government, we are among the fairest. I would recommend that we reinstitute it.

দ্বিতীয়ত হচ্ছে, অনুচ্ছেদ ৭(এ) এবং (বি)। যেখানে বলা হচ্ছে যে, সংবিধান কোনো সংশোধন করা যাবে না। আমার মনে হয়, এটি impractical এবং অবাস্তব ঘটনা। অবশ্যই Constitution is a supreme law. কিন্তু জনগণ যদি চায় তাহলে সেটি জনগণের মতামতের আলোকে সময়মত সংশোধনের সুযোগ থাকতে হবে। আমরা এটিও দেখেছি যে, সংশোধন করাটা মুড়ি মুড়কির মত করে ফেলা হয়েছিল। যার যেখানে সুবিধা সে সেই জায়গায় সংবিধান সংশোধন করছে। তাই আমার প্রস্তাব হচ্ছে, সংবিধান সংশোধনের প্রথাটা থাকবে, কিন্তু সংবিধান সংশোধন করার প্রক্রিয়ায় এমন একটি শক্ত প্রক্রিয়া থাকা উচিত যে, খুব সহজে বা কোনো দলের সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও সে যেন ইচ্ছা করলেই সংশোধন করতে না পারে।

তৃতীয়ত আমি সাংবাদিক হিসেবে দেখেছি যে, ক্ষমতাসীন সরকার নির্বিচারে যে সংবিধান লংঘন করছে, সে অভিযোগটি তাদের বিরুদ্ধে আনা হয় না। সংসদে হয়ত আনা হতো। কিন্তু আমাদের দেশের আরেকটি কালচার হচ্ছে, culture of boycott. সেটির জন্য আমি বিরোধী দলকে দায়ী করি। তারা প্রথমে শুরু করে walkout দিয়ে, তারপর সেই walkoutটি ১দিন, ২ দিন করে তারপর সপ্তাহ, মাস এবং এক পর্যায়ে গিয়ে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে। ফলে ১৯৯৬ সাল থেকে আজ অবধি আমার অভিজ্ঞতা হলো যেহেতু ডেইলি স্টারের সঙ্গে এই পুরো সময়টিই সম্পৃক্ত ছিলাম যে, Parliament has never been considered as a house of the people. It was always thought of as a house ruling party. বিরোধীদলের সেখানে একটি ভূমিকা দেখি যে, তারা সংসদে এসে boycott করছে, walkout করছে, তারা একবারও ভাবছে না যে, they represent a constituency. They may representant a party but more importantly they represent a constituency. তাদের voiceটি কি সে বলবে না? সে তাদের ভোটে এসে বলছে যে, আমি boycott করব। এই যে একটি watchdog rule of the opposition, সেটিও আমাদের সংসদীয় ইতিহাসে খুব শক্তভাবে নেই। সেখানেও এটিকে কিছু করা যায় কি না যে, opposition boycott করতে পারে, walkout করতে পারে, this is part of the parliamentary process. কিন্তু তার মধ্যেও একটি দায়িত্বশীলতা থাকতে পারে কি না? Coming back, constitution should be amended if necessary but the process of constitutional amendment must be very rigorous.

আরেকটি বিষয়, রাজনৈতিক কাঠামোতে যে ভারসাম্য থাকে অর্থাৎ the balance of power among judiciary, legislative and the executive branches. That is the balance with which a parliament functions democratically আমাদের দেশে আমরা overs the years দেখেছি যে, নির্বাহী বিভাগ অসম্ভব শক্তিশালী হতে থাকে। সেই একই দল যদি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে তাহলে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যবহার করে Executive branch get more powerful. আর দুই তৃতীয়াংশ সংখাগরিষ্ঠাতা হলেতো কোনো কথাই নেই। So, can we have a constitutional structure in which the balance of power among judiciary, executive and legislative. আমি খুব বেশি চেয়ে ফেলছি আপনাদের কাছে। খুব সহজেই যেন এটিকে কিছু না করা যায়। A separate entity of legislative branch. আমি একটি পার্টি থেকে মনোনীত হয়ে এমপি হয়েছি, কিন্তু আমাকে দিয়ে যা খুশি তাই আমার দল করাবে সংসদের ভিতরে সেখানে কোনোভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করা যায় কি না সেই প্রসঙ্গে। আর suspension of article 70 is my very strong recommendation. But except for noconfidence bill and finance bill. এ দুটি বিলে তার হুইপের কথা মানতে হবে। কিন্তু for all other debate, everything and all other votes MP should have the freedom to choose follow his census rather than his party directives.

Independent of Judiciary. এটি constitutio-এ দেওয়া আছে। কিন্তু তারপরেও constitution-এ জাজদের যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সেখানে নির্বাহী বিভাগের বিরাট ক্ষমতা আছে। যার ফলে overs the years জুডিশিয়ারি আস্তে আস্তে লেজিসলেচারের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। Making it certain যে বিচার বিভাগ স্বাধীন। গুরুত্বসহকারে ঐ provision-এ যাওয়া। বিচারের সকল বিভাগই স্বাধীন এটি সংবিধানে রাখার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকবে monitoring the role of judiciary. এখানে judiciary has also be corrupt. জুডিশিয়ারি নিজের আইন সে রক্ষা করেনি। আমি যদি একটু personalised করি ব্যাপারটি। আমার বিরুদ্ধে ৮৪টি মামলা হলো একই বিষয়ে। where is the rule is very clear. একটি অপরাধে একটির বেশি মামলা হয় না। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে ৮৪টি মামলা হলো এবং ম্যাজিস্ট্রেট সেই মামলা গ্রহণ করল। একমাত্র একজন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট সিলেটে, তিনি গ্রহণ করলেন না। বললেন যে, এ বিষয়ে অলরেডি মামলাতো হয়ে আছে। কিন্তু অন্যান্য জজরা করলেন না কেন? সেখানে আরেকটি আছে যে, deformation case-এ শুধু যে defined হয় aggrieved party can loss a case. এখানে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পার্টির লোকজন, ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ মামলা করেই যাচ্ছে। If it is personal, but it is an instance of judiciary not upholding the law, which they are suppose to uphold. একটি যেমন independence of judiciary তার সঙ্গে সঙ্গে জুডিশিয়ারি আইনমত করছে কি না, জুডিশিয়ারি তার নিজের দায়দায়িত্ব এবং তার শপথ সে ভাঙছে কি না সেটি মনিটরিং এর কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না? সুপ্রীম জুডিশিয়ারি কাউন্সিল যেটি জাজদের নিয়োগ, বরখাস্ত ইত্যাদি করে তাদের শক্তিশালী করা যায় কি না? তারা একটি role play করবে প্রতি বছর তাদের একটি সাংবিধানিক

বাধ্যবাধকতা থাকবে to carry on a monitoring process during the year and then submit a report to the Parliament and to the public, in general. আরেকটি হলো কোনো স্থায়ী সাংবিধানিক কমিশন বা এ ধরনের কোনো body স্থাপন করা যায় কি না? যে body should be empower to be independent. যারা নির্বাহী বিভাগ এবং আইন বিভাগ থেকে সুরক্ষিত। And a constitutional commission or constitution commission will monitor the activities the government. তারা যখন কোনো কারণে সংবিধান লঙ্ঘন করে তখন তারা যেন একটি public position will greatly protect our citizen from abuse of power.

আরেকটি ব্যাপার আছে যে, fixing the term of the Prime Minister. Which I strongly recommend should be not more than two terms. একটি জায়গায় আমি খুব পরিষ্কার না। কিন্তু সেটি উত্থাপন করছি। সেটি হচ্ছে যে, একটি দল সে ধরেন ২ টার্ম ক্ষমতায় সে তার প্রার্থী বদল করে প্রধানমন্ত্রী বদলিয়ে দল ২,৩ বা ৪ বার ক্ষমতায় থাকতে পারবে বা সীমাহীন সময় ক্ষমতায় থাকতে পারবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর টার্ম নির্ধারিত থাকবে। এখানে কোনো কিছু করা যায় কিনা যে একটি দল এত টার্মের পরে, আমি জানিনা কীভাবে বলা যায় যে, ঐ পার্টি আর ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। যদিও সেই পার্টির জনপ্রিয়তা থাকে বা ভোট পায়। প্রধানমন্ত্রীর টার্ম নির্ধারিত করাটা খুব সহজ। একটি দলের টার্ম লিমিট করা যায় কি না? পৃথিবীতে এটির কোনো রকম নিদর্শন আছে কি না? যদি একটু খোঁজ করে বের করা হয়।

আরেকটি হলো যে, Term fixed, also limiting the power of the prime minister. এই মুহূর্তে আমাদের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে সব ক্ষমতা দেওয়া আছে। প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যতীত। ঠিক তাও নয়, কারণ প্রধান বিচারপতি নিয়োগও রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো। Bringing some sort of accountability to the power and rule of the prime Minister. তাকে চেক এন্ড ব্যালেন্সের মধ্যে আনা যায়। সেখানে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে কীভাবে ভারসাম্য আনা যায়। তাই যদি হয় এবং সেটি আমার প্রস্তাব, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনও আরও বেশি স্বচ্ছ করতে হবে। It cannot be just the wish of the ruling party of the day, which means actually is the Prime Minister of the day. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আরও স্বচ্ছতা আনা, অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট হতে হলে তার কী কী যোগ্যতা লাগবে এবং সে কতটা জনসেবা করেছে, সেখানেও একটি স্বচ্ছতা সংযুক্ত করা এবং প্রতিযোগিতা করার ব্যাপার আছে কি না যে, It can't judge be a nominee of the Prime Minister of the day. যদি প্রেসিডেন্টকে আরও ক্ষমতা দেই, তাহলে তার নির্বাচন পদ্ধতিতেও জনগণের একটি accountibilty process থাকতে হবে। So, one recommendation President should given more power. তার নির্বাচনে যেন আমরা একটি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা পাই। সেখানে বর্তমানে যেমন একটি আইন আছে যে, সংসদ যদি কোনো আইন করে সেটি প্রেসিডেন্টের কাছে যায়। প্রেসিডেন্ট একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন না দিলে সেটি গৃহীত হয়ে যায়। আমার ধারনা এটি আগের মত President could sent it back at least one time. Can the President give at least a note of decent or something? সংসদে এটি পাস হলো, আলটিমেটলি সংসদের হাতেই ক্ষমতা। প্রেসিডেন্টের এতে সম্মতি নেই, এটিতো তিনি একবার ফেরত পাঠালেন, সেটি দ্বিতীয়বার পাঠালেই আপনাআপনি আইন হয়ে যাচ্ছে। তারপরও একটি note of decent দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকতে পারে কি না? সংসদে এটি পাস হলেও প্রেসিডেন্টের কোনো বক্তব্য থাকার সুযোগ আছে কি না? আরেকটি বিষয়, আমার মনে আছে যে, প্রেসিডেন্ট প্রথম সংসদে বক্তব্য দিতেন, সেটির খসড়া আসতো কেবিনেট থেকে। কিন্তু তারপরও প্রেসিডেন্টের কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করার অধিকার ছিল, যেটি একটি সময় তাও নিয়ে নেওয়া হলো। অর্থাৎ প্রেসিডেন্টের বক্তব্য সম্পুর্ণভাবেই একটি রাজনৈতিক বক্তব্য। ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও খসড়া বোধহয় কেবিনেট থেকে করে দেয়। ঐসব জায়গাতে কিছু flexibility, অর্থাৎ President responding to his conscience , responding to his feeling of what people are saying. Expression of decent, expression of alternative view, expression of his own thought. At least in the floor on the Parliament. সেটি আনা যায় কি না? আমি এটি ব্যক্তিগতভাবে একটু জানি প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন আহমেদ সাহেবের ঘটনা যে খসড়াটি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল সেটি তাঁর মতের সঙ্গে মিলেনি। But he was force to expresses the draft. আরেকটি Phrases সংবিধানে আছে যে, সেটি হলো with reasonable restrictions. যেখানে অধিকারের ব্যাপার আছে, with reasonable restrictions. এই টার্মের ব্যবহার যত সম্ভব কমিয়ে আনা যায়। এটিতো আমার নিজস্ব পেশার একটি ব্যাপার যে freedom of expression and freedom of media, press. এখানে বলা আছে within reasonable restrictions. এখন আমি আসছি within reasonable restrictions এর কী কী ধারা আছে। একটি হলো security of the State. This is such a term, এক একটি সরকার, সে সবকিছুর সিকিউরিটি আলটিমেটলি। expression of decent can be thought of a security. অবশ্যই মিডিয়া থেকে আমরা চাই না যে, রাষ্ট্র নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাক। কিন্তু এই টার্মটাকে একদম সুনির্দিষ্ট define যে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বলতে আমরা কতটুকু যাব। আরেকটি আছে friendly relationship with foreign state. আরে ভাই আমি যদি মনে করি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কটা আরও গভীর হওয়া উচিত, অথবা আমরা খুব বেশি যাচ্ছি। we are surrounding our sovereignty. আমি কিছু লিখতে পারব না বা জনগণ কিছু বলতে পারবে

না। এখানে স্পষ্ট বলা আছে friendly relationship foreign states. আরেকটি আছে public order. Reasonable restrictions এর মধ্যে public order. public order তো such a vague term, such a swiping term. It can be used any moment on anything. So therefore, reasonable restrictionsকে আপনাদের কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ you must remove this in as many case as you think is logical. কিন্তু যেখানে আপনি মনে করেন এটি ব্যবহারে আপনি বাধ্য, করতেই হবে, সেখানে you have to define it. Reasonable restrictions must be defined very clearly. তারপর আছে decency. Decency এর জন্যও reasonable restrictions দেওয়া হতে পারে। তারপর আছে morality. Reasonable restrictions you have to define and you have to make it as specific and as narrow as possible.

আর একটি বড় বিষয়। সেট হচ্ছে contempt of court. Now as a journalist I have an experience that even the court is very restrictive of freedom of expression because তারা contempt হয়ে গেল। একটি জাজের দুর্নীতিতো দূরের কথা, আমাদের একটি মামলা হয়েছিল, একজন জাজের নিয়োগের পরে, জুডিশিয়াল কোনো একটি body থেকেই discovered হয়েছিল যে, তার SSC certificate was জাল। সেটি আমরা যখন রিপোর্ট করলাম, প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার মাসাবধি কোর্টে গেল। সেখানে বলা হলো যে, truth is not a defense against contempt of court. Truthই যদি contempt of court এর defense না হয়, তাহলে কোন জগতে যাব আমরা। So again request to you is that reasonable restrictions এর মধ্যে আপনারা specifz হবেন আর contempt of court এর ব্যাপারটি আপনারা একটু দেখবেন। কারণ আমাদের যে contempt rule it goes back to the colonial times. এরপর ব্রিটেন যে colonial rules দিয়েছে তাও কিন্তু তার দেশে পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেক বার। আমাদের দেশে পরিবর্তন হয়নি। So, this is another request.

আর deformation media should be civil offence, not a criminal offence. এটি এখন আছে criminal and civil, both. আমার শেষের কথাগুলো একটুখানি বলতে পারেন যে, biased against for my own profession. আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনাদের এই সংস্কার কমিটি এবং নতুনভাবে আপনারা সংবিধানকে দেখবেন সেখানে যেন freedom of the press, freedom of the media, freedom of the expression এগুলো খুবই protected থাকে। Obviously I am consensus the media can make mistake, media can sometime be very biased. সেগুলোর জন্য আপনারা provision রাখবেন সেটি আমি নিজে স্বীকার করছি। কিন্তু এগুলোর handle to the power of the day-তে যেন পরিণত না হয়।

Secondly, I strongly believe that the constitution should be amended not rewritten. Amendment যত গভীরে যান, যত বিস্তৃত হোক, যত ব্যাপক হোক, I am in favor of that. But to abandoned this constitution and make a new one আমি মনে করি, is a very risKz process. এতে আপনাদের প্রচুর প্রতিবন্ধকতা হবে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংবিধানকে আরও গণতান্ত্রিক করতে চাই। আরও pro people করতে চাই, আরও right based করতে চাই, আরও সত্যের প্রতীক দিতে চাই। সেইসব জায়গাতে আপনি সহজেই সংশোধনের মাধ্যমে যেতে পারেন। You realy do not have to rewrite the constitution to go there.আর আমাদের সংবিধানে অনেক ভালো ভালো বিধান আছে। যেগুলো আমি অনুভব করি যে the government of the day তারা এটিকে অপব্যাখ্যা দিয়ে একদিকে নিয়ে গেছে। সংবিধান তারা অনেক লঙ্ঘন করেছে, as they were running the country. মিডিয়াও ঐ বিষয়গুলো যথেষ্টভাবে তুলে ধরিনি যে এগুলো সংবিধানের বিরুদ্ধে কাজ করা হচ্ছে। এটি করা যায় না। এ ধরনের অবস্থান মিডিয়া থেকে নিতে ব্যর্থ হয়েছে, ঐ সমস্ত আইনগুলোর কারণে। আমার জানামতে ৯টি আইন আছে যেগুলো Directly or indirectly impinges against freedom of press. আমি আপনাকে লিখিতভাবে এটি উপস্থাপন করব। আরও কতগুলো ছিল, সেগুলো এখনো আইন হয়নি। আমরা শুনলাম ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন যেটি সাইবার সিকিউরিটি আইনে পরিণত হয়েছিল সেটি নাকি বাতিল হতে যাচ্ছে। সেটি আর বলার দরকার নেই। কিন্তু structurally আমাদের সংবিধানে অনেক জায়গায় আছে যেটি সহজে ইন্টারপ্রেট করে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনারা মেহেরবানি করে এদিকে সুনজর রাখবেন।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, জনাব মাহফুজ আনাম। আমরা ঐ তালিকাটির জন্য অপেক্ষা করব। এটি আমাদের জন্য খুব সহায়ক হবে। এর বাইরেও আপনার এই বক্তব্যের পরেও যদি পরবর্তীতে আপনার কিছু মনে আসে, যা আমাদের নজরে রাখা দরকার, মনোযোগে রাখা দরকার, বিবেচনা করা উচিত, আমাদেরকে ই-মেইলে পাঠালেও সহায়ক হবে।

আমরা এখন একটু ড. জাহেদ উর রহমানের কাছ থেকে শুনি। তারপর ২/১টি প্রশ্ন আমরা উত্থাপন করব।

ড. জাহেদ উর রহমান: ধন্যবাদ, আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য। কিছু ইস্যু আছে, অনেক কথা হয়েছে। আমি ধারণা করি যে, আমাদের সোসাইটিতে একধরনের consensusও আছে। যেহেতু এখানে রেকর্ড রাখা হচ্ছে, তাই আমি খুব দ্রুত কয়েকটি ইস্যু বলব। তারপর ২/১টি জায়গায় আমার নিজস্ব কিছু জোর দেওয়ার বিষয় আছে সেগুলো বলব।

প্রথম আমরা এই আলোচনাগুলো করছি যে, আমাদের রাষ্ট্রপরিচালনার যে মূলনীতিগুলো আছে, এগুলো যে সময় করেছি সে সময় মূলনীতি হিসেবে বলা হয়েছে। এগুলো মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। আমি মনে করি, এগুলোর অনেকগুলোই মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হওয়া উচিত। তাই আমি আশা করি যে এটি আপনারা বিবেচনায় নিবেন। জনাব মাহফুজ আনাম যে কথাটি বলেছেন যে, আমরা মৌলিক অধিকারগুলোকে অনেক বেশি condition based করেছি। আমি একটু পড়ে শুনাই। Article 35 of Chines Constitution: “Citizens of the People Republic of China shall enjoy freedom of speech, the press, assembly, association, precession and demonstration” অর্থাৎ চায়নাও unconditional right দিয়েছে at least constitutionally. এ আলাপ আমি দীর্ঘদিন থেকে করছি যে, universal declaration of human rights এ আমরা যেভাবে এগুলোকে দিয়েছিলাম, যদি আমরা রাখতেই চাই, অনেকে বলে যে এটি দরকারই নেই রাখার, যদি রাখতেই চাই তাহলে unconditionalভাবে রাখা উচিত। এতে যে কাজ হয়ে যাবে তা না, অন্তত আমরা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, এটি conditional করা হয়নি।

খুব আলোচিত বিষয় অনুচ্ছেদ ৭০। জনাব মাহফুজ আনাম যেটি বলেছেন, আমি তার সাথে একমত পোষণ করি। আমি এর সাথে যোগ করতে চাই, যদি আমাদের রাজনৈতিক ঐক্যমতের প্রয়োজন হয়, পাকিস্তানের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯ (এ) যদি আমি ভুল না করে থাকি, তারা ৪টি বিষয়কে রেখেছে। ১। সরকার গঠনের সময়, ২। ট্রেজারি বিলের সময়, ৩। অনাস্থা ভোট এবং ৪। সংবিধান সংশোধন। তারা এটিও রেখেছে। বৃহত্তর ঐক্যমতের জন্য যদি ৪টিকেও রাখতে হয়, রেখে আমাদের অনুচ্ছেদ ৭০কে সংশোধন করতেই হবে। আমার কাছে মনে হয় অন্তত ২টি অনুচ্ছেদ সংশোধন করতেই হবে। অনুচ্ছেদ ৭০ এবং অনুচ্ছেদ ১১৬। আমরা খুবই surprising যে, আমরা আমাদের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১১৬ রাখছি, যেটি পরিষ্কারভাবে অনুচ্ছেদ ২২-এর সাথে সাংঘর্ষিক। মাসদার হোসেন মামলার রায় হয়েছে। কিন্তু আমি জানিনা, ঐটির মধ্যেতো built in থাকার কথা ছিল যে, অনুচ্ছেদ ১১৬ এই চেহারায় থাকতে পারে না। নিম্নআদালত পুরোপুরি স্বাধীন করা দরকার constitutionally at least. এ দুটোকে অন্তত সংশোধন হতেই হবে বলে আমি মনে করি। কোর্টের ক্ষেত্রে আরও দুটো কথা। সেটি হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা যে একটি অপশন রেখেছি আইন করতে হবে। ফলে সরকার যা যা করছে, সেটি সাংবিধানিকভাবে করছে। আইন ছাড়া কোনো নিয়োগ হতে পারবে না। এটিও যদি আমরা আনি সেটিও সেই আইনের মধ্যে সংযুক্ত হতে হবে। তাই একটি আইন করতেই হবে। আইন তৈরি হতেই হবে এটিই হচ্ছে একমাত্র অপশন। তার মধ্যে আমরা কন্ডিশনগুলো রাখলে রাখতে পারি।

সুপ্রীম কোর্টের বেঞ্চ নিয়ে কথা। আমি অবাকই হই, আমার কাছে এখনও অবাকই লাগে কেন আমাদের উচ্চ আদালত একসময় বেঞ্চ এর বিধান নিষেধ করেছে। অনুচ্ছেদ ১০০ তে বলছে,“তবে রাষ্টপতির অনুমোদন লইয়া প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে কোনো স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।” সেটি যদি একটি সংবিধান অনুমোদন করে একটি স্থায়ী বেঞ্চে কী সমস্যা আছে? এটি খুব একটি সোজা সাপ্টা কথা। আমরা অনানুষ্ঠানিক যে আলোচনা শুনি, আমাদের এখানে যে বড় বড় আইনজীবীরা আছেন, তারা হয়ত খুব বেশি চাননা যে বিভিন্ন জায়গায় হাইকোর্টের বেঞ্চ চলে যাক। কিন্তু এটি যাওয়া খুবই প্রয়োজনীয়। আমি খুব জরুরি বলে মনে করি। আমাদের আপীল বিভাগটি এখানে exclusively থাকল, কিন্তু হাইকোর্ট পর্যন্ত কাজ যদি জেলায় করে ফেলতে পারে বা বিভাগীয় শহরে করতে পারে সেটিও একটি বড় কাজ হবে বলে আমি মনে করি।

সংবিধান সংশোধন নিয়ে ভাই যেটি বলেছেন আমি সেটির সাথে একমত। কিন্তু আমি মনে করি, দুই তৃতীয়াংশ আমরা যদি এই পদ্ধতিতে থাকি তাহলে এখানে অনেকগুলো ‘যদি’ কিন্তু আছে। আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো, আমার যাবতীয় আলোচনা হচ্ছে পঞ্চদশ সংশোধনী হয়নি, এটার ওপর ভিত্তি করে। কারণ পঞ্চদশ আছে ধরে কথা বলতে গেলে কয়েক হাজার কথা বলতে হবে। আমি আশা করি যে, কোর্টেই এটি বাতিল হবে। কারণ it is so bad. এটি এত বেশি মৌলিক অধিকার ভঙ্গ করেছে যে, এটি টিকে থাকার কথা নয়। তাই আমার কথাগুলো পঞ্চদশ সংশোধনীর আগের পরিস্থিতি নিয়ে। অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক সরকার লাগবে। কিন্তু বলছি যে, পঞ্চদশ সংশোধনী হওয়ার আগে, পঞ্চদশ বাতিল হওয়া পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি আছে যেটি সেটি হচ্ছে যে, দ্বাদশ সংশোধন হওয়ার পর বেশ কিছু অনুচ্ছেদের জন্য গণভোটের অপশন রাখা ছিল, আমি মনে করি এই অপশনটি সবকিছুর জন্য রাখা উচিত। কারণ fast pass the post system-এ জন্য আমরা যত যাই বলি না কেন দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা technically ২০-২৫% ভোটেও দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়ে যেতে পারে। তবে তারা সংবিধান সংশোধন করে ফেলবেন এটি হতে পারে না। Any form of amendment, any

Article সেটি প্রাথমিকভাবে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হতে হবে। তারপরই গণভোট থাকা দরকার। এটি ছাড়া হতে পারে না। কারণ আমাদের কোথাও না কোথাও একটি বিধি নিষেধ দিতে হবে। fast pass the post system-এ যে একটি সমস্যা আছে সেটিকে রোধ করতে হবে। এখন এটির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এসেছে proportional representation. আমি আমার মতামত খুব পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেই, সেটি হচ্ছে অনুচ্ছেদ ৭০ আমরা যে কারণে বাদ দিতে বলি না, বিশেষ করে আমি বাতিল করতে বলছি না, অনুচ্ছেদ ৭০ একটি brilliant idea ছিল '৭২-এ। কিন্তু তাদের এটি অনুভব করা দরকার ছিল যে এটি সংকট তৈরি করতে যাচ্ছে। কারণ অনুচ্ছেদ ৭০ আসলে যেভাবে রাখা হয়েছে তাতে বাংলাদেশে আর আইন বিভাগ নেই। একজন ব্যক্তি যা বলে তাই হয়ে যায়। তাই বাংলাদেশ জন্মই নিয়েছে without a wing. আমি প্রায়ই বলি যে basic fundamental যে কথা, separation of power-এ যে তিনটি বিভাগ পৃথক থাকবে সেখানে আমাদের কোনো আইন বিভাগ জন্ম থেকেই ছিল না। কিন্তু এটি না থাকলে সরকার টিকে থাকবে না। আমরা horse trading-এর কথা বলি, it is very much relevant. এটি যদি আমরা বিশ্বাস করি তাহলে আমরা নিম্নকক্ষে কমপক্ষে, আমরা নিম্নকক্ষের আলাপ করছি সেই সঙ্গে আমরা উচ্চকক্ষেরও আলাপ করছি। সেই জায়গায় আমি আসছি, নিম্নকক্ষে যদি আমরা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব করি তাহলে বাংলাদেশে সরকার গঠিত হবে না, সরকার টিকবে না। আমরা জার্মানিতে যদি দেখি, প্রায়ই দেখা যায় তাদের বিরোধী দল সরকার গঠনে সমর্থন দিচ্ছে এবং তারা বিরোধী দল হিসেবেও আছে। বাংলাদেশে এই পলিটিক্যাল কালচার কবে আসবে আমরা জানিনা। আমরাতো প্রাগৈতিহাসিক আলোচনা করছি। আমরা একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারি না। সেই জায়গায় বসে আমরা ধারণা করছি, আমি একটি উদাহরণ দেই, Thirty five percent is more than enough to get general majority in our electoral history. কিন্তু ৩৫% ভোটে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বে একটি দল ১০৫টি সীট পাবে। সে ৩৬টি সীট লেক করে। এই ৩৬টি সীটের জন্য সবার যে মতামত সেটি মহৎ ধারণা যে আমরা চেক এন্ড ব্যালেন্স নিশ্চিত করছি। ফলে একটি দল স্বৈরাচারি হয়ে উঠবে না। সে কোনোদিন দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। চাইলেই সংবিধান পালটাতে পারবে না। এটি রক্ষা কবচ হিসেবে পাচ্ছি। কিন্তু ১০৫টি সীট পাওয়া একটি দল সরকার গঠন করতে পারবে না। কোনো সুযোগ নেই। পারলেও দেখা যাবে যে তারা এমন সব দাবিদাওয়া করতে থাকবে ঐ সরকার আসলে দীর্ঘস্থায়ী হবে না। অপশন হিসেবে সবাই যেটি বলছেন, সেটি আমিও সমর্থন করি। সেটি হচ্ছে একটি উচ্চকক্ষে একই নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের শতকরা অনুপাতে তৈরি হবে। আমি এই উদাহরণটিই দেই। বুঝার সুবিধার্থে যদি বলি যে, উচ্চকক্ষে ১০০ জন সদস্য থাকবে। তাহলে যে দলটি ৩৫% ভোট পেয়ে ধরে নিলাম ১৭০টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।

সে সরকার গঠন করল। সে টিকে গেল। সে উচ্চকক্ষে ৩৫টি সীট পাবে। তার দলের সবাই যদি ভোটও দেয় কোনো একটি বিলের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রেও তার ১৬টি সীটের অভাব থাকবে। সুতরাং আমাদের কিছু বিল উভয় হাউজে পাস হতে হবে। অথবা সিনেটের মত। আমেরিকার সিনেটে কতগুলো exclusive power আছে। কিছু নিয়োগ বা এ ধরনের ক্ষেত্রে। আমরা তা include করতে পারি। ফলে আমরা যে check and balance কথা বলছি সেটি ensure করা যাবে। যে মানুষটা বা যে দলটা ১০% ভোট পেয়েও একটি সীটও পেল না নিম্নকক্ষে সে কিন্তু উচ্চকক্ষে ১০টি সীট পেল। তার প্রতিনিধিত্ব আমরা ensure করতে পারলাম- এই মডেলটা করলে। আবার কেউ কেউ বলছেন, নিম্নকক্ষ মিশ্রপদ্ধতিতে করা যায় কি না? আমি এটিও বিরোধীতা করি। আমি মনে করি যে, এটিও গ্রহণযোগ্য সমাধান এভাবে হতে পারে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে কি করা হবে? এখানে জনাব মাহফুজ আনাম আছেন। তাঁর বাবা জনাব আবুল মনসুর আহমেদের একটি অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম। একটি খুব interesting বিষয়, আমাদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যদি আমরা এই পদ্ধতিতে থাকি, বর্তমান যে পদ্ধতি আছে, এটির একটি 'Electoral College' তৈরি করতে পারি কি না? আমাদেরতো প্রদেশ নেই। আবুল মনসুর আহমেদ কিন্তু এটি প্রস্তাব করেছিলেন। which I like very much. ভারতে যেটি হয়। ভারতে উভয় হাউজের মেম্বার এবং তাদের যে legislative assemblyগুলো আছে বিভিন্ন প্রদেশে, তাদের সদস্যরা মিলে এবং total একটি electorate এবং একটি ওজন আছে যে লোকসভা হলে এত, বিধান সভা হলে এত। আমরা এটি করতে পারি কি না, আমাদের যেহেতু দুটি হাউজ বা ধরে নেই একটি হাউজই আছে- সংসদ-সদস্যরা একেকজনের ওয়েট হচ্ছে এত, আমরা তার সাথে উপজেলার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান বা মেম্বার, ইউনিয়নের ক্ষেত্রে শুধু চেয়ারম্যান ধরে, এভাবে ধরে যদি এদেরকে একটি ওয়েট ধরে একটি electorate তৈরি করি খুব সম্ভাবনা থাকবে অনেক সময় যে বিরোধী দল থেকে মনোনীত কেউ প্রেসিডেন্ট হয়ে যেতে পারেন। সুতরাং সরকারি দল যাকে চাইলেন, সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবে এটি প্রতিহত করা যায়। আমি খুবই সমর্থন করি, আমার খুব ভালো লেগেছে এই পদ্ধতিটি। আর প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতার ভারসাম্য অনেক ক্ষেত্রেই হতে পারে। তার সাথে আরো কয়েকটি জিনিস আমরা যোগ করতে পারি যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে exclusively তার হাতে power দিতে পারি। আমি একটি উদাহরণ নেই। ধরুন নির্বাচন কমিশনে একটি নিয়োগের আইন হয়েছে। নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের প্যানেল তৈরি করে, সার্চ কমিটি প্যানেল তৈরি করল এবং সেটি রাষ্ট্রপতির কাছে দেবে, আমাদের বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) অনুযায়ী এটি আসলে

প্রধানমন্ত্রী ঠিক করবেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া আমরা এই ৫ জন ৭জন বা ১০ জনের প্যানেল, সেখানে প্রতি পদের জন্য ২ জন অর্থাৎ ১০ জনের একটি প্যানেল দেবে। এই ৫ জনকে কিন্তু select করবেন প্রধানমন্ত্রী। বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী। সোজা সাপটা কথা। এরকম কিছু নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)কে সংশোধন করে এটির decision search committee-এর পর exclusively প্রেসিডেন্ট দেবেন, যেটিতে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ exemption দেওয়া হয়েছে। যেমন প্রধান বিচারপতির ক্ষেত্রে অন্তত তাত্ত্বিকভাবে দেওয়া হয়েছে। এরকম আরও বেশ কিছু দেওয়া যেতে পারে। যেমন বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে আইনের কথা বলছি সেটিরও ক্ষমতা বা সক্ষমতা তার হাতে থাকতে পারে যদি বিদ্যমান পদ্ধতিতে থাকি। যদিও এ ব্যাপারে আমার একটি ভিন্ন মতামত আছে।

এবার আমি স্থানীয় সরকারের বিষয়ে কিছু বলতে চাই। স্থানীয় সরকারের বিষয়ে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯। আমি আমাদের সংবিধানের স্পিরিট যতটুকু বুঝি সেখানে বলা আছে, সংসদ আইন তৈরি করার মাধ্যমে চাইলে প্রশাসন, পুলিশসহ সবকিছুর দায়িত্ব স্থানীয় সরকারকে দিতে পারে। তার অর্থ আমাদের সংবিধান মতে এখনও এগুলো দেওয়া সম্ভব। কিন্তু আমি চাই যেটি, আমরা খেয়াল করেছি বিকল্প দিয়ে কোনোদিন আইন তৈরি করা হয়নি। পক্ষান্তরে প্রশাসকরা, ইউএনওরা উপজেলা চেয়ারম্যানের ওপর খবরদারি করেছেন। যেটি হয়, সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট রায় আছে, সেটির বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে, সেটি ঝুলে আছে আপিল বিভাগে, তাই আমি মনে করি এটিকে imperative করে দেওয়া। আইন করে এটি তাদের অধীনে দিতে হবে। অনুচ্ছেদ ৫৯ এর এই পরিবর্তনটি যদি হয়, আমি মনে করি আমাদের স্থানীয় সরকারের একটি বিরাট পরিবর্তন আসতে পারে।

সাংবিধানিক কমিশনগুলো সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। আমাদের অনেকগুলো কমিশন আছে যেগুলো সাংবিধানিক না। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের এক ধরনের statutory commission যেমন দুদক, মানবাধিকার কমিশন এগুলোকে সাংবিধানিক কমিশন করে দেওয়া উচিত। সাউথ আফ্রিকায় আমি গুনে দেখেছি ওদের সাংবিধানিক ১৬-১৭টি কমিশন আছে। অনেকদিন আগে গুনে দেখেছি। এখানেও সাংবিধানিক করা। দ্বিতীয়ত এগুলোকে স্বাধীন করা। মানে এদের প্রত্যেকের লোকবল নিজস্ব হবে। নির্বাচন কমিশনে প্রশাসন থেকে, সরকারের জনপ্রশাসন থেকে সচিব কেন থাকবে? দুদকে কেন সচিব থাকবে। আমরা যদি বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় করি, যেটিতে শুধু জুডিশিয়ারির মানুষ থাকবেন, আমরা দুদকে একজন সরকারি সচিব কেন রাখব? সরকারি সচিব রাখার কারণে যেটি হয়, দুদকের একটি বড় কাজ টেকনিক্যালি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিদের দুর্নীতি ইত্যাদি খোঁজ করা। শুধু সচিব না, আরও কয়েকজনকে সেখানে রাখছি সেটি ঠিক না। যদি সম্ভব হয় কমিশনগুলো তার সচিবালয়ের দিক থেকে পুরো স্বাধীন হবে। Free from the government employee. এরকম একটি অপশন যদি রাখা যায়। অনেক রকম কমিশন হতে পারে, নতুন নতুন কমিশন। যেমন সাউথ আফ্রিকার আমার খুব প্রিয় একটি কমিশন, I wrote on that. অর্থাৎ পুলিশের বিরুদ্ধে আনা যে কোনো অভিযোগ, সেটি তদন্তের জন্য আলাদা কমিশন আছে। পুলিশ যখন নিজের অভিযোগ নিজে তদন্ত করে, এটি কার্যকরী হয় না। সাউথ আফ্রিকায় এরকম একটি সাংবিধানিক কমিশন আছে যেটি শুধু পুলিশের বিরুদ্ধে আসা অভিযোগগুলো তদন্ত করে। এরকম আরও বহু কমিশন আছে। প্রত্যেকটি কমিশন, যেগুলো বিদ্যমান আছে, মানবাধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি কমিশন অবশ্যই সাংবিধানিক হওয়া উচিত। এরকম আরও কিছু কমিশন করা যেতে পারে। disparity এর বিরুদ্ধে কমিশন আছে সাউথ আফ্রিকায়। culture এর মত কমিশন আছে। ক্রয় সংক্রান্ত কমিশন আছে। আমাদের ক্রয় পুরো সরকারের হাতে রাখব নাকি একটি কমিশনে দিয়ে দিব সেগুলো আলাপ হতে পারে। কিন্তু এগুলো সাংবিধানিক হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

Finally, যেটি আমার সবচেয়ে প্রধান আলোচনার জায়গা, সেটি হচ্ছে আমরা ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে কথা বলছি। আমি মনে করি রাষ্ট্রপতির হাতে পাওয়ার দেওয়ার চাইতে আরও ভালো উপায় হচ্ছে সাংবিধানিক কমিশন তৈরি করা। আমি উদাহরণ দেই, আমাদের কাছের দেশ হিসেবে শ্রীলংকায় আছে। সেখানে ১০ সদস্যের একটি কমিশন আছে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী আছেন, বিরোধীদলীয় নেতা আছে, স্পীকার আছে, রাষ্ট্রপতির মনোনীত লোক আছে এবং সিভিল সোসাইটির লোক ৫ জন আছে যেখানে ২ জন মনোনীত করতে হবে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার। এভাবে ১০ সদস্যের যে কমিশন আছে তারাই শেষ পর্যন্ত এই positionগুলোতে নিয়োগ করেন। শুধু সাংবিধানিক কমিশন না, পুলিশের আইজিও শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করতে পারেন না। সেটি ঐ কমিশন নির্বাচন করে। ফলে যেটি দাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর হাতের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কমানো যায়। একটি খুব মজার গল্প আছে। এই সংশোধনীটি শ্রীলংকার সপ্তদশ সংশোধনীতে সংযোজন করেছিলেন চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা। খুবই মজাদার। তরপর যখন মাহেন্দ্র রাজাপাকশে যখন প্রেসিডেন্ট হলেন, তিনিতো কতৃত্ববাদী হয়ে উঠতে চাইলেন। তিনি তার হাতে ক্ষমতা রাখতে ১৮তম সংশোধনীর মাধ্যমে এই কমিশন বাতিল করে দেন। এরপর সিরিসেনা যখন প্রেসিডেন্ট হলেন ১৯তম সংশোধনীতে তিনি আবার এটিকে নিয়ে আসলেন। আমাদের এ দুজনকে গণতান্ত্রিক বলব। মজার ব্যাপার হলো এরপর যখন গতাবায়া, দুইভাই সমান authoritarian, তিনি ২০তম সংশোধনীতে আবার এই কমিশন বাতিল করেন। তাই authoritarian এর সাথে এই কমিশনকে correlation করা যায়। আমার কাছে খুব মজা লেগেছে। এরকম একটি কমিশন

আমি খুব শক্তভাবে চাইব।

আমার কাছে যদি বলেন, ৩টি জিনিস। এবার আমাদের কী চাওয়া উচিত? ১। আমাদের অনুচ্ছেদ ৭০, ২। অনুচ্ছেদ ১১৬ এ দুটো সংশোধন করতে হবে। যাতে আমাদের separation of power নিশ্চিত হয়। ৩। একটি সাংবিধানিক কমিশন চাই। যেটি এই অবস্থানগুলোতে নিয়োগ নিশ্চিত করবে। সেটি বিচারক থেকে শুরু করে সবকিছু ঠিক করবে। প্রধানমন্ত্রী থাকবে এই ৭ জন, ১০ জন বা ১৫ জন যাই থাকুক তার একজন। সংখ্যাটি আমি সঠিক জানিনা।

আর শেষ কথা, জনাব মাহফুজ আনামের সাথে আমি একেবারেই একমত, আমিও মনে করি সংবিধান সংশোধন করেই সবগুলো কাজ করা সম্ভব, যা যা বলছি। পুনর্লিখন করলে এই মুহুর্তে সমাজে একটি বিতর্ক তৈরি হবে। পুনর্লিখন করলে যে বড় সমস্যা হবে তা না। বিতর্ক তৈরি হবে, এটি সংঘাতের দিকে যেতে পারে। সংবিধানের আলোচনায় আমি প্রায়ই *Deng* Xiaoping-এর সেই উক্তিটা ব্যবহার করি, "বিড়াল ইদুর মারতে পারে কি না, সেটিই বিষয়। সেটি কালো না সাদা, সেটি বিষয় নয়।" সংবিধান সংশোধন করেও যদি আমি আমার কার্যকরি বিষয়গুলো পেতে পারি, সংযোজন করতে পারি সেটি আমার কাছে বড় মনে হয়। আমি যতদূর বুঝি সংবিধানের, আমার মনে হয়েছে এটি অবশ্যই সম্ভব।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

ছোট ছোট ২/১টি প্রশ্ন, জনাব মাহফুজ আনাম আপনার কাছে। সেটি হচ্ছে, প্রেসিডেন্টর হাতে ক্ষমতা দেওয়ার কথা আপনি বলেছেন। কিন্তু নির্বাচনের প্রক্রিয়াটা যদি এখন যা আছে পার্লামেন্টে, সেটিই যদি থাকে তাহলে প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা যাবে কী না?

জনাব মাহফুজ আনাম: একদম ঠিক বলেছেন। আমি কিন্তু বলেছি যে, প্রেসিডেন্টের নির্বাচনটি আরও কীভাবে স্বচ্ছ এবং জবাবদিহি করা যায়- আমি সেটি চাই। কিন্তু সেটি নিয়ে চিন্তা করা হয়নি। সেটি একটি দুর্বলতা। এই সুযোগে ড. জাহিদের প্রস্তাবটি আমি খুবই শক্তভাবে সমর্থন করতে চাই। Introduction of the upper House. সে যেটি বলেছে যে, যে দল যত শতাংশ ভোট পাবে সেই অনুপাতে আপার হাউজে যাবে। তাহলে আমি এক নির্বাচনে দুটো হাউজই পেয়ে যাচ্ছি- আনুপাতিক ভোটে আপার হাউজ হচ্ছে আর সরাসরি ভোটে first past the post যেটি এখন আছে সে অনুযায়ী লোয়ার হাউজ হচ্ছে। এটি আমি সমর্থন করি।

আর ombudsman সম্পর্কে আমি বলতে ভুলে গেছি। I would strongly recommended the introduction the ombudsman. আবারও ড. জাহেদ উর রহমানের কতগুলো প্রস্তাব যেটি হলো সাংবিধানিক কমিশন যেমন- মানবাধিকার কমিশন, Right to Information কমিশন বিশেষভাবে দুর্নীতি দমন কমিশন।

আরেকটি বিষয় আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম সেটি হচ্ছে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের যে অফিস, সেটি একটি সাংবিধানিক অফিস, সেটি একদম অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছে। তারা সংসদে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। তারপর আর কিছুই হয় না। তাই আর্থিক জবাবদিহিতার কোনো সাংবিধানিক কমিশন করা যায় কি না? এই অফিসটিকে আরও শক্তিশালী করা এবং আমার জানামতে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের অডিট বিভাগ রয়েছে। অর্থাৎ অডিটিং পদ্ধতিটি, আর্থিক অডিটিং, এজি অফিসের ব্যাপারটি এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে যে নিয়োগ হয় আমাদের দেশে বিরোধী দল সাধারণত সংসদে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি দলের এমনিতেও যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতা ছিল সেটি আরও বেশি প্রয়োগ হয়েছে, কারণ মাঠ খালি ছিল। আমি মনে করি, সংসদে কিছু বিশেষ স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে হওয়া উচিত। তাতে একটি জবাবদিহিতা থাকবে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আগের প্রশ্নটি একটু ব্যাখ্যা করার জন্য বলছি। প্রেসিডেন্টের নির্বাচন গত কয়েকদিনের আলোচনায় কেউ কেউ ক্ষমতার ভাগ বন্টনের প্রশ্নে দুটি ধারণা তৈরি হয়েছে। একটি ধারণা আমরা পাই যে, প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতা থাকলে ভারসাম্য হবে। আবার কেউ কেউ এই উদ্বেগ, আশংকা করছেন যে, ক্ষমতার দুটি ভরকেন্দ্র তৈরি হলে সরকার চালানোই বিপদগ্রস্ত হয় কি না? আপনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পদ্ধতিটির কথা বলেছেন যে, আমাদেরকে ভাবতে বলেছেন। সেক্ষেত্রে কি সরাসরি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কথা কি ভাবা যেতে পারে? জনাব জাহিদ উর রহমান যেটি বলেছেন সেটি একটি ভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। Indirect basis direct নির্বাচন নয়। কিন্তু সরাসরি নির্বাচনের কথাও কি বিবেচনা করা যেতে পারে? কেউ কেউ বলছেন কথাটি।

জনাব মাহফুজ আনাম: আমার মত হচ্ছে, That will definitely create two sentence of power. প্রেসিডেন্ট সরাসরি নির্বাচিত হলে তার নৈতিক ক্ষমতা অনেক বড় হলো। We make into complex situation of stalemate. কেননা আমাদের পলিটিক্যাল কালচারতো

পিছনের যা আছে তা ভাবতে হবে। এখন ধরেন আমেরিকান সংবিধানেও কিন্তু stalemate হয়। সেটি একটি প্রথা হয়ে আসছে। They are survive all that. আমাদের এখানে রাষ্ট্রপতির সরাসরি নির্বাচন আমার মনে হয়, নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা অনেকভাবে ক্ষুন্ন হতে পারে।

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (কমিশন সদস্য): অনেকেই বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ২ মেয়াদে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। What if I Prime Minister is found to be to have become authoritarian in the first term.

জনাব মাহফুজ আনাম: সেখানে সাংবিধানিক কমিশন যেটি বলা হচ্ছে, আমরা যদি আপার হাউজ করতে পারি অর্থাৎ It can be that she or he is very authoritarian even in the first term. Accountability of the Prime Minister power should be a part of our constitution. The question is very valid. After all elected Government এর প্রতিও তো আমাদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। কমপক্ষে একটি টার্মতো আপনি দিবেন। পরবর্তী নির্বাচনে হয়ত সে বেরিয়ে যাবে। নির্বাচন কারচুপির বিষয়টি আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে। কারণ হাসিনা সরকার নির্লজ্জভাবে নির্বাচনে কারচুপি করেছে। কিন্তু কোনো রকম প্রতিকারমূলক কিছু করা যায়নি। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের নিশ্চয়তা কতভাবে দেওয়া যায়, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, আরও কীভাবে জোর দেওয়া যায়, সেটি আমাদের ভাবতে হবে।

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (কমিশন সদস্য): আরেকটি প্রশ্ন। একটি বিষয় হলো যে, আমরা অনেকগুলো consultation করেছি। একটি জিনিস খুব পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে এসেছে যে, unless rechange the political culture, unless rechange the character of political parties, অনেক সংস্কারই will not see the light of day. এখন রাজনৈতিক দলগুলোর চরিত্র বদলাতে হলে over the years ingrained, inherent corruption. How do you go about it. How do you actualy rain in the political parties given their kind of leverage that they had. এত বছরের মধ্যে তারা সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্র শ্রীলংকা আপনি বললেন, ওদের প্রতিষ্ঠানগুলো মোটামুটি টিকে গেছে। কিন্তু আমাদের যে framework, foundationগুলো কিন্তু ধ্বংস হয়ে গেছে। সকালে একজন আলোচক বলেছেন যে, আমরা যত সুন্দর সংবিধানই করে দেই না কেন, unless you have the right political will to drive at home this will become very very daunting task. আপনাদের তরফ থেকে কোনো প্রস্তাব আছে কি না? এই যে বললেন এসিসি, এনএইচআরসিকে যেগুলোর অলরেডি সাংবিধানিক bodies আছে, ওরাও কিন্তু had become completely redundant. এই কালচার চলতে থাকলে আরও সাংবিধানিক body করে আমরা কি লাভ পাব সেটি আমি নিশ্চিত না। কিন্তু এই সুপারিশ অনেকেই দিচ্ছেন। I think to give more teeth to those institution. কিন্তু আমরা দেখেছি যে, constitutional bodies had become quite week. They could not function.

জনাব জাহেদ উর রহমান: আপনি যে প্রশ্নটি তুললেন, ইদানিংতো অনেক অনুষ্ঠান হচ্ছে সংবিধান নিয়ে, সেখানে অনেকগুলোতে যাই, যেভাবেই হোক আমি আমন্ত্রণ পাই। আপনি যে আলোচনাটা করছেন, সেখানে গিয়ে সে আলোচনাটা আমি অনেক বেশি করি। সংবিধান সম্পর্কে একটি কথা আমি সবসমই বলি যে, ভালো সংবিধানকে খাটো করা ঠিক না। কিন্তু overestimate করাও ঠিক না। কিছু লোক আছে তারা মনে করেন, খুব চমৎকারভাবে একটি সংবিধান লিখে ফেললেই হয়ে যাবে। আমি সাউথ আফ্রিকার সংবিধানটি কেন পড়তে গেছি, কারণ তুলনামূলকভাবে সংবিধানের ক্ষেত্রে অনেকে বলেন যে, এটি বিশ্বের অন্যতম একটি ভালো সংবিধান। আমি দেখলাম, আসলে আমি যতদুর বুঝেছি, ভালো। সেটিতো পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশ নয়। যদিও তাদের একটি ভালো সংবিধান রয়েছে। সুতরাং এটি আসলে হয় না। ভালো সংবিধান থাকলে কী হয়, আমি সবসময় একটি উদাহরণ দেই, ১৬তম সংশোধন বাতিল হওয়ার পরও একটি বিতর্ক হলো, তারা যদিও সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল করেছেন, এটি নাকি আপনাআপনি পুনর্বহাল করা যাবে না। কোর্ট can not decide? । তারপরও আওয়ামী লীগ যেটি করেছে, তাদের সংবিধানে আগের অপশনটিই রয়ে গেছে। এটি ফাইন। এসকে সিনহাকে তারা বের করে দিয়েছেন। তাদের হাতে সব ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তারা ঐ সাংবিধানিক পদ্ধতিটিরও ধার ধারেনি। তারা তাকে গান পয়েন্টে বের করে দিয়েছেন। এই আর কি বিষয়। আমার কাছে যেটি সমাধান, সেটি হচ্ছে যারা খুব দ্রুত সবকিছু করতে চাইছেন, আমার ঘটনাটি হচ্ছে এরকম, কমপক্ষে ১৫ বছর। আমাদের যদি ১৯৯১ থেকে বাধাহীনভাবে আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যেতে পারতাম, বা নির্বাচন পদ্ধতি। আমি কিন্তু নির্বাচনকে খুব গুরুত্ব দেই। কেউ কেউ বলে যে আমি overestimate করি। কিন্তু আমি মনে করি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকা এবং বেশ কয়েকটি নির্বাচন যদি ক্রমাগত চলতে পারে, অবাধ নির্বাচন, সেটি একটি date rent হিসেবে কাজ করবে। আমি একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দেই, সরাসরিই বলি। বিএনপির কিছু লোকজন চাঁদাবাজি করছে, খুব দ্রুত action নিচ্ছে। সত্যিই দেড় হাজারের মত action নিয়েছে। আমি ধরেই নেই যে তাদের চরিত্রগত পরিবর্তন হয়নি, তাহলে তারা এই কাজটি কেন করছে? সামনে একটি নির্বাচন আছে। আমরা ধ্বংস হতে শুরু করলাম তখন, যখন আমরা সামনে আর নির্বাচন দেখলাম না।

আমি দুটো সরকারের কথা বলি, যেগুলো নির্বাচিত হলেও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কারণ তাদের সামনে নির্বাচন ছিল না। একটি

হলো, ২০০১ এর বিএনপি সরকার। সেটি একটি ভালো নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত হয়েছে। তারপর তাদের মাথায় বুদ্ধি আসল, আমরা কিন্তু তত্ত্ববধায়ক সরকারকে manipulate করব, বিচারকের বয়স বাড়াব, সেই কারণে কিন্তু সেই সরকারটি খারাপ সরকার হয়ে গেছে। কারণ সে মনে করেছে যে, মেনিপুলেট করে থেকে যাব। একই বিষয় করেছে ২০০৮ সালের আওয়ামী লীগ সরকার। তারা ক্ষমতায় আসল এবং তারা বুঝল যে তারা তত্ত্ববধায়ক সরকার বাদ করে দেবে। তখন দেখব যে, ঐ সরকারটি নির্বাচিত হয়েও খারাপ ছিল। তুলনামুলকভাবে ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালের যে দুটি সরকার ছিল, অনেক সমালোচনার পরও তুলনামুলকভাবে ভালো ছিল। আমি মনে করি, আমরা যদি সেটুকুও সুনিশ্চিত করতে পারি, এখন কি সেটুকুও পারব? উত্তর হচ্ছে, পারব না। কেউ যদি মনে করে, তত্ত্ববধায়ক সরকার দেওয়ার পরেও সবকিছু manipulate করে বসে থাকবেন, এটি অসম্ভব না। যদি পারি, নির্বাচন ঠিকঠাকমত করতে তাহলে আমাদের সকল প্রতিষ্ঠানগুলো ভালো হতে শুরু করবে এটি আমি শতভাগ বিশ্বাস করি।

ধন্যবাদ।

জনাব মাহফুজ আনাম: হঠাৎ মাথায় আসলো যে, এটি বোধ হয় সংবিধানের বাইরে। আমরা যেমন প্রধানমন্ত্রীর টার্ম নির্ধারিত করছি তেমনি আমরা কি দলীয় প্রধানের টার্মও নির্ধারিত করতে পারি কী না? এটি বেশি interventionist হয়ে যাচ্ছে হয়ত, সেখানেও তো গণতন্ত্রের ব্যাপার আছে।

জনাব জাহেদ উর রহমান: এখানে আমি আবার একটি বিপরীত যুক্তি দেই। যেহেতু আলোচনার মতো হচ্ছে। বিজেপি-এর এই টার্মের আগে, কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় আসলো, সোনিয়া গান্ধি প্রধানমন্ত্রী হবেন কি না, সেটি নিয়ে বিজেপি সমাালোচনা করল, তিনি প্রধানমন্ত্রী হলেন না। মনমোহন পর পর ২ টার্ম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আসলে সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে ছিল? যদি আপনি এই প্রশ্নটি করেন, ঐ সময়ে আসলে প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? defecto প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? তিনি হন নি, বা ২ টার্মের পর কেউ হবেন না। কিন্তু কালচার যদি না পাল্টায়, defecto সোনিয়া গান্ধিই ছিলেন সেই সময়।

জনাব মাহফুজ আনাম: বাধ্যবাধকতা করা আর কি? আরেকটি বিষয় আমি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি, বিরোধী দল যদি বার বার সংসদ বর্জন না করত, তাহলে আমাদের সংসদ আরেকটু শক্তিশালী হতো। ধরেন হাসিনা সরকারের আগেও '৯১ সালে আওয়ামী লীগ বর্জন করল, ১৯৯৬ থেকে ২ বারই বিএনপি বর্জন করল। আবার আওয়ামী লীগ বর্জন করল। অর্থাৎ সংসদ একটি খেলার জায়গা। আমি যেটি বলছিলাম, They never took it to be house of the people. It's not the house of the ruling party. তুমি সেখানে যাবে না কেন? বলবে না কেন? একটি কথা তখন আসতো যে, স্পীকার নাকি মাইক বন্ধ করে দেয়। তখন আমি মনে করি, আমি লিখেছি যে মুহূর্তে মাইক বন্ধ করবে, আপনি সংসদের বাইরে গিয়ে You hold a press conference. So what you could have said inside the house, you said outside the house right then. সংসদ ব্যবহার করে আমরা একটি কালচার সৃষ্টি করি, জবাবদিহিতার কালচার। আমরা সব সময় ক্ষমতা দেখলাম। কীভাবে সরকারকে হেয় করা যায়, বা কোনঠাসা করা যায়। বিরোধী দলের সকল কার্যক্রম এ ধরনের। আর সরকারি দলের ভূমিকা হলো বিরোধী দলকে যতটুকু কোনঠাসা করে রাখা যায়। Yes, we have a very difficult task in hand. Best constitution may not give us the democracy we deserve. তারপরও যদি কাঠামোটি আমরা intelligently করতে পারি may be will go towards that side with very independent phrase always pushing at civil society. আর এখন তো social media is very powerful. সেটিও আমরা গণতান্ত্রিক কাজে ব্যবহার করতে পারব।

জনাব ফিরোজ আহমেদ (কমিশন সদস্য): আপনাদের ২জনকেই অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের আলোচনা শুনলাম। পরামর্শের জন্যই আপনাদের ২জনের কাছে ২টো প্রশ্ন তুলে রাখছি, আপনারা এখনও বলতে পারেন বা পরে লিখিতভাবে জানাতেও পারেন। একটি আলোচনার বিষয় আজকে আপনারা ২জনেই করেছেন এবং এই কয়েকদিন যারা এসেছেন তারা সবাই বলেছেন, সংবিধান সংস্কার কিংবা পুরোপুরি বদল এটি নিয়ে। যে কোনো কারণেই হোক এটি একটি আলোচনার বিষয় হিসেবে এসেছে যে, সংবিধান আমরা রাখব বা সম্পুর্ণভাবেই বদলে ফেলব কিছু সংস্কার না। এই বাস্তবতাটা এসেছে তার কিছু সংগত কারণও আছে। মানুষের মধ্যে এটি আলোচ্য বিষয়ও এখন। আপনারা কি পরামর্শ দিবেন? এ বিষয়ে কোনো জনমত হতে পারে, গণরায় হতে পারে যে, আপনারা এই সংবিধান চান কি চান না? ভোট হতে পারে। এরকম কোনো পদ্ধতির আয়োজন করা যায় কি না? যেহেতু এত বড় আলোচনার বিষয় হয়ে এসেছে। এটি জানা দরকার হয়ত মানুষ এ বিষয়ে কী মনে করছে। বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য আছে কী না? দ্বিতীয়ত হচ্ছে, বাংলাদেশে বহু বছর ধরে পরিচয়বাদী রাজনীতি একটি বড় জায়গা করে নিয়েছে।

সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম আছে, আরও অন্যান্য চাপও আছে। এ কয়দিনের আলোচনায় বিষয়গুলো বার বার এসেছে। এ বিষয়ে আপনারা কী মনে করেন, সেটিও আপনারা এখন বলতে পারেন, কিংবা আপনার লিখিতভাবে দিতে পারেন। আমরা চাইব যে, আপনাদের মতামত

বা পরামর্শ এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে আসুক।

জনাব জাহেদ উর রহমান: আমি প্রথম প্রশ্নটির জবাব এখন দেই। আর দ্বিতীয়টি আমি লিখিত দিব। আমার আরেকটু ভাবতে হবে। প্রথমটির জবাব হচ্ছে, আমাদের মানুষের মতামত নেওয়ার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকা উচিত। এটি খুব undemocratic শুনাচ্ছে বা আমরা অনেক বেশি বুঝি এ ধরনের মনে হতে পারে। কেন বলছি, যেমন ধরুন, আমরা যদি মানুষকে জিজ্ঞেস করি যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে মোবাইল কোর্ট কি থাকা উচিত? মানুষ কোনো কিছু না বুঝেই বিষয়টিকে সমর্থন করবে। আমি প্রথম আলোতে একটি কলাম লিখেছিলাম, রোকনুদৌলা এবং ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার। celebrity হওয়া যে কারণে আশংকাজনক। তারা Rockstar মতো বিখ্যাত। ভোট নিলে increasingly মানুষজন ভোট দেবে। এমনকি আমাদের শিক্ষিত মানুষও। আমি ব্যক্তিগতভাবেও দেখেছি যে, কেউ infact এটি নিতেও পারে না। কিন্তু এর মধ্যে যে কত বিরাট একটি সংকটের জায়গা আছে, এটি অনেকেই ধরতে পারছেন না। ফলে প্রচুর populist কথাবার্তা সংবিধান পুনর্লিখন নিয়ে আছে। সেটি থাকার কারণে যারা অন্তত বুঝেন, প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কত শতাংশ মানুষ পর্যন্ত যাব, তৃণমূলের মানুষ আসলে সংবিধান সম্পর্কে কিছু জানেই না। এমনকি শিক্ষিত মানুষও। সেদিন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তোমরা যারা বিসিএস দাওনি বা দেওয়ার পরিকল্পনা নেই তাদের কয়জন সংবিধান পড়েছ, হাত তোলো। আমি দেখলাম যে, তাদের প্রায় কারও হাত উঠেনি। তাই এটি করাটা কতটা ফলপ্রসু হবে তা নিয়ে আমার দ্বিধা আছে। Frankly speaking, এ রকম একটি অন্তবর্তীকালীন সময়ে, আবেগপূর্ণ সময়ে, আমরা খুব যুক্তিসঙ্গত যে কাজ করতে পারছি সেটি নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমার কাছে এজন্য মনে হয় যে, এটি নিয়ে কিছু করা ঠিক হবে কি না। আমার কিছু মতামত ব্যক্তিগতভাবে দিতে পারি আরও বড় পরিসরে। কিন্তু এক ধরনের পোল এর মত যদি কিছু করতে চাই যে, আমি পোল দিলাম যে, সোস্যাল মিডিয়াতে, পত্রিকায়, সবাই আপনারা ভোট দেন। আমি গণভোটের কথা বলছি না। সেক্ষেত্রে যে ফলাফল আসবে সেটি আমাদের জন্য খুব বেশি ভালো নাও হতে পারে। এটি হচ্ছে আমার মতামত।

জনাব মাহফুজ আনাম: আমি তাঁর বক্তব্যটি সমর্থন করতে চাই। Honestly speaking আমরা সংবিধান নিয়ে আলাপ করছি। তবে এটি কোনো আবেগের ব্যাপার না, এটি কোনো জনপ্রিয়তার ব্যাপার না, এটি খুবই vital document for the future of the country. এখন সত্যিকার অর্থে সংবিধান বাতিলের যে পক্ষটা, তাদের সাথে আমি আলাপ করে দেখেছি, It is more emotional than factual. আমি যদি বলি, কেন চাও? বলবে এটি মুজিববাদী সংবিধান। এটি '৭০ এ নির্বাচিত constituent assembly, '৭২ এ এসে সংবিধান দিয়েছে, এটি পাকিস্তানের assembly সদস্যরা বাংলাদেশে এসেছে এ কারণে। There was a liberation war in between. তারা পাকিস্তান আমলে নির্বাচিত হয়েছে কিন্তু তারপরতো মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। বিরাট পরিবর্তন। তাই আমার উত্তর হচ্ছে যে সংবিধানের ব্যাপারে অবশ্যই জনগণের মত প্রতিফলিত হবে। কিন্তু সেটি আবেগের ভিত্তিতে হলে we might fall into many pitfalls. আপনারা যে বাণি পাচ্ছেন, কোন কোন জায়গায় আমাদের ক্ষোভ, সেটি খুবই বিস্তৃতভাবেই সংশোধনের মাধ্যমে করা যায়। যেটি আপনি পাচ্ছেন একটি সহজ পথে, সেখানে আপনি ঐ পথে যাবেন কেন? আমাকে কেউ যদি বুঝাতে পারত যে সংশোধন করে আমরা এই এই ধারাতে সংশোধন আনতে পারছি না। তাই সংবিধানকে বাতিল করে আনতে হবে। আমি কিন্তু ঐ ধরনের যুক্তি পাইনি। একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি চেষ্টা করেছি ছাত্রদের সাথে কথা বলতে। যারা আন্দোলনকারী শিক্ষক তাদের সাথে কথা বলতে এবং সাধারণ জনসাধারণের সাথে যতটা সম্ভব। আমি অনুরোধ করব যে, সংবিধান অবশ্যই মানুষের চিন্তা, আবেগেরও প্রতিফলন হবে। কিন্তু আবেগ দ্বারা পরিচালিত সংবিধানের দিকে যাওয়াটা আমার মনে হয় একটু কঠিন। না যাওয়াটাই ঠিক।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক (কমিশন সদস্য): আমি ছোট ২টি প্রশ্ন করব। একটি হচ্ছে জনাব মাহফুজ আনাম আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহালের কথা বলেছেন। এখানে কি সুনির্দিষ্ট কোনো মতামত আছে, নাকি ৫৮ এ যে রকম ছিল, যেটি বাতিল হয়েছে সেই একই ফরমেট, নাকি ঐ ফরমেটের কোনো পরিবর্তন আপনি প্রস্তাব করছেন।

জনাব মাহফুজ আনাম: ঐ ফরমেটের সবচেয়ে বড় যেটি নেতিবাচক অংশ হচ্ছিল যে, Judiciary was getting politicize. বিশেষ করে বিচারকদের অবসরের বয়সসীমা এবং অন্যান্য বিষয়। এক্ষেত্রে আমরা একটু আপনাদের সৃজনশীলতার ওপর নির্ভর করব। Fast one we want the system. কিন্তু সেটির গঠন কিভাবে হয় সেটিতে আরও সৃজনশীলতার দিকে যেতে পারে। Keeping the judiciary protected. এটি একটি বিরাট প্রয়োজনীয়তা।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): ধন্যবাদ। ড. জাহিদ উর রহমানের কাছে আমি একটি বিষয় জানতে চাই, আপনি সঠিকভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিষয়টি এনেছেন। তারা অনেক ভালো সংবিধান করেছে, একটি transformative constitution. অনেক কিছুই তারা differently করেছে। আপনি যেমন অনেকগুলো কমিশনের কথা বললেন, আবার bill of rights'ও তারা অনেক কিছু বড় করেছে। তাদের এই প্যাকেজে কিন্তু আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারা করেছে। সেটি হচ্ছে Establishment of a several Constitutional

court. সংবিধানটি যে এত শক্তিশালী করল, এত দীর্ঘ করল এত কিছুর। এটির appropriate enforcement, implementation-এর কথা মাথায় রেখে এটি করেছে। আমি একটু জানতে চাই যে, এই constitutional court establishment নিয়ে কোনো কিছু ভাবছেন কি না? বা এটি যদি এখন বাংলাদেশে প্রস্তাব করা হয়, সুপ্রিম কোর্টের পাশাপাশি, এটি কতটুকু মানার সম্ভাবনা আছে?

জনাব জাহেদ উর রহমান: আমি আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে বলব যে, আমার কিছু সময় মাথায় ছিল যে এরকম একটা কিছু হতে পারে কি না? কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতায় আমাদের সুপ্রিম কোর্টের পাশাপাশি এটি বড় প্রশ্ন তৈরি করবে। যেহেতু আমাদের সংবিধানের যে কোনো ইস্যুতে আমরা সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারছি, আমার কাছে এটি থাকা প্রয়োজন বলে মনে হয়। এটি খুবই বড় ধরনের পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং এটি বড় বিতর্ক তৈরি করতে পারে। আর জনাব মাহফুজ আনামের কাছে যে প্রশ্নটি করেছেন সেটিরও একটু জবাব দিতে চাই। জুডিশিয়ারিকে বাইরেও রাখতে হবে না। সুনির্দিষ্ট না করে দিলেই হয়। অর্থাৎ আপনি চাইলে অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি নিতে পারেন। কিন্তু আমরা আগে সে পদ্ধতিটি করেছিলাম, একজন বিশেষ ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট করেছিলাম যে তিনি হবেন। বিচার বিভাগের সর্বশেষ প্রধান বিচারপতি হবেন। এরকম না করে আমরা যদি এটিকে খোলামেলা করি, কীভাবে মনোনয়ন হবেন এর মধ্যে জুডিশিয়ারির মানুষ থাকতে পারে। আমার কাছে মনে হয়, তাতেও সমস্যা নেই। ফলে targeted কোনো রাজনীতিকরণের চেষ্টা হবে না।

জনাব মাহফুজ আনাম: এখানে সুনির্দিষ্ট করার পর ঐ ব্যক্তির দিকে নজর চলে গেল। আবার এতটা সুনির্দিষ্ট না হলে আমাদের রাজনৈতিক যে কালচারটা, ঐ মনোনয়নের সময়েই একটি বিরাট ঝগড়ার মধ্যে চলে যাব। There was a merit to the specificity and there was a danger. সেখানেই আপনাদের সৃজনশীলতার ওপর আমাদের নির্ভর হতে হবে।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): আমার দুটো প্রশ্ন আপনাদের দুজনের কাছেই। প্রথমটি হচ্ছে মহিলা সীট নিয়ে। আমাদের লোয়ার হাউজ যদি সরাসরি নির্বাচন হয় আর আপার হাউজে যদি আমরা P.R. এর মাধ্যমে নির্ধারণ করি বা পপোলেট করি, তাহলে আমরা কি সংরক্ষিত সীট আগের মতো যেভাবে আছে সেভাবে রাখব লোয়ার হাউজে? নাকি আমরা সেটি আপার হাউজে নেওয়ার চিন্তা করব।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে জুডিশিয়ারি সম্পর্কে। আমাদের বিগত ১৫ বছর বা আরও বেশি সময় ধরে দেখছি যে, সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমেই বেশি অবিচার হয়। আমরা Judges are beyond any discipline. আমরা খুব খুশি হয়েছি যে, sixteen amendments have been structed down, Supreme judiciary council provision has been restored. কিন্তু আসলেই কি এটি খুশি হওয়ার ব্যাপার? সুপ্রিম জুডিশিয়ারি যখন ছিল, তখনওতো আমরা বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের বিরুদ্ধে আবেদন দিয়েছিলাম, There was never dispose of. সেটি পেন্ডিং থাকা অবস্থায়ই তাকে এপিলেট ডিভিশনে নেওয়া হলো। আমরা যখন বিচারপতি মোহাম্মদ নিজাম উল হক নাসিমের বিরুদ্ধে আবেদন দিলাম সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে disciplinary proceedings আনার জন্য, কিছুই হয়নি। আপিল বিভাগ কর্তৃক তা *elevated* হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পর্যাপ্ত কী না? এখানে আমার চিন্তা করতে হবে কি না যে লেজিসলেচারের কোনো ভূমিকা থাকবে কি না?

জনাব জাহেদ উর রহমান: আমি প্রথমে regard females আমি মনে করি এটি সঠিক না। রাজনৈতিক দলের জন্য আরপিও তে যে আইনটি করা হয়েছে প্রত্যেকটি কমিটিতে এটি হতে পারে ৩০ বা ৩৩ % সম্ভবত নারী প্রতিনিধি লাগবে। আমরা যদি নারীদেরকে আনতে চাই, এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা দিয়ে যে তারা তাদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে এত শতাংশ নারীকে মনোনয়ন করতে হবে। সমস্যা আছে, সমস্যা হচ্ছে, যেখানে তার অবস্থা খারাপ সেখানে হয়ত দেবে, কিন্তু এটি একটি অপশন হতে পারে। কিন্তু সংরক্ষিত সীটের কোনো দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। ১৬তম সংশোধন আসলে আমরা যদি রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি কোণ থেকে চিন্তা করি সঠিক ছিল। আমরাতো যখন চেক এন্ড ব্যালেন্স নিশ্চিত করতে চাইব। তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসবে জুডিশিয়ারি কেন নিজে নিজের বিচার করবে। জুডিশিয়ারিকে oversee করার জন্য অন্য কেউ চেষ্টা করতে পারে। Technically কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক আছে। কিন্তু ঐ যে ব্যবহার, যেমন আমি এ প্রসঙ্গে বলি, ভারতে এখন এই বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভারতে যে জাজ নিয়োগ হয় ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে। সেখানে তারা নিজেরাই ঠিক করেন যে কে হবে? ইসরাইলেও একই রকম। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো আমরা দেখলাম যে ঐ পদ্ধতিটা কিন্তু কাজ করেছে। একটি হলো তাত্ত্বিক চিন্তা করা, আরেকটি হলো আমরা যখন ব্যবহার করতে যাই বা আমি ধারণা করি ভারতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই বিতর্ক শুরু হবে, গত সরকারের সময় তাদের আইন মন্ত্রী এ প্রশ্নটি তুলেছিলেন। কিন্তু ভারতেও ঔপনিবেশিক পদ্ধতি ভাবতে খুব সঠিক মনে হয় না। তারা নিজেরা প্যানেল করছে, সরকার সেখান থেকে পছন্দ করবে। একইভাবে আমার মনে হয় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলজনিত যে সংকটগুলো ছিল, সেগুলো ছিল সরকারের সংকট। সেখানেও সমস্যা হচ্ছে। লেজিসলেচারের হাতে নিলে বা আমি কিছু involvementও যদি রাখতে চাই, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সেই সমস্যা আরও বাড়বে বলে আমি মনে করি।

জনাব মাহফুজ আনাম : সংরক্ষিত আসনের ব্যাপারে ছাত্র আন্দোলনের ফলে আমাদের অনেকেই out of the box চিন্তা করতে

শিখাচ্ছে। আমি out of the box একটি পরামর্শ দেই। It is sound a bit absurd, but it is quite revolutionary. আমরা কী এরকম করতে পারি। কমিটিকে জিজ্ঞাসা করছি যে, প্রত্যেকটি কনস্টিটিউয়েন্সিতে দুজন করে প্রার্থী থাকবে। একজন নারী, একজন পুরুষ। সংসদে ৬০০ সিট থাকবে, প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় ২জন করে এমপি। এখানে একটি প্রশ্ন আসবে যে এমপিরাতো একজন আরেকজনের সাথে ঝগড়া করবে। সেক্ষেত্রে কী করা হবে? সেখানে creatively তাদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া যায় কি না? আমি মনে করি যে, আমরা পার্টিকে বলি যে তোমরা ৩৫% দাও ইত্যাদি। পার্টি বলবে যে, আমি যদি এই আসনে নারী মনোনয়ন দেই, আর অন্যরা যদি পুরুষ দেয়, তাহলেতো পুরুষ জিতবে। তাহলে ২জনকেই মহিলা দিতে হবে। এত বাধ্যবাধকতার মধ্যে যাবেন কি না। With this radical thinking you actually transform the nature of the Parliament. You have 600 MPs, each constitution has 2 MPs. এটি জটিলতা সৃষ্টি করবে কি না আমি জানিনা। I just thought it is totally thinking out of the box and with one stroke you create an equality example. যেটি আমার মনে হয় সমস্ত সমাজে ছড়িয়ে যাবে।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): আপনাদের out of the box চিন্তায় আপনি বলেছিলেন যে, একটি দলের মেয়াদ নির্ধারণ, সেট করা যায় কি না? এটি করলে আমার মনে হয় রাজনৈতিক দলের মধ্যে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের এর সাথে দলের মেয়াদের কথা বলেছিলেন, এটি apparently কতটা বাস্তব, সেটি যদি আপনি গুরুত্বসহকারে বলে থাকেন সেটি আমার জানা দরকার যে এটি কোন ভিত্তিতে।

দ্বিতীয়ত একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে জনগণ এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা আছে যে এবং আপনারা প্রস্তাব দিলেন যে, সংশোধনীর মাধ্যমেই করা। কিন্তু কিছু কিছু পস্তাব এসেছে আপনাদের কাছ থেকে এবং অন্যদের কাছ থেকে যেগুলো করতে গেলে একটি সংসদের পক্ষে সম্ভব না। যেমন যদি দ্বিকক্ষ পদ্ধতি করতে চাই, তাইলে আমি দ্বিকক্ষ পদ্ধিতি সংশোধন করে বা আসন্ন সংসদে করে সেটির স্বাভাবিকভাবে বাস্তবায়ন করতে গেলেও আরেকটি টার্মের জন্য হয়ত অপক্ষো করতে হবে। কারণ ঐ নির্বাচিত সংসদ অটোমেটিকলি দ্বিকক্ষ পদ্ধতি আপার হাউজটি আপনাআপনি গঠন করতে পারবে না। সেখানে আবার আরেকটি পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে যদি আমার বাস্তবায়নের ইচ্ছাটাই থাকে, আমাকে আবার একদম ভবিষ্যতের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। যদি তাদের ইচ্ছা হয়।

দ্বিতীয়ত হচ্ছে সরকার যে আমাদের scopeটি দিয়েছে সেটি এক ধরনের ড়pen ended. কোনো সুনির্দিষ্ট পয়েন্ট আমাদেরকে বলেননি। আপনারা যেহেতু public field-এ বেশি active, public pulseটা আমাদের একটু বুঝা দরকার যে, তারা আসলে আমাদের কাছে থেকে একটি swiping changes recommendation expect করে নাকি আসলে practically যেগুলো এখনই করা প্রয়োজন বা একটা টার্ম ইউজ করে যদি বলি ফ্যাসিবাদ যে পদ্ধতিটি উন্নয়ন করেছিল, সেটিকে পরিবর্তন করার জন্য এখনই কিছু পদ্ধতি আমাদের সুপারিশ করা। কোন দৃষ্টি থেকে আমাদের কাজ করা উচিত বলে আপনাদের মনে হয়। একটিতো provision by provision প্রস্তাব দিলেন। সাধারণত একটি প্রস্তাব আশা করব যে, আপনারা এই ধরনের wayতে চিন্তা করেন, যাতে apparently এটি বাস্তবিকভাবে ব্যবহার করা যায়।

জনাব জাহেদ উর রহমান : আমি প্রথমেই একটু বলি, আমাদের প্রত্যাশাটি কি? আমি যেহেতু অনেকগুলো অনুষ্ঠানে কথা বলেছি। যিনি বলেছেন, এই সংবিধান যাচ্ছে তাই, এটি শেখ হাসিনার সংবিধান, এটি মুজিববাদ, এ আলোচনা যারা শুনতে আসেন তারা consus people. তারা দীর্ঘ সময় বসে শুনেন হয়ত প্রথমই শুনছেন। তারা খুবই উৎসাহি হয়ে উঠতে থাকেন। তারা মনে করেন এটি একেবারে খোল-নলচে পাল্টে ফেলা উচিত। এ ধরনের একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মত আছে। আমি জনাব মাহফুজ আনামের সাথে একেবারেই একমত সে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি এক ধরনের emotional impulsive decision. এমনকি ভুল narrative সামনে আনা হচ্ছে। আমি একটি narrative-এর কথা বলি, এই সংবিধান না পাল্টালে আমরা অনুচ্ছেদ ৭(এ)-এর মাধ্যমে ঝুলে যাব সবাই। এরকম কথা। ফলে আমরা এই বিপ্লব বা গণঅভ্যুত্থানে যারা আছি সবারই মৃত্যুদণ্ড হবে। আমাদেরকে বাঁচতে হলে এটিকে পাল্টাতে হবে। আমাকে অনেকে এই প্রশ্ন করেছিল এমনকি শিক্ষিত মানুষজনও। এরকম নানান কারণে। একদিন আমার সামনে একজন বিখ্যাত আইনজীবী টকশোতে বলছেন, আমি তাঁকে বললাম, আচ্ছা আমরা একটি সংবিধান লিখলাম, সেখানে বললাম, এই জুলাই appraising-এর সাথে জড়িত, তারা জাতির সূর্য সন্তান। যদি লিখে দেই যে, তাদেরকে একটি ফুলের টোকাও দেওয়া যাবে না কোনোদিন। ভবিষ্যতের সরকার। আপনি কি বিশ্বাস করেন ভবিষ্যতে যদি শেখ হাসিনা ফিরে আসে ঐ সংবিধান আমাদেরকে বাঁচাবে। না। নানারকম ভুল বুঝানোর ফলে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ধারণা তৈরি হয়েছে। আমার সুপারিশ হচ্ছে, মানুষ বলতে আমরা কাকে বুঝব, আমরা কি রাজনৈতিক দলকে বাদ দিচ্ছি। ধরি বিএনপি এর মত একটি বিরাট দলের সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে একটি বিরাট reservation আছে। তাঁকে যদি মানুষ হিসেবে ধরি, তাহলে দেখব, খুব বেশি কিছু করা বোধ হয় তাদের দিক থেকে endorse হবে না। এটি আরেকটি জায়গা। সুতরাং আমার প্রস্তাব, এই কমিশনে আমি থাকলে এরকমই সুপারিশ করতাম। বাংলাদেশের সংবিধানের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সংশোধন করা দরকার,

সেগুলো চিহ্নিত করা এবং সেটুকু যেন আমরা করি। কিন্তু ন্যূনতম কিছু প্রয়োজনীয় রয়েছে এগুলো যেন আমরা করি। সেক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি একটি কার্যকরি সংবিধান পাই। আবারও বলছি, Fifteenth Amendment-এর পূর্বে যে সংবিধান, সেটির ভিত্তিতে। সেটুকুরও একটি আলাদা highlights যদি থাকে সেটি আমার মনে হয় রাজনৈতিক দলের সাথে- তারা একটি বড় অংশীজন, তাদের সাথে আলোচনা সহজ হবে।

জনাব মাহফুজ আনাম: আমার ধারনা জনগণের প্রত্যাশা আছে, তারা মুক্তির আলো দেখতে চায়। যেভাবে সংবিধানকে ব্যবহার করে আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, সাংগঠনিক স্বাধীনতা সবকিছু যেভাবে নিষ্পেষিত হয়েছে তার একটি পরিবর্তন চায়। কিন্তু তারা আবার নির্বাচনও চায়। খুব বেশি দূরে হলে আমার মনে হয় না সেটি আপনাদের পক্ষে যাবে। তাই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে, আলোচনার এদিক ওদিক মিলে বড়জোর এক, দেড় বা দুই বছর। আরেকটি বিষয় হলো, আপনাদের যে সুপারিশগুলো যখন আপনারা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবেন, আমি যেটি বুঝেছি তখন এটি বিস্তারিত আলোচনা হবে। প্রধান উপদেষ্টাও যেটি বলেছেন যে, আমরা রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করব। আশা করা যায় যে, আপনারা যদি ২০টি নতুন সংশোধন প্রস্তাব করেন সেখান থেকে ১৫টি ঐক্যমত হলো। সেই ঐক্যমতটি আমরা in a way by some declaration- ধরে নিলাম যে, this is a consensus change that is expectable to all party. তারা নির্বাচনের পরে সংসদের মাধ্যমে সেগুলো legalise করবে অর্থাৎ লিগাল করবে। ঐ ধারাটা আমার কাছে মনে হয়েছে। ঐ ঐক্যমতে গেলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে কতুটুকু হবে। তখন দ্বিকক্ষ রাখবে কি রাখবে না, তারপর প্রধানমন্ত্রীর টার্ম ইত্যাদি। ইতোমধ্যে তো আপনারা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারবেন। আমি যেটি কাগজে পড়েছি যে, বিএনপি ইতোমধ্যে ২ মেয়াদের কথা বলেছে, দ্বিকক্ষের কথা বলেছে। জনাব জাহিদ উর রহমানের এই প্রস্তাবটি আমার খুবই ভালো লেগেছে, আমরা যদি আপার হাউজটি আনুপাতিক প্রতিনিধি দিয়ে আনি তাহলে কিন্তু we cross a big hurdle very easily. আমার কাছে মনে হয় যে, রাজনৈতিক দল হয়ত এটিতে সম্মতি দিবে। যাই হোক, আপনারা আপনাদের নিজেদের সুপারিশগুলো করবেন, but you cannot take too much time. তারপর সেটি জনগণের কাছে যাবে, you will dialogue with the political parties. তারপর একটি ঐক্যমত আশা করি হবে, and then we move to the election with a commitment. অথবা এটি হয় কি না জানি না। অধ্যাদেশের মাধ্যমে ঘোষণা করা with the consent of the political parties যে এগুলো আমরা গ্রহণ করছি বা এটি এখন প্রণীত হচ্ছে। দ্বিকক্ষতো প্রণীত হতেই হবে, অন্যথায় তারাতো নির্বাচনে যাবে না। এটি একটি কঠিন প্রক্রিয়া। আমার কাছে মনে হয় যে, বিশাল একটি জনগোষ্ঠী এ পরিবর্তনটি চায় এবং you also have the support of the political parties. কিন্তু এটি কোন পর্যন্ত যাবে এ বিষয়ে আমিও জনাব জাহিদ উর রহমানের সাথে একমত যে কতটুকু যাবে আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত না।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, জনাব ড. মাহফুজুর রহমান এবং জনাব ড. জাহিদ উর রহমান। আপনারা আমাদের সাথে সময় ব্যয় করলেন এবং আপনাদের পরামর্শগুলো যতদূর সম্ভব হয় এগুলো লিখিতভাবে দিলে আমাদের কাজের জন্য খুব সহায়ক হবে। আমরা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। সময়ের যে স্বল্পতা সেটি প্রজ্ঞাপনের মধ্য দিয়েই নির্ধারিত হোক। ফলে যতটা সহায়তা আমরা জোগাড় করতে পারি ততটা সাফল্য না হোক অন্ততপক্ষে সম্পাদন করার চেষ্টা করব।

সবাইকে ধন্যবাদ।

জনাব মাহফুজ আনাম: আমি আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাদের কমিটিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি আসলে আপনাদের কমিটির আমন্ত্রণ পেয়ে চিন্তা করতে করতে আরও বেশি অনুধাবন করলাম, যে আপনারা কত গুরু একটি দায়িত্বে আছেন এবং truly speaking at the success your committee may give us realy a stronger possibility for democratization. So I want you all to know আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে, আন্তরিকতার সঙ্গে আপনাদের সাঙ্গে সবধরনের সহযোগিতা করছি এবং করতে রাজি আছি।

Wishing you all the best.

জনাব আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

দশম সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল ৯.৩০ থেকে ১১.০০ পর্যন্ত

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:

১।	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক	কমিশন প্রধান
২।	অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল	সদস্য
৪।	অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫।	ব্যাস্টিার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল	সদস্য
৬।	জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক	সদস্য
৭।	জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ, লেখক	সদস্য

অংশগ্রহণকারী অংশীজনদের এর তালিকা :

১। ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির, সাংগঠনিক সম্পাদক, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)

২। জনাব হাসান হাফিজ, সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব

৩। ডা. ফয়জুল হাকিম, সহসভাপতি, ডক্টরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ(ডিপিপিএইচ)

৪। ডা. মোঃ হারুন রশিদ, সদস্য, ডক্টরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ(ডিপিপিএইচ)

কার্যবাহ প্রস্তুতকারক :

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সম্পাদনায়:

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানের কার্যবাহ

কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজ এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ, আমি এই কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে সংবিধানের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা গত কয়েকদিন যাবত ছোট ছোট অধিবেশনে বিভক্ত হয়ে আপনাদের সাথে কথা বলছি। অংশীজনদের সাথে কথা বলছি, যাতে করে সকলের কথা শোনার ও আলোচনা করার সুযোগ থাকে। আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকের এই অধিবেশনের শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে এবং কমিশন গভীর শ্রদ্ধার সাথে এই শহিদদের কথা স্মরণ করছে এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছে। এখন কমিশনের সদস্যরা তাঁদের পরিচয় দেবেন।

(কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির সক্রিয় অংশীদার হিসেবে সংবিধানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার এবং আপনার সংগঠনের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে সকলের মতামত শোনা এ নিয়ে কথা বলার সুযোগ হবে। আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব লিখিত আকারে আজকে আমাদের কাছে দিতে পারেন অথবা আগামী ২০ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

[এ পর্যায়ে অংশীজন নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।]

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): বক্তব্যের শুরুতে আপনার নাম এবং আপনার সংগঠনের নাম উল্লেখ করলে আমাদের পক্ষে নোট নেওয়া সহজ হবে। আমরা আজকে শুরু করব ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির, সাংগঠনিক সম্পাদক, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) এর বক্তব্য দিয়ে।

ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির (সাংগঠনিক সম্পাদক, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ,ড্যাব): আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন, এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কারের জন্য যে কমিশন হয়েছে এবং আপনারা দায়িত্ব পেয়েছেন এবং আপনারা যে কষ্ট করছেন এজন্য আপনারা সফল হোন এ প্রত্যাশা করছি। আপনারা যে চিঠি দিয়েছেন সেটি ১২ তারিখের চিঠি। আমি সাংগঠনিক সম্পাদক, আমি বিদেশে ছিলাম, গতকাল এসেছি। গতকালই আমার সভাপতি মহোদয় আমাকে জানালেন যে আগামী কালকে মিটিং আছে। উপস্থিত হতে হবে। আসলে এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের জন্য আপনারা যে সময় দিয়েছেন এটি খুবই কম সময়। সাধারণত এ ধরনের ক্ষেত্রে আমরা সাংগঠনিকভাবে ৫ বা ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি করে দিই। তারা মিটিং করে আলোচনার ভিত্তিতে সাজেশন তৈরি করে। এক্ষেত্রে আমরা সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারিনি। এজন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা পরবর্তীতে যে সংগঠনকে ডাকবেন তাদেরকে একটু সময় দিলে সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়। আপনারাতো আমাদের মতামত জানতে চাচ্ছেন, আমরা যদি একটু স্টাডি করতে পারি, তাহলে আরও সুন্দরভাবে মতামত প্রদান সহজ হয়। আপনি সুন্দর বলেছেন যে, আজকে আমাদের মৌখিক মতামত বলি, তারপর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমাদের লিখিত মতামত প্রদান করব। যেহেতু পর্যাপ্ত সময় পাইনি, এ সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা একটি মিটিং করি, পর্যালোচনা করি। সেই পর্যালোচনাটি আমরা করতে পারিনি। সেক্ষেত্রে আমি আমার কথাই বলছি।

সংবিধান পড়তে গিয়ে দেখলাম, আসলে সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে আমাদের কথা বলারতো কোনো এখতিয়ারই নেই। কারণ এটি পুরোপুরি সংসদ-সদস্যদের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। এখানে আসলে অন্য কোনো মানুষের এখতিয়ার নেই। আমার কাছে যেটি মনে হয়েছে যেমন অনুচ্ছেদ ৪(ক)। আমার মনে হয় এটি সংবিধানে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। আবার ৬(২) যেটি আছে, জাতি হিসেবে ‘বাঙালি’ এবং নাগরিক হিসেবে ‘বাংলাদেশী’ পরিচয় দেওয়া। এখানে জাতি এবং নাগরিক দুটি আলাদা করার দরকার নেই। আমরা কেবল নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী এটি থাকলেই যথেষ্ট। কারণ আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং অন্যান্য উপজাতি আছে। আমরা যদি সবাইকে

বাঙালি বলি এবং highlight করি তাহলে তাদেরকে অবমাননা করা হয়। নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী এটিই থাকাই যুক্তিযুক্ত। আর সংবিধানে ইতোপূর্বে যেটি ছিল এবং পরবর্তীতে সংশোধন হয়েছে, "সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস", এটি ফিরিয়ে আনার দাবি জানাচ্ছি। সংবিধানে যেটি কোথাও নেই 'ন্যায্যতা এবং সততা'র মাধ্যমে দেশ চলবে, এই ন্যায্যতা এবং সততা কথাগুলো অনুপস্থিত আছে। অনুচ্ছেদ ৯ সংশোধন করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, সেখানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আনতে হবে। অনুচ্ছেদ ১১ তে ভাষা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। অনুচ্ছেদ ১২ প্রয়োজন নেই। এটি ২(ক) এর সাথে সাংঘর্ষিক। অনুচ্ছেদ ১৮ তে জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা, সবার জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এই শব্দগুলো নিয়ে আসা উচিত। স্বাস্থ্য খাতে বাজেট, তারপর স্থানীয় প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি যারা আছেন, তারা যাতে দেশে স্বাস্থ্য সেবা নেন, এটি বাধ্যতামূলক করা উচিত। কারণ তারা দেশের কোনো মেডিকেল বোর্ড এর রিপোর্ট বা পরামর্শ ছাড়াই রাষ্ট্রীয় খরচে দেশের বাইরে যাচ্ছেন। যে চিকিৎসাগুলো দেশে সম্ভব, দেশে চিকিৎসা না নিয়ে রাষ্ট্রীয় খরচে বিদেশ যাওয়ায় রাষ্ট্রীয় তহবিলের অপচয় হচ্ছে। তারা জনপ্রতিনিধি হোন বা রাষ্ট্রীয় কোন ব্যক্তি হোন তাঁরা যদি রাষ্ট্রীয় খরচে দেশের বাইরে চিকিৎসা নিতে যান, অবশ্যই দেশের একটি মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ নিয়ে তাদের যেতে হবে। জুডিশিয়াল স্বাস্থ্য কমিশন গঠন করা, এ বিষয়গুলো স্বাস্থ্য খাতে নিয়ে আসা উচিত।

অনুচ্ছেদ ২২। নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগ, যেটি আমরা দীর্ঘদিন থেকে দেখি যে বিচার বিভাগ স্বাধীন, কিন্তু কোনো এক সুতোয় বিচার বিভাগকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। বিচার বিভাগটিকে পুরোপুরি স্বাধীন করে দেওয়া উচিত। এখানে নির্বাহী বিভাগের সাথে কোনো রকম সম্পৃক্ত থাকার দরকার নেই। সম্পৃক্ত থাকলেই দেখা যায় যে, কিছু না কিছু হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থাকে। যেটি মানুষের চাহিদা। আমরা ছোট বেলা থেকেই শুনে আসছি যে, বিচার বিভাগ স্বাধীন হবে, বিচার বিভাগ স্বাধীন হবে, কিন্তু আমরা কখনই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দেখিনি। সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মান মর্যাদা, সমুন্নত রাখতে হবে, বাংলাদেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখতে হবে। বৈদেশিক চুক্তির ক্ষেত্রে দেশ ও জনগণের স্বার্থ সমুন্নত রাখতে হবে এবং পরিপূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা যাবে না। কোনো না কোনো পর্যায়ে সংসদে আলোচনা করতে হবে, না হলে সংসদীয় কমিটিতে আলোচনা করতে হবে। কোনো না কোনো পর্যায়ে আলোচনা করতে হবে। কারণ বিগত সময় দেখেছি, রাষ্ট্রীয় যে চুক্তিগুলো হয়েছে, আমরা জনগণ হিসেবে এই চুক্তিগুলো সম্পর্কে জানি না এবং সংসদেও কখনও এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে দেখিনি। দেশ তো শুধু সংসদ-সদস্যদের না। দেশ প্রত্যেকটি নাগরিকের। এজন্য রাষ্ট্র কী চুক্তি করছে সবাই না জানলেও অন্ততপক্ষে কিছু ফোরামে আলোচনা পর্যালোচনা হওয়া উচিত। অনুচ্ছেদ ২৬ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অধিকার সংযুক্ত করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৩৩(৩) রহিত করা উচিত এবং অনুচ্ছেদ ৩৩(৪) নিবর্তনমূলক আইন, বাতিল করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৪৬ এ দায়মুক্তি বিধান সংশোধন করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৪৮-এ শিক্ষাগত যোগ্যতা, রাষ্ট্রপতি এবং যারা জনগণের প্রতিনিধি হবেন, এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতার উল্লেখ নেই, আমার মনে হয় এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতার উল্লেখ করতে হবে। কারণ শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এ আছে যে, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে দায়িত্ব পালন করবেন বা কাজ করবেন। আমার মনে হয় যে, এখানে বাধ্যতামূলক না করে পরামর্শ করবেন এ ধরনের শব্দ নিয়ে আসা। মানে তাঁকে বাধ্য না করা। অনুচ্ছেদ ৫০ ও ৫২। রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের বিষয়ে স্পীকার না থাকলে ক্ষেত্র বিশেষে পদত্যাগের 'বিকল্প' সংযুক্ত করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৫৫-৫৮, একাধিক্রমে বা জীবদ্দশায় ২ বারের বেশি কেউ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে, সেটি রাষ্ট্রপতি হোক বা সরকারের অন্য কোনো দায়িত্ব হোক, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী থাকতে পারবে না। শুধু রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে না, রাষ্ট্রের দায়িত্বে এবং সরকারের দায়িত্বে ২ বারের বেশি কেউ থাকতে পারবে না। দেশের শিক্ষিত জনগণ অনেক আছে। আমার মনে হয়, এরকম সুযোগ সবার জন্য বাড়ানো উচিত। কোনো কিছু কুক্ষিগত করার দরকার নেই।

সংবিধানের মৌলিক বিষয় পরিবর্তনের জন্য গণভোট বা দুই তৃতীয়াংশ সংসদ-সদস্যের সম্মতি। যেমন গণভোট এখন নেই। বর্তমান সংশোধনে এটি নিয়ে আসা যেতে পারে। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা উচিত। যেটি বর্তমান ব্যবস্থায় আসলে অনুপস্থিত। নির্দলীয়, নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত যেটি আগে ছিল। দুই সরকারের মধ্যবর্তী সময়ে এটি চেক এন্ড ব্যালেন্স হিসেবে কাজ করে। অনুচ্ছেদ ৫৬(২), টেকনোক্র্যাট কোটায় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী যেটি আছে এক দশমাংশ, আমার মনে হয় এটি বাড়ানো যেতে পারে। এটি ২০% করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ৫৬(৪) প্রয়োজন নেই বা এটি সংশোধন করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ৫৭ (খ) সংশোধন করা প্রয়োজন। অনুচ্ছেদ ৫৮(খ) আমার দৃষ্টিতে প্রয়োজন নেই। অনুচ্ছেদ ৫৮ (৪) প্রয়োজন নেই। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আসতে হবে, এটি পূর্বেই বলেছি। অনুচ্ছেদ ৫৮(ক) ফিরিয়ে আনা এবং পঞ্চদশ সংশোধন রহিত করা, যে আইনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রহিত করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৬৭(ক) পূর্বেরটি সংশোধন হলে, এটি এমনিতেই চলে আসবে। অনুচ্ছেদ ৭০, এটি অবশ্যই পরিবর্তন করা উচিত। এখন যেটি হয় সংসদে কোনো দলের বিপক্ষে কেউ কথাই বলতে পারে না। এটিতে আসলে একজন সংসদ-সদস্যের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। অর্থবিল ছাড়া বা অন্য কোনো ব্যাপারে তিনি স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেটিতে সরকারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার বিষয় জড়িত, এরকম কিছু বিবেচনা করা যেতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রে

সরকারের সমালোচনায় সংসদ-সদস্যদের কথা বলার ক্ষেত্রে একটু স্বাধীন হওয়া উচিত। অর্থাৎ সংসদ-সদস্যরা যাতে স্বাধীন মতামত দিতে পারে এবং ভোট দিতে পারে। বিচারপতিদের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে যেটি হয়েছিল যে বিচারপতিরা অবসর গ্রহণের পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে সম্পৃক্ত হন, আমাদের মত দেশের ক্ষেত্রে বা তৃতীয় বিশ্বের দেশের ক্ষেত্রে manipulation বা বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু ব্যত্যয় ঘটে। আমার মনে হয়, এই ব্যত্যয় যাতে না ঘটে, যারা বিচারপতি থাকবেন তারা অবসরের পরে এ ধরনের কোনো দায়িত্বে না আসাটাই উচিত হবে। অর্থনৈতিক লেনদেন বা রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের হিসাবে স্বচ্ছতার ব্যবস্থা করা। বর্তমান ব্যবস্থা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কেন জানি সংসদ-সদস্যদের কাছে জিম্মি হয়ে যায়। তাদের পরামর্শ বা নির্দেশ ছাড়া স্থানীয় সরকারের কেউ কাজ করতে পারে না। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। স্থানীয় সংসদ-সদস্যদের হাত থেকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে বের করে আনতে হবে। সংসদ-সদস্যদের ক্ষমতা শুধু সংসদ কেন্দ্রিক হতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন বলেন বা বিভিন্ন আধিপত্য বিস্তার বলেন বা প্রভাব বিস্তার বলেন, এগুলোর ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা খর্ব করতে হবে। তা না হলে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যে অরাজকতা আছে এগুলো নিরসন করা মুশকিল হয়ে যাবে। কোনো সংসদ-সদস্য, তিনি দল থেকে নির্বাচিত হবেন বা দলের মনোনয়ন নিয়ে হবেন কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর দলের মূল পদ, যেমন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক পদে থাকতে পারবেন না। তিনি দলের সদস্য হিসেবে বা কমিটির সদস্য হিসেবে থাকতে পারবেন, মূল পদে নয়। ব্যক্তি সম্পদের রাশ টেনে ধরা, অধিকতর মুনাফা অর্জন এবং সম্পদ কুক্ষিগত করার ক্ষেত্রে তাদের রাশ টেনে ধরার জন্য সংবিধানে কিছু ব্যবস্থা রাখা উচিত। এ পর্যন্তই বললাম। আমি আসলে সময় পাইনি। আমার কাছে যতটুকু মনে হয়েছে, আমি বলতে পারলাম। আমি লিখিত আকারে হয়ত বিস্তারিত জানাতে পারব।

আমাকে এখানে এসে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির। আপনার বক্তব্যগুলো যদি পরে আমাদের লিখিতভাবে দেন তাহলে অনেক উপকার হবে। তবে এটি রেকর্ড হয়েছে। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে নিঃসন্দেহে আপনার বিস্তারিত বলার সুযোগ হয়নি। আমাদের সহযোগিতা করার জন্য যদি আপনারা লিখে জমা দেন, ড্যাবের পক্ষ থেকে বা আপনার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সহায়ক হবে। আপনার প্রস্তাবে কিছু সুনির্দিষ্ট দিক আছে। আমরা ২/১টি বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য আবার আসব। আমরা এখন শুনব ডা. মোঃ হারুন রশিদ, সদস্য, ডক্টরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ(ডিপিপিএইচ)।

ডা. মোঃ হারুন রশিদ (সদস্য, ডক্টরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ(ডিপিপিএইচ): আজকের সভার সভাপতি, অন্যান্য সদস্য ও সুধীবৃন্দ, শুরুতেই আমাদের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে যে সমস্ত বন্ধুরা শহিদ হয়েছেন তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই। এ প্রসঙ্গে আমি যে কথাটি বলতে চাই, এখানে হয়ত আমরা গুটিকয়েক চিকিৎসক উপস্থিত আছি, কিন্তু জুলাই গণঅভ্যুত্থানে চিকিৎসা পেশায় যে ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে, আমি তাদেরও একজন প্রতিনিধি। উদাহরণ স্বরূপ আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে, জুনের ১৪ তারিখে যখন একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে একদল গুন্ডারা গিয়ে শাহবাগ দখল করে ফেলে তখন থেকেই ২ আগস্ট পর্যন্ত এ সময়টাতে আমরা শাহবাগে যেতে পারতাম না। তখন কিন্তু এই একই সময় সায়েন্স ল্যাবরেটরি সবসময় একদল আন্দোলনকারীদের দখলে ছিল। এই সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে ছিল ঢাকা কলেজের ছাত্ররা, ইডেন কলেজের ছাত্রীরা, আইডিয়াল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। এর সাথে সাথে ছিল আনোয়ার খান মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা, গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজের ছাত্র এবং পপুলার মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। এটি ছিল সাংগঠনিকভাবে। এর বাইরেও চিকিৎসক, চিকিৎসা কর্মীরা সারাদেশেই ছিল। সেজন্য আমি তাদের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের সামনে কথা বলছি। আমি জানি না, আমি কতটা তাদের যে আকাঙ্ক্ষা তা তুলে ধরতে পারব। বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি যেটি আশা করি সেটি হলো দেশের জনগণের চিকিৎসা পাওয়ার যে অধিকার, সেটি অধিকার হিসেবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার। কিন্তু আমাদের সংবিধানে এটি লিপিবদ্ধ নেই। অধিকার হিসেবে লিপিবদ্ধ নেই। এটি হওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে মূল যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করছি, যে কথাটি আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, সেটি ধরেই আমি কথা বলছি। সংবিধানের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা এর যা কিছুই করা হোক কিংবা অধ্যাদেশের মাধ্যমেও যদি এর কিছু পরিবর্তন করতে হয় তাহলে সেটির একটি মৌলিক যে বিষয় আছে, সেটি হলো যে এটির পরিবর্তন, পরিবর্ধনের অধিকার constituent assembly এর কাছে রয়েছে। আমরা নাগরিক হিসেবে আমরা মতামত পোষণ করতে পারি, কিন্তু বিষয়টি তাদের হাতে। এই সংবিধান যখন প্রণয়ন করা হয়, তখনও কিন্তু একটি ঘাটতি থেকে গেছে। সেটি হলো, জনগণের মতামত নেওয়ার যে বিষয়টি এই সংবিধান যখন গৃহীত হয় তখন গণভোট বা অন্য কোনোভাবেই এই সংবিধান গৃহীত হয়নি। সেদিক থেকে একটি ঘাটতি থেকে গেছে।

অতএব, আমি যে কথা বলতে চাই, আমরা যেন কোনোভাবেই কোনো অধ্যাদেশ বা একক কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছার বশবর্তি হয়ে সংবিধান পরিবর্তন করতে না যাই। সংবিধান পরিবর্তনের বিষয়ে আমি একজন চিকিৎসক এ বিষয়ে আমি আপনাদের চেয়ে অনেক কম বুঝি। আপনারা আমার চেয়ে অনেক বেশি বুঝেন। তারপরও দুএকটি বিষয় যেটুকু আমরা বুঝি জনগণ তার অভিপ্রায়ের মাধ্যমে সংবিধান

পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারে। তারও কতগুলো উদাহরণ আমাদের মাঝে আছে। সেটি হলো, ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে যখন টেনিস কোর্টে একটি ঘোষণা দেওয়া হয় তার মাধ্যমে এর অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিল। অনুরূপভাবে যখন রুশ বিপ্লব হয়, তখনও জনগণ তাদের মতো করে তাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন। আমরা যখন আন্দোলন করেছি, তখন কিন্তু এই সংবিধান পরিবর্তন বা পরিবর্তনের বিষয়ে কোনো মৌলিক ঘোষণা দেইনি। এটি কিন্তু এ সংবিধানের বড় ত্রুটি থেকে গেছে।

এখন চিকিৎসা সংক্রান্ত যে কথা আমি বলতে চাই, সেটি হলো চিকিৎসাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। এটি শুধু কাগুজে বিষয় থাকলে চলবে না। এটিকে যেদিকে নিতে হবে, সেটি প্রায়োগিক দিকে যেন যায়। এই যে জনগণের যে চিকিৎসা সেবা পাওয়ার অধিকার, এটি নিশ্চিত করতে হবে। নিশ্চিত করতে গেলে যে পর্যাই আপনি এই চিকিৎসাটা প্রদান করবেন, অর্থাৎ delivery labelটা যেখানে থাকবে সেখানে এটি অবশ্যই বিনা পয়সায় হতে হবে। সেখানে পয়সা কে দেবে রাষ্ট্র দেবে কি না বা তার কাছ থেকে ট্যাক্স কেটে দেবে কি না সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। এমনকি ডাক্তার সাহেবের চেম্বারেও যদি হয়ে থাকে সেটির টাকাটাও রাষ্ট্রের বহন করতে হবে। এটি কোনোভাবেই ব্যক্তি প্রদান করলে তার চিকিৎসা নিশ্চিত করা যাবে না। এর সাথে কর ব্যবস্থারও একটি সম্পর্ক রয়ে গেছে। এখানেও কর সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা আছে। করের বিষয়ে এখানে কথা বলতে চাই, যেটি এখানে যুক্ত। সেটি হলো আমরা এখানে যারা বসে আছি আমরা যদি একটি ম্যাচের স্টিক কিনতে চাই, ম্যাচ বাক্স কিনতে যাই তাহলেও কিন্তু আমাকে পরোক্ষ করা দিতে হয়। আমাদের দেশে এবং বিভিন্ন দেশে আমাদের যে সম্পদ রয়ে গেছে, সম্পদের বেশির ভাগ রয়ে গেছে ৫ থেকে ১০% মানুষের কাছে। অথচ যে মানুষদের বেশি টাকা নেই তারাই বেশি কর দেয়। পরোক্ষ কর যেটি আছে এর মাধ্যমেই আমরা বেশি টাকা প্রদান করি। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যে কথাটি, যখন জনগণ যে চিকিৎসাটি পাবে, চিকিৎসাটি হতে হবে বিনা পয়সায় কিন্তু করের বিষয়টি হবে ভিন্ন, যাতে এটি সমন্বয় করা যায়। যারা অবস্থাসম্পন্ন মানুষ, তাদের কাছ থেকে যেন আমরা বেশি কর নিতে পারি। এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে। আমার বন্ধু একটি কথা বলেছেন, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের এখানে আপনারা যারা আছেন তারা দেখবেন, আমরা যারা ঢাকা শহরের বাইরে পড়াশুনা করেছি, মফস্বল শহরে সেখানে একটি স্কুল 'জেলা স্কুল' নামে এখনও আছে। ঐ স্কুলগুলোতে যখন আমরা পড়তাম, আপনি খেয়াল করে দেখবেন, ঐ স্কুলে ডিসি সাহেব বা এসপি সাহেবের ছেলেমেয়েরাও পড়ত। ফলে অটোমেটিকলি ঐ সমস্ত স্কুলসমূহ মানসম্পন্ন স্কুলে পরিণত হতো। আমাদের যে বন্ধুরা চিকিৎসা নিতে যায়, তারা যদি সরকারের কর্মকর্তা হয়, রাষ্ট্রপতি থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ের যদি থাকে, তারা যদি সরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করে তাহলে আমাদের সরকারি হাসপাতালের মান উন্নয়ন হতে বাধ্য। অতএব, এটি বাধ্যবাধকতার মধ্যেই করতে হবে। আমাদের পূর্বের একজন রাষ্ট্রপতি যখন কোনো সভা সমাবেশে যেতেন, তিনি রসিকতা করতেন। রসিকতাগুলো মজার ছিল, আমরা সবাই হাসতাম। আরেকটি কাজ তিনি করতেন, সেটি হলো প্রায়শই তিনি মেডিকেল চেক আপের জন্য দেশের বাইরে যেতেন। তিনি তাঁর সময়কালে সর্বশেষ সময়ও কিন্তু সিঙ্গাপুরে গিয়ে মেডিকেল চেকআপ করিয়েছেন। মেডিকেল চেকআপ কথাটি খুবই একটি undefined বিষয়। এটি করার জন্য আপনি রাষ্ট্রের টাকা খরচ করে আরেকটি দেশে যাবেন, এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এখানে চিকিৎসকদেরও দায়বদ্ধতা রয়ে গেছে। কী রকম? আমি দু একটি বিষয় বলতে চাই। আপনি যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকজনদের সাথে কথা বলেন, আপনি যে ডাক্তার সাহেবের কাছে গেলেন, ডাক্তার সাহেব কীরকম ব্যবহার করেছেন। সোজা যে কথাটি বলবে, সেটি হলো যে, ডাক্তার সাহেব আমার কথা শুনেন নাই। না শুনেই তার প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিয়েছে। এটি যে গ্রামে বা উপজেলা লেবেলে হয়, তা কিন্তু না। আমাদের প্রাইভেট হাসপাতালগুলো যেমন ইউনাইটেড এবং স্কয়ারের মতো হাসপাতালগুলোতেও যদি যান, সেখান থেকেই লোকেদের এই একই অভিযোগ থাকে। অতএব, এই জায়গাটা আমাদের মনে রাখা দরকার। এই জায়গাটি আমাদের মনে রাখা দরকার মেডিকেল সায়েন্স একটি pure science. কিন্তু আপনি চিকিৎসা বিষয়ে যখন রোগী এবং তার লোকজনের সাথে কথা বলেন, এটি একটি সমাজবিজ্ঞান। এটি যদি আমরা অর্জন করতে না পারি, তাহলে আমরা আমাদের জনগণকে খুশি করতে পারব না। খুশি না করার ফলে যে সংকটটা দাঁড়িয়ে যায়, গত অর্থবছরে আমাদের এখান থেকে চিকিৎসা নিতে ২৫ লক্ষ মানুষ দেশের বাইরে গিয়েছে। ২৫ লক্ষ মানুষ যদি বাইরে চিকিৎসা নিতে যায়, আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন, ঐ সমস্ত লোকদের বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাদের অনেকেই আমাদের প্রতি অখুশি হয়ে দেশের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এতে করে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হয়। চিকিৎসা শুধু যে curative চিকিৎসা এটি কিন্তু না, এর সাথে জনস্বাস্থ্যের আরও অনেকগুলো বিষয় যুক্ত আছে। ১৯৮৩ সালে রবার্ট মুগাবেকে ইউনেস্কোর একটি সভায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনি আপনার দেশের জনস্বাস্থ্যের জন্য কী কী কাজ করেছেন। তিনি বলেছেন আমি ৩টি কাজ করেছি। যথা; ১। safe drinking water, ২। nutritious food, ৩। proper disposal of excreta. আমাদের অভিজ্ঞতা কী বলে? আমাদের সামনে কিন্তু একটি বোতল হাজির হয়ে গেছে। এই বোতল হাজির হওয়ার মানে হলো আমরা কিন্তু জনগণকে বিশুদ্ধ পানি দিতে পারছি না। কিন্তু এখানে জনাব আলী রীয়াজ আছে, আমাদের মতো যারা বয়স্ক আছেন, তাদের অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে আছে, আমরা যখন কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, আমরা কিন্তু গ্লাস ধুয়ে সেই টেপের পানি পান করতাম। কিন্তু এখন আমরা নিজেরা না আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করে, আমরা ভয়ে থাকি সে টেপের পানি খায় কি

না? ওকে লাগলে আমরা এক জার পানি দিয়ে আসি। তার মানে বিশুদ্ধ খাবার পানি দিতে পারছি না। পুষ্টিকর খাবারের বিষয়তো বিরাট ব্যাপার, এটি নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। Excreta disposal সম্পর্কে আপনারা সকলেই জানেন, ঢাকা শহরে যদি আপনি ঘুরে বেড়ান, যদি হেঁটে বেড়ান, তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকেন আপনি আধা ঘণ্টা হাঁটলে অবশ্যই আপনার পায়ে দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা কিছু একটা লেগে যাবে। তার অর্থ এই তিনটি প্যারামিটারের কোথাও কিন্তু আমরা নেই। না থাকলে আমাদের স্বাস্থ্য সেবাটি ঠিকমতো থাকে না। চিকিৎসা প্রদানের আরেকটি বিষয় হলো, নারীর চিকিৎসার বিষয়। আপনি নারীদের সাথে কথা বলুন, নারীরা খুবই ক্ষুব্ধ থাকে। যখনই বলবেন, বলবে ডাক্তার সাহেবের কাছে গেলেই আমার পেট কেটে বাচ্চাটা বের করে নিয়ে আসে। In global contest, cesarean section that should not more than 10%. আমাদের এখানে গত বছর এটি হলো ৩০ শতাংশ। এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের ডাক্তার সাহেবরা অনেক কৈফিয়ত দেয়, কোনো কৈফিয়ত গ্রহণযোগা নয়। গ্লোবাল কনটেস্টে এটি ১০ শতাংশের বেশি কোন প্রকারেই হতে পারবে না। যে কোনো নারীদের সাথে কথা বলতে গেলেই তারা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। অতএব,স্বাস্থ্য সচেতনতার ব্যাপারে আমি আমার কথা বাড়াতে চাই না। আমি যেটি বলতে চাই, জনগণের চিকিৎসা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে। নিশ্চিত করার জন্য যা যা করার দরকার, সবকিছু করতে হবে।

এখন আসুন সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত কিছু কথাবার্তা বলতে চাই। একটু আগে আমার এক বন্ধু বলে গেলেন, প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকতে হবে। ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কথা বলেছেন। আমি স্পষ্ট যে কথাটি বলতে চাই, আমরা এখন যে ব্যবস্থার মধ্যে আছি, সেটি হলো ব্রিটিশ ধরনের, ex ministerial বা পার্লামেন্টারি সিস্টেমের মধ্যে আছি। সেখানে অবশ্য অবশ্যই ক্ষমতাটি থাকবে প্রধানমন্ত্রীর। রাজা কিংবা রাষ্ট্রপতি basically statutory head হিসেবেই থাকবে। তাহলে আমরা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাটিকে কীভাবে রাশ টানতে পারি। হিসাবটি খুব সোজা। অনুচ্ছেদ ৭০ কোনো রকম রাখঢাক করে না, out and out. বাতিল করে দেন। পৃথিবীর বহু দেশে ভারত বলেন, পাকিস্তান বলেন, ব্রিটেন বলেন সর্বত্র নির্বাচিত হন, ২ বছরের মাথায় ঐ সরকারের পতন হয়ে যায়। কারণ যেই সরকার নির্বাচিত হয়েছে সেই দলের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তারা ভোট দেয়। ফলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অনুচ্ছেদ ৭০ কোনো রকম রাখঢাক না করে এটিকে বাতিল করতে হবে। এটি রাখার কোনো অবকাশ আছে আমি তা মনে করি না। নাগরিকের প্রেসিডেন্ট বা কোনো কিছু হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত থাকে না। তাহলে নাগরিকের সাম্য বিনষ্ট হয়। এটি হতে পারে না। এছাড়া আমাদের সংবিধানে অনেকগুলো বিষয় আছে, যেমন কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল, তারপর বিচার বিভাগ, এরকম প্রত্যেকটি জায়গায় এরকম কথাবার্তা আছে। এখানে প্রফেসর আলী রীয়াজ ইউএসএ তে থাকেন। ইউএসএ-এর যে সংবিধান সেটি মাত্র ৮০ বাক্যে লেখা। আর আমাদের সংবিধান বিশাল একটি বই। এটি হতে পারে না। এত বড় একটি বই যদি আপনি যে কাউকে দেন, সে পড়তে পারবে না। পড়ার ক্ষমতাটাই সে লস করবে। তাহলে সংবিধান হতে হবে ছোট, স্বচ্ছ, flexible. Rigid সংবিধান না। You go to UK. সেখানে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন, Magna carta মতো অল্প কয়েকটি লিখিত বিষয় রয়েছে। বাকিটা তাদের conventional অনুসারে থাকে। তাহলে সেটি যদি ভালো সংবিধান গুড কনস্টিটিউশন হয়, ভালো সরকার ব্যবস্থা হয় তাহলে আমাদের দেশে এত Rigid and elaborate সংবিধান থাকার কোনো রকম বাধ্যবাধকতা আছে, আমি সেটি মনে করি না।

আমাদের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বলেন। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয়ে আমি প্রথমেই যে কথাটি বলতে চাই, সেটি হলো বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতিতে গলদ রয়ে গেছে। কারা নিয়োগ করে তাদেরকে। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি তাঁদের নিয়োগদান করেন। এখানেই আপনার গলদ রয়ে গেছে। আপনি যদি ইউএসএ-তে খেয়াল করে দেখেন, সেখানে ফেডারেল কোর্টের যারা বিচারপতি হন, কংগ্রেসে কিন্তু তাদের অনুমতি নিতে হয়। আমাদের এখানে যারা বিচারপতি নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তারা সংসদের কোনোরকম অনুমোদন নেন না। অনুমোদন না নেওয়ার ফলে যেটি হয়, আমরা জানি, আমাদের পূর্বের উদাহরণ আছে, এস. কে সিনহা নামে আমাদের একজন প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রের র্কুধারদের যখন বিরাগভাজন হন, তখন তাঁকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে এবং তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। ফলে আমাদের পার্লামেন্টে যদি এটি পাস করিয়ে নেন, তাহলে প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা থাকবে না বিচারপতিকে ঐ জায়গা থেকে অপসারণ করার। তা যদি করতে পারেন, তাহলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারবেন। অন্য কোনোভাবে নিশ্চিত করতে পারবেন না। আমাদের সংবিধানে দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পর্কে একটি বিষয় আছে। এই বিষয়ে আমি সুস্পষ্ট কথা বলতে চাই। দ্বৈত নাগরিকদের পার্লামেন্টে দাঁড়াবার যেহেতু ক্ষমতা নেই, অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডেও দ্বৈত নাগরিকদের এই ক্ষমতাটা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি না। আমাদের সংবিধানে আরও কতগুলো বিষয় আছে, বিচারপতি নিয়োগ প্রদান করা হয়। দশের বয়স ৫৩ বছর হয়ে গেল, বিচারপতিরা যখন বিচারালয়ে কথা বলে, তখন ইংরেজি কথা বলেন এবং 'My lord' বলেন। আমি বলছি, 'My lord' বলাটা এটি একটি ঔপনিবেশিক চিন্তার একটি ফসল। যদি কোনো বিচারপতি ইংরেজি লিখে বাংলায় লিখতে না পারেন, বাংলায় যদি তিনি রায় প্রদান করতে না পারেন, আমার মনে হয় তাঁর ঐ পদে থাকার কোনো যোগ্যতা থাকে না।

আমি আমার কথা শেষ করে ফেলতে চাই, যে জিনিসটা বলে আমি শেষ করতে চাই, সেটি হলো আমার শিক্ষার বিষয়ে। আমাদের শিক্ষায় অদ্ভুত সব বিষয় রয়ে গেছে। আমাদের গরীব মানুষের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার কোনো দায়ভার আমরা নিতে চাই না। নিতে না চাইলে একজন রিকশাওয়ালা ছেলে কোথায় যাবে? সে মাদ্রাসায় যাবে। কারণ হলো রিক্সাওয়ালাকে আমরা তুমি বলি, রিক্সাওয়ালাকে কেউ সালাম দেয় না। রিকশাওয়ালার ছেলে যখন মাদ্রাসায় পড়ে, কয়দিন পর যখন একটি টুপি মাথায় দিয়ে আসে, সবাই তাকে সালাম দেন। তাহলে কেন সে মাদ্রাসায় পড়াবে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রের নাগরিকের শিক্ষার দায়িত্ব যদি না নেওয়া হয়, তাহলে শিক্ষার এই বৈষম্যগুলো দূর হবে না। একইভাবে আমাদের কিণ্ডার গার্টেন বা ইংরেজি মাধ্যমে নাগরিকদের একটি বিশেষ অংশ পড়ছে। শুধু এমন না যে বিদেশি নাগরিকরা আমাদের এখানে পড়ছে, তাদের সন্তানদের পড়াচ্ছেন তা না, আমাদের সন্তানদের পড়াচ্ছেন। কারণটা কী? শিক্ষার বিষয়েও যে কারণগুলো রয়েছে সে বিষয়ে আমাদের কথা বলা দরকার। কারণ এই সেন্সে শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য নয়। জাপানিরা কিন্তু বিদেশি ভাষা শিখে না। আমাদের এখানে কিণ্ডার গার্টেনেই কেন ইংরেজি শিখতে হবে, এটি হতে পারে না।

সর্বশেষ আমি যে কথা বলে শেষ করতে চাই, সেটি হলো আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে। নির্বাচন সংবিধানের বা গণতন্ত্রের সমস্ত বিষয় না। কিন্তু নির্বাচনটিই যদি আমি করতে না পারি, তাহলে কীভাবে হবে? আমারতো একটি ন্যাশনাল আইডি আছে, আমার ব্যাংকে একটি একাউন্ট আছে, আমার একাউন্ট থেকে কেউতো টাকা নিতে পারে না। আমার ন্যাশনাল আইডি ছাড়া কোনো কিছুই পারে না। তাহলে আমার ভোটটা কীভাবে অন্য কেউ দিয়ে দেয়? এটির একটু ব্যাখ্যা দিতে হবে। কিভাবে অন্য কেউ ৫৩টি ভোট দেয়, তার মধ্যে আমার ভোটটাও থাকে। এটির একটি বিষয় থাকতে হবে। অর্থাৎ আমার ভোট যাতে আমি দিতে পারি, সেটি নিশ্চিত করার বিধান থাকতে হবে। ইউএসএ-এর কথা আমরা বলি। তাদের সেখানেতো প্রায় ৭ কোটি লোক অগ্রিম ভোট দিয়ে ফেলেছে। আমার বয়সতো ৬৬ হয়ে গেছে, তাহলে আমার মতো বয়সী লোকজনদের একটু বাড়িতে ভোট দিতে দেন। তাহলে যে কেউ মনে করবে যে বা একজন নারী মনে করতে পারে যে, আমাকে ভোট দিতে গেলে লোকেরা ধাক্কা মারে, না কি করে, তার চেয়ে আমাকে অগ্রিম ভোট দিতে দেন। তাহলে আমি ভোট দিতে পারব। অর্থাৎ টোটাল ব্যাপারটি, ব্যালটের ব্যাপারটি, এখানে দেখবেন যে, ইউএসএ- এর ইলেকশনের কিন্তু কতগুলো বিধান আছে, আপনার ইলেক্ট্রনিক্স ভোটের সাথে সাথে ব্যালটের ভোটও আছে। কারণ হলো, কোনো কারণে যদি ইলেকট্রিক মেশিনে কোনো ঝামেলা হয়, তাহলে ভোটটি যেন কাউন্ট করা যায়। ভোট সব কিছু না। কিন্তু ভোটই যদি না থাকে, ২০১৪ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৩ বার যে তামাসা হলো, এই তামাসার মধ্যে আর যা থাকুক, গণতন্ত্র ছিল না। কারণ আমি মনে করি, সংবিধানের প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত গণতন্ত্র।

সকলকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, ডা. মোঃ হারুন রশিদ। আমরা আশা করছি যে, এই বিষয়গুলো লিখিতভাবে ২০ তারিখের মধ্যে আমাদেরকে দিবেন সম্ভব হলে। আর কিছু প্রশ্ন ব্যাখ্যার জন্য আমরা আসব। এখন আমরা শুনব জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজের কাছ থেকে।

জনাব হাসান হাফিজ (সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব): আস্‌সালামু আলাইকুম।

আপনাদের ওপর অসম্ভব কঠিন একটি দায়িত্ব পড়েছে। এত কম সময়ের মধ্যে কী করতে পারবেন সেটি নিয়েও আমি সন্দিহান। আরও বিতর্ক এসেছে যে, আপনাদের এখতিয়ার আছে কি না? রাজনৈতিক দলগুলো বলছে যে, সংবিধান সংশোধন করব আমরা। যাই হোক, এখন যে রকম একটি ছাত্র জনতার সর্বব্যাপী যে অভ্যুত্থান হয়েছে, আমি এটিকে বিপ্লবই বলি। কারণ প্রথাগত বিপল্পের সংজ্ঞাটা বদলানোরও দরকার আছে। আমরা এক সময় এনালগ ছিলাম, এখন ডিজিটাল হয়েছি। যে দানবীয় স্বৈরাচারকে আমরা হটাতে পেরেছি, লক্ষ লক্ষ মানুষ যেমন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছে, বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছে সেটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। আমি মনে করি, পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। কিন্তু সেটিকে সংহত করার জন্য, sustain করার জন্য আমাদের যে রকম effort দরকার, সেটির leak আমরা দেখতে পাচ্ছি। নানান ধরনের চক্রান্ত আছে। দেশে আছে, বিদেশে আছে। মিডিয়াতে আছে, বিদেশি মিডিয়াতে আছে। চারদিকে ব্যাপক ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এটিকে নস্যাৎ করার জন্য, ধূলিস্যাৎ করার জন্য কাজ করতে হবে। এটিকে মাথায় রেখে সতর্কভাবে কাজ করতে হবে। এরকম সুযোগ হয়ত ৫০ বছরে, ১০০ বছরে আর পাব না। আমার সুযোগ হয়েছে, সামরিক গোয়েন্দাদের সাথে কথা বলার, বিভিন্ন উপদেষ্টারে সাথে interaction করার। এমনকি প্রধান উপদেষ্টার সাথেও আমার কথা হয়েছে, সেখানে বার বার আমি বলেছি যে, একজন মাহাথির মোহাম্মদ আমাদের দরকার। মাহাথির মোহাম্মদ মারা গেছেন। একজন লি কোয়ান ইউ এর দরকার। বাংলাদেশকে একটি সম্ভাবনাময় দেশে আমরা পরিণত করতে পারি। যাই হোক, আমি পয়েন্টে চলে আসি।

সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আপনাদেরকে আরও পরিশ্রম করতে হবে, আরও স্টেক হোল্ডারদের সাথে কথা বলতে হবে। সম্ভব হলে ঢাকার বাইরে, বিভাগীয় শহরে যদি একটি interaction করতে পারেন, আপনাদের উপকার হবে। আপনাদের

ওপর একটি হারকিউলিয়ান কাজ দেওয়া হয়েছে। এটি সম্পন্ন করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। বার বার বলা হচ্ছে যে, যৌক্তিক সময়ের কথা। রাজনৈতিক দলগুলো অস্থির হয়ে পড়েছে নির্বাচনের জন্য। ক্রমাগত চাপ ঘনীভূত হচ্ছে একটি অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে। ২৪ জন উপদেষ্টার হাতে আলাদিনের প্রদীপ নেই যে, তারা রাতারাতি একটি কিছু বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলতে পারবে। আমাদের সেই সহিষ্ণুতা নেই, ধৈর্য নেই। আমরা যে ১৮ কোটি মানুষ, নাগরিকরাও কিন্তু আমাদের দায়িত্বটি পালন করছি না।

যাই হোক, "সংবিধানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" বলা হচ্ছে। এটি নিয়ে অনেকের আপত্তি আছে। 'প্রজা' কেন থাকবে? প্রজা থাকলে একটা রাজার ব্যাপার থাকে। মানুষের রক্তের মধ্যে একটি দাসত্ব আছে। তথাকথিত উন্নত রাষ্ট্রেও কিন্তু রাজা বা রাণীকে একটি স্তুতি করতে চায়। অর্থাৎ একটি দাসত্ব হয়ে হয় মানুষের রক্তের মধ্যে আছে। ফলে এটি লেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। ফলে এটি একটু চিন্তা করবেন। আমি একটি অনুরোধ করব যে, আমাদের রেমিটেন্স যোদ্ধারা, প্রবাসী ভাইয়েরা আমাদের অর্থনীতিকে সচল রাখছেন। আমাদের প্রধান দুটি খাত, একটি হলো প্রবাসী রেমিটেন্স আরেকটি হলো গার্মেন্টস। আমি মনে করি, আমি শক্তভাবে মনে করি যে, প্রবাসীরা আমাদের চেয়ে বেশি দেশপ্রেমিক। সংসদে এবং মন্ত্রীসভায় তাদের যেন একটি প্রতিনিধিত্ব থাকে। হোক একটি কোটা। প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তারা একটা বিপুল সংখ্যক মানুষ, তারা দেশকে ভালোবাসে। নিজের জীবন বিপন্ন করে তারা নিজেদের উপার্জনটিকে, রক্তের মূল্যে অর্জিত যে সম্পদ, সেটিকে তারা দেশে পাঠায়। কিন্তু তারা দেশে এসে নিগৃহীত হয়, লাঞ্ছিত হয়। খুনের শিকার পর্যন্ত হয়। আমরা এতই বর্বর একটি জাতি। সেটি আপনারা একটু গুরুত্বের সাথে নিবেন।

আর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে আপনারা একটি interaction যদি করতে পারেন, ভালো হয়। কারণ তারা নিজেদেরকে অবহেলিত মনে করে। সংখ্যালঘু কার্ডওতো এখানে খেলা হচ্ছে। নানা ধরনের ব্যাপার। আপনারা সংবিধানের মধ্য থেকে সেটি কতখানি করতে পারবেন, জানি না। আর ক্ষমতার ভারসাম্যের কথা যেটি উঠেছে, সেটি কিন্তু খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে যতটা পারা যায়। আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রপতির কাজতো এখন কবর জিয়ারত করা ছাড়া আর কোনোটিই নেই আসলে। সেটির যেন একটি ভারসাম্য হয়। কেউ যেন একক কর্তৃত্বে দানব হয়ে উঠতে না পারে। সেরকম একটি পদ্ধতি সংবিধানে করতে হবে। সংবিধানতো একটি কাগজ। মানুষের বোধের যদি পরিবর্তন না করা যায়, ভিতর থেকে যদি চেঞ্জ না করা যায়, তাহলে হাজার হাজার কোটি কোটি পাতা সংবিধান লিখেও, হাজার হাজার সংস্কার করেও কোনো লাভ হবে না। মানুষ যদি নিজেদের মধ্যে সংস্কারটা না করে, তার বোধের উন্নয়ন যদি না হয়, তার আত্মউদ্বোধন না হয়, আত্মশক্তির উদ্বোধন না হয়, তাহলে তো হবে না। আমি চেষ্টা করব, আমি ততটা স্টাডি করে আসতে পারিনি এতটা কম সময়ের মধ্যে। চেষ্টা করব ২০ তারিখের মধ্যে লিখিত কিছু দেওয়ার জন্য।

আরেকটি কথা আমি বলতে চাই, সেটি হলো ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক করা যায় কি না। সেটি আপনারা চিন্তা করবেন। সেটি আপনারা বলতে পারেন, আমাদের এত ঘনবহুল জনঘনত্বের দেশ, সেটি সম্ভব কি না? অবশ্যই সম্ভব। আমরা ন্যাশনাল আইডি করেছি না। স্মার্ট কার্ড আমরা করেছি না। এটি সম্ভব। দরকার হলে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সহায়তা নেবেন। ভোটাধিকার বাধ্যতামূলক, ভোট প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে। বহু দেশে এটি আছে। ভোট না দিলে জরিমানা হয়। সেটির দরকার আছে। আমার ভোট আমি দিব, অর্থাৎ যাকে আমি পছন্দ করি, তাকে আমি দিব। কয়েক বছর যদি এরকম নির্বাচন হয়, তাহলে হয়ত একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক দেশ আমরা পেতে পারি।

সংসদকে "মহান সংসদ" বলা হয়। লুই আই কানের একটি অসাধারণ স্থাপত্যকীর্তি। বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর ২০টি অন্যতম স্থাপত্যকীর্তির অন্যতম একটি এই 'সংসদ ভবন'। বহু দেশের স্থপতিরা এখানে আসে এটি দেখতে। এটি সত্যিকার অর্থে একটি গণতন্ত্রের পীঠস্থান হয়ে উঠুক। এই প্রত্যাশা, স্বপ্ন এবং অঙ্গীকার যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমরা শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকব। আপনাদের সাফল্য কামনা করি। আপনাদের হাজারো ব্যস্ততার মধ্যে অমানুষিক পরিশ্রম আপনারা করছেন। আমাদের একাত্মতা থাকবে, অংশগ্রহণ থাকবে, যখনই মনে করবেন, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে আমরা আপনাদের পাশে থাকতে প্রস্তুত আছি।

আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, হাসান হাফিজ। আমরা আসলে ছোট ছোট আকারে যতদূর সম্ভব যত বেশি স্টেক হোল্ডারদের কাছে পৌঁছতে চাই। আমরা ছোট ছোট অধিবেশনগুলো করেছি যাতে আলাপ আলোচনা করতে সহজ হয়। অনেককে ডেকে একত্রে সকলের কথা শুনার চেয়ে আমাদের কাছে মনে হয়েছে ছোট আকারে ৩ জন বা ৪ জন হলে ভালো হয়। গত কয়েকদিন ধরে স্টেক হোল্ডার এবং সিভিল সোসাইটির ব্যক্তিদের সাথে কথা বলেছি। ঢাকার বাইরেও যতদূর সম্ভব পৌঁছানোর চেষ্টাটা আছে। আপনার এই পরামর্শগুলো খুব গুরুত্বের সাথে নিচ্ছি। এখন আগের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ২/৩টি প্রশ্ন। স্পষ্টীকরণের জন্য। যে সমস্ত নোট নিয়েছি তা থেকে উল্লেখ করি।

মি. কাদির আপনি একটি কথা বলেছিলেন যে, ২ বারের বেশি রাষ্ট্রীয় কোনো পদে থাকতে পারবেন না। এটি আপনি প্রস্তাব করেছেন। আমি কী ঠিক শুনেছি, আপনি জীবদ্দশায় বলেছেন? তার অর্থ পর পর ২ মেয়াদে যদি নির্বাচিত হন, তারপর আর কখনই আসতে পারবেন না?

ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির (সাংগঠনিক সম্পাদক, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)): একাদিক্রমে ২ বার, অথবা জীবদ্দশায় ২ বার।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): অর্থাৎ একাধিক্রমে যদি ২ বার হয়, আর আসতে পারবেন না? এটি আপনি বলেছেন, রাষ্ট্রীয় যে কোনো পদে।

ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির (সাংগঠনিক সম্পাদক, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)): রাষ্ট্রীয় এবং সরকারের মূল দায়িত্বে। যেমন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): একই কথা আপনি বলেছিলেন যে, ক্ষমতা স্থানীয় পর্যায়ে সীমিত করা এবং এমপিরা দলের মূল পদে অর্থাৎ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক পদে থাকতে পারবে না। এটি সকল এমপির জন্য আপনি প্রস্তাব করছেন?

ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির (সাংগঠনিক সম্পাদক, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)): জি।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক (কমিশন সদস্য): ধন্যবাদ। আমার ছোট একটি প্রশ্ন। স্পষ্টীকরণের জন্য জানতে চাচ্ছি। একটি প্রশ্ন করব, আপনার ২টি কথার ভিত্তিতে। আপনি বলেছেন, সংবিধানে বলে দেওয়া আছে যে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করতেই হবে। আপনি সেখানে প্রস্তাব দিয়েছেন পরামর্শটি বাধ্যতামূলক না করার জন্য।

ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির (সাংগঠনিক সম্পাদক, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)): পরামর্শ করবেন, তবে বাধ্যতামূলক নয়।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক (কমিশন সদস্য) ঃ আবার বলেছেন যে, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য চান। এই ২টি প্রস্তাব থেকে আমার যা মনে হয়েছে যে, সর্বময় ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে, এখান থেকে আপনি সরিয়ে আনতে চান এবং রাষ্ট্রপতিকে কিছুটা শক্তিশালী করতে চান। যেহেতু আপনি এটি বলেছেন, সেহেতু আপনার কাছে আমি পুনরায় একটি প্রশ্ন করতে চাই, রাষ্ট্রপতি এখন যে পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন, সংসদ-সদস্যদের মাধ্যমে, এটিই চান, নাকি সরাসরি কোনো ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হোক, চান। এ প্রশ্নটি আমি এজন্যই করছি, একটি স্পষ্টীকরণের জন্য, যেহেতু রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতাটা একটু বাড়াতে চাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা একটু কমাতে চাচ্ছেন, এরকম কোনো চিন্তা কি আছে যে রাষ্ট্রপতির mandateটি একটু সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে আসবে।

ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির (সাংগঠনিক সম্পাদক, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)): আমাদের মতো দেশে অর্থনৈতিক অবস্থাতো উন্নত বিশ্বের মতো না। বারবার যদি নির্বাচনে যান, সেটি ব্যাপক একটি অর্থনৈতিক involvement-এর বিষয়। আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে সংসদ-সদস্যদের সাথে অন্য কোনো নির্বাচনি প্রতিনিধি সংযুক্ত করা যায় কি না, সেটি চিন্তা ভাবনা করতে পারেন।

জনাব ফিরোজ আহমেদ (কমিশন সদস্য): অনেক ধন্যবাদ। আমি পরিষ্কার হওয়ার জন্য কয়েকটি বিষয় প্রশ্ন করে রাখছি। আপনারা চাইলে আজকে আলাপ করতে পারেন কিংবা লিখিত যখন দেবেন তখনও বিষয়গুলো আসতে পারে। একটি প্রশ্ন, আমরা যে কারণে আজকে এবং অন্যান্য সেশনে পেশাজীবীদের সাথে বা সংবিধান বিশেষজ্ঞের বাইরে অন্য কোনো বিশেষজ্ঞদের সাথে বসেছি একটি কারণে যে তারা যেন তাদের পেশার সংকটগুলো নিয়ে বলেন। একইসাথে সংবিধান নিয়েও তাদের মতামতটি দেন। দুটিই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন এখানে ৩জন চিকিৎসক আছেন। সব বিষয়তো আর সংবিধানে থাকবে না। তবে সারসংক্ষেপ আকারে ঐ আকাঙ্ক্ষাটার যেন সংবিধানে একটি প্রকাশ থাকে। এ কারণে আমরা চাইব যে, আপনারা বিস্তারিতভাবেই আপনাদের লিখিত বক্তব্যটি দেন। কারণ আমরা চেষ্টা করব একটি বড় আর্কাইভ করার জন্য যেখানে আপনাদের বক্তব্যগুলো, আকাঙ্ক্ষাগুলোর একটি প্রকাশ ভবিষ্যতের মানুষরাও যেন জানতে পারেন। সেখানে আমার একটি প্রশ্ন, উত্তর আপনার যে কেউ দিতে পারেন। ৪ জনের যে কেউ বলতে পারেন। একটি বিষয় হচ্ছে সরকারের মধ্যে ভারসাম্য। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে একটি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা। আরও কিন্তু অনেক ভারসাম্যের অভাব আমরা গত ৫৫ বছরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রেও দেখেছি এবং গত ১৫ বছরে এটি তীব্র আকার ধারণ করেছে যে আমলাতন্ত্রের একটি ব্যাপক প্রভাব। বিভিন্ন সময় সংবাদপত্রে দেখেছি যে, চিকিৎসকরা, শিক্ষকরা কিংবা কৃষিবিদরা তারা নানারকম সংকটে ভুগছেন এবং এই রাষ্ট্রের মধ্যে বা আইনের এখতিয়ারে মধ্যে তাদের অবস্থানটি কী, তাদের এখতিয়ারটি কী, শুধু ব্যক্তিগতভাবে পদোন্নতি না, পেশার বিকাশ কীভাবে ঘটবে, জনগণকে তারা কীভাবে সেবাটি দেবেন, এ বিষয়ে অনেক সংকট দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে করোনা মহামারির সময় বহু চিকিৎসক অভিযোগ করেছেন যে,

আমলাতান্ত্রিক সংকটের কারণে চিকিৎসায় ক্ষতি হয়েছে বা বহুক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে এবং অপচয়ও প্রচুর হয়েছে। এই বিষয়টিতে আসলে কীভাবে আমরা ভারসাম্য আনতে পারি, শুধু রাজনৈতিক জায়গাতে না, পেশাজীবীদের সাথে আমলাতন্ত্রের নানান সম্পর্কের জায়গাতেও। সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

আরেকটি বিষয়, গত কয়েক দশক, বাংলাদেশে হয়ত আগে কখনও ঘটেনি, কিন্তু গত কয়েক বছর আমরা দেখেছি যে যারা আন্দোলন করছেন তারা আহত হয়ে হাসপাতালে গেলে, চিকিৎসা পাননি বা বহু ক্ষেত্রে হাসপাতালকে হুকুম দেওয়া ছিল যে, তারা যেন চিকিৎসা না পান। হাসপাতাল থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনাও অনেকগুলো ঘটেছে। শুধু গত গণঅভ্যুত্থানের সময় না। ২০১৮ সালেও আমরা দেখেছি, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় কিংবা প্রথমবার কোটা আন্দোলনের সময়। এই বিষয়গুলো নিয়েও আপনারা কী ভাবছেন বা আপনাদের পেশাগত অনুভূতিটা কি এবং এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আসলে কী করা হলে, কী কী নিশ্চিত করা হলে চিকিৎসকের ওপর বা সংবাদকর্মীর ওপর এই যে অনৈতিক চাপ, সেটি থেকে জাতি রেহাই পেতে পারে। অন্তত একটি সাংবিধানিক guaranty আসতে পারে। এ বিষয়ে আপনারা এখনও বলতে পারেন, বা যা বললাম, লিখিতভাবে যখন দেবেন, তখন অবশ্যই আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরামর্শ আকারে ঠিক সংবিধানে তার প্রকাশটা কীরকম থাকতে পারে। কারণ যেটি বলছেন যে, সংবিধান বিরাট কোনো দলিল হবে না। সারসংক্ষেপ আকারে সেখানে থাকবে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষাটা যেন থাকে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আপনারা উত্তর দেওয়ার আগে একটু recognize করা দরকার, আমাদের সাথে ডা. ফয়জুল হাকিম যোগ দিয়েছেন, সহসভাপতি, ডক্টরস প্লাটফর্ম পর পিপলস হেলথ (ডিপিপিএইচ)। জনাব ফিরোজ আহমেদ যে প্রশ্নগুলো উত্থাপন আপনি চাইলে এগুলোরও উত্তর দিতে পারেন।

ডা. ফয়জুল হাকিম (সহসভাপতি, ডক্টরস প্লাটফর্ম পর পিপলস হেলথ (ডিপিপিএইচ): ধন্যবাদ। প্রথমেই আজকের এই সংবিধান সংস্কার কমিশনে আমাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি দেরিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।

জনাব ফিরোজ আহমেদ যে প্রশ্নটি করেছেন সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমার অবস্থানটি পরিষ্কার করতে চাই। যদিও আমি সংবিধান সংস্কার কমিশনের এই বৈঠকে উপস্থিত হয়েছি। আমরা মনে করি না যে, জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থান এই বিদ্যমান সংবিধান ধারণ করতে পারে। একটি নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান একমাত্র এই অভ্যুত্থানকে ধারণ করতে পারে। জুলাই অভ্যুত্থান এই বিদ্যমান সংবিধানকে নাকচ করে দিয়েছে। যদিও তাকে নানাভাবে এই গর্তের মধ্যে ঢোকানো হয়েছে। কেননা আপনারা জানেন যে, এই সংবিধানে কিন্তু জনগণের যে মৌলিক অধিকার, বিশেষ করে স্বাস্থ্যের, সেটি আইন দ্বারা কিন্তু স্বীকৃত নয়। এটি এমন একটি সংবিধান, যেটি এই ৫৩ বছরে একটি দানব তৈরি করেছে। একটি লুণ্ঠনজীবী, একটি দুর্নীতিবাদ, একটি সন্ত্রাসী এবং সমগ্র রাষ্ট্র এটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে, প্রশাসন, পুলিশ, সেনাবাহিনী সবাই। সেটি আমি প্রথমেই বলে নিতে চাই।

সংবিধানের মূলনীতির ক্ষেত্রেও যদি আমরা বলি, এমনকি এখানে আলোচনা হয়, ১০ই এপ্রিলের সংবিধানে স্বাধীনতার যে ঘোষণা, সেখানেও দেখা যাবে যে ইতিহাসের কতগুলো মিথ্যা উক্তি সেখানে সন্নিবেশিত রয়েছে। ফলে আমরা '৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের পর যেভাবে একটি সংবিধান হওয়ার কথা ছিল, একটি গণপরিষদ নির্বাচন, সেটিতো হয়ইনি, ইয়াহিয়া খানের অধীনে নির্বাচিত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ তাদেরকে গণপরিষদ হিসেবে নিয়ে আমাদের ৯ মাসের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম সেটিকে কার্যত অস্বীকার করা হয়েছে। এটি অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের যদি আজকের পরিস্থিতি দেখা যায়, সমগ্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটি একটি জবাবদিহিহীন অবস্থায় গেছে। যাই হোক এ সম্পর্কে এখানে আর বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না। আমাদের এই জনপদে এই অভ্যুত্থান এটি অতীতের সংগ্রাম ও ইতিহাসের সাথে যুক্ত। তারপরও এখানে সংবিধান সংস্কার কমিশনে এসেছি, আপনারা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যেটি বলব, জনাব ফিরোজ আহমেদ এখানে বলে গেলেন, আপনারা জানেন, মেডিকেল ইথিক্সের মধ্যে কথাই আছে যে, রোগী, তিনি যে ধর্মের, বর্ণের বা মতাদর্শেরই হোক না কেন, তাকে আমরা চিকিৎসা দিতে বাধ্য। চিন্তা করা যায়, সেখানে হাসপাতালে যাওয়ার পর চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। এটিতো চিন্তাই করা যায় না। এটি যে কত অমানবিক, বর্বরোচিত। এটি কেন হয়েছে এখানে। এটি হচ্ছে, দলীয়করণ, দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে। সমস্ত সমাজে। শুধু চিকিৎসকদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালে চলবে না। সকল ক্ষেত্রেই একটি জবাবদিহিহীনতা রয়েছে। ফলে একেক জনের বালিশের নিচে থেকে শতকোটি টাকা বেরুচ্ছে। তাদের যে জীবন সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের যে প্রজন্ম, তরুণরা এবারে যেভাবে জীবন দিয়েছে, সেই জীবন দেওয়াটাকে যদি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হয়, তাহলে নতুন সংবিধানের দিকে যেতে হবে। এখানে হয়ত একটি সংবিধান সংস্কার কমিশন করতে পারেন আপনারা, কিন্তু আরেকটি অভ্যুত্থানের জন্য আপনারা প্রস্তুতি নেন। নতুন সংবিধানের জন্য জনগণ নিশ্চয়ই ওঠে দাঁড়াবে। এটি হতে দেওয়া যায় না।

ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে প্রশ্ন, সেটি হচ্ছে আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন। মৌলিক পরিবর্তন। সেক্ষেত্রে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকবে আর এখানে একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হবে। এখানে আমলাতন্ত্র স্থায়ী আসন গেরে বসবে, তাদের কোনো জবাবদিহিতা নেই। একবার বিসিএস করে ঢুকলেন, সে জুডিশিয়ারিতে ঢুকুক বা প্রশাসনেই ঢুকুক, তাকে ধরাও যাবে না, ছোঁয়াও যাবে না। তাই না? এই যে পরিস্থিতি, এটিকে বদলাতে হবে। ফলে কীভাবে প্রশাসনকে জনগণের কাছে কৈফিয়তযুক্ত করা যায়, জবাবদিহিতে বাধ্য করা যায়, তাহলে তারা একটি পরিস্থিতির মধ্যে থাকবে। তারা বিত্ত-বৈভবে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না। জনগণের অধিকারকে তারা পদদলিত করবেন না। বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোতে আমি দেখেছি, আমি যখন কৃষক সংগঠনের কাজ করেছি, তখন দেখেছি যে উপজেলা পর্যায়ে কীভাবে সাধারণ মানুষকে অপমান করা হয়। চেয়ারে বসতেও দেওয়া হয় না। জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে, একটি লিখিত দিয়ে দেন। এরকম চিকিৎসকও দেখেছি। এটি সাধারণভাবেই আছে। কিছু ব্যতিক্রমতো থাকতেই পারে। এটি সমাজের প্রতিনিধিত্বটাই করে। তাদের সংস্কৃতিতে, আচরণে। বিশেষ করে গত ১৫ বছরে যা হয়েছে সে তো তুলনার বাইরে। আর চিকিৎসা ক্ষেত্রে, সেখানেতো অন্য কোনো মতই নেই। অন্য চিকিৎসক, যারা ভিন্ন মত করবে, সেটি নেই। আমাদের এখানে নির্বাচনী ব্যবস্থা, জাতীয় সংসদ উচ্ছেদ হয়ে গেছে। পেশাগত নির্বাচন উঠে গেছে। প্রেসক্লাবের কথা বলি, বিএমএ-এর কথা বলি। আগে যেটি ছিল, আমরা যখন ৯০ এর গণঅভ্যুত্থান করি, ছাত্রদের, সাংবাদিকদের, শিক্ষকদের, সংস্কৃতি কর্মীদের, শ্রমিক কর্মচারীদের, নারীদের, কৃষক ক্ষেতমজুরদের, আইনজীবীদের, প্রকৌশলীদের এই যে একটি শক্তি তৈরি হয়েছিল, দেখা যাবে যে অভ্যুত্থানের পরে যে সরকার গঠিত হলো সেটি অভ্যুত্থানের উপর দাঁড়িয়ে নেই। সেটি একটি আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে। যেটি এখনও হয়েছে। চিন্তা করে দেখেন, গত রাতে ৫ জন উপদেষ্টা গিয়েছেন পঙ্গু হাসপাতালে। আহতদের কাছে। আসল চেহারাতো চলে এসেছে মানুষের সামনে। কী দায়িত্বহীনতা চলছে এখানে। কী মনে করেছেন উপদেষ্টারা। আমিতো ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক আলোচনার জন্য গিয়েছি, প্রধান উপদেষ্টার সাথে আলোচনা শেষে একটি কথা বলে এসেছিলাম। যদি কিছু মনে না করেন, আপনাদের স্বাস্থ্য উপদেষ্টাকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করেন। অন্য কাউকে দায়িত্ব দেন। আজকে সকালে উঠে দেখলাম যে, ৫ জন উপদেষ্টা সেখানে হাজির হয়েছিলেন। রাস্তা বন্ধ কেন, দেশ বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের সন্তানদের জীবনের মূল্য যারা দিতে জানে না, তাদের কী অবস্থা আছে এখানে। একদিকে দিল্লীর ষড়যন্ত্র, একদিকে পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে এই অবস্থা। এভাবেতো চলতে পারে না। সুতরাং আপনারা সংবিধান সংস্কার কমিশন, আপনারা অনেকের মতামত শুনছেন, আমাদেরকেও ডেকেছেন, আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, এই গণঅভ্যুত্থানের যে আকাঙ্ক্ষা, এই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে কর্তৃত্ব তৈরি হয়েছে জনগণের, ছাত্র, শ্রমিক জনতার সেটিকে কীভাবে ধারণ করা যায়, সেটির জন্য নতুন সংবিধান সভার নির্বাচন বা গণপরিষদ নির্বাচন করা, একই সাথে এটি সংসদ হিসেবেও কাজ করতে পারে। নির্বাচন চাচ্ছে রাজনৈতিক দল, আপনি বলছেন অস্থির, অস্থির কেন? নির্বাচনতো হতেই হবে এখানে। একটি অনির্দিষ্টকাল এভাবে চলতে পারে না। একটি সময়সীমাতো নিশ্চয় ঘোষণা করতে হবে। শেষ বিচারে গিয়েতো রাজনৈতিক দলের উপরই দায়িত্বটি পড়ে। ফলে পেশাজীবীদের সংগঠন হিসেবে আমরা মনে করি যে, আমরাও এর বাইরে না। রাজনীতিটি শুধু রাজনৈতিক দলের হাতে ছেড়ে দেওয়াটা পেশাজীবী হিসেবে আমি মনে করি না, এটি ঠিক। এখানে রাজনৈতিক চিন্তাটাও করতে হবে। আমরা স্বাস্থ্যের চিন্তা করব, জনগণের স্বাস্থ্যের অধিকারের কথা বলব, রাজনীতির কথা বলব না, এটিতো রাজনৈতিকভাবে চিন্তা করলে হবে না। কোভিডের সময় আমরা দেখেছি এটি। কোভিডের সময় আমরা একটি প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, সবাই মিলে আমরা জনগণের পাশে দাড়াই। আমার মনে আছে, ১৯৭৪ সালে সম্ভবত তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেব বিদেশ থেকে ফিরেছিলেন, তাঁকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই যে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ চলছে আমরা কীভাবে মোকাবেলা করতে পারি। তিনি বললেন যে, আমাদের সরকারের পক্ষে এটি সম্ভব না। সকল বিরোধী দলকে নিয়ে আমরা এটি মোকাবেলা করতে চাই। পরের দিন শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর এক ঘণ্টা পরে তিনি পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করেছেন। এইতো আমাদের বাংলাদেশ। সুতরাং এই দেশের শাসক শ্রেণির ইতিহাসতো আমরা জানি। এই পার্লামেন্ট ভবনেইতো পাকিস্তান আমলে প্রাদেশিক পরিষদে ডেপুটি স্পীকারকে মেরে ফেলা হয়েছিল। সংঘর্ষ হয়েছিল এখানে, এটিতো এখানকার ইতিহাসে নেই। এখানকার রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনাই হয় না। ফলে এই যে শাসক শ্রেণি, বিশেষ করে গত ৫৩ বছরে গঠিত হয়েছে ঘুষ, দুর্নীতি, চোরাচালান- যা একটি দানব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা সেটি একটি কাজ। পেশাজীবীদেরর সংগঠনকেও জনগণের স্বাস্থ্য অধিকার হিসেবে যেহেতু স্বাস্থ্য নিয়ে সংগ্রামে আমরা যারা রয়েছি, আমরা মনে করি দলীয় রাজনীতির যে বিষাক্ত বৃত্ত আছে, বিশেষ করে শাসক শ্রেণির রাজনৈতিক দলগুলো, সেই বিষাক্ত বৃত্ত ভেঙে এখানে কীভাবে পেশাজীবী জনগণের বিশেষ করে স্বাস্থ্যের অধিকারটি এখানে প্রতিষ্ঠা করা যায়। আমাদের এখানেতো জনস্বাস্থ্য সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। গ্রামাঞ্চলে গেলে বুঝা যায়। ঢাকা শহরের হাসপাতালগুলোতে গেলে বুঝা যায়। মনে হয় বাজার বসেছে। হাজার হাজার রোগী। আরে একি! এখানে এত ক্যান্সারের রোগী কেন? এখানে এত কার্ডিয়াক রোগী কেন? খাদ্যে কি হচ্ছে এখানে? তারপর এন্টিবায়োটিকের রেজিসট্যান্ট তৈরি হয়েছে দুনিয়া জুরে, আমাদের দেশেও তৈরি হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা হয়েছে যে সেটিকে কীভাবে মোকাবেলা করা যায়। একজন প্রফেসর ড. হাসিনা তিনি করেছেন আমি বিবিসি তে বছর ২ আগে রিপোর্ট পেলাম। তারপর ফলো করলাম যে এ নিয়ে কোনো কাজ হচ্ছে

কি না? এ নিয়ে কোনো কাজ নেই। ফলে আমাদের দেশে অনেকেই রয়েছেন যারা জনগণের কথা চিন্তা করেন, জনগণের প্রতি দরদ যাদের আছে। তারা কীভাবে সামনে আসতে পারেন, জনগণের পাশে আসতে পারেন, সেই হিসেবে জনগণের দিকটা আমাদের বিবেচনা দরকার। শেষ করব এই বলে, যে সমস্যাটি আমার জন্য হয়েছে, এই বিদ্যমান সংবিধানের মধ্যে এই আলোচনাটা আমাকে করতে হয়েছে। ফলে বিষয়টি হলো, সেটি আপনারা কতটুকু মেরামত করতে পারবেন, সেটি আগামী দিনে বলা যাবে। বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলে পরিচয়।

ধন্যবাদ।

ডা. মোঃ হারুন রশিদ (সদস্য, ডক্টরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ(ডিপিপিএইচ)): জনাব ফিরোজ আহমেদ এর প্রশ্নের জবাবে আমি ২/১টি কথা বলতে চাচ্ছি। আমলাদের সাথে চিকিৎসকদের যে সমস্যাটি তৈরি হচ্ছে এটি সম্পর্কে আমি ২/১টি কথা বলতে পারি। সেটি হলো যে, চিকিৎসকদের প্রচলিত ব্যবস্থায় যে পদোন্নতি, বদলি এই জিনিসগুলো যদি চলে তাহলে সমস্যাটি থেকেই যাবে। বরং একটি স্বাধীন চিকিৎসা কমিশন গঠন করে তার মাধ্যমে যদি এটি করা যায় তাহলে মনে হয় বিষয়টির কিছুটা সমাধান সম্ভব হতে পারে। গ্রামাঞ্চলে আমাদের যে চিকিৎসকরা যান, তাদের যাই বেতন দেন না কেন, বিশেষ করে নারী চিকিৎসক, তাদের নিরাপত্তা যদি নিশ্চিত না করা যায় তাহলে তারা গ্রামাঞ্চলে থাকবে না। সেজন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আমলাতন্ত্রের বিষয়ে আমি একটি কথা বলতে চাই, সেটি হলো যে, বিগত সরকারের মন্ত্রী এমপিরা যখন কোনো জায়গায় যেতেন, তার সাথেতো শুধু রাজনীতিবিদেরা যেতেন না। ওবায়দুল কাদের যেতেন না। আমলারাও যেতেন। তাদের ছবিগুলো এখনও আছে। অথচ সেই আমলারা আছে এবং কয়েক দফা তাদের পদোন্নতি হয়ে গেছে। এই বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় নেওয়া উচিত। হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদান না করা বিষয়ে আমি একটি কথা বলতে চাই। সেটি হলো যখন এই আন্দোলনটি চলে, তখন কয়েকজন প্রায়ই আমাকে বলতেন, তারমধ্যে বেশি বলতেন তানজীম উদ্দিন খান, হুট করে আমাকে বলতেন, মুগদা মেডিকেল কলেজে কিন্তু ছেলেরা গেছে, তাদের চিকিৎসা দিচ্ছে না। তখন আমি সেখানকার পরিচালককে ফোন করে একদিন একটি গালি দিয়েছি, শুধু স্যার স্যার করে। আমি বললাম যে স্যার স্যার কর কেন? আগে লোকগুলোর চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। সে আওয়ামী লীগ না বিএনপি সেটি দেখা কি তোমার কাজ? চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। ফলে আমি মনে করি, যারা এটি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করা দরকার, কেন তারা জনগণকে চিকিৎসা প্রদান করেনি।

সর্বশেষ যে কথাটি বলে আমি শেষ করতে চাই, সেটি হলো, কালকে যে অনভিপ্রেত ঘটনাটি ঘটলো তার সূত্র ধরে। আমি এর আগে কয়েকবার হাসপাতালে গিয়েছি, পঙ্গু হাসপাতাল, চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটেও গিয়েছি। একটি তথ্য আমি জানিয়ে রাখি যদি কাজে লাগে। আজকে ১৪ নভেম্বর অরবিসের একটি হসপিটাল প্লেনে চট্টগ্রাম আসবে এবং তারা আগামী মাসের ২ তারিখ পর্যন্ত থাকবে। তারা আমাদের এখানে যাদের চোখে ইনজুরি হয়েছে তাদের চিকিৎসা প্রদান করবেন। এটি নিয়ে আমি সেখানকার পরিচালকের সাথেও কথা বলেছি। এটি অপারেশনে যাবে ১৭ তারিখে। আজকে নামবে, ১৭ তারিখে অপারেশনে যাবে। তারা আমাকে এ কথাও বলেছে, বাইরেও যদি কোনো রোগীর চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে তারা তা করতে পারে। এই প্লেনটা ল্যান্ড করেছে চট্টগ্রামে। আমাদের ঢাকাতে নয়। তাদের নাকি সুবিধা চট্টগ্রামে। এখানে অনেকগুলো রোগী আছে চোখের, আমি তাদেরকে দেখেছি। এদেরকে যদি পাঠানো যায়, আমার মনে হয় কাজে লাগবে। আমি পরিচালকের সাথে কথা বলেছি, লাগলে আবারও বলব। পঙ্গু হাসপাতালের যে ঘটনা, সেটিও দুঃখজনক। সেখানেও আমি কয়েকবার গিয়েছি। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক যে ঘটনাটি ঘটেছে, একজন রোগীকে তারা জোর করে ডিস্চার্জ করেছিল। কেন? যে তোদের কে আন্দোলন করতে বলেছে? তারপর আমি গিয়ে ঐ চিকিৎসককে খুঁজেছি, পাইনি। পরে আমি ডাইরেক্টরকে বলে এসেছি যে এই ঘটনাটি তুমি চিহ্নিত কর। কোন্ চিকিৎসক যিনি ৫ তারিখের পরেও এই চিকিৎসাটি বাঁধাগ্রস্ত করছে।

সকলকে ধন্যবাদ।

জনাব আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। জনাব মুসতাইন আপনার একটি প্রশ্ন ছিল।

জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ (কমিশন সদস্য): স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে আপনাদের প্রস্তাবনাগুলো একটু বুঝার জন্য। স্বাস্থ্যকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আপনারা প্রস্তাব দিয়েছেন। একই সাথে আপনি বলেছেন যে, চিকিৎসার ব্যয় সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র দ্বারা নির্বাহ করতে হবে বা রাষ্ট্র পেমেন্ট সিস্টেমের দায়িত্ব নেবে। চিকিৎসার একদম সামগ্রিক ব্যয় নির্বাহ করাটিকে আপনি বুঝাচ্ছেন নাকি এর কোনো স্তর থাকবে বা কতটুকু পর্যন্ত রাষ্ট্রের দায় থাকবে বা কতটুকু পর্যন্ত আপনি ভাবছেন, এর বিস্তারিত কি আপনি বলতে পারেন? আর সংবিধানের যে সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল, সহজবোধ্য ভাষার কথা বলেছেন, সেখানে আমার একটু দ্বিধা তৈরি হয়েছে। আপনি rigid শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আপনি কি rigidটি চাচ্ছেন নাকি চাচ্ছেন না। আর যদি চান সেটি আসলে কেন?

ডা. মোঃ হারুন রশিদ (সদস্য, ডক্টরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ(ডিপিপিএইচ): আমার পরিষ্কার কথা, জনগণকে বিনা পয়সায় চিরকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। এর মাঝামাঝি কোনো কথা নেই। আমাদের প্রাইমারি হেলথ কেয়ারটি যদি কাভার করা যায়, ৭০%

চিকিৎসা কিন্তু চলে আসে। প্রাইমারি হেলথ কেয়ারটি প্রদান করা হয় উপজেলা, কমিউনিটি ক্লিনিক, জেলা হাসপাতাল এই পর্যন্ত। আমাদের বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রায় ৭০% চিকিৎসা নিশ্চিত করা যায়। বিশেষায়িত হাসপাতালের ব্যবস্থা যেটি থাকছে, সেখানে যাদের চিকিৎসা দেয়া হবে, সেখানে আমি প্রথমেই কর ব্যবস্থাপনার কথা বলেছি। ব্যয়বহুল চিকিৎসা, যেমন- ক্যান্সারের চিকিৎসা, কিডনির চিকিৎসা, এগুলো ব্যয়বহুল চিকিৎসা। আপনার টাকা নেই আপনাকে বিনা পয়সায় আমরা চিকিৎসাটি দেব, জনাব আলী রীয়াজের অনেক টাকা, তার কাছ থেকে কর কেড়ে নিব। এটি হলো নিয়ম। কিন্তু চিকিৎসা নিশ্চিত করার দায় রাষ্ট্রের। আর rigid সংবিধানের কথা আমি বলিনি। আমি rigid-টির বিপক্ষে।

জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ (কমিশন সদস্য): সংবিধানকে যদি আপনি rigid না রাখার পক্ষপাতী হন, তাহলে ভবিষ্যতে এর সংশোধন প্রক্রিয়া কি উন্মুক্ত রাখার পক্ষপাতী আপনি?

ডা. মোঃ হারুন রশিদ (সদস্য, ডক্টরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ(ডিপিপিএইচ): সংশোধনতো করা যাবেই। আপনি দেখবেন যে, আমাদের সংবিধানটি অনেক elaborate. যেমন ধরেন কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল, তার সম্পর্কে এক গাদা কথা আপনি লিখে রেখেছেন। এগুলোতো লেখার দরকার নেই। এগুলোতো আইনের মাধ্যমেই হতে পারে। যেমন স্বাধীনতার ঘোষণা, আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন, আমাদের কি অদ্ভুত ব্যাপার আছে। এখানে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি দেওয়া আছে। আবার ২৬ তারিখের ঘোষণা দেওয়া আছে, ১৭ তারিখের কথাটি দেওয়া আছে। অর্থাৎ আপনি কোনটি বুঝাতে চান? আমরা নিজেরাই একটি quotic situation তৈরি করছি, এগুলো করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের একটি পরিষ্কার কাট সংবিধান ছোট করলে হয় কি, আপনি দেখবেন যে, অনেক লোকেরা এক ঘণ্টা কথা বললে পরে নেওয়ার মতো কিছু থাকে না। আর অনেকে দেখবেন ১০ মিনিট কথা বলবে, তা থেকে আমরা অনেক উপকৃত হই।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): জনাব হাসান হাফিজ সাহেব বলেছেন, ভোটিং বাধ্যতামূলক করা। এই কথাটি আপনি বলেছেন যে, সবাইকে বাধ্যতামূলক করা যায় কি না? সেক্ষেত্রে franchise চয়েজটা আমার নিজস্ব, আমি কাকে ভোট দেব। এক্ষেত্রে "না" ভোটের কোনো চিন্তাভাবনা করা যায় কি না? বাধ্যতামূলক করলে আমার যদি পছন্দ না থাকে আমি কাকে ভোট দেব, আমি কি জরিমানা দেব?

জনাব হাসান হাফিজ: আসলে আমাদের চেতনার স্তরতো এত উন্নত না। কয়েকটি নির্বাচন হতে হবে। 'না' ভোটটা হয়ত অনেকে বুঝতেও পারবে না। তবে পাইলট আকারে করে দেখতে পারি। আমরা perfect কোনো সিস্টেমে যেতে পারব না। কয়েকটি নির্বাচন লাগবে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। এটি পরীক্ষামূলক আমরা দেখতে পারি। কিন্তু আবার ইভিএম এর মত নষ্ট প্রকল্পে যেন না যায়। সেগুলোতে রাষ্ট্রের কত টাকা গচ্ছা গেচ্চা, সেগুলো এখনও আমাদের বোঝা হয়ে রয়েছে। ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য নানা অপকৌশল আমরা দেখেছি। সেটি যেন না হয়। আমাদের ছোট দেশ এবং সম্পদ সীমিত। আমরা যেন অপচয় না করি ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য। এমন একটি ব্যবস্থা করা দরকার।

ধন্যবাদ।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): আমি ছোট একটি বিষয়ে জানতে চাই। আপনি স্টেক হোল্ডার পরামর্শ সম্পর্কে বলেছেন যে, বিভাগীয় পর্যায়ে পরামর্শ গ্রহণ করা যায় কি না? আপনার কি সুনির্দিষ্ট কোনো মতামত আছে যে, কীভাবে, কাদের সাথে, কতজনের সাথে বসব। কারণ আমরা এখন ঢাকায় সব শ্রেণিপেশার প্রতিনিধিদের সাথে বসার চেষ্টা করছি।

জনাব হাসান হাফিজ: ধন্যবাদ। আমরা দেখেছি যে, সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টা রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কথা বলেছেন। ২ দফা কিংবা ৩ দফা। এক দিনেই সবার সাথে কথা বলেছেন। তাতে হয় কি, interactionটি হয় না। এখানে যেমন কার্যকর হচ্ছে, আমার সম্মানিত ছোট ভাই যেমন একজন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র, শিক্ষক, তিনি জানেন যে, এই interactionটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা নাহলে কার্যকর একটি কিছু পাই না। আমি অনুরোধ করব যে, আপনারা অন্তত ৮টি বিভাগ আছে তো, ৮ দিন অন্তত করলেন আপনারা। সারাদিন, নানা সমাজের, নানা শ্রেণি পেশার লোকদের সাথে কথা বললেন। এখন যে-রকম interactionটি হচ্ছে, তাতে কিন্তু একটা কিছু বেড়িয়ে আসবে। এ ধরনের যদি করা সম্ভব হয়। আপনাদের হাতে সময় নাই। আপনারা শুরুও করেছেন দেরিতে। আমাদের সংস্কার কমিশনগুলোর অনেকগুলোর কমিটিই হয়নি। ফলে কিভাবে যে কি করবে আমি এটি নিয়ে অত্যন্ত সন্দিহান।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রিয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। যে কারণে আমি গোড়াতেই বলেছি, আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের কমিশনের কথা আমি বলতে পারি, আমরাতো বিভিন্নভাবেই আগে থেকেই চেষ্টা করি, কখনও কখনও পৌঁছানো যায় না। আমাদের দিক

থেকে সময়ের স্বল্পতাটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে আমরা চেষ্টা করছি যতদূর সম্ভব, যত বিস্তৃত, যত ব্যাপকভাবে। দুটো জিনিস আমরা চেষ্টা করছি, যত শ্রেণি পেশা, বিভিন্ন মতগুলো আনতে, আবার অনেককে ডেকে আলোচনার কোনো মর্ম দাঁড়ায় না। ৩ জন ৪ জন হলে সকলের কথা বুঝা যায়, নোট নেওয়া যায়, substantive. স্বল্প সময় হলেও আপনারা যতটুকু substantive কথাবার্তা বলতে পেরেছেন, সাত দিন সময় দিয়ে ৪০জন লোককে ডাকলে আমরা অতটা পেতাম না। আমরা চেষ্টা করছি। আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা দরকার। যে কারণে আমরা বার বার অনুরোধ করছি যদি লিখিতভাবে দেন, দুটো কাজ হবে। একটি হচ্ছে এই মুহূর্তে আমাদের কাজটি সহজতর হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে যেটি জনাব ফিরোজ আহমেদ উল্লেখ করেছেন, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, এই প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে documented করে ফেলা। প্রত্যেকেরই বিভিন্নরকম আকাঙ্ক্ষা আছে, প্রস্তাব আছে সুনির্দিষ্ট, সেগুলো documented হওয়া দরকার। বাংলাদেশের সংবিধান তৈরির প্রক্রিয়াটি যদি আপনি খেয়াল করে দেখেন ১৯৭২ সালের, সেটি নিয়ে জনাব ফয়জুল হাকিম প্রশ্ন তুলেছেন এবং পরবর্তী সময়ে সংশোধনী যেগুলো হয়েছে, কী প্রক্রিয়ায় হয়েছে আমরা জানি। ফলে মানুষের মধ্যে যে আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো আছে সে আকাঙ্ক্ষাগুলোর কোনো documentation নেই। পত্রিকায় বলেন, রাজপথে বলেন, জনসভায় বলেন- আমরা সেই চেষ্টাটাও করছি। আমরা আশা করছি কতটা আমরা অর্জন করতে পারব, আমাদের আন্তরিক চেষ্টা থাকবে, যেহেতু আমাদের সকলের ওপর দায়িত্ব, আমরা চেষ্টা করব, আপনাদের সহযোগিতা লাগবে, সেই সহযোগিতার প্রেক্ষিতে। লিখিত হওয়া ছাড়াও হয়ত আমরা আবার আসব আপনাদের কাছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে। সেই অনুরোধটিও জানিয়ে রাখলাম।

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (কমিশন সদস্য): আমার একটি ছোট প্রশ্ন আছে জনাব ফয়জুল হাকিমের কাছে। আপনি বলেছেন যে, আমাদের বর্তমান সংবিধানটি আমাদের যে গণঅভ্যুত্থান হয়েছে সেটি ধারণ করার জন্য পর্যাপ্ত নয়, উপযোগীও না। আপনি আমাদের একটু guidance দেবেন যে কী ধরনের সংবিধান হলে পরে এই ধরনের situation contained করতে পারবে?

ডা. ফয়জুল হাকিম: এটি আমি বুঝাতে পেরেছি কি না, জানি না। কারণ এখানে সংবিধান সংস্কার কমিশন, আমি যেটুকু বুঝেছি, আপনার বিদ্যমান সংবিধানের মধ্যেই আপনি মেরামতটি করতে চাচ্ছেন। নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান অর্থাৎ গণপরিষদ একটি নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি করবেন, আবার এই গণপরিষদটি পার্লামেন্ট হিসেবে কাজ করবে। একটি সরকার থাকবে। এখন যে সরকারটি আছে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে সেই নির্বাচিত সরকার। এটি হচ্ছে কাঠামোর চিন্তা। সেখানে একটি মূলনীতি থাকবে। আমাদের বিদ্যমান সংবিধানের মূলনীতি যদি দেওয়া যায়, তাহলে মনে হবে এই জনপদের মানুষ পাকিস্তান আমলেই সংগ্রাম করেছে। তাহলে আমাদের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, এই অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহের যে সংগ্রাম, আরও আগে যদি যাই, মোগলদের বিরুদ্ধেও এই অঞ্চলের সংগ্রাম আছে। এই অঞ্চলের মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসটি এই বিদ্যমান সংবিধানে নেই। এটি পাকিস্তান আমলের, শুধু স্বাধিকার সংগ্রামের। আমরাতো অবিভক্ত বাংলাদেশে ছিলাম। ধরেন একটি লড়াই হয়েছে সেখানে, তাই না? যাতে বাংলা বিভক্ত না হয়। ভারত ভাগ হয়েছে সেটি একটি প্রশ্ন হতে পারে ইতিহাসের ক্ষেত্রে। কথা হচ্ছে যে, এই জনপদের মানুষের মুক্তির সংগ্রাম কিন্তু হাজার বছরের। কিন্তু এই সংবিধান পড়ে মনে হবে এটি শুরু হয়েছে পাকিস্তান আমল থেকে, স্বাধিকারের সংগ্রাম থেকে। আরে, এ কি! তিতুমীরের বিদ্রোহ কই গেল, আমার ফকির সন্ন্যাসীর বিদ্রোহ কই গেল? এই যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উপাদান এখানে নেই। আমাদের এই জুলাই অভ্যুত্থান কিন্তু দিল্লীর মসনদ কাঁপিয়ে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত তারা ষড়যন্ত্র করছে।

ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির: ছাত্র জনতার বৈষম্যবিরোধী যে আন্দোলন, এ আন্দোলনে আমিও সক্রিয় ছিলাম। ১৯ শে জুলাই, শুক্রবার উত্তরাতে যখন ছাত্রদের মাঝে আমি ছিলাম, কোথা থেকে যে গুলি আসল জানি না। আমার পাশে ২ জন ছাত্র মারা গেলেন। তখন ঐ পরিস্থিতিতে গুলির মুখে সরে আসাটাও কঠিন। যারা আন্দোলনে ছিল সবার জীবনটা এমনই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কে যে বেঁচে থাকবে, কে যে মারা যাবে জীবনের কোনো গ্যারান্টি ছিল না। আর চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেটি হয়েছে, একজন চিকিৎসক হিসেবে, সে যে ধর্ম বা যে পেশার হোক না কেন, আমার কাছে তার পরিচয় হলো সে একজন রোগী। তার আর অন্য কোনো পরিচয় নেই। আমাদের দায়িত্ব হলো তখন তার চিকিৎসাটা দেওয়া। কিন্তু ঐ সময় যেটি হয়েছে, ৫ আগস্টের আগে এবং ৫ আগস্টের পরের চিকিৎসা ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে কিছু হাসপাতালে গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন, সরকারি বাহিনীর লোকজন উপস্থিত থেকে চিকিৎসকদের ভয়ভীতি দেখিয়েছে। আন্দোলনে যারা আহত হয়েছে তারা হাসপাতালে যেতে পারেনি। গেলে তারাও সেখানে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, প্রহারের শিকার হয়েছে। চিকিৎসক যারা চিকিৎসা দিতে গেছে, তারাও নিজে অপদস্থ হয়েছেন। আমি নিজে উত্তরার প্রত্যেকটি হাসপাতালে গিয়েছি, ১৮ তারিখ, ১৯ তারিখ। প্রত্যেকটি হাসপাতালের চেয়ারম্যান, এমডি সবাইকে বলছি, আপনারা চিকিৎসা সেবায় কোনো রকম ব্যত্যয় করবেন না। আপনাদের যদি logistics কোনো ঘাটতি থাকে, আমাদেরকে বলবেন, আমি ড্যাবের সাংগঠনিক সম্পাদক, আপনাদেরকে আমরা গজ, ব্যান্ডেজ, সিরিঞ্জ, ওষুধ সরবরাহ করব। প্রত্যেকটি হাসপাতালে গিয়েছি। সেখানে দেখেছি যে, রেজিস্টারে লিখতে চাচ্ছে না। কারণ লিখলে গোয়েন্দা সংস্থার একটি ভয় থাকে। তারা চিকিৎসা দিচ্ছে, হাসপাতাল থেকে ওষুধ দিচ্ছে, কিন্তু লিপিবদ্ধ করছে না। আপনি যখন

রোগী, আপনি যখন হাসপাতালে যাবেন, আপনার নাম, বয়স আপনার সবকিছু লেখা হবে। তাহলে আপনি হাসপাতালে এন্ট্রি হলেন। ঐ রেজিস্ট্রেশনটি তখন হয়নি, রাষ্ট্রীয়, দানবীয় আচরণের কারণে। যে পরিস্থিতিই হোক, 'রাষ্ট্র' দানব হয়ে যাবে এটি আমরা আশা করি না। সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ থাকবে, বিক্ষুব্ধ হবে, কিন্তু রাষ্ট্র কখনও দানব হতে পারে না। রাষ্ট্র অবশ্যই জনগণের প্রতি সহনশীল হতে হবে, সেটি যে কোনো পর্যায়েই হোক। চিকিৎসা ক্ষেত্রে যেটি হয়, যেমন-আমি ইন্দোনেশিয়ায় একটি কনফারেন্সে গিয়েছিলাম, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এক্সপার্টরা এসেছেন, তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, আমরা তাদের বক্তব্য শুনেছি, তাদের বক্তব্য থেকে কিছু শেখার চেষ্টা করেছি। দেশে এসে কিছু কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। আমি এই কনফারেন্সে যেতে পারলাম ৪ বছর পরে। আমি এই সময়ে বিভিন্ন কনফারেন্সের দাওয়াত পেয়েছি, আমি এশিয়া প্যাসিফিক সোসাইটিতে নির্বাচিত হয়েছি, কিন্তু উপস্থিত না হওয়ার জন্য আমার ঐ পদগুলো থাকেনি। কনফারেন্সে যেতে পারিনি। এখানে চোখের আঘাতের যিনি clarification করছেন, তিনি ফ্রাঙ্ক কোন, তিনি একজন আমেরিকান, তাকে বলে গ্যান্ড ফাদার অব দা Grand father of the ocular trauma. তিনি এসে তিনটি লেকচার দিয়েছেন। তার লেকচারগুলো শুনে অনেক কিছু শেখার আছে। আমরা না গেলেতো শিখতে পারব না। কিন্তু এগুলোতে যেতে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আমরা কনফারেন্সগুলোতে যেতে পারিনি, আমরা যোগ দিতে পারিনি, আমরা শিক্ষা নিতে পারিনি। আমরা যদি আপডেট না থাকি, আমরা আপডেট চিকিৎসা কি করে দেব? রাষ্ট্রও কিন্তু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে। সবচেয়ে বড় যে বিষয়, চিকিৎসকগণ স্থানীয় পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ে যেতে চান না কেন? আপনি দেখবেন যে, স্থানীয় পর্যায়ে মাস্তানির সবচেয়ে বড় জায়গা হলো ২টি জায়গা। একটি হলো হাসপাতাল এবং একটি হলো স্কুল। যারা এলাকায় রাজনীতি করে এই ২ জায়গায় গিয়ে মাস্তানি করে। তারা প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। তারা কিন্তু থানায় গিয়ে প্রভাব বিস্তার করে না। তারা এসপি অফিসে গিয়ে প্রভাব বিস্তার করে না। তারা এই ২ জায়গায় মাস্তানি করে। তারা লেখাপড়াতেও বিঘ্ন সৃষ্টি করে, চিকিৎসাতেও বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ফলে ভদ্র ফ্যামিলির ছেলেমেয়েরা যারা এমবিবিএস করার পরে ঐ পরিবেশে যাচ্ছে সে মাস্তানদের সাথে কীভাবে যুদ্ধ করবে? তার ওপর ধারাবাহিক হুমকি ও উগ্রব্যবহার করছে ফলে সে হতাশ হয়ে যায় এবং সে সেখানে চাকুরি করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে গ্রামীণ পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা গেলে এবং তাদের থাকার ব্যবস্থা না করলে গ্রামীণ পর্যায়ে চিকিৎসক রাখা যত আইন-কানুন করেন মুশকিল হয়ে যাবে। আপনার যদি নিরাপত্তা না থাকে আপনিতো সেখানে থাকতে চাইবেন না। এটি আপনি হোন, আমি হই বা যে কেউ হোক। সবচেয়ে বড় যে বিষয় বিগত ১৬ বছরে চিকিৎসকদের যে নিয়োগ, যে কোনো নিয়োগতো একটি কাঠামোতে হবে, নিয়োগ হয়েছে বিভিন্ন কাঠামোতে। পদোন্নতি ঠিকমত হয় না। আমি একজন বিসিএসধারী, আমি পদোন্নতি পাই না। আমার পাবলিকেশন আছে ১৩০ টি, একজন প্রফেসর হওয়ার জন্য পাবলিকেশন লাগে ৫টি। আমি কিন্তু পদোন্নতি পাইনি, আমি সহকারী অধ্যাপক হয়ে আছি দীর্ঘদিন ধরে। পদোন্নতি কিন্তু দেওয়া হয়নি। আমাকে ঢাকার বাইরে রেখে দিয়েছে। এই ৫ তারিখের পর আমি ঢাকায় এসেছি। ১২টি বছর আমাকে গোপালগঞ্জে রাখা হয়েছে। আমার যে অভিজ্ঞতা আছে, আমিতো এমএস করে আমি বিদেশে ট্রেনিং করেছি। আমার অভিজ্ঞাতো আমি মানুষকে দিতে পারছি না। এজন্য নিয়োগ এবং পদোন্নতি একটি কাঠামোর মধ্যে না আসলে আপনি কাঙ্ক্ষিত সেবাতো দিতে পারবেন না।

আরেকটি যেটি সেটি হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক কাঠামো একদম ভেঙ্গে ফেলতে হবে। আমলাতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙ্গে না ফেললে আপনি যদি দেশের বাইরে যান, যারা পররাষ্ট্র সার্ভিসে আছে, তারা কিন্তু এক একজন জমিদার। তারা কিন্তু রাষ্ট্রীয় কিছু দায়িত্ব পালন ছাড়া আমাদের প্রবাসী যারা আছে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে না। তাদের সাথে সেরকম সহযোগিতা করে না। এই যে একটি জমিদারি প্রথা, এই আমলাতান্ত্রিকতা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। আমার মনে হয়, "যুগ্ম-সচিব"এর পরে আর আমলাতান্ত্রিক কাঠামো থাকা উচিত না। এর পর যেটি আসবে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ, আপনিও যেতে পারবেন সেখানে, তারা সবকিছু কুক্ষিগত করে রাখে, একটি জমিদারি প্রথা। এই সিস্টেম ভাঙতে হবে। তা না হলে আপনারা যেভাবে চিন্তা করছেন, আপনারা কাঙ্ক্ষিত সেবা মানুষকে দিতে পারবেন না। অতিরিক্ত সচিব, সচিব, সিনিয়র সচিব এসব পদে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের মধ্য থেকে আসবে। এটি উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিত।

আমি শেষ করছি। পেশাভিত্তিক কাঠামোতে জেলা পর্যায়ে যেটি আমরা দেখি যেমন সংসদ-সদস্য একজন মাফিয়া। ডিসি এবং এসপি এর একটি অংশ। এই যে মাফিয়া কাঠামো, এই সিস্টেমটি ভেঙ্গে ফেলতে হবে। জনগণের অংশগ্রহণ সিস্টেমে আমাদের নক করতে হবে। সংবিধানের ৭(ক) ও (খ) অবশ্যই বাতিল করা উচিত। সবচেয়ে যেটি দরকার, যা আমার জীবনেরও নীতি- ন্যায্যতা ও সততা। ন্যায্যতা আর সততার কোনো ব্যত্যয় করা যাবে না। সেটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হোক আর যে পর্যায়ে হোক। এ দুটো যেন মূলনীতিতে থাকে। আমরা ন্যায্যতা এবং সততা থেকে সরে যাই। আরেকটি বিষয় হলো ভোটিং। ভোট প্রদান আপনি বাধ্যতামূলক করেন, অবশ্যই না ভোটটি আনতে হবে। ইভিএম-এ যাওয়া যাবে না। এখানে সরাসরি ভোটিং আনতে হবে। এটি আমাদের দেশের সংস্কৃতি। প্রবাসীদের ভোটের অধিকার সম্পর্কে আমাদের একজন বলেছেন, এটি আমি পুরোপুরি সমর্থন করি। ভোটের অধিকার ক্ষেত্রে যেটি সবচেয়ে বড় সমস্যা

আমাদের অনেক প্রবাসীর কিন্তু ন্যাশনাল আইডি নেই। তাদের পাসপোর্ট আছে, ন্যাশনাল আইডি নেই। ন্যাশনাল আইডি ছাড়া ভোট দেওয়া যাচ্ছে না। এটি কীভাবে সহজ করা যায় এ বিষয়টি একটু দেখতে হবে।

অপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য)ঃ আমাদের স্বাস্থ্য অধিকারের যে সংজ্ঞাটি হওয়া উচিত, সত্যিকার অর্থে স্বাস্থ্যতো শুধু চিকিৎসা না। এটি ব্যাপক একটি বিষয়। এ বিষয়ে যখন আপনারা লিখিত দিবেন, সুনির্দিষ্ট গন্ডিটা, পরিধিটা দিলে আমাদের জন্য একটু সহজ হবে।

জনাব আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান)ঃ ধন্যবাদ।

আমরা জানি আপনাদের আরও বক্তব্য আছে। কিন্তু আমাদের সময়ের স্বল্পতার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে তো। আমাদের পরবর্তী আরেকটি অধিবেশন রয়েছে। এখনকার অধিবেশন এখানেই শেষ করছি।

আপনাদের আবারও ধন্যবাদ অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

একাদশ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : বিকাল ২:৩০ থেকে ৪:০০ পর্যন্ত

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকাঃ

১। **অধ্যাপক আলী রীয়াজ**, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক কমিশন প্রধান
২। অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য
৩। ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল সদস্য
৪। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য
৫। ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল সদস্য
৬। জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক সদস্য
৭। ড. শরীফ ভূইয়া সদস্য
৮। জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ, লেখক সদস্য

অংশীজনের তালিকাঃ

১। অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম
২। কে. শামসুদ্দিন মাহমুদ
৩। এ. কে মোহাম্মদ হোসেন
৪। বিচারপতি মোঃ আবদুল মতিন

কার্যবাহ প্রস্তুতকারকঃ

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সম্পাদনায়ঃ

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহ

কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনারা জানেন যে, সংবিধানের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেই কারণে, আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা অংশীজনদের সাথে আলোচনা ছোট ছোট অধিবেশনে বিভক্ত করেছি যাতে করে সকলের কথা ও মতামত শোনা এবং তাদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পাওয়া যায়।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। ফলে আজকে এই প্রথম সভার শুরুতে আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই সেই সব শহিদদের প্রতি, যাঁদের আত্মদানের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে এবং আমরা আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় দিবেন।

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

সংবিধান, বিচার ও আইন বিষয়ে আপনাদের অভিজ্ঞতা ও অবদানের প্রেক্ষাপটে আমরা জানি যে, সংবিধানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি অনুরোধ আপনারা প্রথমে ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ উপস্থাপন করলে সকলের মতামত শুনতে পাব এবং পরবর্তী সময় আমরা কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারব। এর বাইরে আগামী ২০ তারিখের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য যদি লিখিত কিছু পাঠাতে চান, সেটি আমাদের জন্য খুবই সহায়ক হবে। আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব, যদি পরবর্তী সময়ে আমাদের লিখিতভাবে দিতে পারেন। এখন আমি উপস্থিত সকলকে তাদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদানের আহবান জানাচ্ছি।

[এ পর্যায়ে অংশীজন তাদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।]

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমি এখন সনির্বন্ধভাবে অনুরোধ করব বিচারপতি মোঃ আবদুল মতিনকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য।

বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল মতিন (অংশীজন) : কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সংস্কার কমিশনের কাছে আমাদেরকে ডাকার জন্যে যাতে আমরা অবদান রাখতে পারি। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমরা যে-সমস্ত সমস্যা চিন্তা করছি, আমার মতে প্রথমেই আসে jurisdiction-এর প্রশ্নটি। এই যে revolution-টি, এই revolution-এর successful পরিণতির পরে what is the status of this revolution. এতে আমার মত হচ্ছে, It is a successful revolution and when it succeeds, it assume of responsibility of installing a system of government or the constitution according to their thinking, their philosophy and that will replace the original constitution. The authority is, as I find from my humble research, each from the two types on the two governments by John Locke. When he says that if the regime becomes destructive of the rights, that is human rights, then it becomes the duty and right of the people to dislodge it and replace it by the system they like or they need.Accordingly, this was acted upon by the revolution in the United States and in the Jefferson's Declaration of Independence we find the same language about the nature of destructive governments and the right of the people and duty of the people to replace it with their own system. So the people and the students who led the movement, they have the right either to adopt the constitution or part of it, or they can abandon the whole of it and replace it with a new one. There is no limitation. Having said so, I want to add something that the constitution that we have been working on since 1972. It has some legacy. We have some traditions, some historical background of this constitution. So we have some soft corner for that constitution also and particularly on some items that are not disputed. Particularly Article 77 of the Constitution which has been adjudged by the highest court, apex court, as the pole star of the constitution. So it gives or it declares

the people's sovereignty and at the same time, any law repugnant to the constitution is ultra vires. So such a golden piece of jurisprudence we should not like to forget. So such things which are not disputed may be incorporated in the present constitution or it can be adopted as a whole.

So now about the constitution proper, I first refer to the insertion of this '15th Amendment' whereby one-third of the constitution has been suspended. So this should be restored.

Secondly, by this amendment 3rd amendment of the constitution was annulled. It is the people's wish that should be restored with some modification, some necessary amendment, if necessary.

Now about the judiciary, which I belong and still boast of belonging, there is a requirement of making law for the appointment of judges since 1972. Nothing has been done by any government, either BNP or Awami League, those who are in power. They neglected it and that's why no law has been enacted by any parliament. So immediately, law should be inserted in the constitution, amending Article 94 of the constitution. How judges are to be appointed, their qualifications etc.

The control and supervision of the subordinate judiciary was all through in the High Court division. But by the Fourth Amendment, it was taken out from the jurisdiction of the Supreme Court and thereafter a compromise has been given in Article 116 of the Constitution which has made the problem. What's then or it has been? Now, the dual administration in the name of consultation with the Chief Justice has made a deadlock in the administration. Some soils are sent and it remains in the cold storage for years. The files that they don't like to agree with the Supreme Court, they will keep in the cold storage. So virtually it is not working. So Article 116 must be deleted or the previous condition, as was there in the 116, in the 1972 constitution should be restored.

Another thing is, since 1954, there was a demand in the 21-point declaration of that government or that party, Jukta Front; there was one item, and it was the separation of the judiciary from the executive. And this was inserted in the 1972 Constitution in Article 22 of the Constitution. But nothing was done by the executive and therefore, the Supreme Court thought it unwise to remain silent and the occasion came when the 'Masdar Hossain case' was filed. While concluding the hearing, after conclusion, the court decided to give some directions. Twelve directions were given to make effective separation of the judiciary. Only a few directions have been implemented. But provisions like the 'Pay Commission' and other things are not implemented as yet. So the total judgment, in the light of the judgment and the directions should be immediately implemented. Along with this Article 116 should be deleted- I am repeating.

Now, about another article of the Constitution, there is a deadlock with regard to the parliament. Parliament is not working because it has been made, if I'm permitted to use the word unique one, because no power has been left. So far the independence of the parliament is concerned by putting Article 70 of the Constitution. In Pakistan, in the 1973 Constitution of Pakistan, there was nothing like any provision of floor crossing. But in the Nawaz Sharif's times, they implemented a provision in Article 60 or 63, probably. Further, it has been amended by the Musharraf's government. Now the position is only with regard to the election of the leader of the House no confidence is concerned and in the budget. In those cases only, they cannot vote against their party. Otherwise, they are free to vote. So we should modifz our Article 70 reasonably. So that, they can serve the parliament according to their mandate of the people independently.

Now, coming back to Article 2 of the Constitution. There has been one item like state religion. 'Islam' has been made the state religion. So this is in conflict with the preamble of the Constitution, which says of 'secularism'. So secularism and a particular state religion or anything, said Islam or any other religion is self-contradictory. So this should be done away with in the new Constitution. In the same article, probably there is another provision with regard to the 'Portrait' of the 'Father of the Nation'.

In the United States of America or in any other constitution, there is nothing like portrait of the Father of the Washington or any other so-called father of the Nation. So this provision of portrait in Article 2 should be done away with. Because that is also the demand of the people. It has created some confusion.

In the Constitution, there has been added two appendices, like the 5th or 6th. The speech delivered by Sheik Munjibur Rahman on 7th of March, which has been added as one of the appendices in the Constitution and another is declaration. The third one is proclamation. The general view is that proclamation may be retained. The proclamation of the 10th of April may be retained there. But other provisions have nothing to do with the Constitution or law. Those should not have been added in this Constitution. Because it has burdened the Constitution unwisely.

Another matters like public service. Public service- it is not worth inserting in the Constitution. I do not find anything like this in the good constitutions, like USA etc.

Now, about the method of the commission- if the commission goes for amendment, there is also no difficulty. Because in the American constitution, only after four years of the ratification, they made 10th amendments. 1, 2, 3, 4, 5, 6.. and 10 amendments by one day. They inserting 10 important things in their Constitution. And so therefore probably our problems may be accommodated less than 10 amendments. If it is properly addressed. And in addition, I submit that there should be one imitation of their Ninth Amendment. In their ninth amendment, they declared that the rights enumerated in the Constitution. Near enumeration of the rights in the Constitution shall not disparage or deny. The rights not mentioned in the Constitution. Because there was a confusion that the court is bound by enumerated rights in the Constitution and other rights should be ignored. So in protest to that, that important article was inserted. So similarly these questions are here also. When the question of the right to revolt is taken. Then people say that where is the right in the Constitution? Certain rights are not there or not supposed to be there. But that does not mean that people do not have that right. So only certain important rights are anymore in the Constitution. But that does not mean that we have not other rights.

Probably this is what I was thinking while I was coming to your commission.

Thank you.

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : Thank you, Justice Md. Abdul Mateen. We may come back to you. আমি এখন অনুরোধ করব অধ্যাপক কে. শামসুদ্দিন মাহমুদকে বক্তব্য রাখার জন্য।

অধ্যাপক কে. শামসুদ্দিন মাহমুদ (অংশীজন) : সম্মানিত প্রফেসর আলী রীয়াজ, উপস্থিত বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সুধীজন আসসালামু আলাইকুম। শুভ অপরাহ্ন।

সংবিধান প্রণয়নের পঞ্চাশ বছর পরেও বাংলাদেশের সংবিধান সত্যিকার অর্থে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায় কিনা; তা নিয়ে অনেকেই বিভ্রান্ত। আমাদের প্রতিষ্ঠাতারা যে রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সংবিধানের পুরো পরিকল্পনায়, আমাদের সেই রাষ্ট্র দিতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমত সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক সমাজের কথা বলা হলেও সেই স্বপ্ন এখনো অনেক দূরের কথা। অন্যদিকে আমরা দেখছি যে, রাজনৈতিক শক্তিগুলো তাদের ক্ষমতা ধরে রাখার উপায় হিসেবে সংবিধানকে ব্যবহার করছে।

দ্বিতীয়ত: সংবিধান রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করার পরিমাপক হিসেবে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ।

তৃতীয়ত: দেশের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতেও ব্যর্থ হয়েছে সংবিধান।

চতুর্থত: সংবিধানের নকশাই নির্বাহী শাখাকে স্বৈরাচার সৃষ্টি করায় সাহায্য করে। এটি করতে গিয়ে সংবিধান নিজের সুরক্ষায় অসহায় হয়ে পড়েছে।

পঞ্চমত: অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিচার বিভাগকে সাংবিধানিক রীতিনীতির অভিভাবক বলা হয়ে থাকলেও এই প্রতিষ্ঠান সাংবিধানিক চেতনাকে নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন করেছে। গত কয়েক বছর বিচার বিভাগ হয়ে উঠেছে নির্বাহী বিভাগের মুখপাত্র শক্তি বা সংকল্পহীন কাগুজে বাঘ। তাই সংবিধানের মধ্যে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখানে আমি কিছু পরামর্শ দিতে চাই।

১। গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা এবং নির্বাচনি অখণ্ডতা শক্তিশালী করা।

সংবিধানে অবশ্যই দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে সুস্পষ্টভাবে যুক্ত করতে হবে। সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। অবাধ, সুষ্ঠু ও প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ-সদস্যদের সরাসরি জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে এবং তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে এটি অর্জন করা যেতে পারে। তথাপিও ভোটের অধিকারকে সংবিধানের মধ্যে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া উচিত। সরকার নাগরিকদের সংগঠন করার ক্ষমতা রক্ষা করা। উপরন্তু নির্বাচন যাতে নিরপেক্ষ হয়, স্বচ্ছ এবং জনগণের প্রকৃত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়, তা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনের জন্য জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য।

২ । প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ক্ষমতা কেন্দ্রীয়করণ সংস্কার করা।

বর্তমান সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর হাতে অত্যাধিক ক্ষমতা রাখে। তাহাদের ইচ্ছেমতো মন্ত্রী নিয়োগ ও অপসারণের অনুমতি দেয়। এটি জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ক্ষুন্ন করে। এই ভারসাম্যহীনতা মোকাবিলার জন্য মন্ত্রিসভা গঠন করা যেতে পারে। প্রধান রাজনৈতিক দলের সদস্যগণকে তাদের সংসদীয় আসনের অনুপাতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শাসনের ক্ষেত্রে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতির প্রয়োজন। উপযুক্ত একজন মন্ত্রীকে অপসারণের ক্ষমতা সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। এই ব্যবস্থা মন্ত্রীদের নির্বিচারে বরখাস্ত রোধ করবে। নির্বাহী শাখার মতো ভাগ করার দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলবে। অধিকন্তু ক্ষমতা একত্রীকরণ রোধ করার জন্য সংবিধানে যে কোনো ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ ২ মেয়াদে সীমাবদ্ধ করা উচিত। এই সীমাবদ্ধতা রাজনৈতিক বৈচিত্র্য ও নেতৃত্বের ভারসাম্যকরণে উৎসাহিত করবে। যেকোনো একজন নেতার দীর্ঘমেয়াদি আধিপত্যকে রোধ করবে এবং সুস্থ গণতান্ত্রিক উত্তরণকে উৎসাহিত করবে।

৩ । সংসদ-সদস্যদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ৭০ ধারা বাতিল করতে হবে।

বাংলাদেশে সত্যিকারের সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান বাধাগুলোর মধ্যে একটি বড় হলো ৭০ অনুচ্ছেদ। সংসদ-সদস্যগণকে তাদের দলের অবস্থানের বিরুদ্ধে ভোট দিতে নিষেধ করে। যদি একজন সংসদ-সদস্য তাদের দলের বিরুদ্ধে ভোট দেন, তাহলে তারা তাদের আসন হারানোর ঝুঁকিতে থাকেন। যা সংসদকে একটি সত্যিকারের ইচ্ছাকৃত সংস্থার চেয়ে একটি rubber stamp প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। ৭০ অনুচ্ছেদ অপসারণের ফলে সংসদ-সদস্যরা কেবল দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশ অনুসরণ না করে, তাদের বিবেক এবং তাদের নির্বাচনি এলাকার স্বার্থ অনুযায়ী ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা পাবে।

৪। বৃহত্তর প্রতিনিধির জন্য একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি মিটমাট করার জন্য সংবিধানকে একক থেকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থায় রূপান্তর করা উচিত বলে আমি মনে করি। এই মডেল একটি সরাসরি নির্বাচিত নিম্নকক্ষ সাধারণ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে। আর উচ্চকক্ষটি পেশাদার, জাতিগত, সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীসহ বিভিন্ন সামাজিক সেক্টরের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হতে পারে। উচ্চকক্ষ, নিম্নকক্ষের সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ চেক এন্ড ব্যালেন্স হিসেবে কাজ করতে পারবে। এটি নিশ্চিত করে যে আইনটি ভালোভাবে বিবেচিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমস্ত নাগরিকের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত। এইভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সমৃদ্ধকরণ সম্ভব।

৫। কাঠামোগত পৃথকীকরণের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

সত্যিকারের স্বাধীনতা বিচার বিভাগের জন্য, সংবিধানে বিচার বিভাগেকে নির্বাহী বিভাগের অধীন থেকে পৃথক করার বিষয়টি কার্যকর করতে হবে। নিম্ন আদালত সুপ্রিমকোর্টের তত্ত্বাবধানে বা একটি পৃথক বিচারিক সংস্থার অধীনে রাখা উচিত নির্বাহী নিয়ন্ত্রণের জন্য। এই পরিবর্তন বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতাকে শক্তিশালী করবে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করবে। নাগরিকরা যাতে ন্যায্য এবং নিরপেক্ষ আইনি রায় পান, তা নিশ্চিত করবে। আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে এবং নির্বাহী ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে নাগরিকের অধিকার রক্ষার জন্য বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা অপরিহার্য।

৬। প্রধান বিচারপতি নিয়োগের জন্য একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

বিচার বিভাগে অযাচিত রাজনৈতিক প্রভাব ঠেকাতে প্রধান বিচারপতির নিয়োগ, বিচারিক কার্যক্রমসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ন্ত্রণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। ভারতের মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। এতে বিদায়ী প্রধান বিচারপতি উত্তরাধিকারী সুপারিশকারী সিনিয়র বিচারপতিদের নিয়ে একটি collegium গঠিত হতে পারে, জড়িত করতে পারে। এই ধরনের ব্যবস্থা বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করবে। কারণ এটি বিচার বিভাগকে তার নিজস্ব নেতৃত্বে পরিচালনা করতে দেয়। বিচার বিভাগকে তার নিজের প্রধান বিচারপতি সুপারিশ করার ক্ষমতা অর্পণ করে সংবিধান সর্বোচ্চ আদালতের মধ্যে স্থিতিশীলতা, যোগ্যতা এবং সততা উন্নত করবে।

৭। সাংবিধানিক নমনীয়তা নিশ্চিত করতে অনুচ্ছেদ ৭ অপসারণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সংবিধানের ৭(খ) অনুচ্ছেদ, তথাকথিত চিরন্তন ধারা হিসেবে পরিচিত। অনমনীয়তা তৈরি করে, rigidity করে এবং পরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজনের সাথে বিকশিত হওয়ার সংবিধানের ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করে। এই ধারাটি সরানো হলে আইন-প্রণেতা দেশের মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সংবিধানকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হবে। একটি আরো অভিযোজন যোগ্য সংবিধান, এখনো তার মৌলিক নীতিগুলো বজায় রাখবে এবং নতুন চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতিক্রিয়া এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের বিকাশে নমনীয়তা প্রদান করবে।

৮। সর্বশেষে সমালোচনাকারী এবং অংশীজনের জন্য একটি গণভোটের প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত করার দরকার আমাদের সংবিধানে। সংবিধানে কিছু বিধান বিশেষ করে যেগুলো রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে সংজ্ঞায়িত করে বা মৌলিক নীতিগুলোকে সমর্থন করে, গণভোটের মাধ্যমে জনগণের সম্মতি ছাড়া সংশোধন করা উচিত নয়। এই ব্যবস্থা ব্যাপক সমর্থন ছাড়া সংবিধানে কঠোর পরিবর্তন রোধ করবে। উদাহরণস্বরূপ যদি বলি তাহলে বলতে হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা অপসারণের সিদ্ধান্তে নাগরিকদের সরাসরি input নিয়ে নেওয়া যেতে পারত।

জাতীয় গুরুত্বের বিষয়ে একতরফা পদক্ষেপ রোধ করা প্রয়োজন। এই ধরনের প্রয়োজনীয়তা সংবিধানের অখণ্ডতা রক্ষা করবে। নিশ্চিত করবে যে মৌলিক পরিবর্তনগুলো সত্যিকারে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, অধ্যাপক কে. শামসুদ্দিন মাহমুদ।

আপনার লিখিত বক্তব্যটি যদি দিয়ে যান তাহলে সেটি আমাদের জন্য সহায়ক হবে।

আমরা এখন অনুরোধ করব অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইছুমকে তাঁর বক্তব্যের জন্য।

অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইছুম (অংশীজন): আপনাদের ধন্যবাদ।

আমি ১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করব। কিন্তু আমি জানি না পারব কিনা।

আমার প্রথম সমস্যা হচ্ছে, আমি কমিশনকে কম বুঝছি। আমি যখন কমিশনের নাম দেখি, এটি হচ্ছে সংবিধান সংস্কার কমিশন। তখন আমি আসলে সংস্কার বলতে কমিশন কতদূর এর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করেছে, এটি আমি বুঝতে পারিনি। আমরা যে-রকম সংস্কার বলতে একটা বিষয়কে বুঝি, এটি আসলে কমিশন বোঝে কিনা; এটা আমার কাছে স্পষ্ট না। আমরা নিজেরা মনে করি যে, সংস্কার এই অর্থে যে, এটি একটি নতুন সংবিধান না। একদম পরিবর্তন করে ফেলা না। আবার আমাদের এখানে যারা আছেন, তারা বেশির ভাগই আইনজীবী কিংবা আইনের সাথে যুক্ত মানুষ। আদালত সংশোধন বলতে যা বুঝায় কিংবা সংসদ সংশোধন বলতে যে ধরনের কর্মকাণ্ডকে বুঝায়, এটি এর মধ্যেও নেই। More than amendment less than new. এরকম একটি জায়গাকে বোঝানোর জন্য আমাদের জায়গা থেকে একটি সংস্কার বলতাম। সংবিধান সংস্কার কমিশন এটিকে কীভাবে বুঝে, আমি জানি না। এজন্য আমার কথা বলা একটু difficult.

দ্বিতীয়ত হচ্ছে, আমি আমার জায়গা থেকে জানি না যে, আসলে কমিশন নিজেরাই কী, না আমরা যারা কথা বলছি আমাদের কথাবার্তা থেকে compile করে কেবল edit করার কাজ করবেন? নাকি তারা তাদের নিজেদের opinion-এ যেটি তৈরি হবে, সেটিও একসাথে add করবেন? এ বিষয়টি আমি জানি না। এই অস্পষ্টতার মধ্যেই আমি যেভাবে বুঝি, সেই জায়গা থেকে আমার কথাটি বলার চেষ্টা করছি। তার মধ্যে আমার দুটি জায়গা আছে। আমি আবার আরেকটি বিষয় আপনাদের সাথে clear করতে চাই। আমি মনে করি, আমাদের একটি চাওয়া আছে। আমি যেখান থেকে কথা বলি, আমি চাই আসলে একটি 'গণক্ষমতাতন্ত্র'। আমরা গণতন্ত্রকে গণক্ষমতান্ত্রের কথা বলি এবং এরকম একটি সংবিধান। সাধারণভাবে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান লাগবে বলেই আমি মনে করি। এটিই হচ্ছে আমার একমাত্র চাওয়া। এটি যদি আমি চাই তাহলে all powers to people, এই রকমের একটি ভিত্তির উপর আমি সংবিধানকে দাঁড় করাতে চাই। বিচারপতি মোঃ আব্দুল মতিন স্যার যেটিকে বাংলাদেশের বিপ্লব বললেন, আমি এখানে যেটি বুঝি এবারের যে ঘটনাটি ঘটল, সেই ঘটনায় যারা যারা অংশীজন, ছাত্ররা নেতৃত্ব দিল এবং বাকি যে-সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো এখানে অংশ নিল তাদের প্রত্যেকের যে চাওয়া-পাওয়া কমন পরিসরে আমি দেখি, সেটির মতো এরকম জায়গাটি অর্থাৎ বিপ্লবী পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাসহ সবাই এসেছে, এরকম আমি দেখি না। আমি মনে করি যে, বিএনপি এই গণঅভ্যুত্থানের একটি বড় উপাদান। কিন্তু বিএনপির খুব পরিষ্কার অবস্থান হচ্ছে, তারা আসলে এই সংবিধানের গুণগত পরিবর্তনই চায় না। অথবা যেটি চায়, সেটি আসলে তারা নির্বাচিত হওয়ার পরে করতে চায়। তার অর্থ এটি দিয়ে আমি কাউকে ছোট-বড় করছি না। আমি বলছি যে, আকাঙ্ক্ষায় পার্থক্য ছিল এ অভ্যুত্থানের ভেতরে এবং এরপর যারা আবার রাজনৈতিক অবস্থান

নিয়েছে, তারা তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের জায়গায় ফেরত গেছে। সেখান থেকে আমি ভাবি যে, আমার একটি চাওয়া। আরেকটি হচ্ছে এই সময়ের বাস্তবতার মধ্যে, এই পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের পক্ষে আসলে কতটুকু সম্ভব। সেটির জন্য একটি পরামর্শ দেওয়া। দুরকমের হতে পারে পরামর্শ। আমি আপনাদেরকে বলতে পারি, আমি এই এই চাই। আর আরেকটি হতে পারে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে এটুকু করা সহজতর বা এটুকু আপনারা করতে পারেন। আমি আমার চাওয়ার জায়গাটিকে উল্লেখ না করে, আমার বিবেচনায় এই সময়ের মধ্যে যতদূর আসলে করা সহজতর মনে করে আমি সেই জায়গার কথা বলছি। আমি ৫-৭ মিনিটের মধ্যে আমার কথাটি শেষ করব।

আমি যদি সংবিধানের প্রথম থেকে যাই, তাহলে প্রথম হচ্ছে মৌলিক অধিকারের বিষয়ে আমার কথা আছে। মৌলিক অধিকারের যে ভাগ, এখানে শুধু মৌলিক অধিকারগুলোর অন্তত ১৫টির মধ্যে শর্ত দেওয়া আছে। তার অর্থ এগুলো মৌলিক অধিকার না। এগুলো বিভিন্ন আইন-এর সাপেক্ষে আমার অধিকার। আমি এটিকে মুক্ত করার পক্ষে। আইনগুলোকে আমার অধিকারের স্বপক্ষে করার কথা আমি ভাবি। আমি যদি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চাই, তাহলে আমি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে আমার যা কিছু অধিকার, সেটি ভোগ করার ক্ষেত্রে আইন আমাকে সহায়তা করবে, রাষ্ট্র আমাকে সহায়তা করবে। আমি রাষ্ট্রটিকে এভাবে দেখার পক্ষে। রাষ্ট্র আমাকে শাসন করবে, দমন করবে এবং নিয়ন্ত্রণ করবে–এটিকে আমি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বুঝতে পারি না। সুতরাং আমি এই শর্তগুলো দূর করার পক্ষে এবং কিছু সংযুক্ত করার পক্ষে। ধরেন মূলনীতির মধ্যে বলা ছিল, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এগুলো মৌলিক অধিকার হবে। তার মধ্যে ১৯৭২ সালের যে বিতর্কটি ছিল শিক্ষার ব্যাপারে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত যে fightটি দিয়েছে, এখন ৫৩ বছর পরেও কি আমি শিক্ষাকে এখানে আনতে পারব না? আমি মনে করি, শিক্ষার সাথে সাথে আমাদের সমর্থন তাতে এখন চিকিৎসাকেও এখানে আনতে পারি। তার অর্থ হচ্ছে, আমি এটিকে শর্তহীন করতে চাই এবং ওখানে আমি কিছু অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। এই হচ্ছে মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে যদি যাই।

আমি তারপরে যদি নির্বাহীতে আসি, প্রেসিডেন্টকে অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)-এর শর্তে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার প্রতিপালনের একজন হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। আমাদের বাস্তবতায় এটিকে যদিও ওয়েস্টমিনিস্টার সিস্টেম বলা হয়। আমি মনে করি, অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)-এর জায়গায় আরো কিছু ক্ষমতা address করা যেতে পারে। আমি অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) সংশোধন বা পরিবর্তন করার পক্ষে।

তারপরে যদি আমি পার্লামেন্টের বিষয়ে আসি। পার্লামেন্টের সদস্যদের ক্ষমতা বাড়ানো এবং কমানোর পক্ষে। আমি কমাতে চাই যে, সে আইন-প্রণয়নের বাইরে আর কিছু করতে পারবে না। অনুচ্ছেদ ৪০-এ তাকে আইন-প্রণয়নের মধ্যেই confined থাকতে হবে, nothing more. আমি এখানে তার ক্ষমতা কমিয়ে অনুচ্ছেদ-৭০-এ ক্ষমতা বাড়াতে চাই। অনুচ্ছেদ-৭০-এ Up to the impeachment of Prime Minister কিন্তু government পড়বে না। Government change হবে না, Prime Minister change হবে, এরকম ক্ষমতা আমি পার্লামেন্ট সদস্যদের কাছে দেওয়ার জন্য অনুচ্ছেদ-৭০ সংস্কারের পক্ষে। আমি পার্লামেন্টের কার্যক্রমের মধ্যে যদি আসি, তাহলে আমি Budgetary system যে-রকম, বাজেট যেভাবে তারা করে, এই পদ্ধতির বাইরে আসতে চাই। পার্লামেন্ট সদস্যদের constituency হচ্ছে অবশ্যই people-এর। ওখানকার producerদের, ওখানকার ভোক্তাদের সাথে কথা বলে, ওখান থেকে তাদের মতামত নিয়ে আসতে হবে বাজেটের আগে। এটি তার একটি দায়িত্বের মধ্যে আনতে হবে যাতে বাজেট প্রণয়নে তার জনগণের মনোভাবের অন্তত প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করবে। বাজেট প্রণয়নে সংসদের এখন যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতির অনেক জায়গায় হাত দিতে হবে।

আমি জুডিশিয়ারির ক্ষমতা বাড়াতে এবং কমাতে চাই। জুডিশিয়ারির বিষয়ে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬-এ এখন যেভাবে আছে, এটি আমি পাল্টাতে চাই। এখন আছে প্রেসিডেন্ট করবেন চিফ-এর পরামর্শ নিয়ে। এখানে চিফ প্রেসিডেন্টকে অবহিত করবেন জুডিশিয়ারি প্রশ্নে, এই জায়গায় যেতে চাই। এখানে পরামর্শ হচ্ছে বিষয়টি উল্টে দিতে চাই এবং চিফকে absolute করা। জুডিশিয়ারির কাছে absolutely নিয়ে আসা। এখন পার্লামেন্টকে যদি এখান পর্যন্ত নিতে পারি, আমি এটিকে শর্তসাপেক্ষে বলছি। পার্লামেন্টকে যদি আমি সত্যিকার সংসদ করতে পারি, তাহলে আমি জুডিশিয়ারিকে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ করতে চাই। Banana পার্লামেন্ট থাকলে তার কাছে যাওয়া যাবে না। কিন্তু সংসদ যদি সংসদের মতো হয় তাহলে জুডিশিয়ারিকে পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহী করতে হবে। Judiciary effective করার জন্য দুটি বিষয়কে আমি জুডিশিয়ারির হাতে দিতে চাই। এর একটি হচ্ছে criminal justice যেটি হয়, সেই criminal justice system-এর একটি বড় পার্ট হচ্ছে পুলিশ। যারা investigation-এর সাথে আছে। Investigation-এর side-টিকে পুলিশ থেকে আলাদা করে judicial system-এর under-এ একটি investigation system করতে হবে। এর পাশাপাশি justice delivered হওয়ার পরে যাতে এটি কার্যকর হয়। আমি গভর্নমেন্টের উপরে contempt power বাড়াতে চাই। এখন যেটি হচ্ছে, government contempt power-কে প্রায় নাই করে ফেলছে। গভর্নমেন্ট পার্টের উপরে, জনগণের উপরে না, নাগরিকের উপরে না। আমি গভর্নমেন্টের-এর উপর কোর্টের contempt করার ক্ষমতাটি বাড়াতে চাই। আমি আরেকটি বিষয়ে বলতে চাই, judiciary judgement deliver করার পরে jail system-এর উপরে judiciary control চাই। এটি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারবে না। তার অর্থ judicial system-কে independent করলে, আইন পরিবর্তনের কথা এখানে বলে লাভ নেই। আইন পরিবর্তন করতেই হবে। আইন pro people না হলে আপনার legal system- কে যত empowered করবেন, ঐ legal system আপনাকে তত বেশি নিপীড়ন করবে।

আমার আরেকটি প্রশ্ন, আমি সংবিধানের মধ্যে থাকছি না। এটি হচ্ছে জুডিশিয়ারি সম্পর্কে আমার পরামর্শ। আমি এখন electoral system নিয়ে কথা বলতে চাই। আমি electoral system- এর ১২৩ (৩) পরিবর্তন করতে চাই। আমাদের এখানে ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করতে পারে এরকম কোনো সিস্টেম থাকতে পারে না। তত্ত্বধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে ১৩তম সংশোধনীতে দুটি পর্যবেক্ষণ ছিল। এই দুটি পর্যবেক্ষণকে বিবেচনায় নিয়েই তত্ত্বধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়, পুনরুদ্ধার করা যায়। সেটি করার পক্ষে আমি। জুডিশিয়ারির এক্স চিফ জাস্টিসকে এই পদে রাখার পক্ষে আমরা না। এটির জন্য টিচার থাকতে পারে, আমলা থাকতে পারে, যে কেউ হতে পারে। গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তি হলেই হলো তত্ত্বধায়কে। একদম এক্স চিফ জাস্টিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা, এটির আমরা বিপক্ষে। কিন্তু তত্ত্বধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে আনতে হবে। যদি কেউ মনে করে, ঐ জাজমেন্টে ছিল যে, এরা নির্বাচিত না। যদিও এ ব্যাপারে জনাব মাহমুদুল ইসলাম বলেছেন যে, এই প্রেসিডেন্ট হচ্ছে, সংসদের মাধ্যমে নির্বাচিত। সুতরাং এটি একটি নির্বাচিত সরকার। তা নয় যে, তখন আর নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে জনাব মাহমুদুল ইসলাম-এর আরগুমেন্টের সাথে একমত। তার পরেও যদি এটি না হয়, তাহলে ইচ্ছে করলে তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত করেও নিয়ে আসা সম্ভব। তাতে তত্ত্বাবধায়ক ফেলে দেওয়ার কোনো দরকার নেই। তত্ত্বধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংশোধন করা যায়। আমি তত্ত্বধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংশোধনীতে একটি electoral system-এ চাই।

Electoral system-এ আমাদের আরেকটি বিষয় আছে, এটি এই সময়ের মধ্যে executable হবে কিনা, জানি না। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, এটি আমাদের শুরু করা উচিত। আমি ভোটিং সিস্টেমটিকে মিশ্র ভোটিংয়ের দিকে যাওয়ার পক্ষে। আমাদের ৩০০ আসনকে বাড়ানোর পক্ষে আমি। কারণ এটি ১৯৭১ সালের জনসংখ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। কিন্তু এখন সংগতিপূর্ণ নয়। জনসংখ্যার বিবেচনায় সংসদ-সদস্যদের আসন সংখ্যা বাড়ানো দরকার। একইসাথে আপার হাউজের যে ধারনা, এই আপার হাউজের জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বকারীদেরকে নেওয়া। যদি সরাসরি নির্বাচনের জন্য ৩০০ আসন হয়, তাহলে ১৫০ আসন আপার হাউজের জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব হিসেবে আসতে পারে। যাতে এটিকে pro people করা যায় এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচনী ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের দিকে নেওয়া যায়। নির্বাচনী ব্যবস্থার বিষয়ে আমার এটুকু পরামর্শ। আমাদের অনেকগুলো অন্য প্রস্তাব আছে যেমন reconstitution-এর ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১৪৯-কে আমি খুবই সংশোধন করার পক্ষে।

অনুচ্ছেদ ১৪৯-এ যেভাবে সমস্ত আইনকে ধারাবাহিকতা দেওয়ার নামে বৈধতা দিয়েছে, সেখানে এগুলোর একটি টাইম লিমিট করা দরকার যে, ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর বা তিন বছরের মধ্যে পরীক্ষা করে যে আইনগুলো আমাদের সাংবিধানিক কিংবা মৌলিক অধিকারের spirit-এর সাথে যায় না, ওগুলোকে বাতিল করে দিতে হবে। বাকিগুলোর ধারাবাহিকতা থাকতে পারে। সমস্ত আইনের ধারাবাহিকতা স্বাধীনতার অব্যবহিতের পূর্ব পর্যন্ত যে-সমস্ত আইন কিংবা এরকম আইন ছিল, সেটি হইতে পারে না। আমি রাষ্ট্রের সংজ্ঞা পরিবর্তনের পক্ষে। এখানে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এবং সরকারকে একাকার করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৫২-তে রাষ্ট্র ও সরকার এক জায়গায় আছে। সুতরাং এই সংজ্ঞা পরিবর্তন করতে হবে। সংবিধানে রাজনৈতিক দলের যে সংজ্ঞা আছে, সেটির বাইরে পিপলস রিপ্রেজেন্টেটিভ অর্ডার (পিআরও) যেগুলো হয়েছে, এগুলোর সিরিয়াস বিষয়ে যখন যাই তখন আমরা এগুলো নিয়ে দুটি বিষয় করার পক্ষে। আমরা মনে করি যে, এই সংবিধানকে অমান্য করার পরে সরকার, সরকারি দল অর্থাৎ আমরা যে-রকম বলি যে, সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য contempt লাগবে। সরকারে যারা যায় তাদের জন্য কী লাগবে? সেখানে কোনো ব্যবস্থা নাই। As if যে এটি তাদের wiil-এর সংবিধান, no. সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায়ও তো তারা। সুতরাং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা হলে, সেই সংবিধানকে যদি violet করে তাহলে তার জন্য ব্যবস্থা লাগবে, সেটি যোগ করতে হবে সংবিধানে। একই সাথে মৌলিক অধিকারকে যদি আমি মুক্ত করতে পারি, তাহলে আমার মৌলিক অধিকার আদায় করার জন্য আমি জেলায় জেলায় মৌলিক অধিকারের আদালত চাইব। আমি নাগরিক আদালত যোগ করার পক্ষে। আমার নাগরিক অধিকার বা আমার এই নাগরিক অধিকারের বিপরীতে কিছু হলে আমার জনগণ যাতে প্রতিকারের জন্য আদালতে যেতে পারে, শুধু অনুচ্ছেদ ১০২-তে এসে করবে এরকম না। আমি জেলায় জেলায় নাগরিক আদালত চাইব। এটি সংবিধানে যোগ করতে হবে। সেজন্য আমি অনুচ্ছেদ ১০২-এর সংশোধন চাই। অনুচ্ছেদ ১০২-এর মধ্যে যা আছে, তাতে শুধু আমরা সরকারকে বলতে পারি থাম অথবা বলতে পারি যে, কর। যারা এর আগে থামে কিংবা অমান্য করে এবং যেখানে অন্যদের ব্যক্তিগত সুযোগ সুনির্দিষ্টভাবে পরিষ্কার থাকে, তাদের ব্যাপারে এখন কোর্ট সক্রিয়তা দেখাচ্ছে একধরনের যে, জরিমানাসহ অন্যান্য কিছু করছে। কিন্তু এগুলো বিভাগের উপরে যায়। আমার কাছে মনে হয় যে, অনুচ্ছেদ ১০২-তে প্রতিকার হিসেবে ক্ষতিপূরণকে সাংবিধানিকভাবে যোগ করা উচিত। শুধুমাত্র থাম এবং কর–এর বাইরে আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হলে নাগরিকরা যাতে আসলে ক্ষতিপূরণ পেতে পারে, সেই অংশটুকু অনুচ্ছেদ ১০২-তে আনতে হবে। আর একটি কথা বলে, আমি বক্তব্য শেষ করতে চাই। আমি অনেক বেশি সময় নিয়ে ফেলেছি, দুঃখিত।

আমি আমলাতন্ত্রকে এবং নির্বাহীদেরকে জবাবদিহিতা করার পক্ষে। এটি করার জন্যে concrete proposal হচ্ছে এরকম যে, এখন আমলাতন্ত্রে যেভাবে সচিবালয় হয়, এটি আসলে কমন ক্যাডাররা যেভাবে পরিচালিত হয় আমলাতন্ত্রে সেখানে অন্যান্য পেশার যার যেটি সংশ্লিষ্ট পেশা থেকে সে সচিবালয় পর্যন্ত আসবে। এই ব্যবস্থাটি সংবিধানে যোগ করা যায় কিনা; এটা আমাদের একটা প্রস্তাব। আমি মনে হয়, অনেক কথা বলছি। আমি আর কথা না বলি।

আপনাদের ধন্যবাদ আমাকে এতক্ষণ শোনার জন্য।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইছুম। কেবল রেকর্ডের জন্য বলছি। আপনি শুরুতে সংস্কারের ব্যাপারে অস্পষ্টতার কথা বলেছেন। যেহেতু এটি রেকর্ডেড হচ্ছে, সে জন্য বলে রাখা প্রয়োজন। আসলে ৩ নভেম্বর আমরা একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে কমিশনের পক্ষ থেকে কয়েকটি বিষয় বলেছিলাম। তার মধ্যে সংস্কারের পরিধি, যেটি আমাদের ওয়েবসাইটেও আছে। সেখানে খুব সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছি। আমরা বলেছিলাম, সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হবে বর্তমান সংবিধান পর্যালোচনাসহ জনাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের লক্ষ্যে সংবিধানের সামগ্রিক সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্লিখন। এভাবেই সংস্কার কমিশন define করেছে। তার পাশাপাশি আমরা কিছু উদ্দেশ্যের কথাও বলেছি এবং ছাত্রদের উদ্দেশ্যের কথাও বলেছি। রেকর্ড হচ্ছে বলে মনে হয়েছে কমিশনের পক্ষ থেকে তা স্পষ্ট করাটি আমার দায়িত্ব।

ধন্যবাদ। আমরা আপনার কাছে আসব। আপনাকে কিছু প্রশ্ন আমরা করব।

আমি এ পর্যায়ে জনাব এ. কে মোহাম্মদ হোসেন-এর কাছ থেকে শুনব।

জনাব এ. কে মোহাম্মদ হোসেন (অংশীজন): আসসালামু আলাইকুম।

কমিশন প্রধান, কমিশনের মাননীয় সদস্যবর্গ এবং উপস্থিত সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে, এরকম একটি মহতী কাজে আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, একটি সুযোগ দিয়েছেন নিজেদের কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। তবে প্রথম পর্যায়ে আমি যেটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে, বেশকিছু সরকারের অধীনে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং সংবিধানের সংশোধনীর সাথে সম্পৃক্ত থাকার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। আমি একটি দিক মাথায় রেখে আলোচনা করব। সেই বিষয়টি হচ্ছে, purely technical ইস্যুটিকে মাথায় রেখে আমার নিজস্ব মতামত দেওয়ার চিন্তা করব। ৫ আগস্টের বিপ্লব যাই বলেন, শুধু কোনো সরকারের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে আমি এটি মনে করি না। আমার কাছে মনে হয়েছে, এটি একটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে বিপ্লবটি হয়েছে। এর অর্থ সংবিধানের প্রতিটি provision যে উদ্দেশ্যে লেখা ছিল, সেখানে এই provisionগুলো সেবা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। যে কারণে এই ধরনের একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখন আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে, আমাদের কী করণীয়? আমাদের কাজ হচ্ছে পরামর্শ দেওয়া। আর কমিশন আমাদের পরামর্শ থেকে কিছু রাখবেন বা না রাখবেন, তারা তাদের সুপারিশ তৈরি করবেন, এটি আপনাদের উপরে নির্ভরশীল। যেহেতু আমরা সুযোগ পেয়েছে কিছু কথা বলি।

যেমন সংসদ: দেখা যাচ্ছে যে, সংবিধান অনুযায়ী আমাদের সংসদ শুধু ৩৫০ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত। ইন্ডিয়ান সংসদ দুটো হাউজ এবং প্রেসিডেন্টকে নিয়ে গঠিত। আমাদের প্রেসিডেন্টের যদিও কার্যকর ভূমিকা আছে আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে। কিন্তু বাস্তবে সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে অংশ করা হয়নি। হয়ত সংবিধান প্রণয়নের ঐসময় রাষ্ট্রপতির প্রতি ভীতি কাজ করেছে। এ কারণে হয়ত রাষ্ট্রপতি আইছুব খানের কথা মনে করে এখানে হয়ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি প্রাথমিক পর্যায়ে এবং পরবর্তী পর্যায়ে যতগুলো সংশোধনী আছে, সেখানেও কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে সংসদের অংশ করা হয়নি। যদিও দায়িত্বটি রেখে দেওয়া হয়েছে। আপনি যেটি বলছেন যে, আমাদের যে নির্বাহী ক্ষমতা; ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে দেখা যাচ্ছে, নির্বাহী ক্ষমতাটি কেবিনেটের উপর অর্পিত। কিন্তু আমাদের perspective-এ আমাদের সংবিধানে নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর উপরে ন্যস্ত। সুতরাং সংবিধানের বিভিন্ন provision বা বিভিন্ন অনুচ্ছেদ সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। এখানে কিন্তু অন্তর্নিহিত কিছু ভুলত্রুটি থেকে গেছে। এখন আপনি কিছু রাখবেন মৌলিক বিষয়, যেগুলো পরীক্ষা করা হয়নি। যে provisionগুলো দ্বৈত আকারে দেখা দেয়নি, এগুলোকে আপনারা নতুন সংবিধানে রেখে দিতে পারেন। আমার যুক্তি হচ্ছে, যেটি পরীক্ষিত, যেটি নিয়ে জনগণের উপর কোনো ধরনের হয়রানি, কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা, কোনো ধরনের আঘাত আসেনি সেরকম provisionগুলো আপনারা আপনাদের প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। কিন্তু যে-সব provision একটি দানব আকারে আসছে, যে provisionগুলো অন্যকে দানব হতে সাহায্য করছে অথবা যে-সব provisionগুলো মানুষের জন্য ভীতির কারণ হয়েছে, এগুলোতে নিশ্চয়ই সংশোধনী আনতে হবে। যেমন: আমরা সবাই বলে থাকি যে, রাষ্ট্রপতির কোনো ক্ষমতা নেই। আপনারাও সবাই বলছেন। পত্রপত্রিকায়ও দেখেছি, ইউটিউবে দেখেছি, আলাপ-আলোচনায়ও দেখেছি যে এখানে একটি চেক এন্ড ব্যালেন্স করতে হবে।

আমার প্রস্তাব হচ্ছে, বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতির সাথে একজন উপরাষ্ট্রপতি রাখলে ভালো হবে। দুটো হাউসের যে প্রস্তাব দিয়েছেন, দুটো হাউস থাকলেও ভালো হয়। হয়ত একটি প্রতিনিধি পরিষদ থাকবে, আরেকটি অভিভাবক পরিষদ থাকবে। এরকম হতে পারে। অভিভাবক পরিষদ হতে পারে যেখানে ধরে নিতে পারেন যে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীসহ বিভিন্ন সেক্টরকে বিবেচনায় রেখে তাদেরকে নির্বাচিত করতে পারেন, উচ্চকক্ষে।

আমার কাছে মনে হয়, সংসদের মেয়াদ ৪ বছর, ৫ বছর না করে ৬ বছর করতে পারেন এবং retiring এর ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশকে retirement-এর দিকে নিতে পারে। তাহলে একটি সরকারের ধারাবাহিকতা থাকে। তখন আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের খুব একটি প্রয়োজন হবে বলে আমার কাছে মনে হয় না। প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর অবসরে চলে গেলে, ওখানে তিন ভাগের এক অংশতে যদি নির্বাচনের ব্যবস্থা বিবেচনা করেন।

এখন আরেকটি ইস্যু যেমন: বিচার ব্যবস্থার কথা অনেকেই বলেছেন। আমাদের সাংবিধানিক যে কমিশন বা কর্তৃপক্ষ, statutory authority, সবগুলোতেই দেখা গেছে যে, কোনোটিই সফল হয়নি। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সফল হয়নি এবং আইন দ্বারা সৃজিত আরো যে সকল প্রতিষ্ঠান এগুলোর কোনোটিই কিন্তু আইন দ্বারা যতটুকু mandate দেওয়া হয়েছে, সেই mandate পূরণ করতে পারেনি। জনগণকে তারা হতাশা দিয়েছে। কিন্তু কেন? এর পিছনে আমি অনেকগুলো কারণ দেখতে পাই। একটি হচ্ছে, অনেক সময় অযোগ্য লোক এ জায়গায় বসেছে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে mandate যতটুকু আছে, সে অনুযায়ী তাদেরকে সহায়তা দেওয়া হয়নি, জনবল দেওয়া হয়নি বা দেখা যাচ্ছে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়নি। অথবা দেখা গেছে যে, যোগ্য লোক থাকা সত্ত্বেও এসব resource-এর কারণে তাদেরকে যে mandate দেওয়া হয়েছিল, এগুলোকে তারা পরিপূর্ণ করতে পারেনি। পুরো দায়ভার কিন্তু কমিশনের উপর গেছে। এখানে এই সেক্টরটিকে আরেকটু পরিষ্কার করতে হবে।

আর অনেকেই মনে করে যে, সংবিধান আরেকটু ছোট হলেই হবে। বাকি আইন পার্লামেন্ট দিয়ে তৈরি করবে বা আমরা পার্লামেন্টের হাতেই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, মুক্ত করা হলে আইনটিকে তারা নিজেদের প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করে ফেলে। আমার প্রস্তাবনা হচ্ছে, যতটুকু সম্ভব, সংবিধানে বিস্তারিত লিখে দেওয়া দরকার। যেমনঃ আমার কাছে মনে হয়, আমাদের যে সংবিধানের প্রথম ভাগ, that is the 'Republic'. এটিই আমাদের দেশ। দ্বিতীয় ভাগ, নীতি। তৃতীয় ভাগ-এ গিয়ে আমরা বলতেছি যে, আমাদের অধিকার। বাদবাকি যতগুলো আছে, all are machnism. আপনি দেখবেন যে, machnism-এর কারণে প্রথম ভাগ frosted হচ্ছে বারবার। সুতরাং আমাদেরকে Republic-এ পরিষ্কার করে দিতে হবে, কী Republic হবে? আমাদের প্রথম ভাগটি স্পষ্ট করে দিতে হবে। আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর জন্য সম্পর্ক কী হবে, পরিষ্কার করে দিতে হবে। প্রয়োজনে সাংবিধানিক কোর্ট করতে হবে, সাংবিধানিক কাউন্সিল করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাংবিধানিক কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসতে হবে, জবাবদিহিতা এখানে নিশ্চিত করতে হবে তাদের মাধ্যমে।

এখন বিচার ব্যবস্থা নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন যাবত দেখছি যে, সংবিধানে বিচারক নিয়োগের যে পদ্ধতি, এ পদ্ধতিতে দেখা গেছে যে আইনজীবিদের মধ্য থেকে হবে অথবা জুডিশিয়ারি থেকে হবে। সেখানে আরেকটি provision আছে, আমরা কোনো সময় এটির প্রতি মনোযোগ দেয়নি। provisionটি হচ্ছে আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা। কেন আইনের প্রফেসর কি বিচারক হতে পারে না? লেজিসলেটিভ ড্রাফটস্ম্যানরা কি বিচারক হতে পারে না? একটি আইন দ্বারা এগুলো হওয়ার কথা ছিল। অথচ এই জায়গাটিকে কিন্তু ignore করা হয়েছে। এটির জন্য ৫৩ বছরেও কোনো আইন তৈরি করা হয়নি। উচ্চ আদালতে বিভিন্ন পেশা থেকে আসবে, যাদের আইন ডিগ্রি আছে তাদের মধ্য থেকে। তারা যাতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এ ধরনের একটি সুযোগ সংবিধানে থাকতে হবে। শুধু আইনজীবি, বিচারক; এজন্য সুপ্রিমকোর্ট আমাদের দখলে থাকবে, এটা না। এখানে কিন্তু technical লোকজন নিয়ে আসতে হবে। কারণ পৃথিবী ধীরে ধীরে খুব বেশি technical ইস্যুর দিকে যাচ্ছে। শুধু আইন জানলে যে, সব খুটিনাটি জানা যাবে, এমন না। যেমন দেখা যাচ্ছে যে, পার্লামেন্টের জন্য আলাদা একটা সচিবালয় আছে। তাদের জন্য আলাদা লোক আছে। কিন্তু পার্লামেন্ট সচিবালয়টি সব সময় প্রেষণ দিয়ে পরিচালিত হয়। নির্বাহী বিভাগের লোকজন আসে। ২ বছর কাজ করে চলে যায়, আবার আরেকজন চলে আসে। এখানে পার্লামেন্টারি সার্ভিস, যারা সংসদ-সদস্য থাকবেন, তাদেরকে যে গবেষণালব্ধ সহযোগিতা দিতে পারবে, এই ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান পার্লামেন্টে গড়ে উঠেনি। এখানে পার্লামেন্টারি সার্ভিসে, যারা পার্লামেন্ট সচিবালয়ে আছে, তারা খুব একটি কার্যকরী সহযোগিতা কিন্তু মাননীয় সংসদ-সদস্যদেরকে দিতে পারে না। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এখানে fund আছে, যেসব লোকজন নিয়োগ দেওয়া হয় তারমধ্যে এমএলএসএস, কুক, গার্ড, পিয়ন-এদের পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু এই fund-এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যে, গবেষক নিয়োগ দিবে। প্রতিটি স্থায়ী কমিটিতে অনেকগুলো গবেষক নিয়োগ দিবে। বিশেষ করে কমিটিকে সমর্থন দিবে। কিন্তু এই সামর্থ এখানে নেই। আমার অভিজ্ঞতা থেকে যেটি দেখেছি, আইন প্রণয়নে জনসাধারণের অংশগ্রহণের সুযোগ কিন্তু আমাদের ব্যবস্থায় আছে। পিটিশন কমিটি। এই

কমিটির মাধ্যমে যে কেউ এসে তার কথাটি একজন এমপির দস্তখত নিয়ে বলতে পারে। এখানে কিন্তু বিরাট আকারের এজলাস সাজানো আছে। পিটিশন কমিটির যে চেয়ার তা অনেক উঁচুতে সুপ্রিম কোর্টের মত সাজানো। দেখা যাচ্ছে যে, ২/৩টি সংসদের মধ্যে কোনোদিনও কমিটির একটি মিটিংও ডাকা হয়নি। কোনো আবেদনও হয়নি। এটি পরিষ্কারভাবে অকার্যকর। সুতরাং আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে, আমার আবেদন বা আহ্বান যেটি হবে, সেটি হলো সংবিধান দরকার হলে অনেক বড় হোক। প্রয়োজনে একটা ভাগের জন্য, একটি অধ্যায়ের জন্য সংবিধান হোক আলাদা আলাদা। দরকার হলে ১০, ১১ ভলিউম হোক। বিস্তারিত বলে দিতে হবে যদি কোনো idea অন্যের জন্য রেখে দেন, সেটি misuse হয়। আবার এখানে কোনো একটি ক্ষমতা দেয়ার সময় দেখা গেছে যে, কোনো ব্যক্তিকে যখন কোনো discretionary power দেওয়া হয়, কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা যখন ব্যক্তিবিশেষকে দেওয়া হয়, সেটি সবসময় অপব্যবহারের সম্ভাবনা বিভিন্ন সময় দেখা গেছে। এই জায়গাটিতে স্বজনপ্রীতি দেখা গেছে এবং জায়গাই বেশি স্বজনপ্রীতি হয়। সুতরাং কোথাও যদি কোনো discretionary power দেওয়া হয়, সেখানে সংবিধানে দিয়ে দেন, একই সাথে আইনও দিয়ে দেন। সেখানে বিস্তারিত বলে দেওয়া হবে এবং একটি গ্রুপকে দেওয়া ভালো। এই discretionary powerটি একটি group of people-কে base করা ভালো। আমার মনে হয়, তখন কিছুটা স্বচ্ছতা থাকবে।

ধন্যবাদ, আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ এ. কে মোহাম্মদ হোসেন।

কিছু কিছু প্রশ্ন বুঝা ও স্পষ্টীকরণের জন্য আপনাদের কাছে আসব। বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল মতিন, আপনি একটি কথা বলেছিলেন যে, 13th Amendment, এটি পুনঃস্থাপন with some modificationsসহ। এই modification-গুলোর বিষয়ে কী কোনো পরামর্শ আছে আমাদের জন্য?

বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল মতিন (অংশীজন): The judiciary should be excluded from this. Particularly the Chief Justice or next to the Chief Justice. This has created some confusion. And also the President should never be the Chief of Caretaker government.

ড. শরীফ ভুঁইয়া (কমিশন সদস্য): আমি বিষয়টি ভালোভাবে বুঝার জন্য বলছি। যে ফর্মুলাটি অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম বলেছিলেন, বিচারকদের মধ্যে সীমিত না রেখে, এটি মুক্ত থাকা উচিত। যে কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হতে পারে। এই বিষয়টিতে আমিও সম্পূর্ণ একমত পোষণ করি। যে কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি অন্তর্বতী সরকারের প্রধান হিসেবে আসতে পারে। কিন্তু আমার ধারণা এবং এটি এখনো আছে। এখন যেটি আছে যে, প্রথমে চিফ জাস্টিস নেওয়ার চেষ্টা করা হবে। তারপর অবসরপ্রাপ্ত আপীল বিভাগের বিচারপতিদের থেকে চেষ্টা করা হবে, কোনোটি থেকেই যদি না পাওয়া যায় সবাই অপারগ হন, তখন সর্বজন গ্রহণযোগ্য একজনকে দিতে হবে। আমার ধারণা immediate চিফ জাস্টিস বা তিনি যদি unavailable হন একটি নির্দিষ্ট ফরমুলা দেয়া হয়েছে এই চিন্তা থেকে যে, যদি সবাই সম্মতি করতে না পারে, তখন তো একটি অচলাবস্থার তৈরি হবে। এজন্য সংবিধানে একটি ফরমুলা অনেক দূর পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে যে, প্রথমে A, A যদি available না হয় B, তারপর C, তারপর D. ধরে নেয়া হয় যে, হয়তো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও ঐক্যমত্য হবে না কে প্রধান হবে? কাজেই সেই জায়গায় যাওয়ার আগে কতগুলো নির্দিষ্ট ফরমুলা ৪ থেকে ৫ জন পর্যন্ত। এতগুলো অকৃতকার্য হলো। তখনই এই riskটি যে, ৪টি ধাপ পার হওয়ার পরেই অচলাবস্থার দিকে যাব। শুরুতেই যদি করি, তাহলে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এই অচলাবস্থার বিষয়টিকে আমরা কীভাবে address করতে পারি। সে ব্যাপারে আপনারা ভেবেছেন কি না; যে আমরা এটি উন্মুক্ত করলাম কিন্তু এই অচলাবস্থার riskটি আমরা কীভাবে নিষ্পত্তি করব?

অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম (অংশীজন): আমার পরামর্শটি বলি। স্যার, নিশ্চয়ই বলবেন। আমারটি হচ্ছে, এর উল্টো পথে যাওয়া। আমরা যদি নিজেদের মধ্যে এরকম কোনো বিধান রাখি, সেটিকে বিকল্প রাখা যে, কাউকে না পাওয়া গেলে তখন এক্স চিফ জাস্টিস।

ড. শরীফ ভুঁইয়া (কমিশন সদস্য) সেটি একটি সমাধান হতে পারে। শেষটি প্রথমে চলে আসবে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): কিন্তু অন্যরাও বলেছিলেন। বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল মতিনও বলেছিলেন যে, যাতে জুডিশিয়ারিকে কোনোভাবে অন্তর্ভুক্ত করা না হয়। তাহলে এটিকে কি রাখার প্রস্তাব করছেন কিনা?

অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম (অংশীজন): আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে, তখনই জুডিশিয়ারিকে ডেকে আনা যখন আমাদের নিজেদের মধ্যে আসলে কোনো ঐক্যমত্বে পৌঁছতে পারছি না। তখন জুডিশিয়ারিকে যে কারণে না করা হচ্ছে, সেই জায়গাটি কম ক্ষতিগ্রস্ত

হওয়ার সম্ভবনা থাকে। তখন মনে হবে যে, জুডিশিয়ারিকে আমাদের ব্যর্থতার কারণে ডেকে আনতে হয়েছে। জুডিশিয়ারি এটার মধ্যে আসতে চায়নি। সুতরাং আমি এভাবে জুডিশিয়ারিকে যতটা সম্ভব রক্ষা করার পক্ষে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): প্রেসিডেন্টের বিধানটি রাখবেন কি, রাখবেন না?

অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম (অংশীজন): আমার এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট পরামর্শ নেই।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): আমার দুটি প্রশ্ন আছে। ১টি অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুমের কাছে। আপনি বলেছেন যে, পার্লামেন্টের, বিশেষ করে নিম্নকক্ষের কথা দৃষ্টিগোচর করেছেন যে, একমাত্র আইন প্রণছু কার্যক্রম থাকবে। যদি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা হয়, সেক্ষেত্রে পার্লামেন্টের অনেকগুলো আন্তসম্পর্কিত কার্যক্রম চলে আসে। বিশেষ করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্যে। সেক্ষেত্রে আমি শুধু আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যটি কী করে serve করব?

অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম (অংশীজন): সময়ের স্বল্পতার কারণে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কথা বলতে পারিনি। আমি সংসদীয় পদ্ধতির কথা বলছি, তখন আবার extra parliamentary functions–এর কথা বলছি। পার্লামেন্টকে আরো কার্যকর করার জন্যে আমার প্রস্তাব হচ্ছে, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে অধিক ক্ষমতায়ন করতে হবে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রধান একদম না পাওয়া গেলে কিন্তু প্রধান বিরোধী দল থেকে হবে এবং তার কাছে মন্ত্রণালয়কে জবাবদিহি করার পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এখন পর্যন্ত সংসদীয় পদ্ধতিতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কিছুই করার নেই। সুতরাং এরকম সংসদীয় স্থায়ী কমিটি দিয়ে তো আপনি সংসদ চালাতে পারবেন না, সংসদীয় গণতন্ত্র চালাতে পারবেন না। তাকে যদি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই, কমিটির কাছে যদি নির্বাহী এবং অন্যদেরকে জবাবদিহি করাতে চাই তাহলে আমি কমিটির কাছে সংসদীয় কার্যক্রমের যে সমস্ত জায়গা সেগুলো সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। এরা এখন কী করে? এখন তারা স্থানীয় সরকারের কাজ করে। স্থানীয় সরকারে তো আমি তাকে যাইতে দিতে পারি না। অথচ তিনি স্থানীয় সরকারে গিয়ে বসে। স্থানীয় সরকারের বিষয়ে সংবিধানে লেখা আছে, স্থানীয় শাসন। কিন্তু আমরা মনে করি হবে 'স্থানীয় সরকার'। কিন্তু ভাষাটি হচ্ছে, স্থানীয় শাসন। ওখানে কোনো স্থানীয় সরকার নেই তো, exist করে না। আপনাদেরকে এই ১৫ মিনিটের সময়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষাটি বলতে পারব না। খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমি আপনাকে বলতে পারিনি যে, আমাদের একটি বড় রকমের অপরাধ আছে ১৯৭২ সালের সংবিধানে। পাকিস্তান আমাদের সাথে যে আচরণ করছে, আমরা অন্য জাতিসত্তাগুলোর প্রতি সেই আচরণ করি। সুতরাং এটা আমরা করতে পারি না। We have no authority. আমি একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে দোষারূপ করতেছি, আমরা মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে আসছি। এটিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সংবিধান বলতেছি। আমরা মুক্তিযুদ্ধ যে কারণে করলাম, সেই কারণ দিয়ে তো আমি অন্যের উপর জুলুম করতে পারি না। একদম self-contradictory from the very begining. সুতরাং এরকম অনেক কথা যেগুলো রাজনৈতিক কথা হবে। সুতরাং আমি মনে করি, অনেকে আপনাদের কাছে অনেক কথা বলছে। সেগুলো অনেকবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সুতরাং আমি এগুলোতে যেতে চাইনি, কম যেতে চেয়েছি।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম, যেহেতু সময়ের স্বল্পতার কারণে বেশি সুযোগ দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলো জানতে চাই, বুঝতে চাই এবং এগুলো বিবেচনায় নিতে চাই। সে কারণে আপনার যে প্রস্তাবগুলো যদি লিখিত থাকে, আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে লিখতে হবে তা নয়। যদি ইতোমধ্যে লিখিত থাকে, আমি অনুমান করি এবং আমি আপনাকে যতদূর চিনি, লিখিত আছে। সেগুলোকে যদি আপনি সরবরাহ করেন, তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে। এখানে ছোট্ট একটি প্রশ্ন করে রাখি। আপনি অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) সম্পর্কে বলেছিলেন, প্রেসিডেন্টকে আরো কিছু ক্ষমতা দেওয়া। এটি কী একটু define করবেন যে, ঠিক আরো কত কিছু বা কতদূর দেওয়া যায়?

অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম (অংশীজন): আমি যেটি মনে করি যে, এখন সংবিধানে এগুলো বলা আছে। কিন্তু এগুলো আসলে কার্যকর না। এখন পর্যন্ত সমস্ত নিয়োগ সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী। কিন্তু আইন হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের করার কথা। কিন্তু যেহেতু অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)-এর পরামর্শটি লাগে, সুতরাং এটি করতে পারে না। আমি সাংবিধানিক সংস্থাগুলোর নিয়োগের জন্য সংবিধান সংস্কার কমিশনের মতো একটি কমিশন করার পক্ষে। ইন্ডিয়া এটা থেকে সরে গেছে। কিন্তু ইন্ডিয়াতে যেটি ছিল, এরকম একটা বিষয় আমরা শিক্ষা নিতে পারি। আমাদের এখানে অনেক কাজে আসতে পারে। আমি মনে করি, এই জায়গাগুলোতে আইন করে এরকম বলে দেয়া যায় যে, তারা নিয়োগ দিয়ে দিতে পারে এরকম না। নিয়োগের জন্য তারা বাছাই করতে পারবে। এটি জনগণকে জানাতে হবে। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জনগণ এগুলো নিয়ে কথা বলবে, তারপর তারা চূড়ান্ত করবে। সেই জায়গাগুলো ইচ্ছা করলেই আমরা ভাঙতে পারব, ভাঙতে পারব কিন্তু ক্ষমতাগুলো সংবিধানে কত দূর পর্যন্ত আপনি দিবেন? আমি মনে করি, নিয়োগের সাংবিধানিক সংস্থাগুলো যে আছে, এগুলো নিয়োগের ক্ষমতার মধ্যে রাষ্ট্রপতির একটি অংশ থাকা দরকার। Apart from ঐ রকম না যে, under opinion of Prime Minister. এখানে তার স্বাধীন হওয়া দরকার।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক (কমিশন সদস্য): এর সাথে একটি সম্পূরক প্রশ্ন যে, if the presidnt becomes the Prime Minister তখন প্রেসিডেন্টকে কী সেই ক্ষমতা দিয়ে কোনো লাভ আছে, নাকি এটিকে কার্যকর করার জন্য প্রেসিডেন্টকে ভিন্নভাবে আনার কোনো চিন্তা-ভাবনা করা যায়?

অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইয়ুম (অংশীজন): প্রথমত পার্লামেন্ট নিয়ে কথা বলতে পারি যেমন: স্পীকারকে যে রকম বের করে ফেলি। প্রেসিডেন্টের বিষয় একদম আইন করা উচিত সংসদে। Position থেকে position যদি কেউ হয় অর্থাৎ position থেকে প্রেসিডেন্ট আসবে না। He must be independent from oppositions. এটি হচ্ছে আমাদের মতামত। আমি তো বললাম যে, তাহলে আপনাদের সাথে আমাকে অনেকক্ষণ কথা বলতে হবে। আপনাদের সময় কম।

জনাব এ. কে. মোহাম্মদ হোসেন (অংশীজন): আমি এখানে কিছু যোগ করতে চাই। সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি। এখন যে রকম সংসদ নির্বাচন করে, সেক্ষেত্রে আমরা হয়ত collegium তৈরি করে নিতে পারি। স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় শাসনের যারা আছেন, তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারি। ধর্মীয় গুরু যারা আছেন, তাদেরকে নিয়ে আমরা একটি collegium তৈরি করে নিতে পারি। তাদের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবে। এভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারি।

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (কমিশন সদস্য): আমার প্রশ্ন জনাব এ. কে মোহাম্মদ হোসেন, আপনার কাছে। আপনি ডেপুটি প্রেসিডেন্টের কথা বলেছিলেন। এতে কী লাভ হবে?

জনাব এ. কে. মোহাম্মদ হোসেন (অংশীজন): আমি যেটি দেখছি, সেটি হচ্ছে যখন মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাইরে যাবেন, তখন তিনি রাষ্ট্রপতি থাকবেন বা অনেক সময় রাষ্ট্রপতি হয়ে গেলেও এই অংশটুকুর জন্য সঠিকভাবে কার্যকর হয় না এবং এখানে একটি বিরাট আকারের gap থাকে।

আর দুই নম্বর হচ্ছে, আপনারা যেহেতু দুটি হাউজের কথা ভাবছেন। তাহলে তো অবশ্যই আপনাদের একজন চেয়ারপারসন লাগবে for the upper house, Guardian house-এর জন্য। আমার দৃষ্টিতে, ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকলে ভারসাম্য হবে। He will be a running mate প্রেসিডেন্টের।

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (কমিশন সদস্য): আমার আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা অনেকগুলো consultation session-এ শুনেছি সবাই বলেছেন accountability measures দরকার আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, জুডিশিয়ারিকে accountability করার জন্য। এই accountabilityটা কীভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে করা যায়? এ বিষয়ে nobody gives us any directions. সুতরাং আপনাদের কাছে কোনো concrete recommendation বা strategy যদি থাকে accountability-এর measuresগুলো সংবিধানে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা, কোন পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা and how to implement them?

জনাব এ. কে. মোহাম্মদ হোসেন (অংশীজন): আমার কাছে মনে হয় যে, আপনারা Constitutional Council-এর কথা সুপারিশ করতে পারেন। অর্থাৎ একটি Constitutional Council হবে। এখানে নিয়োগ কী পদ্ধতিতে হবে, সেটি ঠিক করতে পারেন অথবা নির্বাচনের মাধ্যমে কাউন্সিল নির্বাচন করতে পারেন, একই সাথে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় সাংবিধানিক কাউন্সিলেরও নির্বাচন হবে এবং এদের মাধ্যমেই সাংবিধানিক সত্তা যেগুলো আছে, এগুলোর নিয়োগ এবং এগুলোর accountability আপনারাই সুনিশ্চিত করতে পারেন।

অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইয়ুম (অংশীজন): আমি একটু যোগ করতে চাই। আমাদের অনুচ্ছেদ ৭৭ কখনোই কাজে লাগেনি। ন্যায়পালের যে ধারনাটি, এখানে এটি যোগ করতে পারেন কিছু পরিমাণে। তাহলে এই জায়গাগুলোতে একটু কাজ আসবে।

ড. শরীফ ভূঁইয়া (কমিশন সদস্য): ন্যায়পালের বিষয়টি নিয়ে আমাদেরকে অনেকেই বলেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো আমাদের ১০০ সদস্যের সুপ্রিমকোর্ট যেখানে কাজ করেনি justice deliver করতে, সেখানে একজন ন্যায়পাল হলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এটি আমরা কেন ভাবি?

অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইয়ুম (অংশীজন): প্রথমত আইন করা উচিত যে, সুপ্রিমকোর্টে যারা জাজেজ হবেন, আর কারো বেলায় হোক আর না হোক তাদের বেলায় অন্তত তাদের সম্পদের হিসেব দিয়ে শুরু করা উচিত। কারণ হচ্ছে যে, তারা তো তাদের সম্পদের হিসেব দেয় না। তারা যেদিন জয়েন করে এবং যেদিন বেরিয়ে যায়, তারমধ্যে সম্পদের কী পার্থক্য হয় সেটিতো আমরা দেখতে পাই না, সেজন্যই। ন্যায়পাল মানে তো একজন নয়। ন্যায়পাল মানে একটি অফিস। আপনি যদি এটিকে কার্যকরী করতে চান, তাহলে তো একজনকে ন্যায়পাল হিসেবে নিয়োগ করবেন। এরপর তার জন্য আপনি আইন করবেন যে, আসলে এই প্রতিষ্ঠান কীভাবে কাজ করবে? কোন কোন জায়গায় তার কী ধরনের জনবল লাগবে? তারা কী কী করতে পারবে, সেজন্য আলাদা একটি আইন লাগবে।

ড. শরীফ ভূঁইয়া (কমিশন সদস্য): আসলে আমার প্রশ্নটি হলো যে, আমাদের তো প্রতিষ্ঠান অনেক ছিল। এখানে আমি সুপ্রিমকোর্টের কথা বললাম। কারণ primary justice deliver-এর সাথে জড়িত। এখানে শুধু ১০০ জন জাজ না। সাথে বিশাল বড় অবকাঠামো আছে। কিন্তু পুরোপুরি fail করল না গত ১৫ বছরে?

অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইয়ুম (অংশীজন): শুরু হচ্ছে আসলে নিয়োগ থেকে। সুপ্রিম কোর্টের নিয়োগের জন্য যদি আপনি rules না করেন। বর্তমান নিয়োগ পদ্ধতিতে আছে, যদি ১০ বছরের লাইসেন্স থাকে এবং আমার শতভাগ আনুগত্য ছাড়া আর কি যোগ্যতা লাগে আসলে জাস্টিস হওয়ার জন্যে? সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এটিকে আপনি আইনের অধীনে না আনবেন তার সততা, integrity, তারা জানা, বুঝা এগুলোকে যতক্ষণ পর্যন্ত মানদণ্ডের মধ্যে না আনবেন, তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনোভাবেই পরীক্ষা করার কোনো সুযোগ থাকবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে একটি প্রতিষ্ঠানকে রাখতে হয় কোনো একটি জায়গায়, যেমন ওরা রাজাকে রাখে। আমরা কোর্টকে রাখতে চাই। এখন পর্যন্ত এটি হচ্ছে আমাদের শিক্ষিত লোকদের এক ধরনের পুরোনো শিক্ষার কারণ। না হয় সুপ্রিম কোর্টই এখানে সবচাইতে বেশি আসলে আক্রান্ত হওয়ার কথা ছিল, পুলিশ না। এই অভ্যুত্থানের সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হওয়ার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টের। কারণ চিফ জাস্টিস থেকে শুরু করে সমস্ত জাজেজরা আসলে পুলিশের ভূমিকায় ছিল। এর আগ পর্যন্ত সরকারগুলো আর্মিকে ব্যবহার করছে, পুলিশকে ব্যবহার করছে। গত ১৫ বছরে আসলে যে, peculiarity হয়েছে, সেটি হচ্ছে যে, জুডিশিয়ারিকে ব্যবহার করে তারা তাদের সমস্ত অন্যায়কে বৈধ করেছে।

মানুষ আমাদেরকে দয়া করেছে অন্য কারণে। সুতরাং এখানে হাত দিতে হবে। জুডিশিয়ারির কথা যেটি বললাম, তাকে accountable করা। তার নিয়োগের জায়গা থেকে শুরু করে তার সততার জায়গাকে আসলে সবার আগে যাচাই বাছাই করতে হবে। তার সর্বোচ্চ scrutinizing করা গেলে অন্যদের scrutinizing করার অধিকারী হয়।

ড. শরীফ ভূঁইয়া (কমিশন সদস্য): আমার সর্বশেষ প্রশ্ন। আপনি যেটি বলেছেন, এটির সাথে সম্পর্কিত আমার মনে হয় এবং একজন মাননীয় আপীল বিভাগের খুবই শ্রদ্ধেয় বিচারপতিও এখানে আছেন। সেটি হলো, আমাদের যে contempt আছে, এটির আপনারা কি মনে করেন পরিবর্তন দরকার? যেমন: আমরা সকল প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করতে পারি। যেমন: contempt এরতো দুটো অংশ আছে। একটি হলো আমি আদালতের আদেশ মানলাম না সেটি definitely contempt clause. কিন্তু দেখা যায় আমি রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করতে পারি কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এবং জুডিশিয়ারির কোনো সমালোচনা করতে পারি না। এই জিনিসটার সুবিধাই বিগত ১৫ বছরে নেয়া হয়েছে। যার করণে সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে একটা কিছু বলে দিলেই মানুষ এটি আর সমালোচনা করতে পারেনি। একজন বিখ্যাত সাংবাদিক তো অনেক হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন। এই যে আমাদের contempt আইন, এটির ব্যাপারে আপনারা কী ভাবছেন?

অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইয়ুম (অংশীজন): আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, contempt বিষয়টিকে আইনে পরিণত করতে হবে। ২০১৮ সালে যেটি করার চেষ্টা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত যেটি contempt আছে, আপনি জানেন যে, এটি হচ্ছে জাস্ট ইচ্ছা প্রকাশের বাইরে তো আর কিছু না। এরচেয়ে vague এবং undemocratic law তো নেই। এটি কোনো law-ই না। অন্যান্য আইনকে যেরকম আপনি point out করলেন যে, আদেশ অমান্য করলে তার জন্য কী ব্যবস্থা, সরকারে থেকে তারাও অমান্য করলে তার জন্য কী ব্যবস্থা এবং জনগণের জায়গা থেকে কোর্ট সম্পর্কে তার মতামত দিলে তার কী অবস্থা- আসলে এগুলোকে খুব স্পষ্ট করা দরকার। জুডিশিয়ারিকে কার্যকর রাখার জন্য যতদূর দরকার, ততদূর করতে হবে। আর জুডিশিয়ারি অন্যের ভাড়াটিয়া হিসেবে, অন্যের বাহিনী হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যে জায়গাটি, সেটি বন্ধ করে দিতে হবে।

ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক (কমিশন সদস্য): আমার দুটি প্রশ্ন। প্রথমে আমি জুডিশিয়ারির কথা যেটি বললাম। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল মতিন-এর কাছে। বিদ্যমান 16th Amendment যেহেতু struck down হয়ে গেল এবং Supreme Judicial Council restored হয়েছে। স্যার, আপনি কী মনে করেন যে, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে জুডিশিয়াল কৃংখলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কারণ অতীতে তো আমরা দেখেছি যে, অনেক আবেদন পড়েছে for convening সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল proceedings against many judges. বিশেষ করে বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের কথা আমি নিজেই জানি। ঐ আবেদনগুলোর কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায় বরং তাঁকে অ্যাপিলেড ডিভিশনে elevate করে দেয়া হয়। সেখান থেকে আরো অবিচার হয়। There is no transparency. কেউ জানে না কোনো আবেদন পড়ছে কিনা; কেউ জানে না application-টি আদৌ নিষ্পত্তি হবে কিনা? রাষ্ট্রের এই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গে যে এত ধোঁয়াশা বা transparency-এর পুরোপুরি অভাব। সেজন্য আমরা কি বলতে পারি যে, এই Supreme Judicial Council provision has failed to discipline judges.

বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল মতিন (অংশীজন): Supreme Judicial Council রাখার একটি background আছে। The 15th Amendment যখন challenge হলো, 15th Amendment আমরা void decleared করলাম। We saved many things যেগুলো 4th

Amendment হয়েছিল। ওটি save না করলে আমাদের সুপ্রিম কোর্টের চিহ্নই থাকত না। Save করতে গিয়ে there was a question whether this provision should be retained or not, save or not Supreme Judicial Council. We considered Article 70. The Article 70 as it is, parliament is not independent, but surely it is the office of the Prime Minister. তার কাছে অর্থাৎ একটি ব্যক্তির হাতে the fade of the judges রাখা মান্যগণ্য করিনি। The same thing was considered during the Fifth Amendment. They agreed with the saving of the provision. But 16th amendment তারা homogically করে দিল and it has been struck down by the highest court. তারা সুতরাং এই background-এ পার্লামেন্ট যেভাবে আছে, এভাবেই রেখে সুপ্রিম কোর্টের দেয়া রায়টাই বোধহয় ঠিক আছে। আর যেটি বললেন যে, ধোঁয়াশা হয়ে গেছে এটি। There was no rules. By now, no rules have been framed. To my knowledge, there has not been rules. If the rules are followed, probably things will be otherwish.

ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক (কমিশন সদস্য) : Article 70 যদি আমরা repel করে দেই। তাহলে কী পার্লামেন্ট সম্পৃক্ত থাকতে পারে impeach-এর জন্য।

বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল মতিন (অংশীজন): Article 70 যদি সম্পূর্ণটা বাতিল করে দেন, তাহলে অনেকটা ঠিক হবে। অনেক দেশেই তো সুপ্রিম জুডিশিয়াল বলে কিছু নেই। General tendency হচ্ছে it should be left with the parliament. But parliament should be independent. That is the question. If the provisions are enough to make the parliament independent in the real sense of the term, then there is no bar in restoring the power to the parliament.

জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ (কমিশন সদস্য): জনাব এ. কে মোহাম্মদ হোসেন আপনি একটি বিষয়ে বলেছেন, যেটি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। আমাদের সংবিধানের কিছু কিছু provision expressly monster powerকে facilitated করেছে বা use করেছে। এগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত লিখিতও দিতে পারেন। আমাদের অনুরোধ সেখানে এর ব্যবহারের মাত্রা এবং বিভিন্ন তারতম্য যা ঘটেছে, সেক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ যে এগুলোর এই পরিবর্তন বা এই কারণে এই বিষয়টি এই দিকে যেতে পেরেছে। আমার মনে হচ্ছে যে, আপনার কাছ থেকে এগুলো পাওয়া যাবে। কিন্তু একটি বিষয় আমরা যে আলোচনা করছি জুডিশিয়ারিতে নিয়োগ, পৃথিকীকরণ, এটির সচিবালয়- সচিবালয় তো আছে। পুলিশেরও তো সচিবালয় আলাদা আছে। তাতে তো আসলে লাভ হচ্ছে না। আপনারা আমার চেয়ে এসব বিষয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ এবং জানেন। সামরিক সরকারের সময়েও তো আমরা জুডিশিয়ারির এই অধঃপতন দেখিনি। এমন কি প্রথম নির্বাচিত খালেদা জিয়ার সরকার, শেখ হাসিনা সরকারের সময়টিতেও এটি ঘটেনি। সুতরাং আমরা যে সমাধানগুলো বলছি, এটি কি আসলে adequate? আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন। নাকি আরো কিছু সমস্যা চিহ্নিত করা দরকার?

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম যেটি বললেন, আপনারা যারা দীর্ঘদিন এটি নিয়ে কাজ করছেন। আরো বিস্তারিত শুনতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু আমাদের একটু বুঝার জন্য। আপনি নাগরিক আদালতের কথা বলেছেন। এটি একটু যদি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতেন তা হলে ভালো হতো। আলোচনায় আসছে যে আপনি অন্য একটি প্রসঙ্গে বলেছেন, অনুচ্ছেদ ৭১ বা ৭২-এ সংসদ-সদস্যদের সংখ্যা, সেটি এখন adequate কিনা? আমরা কি এই প্রশ্নটি আমাদের জুডিশিয়ারির ব্যাপারে করতে পারি না যে, একটি হাইকোর্ট রেখে ১৮ কোটি মানুষকে কীভাবে আমরা সেবা দিচ্ছি? এই আলোচনাটি আসছে না কেন?

অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম (অংশীজন): আপনাকে ধন্যবাদ। প্রথমটির উত্তরটা দেই।

এখন পর্যন্ত আমাদের এখানে সমস্ত আইনের jurisprudenceটি হচ্ছে এরকম যে, আমাদের জনগণ হচ্ছে unruly. এদেরকে শাসন করতে হবে। এদেরকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে। এটি একটি ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণা। এখানকার সবাই আমরা জানি। সুতরাং এটিকে উল্টাতে হবে। উল্টাতে যদি হয় তাহলে ধরেন একটু লম্বা পথ আমাদের হাঁটতে হবে। শুরুতেই ধরেন আমরা খুব ভালো করব, সবাই হবে, এরকম না। মৌলিক অধিকার যেগুলো স্বীকার করব, সেগুলো নিশ্চিত হবে কীভাবে? দুই ভাবে। যদি আপনি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন। হওয়ার তো কথা ছিল প্রতিষ্ঠানগুলো এরকম যে, আমাদের জনগণের আসলে যা কিছু উপভোগ করার কথা, সেক্ষেত্রে তার উপভোগটা যাতে পরিপূর্ণ হয়, তাকে যাতে কেউ restrain দিতে না পারে, সে যাতে protection পায় আইনের কাছে, আদালতের কাছে, এভাবে। আমাদের যেহেতু psychologyটা অন্য। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো ঐরকম নেই। আমি যদি শুরু করতে চাই, আমি ধরে নিচ্ছি যে কালকেই আমি পুলিশের কাছে এটি পাব না। আমি ধরে নিচ্ছি যে, কালকেই আমলারা আমাকে এই অধিকারটি দিবে না। এমন কি জনপ্রতিনিধিরাও দেবে না। আমরা জনপ্রতিনিধি বলি, কিন্তু আসলে সে ঐ মানসিকতা নিয়েই হয়। একটি শাসনের মানসিকতা নিয়ে হয়। তাঁকে আমরা ভাষায় বলি জনপ্রতিনিধি। এটি হয় না। সুতরাং নিদেনপক্ষে তার সেবাটি পাবে, এটি আমি ধরছি না। কিন্তু তার violation হইলে সে protection পাবে কোথাও। সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আমি মনে করি যে, কোর্ট। জেলায় জেলায় কী করছি? নারীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোর্ট আছে, অর্থ ঋণের জন্য, টাকা আদায়ের জন্য

কোর্ট আছে। সুতরাং আমার যেগুলো মৌলিক অধিকার ছিল, সেগুলো ensure করার জন্য, সেগুলোর violation হলে তার বিরুদ্ধে যেন আমি যেতে পারি নাগরিক হিসেবে হাইকোর্টে না এসে। আপনার ওটির সাথে অনেকটা সম্পর্কিত। হাইকোর্টে এসে আমরা বলতে পারি। সেজন্য অনুচ্ছেদ ১০২-এর কথা বললাম। এখানে এসে বলতে পারি আমি কোন remedy পাই না। আমি শুধু বলতে পারি যে, ও আমারে নির্যাতন করতেছে, সরকারকে বলতে পারে যে থামাও। অথচ আমার নির্যাতনের কোনো remedy নাই। এতে যে করল, সে আরো promoted হয়। তার কোনো সমস্যা হয় না। সে এটিকে উপভোগ করে। সুতরাং এটিকে বন্ধ করার জন্যে আমি মনে করি, বিদ্যমান যে কাঠামো আছে, তার মধ্যেই এই জুডিশিয়ারি থেকে আরেকটি কোর্ট বানানো সম্ভব। যদি আমরা অধিকারগুলোকে বলে দেই যে, এগুলো নাগরিকের অধিকার। একই সাথে আপনারা যেটা বললেন যে, বিদ্যমান সংবিধানেও যেটি সম্ভব এবং জনাব হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ যেটি করেছিলেন যে, ৬টি সার্কিট করেছিলেন। Unitary stateও যদি থাকে, আপনি যদি autonomy অন্য কাউকে না দেন, আপনি federal character-এ নাও জান, তারপরেও একক পদ্ধতির মধ্যেও হাইকোর্টের তো বেঞ্চ আপনি করতেই পারেন। আপনি কমপক্ষে প্রতিটি বিভাগে কেন হাইকোর্টের বেঞ্চ করবেন না? এগুলো হচ্ছে এরকম আলোচনা যে, আমাদের কিছুই হয় না। সব একসাথে করতে হবে বলে এরকম প্রাথমিক আলোচনা আমাদের করতে হচ্ছে। কেন এটি আলোচনা করতে হবে? মানুষের access to justice-এর জন্য আপনার ঢাকায় আসতে হবে, হাইকোর্টে আসতে হবে, আমাদের কাছে আসতে হবে- এরকম হতে পারে না। সুতরাং আমরা যদি বিস্তারিত বলতে পারতাম তাহলে বলতাম। তারপরেও আমি চেষ্টা করব লিখিত দেওয়ার জন্যে। সেখানে আরেকটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

অধ্যাপক মোহাম্মদ একরামুল হক (কমিশন সদস্য): প্রফেসর কে. শামসুদ্দিন মাহমুদ-এর কাছে আমার ছোট্ট একটি প্রশ্ন যে, আপনি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমাতে বলেছেন। ক্ষমতা কমাতে হবে। আমার কৌতুহল যে, আপনার কি কোনো ধারণা আছে না কি জাস্ট আমরা কমিয়ে দিব, নাকি কমানোর ক্ষমতাটি অন্য কোনো অথরিটিকে দিতে চাচ্ছেন? এই প্রশ্নটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক এই জন্য যে, সরকার পদ্ধতি গঠনের যে সনাতন ধারণা ছিল যে, prime ministerial form of government, presidential form of government -এখান থেকে আমরা আধুনিক দেশসহ বিভিন্ন দেশে দেখি যে, একটি balance type-এর বিভিন্ন ফরমেট দাঁড়াচ্ছে। সেটি কিছুটা presidential, কিছুটা prime ministerial ঐ ক্ষমতার রদবদল কারার জন্য বা কোথাও কমানো বা বাড়ানোর জন্য। এ বিষয়টি যদি আপনি পরিষ্কার করতেন?

জনাব **কে. শামসুদ্দিন মাহমুদ** (অংশীজন): আমরা তো infact already hybrid-এ আছি, ক্ষমতার দিক দিয়ে চিন্তা করলে। ২ টার্ম যদি না থাকে, কিছু কিছু ধারা আছে সংবিধানে, যেখানে তাঁর কাছেই যেতে হবে। লাটাই বা সুতার নাটিটা তাঁর হাতেই আছে। সেই বিষয়টি থেকে বের হয়ে আসার জন্য যেখানে যতটুকু করার, এই সংস্কার কমিটিকে সেটিই করতে হবে। তা না হলে ক্ষমতা কুক্ষিগত হবে এবং unfettered right ওখান থেকে তিনি চালাবেন। আপনারা তো সংবিধান বিশেষজ্ঞ। আমি না। আমি বিজনেস সেক্টরের লোক। ব্যবসা আমি পড়াই। আপনাদের আমন্ত্রণে আমি আসছি এবং মোটামুটিভাবে apparently যেটুকু মনে করার, এটি করার দরকার বলেছি। কিন্তু ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টাটি থাকতে হবে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, আপনারা এসেছেন।

দেড় ঘণ্টার বেশি সময় আমাদের সঙ্গে ব্যয় করলেন। আপনাদের মতামতগুলো আমাদের জন্য খুবই সহায়ক হবে। পরবর্তী সময়ে যদি আপনারা লিখিত বক্তব্য আমাদের সরবরাহ করেন তা আমাদের কাজে লাগবে। এই কাজগুলো আমাদের আরো সহজতর হবে। আশা করি, আপনাদের সেই সহযোগিতাটি আমরা পাব। এই বলে কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখনকা মতো অধিবেশন সমাপ্ত করছি।

ধন্যবাদ, সবাইকে।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

দ্বাদশ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল ৯.৩০ থেকে ১১.০০ পর্যন্ত

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:-

১।	**অধ্যাপক আলী রীয়াজ**, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক	কমিশন প্রধান
২।	অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল	সদস্য
৪।	অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫।	জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক	সদস্য
৬।	জনাব মোঃ মোসতাইন বিল্লাহ, লেখক	সদস্য

অংশীজনের তালিকা :-

১। নাসরিন বেগম, চেয়ারম্যান, আরবিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল,(এফবিসিসিআই)

২। চৌধুরী মকিমুদ্দিন কেজে আলী,প্যানেল আইনজীবী

৩। মোঃ জামিল উদ্দিন মিল্টন, উপমহাসচিব

৪। প্রকৌশলী মোঃ কবীর হোসেন, আহ্বায়ক, আইডিইবি, অন্তবর্তীকালীন কেন্দ্রীয় কমিটি।

৫। প্রকৌশলী মোঃ গিয়াস উদ্দিন, যুগ্ম আহ্বায়ক (ঢাকা), আইডিইব, অন্তবর্তীকালীন কেন্দ্রীয় কমিটি।

৬। কাদের গনি চৌধুরী, মহাসচিব (বিএফইউজে)।

৭। মোঃ শহিদুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ (বিএফইউজে)।

৮। সিনিয়র অ্যাডভোকেট মাহবুব উদ্দিন খোকন, প্রেসিডেন্ট (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন)।

৯। অ্যাডভোকেট মোঃ শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন)।

কার্যবাহের রিপোর্ট প্রস্তুতকারক ঃ

(১) এইচ, এম, আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সম্পাদনায়:

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহের রিপোর্ট:-

কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ। আমি এই সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে, সংবিধান সংস্কার বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেই কারণে, অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা অংশীজনদের আলোচনা ছোট ছোট আকারে রাখার চেষ্টা করেছি, যাতে করে আপনাদের কথাগুলো আমাদের শোনা সহজ হয় এবং সেগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন থাকলে আমরা আলোচনা করতে পারি।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকে অধিবেশনের শুরুতেই আমি সেইসব শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং আমরা আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় দিবেন।

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমরা অনুমান করতে পারি যে সিভিল সোসাইটির সক্রিয় অংশীদার হিসেবে এবং পেশাজীবী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে সংবিধানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে ও অনেক প্রস্তাব আছে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি অনুরোধ আপনারা যদি আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ ১০ মিনিটের মধ্যে তুলে ধরেন, তাহলে সকলের মতামত শোনার সুযোগ হবে এবং আলোচনা করা সম্ভব হবে। আপনাদের বিস্তারিত মতামত এবং প্রস্তাব ইতোমধ্যে আপনাদের কাছে লিখিত থাকে তাহলে আজকে দিতে পারেন অথবা আগামী ২২ নভেম্বরের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন। আপনাদের কাছে পাঠানো আমন্ত্রণপত্রে একটি ই-মেইল এড্রেস আছে সেখানে পাঠালে আমাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে এবং সেটিকে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে আমাদের কাজ সহজতর হবে। আজকের বক্তব্যের শুরুতে আপনারা এখানে একাধিক পেশাজীবী সংগঠনের সদস্য উপস্থিত আছেন। প্রত্যেকে পরিচিত হব এবং তারপর বক্তব্য শুনব।

(অতঃপর কমিশনে উপস্থিত অংশীজন তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমরা আজকে প্রথমেই এফবিসিসিআই এর পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনব। সময়ের স্বল্পতার জন্য যেটি আমরা অনুরোধ করেছি, যদি ১০/১২ মিনিটের মধ্যে সংক্ষেপে আপনাদের বক্তব্য রাখেন এবং লিখিতভাবে আমাদের দেন তাহলে সুবিধা হবে।

ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)।

মিসেস নাসরিন বেগম (চেয়ারম্যান, আরবিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল) : ধন্যবাদ স্যার।

আমরা আসলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুই দিনের নোটিসে মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করছি। আজকে যে কথাগুলো বলব সেটি হয়তো একাডেমিক discussion এর মতো হবে। আজকে আপনাদের পরামর্শ বা দিকনির্দেশনা পাই সে অনুযায়ী যে সময় দিবেন পরবর্তীতে আমাদের একটি লিখিত সুপারিশ দাখিল করব, ইনশাল্লাহ। আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই জানতে চাচ্ছি যে, as a whole সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে শুরু যে অনুচ্ছেদ ওয়ারি বিষয়গুলো রয়েছে, সেগুলোর প্রতিটির ওপর reflect করার সুযোগ থাকবে কি না এ বিষয়ে আমার একটু জানার দরকার আছে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আপনারা যে ফর্মেই জানাতে চান, সেটিই আপনাদের জন্য উন্মুক্ত। শুধু আপনারা না, আমরা যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে সেটি বলেছি। এমনকি আমরা সিভিল সোসাইটির সদস্যদেরও বলেছি। সুনির্দিষ্টভাবে যদি অনুচ্ছেদ ধরে বলতে চান সেটিও আমাদের জন্য সহায়ক হবে। সামগ্রিকভাবে যদি কিছু মন্তব্য থাকে, সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে যদি মতামত থাকে তাহলে সবকিছুই আমাদের সহায়ক হবে।

মিসেস নাসরিন বেগম (চেয়ারম্যান, আরবিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল): ধন্যবাদ।

প্রথমেই যেটি মনে হয়েছে যে, বিভিন্ন সংশোধনীর কারণে সংবিধানের যে রূপ পাল্টে গিয়েছিল, সেটিকে যদি আমরা বিবেচনায় নেই, তাহলে একটি সময় হবে, যে সংস্কারের জন্য প্রস্তাব করা হবে আশা করি আমাদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে প্রস্তাবনার অংশ বা প্রিম্বেলেও একটি সুপারিশ থাকবে। দ্বিতীয়ত বলছি যে, আমাদের সংবিধানে আছে যে, সকল নাগরিকের সমঅধিকার রয়েছে। ধর্ম বা বর্ণনির্বিশেষে সকলের যে বিষয়টি বলা হয়েছে, আমরা সেটিকে নিশ্চিত করার ব্যাপারে এই প্রস্তাবনা। আমরা আগেই বলেছি যে, আপনাদের কাছ থেকে একটি দিকনির্দেশনা পাওয়ার সুবিধার্থে আজকে আমরা একাডেমিক discussion এর মতোই আলোচনা করব। সেই হিসেবে আমরা বলতে চাচ্ছিলাম যে, তাদের কর্ম পালনের অধিকার নিশ্চিতকরণসহ সকলের মৌলিক যে অধিকার রয়েছে, সেই অধিকারগুলোকে যেন নিশ্চিত করা হয়। এই বিষয়টি আছে। কিন্তু এই বিষয়টি নিশ্চিত হচ্ছে কি না; এ বিষয়টির ব্যাপারে দিকনির্দেশনা করা যায় বা এ ব্যাপারে রাষ্ট্র কোনো ব্যবস্থা নিবে কি না; সেই ধরনের ব্যবস্থার ব্যাপারে আমাদের সুপারিশ থাকতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগের স্বার্থে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে জোর দিতে হবে। আমরা যেহেতু এফবিসিসিআইকে রিপ্রেজেন্ট করছি যে জন্য আমরা মনে করছি যে, ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন রয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য বান্ধব বিচারব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত বিচারকাজ দ্রুত সমাধানের জন্য জেলা পর্যায়ে পৃথক বিশেষ বেঞ্চ স্থাপন করা যেতে পারে। তা নাহলে দেখা যায় যে, এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অনেক সময় ব্যবসা বাণিজ্যে ক্ষতি হয়ে যায় বা মানুষের বিনিয়োগের যে বিষয়টি থাকে সেটি থেকে তারা আস্থা হারিয়ে ফেলে। ব্যবসার খরচ হ্রাস ও সময়ের সাশ্রয়ের লক্ষ্যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম জোরদার করা যেতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোর আয়-ব্যয় হিসাবের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের তহবিল সংগ্রহের পদ্ধতিকে নিয়ম নীতির মধ্যে আনতে হবে। সেই সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করতে হবে। শ্রমিক সংগঠনগুলো যাতে স্বতন্ত্রভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, সে বিষয়ে নীতিমালা থাকতে হবে। কোনো রাজনৈতিক দলের অনুগত হয়ে যাতে কোনো শ্রমিক সংগঠন পরিচালিত না হয় সে বিষয়ে আচরণ বিধি থাকতে হবে। শ্রমিকরা যাতে তাদের ন্যায়সঙ্গত মজুরি সময় মতো পেতে পারে, সে বিষয়ে নীতিমালা থাকতে পারে। আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি যে, শ্রমিকদের প্রাপ্য যে মজুরি, সেটি সময় মতো না পাওয়ার কারণে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে। সুতরাং এ বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রচলিত শ্রম আইন রয়েছে, সেই জায়গাগুলোতে আমাদের সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি। অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন কোনো কার্যক্রম যাতে পরিচালিত না হয়, সে বিষয়ে রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠনসমূহের সাথে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে পারে। রাজনীতিবিদরা ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ যাতে ব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকতে হবে। এই নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা তদারকির জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। জনসাধারণের মৌলিক অধিকার যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা- প্রকৃত পক্ষে এই অধিকারগুলো নিশ্চিত হচ্ছে কি না; সে বিষয়টিকে আরও তদারকির মধ্যে আনতে হবে। নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর পদে পর পর দুইবার নির্বাচিত হলে বা একমেয়াদ বিরতির পর আবার নির্বাচন করার বিধান করা যেতে পারে। অনুৎপাদনশীল, অপ্রয়োজনীয় খাতে সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে সরকারের প্রতিটি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। জনবহুল ঢাকা শহরে নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য মেট্রোপলিটন সরকার গঠন করা যেতে পারে। এ সরকারের অধীনে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ঢাকা শহরে কয়েকটি municipality থাকতে পারে। এগুলো হচ্ছে আমাদের তাৎক্ষণিক চিন্তা, সেটা আমরা জানালাম। এখান থেকে যদি আমাদেরকে কোনো পরামর্শ বা দিকনির্দেশনা দেন তাহলে আমরা এটাকে আরও elaborate করে পরবর্তীতে যেটা দেয়া হবে, সেটিতে অন্তর্ভুক্ত করব। একই সাথে স্যার আমাকে যদি অনুমতি দেন আপনি সময় দিয়েছেন ২২ তারিখ, এটিকে দুই দিন বাড়ানো যায় কি না। আসলে আমার ব্যক্তিগত একটি সমস্যা রয়েছে। আমার স্বামীর মৃত্যুবার্ষিকী আগামী ২৩ তারিখে। আমি একটু ঢাকার বাইরে যাব। এটি যদি ২৫ তারিখ করেন তাহলে আমার জন্য একটু উপকার হবে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): অবশ্যই আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকেও ২৫ তারিখ পর্যন্ত চেয়েছি। সেহেতু আমরা এটি ২৫ তারিখ পর্যন্ত করলাম। আমার প্রক্রিয়া শুরু করার সময় যে তারিখ নির্ধারণ করেছিলাম সেটা আপনাদের জন্য যারা শেষের দিকে আসছেন তাদের জন্য অতি স্বল্প সময় হয়ে যাচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছি। ফলে সকলের জন্যই আমরা সহজেই ২৫ তারিখ পর্যন্ত নিতে পারি। কারণ আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছেও ২৫ তারিখ পর্যন্ত আশা করছি। ফলে বাস্তবিকভাবে যতটা সম্ভব সেই অর্থে। আপনাদের কাছে হয়তো কিছু প্রশ্ন থাকবে। আমরা সকলের কথা শুনব। তারপরে আমাদের সহকর্মীরা প্রশ্নগুলো তুলবেন। এরপরে আমরা যাচ্ছি বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস (বিএফইউজে) এর প্রতিনিধিদের কাছে।

জনাব কাদের গনি চৌধুরী, মহাসচিব (বিএফইউজে) : আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই যে, বাংলাদেশের জনগণের কাছে তার মালিকানা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। আমাদের বর্তমান সরকার সংবিধান সংস্কারের উদ্যোগ নেয়ায় ধন্যবাদ জানাই। আপনাকে ধন্যবাদ জানাই একটি গুরু দায়িত্বভার আপনি কাঁধে নিয়েছেন।

আমি সূচনায় না গিয়ে সরাসরি বলি। ইতোমধ্যে অনেকগুলো প্রস্তাব এসেছে। আমাদের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাবগুলো আমরা একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট চাই। কেন আমরা পার্লামেন্ট দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট চাই এর পিছনে দেখেন যে, আজকে কারা সংসদে নির্বাচিত হয়ে আসছে? আপনি যদি টিআইবির রিপোর্ট দেখেন তাহলে সেখানে কারা? এর অধিকাংশ স্বল্প শিক্ষিত, সমাজের গডফাদাররা, ইয়াবা গডফাদাররা চলে আসছে, চাঁদাবাজরা চলে আসে। বিভিন্ন লোক সংসদে ভোটের মাধ্যমে চলে আসে, এটি অস্বীকার করার সুযোগ নেই। জ্ঞানী গুণী মানুষগুলো নির্বাচনে গিয়ে তাদের কাছে muscle man নেই, অর্থ নেই, সেই জন্য তারা নির্বাচিত হয়ে আসতে পারছেন না। আমি নাম উল্লেখ করতে চাই না নির্বাচিত হয়ে আসছে বিভিন্ন এলাকার গডফাদাররা, ইয়াবা ব্যবসায়ীরা। এরা পার্লামেন্টে কী ভূমিকা রাখবে? আপনি বলুন। একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা চলে আসছে। কারণ রাজনৈতিক দলগুলো মনে করে যে, এদেরকে যদি আমি মনোনয়ন দেই, এরা তো নির্বাচিত হয়ে আসতে পারছে। আমাদের সরকার গঠনের জন্য এ ধরনের লোক দরকার। সুতরাং এরাই নির্বাচিত হয়ে আসছে। আমরা একটি সভ্য রাষ্ট্র, মানবিক রাষ্ট্র পাই না। পার্লামেন্টে জনগণের পক্ষে কথা বলার লোক থাকে না। পার্লামেন্টে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিল পাস হয়ে যায়। বিলের বিষয়ে আলোচনা হয় না। এজন্য আমরা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের কথা বলছি। যে পার্লামেন্টে নির্বাচিত যারা থাকবেন দেশের জ্ঞানী গুণীদের সমাবেশ ঘটবে উচ্চ কক্ষে। যে কক্ষে নিম্ন কক্ষের মতগুলো হয়তো সঠিক নয়, সেই মতামতগুলো উচ্চ কক্ষে গিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। আপনি জানেন আমেরিকায় বহু নিম্ন কক্ষের সিদ্ধান্ত উচ্চ কক্ষে গিয়ে বাতিল হয়ে গেছে। এজন্য আমরা মনে করি, একটি মানবিক বাংলাদেশ যদি গড়তে চাই এবং সত্যিকার অর্থে আইনের শাসন চাই, তাহলে আমাদের জন্য একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট একটি পার্লামেন্ট দরকার। আমি আবারও বলছি যে, যারা ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসে তাদেরকে আপনার বাদ দেয়ার সুযোগ নেই। ওখানে কারা আসছে? সেই বিবেচনা বোধ থেকে আমাদের একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট খুবই জরুরি।

আরেকটি হচ্ছে- কার্যকর নির্বাচন কমিশন। কার্যকর নির্বাচন কমিশন কেন? গত ৩টি নির্বাচন যদি আপনারা দেখেন এ নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারেনি। আমি নিজেও আমার ভোট দিতে পারিনি। বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিতে পারেনি। কারণ এই নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থাকে এমন করেছে ওরা একটি দলের দাসে পরিণত হয়েছিল। আমরা দলের দাস, দলনির্ভর, দল কেন্দ্রীক নির্বাচন কমিশন চাই না। আমরা একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন চাই। আমরা চাই যে, জনগণ যেন তার ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে পারে। কোনো দলের প্রতি যেন দায়বদ্ধ থাকতে না হয়। এমন একটি নির্বাচন কমিশন গঠনের বিষয়ে আমরা প্রস্তাব করছি। এ ব্যাপারে লিখিত দিব। আমি just pointগুলো বলে যাচ্ছি। আমরা আরেকটি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছি। যেটি হচ্ছে- নির্বাচনকালীন একটি নির্দলীয় সরকারের পক্ষে। এটি আজকে বাস্তব সত্য যে, কোনো দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ এবং নিরপেক্ষ হতে পারে না। এ যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্ম হয়। দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, জন আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিগত সরকার যে সরকারের পতনের পর এ ধরনের একটি সভা, মুক্ত পরিবেশে করতে পারছি। অতি উদ্দেশ্যে প্রণীতভাবে ফ্যাসিবাদি শাসনকে দীর্ঘায়িত করার জন্য ভোটাধিকার কেড়ে নেয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়েছে। আমি এখনো বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে ভোট দেন, ৯০ শতাংশ মানুষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে বলবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও মানুষের মতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য এমন একটি ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেয়া হয়েছে। আমি এই সভা থেকে ধিক্কার জানাই। আমরা মনে করি যে, জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য, জনগণের মালিকানা জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য একটি মানবিক রাষ্ট্র করার জন্য, একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আনা অতীব জরুরি। এ ক্ষেত্রে আপসের কোনো সুযোগ নেই। কেন বলছি, দলীয় সরকার নির্বাচনে জয়লাভ করার পর সরকারি সম্পদ এবং সুযোগ সুবিধা প্রয়োগ করে নির্দ্বিধায় তাদের কার্য চালায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলে সেই সুযোগটা থাকে না। আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বা নির্দলীয় সরকারের কথা বা নির্বাচনকালীন সরকারের কথা কেন বলছি; এ ধরনের সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সরকার সমর্থিত সন্ত্রাসীরা, muscle manরা নির্বাচনের কেন্দ্র দখল, জাল ভোট প্রদান, জোর করে বিরোধী দলের বা ভিন্ন মতের লোকদের ভোটদান থেকে বিরত রাখার সুযোগ পায় না। আমি কেন নির্দলীয় সরকার, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নির্বাচনকালীন সরকারের কথা বলছি এ ধরনের সরকার থাকলে প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে। ফলে level playing থাকে। আমি কেন এ ধরনের সরকারের কথা বলছি? এ ধরনের সরকার থাকলে দিনের ভোট রাতে হওয়ার যে কলঙ্ক সেই কলঙ্কের নতুন অধ্যায় আর তৈরি হবে না। তাই আমি মনে করি যাদের অন্তত নূন্যতম গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে, ভোটাধিকারের প্রতি যাদের সম্মান আছে, তারা অন্তত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবে না। আমি এ বিষয়টিকে নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করছি।

আরেকটি বিষয়- যেটি হলো ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা। আপনারা জানেন ভোটাধিকার হরণ, জনগণের বাকস্বাধীনতাকে কেড়ে নেয়া, মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া এবং মৌলিক অধিকারের প্রতিটি পদে পদে রাষ্ট্র যে প্রতারণা করেছে, সেটা থেকে মুক্তি। বৈষম্যমূলক যে আচরণ, নিরাপত্তা হেফাজতে যে মৃত্যু, আয়নাঘরের যে সৃষ্টি, গুম খুনের যে নজির স্থাপন, রাজপথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যে বেপরোয়া

আচরণ, বিদেশে অর্থ পাচার, শেয়ারবাজারে কেলেঙ্কারি, মানবাধিকার লঙ্ঘন, দুর্নীতির সর্বগ্রাসী যে আক্রমণ, সেটির প্রতিকার পেতে হলে সাংবিধানিক ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আমি কোনো বিকল্প দেখছি না। আমি মনে করি যে, এতে সরকারও অনেকটা পার পেয়ে যাবে। এই ন্যায়পালের কাছে সবকিছু যাবে। ফলে সরকারের জবাবদিহিতা অনেকটা কমে যাবে। যার কারণে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি। সব শেষে যেটি আমি বলব, সেটি পঞ্চদশ সংশোধনী। এই পঞ্চদশ সংশোধনীকে আমি মনে করি সংবিধানের বুকে একটি কুঠারাঘাত। আমি মনে করি, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানকে কলুষিত করেছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের সাথে চরম এক প্রতারণা করা হয়েছে। আমি মনে করি, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের যে অধিকার, সেই অধিকারের প্রতি চরম ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকার ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তাই আমি এই পঞ্চদশ সংশোধনী অবিলম্বে বাতিল বা যেসব ক্ষেত্রে ফ্যাসিস সরকার তাদের ব্যক্তি স্বার্থে, তাদের দলীয় স্বার্থে, তাদের নেতার স্বার্থে ব্যবহার করেছে, সেসব জায়গাগুলোকে সংশোধন করে এই পঞ্চদশ সংশোধনী হয় বাতিল অথবা সংশোধনী আনার জন্য। এক ব্যক্তি, এক পরিবারের পুজার জন্য এ ধরনের একটি সংশোধনী আনা হয়েছিল। আমি বিশদ কথা বলতে পারতাম। এ বিষয়ে আমি বিশদ না বলে শুধু ক্লুগুলো দিলাম। শীঘ্রই লিখিতভাবে আমরা আমাদের যুক্তিগুলো তুলে ধরব। সব শেষ যে কথা আমরা বলব, সেটি হলো বাংলাদেশের মানুষ যাতে বাকস্বাধীনতা পুরুটা পায়। শুধু শুধু এটা সংবিধানে থাকবে, কিতাবে থাকবে তা নয়। মানুষ যেন সেটা enjoy করতে পারে। আমরা একটি মানবিক বাংলাদেশ চাই। যে বাংলাদেশে গুম থাকবে না, খুন থাকবে না, লুট থাকবে না। আমার বোনেরা নির্বিঘ্নে চলতে পারবে। তারা ধর্ষিত হবে না। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ চাই, যেখানে বিদেশে টাকা পাচার হবে না। আমরা এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা চাই, এমন একটি বাংলাদেশ চাই যেখানে একই সাজায় খালেদা জিয়া নির্বাচন করতে পারে না, নাজমুল হুদা একই সাজা পেয়ে নির্বাচন করতে পারেন, হাজী সেলিম পারেন। এই অসভ্যতাকে আমরা দূর করতে চাই। আমরা সভ্য বাংলাদেশের নাগরিক হতে চাই। আমরা আশা করি, আলী রীয়াজ আপনি জাতির বিবেক। আমি আপনাকে দীর্ঘদিন যাবৎ চিনি। আপনি এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবি ছাত্র ছিলেন। আজকে জাতির এই দুঃসময়ে ফ্যাসিবাদ যখন বাংলাদেশে জেঁকে বসেছে আপনার লেখনি আমাদের উৎসাহিত করেছে। উজ্জীবিত করেছে। আপনাকে আজকে এখানে নেতৃত্বে দিয়েছে। আপনার কোনো দলের প্রতি পিছুটান নেই। আপনার কোনো স্বার্থ নেই, এটি আমি বিশ্বাস করি। এই আশা নিয়ে আমরা এখানে এসেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি এমন একটি সংস্কার প্রস্তাব দিয়ে যাবেন, যাতে আমরা একটি মানবিক বাংলাদেশ পাই। যাতে শোষণ বঞ্চনার শিকার আমাদেরকে হতে না হয়। বাংলার মানুষকে যেন তার ভোটাধিকার হারাতে না হয়। যেন কোনো fascism জেঁকে বসতে না পারে। সে ধরনের একটি প্রস্তাবনা আপনি দিবেন। এই সংস্কার কমিটি বা এই সরকারের পক্ষে এটি করা যায় কি যায় না। সরকারের পক্ষে কতটুকু করা যায় বা না যায়। আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন এটি অত্যন্ত ভালো দিক। আপনারা একটি প্রস্তাবনা দেন। সেই প্রস্তাবনা এই সরকারও করতে পারে। যদি আইনি কোনো বাধা থাকে তাহলে পরবর্তী সরকার করবে। কিন্তু উদ্যোগটা যেন ভেস্তে না যায়। এগুলো সফল হোক। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমাদের সঙ্গে এখন যোগ দিয়েছেন ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারসের পক্ষ থেকে দুইজন প্রতিনিধি। আমরা তাদের কাছে আসব। রেকর্ডের জন্য প্রথমেই আপনারা আপনাদের পরিচয় দেন। পরবর্তীতে সিনিয়র এডভোকেট মাহবুব উদ্দিন খোকন বলবেন। তারপরে আপনাদের কাছে বক্তব্যের জন্য আসব।

(অতঃপর কমিশনে উপস্থিত অংশীজন তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): বিএফইউজে এর পক্ষ থেকে আরেকটু সংযুক্তি আছে।

জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ (বিএফইউজে) : ধন্যবাদ স্যার।

আমি প্রথমেই জুলাই আগস্ট বিপ্লবে যারা শাহাদতবরণ করেছেন তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আহত অবস্থায় যারা এখনো চিকিৎসাধীন আছে তাদের সুস্থতা কামনা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার অল্প একটু বক্তব্য। হাতে লেখা বক্তব্য। ইনশাল্লাহ, পরবর্তীতে আমি লিখিতভাবে আপনাদের কাছে দিব। প্রথমেই আমি যেটা বলতে চাচ্ছি "সংবিধানের মূল ভূমিকায় আল্লাহর ওপর আস্থা বিশ্বাস থাকতে হবে এবং সেটা হবে সংবিধানের সব আইনের মূল ভিত্তি। সংবিধানের অন্যান্য ধারা বা অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই বলা হউক তা যদি এই মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে বাতিল বলে গণ্য হইবে।" দ্বিতীয়ত বর্তমান সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার যে ৪টি মূলনীতি রয়েছে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমি জানি যে, এই ৪টি নীতির একত্রে অবস্থান একটি রাষ্ট্রে থাকতে পারে না। প্রতিটি নীতি, আদর্শ একে ওপরের সাথে সাংঘর্ষিক বা পরস্পর বিরোধী। যা অবসান হওয়া প্রয়োজন। আমার পরামর্শ হচ্ছে- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হবে গণতন্ত্র বা জনগণের মতামত।

তৃতীয়ত নির্বাচন পদ্ধতি হতে হবে আনুপাতিক হারে। দলের প্রতীকে নির্বাচন হবে। দল থেকে মনোনয়ন দিবে। সে হবে সংসদ-সদস্য। তার কাজ হবে আইন প্রণয়ন করা অথবা আইন প্রণয়নে সহযোগিতা করা। বিদ্যমান অবস্থায় সংসদ-সদস্যরা এলাকার সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল ব্যক্তি। আর এ কারণেই আইন প্রণেতারা হয়েছেন এলাকার বড় মাস্তান বা গডফাদার। আমার মতে উন্নয়ন কার্যক্রম করবেন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা। যেমন- উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, শহর অঞ্চলের পৌর মেয়র এবং কমিশনার, সিটি করপোরেশন এলাকায় সিটি মেয়র এবং কমিশনারগণ। সর্বপরি সংসদীয় আসনে রাষ্ট্রের কোনো ক্ষুদ্র একক বা ইউনিট নয় যে এক একটি আসন থেকে ভোট বা অন্যান্য ভোটের মাধ্যমে পাস করে এলে তিনি হয়ে যাবেন সর্বেসর্বা। এতে অন্য ভোটারদের ভোটের কোনো মূল্যায়ন থাকে না। আসন ভিত্তিক নির্বাচনে সত্যিকার অর্থে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটে না। এই পদ্ধতিতে বারবার শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতার দাপটে স্বৈরাচার হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতেও তাই হবে। সুতরাং এই পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে আনুপাতিক হারে নির্বাচনের পদ্ধতি সংবিধানে সংযোজন করতে হবে। সবাই মিলে দেশ গঠন করতে হবে। ছোট, বড় সব দল মিলেই দেশ গঠন করতে হবে। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ জাতি ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিকে কেউ পরাভূত করতে পারে না। ভোটের আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে অতি ক্ষুদ্র দলেরও অংশগ্রহণ থাকবে জাতীয় সংসদে। তারাও দেশ গঠন বা আইন প্রণয়নে তাদের মতামত দিতে পারবেন। চতুর্থ- আস্থা ভোটের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাহলে সরকারের স্বৈরাচার হয়ে ওঠার প্রবনতা কমে যাবে। পঞ্চম: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ বাতিল করতে হবে। ষষ্ঠ: সংসদের মেয়াদ হবে ৪ বছর। সাপ্তম: রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। অষ্টম: জুলাই ২০২৪ ছাত্র গণঅভ্যুত্থানকে ধারণ করে সংবিধানকে নতুন করে লিখতে হবে। বিদ্যমান সংবিধানের ওপরে কিছু ঘষামাজা করে সংশোধন কাজ শেষ করা ঠিক হবে না।

ধন্যবাদ স্যার।

আসসালামু আলাইকুম।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আপনাদের লিখিত প্রস্তাব অনুমান করছি যে, এগুলো আমাদেরকে দিবেন।

আমরা এখন আসছি সিনিয়র এডভোকেট মাহবুব উদ্দিন খোকনের কাছে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের দুইজন প্রতিনিধি আছেন।

অ্যাডভোকেট মোঃ শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন) : ধন্যবাদ স্যার।

আমি মোঃ শফিকুল ইসলাম বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির কার্যকরি সদস্য।

আমার প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে যে, আমাদের preamble আছে, preamble এর দ্বিতীয় প্যারায় যে সংশোধনী এনেছে, সেই সংশোধনীতে আপনি দেখবেন যে, আমাদের উল্লেখ ছিল সর্ব শক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখিয়া এ কথাটি প্রতিস্থাপন করে ধর্মনিরপেক্ষতা দেয়া হয়েছে, এটি আবার পুনর্বহাল করতে হবে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে সংশোধনী করেছে এটি আবার পূর্বের অবস্থায় যেতে হবে। আর দ্বিতীয় প্যারাতে আরেকটি নতুনভাবে যুক্ত করতে পারেন। আমি এভাবে বলছি। পরে আমি লিখিত দিব। সেটি হচ্ছে জুলাই আগস্ট ২০২৪ এ ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে সাম্যের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা অন্যতম মূল নীতি হইবে। এই বিষয়টি দ্বিতীয় প্যারার সঙ্গে আপনারা যুক্ত করতে পারেন। অনুচ্ছেদ ৪(ক) যেটি সংশোধনী করা হয়েছে। ৪(ক) তে যেটি এনেছে। যেহেতু জাতির পিতার প্রতিকৃতি, এটি বাতিল করিতে হইবে। পূর্বে যেমন ছিল, ৪(ক) তে সব জায়গায় রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি থাকবে, এটি পুনর্বহাল করতে হবে। জাতির পিতার প্রতিকৃতি এ কথা বাদ দিতে হবে। পরবর্তীতে অনুচ্ছেদ ৭(ক) যেটি পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনা হয়েছে। ৭(ক) তে সংবিধান বাতিল, স্থগিত ইত্যাদি অপরাধ। যে বিষয়টি পুনর্বেশিত করা হয়েছে, এটি বাতিল করতে হবে। কেন না ৭(ক) দিয়ে মনে হচ্ছে যে, সংবিধান একটি পেনাল ল' এর মতো মনে হচ্ছে। যেহেতু আপনি sedition বলেন, সেটি স্পেশালি আমাদের পেনাল কোডের সেকশন ১২৪ এ স্পেসিফাই করা আছে। কোন কোন কাজগুলো sedition বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা হবে।

আমি মনে করি ৭(ক) যেটি এনেছে, এটি ফ্যাসিস সরকারের সহায়ক হিসেবে ৭(ক) এনেছে, এটি বাতিল করতে হবে। একই সাথে ৭(খ) যেটি আছে, যেটি তারা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংশোধন করেছে, যেটি মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য। আপনারা জানেন সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পার্লামেন্ট সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী পরিবর্তন করবে। সেখানে প্রসিডিউর দেয়া আছে টু থার্ড মেজরিটি। এখন ৭(খ) এর মাধ্যমে সেই পাওয়ারটা স্থগিত করে রাখা হয়েছে। আমি মনে করি ৭(খ)টি বাতিল করিতে হবে। এরপর আছে অনুচ্ছেদ ৮(ক) আপনার fundamental principle of state policy. এখানে ৮(১) এবং ১(ক) দুই জায়গাতেই আপনার

সর্ব শক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা, এটি বাদ দিয়ে তারা ধর্ম নিরপেক্ষতা করেছে। আমি মনে করি ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে আবার সর্ব শক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এই কথাটা প্রতিস্থাপিত হবে। আগে যা ছিল as it is আসতে হবে। এরপর বর্তমান সংবিধানের ৯ এ যেটি বলা আছে, এটি আমার ব্যক্তিগত মতামত। আপনারা বিবেচনায় নিতেও পারেন। এখানে বলা আছে 'জাতীয়তাবাদ'। জাতীয়তাবাদে বলা আছে ভাষাগত, সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি, এখানে একক সত্তার। আমি এখানে মনে করি যেটি, বিভিন্ন সত্তা আসতে পারে। কারণ আমরা বাঙালি। কৃষ্টি কালচারে দেখা যাচ্ছে যে, যারা সাওতাল বলেন বা হাজন বলেন বা অন্য সম্প্রদায় আছে, তারা কিন্তু বাঙালি না। কারণ আপনারা যখন এখানে একক সত্তা দিবেন তখন তাদের বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। আমি মনে করি, এখানে একক সত্তার জায়গায় বিভিন্ন সত্তা আনলে সকলকে include করা যাবে। যেখানে বাঙালি কথাটা আছে সেখানে আপনারা বাংলাদেশি দিতে পারেন। আগে যেটি বাংলাদেশি ছিল। এই পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাঙালি কথাটি এনেছে। আপনারা চাইলে বাঙালির জায়গায় বাংলাদেশি দিতে পারেন। আর আগের সংবিধানে যেটি ছিল, অনুচ্ছেদ ৯ এবং ১০। স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন এবং জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ। ৯ এবং ১০ যেটি ছিল, আমার মতে আপনারা আবার পুনর্বহাল করতে পারেন। যেটা পঞ্চদশ সংশোধনীতে বাদ দেয়া হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনীতে যেটা ছিল সেটি আবার পুনর্বহাল করতে পারেন। বর্তমানে অনুচ্ছেদ ১২ তে রয়েছে, ধর্ম নিরপেক্ষ, ধর্মীয় স্বাধীনতা। এটি আমার মতে আপনারা বাতিল করতে পারেন। অনুচ্ছেদ ১২ secularism যেটি আছে। এরপর যেটা most importantly. যেহেতু আমরা সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনকে represent করছি। অনুচ্ছেদ ২২ নিয়ে আমি একটু বলতে চাই। আপনারা জানেন বিখ্যাত মাসদার হোসেন মামলায় ২০০৭ সালে জুডিশিয়াল separate হয়েছে। এটা কাগজে কলমে separate হয়েছে। প্রকৃত অর্থে যে separation, সেটা কিন্তু আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি নাই। কারণ আপনারা দেখেন এখনো আমাদের বিচার বিভাগের জন্য আলাদা কোনো সচিবালয় নেই। যার দরুন আমাদের বিচারক যারা রয়েছেন, from higher judiciary to lower judiciary, their controll by the Ministry of law. আমি মনে করি অনুচ্ছেদ ২২ এ আমাদের যে spirit, এটি যদি আপনি able করতে চান, তাহলে অবশ্যই পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আপনারা জানেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি already ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর মেয়াদেই এটা করবেন। আরেকটি বিষয় আছে যে, আমাদের বিচারকদের যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিধি। এই নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিধি এখনো প্রণয়ন করা হয়নি। আমি মনে করি যে, নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিধি অনুচ্ছেদ ২২ এর আলোকেই ব্যবস্থা নিতে পারেন। সুতরাং অনুচ্ছেদ ২২ এর ক্ষেত্রে আমার specific পরামর্শ হচ্ছে যে, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে স্পিরিট, এটাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। এখানে time frame দেয়া নেই। যার সুবিধা নিচ্ছে বিভিন্ন সরকার। আমি মনে করি এটার specific করে এটা সংবিধানে time frameটি দিতে পারেন যে, এত সময়ের মধ্যে আপনাদেরকে অবশ্যই বিচার বিভাগের separate সচিবালয় এবং বিচারকদের নিয়ম শৃঙ্খলা বিধি প্রণয়ন করতে হবে। এটা আপনারা অনুচ্ছেদ ২২ এ আর্টিকেল specifz করতে পারেন। এরপর অনুচ্ছেদ ৪৮ এ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রী একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। অনুচ্ছেদ ৪৮ এ এসে আপনি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনতে পারেন। কারণ রাষ্ট্রপতির প্রতিটি কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিতে হচ্ছে। এ জন্য দেখা যাচ্ছে check and balances দরকার। অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) অনুযায়ী আমার পরামর্শ হচ্ছে ভারসাম্য আনবেন। article fifty seven এ যেটা আছে- আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ। সে ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাবনা হচ্ছে "কোনো ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পর পর দুইবারের বেশি নির্বাচিত হইয়া দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।" আমি মনে করি এটা ভালো হবে। আপনারা আর্টিকেল সেভেনে add করতে পারেন। আর একটি বিষয় already এসেছে। অনুচ্ছেদ ৫৮(খ) (গ) (ঘ) (ঙ) যেটা আমাদের caretaker government ছিল। যেটা ত্রয়োদশ সংশোধনীতে বিচারপতি লতিফুর রহমানের মাধ্যমে এসেছিল। এটা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে। আমি মনে করি যে, বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা আবার free fair, impartial করার জন্য। অনুচ্ছেদ ৩৮ এ যে caretaker government আছে, এটি আবার আপনারা পুনর্বহাল করতে পারেন। এরপর আছে অনুচ্ছেদ ৬৫। আপনারা জানেন, এই জাতীয় সংসদে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান একটি প্রস্তাবনা দিয়েছেন যে, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হইবে এবং দ্বিকক্ষ বিশিষ্টের ক্ষেত্রে তিনি একটি upper house এর ধারণা দিয়েছিলেন। সেটিই আমি বলছি যে, দেশে প্রথাগত রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নন, কিন্তু দেশ গঠন, উন্নয়ন ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে চান এমন অসংখ্য জ্ঞানী গুণী শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, আইনজীবী, সাংবাদিক, গবেষক, চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, মানবাধিকার কর্মীদের সমন্বয়ে অনধিক ১০০ জন সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ কক্ষ গঠিত হইতে পারে। আপনারা জানেন যে, human rights commission ২০০৯ এর seven অনুযায়ী যেভাবে মানবাধিকার কমিশন গঠনের বিষয়ে বলা হয়েছে, চেয়ারম্যান বা অন্যান্য মেম্বারদের নিয়ে সার্চ কমিটি গঠনের কথা বলা আছে- আপনারা চাইলে ওই আইনের মতোই একটি সার্চ কমিটির মাধ্যমে উচ্চকক্ষের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন এবং নিম্নকক্ষের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে, আমাদের বর্তমান সংবিধানে যে সংসদ চালু রয়েছে, যারা সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হবেন, তারা নিম্ন কক্ষের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন। আপার হাউসে representative দ্বারা হতে পারে। আর্টিকেল ৭০ যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অনুচ্ছেদ ৭০ এ যেটি বলা আছে, কোনো সংসদ

সদস্য তার দলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারে না। আমি বলি এটা উচিত না। আপনাদের এটাতে সংশোধনী এনে অবশ্যই member of parliament থাকবেন, কিছু কিছু বিষয়ে তারা মনে করলে নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোটদান করতে পারবেন। এটা পুনর্বহাল করা উচিত। এরপর যেটা এসেছে যে, ombudsman বা article 77 এ যে ন্যায়পাল। আইনে ন্যায়পালের কথা বলা আছে। কিন্তু তা বাস্তবায়নে নেই। আমি মনে করি যে, এখন সুযোগ এসেছে স্যার। আপনাদের মাধ্যমে ন্যায়পাল নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সুনির্দিষ্ট time frame দিয়ে আপনারা অবশ্যই ন্যালপাল নির্ধারণ করার জন্য বলবেন। আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ যেটি অনুচ্ছেদ ৯৫ তে আছে। আমরা যেহেতু হাইকোর্টে আছি। অনুচ্ছেদ ৯৫ এ বিচারক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৯৫ এ বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই, যার দরুন দেখা যাচ্ছে যে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক অনিয়ম দেখা যায়। আমি মনে করি, article 95 এ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করতে পারেন। আমার সর্বশেষ suggestion আর্টিকেল ১০৬। যেটা আপনারা already দেখেছেন। আমাদের অন্তবর্তী সরকারের ক্ষেত্রে একটি রেফারেন্স আর্টিকেল ১০৬ অনুযায়ী honorable appellate divission একটি মতামত নিয়েছিলেন। ১০৬ যে একটি কথা নেই, সেটি আপনারা চাইলে add করতে পারেন যে, "দেশে কোনো সংবিধানিক সংকট তৈরি হইলে আপিল বিভাগ রাষ্ট্রপতিকে মতামত প্রদানের মাধ্যমে সংকট নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারেন।" এই কথাটি উল্লেখ নেই। যেহেতু এ রকম একটি অবস্থা তৈরি হয়েছিল। আমি মনে করি সাংবিধানিক সংকট এই শব্দটি আপনি সন্নিবেসিত করতে পারেন। আমার এটা লিখিত দেয়া আছে। আপনাদের যে সময়সীমা দেয়া আছে, সেই সময়সীমার মধ্যে মেইল করে আবার আপনাদের এটা দিয়ে দেব। আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ দেয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

আসসালামু আলাইকুম।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

অ্যাডভোকেট মাহবুব উদ্দিন খোকন আপনি কি এর সঙ্গে কিছু যুক্ত করবেন।

অ্যাডভোকেট মাহবুব উদ্দিন খোকন, সভাপতি (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন) : ধন্যবাদ।

সরকার কর্তৃক মনোনীত সংস্কার কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান, মেম্বারগণ এবং এখানে যারা আসছেন, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

আমি বিস্তারিত একটু পরে যাব। আমি প্রথমেই বলতে চাচ্ছি যে, যেটি আমি সব সময় বলে আসছি। সংবিধান সংশোধন করতে হবে। অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ হচ্ছে, 7(A) & (B). একটি সংবিধান পরিবর্তন করতে পারবে না! সারা পৃথিবীতে এ রকম কোনো নজির নাই। নজিরবিহীন। সংবিধানের সংশোধন দরকার আছে। আলোচনা বা খুব আলোচনা হচ্ছে যে, amendmend প্রয়োজন বা আবার কেউ বলে rewrite করতে হবে। নতুন করে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। sound is very good but how are you going to be enforce it.

আমরা কেউ enforce করব বা অন্তবর্তী সরকার কীভাবে address করবে। এ সরকার কোটি কোটি মানুষের আকাঙ্ক্ষার ফসল। অনেকে আত্মহুতি দিয়েছেন। কমপক্ষে দেড় হাজার লোক আত্মহুতি দিয়েছেন। তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। যারা আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। Are you going to the enforce the proposed amendment or rewrite the constitution? Who are under the constitution? Have we the power to amend it? অনেকের আলোচনা আছে যে, আমরা গণভোটের মতো একটি আয়োজন করব বা শুধু সংবিধান বা অনুমোদনের জন্য আমরা একটি প্রতিনিধি নির্বাচন করব। এখনো অর্ন্তবর্তী সরকার সংবিধানের ধারাবাহিকতায় আছে। We have not having martial law বা বিপ্লবী কোনো সরকার বা সংবিধান বা কোনো আইনকানুন কিছু নাই। আমরা কিন্তু still depends of this constitution. এ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমার কাছে এখনো আসে নাই। আমি আইনজীবী হিসেবে practice করছি। আইন বিষয়ে হিসেবে পড়াশুনা করেছি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়ালেখা করেছি। ২০০৮ সালের পার্লামেন্টে ৩০জন এমপির মধ্যে আমি একজন ছিলাম। আমার কাছে এখনো এর answer আসে নাই যে আমরা এটা কীভাবে করব? Amendment বলেন বা নতুন করে সংবিধান লেখা বলেন। বর্তমান সরকার অর্ন্তবর্তী সরকার, সেই সরকারের ১০০ দিন হয়ে গেল। এ রকম কোনো আমরা কর্মকাণ্ড দেখছি না যে তারা radical কোনো চেঞ্জ করবেন। যেমন ধরেন ইরানে সরকার আসার পরে পরিবর্তন হয়ে গেছে। আগের constitution নেই। সেখানে ইসলামি আইন হয়ে গেছে। আফগানিস্তানে পরিবর্তন হয়েছে। total redical change তাহলে ওই sisuation আসতে পারে বা communism আসছে। change আসতে পারে। কিন্তু এখানে redical change কোনো কিছু নেই। hundred daysতে আমরা এমন কোনো spirit দেখছি না। আমরা কীভাবে approved করব। অনেকের ধারণা সংবিধান পরিবর্তন। এটি হলো first question যে খুব difficult situation হয়ে যেতে পারে। আর সংবিধান যদি বাতিল করি। অনেকে খুব emotional বক্তব্য রাখবে সংবিধান বাতিল

করলে। সংবিধান বাতিল করলে আমরা রাজনৈতিক সংকটে পড়ে যাব। মানুষ কিন্তু ১৬-১৭ বছর আন্দোলন করছে এবং ছাত্ররা সামনে আসার পর সেখানে ধরেন ১ লক্ষ লোক ছিল। কিন্তু ১৫ থেকে ২০ লক্ষ লোক নিয়ে সমাবেশ করেছি, সরকার পরিবর্তন হয়নি। পুলিশ ছিল আগের সরকারের ভিত্তি বা ফাউন্ডেশন। পুলিশ confederation এ চলে গেল। কারণ Government was based on the police and RAB. ছাত্ররা confederation এ যাওয়ার পর সরকারের পতন হলো। সেখানে ছাত্রদের দাবি ছিল চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে হবে, সংস্কার করতে হবে। সমগ্র দেশবাসী তাতে সমর্থন দিয়েছে। আমি নিজেও মাঠে ছিলাম। ওটাই mandate ছিল। ওটাই peoples support দিয়েছে। তারা আজকে রাষ্ট্রীয় সংস্কারের কথা বলছেন, রাষ্ট্রীয় সংস্কারের বক্তব্য তো সে সময় দেন নাই। তখন তো রাষ্ট্রীয় সংস্কারের question আসবে। সেই সময় কিন্তু mandate ছিল না। These are duty of the politicians. আমরা যদি রাষ্ট্রীয় সংস্কার করতে যাই, এই সরকার, ওই সরকার, তাহলে কতটুকু আগাতে পারব। মনে রাখতে হবে যে, জাতি কিন্তু বিভক্ত রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে। আমরাতো নির্বাচনি এলাকা maintain করি। আমি নিজেও গতকাল এলাকায় ছিলাম। প্রতি weekend এ এলাকায় থাকি। নোয়াখালী-১ এ। সচেতন লোকের বেশির ভাগ রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ। ঠিক আছে- সংবিধান সংশোধন হবে কি হবে না, এ জন্য একটি গণভোট বা কিছু একটা ইলেকশন করেন যদি। আমার মনে হয় যে, এখানে ১৫% লোক ভোট দিতে আসবে না। কারণ এখানে রাষ্ট্রগত ক্ষমতায় কারা আসছে তাতে পরিবর্তনের কিছু নাই। আমাদের জন্য সংবিধান গুরুত্বপূর্ণ। সচেতন নাগরিকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত লোকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মানবাধিকার কর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের মানুষের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ না। তাদের কাছে হলো চালের দাম কোন সরকার কম রাখছে। মাছের দাম কম রাখছে। ডালের দাম কম রাখছে। হানাহানি কম। মারামারি কম। চুরি ডাকাতি কম। আমরা খেয়ে পরে বাঁচতে পারছি কি না। That is their concern. আমরা referendum বা গণভোটে যাব। সেখানে suppose ১৫% ২০% ভোট পড়ে। আমরা সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা চাই। আমরা সরকারকে support দিতে চাই। তাহলে এটা loss করবে। একটি পক্ষ ভোট দিবে না আর অন্য পক্ষ ভোট দিবে। আমরা referendum এ যদি পুলিশ involve হয়, ভোট বাড়ানোর জন্য তাহলে আবার বিতর্ক সৃষ্টি হবে। এ জন্য very very important is this a question now. Enforcement of the propose amendment of the constitution or reject in of the constution. আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বর্তমান সংবিধান বাংলাদেশে চলতে পারে না। অনেকগুলো প্রভিশন আছে, যেটা অকার্যকর। আমরা যদি নতুন করে লিখতে যাই। আমরা বলছি যে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। আরেক জনে বলতে পারে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এই আমার ভাই বললেন যে, ইসলামি জাতীয়তাবাদ। এই মৌলিক বিষয় থেকে জাতি বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। মৌলিক কিছু কিছু বিষয়ে জাতি বিভক্ত হয়ে যাবে। আমরা তাহলে এগিয়ে যেতে পারব না। সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেগুলো আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য করেছিল। আমি মনে করি যে, সেগুলো সংশোধন হওয়া উচিত। আর দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের কথা আলোচনায় আসছে। এই Idea is very nice. ১৭ কোটি বা ১৮ কোটি মানুষের দেশ। একটি কেন্দ্রীয় সরকার সবদিক খেয়াল রাখতে পারে না। প্রত্যেক সরকারের সময় কোনো এলাকার উন্নয়ন হয়। এক এলাকা বা দুই এলাকার উন্নয়ন হয়। আর অন্য জায়গায় উন্নয়ন হয় না। আমি মনে করি যে, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট থাকা উচিত। তবে কী রকম হবে? যেমন হাউস House of Commons. আমাদের যেটা জাতীয় সংসদ।

উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষে যদি নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়। উচ্চকক্ষে বেশির ভাগ মনোনীত হবে, পেশাজীবী হবে। এখন নিম্নকক্ষ জনগণের প্রতিনিধি করে যে কক্ষের যদি যে কোনো প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা থাকে তাহলে তো এটা conflicting হবে। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-চেতনার conflicting হবে। আবার শোনা যাচ্ছে যে, মনোনীত করা হবে। পত্রপত্রিকায় আসছে যে, রাষ্ট্রপতি ২০% মনোনীত করবে। তিনি নির্বাচিত হয়ে এসে elected mandate-এ তিনি বৈরি ভোট দিবে, হারিয়ে দিবে এবং defect দিবে, সেটি তো হয় না।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): অ্যাডভোকেট মাহবুব উদ্দিন খোকন আপনার বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সময় স্বল্পতা বিবেচনায় যদি একটু সংক্ষিপ্ত করা সম্ভব হয়। আরো যারা আছে তাদের বক্তব্য শুনতে হবে। আমাদের সহকর্মীদের কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে।

অ্যাডভোকেট মাহবুব উদ্দিন খোকন (সভাপতি, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন) : আমি সংক্ষিপ্ত করছি। Then power and function. সংসদ-সদস্যদের আসন বাড়াতে পারে। আর মহিলা সংসদ-সদস্য। রিজার্ভ সিট। What is this? এটার দরকারটা কী? আপনি বরং mendatory করে দেন যে, এখানের মধ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে আনুপাতিক হারে প্রার্থী দিতে হবে। ২৫% বা ৩০% বাধ্যতামূলক। এখন আর সেই যুগ নেই। পঞ্চদশ সংশোধনীর সেই অবস্থা নেই। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক ঠিক আছে যে, এত শতাংশ তাকে দিয়ে দিতে হবে। তারা তো পার্লামেন্টে সমান সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। But they are not elected by the people. Elected আর non elected একসাথে বসছে। বরং তারা যদি মাঠে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসে, তাহলে মহিলাদের জন্য অনেক

সম্মানজনক হবে। সংরক্ষিত আসনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। তাদেরকে কোটা ভাগ করে দেন যে, এত শতাংশ দিতে হবেই প্রতিটি রাজনৈতিক দলের। তাহলে তারা সমান সুযোগ পাবে। আমার মনে হয় যে, মহিলাদের third class, second class মানের রাখছি। second class এমপি। আর নির্বাচিতরা first class এমপি, এটা হয় না। আর ইলেকশন কমিশন। They are very important tools. We have the constitution. আইনও আছে যে, ইলেকশন কমিশনে আমরা কোনো সংস্কার দেখছি না। সেখানে ডিসি, এসপি, রিটার্নিং অফিসার, ইউএনও। আমার ইলেকশন কমিশন আছে। ডিসি সাহেবকে বানাচ্ছে। ডিসি সাহেব সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছে। আবার নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিত্ব করছে। দুইয়ের মধ্যে এক। উপজেলায় ইউএনও সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছে আবার নির্বাচনে দায়িত্ব পাচ্ছে। মন্ত্রী সাহেব গেলে ডিসি সাহেব প্রটোকল দেয়। আবার নির্বাচনের সময় নিরপেক্ষ হয়, এটা হয়? আমার মনে হয় যে, এটা পরিষ্কার করা উচিত। যেটা ইলেকশন কমিশনকে দায়িত্ব দেয়া উচিত। আমি খুব সংক্ষিপ্ত করছি। ইলেকশন কমিশন যেটা করছে, গত ১৬ বছর আমাদের সমগ্র জাতিকে শেষ করে দিয়েছে। কী রকম? ডিসি, এসপি, ওসি এরাতো আছেই। ভোটগ্রহণের জন্য শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়। প্রিজাইডিং অফিসার ও পুলিং অফিসার হিসেবে। সবাইকে ভোট চুরি করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। যে সকল শিক্ষক ভোট চুরির সাথে জড়িত এরা ছাত্রদের কী শিক্ষা দিবে; আপনি বলেন? জেনারেশন কিন্তু অনৈতিকভাবে অনৈতিক শিক্ষকতা শিখছে। শিক্ষকদের আপনি অন্তর্ভুক্ত করলেন, কিন্তু আপনি তাকে চুরি শেখালেন। ফলে ভবিষ্যৎ জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হলো। বিচার বিভাগ খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিচার বিভাগের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি সেদিকে যেতে চাচ্ছি না। বিচার বিভাগ শক্তিশালী না হলে গণতন্ত্র কার্যকর হবে না। বিচার বিভাগ শক্তিশালী না হলে আইন শৃঙ্খলার উন্নতি হবে না। মিসেস নাসরিন বললেন যে, "বিচার বিভাগ শক্তিশালী না হলে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হবে না।" বিচার বিভাগ শক্তিশালী না হলে আপনার পার্লামেন্ট ঠিক থাকবে না। বিচার বিভাগকে গুরুত্ব দিতে হবে। পৃথক স্বাধীন বিচার বিভাগ করতে হবে। এখনো আইন মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করে। নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিচার বিভাগের নীতিমালায় এগুলো আনতে হবে। আপনার professional representative. What is this? এখন আপনার সংখ্যা চিন্তা করলে তো হবে না। যারা দুর্বল। যারা ভাগ চায়। সারা দেশে হয়তো দেখা যাবে যে, ৫০ হাজার বা ১ লক্ষ ভোট পাবে। তাদের দরকার professional representative. নির্বাচন complete করবেন জিতবেন না হারবেন। professional representative কেন? আমি মনে করি যে, একটি bad idea. কোথায় আছে? আমরা বৃটিশ সিস্টেম পার্লামেন্ট ফরম করব নাকি প্রেসিডেন্ট ফরম follow করব। যারা ছোট দল, কোনোভাবে রেজিস্ট্রেশন করেছে। আর যারা মনে করেছে যে, আমাদের রিজেক্ট করবে, আগামী ২০ বছরের মধ্যে মেজরিটি পাব না। তারা মনে করে যে, professional representative হলে একজন পার্লামেন্টারিয়ান বাড়তে পারে। আমি মনে করি যে, just rubbish idea. বাংলাদেশে এটা চিন্তা করা উচিত না। complete করেন। ভোটে যান। জনপ্রতিনিধি যাচাই করুন এবং যে জিতবেন সে পার্লামেন্টে আসবেন। আপনার দল পার্লামেন্টে আসবে। আমি মনে করি যে, এটি very bad idea. এটা আমি professional representative মনে করি না। এটা বাংলাদেশে হওয়া উচিত। আর সার্বিক দিয়ে আমি মনে করি যে, একই কথা বলছি। আমরা যা যা আলাপ করছি সেগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন হবে? প্রথমত নির্বাচন কীভাবে বাস্তবায়ন হবে? আমি মনে করি, আমার মতামত হতে পারে reasonable wayতে। সবাই সংস্কার চায়। কিন্তু সবাই একইভাবে চায় তা নয়। তাদের মধ্যে একটি ঐক্যমত সৃষ্টি হওয়া উচিত। তাদের মধ্যে লিখিত একটি আলোচনা থাকবে পারে যে, হাঁ, অন্তবর্তী সরকার এই প্রস্তাবগুলো দিয়েছে, আমরা একমত। আমরা নির্বাচিত হওয়ার পরে এভাবে করব। Because you can not force the people. যে তারা আগের পার্লামেন্টের মতো এভাবে করতে পারবেন না। সুবিচার পায়। এমপিদের আপনি বাধ্য করতে পারবেন না। আপনারা একটু ঐক্যমত সৃষ্টি করেন। তারা একটি আলোচনা করে একটি ঐক্যমত সৃষ্টি করবেন। একটি লিখিত ঐক্যমত থাকবে যে, আমরা এগুলো এগুলো করব। একমত হয়ে জনসম্মুখে ঘোষণা দিব। তাহলে পার্লামেন্টের নির্বাচন শেষ হওয়ার দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সংসদে আমরা এগুলো করব। যেটি ১৯৯১ সালে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন সাহেবের ব্যাপারটি হয়েছিল। আমি মনে করি যে, more reasionable way তে করা উচিত। সারা পৃথিবীতে আমরা ডিফারেন্ট হয়ে যাব। parliament form or presidential form. আমরা ভাগাভাগি করতে চাচ্ছি না। আপনি চেক এন্ড ব্যালেন্সে থাকেন। প্রেসিডেন্টকে তো এমপিরা বানাবে। যতই আপনি লেখেন না কেন; লাভ হবে না। এনপিরা বানাবে অমুক লোককেই। সরকারি দল অমুলক লোককে বানাবে। ফলে তাদের কথা শুনবে। সুতরাং সংবিধানে কিছু কিছু provision থাকা উচিত। আমি মনে করি যে, যাতে চেক এন্ড ব্যালেন্স থাকে। আমি সর্বশেষ বলতে চাচ্ছি যে, ১৬ বছর যে সংবিধান লঙ্ঘন করল, মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারল না, কোনো বিচার আছে? রিটানিং অফিসার ডিসি এসপির বিচার হয়েছে? আসলে তা নয়। করোই বিচার হয়নি। এই সরকার যদি বিপ্লবী সরকার হয়, প্রকৃত সংস্কার যদি চায়, তাহলে ২০১৪ সাল, ২০১৮ সাল এবং ২০২৪ সালে যে ডিসি, এসপি, ইউএনও ভোট চুরিতে জড়িত ছিল, তাহলে তাদেরকে চিহ্নিত করা হোক। তাদের বিচার করা উচিত। বিচার করতে পারলে বুঝব আপনারা আগাতে পারবেন নতুবা এটা কালক্ষেপণ। আমি মনে করি, এসব কালক্ষেপণ করে পার্লামেন্টের ইলেকশন যত দেরি হবে, তত জাতীয় সংকট সৃষ্টি হবে। আমার তেমন ধারণা। তাদেরকে আগে বিচারের ব্যবস্থা করেন। তাদেরকে বিচারের ব্যবস্থা করতে কোনো অসুবিধা নেই। তাদের বিচার করবেন না! আসলে কী জানেন; বাংলাদেশে মানুষের ধারণা গ্রাম গঞ্জে মুরগী চোরের বিচার হয়। কিন্তু সংবিধান লঙ্ঘন করলে কোনো বিচার হয় না। লঙ্ঘনকারীর বিচার হয় না।

সকলকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমরা এখন ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারসের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনব।

প্রকৌশলী মোঃ কবীর হোসেন (আহ্বায়ক, আইডিইবি) : ধন্যবাদ।

আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলি আসসালামু আলাইকুম।

আমরা একটি সমস্যার কথা বলে নিতে চাই। মাত্র দুই দিন আগে আমরা খবর পেয়েছি যে, এখানে আমাদের আসতে হবে। আরো সমস্যা হচ্ছে যে, ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারসের ৫৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এবং গণপ্রকৌশল দিবস নিয়ে আমরা ৬ নভেম্বর থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত এত ব্যস্ত ছিলাম যে, এদিকে নজর দেয়ার সুযোগ পাইনি। যে কারণে যেভাবে চেয়েছেন ওইভাবে আমরা আনতে পারিনি। আর সেভাবে প্রস্তুতিও নিতে পারিনি। তারপরও সামান্য দু একটি কথা আমরা বলব। সেখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তা সম্মানিত ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন সাহেব যে কথাগুলো বলেছেন তার অধিকাংশ আমার বলার ইচ্ছা ছিল। সুতরাং তাঁর কথাগুলো যদি আনা যায় তাহলে সেখানে আমার কথা এসে যাবে। তারপরও দু একটি কথা বলি, সেটি হচ্ছে যে, বর্তমান যে অবস্থা। বাংলাদেশে যে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে স্থায়ী সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষে একটি নির্বাচনকালীন দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। যেটা বাতিল করা হয়েছে আবার সেটা পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। আমি এখানে আরেকটু যোগ করতে চাই যে, সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার নির্বাহী ক্ষমতায় ভারসাম্য আনতে হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষে নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ও কর্তব্যের সুষ্ঠু সমন্বয় করতে হবে। আর পর পর দুই মেয়াদের অতিরিক্ত কেউ প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত ও বিশিষ্টজনের অভিমতের ভিত্তিতে স্বাধীন, দক্ষ, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর নির্বাচন কমিশন গঠন করার লক্ষে বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশন আইন ২০২২ সংশোধন করতে হবে। আর ইভিএম এর কথা আসছে। ইভিএম নয়। সব কেন্দ্রে পেপার ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক দল নিবন্ধন আইনকে আবার সংস্কার করতে হবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার করা যাবে না। এটা বাতিল করতে হবে। বিচার বিভাগের জন্য সুপ্রীম কোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পৃথক সচিবালয় থাকতে হবে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অভিসংশন প্রশ্নে সংবিধানে বর্ণিত ইতঃপূর্বেকার সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। দলীয় বিবেচনার উর্ধ্বে উঠে কেবল জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নীতিবোধ, বিচারবোধ এবং সুনামের কঠোর মানদণ্ড যাচাই করিয়ে বিচারক নিয়োগ করতে হবে। যেকোনোভাবে বিচারক নিয়োগ করা যাবে না। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পরিষেবা জনপ্রশাসন, পুলিশপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষে যোগ্য, অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন করতে হবে। মেধা, সততা, সৃজনশীলতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসন নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। গণমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে এবং সার্বিক সংস্কারের লক্ষে সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতি, মিডিয়াসংক্রান্ত পেশাজীবী, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও গ্রহণযোগ্য মিডিয়া ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি মিডিয়া কমিশন গঠন করতে হবে। সৎ, স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিবেশ পুনরুদ্ধারের লক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ মৌলিক, মানবাধিকার হরণকারী সকল কালাকানুন বাতিল করতে হবে। আমি আরো কিছু লিখিত এনেছিলাম, এগুলো read out করতে চাচ্ছি না। লিখিত ই মেইলে হোক বা সরাসরি আমরা পাঠিয়ে দিতে পারব। যদি সুযোগ থাকে তাহলে এটা গুছিয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারব, ইনশাল্লাহ। মৌলিক বিষয় হচ্ছে যে, সাধারণ জনগণের যে ৫টি মৌলিক অধিকার, এই ৫টি মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে। সংবিধানে সেটা যাতে নিশ্চিত হয়, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আমি এখানে আর বেশি কথা বলব না। আমাদের যদি সময় দেয়া হয় তাহলে এটাকে খুব ভালোভাবে লিখিতভাবে আপনাদের কাছে জমা দিতে পারব। আপনারা যে আমাদেরকে দাওয়াত করেছেন এ জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ দেশে true sense এ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হোক। নির্বাচন, নির্বাচনের মতোই নির্বাচন হোক। বিগত সরকার ১৬ বছরে যেটা করেছেন, সেটা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা হোক। পরিশেষে আমি বলতে চাই যে, ছাত্র জনতা জুলাই আগস্টের যে বিপ্লব করেছেন, সেটাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সেখানে যারা জীবন দিয়েছেন, তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। যারা এখনো অনেকেই হাসপাতাল, বাসায় অসুস্থ অবস্থায় আছেন, তাদের আশু রোগমুক্তি কামনা করছি। আমরা চাই যে, তাদের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য আমরা uphold করতে পারি, সেটি সংবিধানে সন্নিবেশিত থাকুক। এ কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

আসসালামু আলাইকুম।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): প্রকৌশলী কবীর হোসেন সাহেব আপনার অনুপস্থিতিতে আমরা যেটি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে, আগামী ২৫ নভেম্বরের মধ্যে আপনাদের লিখিত বক্তব্য দিবেন। আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে আপনি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে, আমরা ছোট ছোট আকারে অংশীজনদের সাথে কথা বলছি। কম সময়। তবুও অনেকের সাথে যোগাযোগ করতে হচ্ছে। প্রত্যেককে খুব স্বল্প সময়ে আহ্বান জানিয়েছি। আমরা অনুরোধ করেছি। আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ যে, আপনারা স্বল্প সময় সত্ত্বেও উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদের চিঠিতে একটি ই মেইল এড্রেস আছে। আপনারা যদি আগামী নভেম্বরের ২৫ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে দেন, এটা আমাদের জন্য খুব সহায়ক হবে।

প্রকৌশলী মোঃ গিয়াস উদ্দিন (যুগ্ম আহ্বায়ক, ঢাকা) আইডিইবি : প্রথমেই আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে, আমাদের অধ্যাপক আলী রীয়াজ স্যার, প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন। তিনি আমাদের পেশাজীবী হিসেবে আমন্ত্রণ করেছেন। আমাদের সভাপতি সাহেব এখানে যে বক্তব্য দিয়েছেন, এটির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। তবে একটি ambiguity question যে সুপারিশমালা যেগুলো আসছে এবং এটি বাস্তবায়ন হওয়ার প্রক্রিয়া কী? এটা আসলে বাস্তবায়ন হবে কি না? যদিও বাস্তবায়ন নাও হয় তবুও ইতিহাসে লেখা থাকবে এই কমিশন এই সুপারিশগুলো দিয়েছে, যেটি জাতির জন্য কল্যাণকর এবং প্রয়োজন। ইতোমধ্যেই কিছু বিষয় নিয়ে আদালতে কিছু সংশোধনী বাতিলের লড়াই চলছে, আমার মনে হয় আদালতেই এটি চূড়ান্ত হবে এবং এর মাধ্যমে জাতি একটি কল্যাণের পথ দেখবে। দেশের স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর পর্যন্ত যে ঘটনা আমাদের সামনে ঘটল এবং যাদের সাথে ঘটল, তারা কিন্তু not criminal. তারা কিন্তু not রাজাকার। যারা স্টুডেন্ট তারা innocent. They have born in the country many times after liberation. How they will be Rajakar? এই ঘটনার মাধ্যমে, এ রকম একটি পরিস্থিতির মাধ্যমে তারা আমাদের ভূমিকা রেখেছে। দেশের সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে বীর হিসেবে তারা পরিগণিত হয়েছে।

সম্মানিত সুধি মণ্ডলি আমি আরেকটি যে কথা বলতে চাই, অনেকেই সমালোচনা করছেন। এখন সমালোচনা করার সুযোগ সামাজিক মাধ্যম ইউটিউব, ফেসবুক সব জায়গায়ই আছে। কিন্তু যারা অন্তবর্তী সরকারের দায়িত্ব নিয়েছেন, এই কমিশনের যারা দায়িত্ব নিয়েছেন, তারা কিন্তু কেউ apply করেন নাই যে, আমি কমিশনের মেম্বার হতে চাই। আমি অন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টা হতে চাই। তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাদেরকে সমালোচনা করা সহজ। কাজেই আমি মনে করি যে, যারা নিরপেক্ষ, যারা রাজনৈতিক ব্যানার বহন করেন না, যারা সোসাইটিকে won করেন, সমাজের জন্য যারা কথা বলেন। এখানে আদিলুর রহমান সম্পর্কে আমার জানা আছে। তিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন। কিন্তু কেন গ্রেফতার হয়েছিলেন? এই যে প্রতিবাদি কণ্ঠ। আমি মনে করি, এখানে যারা আছেন তারা কম বেশি যৌক্তিক তারা কাজ করবেন। তাদের জন্য আমাদের সাপোর্ট দেয়া দরকার। এই কমিশন সংবিধান পরিবর্তনের যে উদ্যোগ নিয়েছেন, আমি মনে করি যে, এটা যেভাবে হোক একটি প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা দরকার। এটি সরকারের বাস্তবায়নের দায়িত্ব। যারা দায়িত্বে আছেন। আমার মনে হয় ১৯৭৫ এর পরে যখন বাকশাল হয়েছিল, এই বাকশাল বাতিল করে কীভাবে গণতন্ত্র আসলো। এটি আমাদের আইনজীবী মাহবুব উদ্দিন খোকন ভাই বলতে পারবেন। যারা প্রাজ্ঞ। যাদের জ্ঞান আছে। যারা পলিটিক্স সম্পর্কে চর্চা করেন। তারা ভালো বলতে পারবেন। আমি বলব যে, এ সমস্ত রেফারেন্সকে count করে আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। দেশের কল্যাণে, দেশের স্বার্থে সময় কম দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। আমি এই আশাবাদ কামনা করে আমার কথা এখানে শেষ করছি।

আসসালামু আলাইকুম।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (কমিশন সদস্য) : আপনাদের কাছে একটি প্রশ্ন। আপনারা যে কেউ response করতে পারেন। আমাদের প্রায় প্রতিটি সেশনে judicial independence নিয়ে কথা বলা হয়েছে। Judges appointment এর কথা বলা হয়েছে। বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো সুনির্দিষ্ট recommendation আছে কি না। আপনারা বলেছেন যে, যোগ্য ব্যক্তি, reputed ব্যক্তি etc. etc. আমরা কী judge appointment প্রক্রিয়ার মধ্যে lay presentation চিন্তা করতে পারি কি না। laypersons যারা আছে তাদের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে involeve করা। এটার ব্যাপারে আপনাদের কোনো মতামত আছে কি না।

অ্যাডভোকেট মাহবুব উদ্দিন খোকন, সভাপতি (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন) : আমিতো প্রাকটিস করি। লন্ডন থেকে ২০ বছর আগে পাস করে এসেছি। নির্বাচিত হয়ে ১৯ বছর যাবত আইনজীবীদের প্রতিনিধিত্ব করছি। সুপ্রীম কোর্টে ১০ বার নির্বাচিত হয়েছি। ৭ বার সেক্রেটারিসহ। সারা বাংলাদেশে বার কাউন্সিলে আইনজীবীদের **১৯ বছর** elected. Very much involve with the legal profession. Just in general thing **হচ্ছে যে, একজন** বিচারপতি হবে মেধাসম্পন্ন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং সৎ। সাংবিধানিক

পদ হওয়ায় সে বাংলাদেশের নাগরিক হবে। নাগরিকত্ব আইনে বলা আছে "সাংবিধানিক পদে কোনো দ্বৈত নাগরিক বা অন্য কোনো দেশের নাগরিকভুক্ত হিসেবে আছে।" অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগের জন্য মেধাসম্পন্ন লোক খোঁজে। সেখানে third division এর কেউ apply করতে পারে না। কারণ আমরা হয়তো ৩/৪টি মামলা ready করি। তারা এক দিনে ৫০টি মামলা শুনে। মেধা না থাকলে শোনার সুযোগ নেই। সহকারী জজ নিয়োগের পর নিম্ন আদালতে কাজ করার পর জেলা জজ হয়। হাই কোর্টেও জজগণ আপিল শোনে, তাদের revision শোনে। এখানে কোনো নীতিমালা নেই। এখানে সারা জীবনে third division এর সবগুলো। আপনি মন্ত্রী সাহেবের কাছে চিরকুট ধরিয়ে দিলেন, মন্ত্রী আপনাকে বিচারপতি বানিয়ে দিবে। এখানে কোনো মেধা দরকার নেই। শুধু দলপ্রীতি দরকার আছে। This is the system going on. যার দরুন দিন দিন অবনতি হচ্ছে। আক্ষরিক অর্থে বিচার বিভাগ স্বাধীন হলেও, কিন্তু ব্যক্তিগণের মন স্বাধীন না। তারা খুবই নির্ভরশীল। এসব ব্যক্তিত্বের অভাবে। আমি যে ৪টি ক্যাটাগরি বললাম, ওটা হবে দুর্বল বিচারব্যবস্থা। তারা সাহস পায় না। আমি মনে করি, বিচারপতি নিয়োগের নীতিমালা এ জন্য দরকার। দল আসলো দলের কোনো লোক বানিয়ে দিল। Must be independent. judiciary independent বানাতে হবে। দল করতে পারে। But তার personality very important. বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো দল পৃথিবীতে থাকবে না। সমর্থন করতে পারে। তার এসব ক্যাটাগরি আছে। আমাদের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো নীতিই নেই। সব সরকারই সুবিধা নেয়। আমার সময় দরকার কী? আমার কিছু বিচারপতি দেখে দেখে লোক বানিয়ে দেব। সাথে মন্ত্রী বলে বা প্রধানমন্ত্রী বলে। আর দরকার কী আইনের? সবাই বলে বিরোধী দলে গেলে বিচারক নিয়োগ নীতিমালা দরকার। আইন দরকার। বাস্তবে বিচারপতি নিয়োগে কোনো আইন হয়নি। We have to have law. বিগত constitution বলা আছে যে, necessary law will be passed. কিন্তু ওই pass রয়ে গেছে। ওটা বিগত ৫২ বছরেও হয়নি। আমার মনে হয় এটি একটি মৌলিক কাজ করতে পারে। প্রস্তাব দিতে পারে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): জি, আমরা অন্যদের কিছু প্রশ্ন এবং দ্রুত সময়ের বিষয়টি আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আমার সহকর্মীদের।

জনাব ফিরোজ আহমেদ (কমিশন সদস্য): আমি শুধু আপনাদের পরামর্শ দিয়ে রাখব। এখন উত্তর দেয়ার আদৌ দরকার নেই। কিন্তু আমি চাইব যে, আপনারা যখন আপনাদের লিখিত বক্তব্যগুলো দিবেন, তখন এ বিষয়গুলো পরিষ্কার করবেন, তাহলে কমিশনের কাজে সুবিধা হবে। এফবিসিসিআই এর প্রতিনিধি যেটা বলেছিলেন যে, "বিকেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রব্যবস্থা দরকার।" যাতে ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। এ বিষয়টি আপনাদের কাছে বিস্তারিতভাবে জানতে চাইব। বিকেন্দ্রীকরণের অনেকগুলো প্রস্তাব এবং কারণ আমারদের কাছে এসেছে। এ বিষয়গুলো আরো বিস্তারিতভাবে বলবেন। এখানে একটি প্রশ্ন আসে। আপনারা লিখিতভাবে দিলে আমাদের জন্য সুবিধাজনক হবে। শ্রমিক সংগঠন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যুক্ত না থাকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এখনকার সংবিধানে একটি গ্যারান্টি আছে বা পৃথিবীর সব দেশে থাকে। ব্যক্তি বা সংগঠন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত থাকতে পারে। ফলে এটি একটি নেতিবাচক ধারা কীভাবে যুক্ত করা যাবে, নাকি শ্রমিক সংগঠনগুলো আসলে তারা যেন বেআইনি বা ফৌজদারি অপরাধমূলক কোনো কাজ করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এটি চান নাকি তারা সাংবিধানিকভাবে রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবে না, এটি বলতে চান, সেটি একটু পরিষ্কার করবেন। এখানে বিএফইউজে এর কাছ থেকে একটি আলাপ এসেছে যে, অশিক্ষিত গডফাদাররা সংসদে যাচ্ছেন। শিক্ষিত জ্ঞানী গুণীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা দরকার, যেটি মাহবুব উদ্দিন খোকনও আলাপ করেছেন। এ বিষয়ে আপনাদের একটু পরিষ্কার করে বলতে হবে বা বলাটা দরকার বোধহয় যে, আপনারা উচ্চ কক্ষ চাচ্ছেন, সেখানে সদস্যরা কী মনোনীত হবেন বা নির্বাচিত হবেন বা আনুপাতিক হারে আসবেন, এটা দয়া করে আপনাদের প্রস্তাবের সাথে সুস্পষ্ট করে জানাবেন।

এরপরে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনতে হবে। এই ভারসাম্য কীভাবে করা সম্ভব? সেটা আপনারা দয়া করে জানাবেন। শেষে যেটা বলতে চাচ্ছি, এটাও আপনাদের কাছে লিখিতভাবে চাইব। ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারস- আপনাদের প্রতিষ্ঠান বা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা ডেকেছি। পেশাজীবীরা তাদের দাবি-দাওয়া সংবিধানে আসার কোনো কারণ নেই। ওইগুলো আইনের মধ্যে বা নানা ধরনের বিধিমালার মধ্যে থাকবে। আমাদের ২০২৪ সালের বড় স্পিরিট হচ্ছে বৈষম্য বিরোধিতা। আমরা জানি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারসরা নানা সময়ে বৈষম্য বিষয়ে কথা বলেন। সেটার প্রকাশ সংক্ষেপে সংবিধানে কীভাবে থাকতে পারে? সেটার পরামর্শ থাকলে আমাদেরকে দিবেন, এক। দ্বিতীয়ত হচ্ছে- এ বিষয়ে যদি বিস্তারিত বক্তব্য থাকে, সেটা নিশ্চয় সংবিধানে আসবে না। সেই বিস্তারিত বক্তব্য আপনারা যদি লিখিতভাবে আপনাদের কাগজে উত্থাপন করেন তাহলে ভবিষ্যতে archive হিসেবে মানুষ গবেষণা বা জানার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। যেহেতু আমাদের সময় নেই। তাই কারো কাছ থেকে এখন উত্তর আশা করছি না। লিখিতভাবে যদি দেন তাহলে আমাদের কাজে লাগবে।

জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ (কমিশন সদস্য) ধন্যবাদ।

আমার সহকর্মী যেটা বললেন, আসলে ভালো হতো যদি আমদের কিছু তাৎক্ষণিক মন্তব্য পাওয়ার সুযোগ থাকত। সময় স্বল্পতা রয়েছে। আমি শুধু একটি জায়গায় ফোকাস করছি। আমাদের এফবিসিসিআই এর জনাব নাসরিন বেগম- তিনি মেট্রোপলিটন গভমেন্টের একটি কথা বলেছেন। আপনি যদি বিস্তারিত আমাদের লিখিতভাবে জানান তাহলে সেটা আমাদের জন্য সহায়ক হবে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): সবাইকে আমি আবার কমিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি বারবার যেটি বলছি যে, আমাদের সময় স্বল্পতা রয়েছে। আমরা বিভিন্ন রকম সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করছি। কিন্তু কম বেশি আপনারা সকলেই বলেছেন যে, আমাদের সকলের প্রচেষ্টা ছাড়া এ প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করা যাবে না। বিশেষ করে আমাদের লিখিতভাবে দিন, সেটি আমাদের জন্য সহযোগিতা হবে। এর বাইরেও পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের সহযোগিতা, সমর্থন এবং সমালোচনা সবই আমরা প্রত্যাশা করি। যাতে করে আমাদের কাজে সহায়ক হয়। আপনাদের অনুমতি পেলে আমি এখন এই অধিবেশন শেষ করব। ধন্যবাদ।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

ত্রয়োদশ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : দুপুর ১২.০০ থেকে ১.৩০ পর্যন্ত

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:

১। **অধ্যাপক আলী রীয়াজ**, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক — কমিশন প্রধান
২। অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৩। ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিকি, বার-এট-ল — সদস্য
৪। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৫। ড. শরীফ ভূঁইয়া — সদস্য
৬। ব্যারিস্টার এম. মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল — সদস্য
৭। জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক — সদস্য
৮। জনাব মোঃ মোসতাইন বিল্লাহ, লেখক — সদস্য

অংশীজনের তালিকা:

১। জনাব অঞ্জন দাস, সহসভাপ্রধান (গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি)
২। জনাব মিজানুর রহিম চেৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক (গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি)
৩। জনাব সাবিনা ইয়াসমিন, কেন্দ্রীয় সদস্য (গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি)
৪। প্রফেসর ড. আদিল মুহাম্মদ খান, প্রেসিডেন্ট (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স)
৫। প্ল্যানার সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট
৬। প্ল্যানার এ কে এম রিয়াজউদ্দিন,সদস্য
৭। চৌধুরী আশিকুল আলম, প্রেসিডেন্ট (বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ)
৮। জনাব খলিলুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট(বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ)
৯। ডিভিশন প্রধান সুচিয়াং, সদস্য, বিপনেট
১০। নবদ্বীপ কুমার, সদস্য বিপনেট।
১১। নিরূপা দেওয়ান, সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি।
১২। হরি পূর্ণ ত্রিপুরা,সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি।

কার্যবাহের রিপোর্ট প্রস্তুতকারক:

এইচ, এম, আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহের রিপোর্ট:-

কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ। আমি এই সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে, সংবিধান সংস্কার বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেই কারণে, অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা ছোট ছোট অধিবেশনে অংশীজনদের সাথে যুক্ত হচ্ছি, যাতে করে সকলের মতামত শুনতে পারি।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকের এই অধিবেশনের শুরুতেই আমি সেইসব শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং আমরা আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় দিবেন।

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে সংবিধানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের সংগঠনের অনেক কথা বলার আছে ও অনেক প্রস্তাব আছে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি অনুরোধ আপনারা যদি আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ ১০ মিনিটের মধ্যে তুলে ধরেন, তাহলে সকলের মতামত শোনার সুযোগ হবে এবং আলোচনা করা সম্ভব হবে। আপনারা আপনাদের বিস্তারিত মতামত যদি আজকে লিখিতভাবে আনেন, তাহলে আজকে দিতে পারেন অথবা আগামী ২৫ নভেম্বরের মধ্যে আমাদের কাছে যে ই মেইল ঠিকানা আছে সেখানে পাঠাতে পারেন। আমরা এখন পরিচিত হই যে, কে কোন সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

(অতঃপর কমিশনে উপস্থিত অংশীজন তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আজকে এ অধিবেশনের শুরুতেই পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির বক্তব্য দিয়ে শুরু করব।

নিরূপা দেওয়ান, সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : আমাকে এখানে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আমাদের দাবি দাওয়ার সারসংক্ষেপ পড়ে শোনাচ্ছি যেহেতু সংক্ষেপ করতে হবে। আমি আদিবাসীদের মৌলিক বিষয় নিয়ে কথা বলব, যেটি সংবিধান সংস্কারে আনতে চাই।

১। আদিবাসীদের পরিচয় প্রথাগত শাসনব্যবস্থা ও সামষ্টিক ভূমির মালিকানা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া এবং তাদের অধিকারসমূহের আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

২। আদিবাসী জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নীতি আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ এবং তাদের মতামতের প্রতিফলন যাতে নিশ্চিত হয়;

৩। আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থাকা উচিত;

৪। আদিবাসীদের স্থানীয় সরকার থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য reservationসহ সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৫। আদিবাসীদের স্বতন্ত্র রাজনীতি, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

৬। আদিবাসী জনগণের আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বশাসনের অধিকার সংরক্ষণ করা;

এরপরে ছোট করে যে কথাগুলো বলব, সেটি হচ্ছে বিদ্যমান সংবিধান সম্পর্কিত সংশোধনীর প্রস্তাবনা আমাদের পক্ষ থেকে এসেছে। এরপর আমার সহকর্মী বলবেন। আমার বিষয় আমি বলছি। প্রথম ভাগ যেটি প্রজাতন্ত্র অনুচ্ছেদ ৬(২) এ নাগরিকত্ব নিয়ে যে কথাটি আছে,

আমাদের প্রস্তাবিত সংশোধনী হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণ যার যার জাতিগত পরিচয়ে পরিচিত হইবেন এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবেন। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অনুচ্ছেদ ১৩ তে যেটি চেয়েছি, সেটি হচ্ছে মালিকানা নীতিমালা প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তিতে (ঘ) সমষ্টিগত মালিকানা। আমাদের যেটি আদিবাসীদের আছে। অর্থাৎ প্রথাগত আইনভিত্তিক আদিবাসীদের সামষ্টিক মালাকানা অন্তর্ভুক্ত করা। চতুর্থ ভাগ- নির্বাহী বিভাগ- অনুচ্ছেদ ৫৯ এ স্থানীয় শাসনে আছে। প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে বিশেষ আইনের মাধ্যমে প্রশাসিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও অঞ্চলসমূহে আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে। পঞ্চম ভাগে যেটি আইন সভা অনুচ্ছেদ ৮০ তে আছে। আইন প্রণয়ন পদ্ধতি- প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে ২(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়ন বা সংশোধন করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আদিবাসী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করিতে হইবে। পঞ্চম ভাগ আইনসভা অনুচ্ছেদ ৬৫ তে সংসদ প্রতিষ্ঠা। এখানে আমরা প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তি দিয়েছি। ৩(ক) আদিবাসী জনগণের জন্য সংসদে ১৫টি আসন সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হইবে। ৬। সপ্তম ভাগ নির্বাচনের ব্যাপারেও অনুচ্ছেদ ১২১ এ ভোটাধিকার তালিকায় প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য বিশেষ বিধান সংযোজন। দশম ভাগ- সংবিধান সংশোধন। অনুচ্ছেদ ১৪২ সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তি সেটি হচ্ছে 'ই' আদিবাসীদের পরিচয় ও অধিকার সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন বা বাতিলের পূর্বে তাহাদের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করিতে হইবে। এরপর প্রথম তপসিল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৭ এ কতিপয় আইনের হেফাজত প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তিতে আমরা চাই যে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০ এবং আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদ সম্পর্কিত আইনসমূহ এবং আদিবাসীদের প্রথাগত আইনসমূহ। এগুলো আমাদের পক্ষ দু ভাগ করে নিয়েছি। এগুলো আপনাদের লিখিত দিয়ে যাব।

আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ।

আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (প্রধান) : ধন্যবাদ।

আপনাদের পক্ষ থেকে আরও একজন বক্তব্য দিবেন।

জনাব হরি পূর্ণ ত্রিপুরা, সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : দুঃখিত। আমাদের নাগরিক কমিটি থেকে আপাতত এটিই।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমরা এখন গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির পক্ষ থেকে অঞ্জন দাস এর বক্তব্য শুনব।

জনাব অঞ্জন দাস, সহ সভাপ্রধান (গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি) : এত অল্প সময়ের মধ্যে এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি রাষ্ট্র কীভাবে চলে বা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার ভিত্তি হচ্ছে সংবিধান। ফলে constitution বা সংবিধান নিয়ে আলোচনা এত কম সময়ের মধ্যে করা অত্যন্ত মুশকিল। বিশেষ করে আমরা বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিকদের যে প্রতিনিধিত্ব করছি, সেখান থেকে আরও মুশকিল। এখানে যারা আছেন তারা অনেকেই বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক। আপনারা প্রতিনিয়ত সংবিধান চর্চা কিংবা এ বিষয়গুলোর সাথে প্রতিনিয়ত আপনাদের কাজ করতে হয়। আর আমাদের প্রতিদিন হয়তো কারখানায় শ্রমিক ছাটাই হচ্ছে, কোনো জায়গায় নিপীড়ন হচ্ছে, কোথাও গ্রেফতার হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনী দ্বারা আমাদের গার্মেন্টস শ্রমিক খুন হচ্ছে। এ রকম বিষয়ের মধ্যে সারা বছর থাকতে হয়। ফলে আমাদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, আইনগত বিষয়গুলো নিয়ে তুলনামুলকভাবে একটু কাজ করি। ফলে সংবিধানের ভাবনা নিয়ে আসলে যে পরিমাণ সময় দেয়া দরকার, সেই সময় আমরা পর্যাপ্ত মনে করছি না। তারপরও একটি বিষয় বোঝা যায় যে, বিগত ৫৩ বছরে আমাদের ৭২ সালের যে সংবিধান, যে সংবিধান বাংলাদেশের নাগরিকের কোনো ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারিনি। বাংলাদেশের নাগরিকের রাষ্ট্রের সাথে যে সম্পর্ক, রাষ্ট্রীয় মালিকানার সম্পর্ক, সেই সম্পর্কই তারা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। সেটা অন্তত আমরা বিগত ৫৩ বছর দেখতে পাচ্ছি। বিশেষত গত ১৭ বছরে এই ফ্যাসিবাদি রাইজিং শাসনের মধ্যে আমরা সর্বশেষ গত বছরও যখন সাধারণ আইনি অধিকার ও আমার মজুরি চাওয়ার অধিকার, যখন আমরা আন্দোলন করছি তখন আমাদের চার চারজন শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে। এই যে, শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করা হলো- তার বিচার এখন পর্যন্ত হয়নি। ফলে এ অভ্যুত্থানে আমরা নিজেরাও গর্বিত অংশীদার। কারণ আমরা আমাদের ৩০ এর অধিক গার্মেন্টস শ্রমিক জীবন দিয়েছি। ফলে আমরা এমন একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চাই, যে রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশে সমস্ত মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা হবে। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব হচ্ছে জনগণের সার্বভৌমত্ব। যেটা বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধান বাংলাদেশে একটি ফ্যাসিস, একটি একনায়কতান্ত্রিক যে কাঠামো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে এ রকম কর্তৃত্ববাদী জায়গা থেকে শ্রমিকসহ অধিকাংশ মানুষের সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োজন বলে মনে করি। বিশেষ করে আমরা যে সেক্টরে আছি, সে সেক্টরে অনেক সমস্যা আছে। তার মধ্যে basically এই রাষ্ট্র পরিচালনায় আমাদের সাংবিধানিক যে ব্যবস্থা, বিশেষত আমাদের সংসদ- সেখানে কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব করবে। আমরা আঞ্চলিক প্রতিনিধি আকারে যে প্রক্রিয়া চলমান আছে, সেই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে সমস্ত পেশার মানুষের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হয় না। আমরা

যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করতে চাই, তাহলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকসহ অন্যান্য পেশাগত প্রতিনিধি যারা আছে, তাদের যদি আমরা ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে না পারি, তাদের জন্য নতুন কাঠামো বিনির্মাণ করতে না পারি, তাহলে বিদ্যমান কাঠামোতে আসলে কোনো ধরনের সংকটের সমাধান হবে না। ফলে আমরা চাই যে, বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষকসহ বিভিন্ন পেশাগত জায়গায় আমাদের সংসদ থেকে শুরু করে আমাদের স্থানীয় সরকার পর্যন্ত তাদের প্রতিনিধিত্ব কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, তার জন্য এমন একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা এখানে প্রতিষ্ঠা করা। আর কিছু ব্যাপার তো আছেই। যেমন- উদাহরণ আকারে ১৯৪৭ সালে দেখতে পাব যে, Industrial Disputes act সেখানে ট্রেড ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে কারখানায় শ্রমিক নিয়োগ কিংবা ছাটাই হলে সেখানে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হতো। সেটা পরবর্তীতে পাকিস্তান শাসনামলে এসে এই অ্যাক্টগুলো বাতিল হয়ে যায়। ফলে এ রকম অনেক নিবর্তনমূলক আইনগুলো এখানে আছে। আমরা আইন নিয়ে কথা বলছি আসলে আমাদের আইনগুলো বোঝা দরকার। যার ওপর ভিত্তি করে একটি সাংবিধানিক কাঠামো তৈরি হতে পারে। এখানে গার্মেন্টস শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন নিশ্চিত করা। পাশাপাশি জাতীয় নীতি নির্ধারণে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব কীভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব তার একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা আমাদের দরকার। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত lethal weapon বা মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়। হত্যার উদ্দেশ্যে আমাদের রাষ্ট্রীয় বাহিনী ব্যবস্থা নেন, এটির পরিবর্তন দরকার। এ জন্য সাংবিধানিক কাঠামোতে আর শ্রমিক হত্যা হবে না এ রকম নিশ্চয়তা দরকার। আর আমরা দেখেছি যে, বিদ্যমান সংবিধানে অনেক ভালো কথাও আছে। ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে শ্রমিক ইস্যুতে মুক্তির কথাও বলা আছে। এখন সংবিধান আমাকে কী গ্যারান্টি দেয়? যারা ক্ষমতায় থাকেন তারা সাংবিধানিকভাবে জনগণের আকাঙ্ক্ষার যে উইল বা সনদ সেটা যারা ক্ষমতায় থাকেন তারা যদি বাস্তবায়ন না করেন তার বিরুদ্ধে কী action হবে সেটি কিন্তু বিদ্যমান সংবিধানে নেই। ফলে আমরা প্রায়োগিক দিক থেকে সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারসহ জনগণের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো সংরক্ষণ করবে। বিশেষত বাংলাদেশে যারা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় একটি বৈষম্যহীন অবস্থার মধ্য থেকে। প্রকট বৈষম্য। ১২৫০০ টাকা মজুরি দিয়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ যেখানে নিম্ন আয়ের সেখানে তার পক্ষে গণতন্ত্র চর্চা কিংবা মুক্ত চিন্তা করা মুশকিল। ফলে আয় বৈষম্যের দিক থেকেও বাংলাদেশ সাংবিধানিক ব্যবস্থার একটি ব্যালেন্স আনা দরকার। যাতে প্রান্তিক মানুষ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে। যে সংবিধান আমাকে গ্যারান্টি দেয়, নিশ্চয়তা দেয় যে, আমি বিদ্যমান সাংবিধানিক ব্যবস্থায় নিজেদের অর্থনৈতিক বিকাশের সুযোগের সমতা যেন তৈরি হয়। আমি আপাতত এ সকল বক্তব্য দিয়ে শেষ করছি। বাকিটুকু আমার সহকর্মী বলবেন।

সকলকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমি অনুমান করছি যে, আপনাদের অন্যরা বক্তব্য রাখবেন।

জনাব মিজানুর রহিম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক (গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি) : ধন্যবাদ।

সময় স্বল্পতার বিষয়টি সভার প্রধান আলাপ করেছেন। মূল বক্তব্য আমার সহকর্মী মোটা দাগে দিয়েছেন। আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত প্রস্তাব আপনাদের কাছে দিব। এর মধ্যে আমার একটি বক্তব্য হচ্ছে যে, বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে যে ১৪ অনুচ্ছেদের কথা আছে, এটির পুরাপুরি বাস্তবায়ন ঘটে না। আসলে শোষণ থেকে মুক্তি কেবল সংবিধান লিখে বা আইন করে দিলে কোনোভাবে বাস্তবায়ন হবে না। যতদিন না বাস্তবায়নের মতো শক্ত প্রতিনিধিত্ব, মেহনতি মানুষ, কৃষক ও শ্রমিক এবং জনগণের অনগ্রসর অংশের থাকে। বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ছিল ৬৭ জন ১০ জানুয়ারি ২০২৪, এটি প্রথম আলো পত্রিকার রিপোর্ট। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এভাবে জনগণের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব আইনসভায় নিশ্চিত করা যায়নি। কেবল এলাকা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে সংসদে পেশাগত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা কঠিন। অথচ আইন প্রণয়নে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি কীভাবে নিশ্চিত করা যায় সেটা ভাবতে হবে। সংগঠিত হওয়ার অধিকার। মত প্রকাশের অধিকারের মতো মৌলিক রাজনৈতিক অধিকারের বাইরেও সংবিধানের কোনো সুযোগ থাকে কি না। ভারতের লোকসভা তফসিলে যাতে সিডিউল কাস্ট ও তফসিলি জন জাতি সিডিউল ট্রাইবের জন্য আসন সংরক্ষণের ৩৩০ অনুচ্ছেদে অনগ্রসর অংশকে কীভাবে রাজনৈতিক দলের মধ্যে ক্ষমতায়ন করেছে। এমনকি অনগ্রসর, জ্ঞানভিত্তিক রাজনীতিকে শক্তিশালী করার অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় রাখার সুযোগ আছে। প্রস্তাবনা- সংসদ আইন বিভাগে যথাযথ পেশাগত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। কোন উপায়ে এটি করা যেতে পারে সে বিষয়ে পর্যালোচনা করা দরকার। কয়েকটি প্রস্তাব বিবেচনা ও আলাপের জন্য উল্লেখ করা হলো। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ ব্যবস্থায় উচ্চ কক্ষে দলভিত্তিক সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি পেশাগত প্রতিনিধিদের জন্য নির্ধারিত আসন বরাদ্দ করা। জাতীয় শ্রমিক কাউন্সিল, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন থেকে নির্ধারিত সংখ্যক শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারেন। এভাবে ছাত্র প্রতিনিধিসহ অন্যান্য পেশাগত প্রতিনিধিত্ব নির্বাচিত হবেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায়

আয়ারল্যান্ডের আইনসভার উচ্চ কক্ষে সিনেটের ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ৪৩ জন ৫টি পেশাগত প্যানেল থেকে আর ৬ জন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ থেকে নির্বাচিত হয়। বাকি ১১টি আসনে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের জন্য বাছাই হয়।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

সংগঠনের আপনারা ২ জনই বলছেন। ঠিক আছে।

আমরা এখন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনব।

প্ল্যানার এ কে এম রিয়াজউদ্দিন, সদস্য (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স) : সংবিধান সংস্কার কমিশনকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের বক্তব্য শুরু করছি।

আমরা বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর আজ ৫০ বছর হলো। আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশ স্থানীয় পরিকল্পনার বিকাশ নিয়ে আমাদের এই সংগঠন কাজ করছে। আমাদের এই সংগঠনের কাজের সাথে যে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবি তা আপনাদের বলতে চাচ্ছি।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমি একটু interrupt করি। আপনারা প্রাথমিকভাবে একটু পরিচয় দিয়ে নেন, যেহেতু আপনারা পরে এসেছেন, সেই জন্য। প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় দিলে রেকর্ডের জন্য সুবিধা হবে।

(অতঃপর কমিশনে উপস্থিত অংশীজন তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)।

প্ল্যানার এ কে এম রিয়াজউদ্দিন, সদস্য : যদি আমরা বাংলাদেশের uniqueness চিন্তা করি যে, কীভাবে বাংলাদেশ অন্য দেশ থেকে আলাদা। সেই বিষয়গুলো আমরা আশা করতে পারি যে, আমাদের সংবিধানে খুব স্পষ্টভাবে হয়তো বিষয়গুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করবে। এর মধ্যে একটি বিষয় হচ্ছে যে, বাংলাদেশ আসলে এমন একটি দেশ যেখানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ খুবই কম। পৃথিবীর যে সকল দেশে জমির পরিমাণ কম, তার মধ্যে বাংলাদেশ। কাজেই ভূমি কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে সে বিষয় নিয়ে আমরা যদি খুব abstract জায়গায় থাকি, তাহলে আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সমস্যা সৃষ্টি হবে। আমরা জেনেছি যে, আমরা হয়তো একটি নতুন সংবিধান পাব। বিষয়টি অবশ্যই একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। কী হবে আমরা জানি না। রেফারেন্স হিসেবে বিদ্যমান সংবিধানের দিকে তাকাই তাহলে এভাবে মন্তব্য করি, তাহলে showcase entry একটি সংবিধান। শুধুমাত্র মানুষকে কেন্দ্র করে একটি সংবিধান ভাবা হয়েছে, তাহলে হয়তো একটি ভুল বলা হবে না। এর মধ্যে যদিও আপনারা কেউ বলতে পারেন যে, biodiversity প্রসঙ্গ আছে। এটা অনেকটা না থাকলে হয় না। জোর করে আরোপ করা। এ রকম হতে পারে। এটি হওয়ার যথেষ্ঠ সুযোগ আছে। আমরা যেহেতু পরিকল্পনার জায়গা থেকে কথা বলছি। বিদ্যমান সংবিধানের ১৫ ধারা লক্ষ করলে দেখবেন যে, যেখানে প্ল্যান ইকোনোমিক গ্রোথের কথা বলা হয়েছে। ফলে এ জায়গাতে পরিকল্পনার যে ধারণা এটিকে সংকুচিত করে ফেলা হয়েছে এবং শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন না বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে কেন্দ্রে রেখে চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। আমাদের যেটি মনে হয় যে, intrusive জায়গা থেকে বের হই, শুধুমাত্র মানুষের টিকে থাকার প্রয়োজন হলেও আমাদের প্রাণ এবং অন্য সব প্রাণকে রক্ষা করা যেমন আমাদের নিজেদের জন্য দরকার। আমরা যদি শুধুমাত্র নিজেদেরকে কেন্দ্র করে তাদেরকে বাঁচানোর অঙ্গীকার করি, সেটিও একটি সীমিত অবস্থান। আসলে সকল প্রাণীর বাঁচার অধিকার আছে। সংবিধান আসলে কতটা মানুষকেন্দ্রীক হবে, আর কতটা সব প্রাণকে ধারণ করতে পারবে এ প্রশ্নটি বোধহয় এ পর্যায়ে এসে করতে পারি। আমরা যদি বৈশ্বিক ধারা লক্ষ করি, আমরা জানি যে, বৈজ্ঞানিকরা দেখাচ্ছেন যে, পৃথিবী এখন sixth mass extinction এর দিকে যাচ্ছে। অর্থাৎ পৃথিবীর তার দীর্ঘ geological history বা বড় ধরনের টাইম লাইনে আমরা যখন দেখি। আমরা জানি যে, ৫ বার বড় আকারে extinction হয়ে গিয়েছিল এবং sixth mass extinction এর দিকে আমরা যাচ্ছি। এই যে, বৈশ্বিক একটি বোধ, এটিকে সংবিধানে প্রতিফলন কীভাবে করা যাবে। আমরা আশা করব যে, যেটি নিয়ে আপনারা ভাববেন। আগের সংবিধানে কমবেশি আমাদের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে আরও বিষয় আছে যে, in detail. আসলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিকল্পনা হলেই আমরা মনে করছি যে, ভালো হলো। কিন্তু কী ধরনের পরিকল্পনা করা হবে? একটি কথা বলা আছে যে, The devil is in the details. এখন পরিকল্পনা আমাদের সারা দেশকে নিয়ে হবে না শুধু শহরকে নিয়ে হবে। পরিকল্পনা কি সমস্যা তৈরি হওয়ার পরে শুরু হবে না সমস্যা যেন না হয় সে জন্য হবে। সে প্রশ্নগুলো আমরা রাখতে চাই। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে, বিশেষ করে স্থানীয় পরিকল্পনা তখনই করা হয় যখন ভূমি রূপান্তর হয় এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, এটিকে আর সামলানো যাচ্ছে না। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পর পরিকল্পনা করা প্রয়োজন এ রকম একটি ভাবনার সৃষ্টি হয়। কাজেই পরিকল্পনা কার্যত সুদূরপ্রসারী হওয়া প্রয়োজন। শুধু মানবকেন্দ্রিক নয়। ভূমিকে কেন্দ্র করে করা উচিত। সেই বিষয়কে আমরা জোর দিতে চাই। আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সবার বিবেচনার জন্য special plan framework এর পক্ষ থেকে একটি প্রাথমিক ধারণা উপস্থাপন

করেছি। আমরা আশা করব যে, কমিশন তার কাজ কর্ম করার সময় এ বিষয়কে যদি একটু আমলে নেন, তাহলে হয়তো আমাদের অনেকগুলো ভাবনা সেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। আমরা সংক্ষেপে যেগুলো এনেছি, সেগুলোতো থাকছেই। ওই details এর প্রশ্নে অনেক কিছু আছে, এটির উত্তর এখানে আসবে। সে জন্য আমি The devil is in the details এর রেফারেন্স টানলাম।

আরেকটি হচ্ছে যে, আমরা যখন উন্নয়ন করি, কী ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে প্ল্যানিং বা special planning বিশেষ করে আশা উচিত। সেটি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন আছে। খুব আর বেশি এভাবে কোনো অর্গানাইজেশন প্ল্যান তৈরি করে ফেলল সে প্ল্যান তারা won করতে পারবে কি না আর সেটিকে কতটুকু বহন করতে পারবে সে বিষয়টি ভাবার অবকাশ আছে। এখানে একটি বিষয় যে, বিদ্যমান যে প্রাকটিস, সেটির দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব যে, এখন প্ল্যানিংয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু কাজ আমাদের দেশে হয়। যা প্রায় দেশের ১০ শতাংশ এলাকাকে হয়তো cover করে, সেটিও মূলত reactive. সমস্যা হয়ে যাওয়ার পর কোনো বিকল্প না। এ ধরনের পরিকল্পনা। কিন্তু সেটি কারা করছে? বাস্তবায়নকারী সংস্থা যেমন- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর যখন পরিকল্পনা করে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের biased থাকে বেশি রাস্তা বানানোর দিকে। ফলে পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ঠ পরিমাণ রাস্তা তৈরি হলো কি না সেটি নিশ্চিত করা থাকে সেই পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। এটি conflict of interest উদাহরণ, যেটি আমাদের economy wide একটি ভাবনা চিন্তার বিষয় আছে। এ ধরনের implementation এবং planning এর মধ্যে যে conflict of interest আসে সেগুলো আমরা কীভাবে address করব। একইভাবে বলা যায় যে, আমরা যদি পরিকল্পনার ইতিহাস দেখি। বিশেষ করে ৯৬ এর দিকে migrantদের address করার জন্য এক ধরনের হাউজিং সমস্যা হিসেবে পরিকল্পনাকে দেখা হতো। তাও এক ধরনের reactive approach. আসলে special planning বলতে আমরা শুধু হাউজিংকে ভাবতে পারি না। আমি জানি যে, special planning আরও বিস্তর বিষয়।

আমরা স্থানীয় সরকার বিষয়ে যাচ্ছি। বিশেষ করে স্থানীয় পরিকল্পনা। আমরা তিন স্তরবিশিষ্ট muti scalar পরিকল্পনার কথা বলেছি। এখন যদি আমরা স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার কথা বলি। আমরা চাই যে, সেখানে স্থানীয় সরকার একটি ভূমিকা পালন করুক। কিন্তু স্থানীয় সরকারের যে কার্যক্রম তাতে আমরা দেখি যে, আমাদের যারা আইন প্রণেতারা আছেন, তাদের কার্যক্রম আমরা যদি ঠিকভাবে বুঝে থাকি, তাহলে তাদের কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন এবং সেখানে জনগণের ভাবনার প্রতিফলন নিশ্চিত করা। কিন্তু তার বাইরে গিয়ে দেখা যায় যে, স্থানীয় যেসব অবকাঠামো প্রকল্প বা পরিকল্পনা। তাতে এদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এ দ্বন্দ্ব যদি নিরসন করা না যায় তাহলে স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার যে wonership সেটি নিশ্চিত করা যথেষ্ঠ কঠিন হবে। এটি কীভাবে আপনারা সংবিধানের মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন, তার instrumentগুলো সম্পর্কে ভালো জানেন। সে বিষয়ে details এ এখন আর যাব না। আরেকটি বিষয়ে যেটি যে কোনো পেশাজীবী গোষ্ঠী অথবা জ্ঞানভিত্তিক কমিউনিটি কম বেশি স্বীকার করবেন। আমি জানি যে, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পেশাজীবী সংগঠনের বিশেষ করে স্বাধীনভাবে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমরা যদি রামপালের কথা চিন্তা করি, তাহলে আমরা দেখব যে professionalরা এক সময় বৈধতা দিয়েছেন। কিন্তু তাদেরও এক ধরনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়। এখানে এক ধরনের conflict of interest থাকে। যদি এগুলো feasible দেখানো না যায়, তাহলে ঠিকাদার হয়তো কাজ পাবেন না। এটি একটি জাতীয় সমস্যা। যেটি আমরা সংবিধানের মাধ্যমে address করতে পারবেন কি না আমি জানি না। কিন্তু এটি কোনো নির্দিষ্ট সেক্টরের সমস্যা নয়। এটি আসলে আমাদের একটি জাতীয় সমস্যা। এটি যদি সংবিধানে কোনোভাবে আনা যায় তাহলে আমাদের জন্য অনেক মঙ্গলজনক হবে।

আমরা সবাই জানি যে, বিশেষ করে বাংলাদেশে গবেষণা এবং উন্নয়নে যে ব্যয় হয়, এটি পৃথিবীর অনেক দেশেই হয়। আমাদের এ ব্যয়ের প্রবনতা অনেক কম। যেটির খুব অল্প অংশ থাকে মূলত research and development এর ওপরে। সেগুলো মনে হয় বিশাল বিনিয়োগ করে ফেলা হলো। এর ফলে যেটি হয়, পেশাজীবীদের মধ্যে

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমি একটু আপনাকে interrupt করি। সময় স্বল্পতার জন্য একটু সংক্ষেপ করলে অন্যদের বক্তব্য শুনতে পারব।

প্ল্যানার এ কে এম রিয়াজউদ্দিন, সদস্য : আমি প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি। এ ক্ষেত্রে দেখার বিষয় হচ্ছে যে, এ সুযোগগুলো সৃষ্টি হলে পেশাজীবীদের field এর সাথে অনেক বেশি নিশ্চিত করা যায়। যদিও আমরা তিন স্থরবিশিষ্ট স্থানিক পরিকল্পনার কথা বলছি এবং দেশের মধ্যেই। তারপরও আমাদের regional development, আমি যদি south asia context বলি বা আরও larger regional context এ যাই তাহলে আমাদের দেখার বিষয় হবে যে, আমরা আসলে collective prosperity এর কথা ভাবতে পারি কি না। আমরা বহু দিন ধরে এক ধরনের bilateral, muti-lateral এর বিষয়ে একটি দোলাচালের মধ্যে আছি। কিন্তু এটি সংবিধানের মাধ্যমে আমাদের collective prosperity বা collective regional prosperityতে আনা যায় কি না; এগুলো আপনারা একটু বিবেচনায় রাখবেন। আমার দিক থেকে আপাতত শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

প্ল্যানার সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স) : সবাইকে স্বাগতম।

একটি হচ্ছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানাস বা পরিকল্পনাবিদদের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছি। ফলে সেই আঙ্গিকে কিছু কথা বলব। আরেকটি হচ্ছে যে, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে কিছু কথা। আসলে সংবিধান আমাদের সকলের সে হিসেবে। আমি প্রথমে একটু স্মরণ করি যে, ১৯৭১ সালে যারা শহিদ হয়েছেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন অভ্যুত্থানে শহিদ হয়েছেন। সর্বশেষ জুলাই ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানে, যাদের আত্মত্যাগে আমরা আসলে এ সুযোগটি পেয়েছি। সংবিধানকে হয়তো আমাদের মতো করে আরেক বার একটু কাজ করার বা ভাবনার জায়গাগুলোকে উপস্থাপন করার। তারপরে দেখা যাবে যে, আমরা কতদূর করতে পারি। আমি প্রথমেই নাগরিক হিসেবে একটু কথা বলতে চাই। আমাদের সংবিধান পুনর্লিখনের দাবি এসেছে এ কারণে যে, এ বাংলাদেশ সবার। অর্থাৎ জাতিগতভাবে যদি বলি, নৃতাত্ত্বিকভাবে যদি বলি, ভাষাগত দিক থেকে যদি বলি, ধর্মীয় দিক থেকে যদি বলি, সবার হচ্ছে বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশের সংবিধান পুনর্লিখন করতে চাই বা সংস্কার করতে চাই বা যেটিই বলতে চাই। সেটি যদি হয়, তাহলে কয়েকটি ছোট পয়েন্ট আমি বলব। এ স্বল্প পরিসরে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। একটি হলো যে, এ সংবিধান হাতে নিয়ে আমরা যেন বাংলাদেশের সকল মানুষ এটিকে সবগুলো জায়গায় মানতে পারি বা আমার বোধে আসে সেই জায়গাটা। আমি একটি ছোট উদাহরণ দেই। আমি যখন কোনো নির্দিষ্ট ধর্মে সৃষ্টিকর্তার নামে সংবিধান শুরু করব তখন কী আমার সমস্ত বাংলাদেশি এটিকে মানবেন? তাহলে যেটি হতে পারে আমি তাকে দুইভাবে দুই দিক থেকে বাধ্য করছি। একটি আমি তাকে তার বিশ্বাসের জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে বাধ্য করছি অথবা আমি সংবিধানের কোনো একটি জায়গা বা কোনো একটি ধারাকে তিনি যেন না মানেন বা অস্বীকার করেন সেটি বাধ্য করছি। এ জায়গায় ভাবনাটি খুবই জরুরি। সংবিধানের দিক থেকে নৈবিত্তিক হবে কি না। রাষ্ট্র অবশ্যই সব মানুষের জন্য হবে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গা যেটি মানুষের জন্য তার স্বাধীনতার কথা বলা আছে। সে জায়গাগুলো নৈবিত্তিক হবে কি না, এটি একটি বড় প্রশ্ন। আমরা যদি সেই জায়গায় থাকতে চাই, তাহলে আমাদের কয়েকটি জায়গা আবার ভাবার দরকার আছে। আমাদের অন্যান্য মানুষকে বাদ দিয়ে এ জায়গাগুলো শুরু করব কি না, এটি গভীরভাবে ভাবনার। আমি আপনাদের প্রতি অনুরোধ রাখলাম। আপনারা এটি ভেবে দেখবেন।

দ্বিতীয় হলো যে, আমরা আসলে রাষ্ট্রকে যদি নৈবিত্তিক দেখতে চাই, বর্তমান পৃথিবীতে একসাথে চলতে চাই, তাহলে আমাদের রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছি সেটি আসলে কথাটা প্রাসঙ্গিক থাকে। আমরা এ জায়গায় নৈবিত্তিক থাকতে পারি কি না। যদিও আমরা পরের ধাপে গিয়ে বলছি যে, সব ধর্মের স্বাধীনতা থাকবে। এখানে আরও একটি বিষয়ে বলার আছে। আমরা আমাদের সংবিধানে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করছি যে, যে যে মানুষ যে যে ধর্ম পালন করবেন। কিন্তু বাংলাদেশে কোনো মানুষ যদি কোনো ধর্মই পালন না করতে চান, তার জন্য একটি বাক্য সংবিধানে নেই। এটি ভবিষ্যতে আরেক ধরনের সমস্যা তৈরি করবে। ফলে এ বিষয়টি আসা দরকার। সারা বাংলাদেশের সব বোধের মানুষকে আমি সংবিধানে ধরতে পারি কি না। এটি আসলে সংবিধান সংস্কারের জায়গা হওয়া দরকার বলে আমার মনে হয়। একদম প্রথম ভাগে ভাষা, সংস্কৃতি। আরেকটি হচ্ছে জাতীয়তাবোধের বিষয়ে আমি যদি বলি আমি শুধু বাঙালি পরিচয় দিতে চাই তাহলে আমার অন্যান্য সকল নৃতাত্ত্বিককে অস্বীকার করি। সেই জায়গাটি বোধহয় এ সময়ে এসে আর প্রয়োজন নেই। বাঙালি জাতি অবশ্যই আমরা। আমরা অনেক প্রাধান্য বিস্তার করছি। আমাদের এখানে আরও অনেক জাতি গোষ্ঠী রয়ে গেছে। ফলে তাদেরকে যদি স্বীকার করতে চাই তাহলে জাতীয়তাবোধে নৃতাত্ত্বিকভাবে আমি শুধু বাঙালি না বলি। তাহলে আসলে তাদেরকে অস্বীকার করাই হয়ে যায়। এ বিষয়টি দেখার আছে।

এবারে আসি মৌলিক বিষয়ের ভিতরে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা এবং অর্থনৈতিক মুক্তির কারণেই আমরা দেখেছি পরবর্তী ৫০ বছরে যত পরিকল্পনার প্রস্তাবনা নেয়া হয়েছে সবই আসলে অর্থনীতিকে। আমার সহকর্মী উল্লেখ করেছেন। আমি খুব সংক্ষেপে বলি। ভৌগলিক অবস্থান, গঠন, জনসংখ্যা, সম্পদ এসব বিবেচনায় আমরা যে পর্যায়ে আছে এবং আগামী দিনে যেখানে যাচ্ছি সেখানে যদি এ সম্পদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা করতে না পারি তাহলে আমরা টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণে কখনো অগ্রগামী হতে পারব না। এ চ্যালেঞ্জ আমরা এখনই দেখছি। সেই জায়গায় আমরা ১৫ ধাপে মৌলিক প্রয়োজনে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলছি সেখানে অর্থনৈতিক এবং স্থানিক উন্নতির কথাটি যদি আমরা সংযোজন করতে পারি, তাহলে এটিকে পরবর্তী ধাপগুলোতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সেই সুযোগগুলো তৈরি হয়। আপনাদের কাছে এটি একটি প্রস্তাবনা থাকল। আমি আর মাত্র দু একটি বিষয় উল্লেখ করি। অনেকগুলো বিষয় আছে। আমরা জানি যে, আমাদের এ সংবিধান সংশোধন হতে হতে প্রচণ্ড এককেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। সেটিকে যেমন আমরা ক্ষমতার ভারসাম্যের কথা বলছি, এটি আরও বড় জায়গা। আরও বিস্তারিত পরিসরে আলাপ আসবে। ক্ষমতা কি শুধু প্রধানমন্ত্রীর নিকট থাকবে। রাষ্ট্রপতির সাথে কতটা ভারসাম্য আসবে। বিচার বিভাগ কতটা স্বাধীন হবে। যে কমিশনগুলো আছে। বাংলাদেশে যেটি প্রকট সমস্যা

দুর্নীতি, সেটি কতটা স্বাধীন হবে। কিন্তু আমি আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গিতের দেখাতে চাই যে, বাংলাদেশে শুধু ওই জায়গায় ক্ষমতার ভারসাম্য নেই। বাংলাদেশের দুই স্তরের সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। একটি জাতীয় সরকার। একটি হচ্ছে স্থানিক সরকার। এই স্থানিক সরকার প্রায় পঙ্গু হয়ে আছে। এটি আসলে তার যে স্বাধীনতা কাগজে কলমে দেয়ার কথা সেই পর্যায়ে নেই। আমরা কর্মক্ষেত্রে গিয়ে দেখেছি। ফলে এ জায়গায় স্বাধীনতা হওয়ার জায়গা রয়ে গেছে। আমরা যদি মানুষ ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে তাদের কার্যভার করতে চাই, তাহলে এ জায়গাগুলো স্থানীয় সরকার কতটা স্বাধীন হবে সেটিও সংবিধানে আরেকটু পরিষ্কার করে আসা দরকার এবং আমার ব্যক্তিগতভাবে কতগুলো শব্দের ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। যেমন- আমরা বলছি প্রজাতন্ত্র। কিন্তু প্রজাতন্ত্রে যে সেন্স আমাদের মনে আসে, সেটি হলো যে, কেউ আমাকে শাসন করছে। আমার মাথার ওপর লর্ড রয়ে গেছে। আমি তার প্রজা। আমরা জনতন্ত্র আনতি পারি। আমরা গণতন্ত্র আনতে পারি। যেমন আমরা ব্যবহার করছি প্রশাসক। এ শব্দটি আসলেই আপত্তিকর। তিনি কেন প্রশাসক হবেন? তিনি কাকে শাসন করছেন? জনগণকে শাসন করছেন? আসলে তিনি জনগণকে শাসন করছে। গণতান্ত্রিক চেতনায় এ শব্দগুলোকে কীভাবে এখানে সংস্কার করতে পারি, সেটিও হয়তো একটু ভাবনায় আনা প্রয়োজন। আমি খুব বেশি দীর্ঘায়িত করব না। আমাদের যে পরিকল্পনার আঙ্গিকে ও অন্যান্য লিখিত প্রস্তাব, এটি আমরা পরবর্তীতে দিব।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমরা এখন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি সংঘের কথা শুনব।

জনাব খলিলুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান (বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি সংঘ) : ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি সংঘ যেটি মনে করে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। আজকে নেই। গত ১৬ বছরেও ছিল না। ১৭ বছরেও ছিল না। এর আগে ছিল না। তাহলে কী ছিল? একদলীয় শাসন ছিল। বাকশাল নয়। যে যখন ক্ষমতায় ছিল তারই শাসন ছিল এবং এক ব্যক্তির শাসন ছিল। এর আগের কথা বলেন। ১৯৭১ সালের আগে সেখানে ষড়যন্ত্র ছিল। তার সহযোগী ছিল। যাকে রাজাকার বলা হয়। সে অবস্থার প্রেক্ষিতে সেখানে স্বৈরশাসন ছিল। সেই স্বৈরশাসন উচ্ছেদ করে তখনই পূর্ব অংশে একটি সংগ্রাম ছিল যে, জাতীয় মুক্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। আমাদের দেশে সেটি অর্জন হয়নি। জাতীয় মুক্তি হয়নি। স্বাধীনতা আসেনি। গণতন্ত্রও আসেনি। তাহলে তো একদলীয় শাসন থাকত না। সেই স্বৈরতন্ত্রের অবস্থায় আমরা এখনো আছি। তার কারণ সেই কাঠামো আছে। কাঠামোর মধ্যে সেই সৈন্যবাহিনী আছে। পুলিশবাহিনী আছে। যার deprived অংশ আছে অথবা যারা বিভিন্ন দলের হয়ে আওয়ামী লীগ হয়েছিল। তারাই এখন ক্ষমতায় আছে। নতুন করে যারা আসছে তারাও কিন্তু মনোবৃত্তি হলো স্বৈরতান্ত্রিক। সেটির কিছু উদাহরণ আমরা দিতে পারব। আমি সারসংক্ষেপভাবে কথাগুলো বলব। সারসংক্ষেপে অনেক ব্যাখ্যা করা যায়। আপনারা অনেক ব্যাখ্যা করতে পারবেন। বিশ্লেষণ করতে পারবেন। সংবিধান সংশোধন বা সংস্কার বা সংবিধান নতুন করে করেন, যেটিই করবেন। কিন্তু এখানে যা-ই করেন 'থোড় বড়ি খাড়া বড়ি থোড়' হবে। যা আছে তা হবে। কেন হবে? আমাদের দেশে গ্রাম বলেন, শহরে বলেন, শিক্ষাঙ্গনে বলেন, democratic atmosphere নেই। আপনি মত প্রকাশ করবেন- আপনার সেই স্বাধীনতা নেই। আগামীতে হবে, সেটিও হবে না। যারা আসবে তারা ক্ষমতায় যাবে এ জন্য বেহুশ হয়ে গেছে। তার মানে আর এক মুহূর্ত ধৈর্য ধরতে চায় না। কিন্তু ক্ষমতা নেই। যারা স্বৈরতন্ত্রব্যবস্থা কায়েম রাখে তারা অর্থেবিত্তে sufficient থাকে। তারা জীবন দিতে চায় না। শিশুরা জীবন দিয়েছে। এখন নতুন করে মোচ তাওচ্ছে ক্ষমতায় যাবে। যারা একচেটিয়া পুজিবাদী গোষ্ঠী আছে, তাদের স্বার্থ রক্ষা করছে। মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করছে। আপনি ইউনিলিভার বলবেন। Uniliver mutinational company. তার যে বিতরণ ব্যবস্থা আছে, distributor এর মাধ্যমে তার man powerকে সার্ভিস নেয়। সেখানে কোনো শ্রম আইন বাস্তবায়ন নেই। সেখানে সংগ্রাম আছে। বিএনপির বিভিন্ন লোকেরা তাদের distributor এর পক্ষ অবলম্বন করে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করছে। কাজেই আপনি সংবিধানে যা-ই কিছুই করেন সেটিতে কোনো কাজ হবে না। সেই অবস্থায় যারা আজকে ক্ষমতায় যাবে তারা যেন অতীত পর্যালোচনা যাতে না করতে পারে, কেন আমরা ক্ষমতায় গেলাম। দীর্ঘ ১৫/১৬ বছরে ক্ষমতায় আসতে পারিনি। আবার একই কাজ করব। একই কাজ করছি। চাঁদাবাজি করব, দলবাজি করব, এ সংবিধানে এটিই হবে। সংস্কার করেন যাই করেন। কারণ যারা লুটেরা আসবে, তারা পেশাদার রাজনীতিবিদ নয়। তারা ব্যবসায়ী। তারা লুটপাটকারী। এ লুটপাটকারীরা মোচ তাওচ্ছে ক্ষমতায় আসবে। আপনি যা-ই কিছু আমার থেকে মতামত নেন না কেন এখানে বিপ্লব হয়নি। একটি গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। কার বিরুদ্ধে? একটি দলের বিরুদ্ধে। একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। কাজেই বিপ্লব যখন হবে কেউ থাকবে না। অতীতে যারা ক্ষমতায় ছিল কেউই থাকবে না। লুটপাটকারী। তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে। তাদের ভোটাধিকার থাকবে না। সেই যে সংবিধান, সেই সংবিধানে জনগণের স্বার্থে জনগণ বলবে যারা শ্রমিক, যারা দেশটি চালিয়ে রাখে- শ্রমিক এবং কৃষক বুঝি। তাদের সেবা করতে পারবে। এর আগে পারবে না। জনগণ সেই জায়গায় যখন যাবে তখন যে সংবিধান হবে, একটি constitutional assembly হবে, সেই assembly এদের ভোটাধিকার কেড়ে নিবে যারা মন্ত্রী, এমপি, অতীতে প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার ছিল। বড় বড় আমলা ছিল। দুর্নীতিবাজ ছিল। তাদের সমস্ত সম্পত্তি

বাজেয়াপ্ত হবে। তাদের ভোটাধিকার থাকবে না। এ রকম একটি সংবিধান আমরা চাই। যেখানে জাতীয় মুক্তি অর্জিত হবে। স্বাধীনতা আসবে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে। democratic atmosphere. শিল্পাঞ্চল, শ্রমিক অঞ্চলসহ ৭টি অঙ্গনে একটি democratic atmosphere তৈরি হবে। এ রকম একটি সংবিধান আমরা চাই। যদি বলি যে, আমরা পাকিস্তানে যাই। সেখানে আন্দোলন ছিল। জাতীয় মুক্তির স্বাধীনতা আন্দোলন করেছিল, যারা নেতৃত্বে ছিল, সেখানে আইএলও কনভেনশন ৮৭ হুবহু rectification হয়েছিল। আইএলও কনভেনশন হুবহু। যেমন- শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশ ১৯৬৯ এর ৩ ধারায় হুবহু আইএলও কনভেনশন rectification হয়েছে। বাংলাদেশে সেটি হয়নি। তার মানে আমরা পাকিস্তান চাই। আমরা পাকিস্তান চাই না। পাকিস্তান আমলে শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশ ১৯৬৯ ছিল, সেটি সংশোধন করতে করতে এখন আপনি সংগঠন করতে পারেন না। আপনি সংগঠন করতে না পারলে ক্ষমতায়ন কোথা থেকে করা হবে? সংগঠন করতে না পারলে শ্রমিকের ক্ষমতায়ন কোথা থেকে আসবে? তারা মতামত ব্যক্ত করতে না পারলে। আমরা সে ধরনের একটি সংবিধান চাই। সেটি এ ব্যবস্থায় এসে হবে না। একটি revolution কথা বলছি। revolution হবে। তখন এটি আসবে। সেই প্রত্যাশায় আমরা আছি।

সবাইকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। এখন আপনাদের দ্বিতীয় প্রতিনিধি বক্তব্য রাখবেন।

চৌধুরী আশিকুল আলম, প্রেসিডেন্ট (বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ) : ধন্যবাদ।

তিনি আমাদের চেতনার কথা বলেছেন। বিদ্যমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাগুলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ উপাদানগুলো কার্যকরি থাকা লাগে। আর লাগে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের ব্যবস্থা, এগুলো রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হয়। সংবিধানে সেটির ফোকাস দরকার। তৃতীয় দরকার হচ্ছে যে, constitution formed করতে গেলে যেহেতু পার্লামেন্ট নেই। এ অন্তবর্তী সরকার কি একটি constitution formed করতে পারবে? এটি একটি প্রশ্ন। প্রশ্ন যেহেতু আছে, সেহেতু on stitutional assembly formed করতে হবে। যদি বিদ্যমান ব্যবস্থায় থাকতে হয়। আর কী করতে হবে; আমাদের রাষ্ট্রকে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে নিজের ওপর দাঁড়ানোর যোগ্যতায় যেতে হবে। যাতে আমাদের ওপর অন্য কারো নিয়ন্ত্রণ মেনেই আমাকে যেন রাষ্ট্র পরিচালনা করতে না হয়। কারণ পৃথিবীতে যে টালমাটাল অবস্থা, সেই অবস্থায় আমার সার্বভৌমত্ব, আমার স্বাধীনতা, আমার জাতীয়তা বোধের যে চেতনা, সেই চেতনাকে লালন পালন করতে গেলে রাষ্ট্রের নিজস্ব সক্ষমতা বাড়াতে হবে। জাতীয় অর্থনীতি, জাতীয় সংস্কৃতি, সবকিছু নিজস্বতার ভিত্তিতে বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। সংবিধানে তার প্রতিফলন হবে। আমরা মনে করেছিলাম যে, ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি এখানে থাকবেন। এখানে অনেকেই আছেন। অনেকেই তাদের মতামত দিয়েছেন। তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলি যে, এ প্রসঙ্গে লিখিত মতামত পাঠাব। সংক্ষিপ্তভাবে এটুকু কথা যাতে এমন কিছু না হোক যে প্রাণ ঝড়ে গেল এবং সেই প্রাণের বিনিময়ে আমরা এমন কিছু অর্জনে যেতে পারলাম আবার বেদনাকেই সামনে নিয়ে আসছে। ফলে আমরা এমন কিছু সৃষ্টি করি যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বা এ জাতির জনগোষ্ঠী বা এ জাতি গোষ্ঠী, এ দেশ তার sovereignty নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমি আগেও বলেছি যে, আপনাদের লিখিত বক্তব্য ২৫ তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দিলে আমাদের কাজে সহায়তা হবে।

আমরা এখন বক্তব্য শোনার জন্য বিপনেটের প্রতিনিধিদের কাছে যাচ্ছি।

ডিভিশন প্রধান সুচিয়াং, সদস্য, বিপনেট : আমাদের এ সংস্কার কমিশনে আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ স্যার।

বিপনেট বাংলাদেশ ইন্ডিজেনিয়াস পিপলস নেটওয়ার্ক শুধু পার্বত্য এলাকায় নয়। আমাদের সমস্ত দেশে সমতল ভূমির যারা আদিবাসী আছেন, তারা এটির প্রতিনিধিত্ব করেন। এখানে প্রায় ৫০টির ওপরে জাতিসত্তার মানুষ। আমাদের বিপনেট বাংলাদেশ ইন্ডিজেনিয়াস পিপলস নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ সংগঠন, এটি প্রায় ৩০টি মাদার সংগঠন বিপনেটের সাথে সম্পৃক্ত। পার্বত্য ও সমতল এলাকার আদিবাসী নিয়ে। বিপনেট এমন একটি সংগঠন যেটি আদিবাসীদের রাষ্ট্রের পলিসি লেভেলে কাজ করেন। আদিবাসী জাতি সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধান এবং এটির অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমরা করি। জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং পরিবেশ প্রতিবেশ উন্নয়নের যে বিষয়টি, এটি আসলে বিপনেট খুব সুচারুভাবে আমরা করে আসছি। বিভিন্ন দিনে বিষয়গুলো আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতিমালার সাথে মতামত পেশ করেছি। বন বিভাগ এবং পরিবেশের উন্নয়ন। আদিবাসীদের ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিষয়ে আমরা কথা বলেছি। আজকে পার্বত্য এলাকার নাগরিক কমিটির সাথে যে সংশোধনী আনা প্রয়োজন এবং আমাদের সংবিধানের সাথে সংযুক্ত করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে আমরাও

একমত পোষণ করছি। আমাদের বিপনেটের পক্ষ থেকে কিছু সংশোধনী আমরা আনতে চাই। আমি আমার লিখিত বক্তব্য থেকে পাঠ করে শোনাই। আমি আমার পেপারটি আপনাদের কাছে দিয়ে যেতে চাই।

বিপনেট বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জুলাই-আগস্ট ২০২৪ ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে জনগণের ক্ষমতায়ন এবং জনপ্রতিনিধিত্বশীল কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আমরা তার সাধুবাদ জানাই। এ দেশে আদিবাসীদের যুগ যুগ ধরে রাষ্ট্রীয় ও বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিকসহ নানা কাঠামোর মধ্যে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে, এগুলো বিলুপের জন্য তারা দীর্ঘকাল ধরে দাবি করে আসছে। বাংলাদেশ একটি বহু জাতি, বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির দেশ। কিন্তু এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে বৃটিশ উপনিবেশিকত্তর সময়কালে একক জাতি এবং তাদের ধর্ম, ভাষা এবং ইতিহাসকে কেন্দ্র করে যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে, তা সংকীর্ণ আদর্শের ওপর স্থাপিত, যা মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক এবং আদিবাসীদের শোষণ ও বৈষম্যমূলক কাঠামোর অন্যতম কারণ। এ প্রেক্ষিতে আদিবাসী জাতিগত পরিচয়, সাংবিধানিক স্বীকৃতি, তাদের প্রথাগত শাসনব্যবস্থা ও ভূমি অধিকার, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অভাবসহ ইত্যাদির কারণে আজ আদিবাসীরা দেশের মধ্যে দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানসহ ইত্যাদি আর্থসামাজিক সূচকে দেশে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অন্যতম। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র নির্মাণের প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রের অস্বীকৃতির ওপর জাতি গোষ্ঠীর ক্ষেত্র তৈরি করে না। দেশের জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ প্রতিবেশের জন্য তা ক্ষতিকর। কারণ জাতিগত কারণ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিশেষ করে আদিবাসীদের প্রথাগত শাসনব্যবস্থা। জ্ঞান ও চর্চার সাথে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তাই জুলাই-আগস্ট ২০২৪ ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের যে স্বপ্ন বৈষম্যহীন বাংলাদেশ তা আমরা আদিবাসীরা সর্বাত্বকভাবে সমর্থন করি।

বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষে যে সাংবিধানিক সংস্কার হতে যাচ্ছে সেখানে আমাদের দাবিগুলো যথাযথভাবে আমলে নেয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের দাবিনামার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

সংবিধান সংস্কার আদিবাসীদের মৌলিক দাবি। এটি আমাদের নাগরিক কমিটি থেকে পড়েছেন। আমি আমাদের বিষয়গুলো বলতে চাই। বিদ্যমান সংবিধানের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবগুলো। প্রথম ভাগ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র সংক্রান্ত ও অনুচ্ছেদ শেষে নতুন সংযোজন বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষার পরিভূষণ ও উন্নয়ন সমভাবে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রদান। দ্বিতীয়ত একাদশ ভাগ। ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ১৫২ অনুচ্ছেদ শেষে আদিবাসী জাতি গোষ্ঠীর সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় ভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি জাতীয় ঐক্য সংক্রান্ত ৯ অনুচ্ছেদে সংশোধনীর প্রস্তাব। ভিন্ন ভিন্ন ও সংস্কৃতিগতভাবে বহু সত্তাবিশিষ্ট বাংলাদেশ জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে। সেই বাংলাদেশ জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। একাদশ ভাগ বিবিধ- প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি সংক্রান্ত। ১৪৩ অনুচ্ছেদের (৩) উপানুচ্ছেদের নতুন সংযোজন। এ অনুচ্ছেদের কোনো কিছু দেশের আদিবাসী জাতি গোষ্ঠীসমূহকে তাদের স্ব স্ব অধ্যুষিত অঞ্চলের ভূমি প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার এবং সামষ্টিগত ভূমি মালিকানার স্বত্বাধিকারী নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না। দ্বিতীয় ভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তিসংক্রান্ত ১৪ অনুচ্ছেদে সংশোধন। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে মেহনতি মানুষকে কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসী এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তিদান করা। তৃতীয় ভাগ মৌলিক অধিকার। ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্যসংক্রান্ত ২৮ অনুচ্ছেদ সংশোধন। আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ নারী ও শিশুদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এ অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্তি করবে না। ৭ এর তৃতীয় ভাগ মৌলিক অধিকার। সরকারি নিয়োগলাভে সুযোগ সমতা সংক্রান্ত ২৯(৩) অনুচ্ছেদের সংশোধন। নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশ ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হবে। ৮, তৃতীয় ভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। অনুচ্ছেদ ২৩(ক) জাতীয় সংস্কৃতি প্রস্তাবিত সংশোধনী। রাষ্ট্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ভাষা, রীতি, প্রথা, ঐতিহ্য, সাহিত্য, শিল্পকলা এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এবং বহু মাতৃক সংস্কৃতি সমৃদ্ধিতে সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবে। উপরোক্ত দাবিগুলো আমলে নেয়ার দাবি জানাচ্ছি। আমরা আশা করি এ সংস্কার কমিশন ও অন্তবর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশ সংস্কৃতির বহুত্ববাদ অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ এবং বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করবে। আমরা আমাদের বিপনেট সমতল এবং পার্বত্য এলাকার আদিবাসীদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি দিচ্ছি। আমাদের লিখিত বিষয়গুলো আমরা উপস্থাপন করব।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

লিখিত বক্তব্য আজকে যেহেতু আছে সেটি আমাদের দিয়ে যেতে পারেন অথবা পরে ই মেইলেও পাঠাতে পারেন।

ডিভিশন প্রধান সুচিয়াং, সদস্য, বিপনেট : আজকে আমরা দিয়ে যাচ্ছি।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

বিভিন্ন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু প্রশ্ন আছে। আমরা সময় স্বল্পতার মধ্যেও আছি। কিন্তু প্ল্যানার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তৃতীয় একজন সংক্ষেপে বলেন যাতে করে আমরা অন্যান্যদের সাথে প্রশ্নের দিকে যেতে পারি।

প্রফেসর ড. আদিল মুহাম্মদ খান, প্রেসিডেন্ট (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স) : আজকে এখানে কথা বলার সুযোগ দেয়ার জন্য আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমরা আগামী ২৫ নভেম্বরের মধ্যে আমাদের লিখিত মতামত পাঠাব। আমরা confused যে এটি সংস্কার হবে না কি পুনর্লিখন হবে। কারণ সংস্কার হলে আমাদের সুপারিশ এক রকম যাবে। আর পুনর্লিখন হলে অন্যভাবে যেতে পারে এবং ভলিউমটি কেমন হতে পারে। ছোট সংবিধান হলে এক রকম আবার বড় সংবিধান হলে আরেক রকম। এটি আমরা অনুরোধ করব। হয়তো আপনারা দিতে পারলে ভালো না হলে আমরা আমাদের মতো করে দিব। ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার প্রথম সংবিধান দিয়েছিল। সাম্য সামাজিক মর্যাদা ন্যায়বিচার এর ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ঠিক তেমনি জুলাই গণঅভ্যুত্থান বৈষম্যহীন বাংলাদেশ। যেটি আমরা গত ৫০ বছরে পাইনি। আমাদের সংবিধানে যা যা ছিল, শাসনতন্ত্রের অংশ বাদে। যদি মানা হতো তাহলে বাংলাদেশের চিত্র এ রকম হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, আমাদের আঞ্চলিক বৈষম্য বেড়েছে। যে আঞ্চলিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জন্ম। আমাদের প্রতিটি পেশার কৃষক, শ্রমিক, জেলে তাদের অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা হয়নি। আমরা একটি রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের পরে কল্যাণ রাষ্ট্রের দিকে যাইনি। মুক্তবাজার অর্থনীতির দিকে গিয়েছি। যেখানে প্রতিটি মানুষকে তার শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য বিষয়ে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। এ জন্য আমরা যে বাংলাদেশ গড়তে চাই, সেটি মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সবকিছু বাজারের কাছে ছেড়ে দেব, যেটি আমাদের মৌলিক অধিকারের ধারাতে আছে। আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা, এগুলো কি মুক্তবাজারে যাবে না কি কল্যাণ অর্থনীতির ধারায় যাব যেখানে আমাদের মানুষের কল্যাণ। সেটি একটি স্পষ্টকরণ উচিত। সেটি না হলে আমাদের বৈষম্যহীন বাংলাদেশের কথা যেটি আমরা বলছি। আমরা প্ল্যানার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলতে চাই, আমাদের যাত্রা হয়তো কল্যাণ রাষ্টের দিকে। আমাদের যিনি প্রধান উপদেষ্টা তিনি ৩০ অর্থনীতির কথা বলছেন। সেখানে তিনি যা বলছেন, সেটি কল্যাণ রাষ্ট্র ছাড়া পুরুটা মার্কেটের ওপর ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়ীদের ওপর ছেড়ে দিয়ে। যে ব্যবসায়ীরা ৭০ ভাগ সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছে, তার কোনো চেক এন্ড ব্যালেন্স নেই এবং সেই ব্যবসায়ীরা conflict of interest এর জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন পলিসি তৈরি করছে। এ জায়গাগুলো যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি, তাহলে আমাদের বাংলাদেশে যে কল্যাণ ও যে বৈষম্যহীন দেশের কথা ভাবছি। আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছে। সেই categorization করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ যারা মারা গিয়েছে, শহিদ হয়েছে, তারা বৈষম্যহীন ক্যাটাগরির। তারা রিকসাওয়ারা, তারা শ্রমিক, তারা কৃষক। যদিও আমরা ছাত্রদের কথা বারবার বলছি। ছাত্রদের পিতামাতার হিসাব করলে দেখা যাবে সেই ক্যাটাগরি বেশি। তাহলে এটি আমাদের দায়বদ্ধতা। ৫০ বছরে যেটি পারিনি। মুক্তিযুদ্ধে যে রক্ত দিয়েছিলাম, এ ৫০ বছর দাঁড়াতে গেলে অবশ্যই কল্যাণ অর্থনীতি। যেখানে আমাদের কৃষকের শিক্ষা, চিকিৎসা। আমাদের গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন, সেটি লাগবে। এ উন্নয়ন কাঠামো যদি তৈরি করতে চাই, বৈষম্যহীন নাগরিক সুবিধাদি তার যদি শিক্ষার বণ্টন এবং তার quality, quantity এর বণ্টন করতে চাই তাহলে আমাদের অন্য বক্তারা যেটি বলেছেন যে, প্ল্যানিংয়ের একটি কাঠামো তৈরি করা দরকার। পরিকল্পনার কাঠামোর বাইরে গিয়ে আমাদের বৈষম্যহীন বাংলাদেশে যেখানে গ্রামের স্কুলের একটি standard থাকবে, সেটি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। এ জন্য সারা বাংলাদেশের কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রয়োজন। সেই পরিকল্পনার উন্নয়নের সংজ্ঞাতে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, অর্থনীতির পরিবেশ এবং আমাদের যে সামাজিকক রক্ষা, এটিকে মিলে উন্নয়নের ধারণা, যেটি আধুনিক বিশ্বে চর্চিত, সেই ধারণা স্পষ্টীকরণ করা প্রয়োজন। কারণ অতীত সরকার যে ভুল করেছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সামনে রেখে আর অন্য যে কাঠামো আছে সব বাদ দিয়ে দিয়েছে। পরিবেশ পরে, আগে উন্নয়ন। গণতন্ত্র পরে আগে উন্নয়ন। তাহলে এ জায়গা থেকে বের হতে হবে। আমরা যদি এ জায়গা থেকে বের হতে চাই তাহলে আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা এবং গ্রাম ও নগরের মধ্যে বৈষম্য দূর করার কথা আগের সংবিধানে ছিল। সেই সংবিধানে যা লেখা ছিল, সেটি বাস্তবায়ন হলেই চলতো। কিছুই বাস্তবায়ন হয়নি। সংবিধানে যা ছিল পরবর্তী পর্যায়ে বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে সব ওলটপালট করা হয়েছে। সে জন্য এ বৈষম্যহীন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পেশাগত বৈষম্য এবং প্রতিটি নাগরিকের যে বৈষম্যগুলো কীভাবে প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করা হবে। শুধুমাত্র সংবিধানে লিখলেই হয় না। এটির একটি পরিকল্পনা কাঠামো তৈরি করতে হয়। পরবর্তীতে সেটি বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রের বিনিয়োগ লাগে। সেই investment এর ধারণা তৈরি করা হয়নি। আমরা প্ল্যানার্স ইনস্টিটিউট থেকে বাংলাদেশে investment এর বৈষম্যগুলো তুলে ধরেছি। প্রতি বছর টাকা প্রায় ৪০ ভাগ নিচ্ছে। চট্টগ্রাম ২০/২৫ ভাগ নিচ্ছে। বাকি ৬০ জেলাতে যে বণ্টন হচ্ছে, সেই বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের standard maintain করা হয়নি। standardization economy of investment সেগুলো সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত। নিশ্চিত

করতে গেলে আমাদের প্রস্তাবনা থাকবে যে, বাংলাদেশে দুটি বিষয়। একটি হচ্ছে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সরকার ব্যবস্থাপনা নিয়ে আসা উচিত। আরেকটি হচ্ছে আমাদের প্রদেশ নেই। আমাদের আছে বিভাগ। সকল বিভাগ সমান আয়তন এবং standard এ নেই। আমাদের আঞ্চলিক সরকার ব্যবস্থাপনা। আঞ্চলিক সরকার তৈরি করা যায় কি না। তাদের পার্লামেন্ট থাকবে, সেটি মনে হয় দরকার। বাংলাদেশ ছোট একটি দেশ। কিন্তু ছোট দেশ বললেই ছোট না। কারণ যে পরিমাণ জনসংখ্যা আছে, জনসংখ্যার দৃষ্টিতে বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে আমরা বড়। যদি জনসংখ্যাকে consider করেন তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশে আঞ্চলিক সরকারব্যবস্থা দরকার। সে রংপুরের মানুষ তাদের এলাকার রংপুরের পার্লামেন্টে কথা বলবে। এটি দরকার আছে। এটি শুধুমাত্র সাইজ ছোট দিয়ে আলোচনাটি সরিয়ে ফেলার কোনো সুযোগ নেই। আমরা এ দাবিটি করতে যাচ্ছি যে, কীভাবে আঞ্চলিক সরকারব্যবস্থা নিয়ে আসা যায়, যাতে জনগণ তার এলাকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আরেকটি আলোচনা হচ্ছে জাতির পিতার আলোচনা করা এখানে প্রয়োজন। জাতির পিতা একজনকে বড় কিছু বানানোর সুযোগ নেই। বরং founding fathers এ অনেকের contribution আছে। পৃথিবীর কোনো মানুষ একা কিছু করতে পারে না। তাহলে আমাদের founding fathers এর আইডিয়াগুলো নিয়ে আসা প্রয়োজন আছে। আমাদের বিভিন্ন প্রান্তিক জনগণের প্রতিটি পেশার আলাদা আলাদা চাহিদা আছে। সেই পেশাজীবীদের কীভাবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারে নিয়ে আসতে পারি। তাদের প্রতিনিধিত্বশীল যে সরকার হয় এবং পেশা মানে যে পেশাতে যারা সত্যিকার অর্থে আছেন। শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা যার কোনো সংযোগ নেই। সেখানে কোনো তার অধিকার নেই। হয়তো ২০ বছর আগে সেই পেশায় ছিলেন, এটি না। যারা সত্যিকার অর্থে বর্তমানে কৃষিতে আছেন, সেই কৃষক প্রতিনিধিদের কীভাবে আমরা সরকারব্যবস্থায় নিয়ে আসতে পারি। আমাদের কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণার বিষয়ে বলছিলাম, সেটি যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি। কারণ অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক তারা কল্যাণ রাষ্ট্র, কিন্তু তারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কল্যাণ রাষ্ট্রের সাথে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাথে কোনো সংঘর্ষ নেই। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই আমাদের বিষয়টি নিয়ে আসতে হবে। আমরা মনে করি সংসদের মেয়াদ ৪ বছর হওয়া উচিত। ৫ বছর লম্বা একটি সময়। ৪ বছর সময় হলে সেখানে checks and balances থাকে। ব্যবসায়ী প্রতিনিধি সংখ্যার আধিক্যের বিষয়টি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেটি ধারণা থাকা উচিত। বাংলাদেশে ব্যবসার নাম দিয়ে জমির মালিকানার ভোগ। আমাদের land reform commission সেভাবে কাজ করেনি। প্রচুর ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাইলের পর মাইল একরের পর একর জমি চলে যাচ্ছে। জমির মালিকানার ব্যাপারে কী পরিমাণ checks and balances করব, সেটি থাকা দরকার।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আপনাকে অনুরোধ করছি যে, সংক্ষেপ করতে হবে। অন্যান্যদের কথা শুনতে হবে।

প্রফেসর ড. আদিল মুহাম্মদ খান, প্রেসিডেন্ট : এক মিনিটের মধ্যে শেষ করছি। স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় কীভাবে প্রকৃত অর্থে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় লোকের অংশগ্রহণ হয় এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াতে যাদের টাকা পয়সা নেই, পেশিশক্তি নেই। তারা কীভাবে এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিনিধি হিসেবে সংসদে যেতে পারে, সেটির ক্ষেত্রে নির্বাচন আইনগুলো কিছু সংস্কার করা দরকার। আমরা বলতে চাই, সকল ক্ষেত্রে টেকসই পরিবেশের ধারণাগুলো এবং তার সাথে ব্যবসার ধারণা। কারণ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে উন্নয়নকে define করতে পারব না। টেকসই পরিবেশ ও উন্নয়নের কারণে সেই এলাকার কৃষি অর্থনীতির ওপরে অভিঘাত না হয় এ ধরনের উন্নয়ন মডেলের গাইডলাইন আমাদের বর্তমান সংবিধানে কিছু আছে। একটু detail in দরকার। আর আমাদের বৈদেশিক নীতি এবং সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আপোষ করার সুযোগ নেই। সেই বিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত। আইন, শাসন এবং বিচার বিভাগ। তাদের জন্য প্রতিটির identity থাকে। কেউ যেন কারো ওপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। আর আমাদের পক্ষ থেকে পরবর্তীতে লিখিত পাঠাব।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আগামী ২৫ নভেম্বরের মধ্যে পাঠালে আমাদের জন্য খুব সহজতর ও সহায়ক হবে। কিছু কিছু বিষয় এসেছে। শুধু ব্যাখ্যার জন্য। অনেকেই এটি বলেছেন। বিশেষ করে আমরা যেটি শুনতে পাই যে, পেশাগত প্রতিনিধিত্বের কথা বলা হচ্ছে। অঞ্জন দাস আপনিও এটি উল্লেখ করেছেন যে, উচ্চ কক্ষ হলেও যেন পেশাদারিত্ব থাকে। বাংলাদেশে পেশার বিষয়ে আপনাদের কোনো সুস্পষ্ট প্রস্তাব আছে। যদি আমরা প্রস্তাব করি, তাহলে কীভাবে পেশাগত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যাবে, সেটি উচ্চ কক্ষ বা নিম্ন কক্ষে হোক।

অঞ্জন দাস সহ সভাপ্রধান (গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি) : আমি যেহেতু শ্রমিক সংগঠনে আছি। একটি ট্রেড ইউনিয়ন যদি জাতীয় একটি কাউন্সিল হয়, তাহলে তারাই সেখানে নির্বাচন করে তার পেশাদারিত্ব প্রতিনিধি পার্লামেন্টে পাঠাতে পারে। আমি উদাহরণ দিলাম। একটি ট্রেড ইউনিয়ন, একটি জাতীয় ইউনিয়ন। ট্রেড ইউনিয়ন সমস্ত শ্রমিক তার প্রতিনিধি ভোটের মাধ্যমে নিশ্চিত করে সংসদে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে নিতে পারে। এভাবে অন্যান্য পেশাজীবীদের মধ্যে হতে বা ভিন্ন কোনো ব্যাপারও থাকতে পারে। আমি একটি উদাহরণ দিলাম।

জনাব খলিলুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট (বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ) : আমি একটু যুক্ত করি। অর্থনীতির বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে যেটি দরকার। একটি জাতীয় নূন্যতম মজুরি। সংবিধান যদি আমাকে জাতীয় নূন্যতম মজুরির গ্যারান্টি দেয়, যেটি আসলে বাংলাদেশের উৎপাদনশীলতা বিকাশের সাথেও যুক্ত। ফলে একটি জাতীয় নূন্যতম মজুরি নিশ্চয়তা আগামীর সংবিধান থেকে আমাদের শ্রমিকরা চায় সাংবিধানিকভাবে নিশ্চয়তা। আমরা যেমন আগের সংবিধান থেকে কোনো গ্যারান্টি পাইনি। অনেক ভালো ভালো শব্দ আছে। কিন্তু বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ না কিংবা সে বাস্তবায়ন না করলে তার বিরুদ্ধে আমার প্রতিষ্ঠান কী action এ যাবে সে ধরনের কোনো ব্যবস্থা বিদ্যমান সংবিধানে নেই। ফলে আমাদের অধিকারের নিশ্চয়তা চাই। গ্যারান্টি চাই। যে সংবিধান আমাকে নিশ্চয়তা দিবে যে, এগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

চৌধুরী আশিকুল আলম, প্রেসিডেন্ট (বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ) : আপনি মনে করেন যে, জাতীয় মজুরি কমিশন হলেই যে বাস্তবায়ন হবে, এটির কারণ নেই। জাতীয় পর্যায়ে সেই ক্যাপাসিটি নেই। নিম্নতম মজুরির জন্য অনেক অ্যাওয়ার্ড আছে। কিন্তু বাস্তবায়নের জন্য যা আছে, ঘুষখোর আছে। পরিদর্শক বিভাগে ঘুষখোর আছে। যারা সরকার পরিচালনা করে তারা হচ্ছে লুটপাটকারীদের পক্ষে। নিশ্চিত ক্ষমতা যাদের, তারা ঠিকই আইন করে। আইন কোনোকালেও বাস্তবায়ন হবে না। তারা যদি intentionally যুক্ত থাকে। কাজেই আইন আছে, কিন্তু আইনের বাস্তবায়ন নেই। আরও আইন হলেও কোনো কাজ হবে না। যারা আছে তারা ব্যবসা বাণিজ্য করে। প্রত্যেকের অবস্থান থেকে চিন্তার জন্ম নেয়। কাজেই যে ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ী অবস্থান থেকে চিন্তার জন্ম নিবে। শ্রমিক এবং কৃষকের অবস্থান থেকে জন্ম নিবে না। পেশাদার রাজনীতিবিদ না। তারা হচ্ছে মন্ত্রী, তারা হচ্ছে এমপি। এ জায়গা থেকে যতক্ষণ না সরবে ততক্ষণ আপনি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারবেন না।

জনাব মোঃ মোসতাইন বিল্লাহ (কমিশন সদস্য) : আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন আছে। আমরা আপনার বক্তব্য শুনেছি। আমি একটু সুযোগ নেই। জনাব নিরুপা দেওয়ান এর কাছে জানতে চাচ্ছি। আপনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছেন। তার বিশদ লিখিত প্রস্তাবনায় থাকবে। আপনি যেটি বলেছেন যে, 'পার্বত্য এলাকার জন্য স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।' একই সাথে আপনি ১৫টি আসনের কথা বলেছেন, সেটি যেন সংরক্ষণ রাখেন। এটি কি আমাদের পার্লামেন্টের জন্য ১৫টি আসনের বিষয়ে বলেছেন।

নিরূপা দেওয়ান, সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : হাঁ।

জনাব মোঃ মোসতাইন বিল্লাহ (কমিশন সদস্য) : ঠিক আছে। সুনির্দিষ্টভাবে একটি আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব তার বাইরে জাতীয় প্রতিনিধিত্বের জায়গা করে কী হবে? এটি যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন।

নিরূপা দেওয়ান, সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : এটি জাতীয় প্রতিনিধিত্ব। জাতীয় পর্যায়ে আমাদের আদিবাসীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করবে।

জনাব মোঃ মোসতাইন বিল্লাহ (কমিশন সদস্য) : এটি হচ্ছে আমাদের assembly এর জন্য, সেটি যে ধরনেরই হোক। অনেকগুলো স্থানীয় সরকার বিষয়ে বললেন।

নিরূপা দেওয়ান, সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : আমাদের customary law আছে।

জনাব মোঃ মোসতাইন বিল্লাহ (কমিশন সদস্য) : একটি তো পার্লামেন্টারি আছে, যেটি আপনি বললেন। স্থানীয়ভাবে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিত্বের বিষয় রয়েছে। সেখানে আপনাদের এ ধরনের কোনো সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করার পক্ষপাতি।

জনাব হরি পূর্ণ ত্রিপুরা, সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : আমি কি একটু add করতে পারি। আমরা এখন ওই রকম সুনির্দিষ্ট সংখ্যা দিতে পারছি না। শুধু একটি উদাহরণ দিতে পারি, সেটি সমগ্র পার্বত্য এলাকায় ৭টির মতো পৌরসভা আছে। যেখানে আদিবাসীদের কোনো একজন মেয়র নেই। তার মানে হচ্ছে যে, প্রতিটি জায়গায় স্থানীয় পরিষদগুলো আছে, সেখানে আমাদের যে ক্ষমতায়ন, ওই প্রক্রিয়া থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। ওই যে স্থানীয় সরকারগুলো। যে নানান ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম করে থাকে সেখান থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। তার মানে হচ্ছে যে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে উন্নয়ন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। সেখানে নাম্বার কী রকম হতে পারে, সেটি হয়তো আলোচনার বিষয়। কিন্তু সংরক্ষণের সময় চিন্তা করা যেতে পারে।

জনাব মোঃ মোসতাইন বিল্লাহ (কমিশন সদস্য) : আমি আসলে প্রশ্নটি এ কারণে করেছি যে, আপনাদের কোনো মানদণ্ড বা criteria প্রস্তাব করতে পারেন কি না। যেমন ১৫ হতে পারে আবার অন্য কিছু হতে পারে। সেটি জনসংখ্যা বা অন্য কোনো বিবেচনার বিষয় আছে কি না; আমাদের একটু লিখিতভাবে দিবেন।

জনাব হরি পূর্ণ ত্রিপুরা, সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : আমরা পরিষ্কারভাবে লিখিত দিব। আমরা যেহেতু প্রতিটি জাতিকে

একটি ইউনিট হিসেবে করে আমরা মত হচ্ছে যে, প্রতিটি জাতি সংখ্যায় বড় বা ছোট, সেটি ব্যাপার নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিসহ ১২টি জাতি থাকে তাহলে প্রতিটি জাতি থেকে একজন। যেমন- চাকমা থেকে একজন, ত্রিপুরা থেকে একজন, বাঙালি থেকে একজন, এ রকম প্রতিনিধিত্ব থাকা দরকার। যাতে সবার অংশগ্রহণ থাকে। তাই সংখ্যা দিয়ে বিচার করলে হবে না। বাঙালি অনেক বেশি বলে বাঙালিরা এত শতাংশ পাবে, চাকমারা বেশি বলে চাকমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে। লুসাইরা ১ হাজারের নিচে। তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকবে না, এটি হয় না। আমরা যে বৈষম্যহীন সমাজের কথা বা দেশের কথা চিন্তা করি, সেটির সাথে কোনোভাবে মিলে না।

জনাব মোঃ মোসতাইন বিল্লাহ (কমিশন সদস্য) : এ জটিলতা আছে বলেই আমি প্রশ্নটি করলাম। আপনারা বিস্তারিত লিখিত দিবেন।

জনাব হরি পূর্ণ ত্রিপুরা, সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : আমরা আরও বিস্তারিত দিব। এখন যে লিখিত সেটি দিয়ে যাচ্ছি।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

ছোট একটি প্রশ্ন। যেটি বারবার ফিরে ফিরে আসছে। প্ল্যানার্স এসোসিয়েশনের এ কে এম রিয়াজউদ্দিন আপনি যখন কথা বলেছেন, সেখানেও বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য। সেখানে কী আপনাদের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে যে, কীভাবে ভারসাম্য তৈরি করা যেতে পারে। প্রশ্নটি এ কারণে তোলা হচ্ছে যে, ধরুন এখনকার ব্যবস্থায় যদি রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। সাংবিধান যে বিধি বিধান তাতে এক হচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকেন রাষ্ট্রপতি। যদি সেটিও প্রস্তাব করি যে, সেটি কোনো না কোনোভাবে decoupling করা হবে প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের প্রক্রিয়া প্রধানমন্ত্রীর অধীন থাকবেই, যদি সংসদের মধ্যে দিয়ে হয়। সে ক্ষেত্রে ক্ষমতার ভারসাম্য আসলে ঠিক কীভাবে দেখেন। আর সংক্ষেপে যদি কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকে তাহলে বলতে পারেন অথবা পরেও বিস্তারিত দিতে পারেন।

প্ল্যানার এ কে এম রিয়াজউদ্দিন : Instantly বলি। এখানে দুটি বিষয় হতে পারে। এখনতো by default প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে সিলেক্ট করেন। এটি ভোটিংয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সিলেক্ট করা যায় কি না। সেটি একটি way out হতে পারে ভোটিং।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আপনি সরাসরি ভোটের কথা বলছেন।

প্ল্যানার এ কে এম রিয়াজউদ্দিন : Exactly. যখন ভোটিংয়ের মাধ্যমে তিনি আসবেন। যদি ভোটিংয়ের মাধ্যমে আসেন তাহলে সরাসরি কিছু পাওয়ার রাষ্ট্রপতির দিয়ে দেয়া হবে। অবশ্যই রাষ্ট্রপতি জনগণের mandate প্রাপ্ত। তখন সেখানে ভারসাম্য তৈরি করা যেতে পারে। আর যদি ভোটিংয়ের মাধ্যমে সিস্টেম না করা যায়, তারপরও আমাদের আইন, বিচার ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে কোনটি প্রধানমন্ত্রী deal করবেন, কোনটি রাষ্ট্রপতি deal করবেন, সেটি আলাদা করে ফেলা উচিত। আলাদা করলে এক ধরনের ভারসাম্য আসবে। সেটি by constitution এ থাকবে। বিদ্যমান অবস্থায় আমরা দেখেছি যে, রাষ্ট্রপতি একটি পুতুল ছাড়া আর কিছুই না। এটি থাকা আর না থাকা ভালো। আমরা বিস্তারিত দিব।

ধন্যবাদ।

প্ল্যানার সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন (সদস্য) : একটি জায়গায় উল্লেখ করে যাই। আমরা লিখিত দিব। এখন হচ্ছে যে, ফ্লোর ক্রসিং বা বিরুদ্ধ দলের বাইরে গিয়ে মতামত দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। এটি এক ধরনের স্বৈরতন্ত্রেরই জন্ম দিচ্ছে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

প্ল্যানার সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন : আমরা যেহেতু পরিকল্পনাবিদদের সংগঠন থেকে এসেছি। আমি দুটি contextual উদারণ দিয়ে আলোচনা করতে চাই। আলোচনা নয়, একদম সংক্ষেপে বলছি। ঢাকা সিটি করপোরেশন যখন দুই ভাগে ভাগ করা হলো, সেটির পিছনে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট করার একটি উদ্দেশ্যে ছিল বলে আমরা বলতে পারি। কারণ ঢাকা একটি functional unit. সেই functional unit কে arbitrary দুই ভাগে ভাগ করা হয় তখন ঢাকার যিনি মেয়র থাকবেন, তিনি ক্ষমতার ভারসাম্যতে একটি ভূমিকা রাখেন, সেটি কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই এটি arbitrary হঠাৎ করে স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতাহীন করার একটি প্রবনতা আমরা দেখেছি। এটি কীভাবে আপনারা বন্ধ করবেন বা বন্ধ করা সম্ভব কি না সেটি ভাবার বিষয়। এটি উদাহরণ আকারে প্রশ্ন দিচ্ছি। আমাদের যে প্রস্তাবনা আছে। এখানে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে বলেছি যে, যখন বাস্তবায়নকারী সংস্থা পরিকল্পনাও করে তখন যে ধরনের conflict of interest তৈরি হয় তাতেও এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়। কাজেই ভারসাম্যহীনতা বলতে আমরা যেটি বুঝি, এটি উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সেটি প্রকাশ পায়। আপনাদের specific context এ আমরা হয়তো qualified না। to give the best answer. আরেকটি বিষয় খুব সংক্ষেপে বলছি। সেটি আপনিও কিছুটা জানেন। আপনারা সংবিধানের ক্ষেত্রে এ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন যে, কীভাবে আপনারা নিশ্চিত করবেন যে,

এটি সকলের সংবিধান হলো। এ ক্ষেত্রে কিছু methodological কথা বলতে পারি। সেগুলো হয়তো explore করে দেখার সুযোগ আছে। সেটি হচ্ছে sortition method। আমরা বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে এসেছি। কিন্তু এটি কীভাবে নিশ্চিত হবে যে, একজন সাধারণ মানুষ, যদি হয়তো আসলে কোনো সংগঠনের সাথে সরাসরি যুক্ত নন। তার চিন্তাভাবনা কীভাবে আসবে? বিশেষ করে আমাদের urban plan-এ দেখি যে, একটি participation এর দায় দায়িত্ব আছে। এটির প্লানিং হতে হবে। participation এ কয়েকজনকে ডাকা হলো, বসা হলো, participation হয়ে গেল। কিন্তু আমরা বলতে পারছি না। কিন্তু সর্টিশন মেথডের একটি দাবি আছে যে, তারা বলে যে, আপনারা সারা বাংলাদেশ থেকে randomly select করেন। বিশ্বাস রাখেন তারাও ভালো মতামত দিতে পারবে। এ বিশ্বাসের জায়গা তেরি করা এবং যদি তারা কিছু ভুলও করে by its self essentially এটি আসলে সকলের হয়ে উঠবে। এই যে, participation এর ধারণা যদি আনা যায় সেটি এক অর্থে ভারসাম্যের বিষয়টিকে এক ধরনের feedback দিতে পারবে বলে আমরা আশাবাদি হতে পারি।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): সমস্ত বিষয়টি রেকর্ড থাকছে। আপনি যেটি বলেছেন যে, consultation process এ সকলের অংশগ্রহণ। আমরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। civil society organizations এর সাথে কথা বলেছি। পেশাজীবীদের সাথে কথা বলেছি। এর বাইরে সিভিল সোসাইটির নেতৃত্ব স্থানীয় বলে চিহ্নিত তাদের সাথে কথা বলেছি। এ রকম বিভিন্ন সংগঠনের সাথে কথা বলেছি। এর বাইরে আমরা ওয়েবসাইটে সকলে মতামত যাতে জানাতে পারেন, সে ব্যবস্থা আমরা করেছি। আমি আশা করি যে, আপনাদের কারো কারো কাছে মোবাইলে ম্যাসেজ এসেও থাকতে পারে। একাধিক বার জানানো হয়েছে, আপনারা দিতে পারেন। এগুলোর randomness আসলে কম, সেটি আপনারা বুঝতে পারছেন। সে কারণে আমরা সারা দেশে একটি জরিপের কথা ভাবছি। যারা এ নেটওয়ার্কের বাইরে আছেন, তাদের মতামত আমরা পাই। মতামত সংগ্রণের জন্য যতদূর স্বল্প সময়ের মধ্যে বিস্তার লাভ করা যায়, সেটি আমরা চেষ্টা করছি। আশা করছি যে, সবটি না পারলেও আমরা একটি বড় অংশ কভার করতে পারব।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য) : আমার প্ল্যানার এসোসিয়েশনের কাছে একটি অনুরোধ থাকবে এবং আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন আছে। যেহেতু আপনাদের অনেক research work আছে, specially আপনারা একটি পয়েন্ট ফোকাস করেছেন যে, human based constitution না হয়ে এটি আরও nature based integration, human and nature. আরেকটি পয়েন্ট বলেছেন যে, global contextকে মাথায় রেখে constitution করা। এ বিষয়ে যদি আপনাদের research work থাকে, তাহলে আমাদের দিলে অনেক help হবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল।

আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির কাছে একটি প্রশ্ন, এটি আমার বহু দিনের জিজ্ঞাসা। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে কমিউনিটিসরা আছেন, প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু law আছে। আর কাস্টমসের মাধ্যমে অনেক ধরনের বিষয় deal করেন। যেটি হয়তো রাষ্ট্র কাঠামোর সাথে অনেক সময় বিষয়টি চলে আসে। আমি যতটুকু জানি যে, বিভিন্ন কমিউনিটিতে রাজা নির্বাচনের একটি প্রক্রিয়া আছে। যেমন- বোমাং রাজা। অনেক কমিউনিটিতে আছে। যে সমস্যা রয়েছে তা address করা খুব জরুরি। রাষ্ট্র কাঠামোর যে ইনস্টিটিউশনগুলো এবং আপনাদের tribal communityতে যে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, এটির মধ্যে একটি integration কী করে করা যায় যাতে আমরা দীর্ঘমেয়াদিভাবে প্রচলিত বা বর্তমানে আমাদের যে সমস্যাগুলো দীর্ঘদিন ধরে দেখছি, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। কারণ রাষ্ট্র কাঠামোর সাথে যদি integration হয়ে যায়, যেখানে cultural এবং legal perspectটি national aspiration এর সাথে integrate করা যায়। এ রকম একটি চিন্তাভাবনা আমাদের লিখিতভাবে দিতে পারেন। আমাদের একটু enlighten করতে পারেন।

নিরূপা দেওয়ান, সদস্য : আমাদের নিজস্ব যে customary law আছে, সেগুলো আমাদের কমিউনিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে যে বিচারব্যবস্থা, সেগুলোর সাথে আমরা সহজেই যাই না। কিছু আছে যে, আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিচারব্যবস্থা সেখানে আমাদের customary law সংঘর্ষ হয় না। তাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই customary law এর মাধ্যমে বিচারব্যবস্থা হয় নিজস্ব কমিউনিটির মধ্যে। আমাদের customary law আছে, সেখানে রাজা হেডম্যান রয়েছে। এখানে আমাদের বাঙালি হেডম্যানরাও রয়েছে। সার্কেলে তারা অবস্থান করছেন। তারাও আসবে। প্রয়োজন হলে তাদের পরামর্শ নিয়ে আমাদের বিচারব্যবস্থা চলে। তাদের পরামর্শ নিয়ে এগুলো আমরা করে থাকি। যাতে আমাদের রাষ্ট্রীয় আইন কানুনের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আমরা সেভাবে চেষ্টা করি। যদি প্রয়োজন হয়, সেটি আমরা লিখিতভাবে দেব।

জনাব হরি পূর্ণ ত্রিপুরা, সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : আমি কি ১ মিনিট সময় নিতে পারি?

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): জি।

জনাব হরি পূর্ণ ত্রিপুরা, সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : আমরা এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলার মানুষ নই। তবে definitely যারা traditionally যে লিডার আছে, রাজাসহ তাদের সাথে কথা বলব। তবে আমাদের অভিমত হচ্ছে যে, customary law সব সময়

customary. National এর সাথে যদি গিয়ে থাকে তাহলে customary থাকবে না। আমার মনে হয় যে, শুধু আমাদের পার্থক্য বুঝতে পারা একটু ভালো হতে পারে। আমরা definitely চেষ্টা করব যে, আপনাদের প্রশ্নের বিষয়টি address করতে।

ধন্যবাদ।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য) : একটি ছোট ইস্যুতে আমি বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে, The chittagoan Hill-tracts Regulation 1900 সেখানে বৃটিশরা আপনাদের ওপরে কিছু বিষয় impose করে দিয়েছে। সুতরাং সে জন্যই একটি clarification প্রয়োজন। আপনারা যদি একটু লিখিত দিতে পারেন।

প্রফেসর ড. আদিল মুহাম্মদ খান : আমি এক সময় নিব। আপনাদের নিশ্চয় বিভিন্ন আলোচনায় গণভোটের বিষয়টি এসেছে। আগে প্রায় গণভোট বাতিল করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু গণভোট হচ্ছে একটি দেশের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় বিষয়। আমি নির্বাচনে জিতলাম আর যা ইচ্ছা বললাম। উদাহরণ স্বরুপ বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ট্রানজিট যাবে। এটি কোনো সরকারের একক সিদ্ধান্ত হতে পারে না। এটি অবশ্যই গণভোট লাগবে। গণভোট লাগবে, এটি national scale এ বললাম। কোনটিতে গণভোট লাগে। অনেক ক্ষেত্রে লোকাল স্কেলেও লাগে। উদাহরণ স্বরূ- ঢাকা শহরে ৫টি মেট্রো করতে গিয়ে ৩ লক্ষ কোটি টাকা investment হবে। সেই investmentকে repay করার ক্ষমতা এ শহরের আছে কি না। এ ধরনের সারা বিশ্বেই বড় বড় planning decision নিয়ে গণভোট হয়ে যায়। National বা regional নির্বাচন হচ্ছে তখন ভোটগুলো বিষয় নিয়ে ভোট দেয়। তাহলে দেশে বড় বড় investment নিয়ে কেউ ছেলেখেলা খেলতে পারবে না, যেটি অতীত সরকার খেলেছে। যার depths ভারটি আমরা এখন দেখছি। সে জন্য গণভোট national scale এবং regional local scale এ করা যায়, সেটি একটু বিস্তারিত দরকার। তাহলে আমাদের মনে হয় অনেক সমস্যার সমাধান হবে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): সবাইকে ধন্যবাদ।

আমি আবারো বলি স্বল্প সময়ের মধ্যে আপনারা এসেছেন। আপনাদের মন্তব্য এবং পরামর্শগুলো দিয়েছেন। কিছু বিষয়ে আমরা প্রশ্ন করেছি। বিস্তারিতভাবে আমাদের যদি আগামী ২৫ নভেম্বরের মধ্যে দেন তাহলে আমাদের জন্য সহায়ক হবে। তদপুরি আমাদের যেটি লক্ষ্য সেটি হচ্ছে এই যে প্রস্তাবগুলো আসছে, সেগুলো আর্কাইভ হিসেবে আমরা সংরক্ষণ করব। এক সময় গবেষণার্থে পাবলিক পলিসি অর্থে মানুষ বুঝতে পারবে। এ সময় মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলো কী ছিল? প্রত্যেকে কথা বলেছেন। যতদূর সম্ভব এটি ডকুমেন্ট করা। কতটা অর্জন করা গেল সে হিসাব করা যাবে কতটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেই আকাঙ্ক্ষা জায়গাগুলোকে আমরা ডকুমেন্ট করতে চাই। সে জন্যই আমরা অনুরোধ করি যে, আপনারা লিখিতভাবে দিলে সংরক্ষণ থাকবে। এখানে আপনারা যেটি বলেছেন, সেটি রেকর্ডে রয়েছে। ভবিষ্যতে সেগুলো আমরা transcribe করব। আরও সুনির্দিষ্ট হবে যদি আপনাদের লিখিত প্রস্তাব পাওয়া যায়।

আমি আবারো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করছি যে, সরকারের জন্য আপনাদের সহায়তা, সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কিছু recommendation তৈরি করতে পারব।

সবাইকে ধন্যবাদ।

আপনাদের অনুমতি পেলে আমি এখন অধিবেশন শেষ করব।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

চতুর্দশ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : দুপুর ২.৩০ থেকে ৪.০০ পর্যন্ত

তারিখ : ১৭ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : দুপুর-২:৩০ থেকে ৪:০০ টা পর্যন্ত

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকাঃ-

১। অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক — কমিশন প্রধান
২। অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৩। ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল — সদস্য
৪। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৫। ড. শরীফ ভূঁইয়া — সদস্য
৬। ব্যারিস্টার এম. মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল — সদস্য
৭। জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক — সদস্য
৮। জনাব মোঃ মোসতাইন বিল্লাহ, লেখক — সদস্য

অংশীজনের তালিকা :

১। জনাব সারোয়ার তুষার
২। জনাব সাইয়েদ আবদুল্লাহ
৩। জনাব অরূপ রাহী
৪। জনাব দীপক কুমার গোস্বামী
৫। অ্যাডভোকেট আরিখ খান
৬। জনাব মাহা মির্জা
৭। জনাব ইমরান মাহফুজ
৮। ড. সৈয়দ নিজার
৯। জনাব ইলিয়া দেওয়ান
১০। জনাব আসিফ আকবর
১১। আরিফ খান

কার্যবাহের রিপোর্ট প্রস্তুতকারক :

১। এইচ, এম, আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহের রিপোর্ট:-

কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ। আমি এই সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে, সংবিধান সংস্কার বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তবর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে কারণে, অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা গত কয়েক দিন ধরে ছোট ছোট অধিবেশনে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি এবং ব্যক্তির সাথে কথা বলেছি। এ ধরনের অধিবেশনের লক্ষ্য হচ্ছে আমরা যেন সকলের কথা শুনতে পারি এবং আলোচনা করতে পারি, সেই জন্য সকলকে একত্রে না ডেকে আমরা ঠিক করেছি বিভিন্ন অধিবেশনে আলাদা করে ডাকলে কথাগুলো শুনতে, রেকর্ড করতে এবং আলোচনা করতে সুবিধা হবে।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। যার সাথে আপনারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। আজকে এই অধিবেশনের শুরুতেই আমরা সেইসব শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং আমরা আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় দিবেন।

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

বাংলাদেশের তরুণ সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের নিঃসন্দেহে সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে, যেটি আমি আগেই উল্লেখ করেছি। জুলাই আগস্টের এই অভ্যুত্থানের সাথে আপনাদের সংশ্লিষ্টতা প্রত্যক্ষ এবং আপনাদের অবদান কিন্তু সময়ের কারণে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে যে, আপনারা যেন ৫/৭ মিনিটের মধ্যে সারাংশ উপস্থাপন করবেন এবং আগামী ২৫ নভেম্বরের মধ্যে যদি আপনাদের প্রস্তাব, মতামত, সেগুলো আমাদের লিখিতভাবে জানান, সেটি আমাদের জন্য সহায়ক হবে। আমরা শুরু করার আগে পরস্পরের সাথে পরিচিত হই। আপনারা প্রত্যেকে নাম এবং পরিচয় উল্লেখ করেন, তাহলে আমাদের রেকর্ডের জন্য সুবিধা হবে।

(অতঃপর কমিশনে উপস্থিত অংশীজন তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

জনাব অরূপ রাহী আপনাকে দিয়ে শুরু করি।

অরূপ রাহী : আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংবিধান সংস্কার কমিশনের সদস্যদের শুভেচ্ছা। আমরা একটি ঐতিহাসিক পর্বান্তরের মুহূর্তে বাংলাদেশের মানুষ। দীর্ঘ দেড় যুগের ফ্যাসিবাদি, কর্তৃত্ববাদি শাসন অবসানে আমরা সবাই যুক্ত ছিলাম। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে আগামীতে কীভাবে দেশ চলবে, রাষ্ট্র চলবে, সমাজ চলবে, সেই বিষয়ে আমাদের ভাবনা চিন্তা। একটি রূপরেখার সমাজ এবং রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি করার জন্য রূপরেখা, যেটি সংবিধান তার একটি মূর্ত প্রতীক হিসেবে কাজ করে। সেটি নিয়ে ভাবনা চিন্তা। আমাদের কল্পনা ও চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে শেয়ার করার জন্য সুযোগ তৈরি হলো, সেটির জন্য সত্যি সত্যি আমি আনন্দিত। আমি সংক্ষেপে এ সময়ের বাংলাদেশে বসে আগামীতে কোনো একটি সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে বা সংবিধান ভাবার ক্ষেত্রে আমার concernগুলো আমি সংক্ষেপে বলব। একটি হচ্ছে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্র ঠিক কোন ধরনের রাষ্ট্র এবং কোন রাষ্ট্র প্রক্রিয়া হিসেবে আমরা exist করতে পারি, একটি give in, global এবং local context এ। কী অর্থে? একটি বৈশ্বিক, ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে আমরা বাস করি। বিশ্ব পুঁজিবাদের মধ্যে বাস করি। সেই পুঁজিবাদির প্রান্তিক অবস্থায় আমরা বাস করি। এ বিশেষ অবস্থায় আমাদের জন্য রাষ্ট্রের জন্য democracy করার জন্য particulars চ্যালেঞ্জ হাজির করে। সেই particulars চ্যালেঞ্জটি কী? একটু মনে হয় ভাবা দরকার এবং সেই জায়গা থেকে আমাদের সংবিধানের ফ্রেমিং হওয়া দরকার। একটি হচ্ছে global colonial এর কারণে এখানে যে একটি বৈশ্বিক ক্ষমতা বিন্যাস সেখানে আমাদের মতো সমাজ এবং রাষ্ট্রের গণতন্ত্রায়ন কোন ধরনের global statusগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে। Regional সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করে, এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে আমাদের লোকাল context এ আমাদের এখানে সমাজ এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে গণতন্ত্রায়ন কোন ধরনের statusগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে। ধরা যাক

আমাদের ruling elite এক ধরনের পুঁজিবাদ বা পুঁজিতন্ত্র বা যেটি বিকাশের ক্ষেত্রে বহুবিদ চ্যালেঞ্জ elite নিজেই। সেই elite কোন ধরনের confederation change কে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। আর কোন ধরনের confederation কে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত নয়। এই যে গণঅভ্যুত্থান হলো, এই গণঅভ্যুত্থান ব্যাপক এবং বিপুল জনসমর্থন গণ অংশগ্রহণ, সেই জায়গা থেকে দেখলে সংবিধান সংস্কার, সংবিধান প্রণয়ন, সংবিধানকে কল্পনা নিয়ে এক ধরনের অভিলাশ থাকা উচিত যে, এটি গণসম্মতি, গণআকাঙ্ক্ষা, গণ স্বপ্নকে আমাদের ধারণ করতে পারতে হবে। কেবল মাত্র কিছু ruling elite এর স্বার্থ হিসেবে constitution এ আমাদের কল্পনা করার সুযোগ এই অভ্যুত্থানে আমাদের দেয় না এবং সেটি হলে আমাদের আগামীতে আরও নতুন ধরনের কোনো কর্তৃত্ববাদী একটি ক্ষমতা চক্রের মধ্যে ঢুকে যাব। সে ক্ষেত্রে আমাদের constitution হওয়া দরকার global and local context থেকে দেখলে এক ধরনের transformative বা রূপান্তরমুখী, রূপান্তরকামী এবং সেই অর্থে progressive, not in ideological senses. progressive প্রতিটি অর্থে নয়। progressive এই অর্থে যে, এই সংবিধান আগামীতে সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জাগল। আমি শুধু কোটার অর্থে বলছি না। বাংলাদেশের মানুষের রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষাটি একটি সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং ইনসাফের সমাজ রাষ্ট্রের জন্য। এই যে বৈষম্যের ভিতরে essence, এই essence এবং এই স্পিরিটকে ধারণ করতে পারে এমন একটি অর্থে progressive এবং ইনসাফপূর্ণ একটি legal document. ethical document, সেটি হওয়া দরকার constitution এ। সেদিক থেকে দেখলে একটি দিক হচ্ছে এই constitution আমাদের রাষ্ট্রকে কীভাবে তার পাওয়ারের separation কে, কীভাবে imagine করে। যেখানে দেশের মানুষের, সমাজের সকল সদস্যদের সার্বিক অধিকার, মর্যাদা এবং বিকাশকে ধারণ করতে সক্ষম হয়। আরেক দিক থেকে দেখলে এই constitution এর মধ্যে কীভাবে আমরা মানুষের মর্যাদা এবং অধিকারকে সমুন্নত রাখব যাতে করে সমাজে চলমান বৈষম্য এবং statusকে challenge করে আরও বেশি সাম্যের মানবিক মর্যাদা এবং ইনসাফপূর্ণ সমাজের দিকে যেতে পারি। এ দুই অর্থে একটি transformative এবং progressive একটি constitution আমাদের রচনা করার একটি সাহস এবং শক্তি দেখানো দরকার। সেটির ফিচার কেমন হতে পারে তার কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমার আলাপ শেষ করব। একটি হচ্ছে যে, আমরা এ যাবতকাল বাংলাদেশে মানুষের ঔপনিবেশিক সংগ্রাম থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশে যতগুলো সংগ্রাম হয়েছে এবং আমাদের সংগ্রাম চলছে, তার মধ্যে একটি বড় আকাঙ্ক্ষার জায়গা হচ্ছে জাতি ধর্ম পরিচয় নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান মানবিক মর্যাদা। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বৈষম্য করার সুযোগ সংবিধান রাখবে না। একইভাবে কোনো রকম পরিচয়ের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সেটি মানুষের ওপর কোনো রকম জুলুম কায়েম করতে সক্ষম হবে না। লিগাল কিংবা অন্য কোনো রাজনৈতিক অর্থে। তার মানে হচ্ছে আমাদেরকে একটি বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্ম এবং বহু সংস্কৃতির সমাজ হিসেবে বাংলাদেশে স্বীকৃতি দিয়ে এই সংবিধানের আলাপ শুরু হওয়া দরকার। এ রকম বহু জাতি, বহু ভাষা এবং বহু ধর্মের সমাজ এবং রাষ্ট্র কেমন হতে পারে তার রূপরেখারটি আসলে আমাদের সংবিধানে একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট হওয়া দরকার। সেই দিক থেকেই কেবলমাত্র pluralism, সেই দিক থেকেই কেবলমাত্র inclusivity, inclusivity কী অর্থে? equal dignity based inclusivity. আয়তন include করে নিলাম। আমরা inclusivity এর আলাপটি করতে চাই না। ফলে প্রত্যেকের সমান মানবিক মর্যাদা এবং নাগরিক অধিকার, এটির ভিত্তি হতে হবে পরবর্তীতে যে কোনো আইনের তৎপরতা, সেটির save guard হবে সংবিধান এবং সেই দিক থেকেই সাম্য ন্যায় এবং মানবিক মর্যাদার সমাজ ও রাষ্ট্র কল্পনা। আমি তার দুটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করব। আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্র ধর্মের যে আলাপ আছে, এ আলাপটি আমাদের rethink করা উচিত বলে আমি মনে করি। একটি বহু ভাষা, বহু দেশ, বহু ধর্মের, বহু সংস্কৃতির সমাজে একটি কোনো ধর্মকে যখন রাষ্ট্রের একটি legal document এর privilege দেয়, সেটি শুরুতেই একটি বৈষম্যের সৃষ্টি করে রাষ্ট্রের বাকি সব অপারেশনের ক্ষেত্রে। ফলে আমি মনে করি যে, রাষ্ট্র ধর্মের clause নিয়ে আমাদের serious rethink করা উচিত এবং সম্ভব হলে এটি আমাদের পরিত্যাগ করা উচিত। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে, যেহেতু এটি বহু জাতি, বহু ভাষা ধর্মের সমাজ। সে ক্ষেত্রে আমাদের জাতিগত পরিচয় অর্থে রাষ্ট্রীয় legal document অর্থে আমাদের প্রত্যেকের এখানে বাংলাদেশি পরিচয় থাকা দরকার এবং প্রতিটি জাতির স্বতন্ত্র মর্যাদাকর পরিচয়ের সুযোগ সংবিধানে রাখা উচিত। যেমন- আদিবাসীদের আমাদের আদিবাসী বলতে পারা উচিত। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মতো অবমাননাকর শব্দচয়ন দিয়ে সংবিধানের মতো একটি ethical document হিসেবে রাখা ঠিক হবে না। আমাদের সকল ধরনের সাম্যের জন্য যে সংগ্রাম, সেটির প্রতি অমর্যাদা করা হয় বলে আমি মনে করি। এ দুটি উদাহরণ আমি দিলাম। বাকিগুলো আমি মনে করি যে, technical details হওয়ায় ই মেইল করে দেব। আমি জানি যে, nationalism এর মধ্যে একটি পুরুষতান্ত্রিক, বিষমলিঙ্গ, আদিপত্যের সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠনে কল্পনা করে জাতীয়তাবাদ। সেখান থেকেই জাতির পিতার মতো ধারণা আমাদের সমাজে চলে। ফলে এ রকম একটি patriarchal nationalist idea থেকে আমাদের সংবিধানকে মুক্ত রাখা উচিত। জাতির পিতার ধারণা থেকে আমাদের সংবিধানকে অন্তত ডকুমেন্ট হিসেবে clause বা ভাষা বা বাক্য পরিহার করা বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি। শেষ কথা হচ্ছে- আমরা সামাজিক অর্থে, রাজনৈতিক অর্থে, অর্থনৈতিক অর্থে, নানা অর্থে গভীর ঔপনিবেশিকতার মধ্যে আবদ্ধ এবং ঔপনিবেশিকতার মধ্যেই গড়ে যে জাতি রাষ্ট্র কাঠামো তার legal regime তৈরি হয় মূলত নাগরিকদের সমাজের সদস্যদের এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে। ফলে আগামী

সংবিধানের ভাষা এবং framing এমন হওয়া দরকার, এটি নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে হবে না। বরং সকল অর্থে সমাজে সকল সদস্যের মর্যাদাভিত্তিক, অধিকারভিত্তিক বিকাশের সম্ভাবনাকে জাগরুক রাখতে সাহায্য করবে। এ রকম একটি liberating এবং emancipatory এর constitution এর framing আমরা আশা করতে চাই। ফলে সেই সকল অর্থে একটি ঔপনিবেশিকতার বাইরে একটি সমাজ রাষ্ট্র কল্পনার জায়গা থেকে constitution এর ভাষা কী হতে পারে, সেটি নিয়ে চর্চা করার একটি বড় সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি। এ কথা বলে আমার কথা শেষ করছি। আমার পরবর্তী আলাপ ই মেইল করে দেব।

সবাইকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ অরূপ রাহী। আপনার লিখিত ভাষার জন্য আমরা অপেক্ষা করব। এটি বোঝার জন্য জরুরি দরকার। আমরা এখন মাহা মির্জার কাছে আসি। আপনাদের আবার স্মরণ করিয়ে দেই এবং আমি নিজেও স্মরণ করি যে, সময় স্বল্পতার জন্য একটু সংক্ষেপে সারাংশ বলুন। পরবর্তীতে আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে বিস্তারিত জানান আমাদের জন্য সুবিধা হবে।

মাহা মির্জা : ধন্যবাদ।

আমি প্রথমে একটু বলে রাখি আমি ঢোকার সময় খুব emotional feel করছিলাম যে, এ রকম একটি কিছু হতে পারে। একটি সংবিধান সংস্কার কমিশন হবে। সেখানে আমাদের মতো মানুষ বক্তব্য রাখবে। আমি পার্লামেন্টে প্রথমবারের মতো ঢোকার experience হবে। আমার তখন মনে হয়েছিল যে, কত প্রাণের বিনিময়ে এটি সম্ভব হয়েছে। এ জন্য রাহী ভাই যে কথাটি বলেছেন, যেটি এত প্রাণের বিনিময়ে এ রকম একটি অর্জন। এটি আসলে যেন, সেই পরবর্তীতে একই ধারার ruling elite এর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন যেন সংবিধানটি না হয়। তার মানে অনেক ঘষে মেজে নতুন কিছু ঢোকানোর আকাঙ্ক্ষাটি থাকতে হবে। রাহী যেটি বললেন যে, গণআকাঙ্ক্ষা। এই গণ আসলে কে বা কারা? আসলে সংবিধানের মধ্যে গণটি থাকে কি না। আমি সংবিধান expert না। কিন্তু আমার জায়গাটি অর্থনীতির, ওই জায়গা থেকে খুব specific কয়েকটি বিষয় বলতে চাই। আমি কয়েক দিন ধরে সংবিধানটি নাড়াচাড়া করছিলাম। ৪২, ২০ অনুচ্ছেদ নিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই। ৪২ এ খুব সম্ভবত আছে right to property. ২০ অনুচ্ছেদে আছে মনে হয় right to work. ভুল হলে ক্ষমা করবেন। এগুলো আসলে এত vague কিছু অর্থ বহন করে না। ভালো ভালো কথা। খুব সুন্দর করে লেখা। কিন্তু যখন আমি পড়ছি, when you are talking about right to work. কর্মসংস্থানের অধিকার বাংলাদেশের মানুষের এবং রাষ্ট্র সেটিকে facilitated করবে। States will create the condition. এ রকম কিছু ভালো ভালো লেখা আছে। ওই জায়গা থেকে বলতে চাই, তাহলে এ রকম vague কথাবার্তা থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। কর্মসংস্থান যেহেতু আমার পড়ালেখার জায়গা। আমি ওই জায়গাতে একটু আলোকপাত করতে চাই। এটি আসলে right to work কী বোঝায়। আমরা জানি যে, বাংলাদেশে ৫ থেকে ৭ শতাংশ আমার কর্মসংস্থান তৈরি করছে রাষ্ট্র বা সরকার। এর মধ্যে ৮৬ বা ৮৭ শতাংশ informally economy. অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক খাতের যে কর্মসংস্থান। তার মানে রাষ্ট্র কোনোভাবে আসলে কর্মসংস্থান তৈরি করাতে খুব বড় রকমের গ্রহণযোগ্য ভূমিকা পালন করছে না। পুরুটাই সাধারণ মানুষ নিজের মতো করে নিজের পুঁজি দিয়ে, নিজেই ঘাম দিয়ে, শেষ সম্বল দিয়ে তারা তাদের আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করে। মানে ৮৬ শতাংশ হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থান, এটি আমার মনে হয় একটি নোট করার মতো বিষয়। আমি একদিকে right to work এর কথা বলছি, কিন্তু রাষ্ট্র কোনোভাবেই কর্মসংস্থান তৈরি করার বিষয়ে তার visible কোনো চরিত্র আমি দেখি না। এ জায়গাতে আমরা বলতে চাই যে, রাষ্ট্রকে আসলে কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে না। এটি বাদ দিলাম যে রাষ্ট্রের সেই দায়িত্ব নেই। কিন্তু যে কর্মসংস্থান already বিদ্যমান, যেটি আমার দেশের সাধারণ মানুষের যে রুটি রুজির জীবিকার ব্যবস্থা নিজে নিজে করে নিয়েছে, সেটিকে যেন রাষ্ট্র উচ্ছেদ করতে না পারে। আমি ৩টি বিষয়ে বলব। আমাকে যদি একটু সময় দেন। একটি হচ্ছে ৪২ অনুচ্ছেদে যাই, যেখানে right to property এর কথা বলা আছে। আমরা বাংলাদেশে গত ১০ বছরে দেখেছি, যে পরিমাণ জমি জোরপূর্বক অধিগ্রহণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র মেগাপ্রকল্পের নামে, মেগা অবকাঠামোর নামে, বিদ্যুৎকেন্দ্রের নামে। গত ১০ বছরে সবগুলো বিদ্যুৎকেন্দ্রের জায়গায় যেখানে জোরপূর্বক অধিগ্রহণ করা হয়েছে। কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়েছে। মাতারবাড়ি বলেন, পায়রা বলেন, রামপাল বলেন প্রত্যেকটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের জায়গায় আমরা দেখেছি যে, শুধু বিদ্যুৎকেন্দ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। উন্নয়নের নামে যত ধরনের মেগা infrastructure হয়েছে, প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ৫ হাজার একর, ৭ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে কৃষককে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে। এখন আমি right to work, right to property, right to land এগুলো আমি সংবিধানে রেখে দিয়েছি। কিন্তু আবার public interest এর নামে বা জনস্বার্থের নামে আমি কৃষকের কাছ থেকে জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণকে রাষ্ট্রীয়ভাবে legalize করেছি। আমি মনে করি যে, এটিকে কোনোভাবে কৃষকের অধিকারকে সংবিধানের মধ্যে সুরক্ষা দিতে পারি কি না। কৃষকের জমি থেকে কৃষককে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা যাবে না। এই constitutional সুরক্ষা আমার দেশের কৃষক deserve করে। এটিকে শুধুমাত্র খাদ্য নিরাপত্তার মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি যে, কৃষি জমি অধিগ্রহণ করা যাবে না। এটি নানা ধরনের নয়ছয় করে দুই ফসলি, তিন ফসলি কৃষি জমিকে অনাবাদি জমি দেখিয়ে অধিগ্রহণের

সিস্টেম আমার দেশে বহু বছর ধরে চলে আসছে। শুধুমাত্র এটিকে খাদ্য নিরাপত্তা না। Ultimately পুরু বিষয়কে আমি কৃষককে তার জীবিকা, তার রুটি রুজি থেকে বঞ্চিত করছি। Already তৈরি হওয়া কর্মসংস্থান, চলমান কর্মসংস্থান থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। আমি আমার সংবিধানে এটি দেখতে চাই এবং কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গত ১০ বছরে মেগা প্রকল্পের নামে, উন্নয়নের নামে এবং public interest এর নামে যেভাবে কৃষকের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে, যে ধরনের জোর জবরদস্তিমূলক মাফিয়াদের মতো অত্যাচার আমরা দেখেছি। That it has to be stopped. আমার সংবিধান কৃষকের জমির ওপর কৃষক যেন তার জমি থেকে উচ্ছেদ না হয়, সেটি সংবিধানে সুরক্ষা থাকতে হবে। আমি খুব strongly মনে করি। এটি কৃষকের জমির কথা বললাম। Right to work. আমাদের দেশে গণআকাঙ্ক্ষার কথা বললাম। সেই গণ ভিতর শ্রমিক আছে কিনা; রিকসাচালক আছে কিনা; অটো রিকসাচালক আছে কিনা; যেহেতু সংখ্যাটি এত বেশি। গত ১০ বছরে ৪৪ লক্ষ মানুষ অটোরিকসার সাথে যুক্ত হয়েছে। এ মানুষগুলোকে সংবিধান কোনোভাবে protect করার উপায় নেই। এ সরকারের কয়েক দিন আগে দেখেছি যে, সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং কিছু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১০০ এর কাছাকাছি অটোরিকসাকে ডাম্প করে সেগুলো নিলামে তোলা হয়েছে। আমার constitution কী এই সুরক্ষা দিতে পারে যে, চলমান রুটি রুজি সেখানে আমার সরকার হাত দিতে পারবে না। অটোরিকসা, রিকসা এগুলো মাঠে নামার আগে এটির একটি procedure আছে, তারা একটি process এর ভিতর দিয়ে আসে। এর মধ্যে অটোরিকসার পার্টস আমদানি হয়, সেই আমদানির সাথে আবার বড় বড় প্রভাবশালী কোম্পানি জড়িত থাকে। সেনা কল্যাণ ট্রাস্ট এই অটোরিকসা আমদানির সাথে জড়িত। আপনি গাজীপুরের তিনমাথার মোড় থেকে টাকশাল পর্যন্ত দেখবেন শতাধিক অটোরিকসা পার্টসের দোকান আছে। যার ভিতর সেনা কল্যাণ ট্রাস্টেরও পার্টসের দোকান আছে। আমি এই নামটি specifically উল্লেখ করলাম। তার মানে হচ্ছে যে, একটি process এর ভিতর দিয়ে যখন রিকসা এবং অটোরিকসার ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হচ্ছে। যখন সেটি final end product হিসেবে রাস্তায় নামে। তখন আমার পুলিশ বাহিনী বলছে যে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের নামে রাস্তায় যেতে পারবে না। শুধু ডাম্প করা নয়, সেটিকে নিলামে বিক্রি করে দেয়ার মতো ঔদ্ধত্য দেখাতে পারছে। আমার সংবিধান এমন হতে হবে যেন একটি already চালু কর্মসংস্থান, যেটি একটি process এর ভিতর দিয়ে রাস্তায় নেমেছে, সেটিকে আপনি ডাম্প করতে পারবেন না। আমার একটি প্রাইভেট কার আছে। আমি যদি সেখানে আইন ভঙ করি নিশ্চয় পুলিশ এসে গাড়ির চাকাটি ফুটা করে দিতে পারে না। কিন্তু যখন একজন রিকসাচালক বা অটোরিকসাচালক যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, সে রাস্তা ভুল হতে পারে, অনিয়ম হতে পারে, সেখানে প্রথমেই তার চাকাটি ফুটা করে দেয়া হচ্ছে এবং সেটি রেকার দিয়ে নিয়ে সেটি ডাম্প করার মতো করছে। একটি অধিকারসহ কাজটি করা হচ্ছে। আমি এটুকু অনুরোধ জানাতে চাই যে, আমার সংবিধানে এই শ্রমজীবী মানুষকে কাজ করার অধিকারকে সুরক্ষা দেয়ার মতো স্পষ্ট বিধান থাকতে হবে। সেটি কৃষকের জমি হোক কিংবা একজন অটোরিকসা হোক।

আমার মনে হয় না যে, এটি কোনো revolution এর অ্যাক্ট। এ রকম খুব স্পষ্ট বিধান থাকতে হবে যে, আপনাকে এ ধরনের কাজ করার আগে নেগোসিয়েশনে যেতে হবে। আপনি জরিমানা করতে পারবেন। কিন্তু আপনি তার রুটি রুজির বাহনকে নিয়ে নিতে পারবেন না। আপনি তার অটোরিকসাকে সিজ করে অন্য জায়গায় পাঠাতে পারবেন না। আপনার জরিমানা স্বচ্ছ এবং transparent প্রক্রিয়ায় হতে হবে। কিন্তু আপনি সেটিকে নিয়ে নিতে পারবেন না। নিলামে ওঠাতে পারবেন না। এটি একেবারে বর্বর জুলুম এবং এ সরকারের আমলেও আমরা দেখেছি। এটি খুবই অস্বস্তিকর। এত প্রাণের বিনিময়ে পাওয়ার পরেও এখনো আমি মনে করি যে, একজন রিকসাওয়ালার রিকসাকে নিয়ে নিলামে উঠিয়ে দিতে পারি। আপাতত আমি মনে করি যে, অনুচ্ছেদ ২০ ৪০ নিয়ে আমাদের বিশদ কাজ করার সুযোগ আছে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ। মাহা মির্জা।

ইলিরা দেওয়ান : ধন্যবাদ।

আমাদের আজকে এই বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে জুলাই আগস্ট আন্দোলনে যারা শহিদ হয়েছেন, আহত হয়েছেন এবং স্বজন হারিয়েছেন, সবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলার চেষ্টা করছি। একই সাথে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যে, আজকে আমাকে সংবিধান সংস্কারে আমার মতামত জানার জন্য এখানে ডেকেছেন, সে কারণে আমি আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি লিখিত নিয়ে এসেছি। চিঠিতে লেখা ছিল, যে বক্তব্য তা যেন লিখিত থাকে। তারপরও হয়তো আমি দু একটি কথা বলব। তার আগে যে বিষয়টি আমি বলতে চাই সেটি হচ্ছে- আমরা বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে এখনো লড়ে যাচ্ছি। সত্যিকার অর্থে যদি বলি যে, গত ৩ মাস ধরে আমরা লড়ে যাচ্ছি বা ১০০ দিনের যদি যাত্রা বলি, সেটি লড়ে যাচ্ছি। কিন্তু এই যে দেশ গড়ার লড়াইয়ে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়া দরকার। সবার প্রতিনিধিত্ব থাকা দরকার। দেশের সকল নাগরিক যাতে সম একটি প্রতিনিধিত্ব থাকে, সেই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া দরকার

বলে বলে আমি মনে করি। কারণ আমরা অতীতে দেখেছি যে, কাউকে বাদ দিয়ে কখনো দেশ এগিয়ে যায় না। হয়তো যায়। কিন্তু এক জায়গাই ঠিকই হচ্ছে, এক জায়গায় ঘা হয়ে থাকে, সেটি হয়তো দেখা যায় না, সেটি এক সময় গ্যাংগিংয়ে পরিণত হয়। আমি মনে করি যে, আমরা যদি নতুন বাংলাদেশ গড়তে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই সবাইকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। যে বিষয়টি আমি বলছি, আমাদের গত ১০০ দিনে বর্তমান সরকারের অধীনে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কমিশন হয়েছে। যেহেতু আমরা রাষ্ট্র সংস্কার করতে চাচ্ছি, সে জন্য অনেক ধরনের সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। কিন্তু আমি যতটুকু উপলব্দি করতে পারি বা অনুভব করতে পারি, সেটি হচ্ছে সব সংস্কার কমিশনে সবার প্রতিনিধিত্ব নেই। তার অর্থ হচ্ছে যে, যারা সংখ্যায় কম বা যারা একটু পিছিয়ে রয়েছে, তাহলে তারা কি সংস্কার চায় না। তাহলে আবারো অতীতের মতো চাপিয়ে দেয়া হবে। আমরা অতীতে দেখেছি তাদের ইচ্ছা মতো আইন করতো। যেভাবে হোক তারা চাপিয়ে দিত। আমি অন্তত চাই যে, বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশে আমাদের যেন সবার প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। যাহোক, আমি যে কয়েকটি পয়েন্ট নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি, সেটি হলো- অরূপ রাহী ভাইও বলেছেন যে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম নিয়ে। আমার এখানে একটু কথা আছে। যদি বিবেচনার সুযোগ থাকে, তাহলে এটিকে আমরা কীভাবে বিবেচনায় নিতে পারি। কারণ হচ্ছে- ধর্ম একটি নিজস্ব ব্যাপার। একটি ব্যক্তিগত দিক, একটি মানবিক দিক। এটি একটি বিশ্বাসের বিষয়। রাষ্ট্র তো রাষ্ট্র। রাষ্ট্র সব সময় নিরপেক্ষ থাকবে।

আমি মনে করি, রাষ্ট্র হচ্ছে দেশের সকল নাগরিকের কাছে নিরপেক্ষ থাকবে এবং সমমর্যাদা প্রদান করবে। ধর্মতো ব্যক্তির বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত চয়েজ। সে ক্ষেত্রে আমরা যারা এ দেশে আছি, সবার বিশ্বাসকে সমানভাবে পালন করতে পারি, সেই বিশ্বাস যদি সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়, তাহলে ভালো হবে। আপনারা অনেক দিন ধরে সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে অংশীজনদের সাথে কথা বলছে। কথাটি হয়তো এসেছে। তারপরও আমি বলছি। আজকে আমি শুধু চাকমা সম্প্রদায়ের। বাংলা আমার মাতৃভাষা নয়। আমি যখন থেকে সংবিধান পড়ছি, সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে লেখা আছে, "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা।" সেখানে দাড়ি দেয়া আছে। এর পর কোনো ভাষার স্বীকৃতি নেই। জুলাই আগস্টের বিপ্লবের পর সুযোগ আসলো। রাষ্ট্র ভাষা বাংলার সাথে অন্যান্য ভাষা যেন এখানে স্বীকৃতি পায়। যেন ওই ভাষাগুলো উঠে আসে। আমি মনে করি, সেটা হয়তো এই সংস্কার কমিশন একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত রেখে যাবে।

৬ নম্বর অনুচ্ছেদের ১ ও ২ উপধারাকে একীভুত করার কথা বলছি। বিস্তারিত আমার এই লেখায় আছে। এখানে যেটুকু বলতে চাচ্ছি যে, এটি এভাবে হতে পারে। নাগরিকত্ব বিষয়ে জাতি হিসেবে বাঙালি আমি মনে করি না। আমাকে চাপিয়ে দিতে পারেন। রাষ্ট্র আমাকে চাপিয়ে দিতে পারে যে, তুমি বাঙালি। সে কারণে ভাষাতে এ রকম হতে পারে যে, বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্বাচিত, নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশি হিসেবে পরিচিত হইবেন। কেন আমি জাতি হিসেবে বাঙালি হব? এ ভাষা ভিন্নভাবে এবং ভিন্ন angle এ যদি বলা যায় আর কি। একইভাবে আমি ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলতে চাই, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট বাঙালি জাতি। এখানে বলা আছে। বাঙালি জাতি গুচ্ছগুলোর পরিবর্তে আমরা বাক্যকে এভাবে সাজাতে পারি যে, দেশের সব জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির নাগরিকগণের ঐক্যবদ্ধ সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সাভভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন সেই নাগরিকগণের। এখানে বাঙালি জাতি বলা ছিল। সেখানে চাচ্ছি যে, নাগরিকগণের ঐক্য ও সংহতি হইবে বাংলাদেশি হবে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। যদি এ রকম ভাষা হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে শুধুমাত্র বাঙালি জাতি অংশগ্রহণ করেনি। এ দেশে যারা আদিবাসী তারাও কিন্তু প্রাণ দিয়েছে। তারাও যুদ্ধ করেছে। কাজেই তাদের স্বীকৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ উহ্য থেকে গিয়েছিল। আমি মনে করি, এ অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে সবার স্বীকৃতি যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে আমরা মনে করব যে, সব নাগরিক সমান সুযোগ পেয়েছে। সবশেষে যেটি বলব, সেটি হচ্ছে- জাতীয় সংস্কৃতি নিয়ে। ২৩ এবং ২৩(ক) অনুচ্ছেদকে পরিমার্জন করা দরকার। আমরা বারবার বলি যে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, উপজাতি বলে যে অপমানজনক ও অবমাননাকর যে শব্দগুলো আমাদের সম্পর্কে বলা হয়। আমাদের সেই শব্দগুলো সব বাদ দিয়ে যদি এ রকম পারে যে, রাষ্ট্র দেশের জনগণের সংস্কৃতিক ঐতিহ্য উত্তারাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমূহের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ দেশের বহু মাতৃক সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবারও অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করিতে পারিবেন। কারণ ২৩(ক) তে সাংবিধানিক ভাষায় যেটি বলা আছে, "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বিকাশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।" বিশেষ ব্যবস্থা কেন? জাতীয়ভাবে অংশগ্রহণ করার যে সুযোগ, সেই সুযোগটি কেন থাকবে না? কেন তার জন্য সংরক্ষণ এবং বিকাশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। তাকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আর হচ্ছে সংবিধানে উপজাতি নৃগোষ্ঠীর যে শব্দগুলো আছে, সেগুলো অপসারণ করা দরকার বলে আমি মনে করি। বাকি প্রস্তাবনাগুলো আমার লেখায় আছে। আমি আজকে সভা শেষে জমা দিয়ে যাব। আমাকে কথা বলার সুযোগ দেয়ায় আবারো সবাইকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ ইলিরা দেওয়ান।

যারা পরে আসছেন আমি আগে যেটি বলেছি সেটি উল্লেখ করতে চাই। আমরা এখানে যেটি করছি সেটি হচ্ছে আপনাদের বক্তব্য

সংক্ষিপ্ত আকারে ৭/৮ মিনিটে সম্পন্ন করেন। আজকে অথবা আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবগুলো আমাদের কাছে ই মেইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন। প্রাসঙ্গিকভাবে বলি যে, লিখিতভাবে চাচ্ছি তার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে, এ প্রক্রিয়াটির শেষ যেখানেই যাক, এ সময় সবার আকাঙ্ক্ষা কী ছিল সেটির একটি ডকুমেন্ট থাকা দরকার। এখন থেকে ৫ বছর, ১০ বছর, ৫০ বছর পরেও মানুষ যেন বুঝতে পারে যে, ওই সময় একটি গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এই আকাঙ্ক্ষাগুলো তৈরি হয়েছিল। আমরা সকলের ভবিষ্যতের জন্য এই ডকুমেন্টটি রাখতে চাই। সেজন্য আমরা বারবার বলছি যে, লিখিত। আমরা আজকে কথা বলছি এবং প্রত্যেকটি consultation আমরা রেকর্ড করছি। পরবর্তী সময়ে transcribe ও করব। আপনাদের সমস্ত বক্তব্য যদি থাকে, তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বড় রকমের আর্কাইভ হিসেবে কাজে দিবে এবং আকাঙ্ক্ষাগুলো বোঝা যাবে। আমরা আশা করি সেই কাজে আমাদের সহযোগিতা করবেন। আমি এখন সারোয়ার তুষারের কাছে যাচ্ছি।

জনাব সারোয়ার তুষার : আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশে এটুকু অর্জন করতে অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। যেটি আমার আগের বক্তারা বলেছেন। বাংলাদেশের মানুষের সামনে এবার যে ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এটি কোনোভাবেই undo করতে দেয়া যাবে না। আমাদের জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নিতে পারার মতো সাহস এবং সেই guards আমাদের থাকতে হবে বলে আমি মনে করি। আপনাদের ই-মেইল রয়েছে সেখানে আমার যে প্রস্তাবনা তা ইতোমধ্যে পাঠিয়েছি। আমি repeat করব না। মূল essence এর কয়েকটি কথা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বলতে চাই। প্রথমত হচ্ছে- আমি মনে করি যে, এ সংবিধান সংস্কারের অবশিষ্ট কোনো জায়গা নেই। আমাদের একটি নতুন সংবিধান লিখতে হবে, যেটি পুনর্লিখন বা নানা ভাষায় বলছে। এই সংবিধান ইতোমধ্যে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাতিল হয়ে গেছে। আমরা যদি এটিকে rising change ধরে নেই তাহলে আমাদের কাছে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার ওই খোপের মধ্যে ঢোকাব। বাংলাদেশে কোনো rising change ঘটেনি। বাংলাদেশে একটি গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে। আমি যদি ভুল না করে থাকি তাহলে এই গণঅভ্যুত্থানের পরে দর্শনশাস্ত্র ও আইনশাস্ত্রে একটি constituent moments গাঠনিক মুহূর্ত হিসেবে বলা হয়। বাংলাদেশে বারবার গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থান ঘটার পরেও একটি নতুন সংবিধান হয়ে পারতো সেটি আমরা পুরানো এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক constitution, সেটির মধ্যে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছি। এগুলো এক ধরনের প্রতি বিপ্লব করার মতো। যে কারণে মানুষ রক্ত দেয়, সেটিকে আবার পিছনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা। এবার সেটি করা উচিত হবে। কারণ সমাজে প্রবলভাবে এই গণঅভ্যুত্থানের আগে থেকেই রাষ্ট্র সংস্কার, রাষ্ট্র পুনর্গঠন, রাষ্ট্র গঠন যে ভাষাতেই বলি না কেন, এটি আকাঙ্ক্ষা ছিল। আর গণঅভ্যুত্থানের পরে আমরা ঢাকা শহরসহ সারা বাংলাদেশের দেয়ালে দেয়ালে দেখতে পাচ্ছি যে, তরুণরা কী লিখেছে। তারা বলে যে, "স্বাধীন হয়েছে। এখন সংস্কার করব।" এখানে পরিষ্কার যে, এবার আমাদের একটি রাষ্ট্র কল্পনা আছে। সংবিধানের মধ্য দিয়ে এবার রাষ্ট্র কল্পনা ধরতে হবে। আমি বিস্তারিত বলেছি, সেগুলো আর এখানে বলব না। প্রথমত হচ্ছে second republic এর কথা এসেছে। second republic এর ব্যাপারে আমাদের seriously ভাবা উচিত। এই গণঅভ্যুত্থানের একটি proclamation জারি উচিত। এটি মানে এই নয় যে, আমরা আমাদের পূর্বের সকল কিছুকে অস্বীকার করছি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র আছে, এটির সাথে নতুন proclamationকে একসাথে যুক্ত করে কীভাবে একটি নতুন সংবিধানের প্রস্তাবনা যুক্ত করা যায়, সেটি আপনারা ভাববেন। আমাদের এখন যে ঘোষণাপত্র আছে তার সাথে নতুন যে proclamation এর কথা বিশেষ করে ছাত্রদের তরফ থেকে উঠেছে, এ দুটিকে যেন আমরা combind করতে পারি। এটির একটি জায়গা এখানে থাকা উচিত। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, আমাদের সংবিধানে এখন যে চার মূলনীতি আছে। আমরা দেখেছি যে, এই চার মূলনীতি পরবর্তীতে একটি দলের মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এই চার মূলনীতিকে বাদ দিতে হবে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সাম্য, মানবিকতা মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার ছিল তার সাথে প্রথম priority দেওয়া উচিত গণতন্ত্রকে এবং এর সাথে নাগরিক অধিকার। এই চার পাঁচটি বিষয়টি আমাদের যে মূলনীতি সেখানে আসা উচিত। তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে- প্রধানমন্ত্রীর একচেটিয়া ক্ষমতা। এ বিষয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। আমাদের সমাজে ২০১৮ সাল থেকে এটি নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে প্রচুর activism হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে পুরু রাষ্ট্র তার সকল প্রতিষ্ঠান এক ধরনের জিন্মি হয়ে থাকে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। তার ক্ষমতাকে curb করতে হবে। সংসদে প্রয়োজনে অভিশংসন করার ব্যবস্থা থাকে, সেটির ব্যবস্থা এবার করতে হবে। আমি মনে করি যে, আরেকটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের অনেকগুলোর সমস্যার প্রধান কারণ হচ্ছে সংসদে চাইলেই সংবিধান সংশোধন করা যায়। এটি বন্ধ করতে হবে। আমি প্রফেসর আলী রীয়াজ অনেক আগে লিখেছেন যে, curts of two third. cuts of two third. দুই তৃতীয়াংশের বলে সংসদে সংবিধানকে সংশোধন করা যায়। আমরা যদি ভালো করে দেখি, এই দুই তৃতীয়াংশ আসলে হচ্ছে less than forty percent vote. যারা ভোট দিয়েছে, টোটাল ভোটাদের নয়, যারা ভোট দিয়েছে তাদের less than forty percent vote এর মাধ্যমে সংসদে এমন এমন বড় বড় সিদ্ধান্ত

নিয়েছে, যেগুলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রকে অনেক ভুগিয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার একবার introduce করা। আবার বাতিল করা। যখন যেমন খুশি তখন তারা সেভাবে করেছে। সর্বশেষ তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করল। বিশেষত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করার পরে এই সংবিধান নিজেই একটি অসাংবিধানিক জায়গায় এসে হাজির হয়েছে। কারণ আপনি সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জনগণের যে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সকল রাস্তা এই সংবিধান নিজেই বন্ধ করে দিয়েছে। তারা বলেছে যে, সংবিধানে হাত দিলে আমাদের ফাঁসি মুখোমুখি হতে হবে। সর্বোচ্চ শাস্তি পেতে হবে। সুতরাং সংসদে দুই তৃতীয়াংশ পাওয়ার থাকলেই সংশোধনী যেন না করা যায়, কীভাবে? সংবিধানে যদি আমাদের কোনো পরিবর্তন করতে হয়; সংবিধানে আমাদের হাত দিতে হয় তাহলে কোন প্রক্রিয়ায় করতে হবে, এটি কী গণপরিষদ ডাকতে হবে কিনা অথবা যে দল ক্ষমতায় যেতে চায় তাদের যদি সংবিধান পরিবর্তন করার কোনো এজেন্ডা থাকে তাহলে তাকে আগেই নির্বাচনের ইশতেহারে সেটি উল্লেখ করতে হবে। এ ধরনের কোনো কিছু করা যায় কিনা, এটি আমাদের seriously ভাবা উচিত। অন্যথায় আওয়ামী লীগ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করবে এটি তারা তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে কখনো ছিল না। কিন্তু তারা এটি পরবর্তীতে করেছে। আমরা ১৫ বছর নির্বাচনহীনতার মধ্যে গেলাম, এটির কারণে। তৃতীয়ত হচ্ছে আগামী দুটি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত। এর পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে দেয়া উচিত। কারণ এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা seemingly মনে এটি সমস্যার সমাধান করে। আসলে এটিই সমস্যার অংশ, এটিই সমস্যা। আমার এখানে প্রস্তাবের মধ্যে বলেছি। আপনারা নিশ্চয় খেয়াল করবেন। এখানে আমি বিস্তারিত বলছি না। আমরা রাষ্ট্রকে যদি সরকারি grip এর বাইরে আনতে পারি, সরকার যদি রাষ্ট্রের অধীনে থাকে এখন যেটি উল্টো সরকারের অধীনে রাষ্ট্র চলে যায়। আমরা যদি এটি করতে পারি।

বাংলাদেশে নির্বাচনের ভাগ্য আসলে ইলেকশন কমিশন ঠিক করে না। প্রধানমন্ত্রী তথা প্রধান নির্বাহী ঠিক করে। আমরা এটি যদি চেক করতে পারি তাহলে ইলেশন কমিশন এবং আমার যদি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থাকে, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো একটি অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ ওয়ান ইলেভেনের মতো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েচে। যেটিকে একটি excuse হিসেবে হাজির করে শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করে দিয়েছে। এই অগণতান্ত্রিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকারই কোনো দরকার নেই। আপাতত দুটি নির্বাচন থাকতে পারে এবং এরপরে আমাদের ভাবতে হবে যে, কীভাবে রাষ্ট্রের অধীন কিংবা নির্বাচন কমিশনের অধীনে আমরা একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করতে পারি। ভোট ছাড়া একদিনও যেন কোনো দল বা সরকার ক্ষমতায় থাকতে না পারে, সেই ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে থাকতে হবে। আমি মনে করি যে, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যতগুলো মানবাধিকার আছে, মানবাধিকার আইন আছে, তার সবগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এখন আমাদের মৌলিক অধিকারের যে provision গুলো আছে, যতদূর বুঝি শুধুমাত্র assert করা কখন কখন কী উপায়ে তারা মৌলিক অধিকার হরণ করবে। মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে না। ফলে মৌলিক অধিকারকে সর্বোচ্চ প্রাধিকার দেয়া উচিত। কারণ এটিই হচ্ছে জনগণের বিষয়। যেটি জনাব আবুল মনসুর অনেক আগেই বলে গিয়েছিলেন। মৌলিক অধিকারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মূলনীতি না। মূলনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রের বিষয়। আর মৌলিক অধিকার হচ্ছে জনগণের বিষয়। সুতরাং এটি প্রাধান্য দিতে হবে এবং এটিকে absolute করতে হবে। এখন যেভাবে শর্তের বেড়াজালে রাখা হয়েছে, এটিকে বন্ধ করতে হবে। যেন সভা সমাবেশের অধিকার থাকে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকে। এখন যেভাবে বলা আছে যে, আপনি বন্ধু রাষ্ট্রের সমালোচনা করতে পারবেন না। ৩৯ এর দোহাই দিয়ে অনেকে বলতে চান যে, এখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বিদেশি রাষ্ট্রের সমালোচনা করতে পারবেন না। যদি আপনি নীতি নৈতকতার বিরুদ্ধে যান তাহলেও কথা বলতে পারবেন না। আমার মতামত হচ্ছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তারা মৌলিক অধিকার বা মত প্রকাশের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করবে, এটি ওখানে তারা বলেছে মাত্র। এ বিষয়টি আবারও আমাদের খেয়াল করা উচিত। তৃতীয়ত হচ্ছে যে, আমি ইলিরা আপার সাথে একমত। যদিও রাহী ভাইয়ের সাথে একটু দ্বিমত করব। আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্যাপারে আমাদের এই তর্কের বাইরে যেতে হবে। আদিবাসীর ব্যাপারে ভিন্ন একটি ভালো ব্যাখ্যা দেই কেন এটি মনে হয় যে, কারা আদিতে এখানে বাস করত, সে রকম শব্দের মধ্যে আছে। ফলে জনগোষ্ঠী এটির মধ্য দিয়ে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে। সুতরাং আদিবাসীও উল্লেখ থাকার দরকার নেই। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরও উল্লেখ থাকার দরকার নেই। বাংলাদেশ যে বহু জাতির দেশ এটি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত থাকা উচিত। বাংলাদেশ শুধু বাঙালি জাতির দেশ নয়। ইলিরা আপা যেটি বলেছেন আমি তার সাথে একমত। সকল নাগরিক আইনের দ্বারা বাংলাদেশি হিসেবে পরিচয় হওয়া উচিত। আমাদের territory এর মধ্যে যারা থাকে, যারা বাংলাদেশের নাগরিক তারা সবাই বাংলাদেশি। এর বাইরে আমাদের ভাষাগত পরিচয় আলাদা আলাদা থাকবে। আমাদের ধর্মীয় পরিচয় আলাদা আলাদা থাকবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলোই আমার বক্তব্য। আরেকটি হচ্ছে স্থানীয় সরকার। যেটি তারা করেছে যে, দলীয় প্রতীকে নির্বাচন হয়। এটিকে চেক করতে হবে। দলীয় প্রতীকে নির্বাচন হওয়া উচিত নয়। আগে যেভাবে হতো যে, স্থানীয়ভাবে যে মার্কা বরাদ্দ দেয়া হতো তাতেই বরং যারা ভালো লোক, যারা সমাজে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করবে তাদের আসার সুযোগ থাকে। সংসদ-সদস্যরা এখন এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন, এটি কোনো দরকার নেই। তাদের কাজ হচ্ছে-আইন সভায় এসে আইন প্রণয়ন করা। সংসদের নামও আইন সভা করা উচিত। সংসদ বললে আমরা বুঝতে পারি যে, এটির কাজ কী।

ফলে মমতাজ এসে এখানে গান গায়। আইন সভার সদস্যদের এ ব্যাপারটি নিশ্চিত থাকা উচিত। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হবে যারা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি তারা করবেন। সকল কিছুর মূল হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী গণতান্ত্রিক সংবিধানের দিকে যেতে হবে। যেখানে সকল নাগরিকের অধিকার থাকবে। মানবাধিকার সুরক্ষিত হবে। কোনো বিশেষ দলের বাইরে থেকে সংবিধান যেন জাতীয় ঐক্যের দলিল হতে পারে এ রকম একটি সংবিধানের দিকে আমাদের যেতে হবে। আমরা মনে করি যে, আমরা এটি পারব। আমাদের সেই সাহস করতে হবে। সংবিধান সংস্কার কমিশনের সময় অনেক কম। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের সময়। আমি জানি না সরকার এত তাড়াহুড়া করছে। এ বিষয়ে আরো সময় নেয়া উচিত। নির্বাচন করার বিষয়ে অনেক দল তাড়াহুড়া করবে। কিন্তু আপনি আমাদের কাছ থেকে মতামতগুলো নিলেন, সেগুলো নিজেদের মধ্যে একটি নির্যাস গ্রহণ করবেন। তার পর আবার এগুলো শুধু সরকারের কাছে দিবেন। আমাদের কাছেও এগুলো ফেরত পাঠানো উচিত। আমরা দেখব না যে, আপনারা আমাদের কথাগুলো কীভাবে এখানে রেখেছেন। সুতরাং এটির সময় নেয়া উচিত। সরকারের তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। সংবিধান সংস্কার কমিশনকে বলা উচিত আমাদের আরো সময় দিতে হবে। আপনারা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মতামতের কথা বলেছেন। ওয়েবসাইটে মতামতের বিষয়ে middle class এখনো অভ্যস্ত না। আমাকে যদি আজকে এখানে না ডাকতেন আমি ওয়েবসাইটে মতামত দিতাম না। আমি পারলেও দিতাম না। সুতরা জনগণ এখানে কীভাবে include হবে। এখানে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে কীভাবে কাজে লাগিয়ে সর্বস্তরের জনগণ সংবিধানে যেন তারা তাদের মতামত দিতে পারে, যেটি মাহা আপা শ্রমজীবী মানুষ যারা আছে, যারা কৃষক আছে, যারা অন্যান্য পেশাজীবী আছে, তাদের কথাগুলো আসার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা কিছু লোক বুঝি এবং আমরা বলে দেব এভাবে হওয়া উচিত নয়। এটি হওয়া উচিত bottom to top হওয়া উচিত একটি process, সেই process এ আমি আশা করব যে, সংবিধান সংস্কার কমিশন সরকারের কাছে প্রস্তাব করবে এবং সরকার এটি করতে বাধ্য। কারণ তারা বারবার বলেছে যে, তারা গণঅভ্যুত্থানের সরকার। যদিও তাদের একটি শপথ নিতে হয়েছে। আমরা মনি করে যে, যেহেতু তারা গণঅভ্যুত্থানের সরকার, তাদের legitimacy এটিই তাদের প্রমাণ করতে হবে যে, তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার না। তারা যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার না এটি প্রমাণ হবে যে, তারা যদি ভালো একটি সংবিধান বাংলাদেশকে উপহার দিয়ে যেতে পারে। অন্যথায় আপনি যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো আচরণ করেন, তাহলে আপনার ৩ মাসের মধ্যেই ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া উচিত ছিল। আপনি যেহেতু যাননি। সুতরাং এ কাজগুলো শেষ করার হিম্মত এবং সেই skill সবাইকে থাকতে হবে।

সবাইকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

এবার আমরা যাব ড. সৈয়দ নিজারের কাছে।

ড. সৈয়দ নিজার : ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : আপনাকে একটু interrupt করি। যেহেতু প্রশ্নটি উঠেছে, সেহেতু একটু ব্যাখ্যা করি। আমরা বিভিন্নভাবে মতামত নিচ্ছে। এর মধ্যে ওয়েবসাইট একটি উপায়। আমরা শীঘ্রই একটি বড় আকারে জরিপ করব যাতে করে ঢাকার বাইরে বা যাদের access নেই তাদের opinion আমরা নিতে পারি। আমরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছি। সবই পারব এ রকম প্রতিশ্রুতি দেয়ার সম্ভব নয়। তবে চেষ্টা করব। যতটা সম্ভব diverse opinion আমরা আনতে পারি। সেই চেষ্টা আমাদের আছে।

ড. সৈয়দ নিজার : ধন্যবাদ।

আমি যে আলোচনা করছি, সেটি আমার একার ভাবনা না। আমরা আগস্ট মাসের শেষ দিক থেকে কিছু শিক্ষক এবং গবেষক মিলে কিছু কাজ শুরু করেছিলাম। তিন প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে আলাপটি শুরু করি, সেটি হচ্ছে ’৭২ এর সংবিধান মূলত aspiration হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের ওপরে। ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের aspiration কী, সেটি প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে methodological question, যেটি আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ প্রশ্নটি নিয়ে আমরা আগেও ভাবছিলাম। আপনারা যে বিভিন্ন মত পথগুলো নিচ্ছেন, এটি methodological accommodate করবেন, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। এ দুটি প্রশ্ন দিয়েই আমরা আলাপ শুরু করি। আমরা কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। এটি এক ধরনের মত শেয়ারের মতো। বিভিন্ন জায়গার শিক্ষকদের কাছ থেকে মতামত নেয়া হয়েছে। আমরা মূলত একটি platform. যেটি হচ্ছে view of vision নিয়ে কাজ করি। ফলে আমাদের এক ধরনের way of thinking আছে। যেটি আগেই বলে রাখা দরকার। আমাদের পূর্ণাঙ্গ যে দাবি, সেটি আমরা অনলাইনে পাঠিয়ে দিব। More or less after ready হয়ে গেছে। আমি দুটি central প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি। আমরা যেটি মনে করছি, সেটি হচ্ছে conflict resolution এবং বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাবনাগুলো আসছে, সেটির methodologically কী করা যেতে পারে এবং at the same time ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থান যে aspiration এটি আসলে এক ধরনের সিদ্ধান্তের দিকে lead করে। সেটি হচ্ছে একটি meta principle. আমরা যদি সংবিধানের দিকে লক্ষ করি, largely

constitutionগুলো, এটি functional অংশ থাকে। অপরটি principle এর অংশ থাকে। আমরা যদি কিছুক্ষণ আগে থেকেই খেয়াল করি, যেগুলো ইতোমধ্যে বিষয়টি emerge হয়েছে। একটি হচ্ছে যে, আমাদের principle নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। কিছু priciple আমরা রাখতে চাই। কিছু principle রাখতে চাই না। at the same time functional বিষয়গুলো নিয়ে কিছু প্রশ্ন আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যখন principle বিষয় নিয়ে devise করবেন, সেটি conflict resolution কীভাবে হবে? দ্বিতীয়ত আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে, principle নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে একটি বিতর্ক আছে। সেটি হচ্ছে, এই principle হচ্ছে discreet মানে হচ্ছে not necessary conected apparently to each other. ফলে কোনো একটি principle বাদ দেয়া যায়। ফলে যেহেতু discreet. ফলে এক ধরনের জায়গা আছে। আমরা যেটি বলছিলাম সেটি হচ্ছে যে, এটির একটি lead করে আমাদের একটি meta principle দরকার। ফলে আমরা যে ধরনের সংবিধান aspect করি তার তিনটি অংশ থাকা দরকার। একটি হচ্ছে principle এর জায়গা। একটি হচ্ছে fundamental principle বা প্রিন্সিপালের জায়গা। সর্বশেষ হচ্ছে functional bet. কেন বুঝতে পেরেছেন যে, অনেকে বলতে পারেন যে, functional অংশ থাকলেই তো যথেষ্ঠ। তখন সংবিধান ছোট থাকে। কেন আমাদের সংবিধান principle এবং আরে অফুরন্ত যুক্ত হচ্ছে meta principle. এই শব্দের সাথে আসলে সংবিধান বিতর্কের সাথে যারা জড়িত। আমরা জানি যে, এই principle এর সাথে একদমই পরিচিত নয়। আমি আবার শব্দটি repeat করছি meta principle বাংলা হবে অধিলিপি। যে প্রস্তাবনাগুলোতে আমরা যেতে চাচ্ছি। সংবিধানের discussion থাকে না। তার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে- বিভিন্ন দেশের সংবিধান যে emerged করে সেটি এক ধরনের শাসনতন্ত্র হিসেবে emerged করে। এটিকে ব্যবস্থাপনাতন্ত্র হিসেবে আমরা দেখতে চাচ্ছি। আমার ধারণা এখানে অনেকেই এটি দেখতে চাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে শাসনতন্ত্রের maximum সংবিধানকে দেখা হয় ওপর থেকে। যেহেতু top down থেকে। আমরা যেটি বলছি যে, আমি তো কখনো শাসনে যাচ্ছি না। আমিতো হচ্ছি জনগণ। রাস্তায় আমাকেই থাকতে হয়। তাহলে আমাদের দৃষ্টিতে জনগণের চাওয়া আকাঙ্ক্ষা কী ধরনের হতে পারে এবং সেই আলোকে principle, meta principle এবং হচ্ছে যে functional be changed করে। এটি একটি theoretical জায়গা থেকে অনুসরণ করা হচ্ছে, সেটি হচ্ছে sovereignty এর question. সাধারণত sovereignty হচ্ছে external sovereignty এ interest এ থাকে। But constitutional large হচ্ছে international sovereignty নিয়ে। যদিও ঘটনাক্রমে একটি আর্টিকেল আছে, সেটি হচ্ছে বন্ধু রাষ্ট্র বিষয়ে। এটি external sovereignty এর অংশ। But enter document হচ্ছে constitution হচ্ছে internal sovereignty. তার মানে হচ্ছে এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ। একটি হচ্ছে রাষ্ট্র এবং একটি হচ্ছে জনগণ। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে জনগণের জায়গা থেকে। প্রথমেই বিষয়টি হচ্ছে যে, এই গণঅভ্যুত্থান এবং এই রাষ্ট্রের আমরা আসলে কে? খুব স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন তৈরি হতে পারে। সাংবিধানিকভাবে আমাদেরকে নাগরিক বলা হচ্ছে। কিন্তু খুব জনপ্রিয়ভাবে আমরা যে সেটি নাগরিক এবং জনগণ দুই শব্দে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। apparently খুব হরহামেশায় এগুলো ব্যবহার করি। কিন্তু ধরুন এই নাগরিক শব্দ গ্রিক এস্টেটের ধারণা, french republic এর ধারণা যেখান থেকে আমাদের republicটি আসছে এবং আমেরিকার constitution এর population এর ধারণ, এগুলো সব এক নয়। আমাদের যদি সংবিধান দেখি এবং আমাদের relevant document দেখি তাহলে সেখানে miss leading এবং confusing termগুলো আছে। ফলে আমরা প্রথমেই সেট করতে পারি যে, আমরা রাষ্ট্রের কে? আমরা বলতে চাচ্ছি যে, আমরা এই রাষ্ট্রের অংশীজন। তার মানে রাষ্ট্রজন বলা যেতে পারে। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবে আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী প্রথমেই replace করা দরকার, সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রজন হতে পারে আর কি। আমাদের entire শব্দগুচ্ছ আছে, আপনাদের সাইডের মধ্যে uplold করে দেব। কী কী শব্দ আসলে ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিতে দেখলে কী কী ধরনের change হতে পারে। তার মানে শাসনতন্ত্র এ ধরনের শব্দ change হওয়া দরকার। আমরা একটি তালিকা তৈরি করে রেখেছি, যেটি আপনাদের পাঠিয়ে দেব। এখন হচ্ছে যে, meta principle এর দিকে আসা উচিত। এ প্রশ্নটি হচ্ছে আসলে আমরা রাষ্ট্রের কে; সেখান থেকে ওৎপ্রোতভাবে connected. অনেক সময় বলা হয়ে যে, জনগণের সাথে সমঝোতা হয়েছে। এটি হচ্ছে national states এর emergence এবং সেই জায়গা থেকে সমঝোতা। জনগণের সাথে আমাদের তো সমঝোতা হয়নি। কী কারণে হয়নি তার একটি প্রেক্ষাপট দেখলে সহজেই বুঝতে পারি। আমার দাদা বৃটিশ empower এ কী ছিলেন। Subject ছিলেন। এই subject এর মধ্যে different আছে। রাণী ভিক্টোরিয়ার ইংল্যান্ডে যে subject এবং আমার দাদার যে subject, সেটি হচ্ছে অধিকারভুক্ত জায়গা থেকে different আছে। subject হওয়ার বলে তার কোনো conscious দিতে হয় না। অনুমতি নিতে হয় না কোনো ধরনের আইন করার জন্য। ফলে obviously সেখানে কোনো সংবিধান ছিল না। রাষ্ট্রের ধারণা ছিল না। ১৯৪৬ রাষ্ট্রের emerge হয়েছে। ১৯৪৭ সালে যখন এখানে রাষ্ট্রটি emerge করছে। যেখানে ইন্ডিয়া পাকিস্তান হয়েছে। যারা colonial empire তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করছেন এবং কারা ক্ষমতা দখল করছেন, largely হচ্ছে, এখানকার elite group. মুসলিম লীগ অথবা কংগ্রেস। এই দুই পলিটিক্যাল পার্টি যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করছেন, তখন এখানে জনগণের সাথে কি কোনো সমঝোতা হয়েছিল। হয়নি। দ্বিতীয়ত ১৯৭১ সালের ক্ষেত্রে যদি আপনারা লক্ষ করেন, সেখানে definitely এক ধরনের ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছে। Self government এর দিকে যাচ্ছে।

আমাদের এখানের middle class political party দায়িত্ব গ্রহণ করছেন এবং তারা ওই আলোকে সংবিধান গ্রহণ এবং গঠন করেছেন। সেই জায়গা থেকে দেখলে ওই সময়ও definitely বাংলাদেশের বড় অংশের aspiration প্রতিফলিত হয়েছে ৭২ এর সংবিধানে। কিন্তু at the same time কোনো ধরনের সমঝোতা জায়গা হয়নি। আমরা বলি যে, '২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কী জানেন; সেটি হচ্ছে প্রথম আমাদের এই সমঝোতার বিষয়টি কী হতে পারে তার একটি রূপরেখা দিতে পারে এবং at the same time আমরা এই রাষ্ট্রের কী? আমি দুঃখিত। আমি হয়তো একটু বেশি সময় নেব। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুটি বলা। আমাদের পুলিশের যে নিপীড়নমূলক আইন সবকিছু। ১৮৬১ সালে introduce করা হয়। কিন্তু পুলিশের সবচেয়ে নিপীড়নমূলক আইন হচ্ছে ১৯১৯ সালের The Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919 এ বিষয়ে সবাই জানি। এই আইনে প্রথম কী করেছে যখন তখন যে কাউকে arrest করতে চাইলে বিচার বহির্ভূতভাবে আন্দামান দ্বীপে পাঠিয়ে দেয়া। যদিও এ কাজগুলো অধিকার দেয়া হয়েছে। On the other hand যদি দেখি, third amendment বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে থেকে ১৯৭৪ সালের স্পেশাল অ্যাক্টের মধ্য দিয়ে সেই অধিকারগুলো আরোপ হয়েছে। পাশাপাশি যেটি হচ্ছে '২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়েছে যে, anarchist এবং relation কে একইসাথে introduce করা হয়। আর্মিদের মধ্যে একটি protest হয়েছে। protestটি হয়েছে মূলত ১ বৈশাখকে কেন্দ্র করে। মানুষ জড়ো হচ্ছিল। তখন জেনারেলরা আর গুলি করার নির্দেশ দেন। সেখানে কয়েক শত মানুষ মারা গিয়েছিল। এর পর থেকে যা হয়েছিল যে, ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন আরো জোরদার হয়েছে। আপনি যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে কোনো একটি সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য literally হচ্ছে দেড় থেকে দুই হাজার লোক হত্যা করা হয়েছে। অযাচিতভাবে। পাশাপাশি হচ্ছে আয়নাঘরের বিষয়। Systematically ক্রসফায়ার থেকে অন্যান্য বিষয়গুলো, যেটি legitimate করা হয়েছে বিভিন্ন আইনের মধ্য দিয়ে। তার মানে আপনি যদি আমাকে বলেন আমরা এ দেশের নাগরিক যে অর্থেই বলি না কেন; আমরা তো নাগরিক না, জনগণও না, even মানবও না। মনে রাখবেন মানবের যে অধিকার, রোহিঙ্গাদের যে human rights এর অধিকার, নাগরিকের অধিকার থেকে কম থাকে। আমাদের সেটিও নেই রাষ্ট্রের। তাহলে আমরা এ রাষ্ট্রে কী পরিণত হয়েছি? literally হচ্ছে একটি বিমানব। বিমানব dehumanization অর্থে বোঝা যাবে না। সেটি একটি হচ্ছে এক ধরনের ratio category অর্থে বোঝা হয় অথবা particular class এবং sector হিসেবে। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে, dehumanization, যেটি আমার মানবিক হিসেবে অধিকার পাওয়ার কথা, সেটি হচ্ছে ব্যক্তি এবং অব্যক্তি দু জায়গা থেকে আমরা অধিকারটি পাচ্ছি না। ফলে আমাদের অধিনীতি কী হওয়া উচিত সেটি রাষ্ট্রজনের মানবায়ন। এই মানবায়ন একমদই human righs এর বিষয়টি বলা হচ্ছে না। মানবকেন্দ্রীকতার কথা বলা হচ্ছে না। আমাদের এক ধরনের conceptual define করা উচিত। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অংশীজন হিসেবে কী কী অধিকারগুলো থাকা দরকার এবং specially সেই জায়গাটি। এটি হচ্ছে আমাদের প্রথম grounding foundation এবং এর আলোকে আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। এটির আলোকে আমরা principle এবং functional এবং legal paradigm rise করা দরকার। এখন আপনি বলতে পারেন যে, এই principle এ কী আমরা সবাই একমত হব। আমি নিশ্চিত যে, আমরা এখানে যারা বসে আছি সবাই একমত যে, রাষ্ট্র কখনো আমাদের যেভাবে treat করে এভাবে treat কখনো মেনে নেয়া যায় না। তার মানে আমি আগেই বলেছিলাম যে, আমরা internal sovereignty ইস্যু নিয়ে আছি। internal sovereignty হচ্ছে রাষ্ট্র কীভাবে ব্যক্তিকে treat করবে, সেই ক্ষমতার বিষয় নিয়ে। ফলে সংবিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ principle এর জায়গা হচ্ছে যে, bottom থেকে দেখা। জনগণের জায়গা থেকে। যেটি হচ্ছে আপনাদের কাছে আমাদের প্রথম আশা হচ্ছে যে, আমরা bottom থেকে কীভাবে দেখব। রাষ্ট্রের অংশীজন হিসেবে কীভাবে দেখব। রাষ্ট্রের কাছে কী চাচ্ছি, সেই বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া। এখন obviously একটি প্রশ্ন আসে কিছুক্ষণ আগে তুষারও বলছিল।

আমাদের proclamation এর মধ্যে যে দাবিগুলো আছে, সেটি হচ্ছে সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার। ৬০ এবং ৭০ দশকে more or less, sociology, philosophy এবং moral document এর সাথে পরিচিত। এটি হচ্ছে যে, ওই সময়কার চটকদার শব্দ। এ শব্দগুলো more of an aspirational but এ শব্দগুলো কোথায় যেন লিড করে every obviously এই conceptগুলো লিড করে এই অধিনীতিকে। মানবান obviously আপনার মানবিক মর্যাদাকে নিশ্চিত করছে। একই সাথে বসেন আছেন যে, আপনি কারো সাথে যদি বৈষম্য না করেন তাহলে সাম্যের বিষয়টি আসে। একই সাথে সামাজিক ন্যায়বিচার এই principle বা অধিনীতির মধ্যে আছে। তার মানে হচ্ছে এই অধিনীতি কোনো discreet কোনো ধরনের principle না। এটি ৭২ এর inspiration ছিল। একই সাথে ২৪ এর যে inspiration তা কোনো ধরনের সাংঘর্ষিক জায়গা থেকে define করা হচ্ছে না। এখন দেখা যাচ্ছে যে, principleগুলো কীভাবে redefine হবে? এটি obviously আমাদের এখানে principle এর যে অংশটি যেটি আমরা প্রায়শ বলি গণতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের বিষয়টি। আমাদের একটি careful হওয়া দরকার। গণতন্ত্রকে এত blank check দেয়া যাবে না। সেটি হচ্ছে popular sovereignty বা গণতন্ত্রের বিষয়টি বলা হচ্ছে, সেটি হচ্ছে জানেন, সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠতার শাসন। আমাদের বিবেচনায় নেয়া উচিত one second. সেটি হচ্ছে এখানকার যারা সংখ্যালগিষ্ঠ আছেন, তার save guard নিশ্চিত করবেন। ফলে আমরা বলতে চাচ্ছি কী জানেন, প্রথম এবং

গুরুত্বপূর্ণ principle অধিনীতি lead করে ন্যায্য গণতন্ত্র। আমাদের গণতন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা দরকার। সেটি হচ্ছে একটি ন্যায্য গণতন্ত্র। একটি হচ্ছে অন্যায্য গণতন্ত্র। অন্যায্য গণতন্ত্র হচ্ছে যেসব সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনো কিছু রুল করে। তার মানে এখানে save guard principle নেই। সেখানে justice এর অভাব আছে। তখন আরেকটি সমস্যার সমাধান হয়, সেটি হচ্ছে আমাদের সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে যে বিষয়টি আলাপ চলছিল, সেটি হচ্ছে caretaker government democracy সাথে fit হয় না এবং interim government অথবা নির্বাচনকালীন সরকার। ন্যায্য গণতন্ত্রের perfectly fit হয়। কারণ আপনি কখনো বসে আছেন classical definition এ থাকছেন না। আপনি revise করছেন আপনার প্রয়োজন সাপেক্ষে। আমরা জানি গত ৫০ বছরে গুরুত্বপূর্ণ political field হচ্ছে political elite এবং পার্টিরা তারা কীভাবে পাঁচ বছর পর পর ক্ষমতা হস্তান্তর হবে, সেটি এখনো decide করতে পারছেন না। ফলে আপনাকে কোনো কোনোভাবে এক ধরনের solution এর দিকে যাওয়া দরকার। ফলে ন্যায্য গণতন্ত্র আপনি যখন introduce করবেন, সেটি আমাদের প্রেক্ষাপট থেকে এটিকে redefine করা এবং আলোচনা হবে আমাদের জায়গা থেকে। ফলে arbitrary কোনো concept আনা ঠিক হবে না। এ কারণে আমি বলতে চাচ্ছি যে, সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে concept গুলো কোথা থেকে নেয়া হচ্ছে এবং কী in depth হবে তার এক ধরনের gloss outline থাকা দরকার। কারণ হচ্ছে যে, ৭২ এর সংবিধানে যে সংকট আমরা দেখি। পাশাপাশি অব্যক্তির যে বৈষম্য। আমি শেষ করে ফেলছি। কতগুলো অব্যক্তিক বৈষম্য দূরীকরণ করা। আসলে অব্যক্তিক মানে হচ্ছে যে, ব্যক্তি কোনো গ্রুপের অংশ হিসেবে, ধর্মের অংশ হিসেবে, জাতি গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে, লিঙ্গের অংশ হিসেবে অথবা বর্ণ বা শ্রেণির অংশ হিসেবে বৈষম্যের শিকারগুলো হয়। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ থাকা উচিত। আমরা মনে করি যে, রাষ্ট্রের আসলে জাতীয়তাবাদ থাকা উচিত না। তাহলে কী থাকা উচিত। রাষ্ট্রকে জাতি প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ থাকা উচিত।

দ্বিতীয়ত ধর্মের প্রশ্নে সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রকে ধর্মের প্রশ্নে নিরপেক্ষ থাকা উচিত। কী কারণে নিরপেক্ষ থাকা উচিত, সেটি হচ্ছে একদিকে রাষ্ট্রের যেমন উচিত হচ্ছে যে, সবার ধর্ম চর্চা নিশ্চিত করা। At the same time যারা মূলত ব্যক্তিগত ধর্ম চর্চা করতে চাচ্ছেন, তাদেরও এক ধরনের scop করা। মনে রাখা দরকার যে, যে শব্দটি religion যেটি religare থেকে আসছে, লেটিন শব্দ। community sense থেকে। মানে community religion থেকে। আমাদের এখানে ধর্ম হতে পারে ব্যক্তির একার। যেটি আমার ধারণা অরূপ রাহী এই বিষয়টি ইঙ্গিত করেছেন। আমরা মূলত আব্রাহাম সেন্ট্রিকের religion এর ধারণা, সেখান থেকে আমাদের revise করা দরকার এবং আমাদের সময় হয়েছে এসব বিষয়ে সতেচন হওয়ার। religion এর ধারণাকে এক ধরনের পুনঃ ডিফাইন করা দরকার। লিঙ্গের বিষয়ে definitely নিরপেক্ষতা থাকা দরকার। পাশাপাশি গোষ্ঠী ও শ্রেণি নিরপেক্ষতা থাকা দরকার। ফলে আপনার sociolism যে সামাজিক principle সেটি আপনি সরিয়ে ফেলতে পারেন। শ্রেণি এবং গোষ্ঠীর যে বৈষম্য, ওইটি দিয়ে হয়তো replace করা যেতে পারে। লেখায় আমাদের পূর্ণাঙ্গ বিষয়টি আছে। আমি আর ব্যবস্থাপনাতন্ত্র নিয়ে আলাপ করছি। খুবই দুঃখিত আমি খানিকটা হয়তো বেশি সময় নিয়েছি, সে জন্যে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

নিজার আপনাদের যে লেখাটি। আপনাদের চিঠিতে একটি ই মেইল এড্রেস দেয়া আছে। সেটিতে পাঠালে সহজ হবে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দিলে এক জায়গায় যাচ্ছে। ডকুমেন্ট হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে যে input সেগুলো আমরা আলাদা ডকুমেন্ট করব। ফলে ই মেইল ব্যবহার করলে আমাদের জন্য distinguish করা সহজ হবে। কার থেকে আসছে। কীভাবে আমরা তথ্যগুলো পাচ্ছি।

আমি এখন অনুরোধ করব অ্যাডভোকেট আরিফ খান।

অ্যাডভোকেট আরিফ খান : সকলকে ধন্যবাদ।

আমি সাংবিধানিক রেনেসার যুগে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি। সাংবিধানিক রেনেসার যুগে আমরা এ মুহূর্তে বসবাস করছি এবং এই কমিটিও কাজ করছে। এ কথাটি আমি কেন বলছি- সংবিধান প্রণয়নের পরে ৫০ বছরে যত ডকুমেন্ট তৈরি হয়নি, যত আলোচনা সমালোচনা তৈরি হয়নি, প্রায় কিছুই তৈরি হয়নি। কিন্তু এই অভ্যুত্থানের পরে গত তিন মাসে যে পরিমাণ constitutional literature তৈরি হয়েছে, আলোচনা সমালোচনা, মতামত just cagaring extraordinary অসাধারণ। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে হয়নি। ফলে আমি মনে করি এটি একটি constitutional রেনেসার যুগ। আমরা দেখছি এবং আমরা experience করছি। এটি অভ্যুত্থানের অর্জন। এটি ২৪ এর জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের আমাদের শহিদদের অর্জন। সেসব শহিদ এবং আহত সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শুরু করছি। সংবিধান নিয়ে যখন কথা বলব তখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটু নোঙর গাড়া। আসলে সংবিধান বলতে আমরা কোন ডকুমেন্টকে ধরব। আমি মনে সংবিধান as such নভেম্বর ১৯৭২ সালে যে draft হিসেবে যেটিকে গ্রহণ করেছিলাম। চূড়ান্ত হিসেবে। সংবিধান বলতে ওইটিকে ধরে

আলোচনা করা সহজ। কারণ পরবর্তীতে যত অগণতান্ত্রিক সংশোধনী হয়েছে, সেগুলো সাংবিধানিক standard এবং principle অনুযায়ী অনেক কিছু বাতিলযোগ্য। ফলে ওইগুলো বাতিল করতে হবে। সংশোধনীর মাধ্যমে যে আবর্জনা যুক্ত করা হয়েছে, সেগুলো সরাতে হবে। এগুলো আলোচনা করে সময়ক্ষেপণ। ওইগুলো আলোচনা করার দরকার নেই। '৭২ এর যে সংবিধানের যে কপি, যেটিকে আমি '৭১ এর সংবিধান মনে করি। আলোচনার রেফারেন্সের সুবিধার্থে '৭২ বলতে হয়। Because it was drafted and adopted during November 1972 but the constitution as such যেটি আমরা adopted করেছিলাম। ওইটি তৈরি ৭১ এ হয়েছিল। এটি যেন আমরা ভুলে না যাই। আমরা রাষ্ট্র সত্তা প্রতিষ্ঠার মীমাংসা কবে করেছি? আমরা '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে করেছি এবং মুক্তিযুদ্ধের magnum opus কী? আমরা আসলে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে extreme supreme কিংবা achievement বলতে কোনো visible কিছু দেখাতে চাই তাহলে কী দেখাব? আমি মনে করি without any alternative, only think that we have in our hand with the constitution. সুতরাং magnum opus যেটি, সেটিকে ধরেই পরবর্তীতে যতবার ফ্যাসিবাদের উত্থান হয়েছে, যত autocrat এর উত্থান হয়েছে, যত totalitarian হয়েছে। সব কিছুর বিরুদ্ধেই আমরা সংগ্রাম করেছি এবং ভবিষ্যতে আবার প্রয়োজন হলে করব। কারণ all the subsequent fasism betray the principle of Muktijudda. মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। সেই আদর্শিক ভিত্তিগুলোকে betray করে বলেই আমরা যে কোনো ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে আবার উদ্ধার করব। আর এখানেই '৭১ এর সংবিধান। for easy reference এ common understanding এ '৭২ এর সংবিধান বলছি। আমি '৭২ এর সংবিধানকে মনে করি যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের magnum opus. It was briantly drafted constitution extra ordinary peace of legislation. I will say. '৭২ এ আমরা যে সংবিধান গ্রহণ করেছি। ওই সংবিধান very unfortunately আমরা যখন এখানে কথা বলছি, এই কমিশন এবং আমরা যারাই কথা বলছি, আমরা in a sense খুবই lucKz. কারণ আজকে সংবিধান নিয়ে কথা বলতে পারছি। আমরা ৫০ বছরের constitutional journey বা experience এর আলোকে কথা বলতে পারছি। এটি এত সোজা নয়। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গত ৫০ বছরে আমাদের experience কেমন সেটি আমাদেরকে drive করছে। আমাদের নতুনভাবে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করছে এবং এটি আমাদের সাহায্য করবে। To adopt think and to man and amend think এবং নতুন কী দরকার। ১৯৭২ সালেও পত্রিকা এবং রেডিও, টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কাছে সুপারিশ চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। মাত্র ৭৮টি সুপারিশ জমা পড়েছিল। সেই সুপারিশগুলোর কপির জন্য আমি এই বিল্ডিংয়ের লাইব্রেরিতে গত ১০ বছর আগে বহু দিনরাত একাকার করে খুটজেছি। সেই কপিতো পাইনি বরং লোমহর্ষক যে গল্প আমি পেয়েছি যে, কীভাবে ৭৮টি সুপারিশ বাজারে বিক্রি করে দেয়া হলো। একটি ট্রাংকের মধ্যে জমা ছিল। সে এক অন্য রকম গল্প। সে নিজেই একটি প্রবন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এই কমিশন খুবই স্মার্ট এবং খুবই tecnologically equity, as i can see. ফলে আপনাদের এসব ডকুমেন্ট খুব দ্রুত ডকুমেন্টেড হয়ে publicly available করে দিবেন। এটি আমার অনুরোধ। ভবিষ্যতে আমাদের বংশধরদের কাছে এই আফসোস না করতে হয় যে, সংবিধান প্রণয়ন কমিটি, ড্রাফটেড কমিটি বা আপনারা যারা সংস্কার কমিশনের সদস্য তাদের ডকুমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না। এ রকম যেন না হয়। So coming to the main point আমরা সংস্কার বরতে কী বুঝব? এখানে আসলে আমাদের সংবিধানের আলোকে কী কাজ করেনি? মানে কী কাজ করলে আমরা আজকে এ জায়গায় আসতাম না, সেটি হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি যে, দুটি বিষয়ে কাজ করেনি। একটি হলো- appointment, constitutional appointmen mechanism, এটি কাজ করেনি। আরেকটি হচ্ছে constitutional accountability mechanism. এ দুটি বিষয় কাজ করেনি। আমরা যদি এ দুটি বিষয় fixed করতে পারি। আমার মনে হয় constitutional crisis বলতে আমাদের যে সমস্যাগুলো আছে। গত ৫০ বছর আমরা নিয়মিত experience করছি। আমি একটি উদাহরণ দেই। আমাদের সংবিধানে ৯টি ইনস্টিটিউটের কথা আছে। সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। এই ৯টি ইনস্টিটিউটের মধ্যে appointment জাতীয় ইনস্টিটিউট আছে ৬টি। এই ৬টি ইনস্টিটিউট যেমন- সুপ্রীম কোর্টে বিচারপতি নিয়োগ দিতে হয়। নির্বাচন কমিশনে কমিশনার নিয়োগ দিতে হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ৬টি ইনস্টিটিউট, যেগুলো সাংবিধানিক ইনস্টিটিউশন, এই ইনস্টিটিউনের appointment এর consistent এর common একটি কমিশন থাকতে হবে। এটি এককে standard এ এক এক ধরনের হলে হবে না। এ জন্য আমি প্রস্তাব করব যে, একটি colism প্রতিষ্ঠা করার জন্য। Constitutional appointment colosseum. That colosseum will be appointed in the all constitutional post. এটি এক ধরনের consistency আনবে। যেহেতু colosseum হবে। শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের লোকজন থাকবে না। ফলে এটি democratically খুব চমৎকারভাবে গঠন সম্ভব। আর accountability যেটি আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে, বাংলাদেশের সংবিধানে যে constitutional institute তৈরি করা হয়েছে, এর মধ্যে কিছু ইনস্টিটিউট। যেমন প্রথম ৩টি ইনস্টিটিউট হলো- governmentকে run করে। যেমন- executive, legislature এবং প্রধানমন্ত্রীর অফিস। এগুলো governmentকে run করে। আর পরের ৩টি ইনস্টিটিউট, সরকারকে control করে। যেমন- বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক। পিএসসি কিছুটা। এই যে, পরের যে controlling ইনস্টিটিউট, এদের বাজেট স্বাধীন না আমাদের সংবিধানে। এদের বাজেট আলাদা করে দিন। একটি constitutional guarantee থাকুক যে, প্রতি বছর জুলাইয়ে পার্লামেন্টে বাজেট adopt করা হয়, সেই বাজেটে প্রতিটি

constitutional institution এর জন্য যে apportion করা হবে, এই বাজেট পরবর্তীতে ওই প্রতিষ্ঠান কীভাবে খরচ করবে, এটি তার হিসাব। এটির জন্য সরকারের কাজে জবাবদিহি করতে হবে না। যে কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ নির্বাচন ব্যবস্থা আমাদের fail করল। আমরা মূল জায়গায় হাত দেইনি যে, নির্বাচন কমিশন কেন ফেল করে। কারণ তার বাজেটের independence নেই। কারণ তার administrative independence নেই। যদি আমরা সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে দিতে পারি, তাহলে আমাদের এ বিষয়গুলো সমাধান হবে। এ ছাড়া কিছু বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান আছে। যেগুলো কিছু reform দরকার। আমি যে লিখিত বক্তব্য দেব, সেটিতে থাকবে। ১১৬ নম্বর অনুচ্ছেদকে সম্পন্ন করা, যেটি বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করবে। প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ দুই মেয়াদ। সেটি একাধিক নামে হোক বা না হোক। এগুলো সব থাকবে। Public accounts committee হলো রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেখানে রাষ্ট্রের সকল টাকা পয়সা খরচ হয়, যে কমিটির হাতের মধ্য দিয়ে। অথচ গত ৫০ বছরে আমাদের অভিজ্ঞতা হলো হাজার হাজার public accounts report unaudited হয়ে পড়ে আছে। সংসদীয় কমিটিগুলো এগুলোকে অডিট করারই সময় পায়নি। ফলে আমাদের খুব মূল জায়গায় হাত দিতে হবে। এগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো constitutional provision থাকতে হবে। যাতে এই public money খরচ যেভাবে হচ্ছে, সেটির ওপরে এক ধরনের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। আমার বক্তব্য শেষের দিকে। আর নতুন ২/৩টি প্রতিষ্ঠান। যেগুলো আইন দিয়ে গঠন করা হয়েছে। সরকারগুলো ইচ্ছা করেই করেছে। যেন সরকার তারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর রাখতে পারে। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানগুলো সংবিধানে ঢুকিয়ে দেয়া দরকার। যেমন- দুর্নীতি দমন কমিশন। It should not be a statutory প্রতিষ্ঠান। It should not be a constitutional প্রতিষ্ঠান। যেমন- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। It should not be a constitutional প্রতিষ্ঠান। এই যে মহা সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে সংবিধানকে নতুন করে develop করার। এখানে এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। জাতীয় সরকার কমিশন। এটি constitution এ অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া দরকার। constitutional organ হয়ে গেলে এগুলো আলাদা মাহাত্ম এবং শক্তি তৈরি হয়, এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাজেট আলাদা করে দিলে অসাধারণ শক্তি অর্জন করে নির্বাহী বিভাগ বা প্রধানমন্ত্রীর অফিস তখন ছড়ি ঘুরাতে পারে না এবং প্রধানমন্ত্রীর যে অসীম ক্ষমতা, এটি রাষ্ট্রপতির সাথে ভাগাভাগির ফর্মুলা যেভাবে আমরা শুনি, এটি আত্মঘাতি হবে। পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই '৭২ সালে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে এককভাবে শক্তিশালী করেছিলাম। তা না হলে পার্লামেন্ট এবং সরকারের মধ্যে এক ধরনের অচল অবস্থা তৈরি হয়, যেটি গোলাম মোহাম্মদ এর আমলে ৫০ এর প্রথম দিকে হয়েছিল। That experience drop us to adopt something like article 70 এবং প্রধানমন্ত্রীর বেশি ক্ষমতা। এখন আবার থোর বড়ি খাড়া। আবার সেই ভাগাভাগির ফর্মুলায় যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এই অসীম ক্ষমতাকে সীমিত করতে হবে। আমি যে colosseum ব্যবস্থার কথা বলেছি। প্রধানমন্ত্রী তার সবচেয়ে বড় ক্ষমতার প্রয়োগটিই দেখায় তার নিজস্ব দলদাস ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়ে। সুতরাং colosseum এর হাতে যদি সকল constitutional post এর নিয়োগের ব্যবস্থা চলে যায়, তাহলে প্রধানমন্ত্রী ডানা কাটা পরবে। এ জায়গায় আমরা creatively যেন সমাধান করি। রাষ্ট্রপতির সাথে ভাগাভাগির দিকে গিয়ে সরকারকে অচল অবস্থায় না ফেলে দেই। সব শেষ এটিই কথা constitution আসলে আমাদের জন্য কী করে? আমরা constitution এর কাছে কী চাই? আমরা যেন constitution এর কাছ থেকে আবার constitution এর সাধ্যের অতিরিক্ত দাবি না করি। কারণ এক বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছেন যে, "মানুষ যদি ফেরেশতা হতো তাহলে constitution এর দরকার ছিল না।" এক, আর দ্বিতীয়ত অতি উচ্চ আদর্শ সম্বলিত সংবিধান প্রায়শ ব্যর্থ সংবিধান হিসেবে ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা যেন উচ্চ আদর্শের তাড়ায় তাড়িত হয়ে এমন কিছু না করি, যেটি feasibility এবং work abilty থ াকবে না। এখন feasibility এবং work abilty এর জন্য আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন। এটি কীভাবে বুঝব যে, এটি feasibility এবং work abilty কীভাবে নিশ্চিত করব। 50 years of experience. very important and include with that 25 years of Pakistanরা। ওটি কিন্তু constitutional crisis এর মধ্য দিয়ে আমাদের গিয়েছে। আর এটি constitution হয়েছে ২৪ বছরে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত। সেই constitution difficult and failure. সেই constitution থেকে আমরা experience draw করতে পারি। গত ৫০ বছরে এই constitution যেটিকে নিয়ে প্রচুর নিন্দা ও মন্দ। যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি এই constitution এর মহাভক্ত এবং অনুরক্ত। এই constitution কিন্তু গত ৫০ বছরে একটি living labs হিসেবে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কাজ করেছে। গত ৫০ বছরে এই constitution এর ওপর কমপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সাড়ে ১৩০০ judgment হয়েছে। reported judgment. unreported judgment এর খবর আমি জানি না। কী ছিল সেই experienceগুলো। সেইসব জাজমেন্টে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা কী কী problem face হয়েছে, এই constitutionকে enforce করার ক্ষেত্রে। এসব living laboratory experience যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি, মনে আমরা সংবিধান সংস্কার প্রশ্নে আজকে যে উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছি, আমরা এর থেকে খুবই ভালো কিছু করতে পারব। আমাকে আজকে এই কমিশনের সামনে উপস্থিত হয়ে দুটি কথা বলার সুযোগ দেয়ার জন্য আমি অসীম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট আরিফ খান।

আমরা এখন শুনব আসিফ আকবরের কথা।

জনাব আসিফ আকবর : সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রজ্ঞাবান সবাইকে সালাম। যারা উপস্থিত আছেন তাদের সবাইকে সালাম ও অভিনন্দন। আমি আসলে শিল্পী মানুষ। আমার সামনে ১ লক্ষ বা ২ লক্ষ লোক থাকলে আমার সমস্যা হয় না। কিন্তু এখানে যা আলোচনা হচ্ছে, তা আমার জন্য খুবই একটি exercise ব্যাপার। আমি মোটামুটি ৪/৫ দিন ব্যায়াম করে আসছি। আমাকে পড়াশুনা করতে হয়েছে। আমি সংক্ষেপে বলতে চাই। আমি যে গোত্র থেকে এসেছি আমি একজন সংগীত শিল্পী। বাংলাদেশে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসার যে পাঁচটি মৌলিক অধিকার আছে, সেখানে বিনোদনকে সংযুক্ত করতে হবে। আমাদের যে সংস্কৃতি কর্মী আছেন। আমরা দেখি হরতাল শুরু গেল, আন্দোলন শুরু হয়ে গেল, যে কোনো crisis এ বন্যা, ঘুর্ণিঝড় crisis এ শিল্পীদের কাজ বন্ধ। অর্থাৎ আমাদের কোনো সামাজিক নিরাপত্তা নেই। আমাদের রাষ্ট্র কোনো কার্ড দেয় না বা রাষ্ট্রের কোনো সুযোগ সুবিধা পাই না। দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর showdown করার জন্য ১০ লক্ষ টাকার চেক দিয়ে দিল অথবা ২০ লক্ষ টাকার চেক দিয়ে দিল। কিন্তু বাংলাদেশের আনাচে কানাচে শিল্পীরা আছেন। যারা নাট্য কর্মী বা সংস্কৃতির বিভিন্ন অংগ থেকে যারা আছেন তাদের কোনো নিরাপত্তার বালাই এ দেশে নেই। বিনোদনের লোকজন হচ্ছে উচ্ছিষ্ট। তাদের কোনো সামাজিক নিরাপত্তা এখানে নেই। এটা আমার গোত্রের আলোচনা এখানে করে ফেললাম। সংবিধানে ৬ নম্বরে বিনোদনকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সংযোজন করা হোক। বাকি বিষয়ে আমি যে পড়াশুনা করেছি। আমি এটির লিখিত এনেছি। আমি আসিফ আকবর। বাংলাদেশের একজন সংগীত শিল্পী। আমি মনে করি বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চার জন্য প্রস্তুত নয়। বিগত ফ্যাসিস সরকারের কার্যক্রম এবং জুলাই বিপ্লবকে ধরে রাখতে হলে ফ্যাসিজমের পূর্ণ জন্ম না দেয়া উচিত। সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে আসন ভিত্তিক মাফিয়া চক্রের উত্থান ঘটার ফলাফল আমরা দেখেছি। প্রধানমন্ত্রীসহ পুরু পার্লামেন্ট পলাতক। এটি কোনো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য সুখকর নয়, এক। দ্বিতীয়ত হচ্ছে বাংলাদেশের আইন বিভাগ, বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ। আইনের শাসন কায়েম করতে হলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের প্রয়োজনীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটি কল্যাণকর বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্র নামের দৈত্যকে জবাবদিহিতায় নিয়ে আসতে হবে। চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী অধীন সংসদীয় গণতন্ত্রেরনামে এক ব্যক্তির শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। এ জন্য আমার ব্যক্তিগত অভিমত বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থায় ফিরে যেতে পারে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে আমরা শ্রীলঙ্কার নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি। বিশ্বের প্রায় ১১২টি দেশে এ ধরনের presidential system চালু রয়েছে। আমেরিক, ইংল্যান্ড, ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশগুলো দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট রয়েছে। আমেরিকায় হাউস কমনস, ইংল্যান্ডে হাউস লর্ড কিংবা হাউস কমনসের মতো দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট গঠন করা যেতে পারে। ফ্যাসিজম থেকে রক্ষা পেতে এবং গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে রাষ্ট্রের যে অর্গান এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে। ক্ষমতা ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে বিকল্প নেই। আমাদের শাসকের প্রয়োজন নেই। আমাদের ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন। রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার তারা দায়িত্ব পালন করবে শাসন করবে না। ছয়, নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সংসদ নির্বাচন ঘোষণা করবেন। যেখানে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্য ব্যালটে নির্বাচিত হয়ে সংসদে যাবেন। সাত, রাষ্ট্রপতি স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে কিংবা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করলে তাকে ইমপেচমেন্টের আওতায় আনার সুযোগ রাখা mandatory. আট- রাষ্ট্র সংবিধানের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র কার্যকর কখনো দৃশ্যমান হয়নি, সেই সঙ্গে সংবিধানে করপাল নামক পদটির উপযোগিতা কখনো দৃশ্যমান হয়নি। ধর্ম, বর্ণ, পাহাড়ি, বাঙালি, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, নৃগোষ্ঠী, আদিবাসী, এ সমস্ত বিভাজন না রেখে বাংলাদেশের সব জনগণ বাংলাদেশি হিসেবে সংবিধানে সন্নিবেসিত করতে হবে। এক দেশ, এক জাতি। আমরা সবাই বাংলাদেশি। Thank you so much.

আসসালামু আলাইকুম।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ আসিফ আকবর।

আমরা এখন যাই ইমরান মাহফুজ আপনার কাছে।

জনাব ইমরান মাহফুজ : মাইক আমার কাছে আসছে না। আমি জানি না যে, আমার আশা ধরা দিবে কি না। প্রধান উপদেষ্টার ৩০-এর মধ্যে থেকে আমার প্রথম জিরো দিয়ে শুরু করলাম। আমার কোনো আশা নেই। প্রথম হলো যে, আজকে ১০ টা ৫৩ মিনিটে একটি নিউজ প্রকাশ করেছে, সেখানে টিআইবি বলেছে যে, আমাদের এখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হতে বিচার বিভাগ অসাধারণভাবে ভূমিকা রেখেছে। আগামী দিনে এই বিচার বিভাগ এভাবে হবে কিনা আমার সংবিধান কীভাবে করবে তা জানি না। আমার বিশ্বাস প্রত্যেকের ঘরে যারা যে ধর্ম পালন করে সে গ্রন্থ আছে। সেই গ্রন্থ মানলেই আর এই সংবিধানের কিছুই লাগে না। তথাপি এই সংবিধানকে আমার মনে হয়েছে যে, দুখিনী বর্ণমালা। এ না রক্ষা করতে পারে নিজেকে, না রক্ষা করতে পারে আমাকে। আমার মনে পড়ে ক্লাস সেভেনে আমি আমার

শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনি যে তথ্যটি বলছেন, এটি ভুল। বলছে যে, "আমি যা বলছি তাই।" ঠিক ২৪ সালে এসে আমার কাছে মনে হয়েছে, আমি আমার রাষ্ট্রপ্রধানকে দেখেছি তিনি যা-ই বলেন তা-ই। তার মানে আমার ক্লাস সেভেনে আমার শিক্ষক কে ছিলেন? তিনিও কি আসলে কর্তৃত্বই দেখাতেন। তখন আমার মনে হয়েছে যে, মানব সভ্যতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট উদাহরণ আসলেই মানুষ। কারণ রবীন্দ্র নাথ এই বাঙালিকে কোনো ভালোবাসার আদরের জায়গা থেকে দেখতে পারেনি। নিজের চোখে তো দেখেছি। যাহোক, এত কিছুর হতাশার মধ্যে আমার 30 এর প্রথম জিরোই রয়েছে হতাশা। আপনাদের দু একটি তথ্য জানাই। ঢাকা শহরে প্রায় দুই লাখ লোক রিকসা চালায় যারা দু শিফটে কাজ করে। তার মানে ৪ লাখ লোক। প্রতিমাসে তারা বাড়িতে পাঠায় প্রায় ২ শত কোটি টাকার ওপরে। আমি জানি না আমার সংবিধান এই আলোচনার মধ্য থেকে এই ২ শত কোটি টাকা শুধু ঢাকা থেকে পাঠানো এই নাগরিকদের কোনো আলাপ থাকবে কিনা। বাংলাদেশে এখন প্রায় ১৭ হাজার ইবতেদায়ী স্বতন্ত্র মাদ্রাসা রয়েছে। যেখানে প্রায় ৬ জন করে তাদের শিক্ষক আছেন। এদের সহকারী শিক্ষকের বেতন ১৮৫০ টাকা। প্রধান শিক্ষকের বেতন ২৬৫০ টাকা। আমি জানি না আপনারা কেউ জানে কিনা। আজকে এই অধিবেশনে যারা আমাকে আপ্যায়ন করেছেন, তাদের বেতন নিশ্চয় ২৬৫০ টাকা নয়। আপনাদের প্রত্যেকের প্রাথমিক শিক্ষা জ্ঞান আছে। নিশ্চয় হলফ করে এখনো ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহায় বাড়িতে গেলে এই শিক্ষকদের কথা মনে করে দেখা হয়। এখনো তারা কেমন আছে? আমাদের সচিব, আমলা, কামলা, ডিসি, এসপি আরো যারা আছেন, তারা কি গ্রামে গেলে তার শিক্ষকের কথা মনে করে কোনো পরিবর্তনের কথা কখনো চিন্তা করেছি। আজও কেন এই কমিশন শিক্ষা কমিশন হয়নি কেন? তার মানে আমার প্রাথমিক শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা কী? আসিফ আকবর একটু আগে বললেন যে, বলে যে, একটি গান চালিয়ে দাও তাহলে কিছুটা ঠাণ্ডা হবে। একটি কবিতা বলে দাও। আসলে কবির অবস্থা কী? সাহিত্যের অবস্থা কী? আপনাদের একটি তথ্য জানাই। বাংলা একাডেমিতে সাহিত্য, সংস্কৃতিতে যারা কাজ করেন তাদের সদস্য হওয়ার সিস্টেম আছে। সমাজ মনে করে যে, তারা ফেলো হওয়ার যোগ্য তাদের উপহার হিসেবে সেটি বলা হয়। ১৯৯৮ সালে সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছে। তার মানে ২৫ বছর কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যাকে বলা হচ্ছে আমাদের বাঙালির উৎকর্সতার প্রতিষ্ঠান। সেখানে ২৫ বছর নির্বাচন হয় না। আচ্ছা নির্বাচন না হলে কী হয়? নির্বাচন না হলে ওখানকার নির্বাচনের মাধ্যমে ৭ জন সদস্য আসবে। যারা পুরস্কার নিয়ে কথা বলবে। বাজেট নিয়ে কথা বলবে। কোন হবে কী হবে না তা নিয়ে কথা বলবে। একই সঙ্গে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে, সেটি নিয়ে কথা বলার কথা। যখন এই ৭ জন না থাকে তখন আমলারাই এটির কামলার ভূমিকা রাখে। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক নীতি কিংবা সাংস্কৃতিক কমিশন না থাকার কারণে জবাবদিহিতা করা যায় না। আপনি দেখেন, আপনি লেখাপড়া শিখে আজকে সংবিধান নিয়ে কথা বলছেন, আমি কথা বলছি। যারা আমাকে কথা বলা শিখিয়েছেন, বর্ণমালা শিখিয়েছি। অ আ ও ই। সেই শিক্ষকদের কী অবস্থা? আমি শুধু ইবতেদায়ী স্বতন্ত্র মাদ্রাসার কথা বললাম, যেটি অনুরূপ চেনার জন্য আপনারা প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবহার করতে পারেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়টি হচ্ছে স্কুলের। আর ইবতেদায়ী স্বতন্ত্র মাদ্রাসা হচ্ছে আলিয়া মাদ্রাসার প্রাথমিক ধাপ। তাহলে এখানে ১৫ হাজার প্রতিষ্ঠান ৪ জন করে হলে ৬০ হাজার শিক্ষক। তারা কারা? আমরা প্রায় দেখি এই শিক্ষকরা যখন প্রেস ক্লাবে আসে তাদের গরম পানি মারা হয়। কে মারে? এসএসসি, ইন্টার পাস একজন পুলিশ অথবা এসি ওসি, যারা মারে তারা। আপনারা কী কখনো ভেবেছেন কারা আসে, কারা যায়। বর্তমানে ৩ জন জাতীয় অধ্যাপক আছেন। আমরা জানি না আনিসুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম স্যারের পরে এই জাতীয় অধ্যাপকের নাম আপনারা জানেন। ওই যে আমার 30 দিয়ে ভুললাম। আপনি শিক্ষিত জনপদ এখানে এসে আমার যে শিক্ষা কমিশন হয়নি, আপনার বিনোদনের জন্য যারা কাজ করে এই আন্দোলনের অন্যতম একটি cultural revolution ঘটেছে, সেই কালচারের কমিশন নেই এবং সেখানে ১ শতাংশ বাজেট নেই। ৩ মাসের মধ্যে ২ জন সংস্কৃতি উপদেষ্টা হলেন। আমি সর্বশেষ উপদেষ্টার সাথে কথা বললাম। তিনি নাকি সপ্তাহে একদিনও ওই মন্ত্রণালয়ে যাওয়ার সুযোগ পান না। ওখানে ৪২ জন কর্মকর্তা আছেন। তারা বলে যে, "স্যারকে আমরা পাই না।" তার মানে আগামী দিনে যে সংবিধান হবে, সেখানেও কী সংস্কৃতির এই অবস্থা হবে? সেখানেও কী প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বতন্ত্র মাদ্রাসার এই অবস্থা থাকবে? আপনারা এগুলো দেখেন। আমার কাছে মনে হয় আপনারাওকখনো কখনো এত কথা শুনতে শুনতে আমার মতোই দুখিনী বর্ণমালা অথবা প্রথম জিরো থেকে শুরু করবেন। আচ্ছা আমাদের জাতীয় ফল আছে, পাখি আছে, ফুল আছে। খুব মজার একটি গল্প আছে। এক বিদেশি বাংলাদেশে ঘুরতে এসে সে জাতীয় ফুল দেখার জন্য শাহবাগে এসেছে। দোকানি বলল "আমাদের এখানে তো পাওয়া যায় না। তুমি কাওরান বাজার গেলে পাবা।" তারপর সে তার ডায়েরিতে লিখেছে যে, " ও এক অদ্ভুত জাতি যারা তাদের জাতীয় ফুলকে রান্না করে খায় এবং সেটি সবজির দোকানে পাওয়া যায়।" আচ্ছা আমাদের একটি জাতীয় বই কি থাকতে পারে না? আমরা যে আজকে এখানে বসেছি, আমাদের সার্বভৌমত্বের ৭১ কিংবা ৭২ এর পরে এটিতো একটি সংস্কৃতির কারণে বসার পর আমাকে এক গ্লাস পানি দেয়া হলো। একটি কলম প্যাড দেয়া হলো। আমাকে একটু আপ্যায়নও দেয়া হলো। এটি তো আমার সংস্কৃতি। অর্থনীতি যিনি পড়েন তার একটি সংস্কৃতি আছে। যিনি একটি আইন করেন তারও একটি সংস্কৃতি আছে। কারণ যে কোনো কাজ ১০ বছর হওয়ার পরে

এটি সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কাজের ধারা, phenomenon, condition, demand. তার মানে কোন বইটি পড়লে এই জাতির মনস্বত্বকে বুঝার জন্য সহায়ক হবে এমন একটি বইকে আদৌ আমরা জাতীয় বই কী বলতে পারি না। আমি গত পরশু আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ইনস্টিটিউটে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রতিবছর ৯ কোটি টাকা বাজেট হয়। গত ৪ বছরে গবেষণায় ১ টাকাও ব্যবহার হয়নি।

বরঞ্চ অন্য খাতে যতটুকু ব্যবহার হয়েছে, সবচেয়ে ৯৯ ভাগ ৯৯% শেখ রাসেল, শেখ রেহানা, এ ধরনের বই বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করেছে। নাম হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। ইউস্কোর two category এর প্রতিষ্ঠান। আচ্ছা আপনারা যারা আছেন, আপনাদের এই প্রশ্নগুলো আসে কিনা; দেখেন কিনা। না হলে ঘরে কোরআন যেমন থাকে, ভালো মানুষ হন না। বাইবেল যেমন থাকে, তাওরাত যেমন থাকে, ইঞ্জিল যেমন থাকে, ভালো মানুষ হন না। এই সংবিধান আমার মনে হয় আবারো আপনাদের অভিশাপ দিবে বলবে "তোর উপর খোদার গজব পরুক। তোরাই তো আমাকে বানালে। তোরাই তো আমাকে মানিস না।" আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবে এগুলো চলে আসছে। যাদের চোখ কান খোলা আছে বুঝতে পারবেন। আমি শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব দিয়েছি। আমি সংস্কৃতি কমিশনের প্রস্তাব দিয়েছি। আচ্ছা সংস্কৃতি কমিশন হলে কী হবে? তাহলে যেসব উপদেষ্টারা দুই দিন পর পর পরিবর্তন করেন দায় এবং দায়িত্ব থাকে না। একদিন তিনি যেতে পারেন না। তিনি কেন যেতে পারেন না সে জবাবদিহি তো আসবে। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হবেন। আমি জানি না সকাল বেলা দেখি একটি প্রজ্ঞাপন তিনি মহাপরিচালক। আমি গত ২০ বছর কবিতা লিখি। আমি গত ২০ বছর নাটকের সঙ্গে আছি। শিল্পকলার কে মহাপরিচালক আমি জানি না। ফ্যাসিবাদ সরকারও এ ধরনের প্রজ্ঞাপন দিতেন বিকেলে নিউজ হতো। আমরা সন্ধ্যায় গিয়ে তাকে ফুল দিতাম। আজও তাই। তাহলে কেন আমার গণঅভ্যুত্থান; কেন শহিদ মুগ্ধ, সাইয়িদ, নাফিজ, তাহিরদের রক্ত? যদি আপনাদের লীলাখেলা, এই ভণ্ডামি, নিমকহারামি আমাদের সাথে ভাওতাবাজী করলেন। তা তো হতে পারে না। তার মানে এই যে সাংস্কৃতিক কমিশন আসলে করতে পারবে তা না। নূন্যতম সেই আইনের মতো public function এ আপনি যদি ধূমপান করেন, ৫০ টাকা জরিমানা, সেটি না নিতে পারা না দিতে পারে। এই যে, আইন আছে, সেটি বলার জন্য অন্তত কমিশন থাকলে আমরা কিছু করতে পারি। একই সঙ্গে বলে রাখি যে, এই সংবিধান কমিশন কী জাহাঙ্গীরনগর পাখির মতো আসা এক মাসের জন্য এ রকম। তিন মাসের জন্য না। আমি প্রস্তাব করছি যে, এই কমিশন যেন স্থায়ীভাবে থাকে তাহলে আমরা বারবার যেন তাদের কাছে আলাপগুলো করতে পারি। বারবার যেন আমাদের সঙ্গে, গণআকাঙ্ক্ষার সঙ্গে থাকে। আমরা জানি প্রতিবছর অনেক কিছু বদলে যায়। আমাদের আকাঙ্ক্ষা বদলেও যেতে পারে। বদল না হলে ৯০ যে গণআকাঙ্ক্ষার জাতীয় ঐক্য, সেটি আমরা কীভাবে ভাঙলাম? কীভাবে প্রতারণা করলাম? তারমানে আমাদের যদি বারবার ধরার মতো কিছু থাকে তাহলে আমরা কিন্তু এই আলাপগুলো করতে পারি। এই ভবনে ৫৪ বছর পরে কেন নাগরিক শুধু আসবে? এটি তো আমাদের প্রতিষ্ঠান। এখানে পাশে লেখা আছে প্রতিবন্ধীদের খেলার মাঠ। গত ১৬ বছরে কোনো প্রতিবন্ধী পাইনি। বরং এখানে যারা এসেছে তাদেরকে আমার প্রতিবন্ধী ক্লাব মাঠ মনে হয়েছে। যাহোক, আলী রীয়াজ স্যার ভয়ের সংস্কৃতি দেখাচ্ছেন এবং চোখ বড় করছেন, এটি ভয় লাগছে। তার ভয়ের সংস্কৃতি কত দিনে তৈরি হলো?

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : সময় স্বল্পতা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

জনাব ইমরান মাহফুজ : আমরা তো ভয় পাই। কারণ আপনার বই পড়ার আরো ভয় পাচ্ছি। আপনারা যারা গ্রাম থেকে এসেছেন, কয়জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর পড়ে গ্রামে গেছেন। তাহলে আমার গ্রাম তো অন্ধকার থাকবে। আমার গ্রামের কমিশনার তো আমাকে খাবে। আমার মেম্বার তো জন্ম নিবন্ধন করার জন্য ১ হাজার টাকা চাইবে। আপনারা কী জানেন আমাদের আহত সৈনিকরা, বীররা এখনো রাস্তায় আসেন। কেন আসেন। করা এরা? তাদের পায়ের ওপর দিয়ে ধাক্কা দিয়ে উপদেষ্টার গাড়ি চলে যায়। আমরা এখানে আবার কথা বলছি, এটি তো লজ্জা, হায়া, মায়া থাকার কথা, বিবেক থাকার কথা। আপনি সংবাদপত্র দেখেন। শেখ হাসিনাকে মনে হয় খালাতো বোনের মতো ব্যবহার করে। কেন; স্বৈরাচার শব্দ ব্যবহার হয় না। ছাত্রলীগের হয় না। মানে যে সংবাদপত্র জনগণের কথা বলবে না। আপনি সরকার আইন করে দেন। সেখানে শেয়ারবাজারের মতো তার শেয়ার মানুষ কিনবে। তাকে মতামত দিবে, তাকে stablish করবে। যে কোনো পত্রিকা আপনার অনুমোদন নিয়ে, আমার অধিকার নিয়ে যেনতেন ছিনিমিনি খেলবে তা হতে পারে না। এ প্রতিষ্ঠানগুলো একটি লিমিটেডের মধ্যে নিয়ে আসা যেতে পারে কিনা। যে প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের অনুমোদন নিয়ে, আমার অধিকার নিয়ে কথা বলবে, সেই প্রতিষ্ঠানে মানুষের জায়গা থেকে accessible হতে পারে। হাঁ সেটি হতে পারে binaryতে, 46 binary হোক অথবা 51, 59 এ binary হোক। এতে কী দাঁড়াবে? জনগণের সাথে তাদের একটি সম্পর্ক থাকবে এবং জবাবদিহিতার মধ্যে থাকবে। যে যুগান্তরের সম্পাদক ২২ জুলাই শেখ হাসিনাকে বলেছে, 'আপনি যা করবেন আমরা তার সঙ্গে আছি।' কারা? প্রায় ১৮ জন সম্পাদক দাঁড়িয়ে তাদের সাথে একথা বলেছে। আমি তখন ভুলে গেছি যে, এটি কি সাংবাদিক editors guilt এর অনুষ্ঠান, নাকি ছাত্রলীগের অনুষ্ঠানে থেকে সভাপতি বলল যে, ' নেত্রী আপনার সঙ্গে আমরা আছি।' সেই সম্পাদক কিন্তু এখনো পত্রিকা চালায়। তাহলে সে কীভাবে লিখবে? ওই পত্রিকাগুলো আমাদের কাছে আছে, যে পত্রিকাগুলো বলেছে, সকাল বেলা ৫ আগস্ট বলেছে যে, 'দুর্বৃত্তরা ঢাকা হানা দিচ্ছে।' সেই পত্রিকা

বিকেল বেলা ভাষা পরিবর্তন করে বলছে 'বিপ্লবিদের গণজোয়ার লক্ষ লক্ষ জোয়ার।' এটি কার script? News editor কি change হয়ে গেছে? যাহোক, এগুলো বলছি আমার first zero থেকে। আমি আপনাদেরকে আশা করছি না। কেননা, আপনাদের প্রত্যেকের চোখে মুখে হতাশা আছে। আপনারাও রাতে ঘুমালে বউয়ের কাছে যান, সন্তানের কাছে যান। সন্তানের চোখ কি আমার মতো মনে পড়ে? ওই রিকসাচালকের মতো মনে পড়ে? যারা ৪ লাখ প্রতিমাসে ২ শত কোটি টাকা বাড়ি পাঠায়। যাকে আপনারা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বলে বলেন যে, 'এই রিকসা যাবা।' রিকসা কী বলে 'আমি যাব না, তুই যা।' এই তুমি তো শ্রেণি বৈষম্যের তুমি। এই তুমি তো ভালোবাসার তুমি না। কাছে টানার তুমি না। এই শ্রেণি হচ্ছে আপনি যে সুটেট বুটেট আছেন এই জন্য রিকসাচালককে বলতে পারেন 'এই রিকসা যাবা।' রিকসাওয়ালা যদি বলে 'আমি যাব না, তুই যা।' আপনি তখন রাগ করবেন। আমি কারো মতো বলতে পারি না। এটি বদলে ফেলুন, সংস্কার করুন, কী করবেন, সেটি মানুষ নিবে। আপনাদের যেহেতু দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। You will decide that but আমার যারা প্রতিমাসে ঢাকা থেকে ২ শত কোটি গ্রামে পাঠায়, চিকিৎসা চলে, এটি সম্পূর্ণ আমার দেশের আয় থাকে। আপনাদের একটি আয় ঢাকায় থাকে, দিল্লিতে থাকে, লন্ডনে থাকে। আমার রিকসাচালকের সকল আয় এখানে থাকে। তাদের কথা আপনারা কি ভাবেন? দেখবেন, আপনাদের যে অনলাইন, সেটির মধ্যে রিকসাচালকের একাউন্ট নেই। সে দিতে পারে না। বলা হচ্ছে যে, এই সংবিধানের কারণে আমার শেখ হাসিনা হইল। এ কথা বলা সঙ্গে সঙ্গে শেখ হাসিনাকে বোধহয় ৫০ ভাগ মাফ করে দেয়া হলো। What is this? যদি তাই হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকার হলগুলো বন্ধ করেনি। আমার স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার হলগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। তার মানে এই বিশ্ববিদ্যালয় আমার ভেঙে ফেলার কথা। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয় আমার গণআকাঙ্ক্ষার সাথে যায় না। যারা একপাশে লিখেছে গণতন্ত্র এবং মুক্তি। কোথায় মুক্তি? যে মুক্তি থাকার কথা মুক্তির সামনে। একটি পত্রিকা ন্যায্য কথা বলার কারণে সেখানকার ভিসি এবং অধ্যাপকরা দাঁড়ায় সরকারের পক্ষে। সেখানে মুক্তি এবং গণতন্ত্র কী হাস্যকর কী হাস্যকর, কী হাস্যকর, হা হা হা। এটিই আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তার মানে বিশ্ববিদ্যালয় আমার ভেঙে দেয়ার কথা ছিল। যদি এই সংবিধান মেনে শেখ হাসিনা স্বৈরাচার হয়, তাহলে এই বিশ্ববিদ্যালয় মেনেই তারা এসেছে। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শেখ হাসিনা। আপনারা আমরা। আমি কিছু কথা বলতে চাই। শেষের দিকে আছি। কারণ রক্ত চক্ষু ভালো লাগছে না। আমি তো first zero দিয়ে শুরু করেছি। আজকে টিআইবির যে রিপোর্ট বলল, আমার ফ্যাসিবাদকে, আমার একনায়কতন্ত্রকে আমার বিচার বিভাগ দিয়েছে। আমার তিন মাস হয়ে গেল। আমার আইন কমিশন হলো। কারণ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কবে হবে? এগুলো বারবার আপনারা বলবেন। আমাদের সাথে কথা বলবেন। আমরা এসে লিখে দেব। আমাদের খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই। থাকবে না। এটি তো হতে পারে না। আপনারা মাদ্রাসা নিয়ে ভাববেন কি না, সেটি দেখবেন। যখন শিক্ষা কমিশন হয়, সেখানে মাদ্রাসা থাকে কি না, সেটি দেখবেন। স্বতন্ত্র মাদ্রাসার কথা উল্লেখ করেছি। আমি সেখারকার একজন সচিবের সাথে কথা বললাম। বলে, 'না, আমরা তো এটি দেখি না। এটি মন্ত্রণালয় দেখে।' মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বললাম বলে 'আমরা তো দেখি না, এটি উপদেষ্টা দেখে।' উপদেষ্টার সাথে কথা বললাম, 'এটি প্রধান উপদেষ্টা জানে।' আচ্ছা সবকিছু যদি ওই প্রধান উপদেষ্টা জানে তাহলে তো একই বিষয় হলো যে, শেখ হাসিনার মতো। আমার সবকিছু প্রধান উপদেষ্টা জানবে কেন? আমার যতটুকু এখানকার কমিশন তার যতটুকু ন্যায্য পাওনা সাররি ওয়া সাররা। সে ততটুকু জানবে। আমি যতটুকু, আমি ততটুকু জানব। তা না হলে সবকিছু যদি ওই খোদা তায়ালা জানে তাহলে আমার সপ্তম শ্রেণির শিক্ষকের মতো হলো যে, 'আমি যা বলছি, তা-ই।' আমি বলছি, স্যার বইতে তো এটি নেই। বলে, 'আমি যা বলছি তা-ই।' তাহলে আমার যখন সাংসদরা আসবেন, আমি বলব তোমার সংসদের এই সংবিধানের পাতায় তো এটি নেই তুমি কেন এটি করছ? বলবে, 'আমি যা বলছি তা-ই।' তাহলে আমার আসলে এই সাংসদেরকে কী বলা দরকার? আজকে আপনারা যে সংবিধান নিয়ে কথা বলছেন, যেসব আলাপ হচ্ছে। আমাদের আরিফ ভাই, আমাদের আসিফ ভাই, আমাদের তুষার যা বলছেন, এগুলো ১৯৭২ সালে আবুল মনসুর আহমেদ অরণ্যে রোদনের মতো কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা কিছুই দরকার হবে না যদি আপনি গণতন্ত্রটা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।' আমি আর দুই মিনিট বলে শেষ করছি। সুতরাং আপনারা গণতন্ত্রটাকে কীভাবে দেখবেন? তার জন্য আমার রিকসাচালক, আমার স্বতন্ত্র মাদ্রাসার শিক্ষক, আমার মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সেটি দেখেন। এই গণঅভ্যুত্থানের শক্তিকে আমরা কেন গ্রামে নিতে পারিনি? আমাদের এই ঢাকায় মনে হচ্ছে এখন অনুষ্ঠানের শহর। সংগঠনের শহর। আমার চট্টগ্রামে এই আলোচনা নেই। নেত্রকোণায় নেই। ভুয়াপুর, উল্লাপাড়া সিরাজগঞ্জে নেই। নেত্রকোণায় এই অনুষ্ঠান নেই। নেত্রকোণার নদীগুলোর অবস্থায় আমাদের নদী বিষয়ে কাজ কাজ করতে করতে উপদেষ্টা হয়ে গেলেন। তার চেহারা আমার চেয়ে সুন্দর। আমার নদীগুলো মরে যাচ্ছে। এবারে রংপুর এবং ফেণীতে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। আমার এই নদীগুলো আপনি দেখেন। একই সঙ্গে আমার রংপুর, কুমিল্লা, ফেণীর যে অবস্থা- বন্যার সময় যেভাবে ত্রাণ সংগ্রহ করা হয়েছিল, পরবর্তীতে পুনর্বাসনের জন্য এখনো কাজ হয়নি। এটি আপনাদের বলছি না। আমি বলছি যে, আমার নদী কমিশন কীভাবে কাজ করে? আমরা শিক্ষা কমিশন কীভাবে কাজ করবে? আমার সংস্কৃতি বিষয়ক কমিশন কীভাবে কাজ করবে? এগুলোকে কোনোভাবে সাংবিধানিকভাবে ভিত্তি দিলে এবং এবং একইভাবে সংবিধানের আইনগুলো শুধুমাত্র দিলাম

স্বর্ণাক্ষরে লিখলাম তা নয়। সেটি আসলে বাস্তবায়ন করার জন্য আমার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাংবিধানিক আওতায় এনে, এদের ক্ষমতা কাঠামো, এদের বরাদ্দ কাঠামো, সেই জায়গায় দেয়া যায় কি না, যেটি আরিফ ভাই বলেছেন।

শেষ করছি ওইটি বলে আমাদের শিক্ষা বাজেট একই সাথে সংস্কৃতি বাজেট এতই প্রতুল্য। ফলে অনেক কাজ আসলে করা যায় না। তাই আজকের মতো আলাপ এখানেই শেষ করছি এবং তার একটি লিখিত রূপ আমি আশা করছি নির্দিষ্ট যে সময় দিয়েছেন, সেটি নিয়ে কথা বলব। আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা এখানে বসলাম। জয় হোক মানুষের।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ ইমরান মাহফুজ।

এখন আমরা সাইয়েদ আবদুল্লাহর কাছ থেকে শুনব। আমরা জানি যে, ইমরান মাহফুজের লিখিত বক্তব্য পাব। সাইয়েদ আবদুল্লাহ আপনার প্রতি সুবিচার হবে না আমি জানি। কিন্তু সময় স্বল্পতার কথাটি একটু বিবেচনায় রাখবেন এবং পরবর্তী সময়ে যেন লিখিত দিতে পারেন অন্যদের কথাগুলো যেন শুনতে পারি। আমার ধারণা যে, আমার সহকর্মীদের কিছু প্রশ্ন আছে আপনাদের কাছে, সেগুলোও একটু আলোচনা করতে চাই।

জনাব সাইয়েদ আবদুল্লাহ : ধন্যবাদ স্যার।

আর যে মুহূর্তে আলোচনা করছি আসলে এ মুহূর্তে আলোচনা করা আমার জন্য ভয়ের কারণ। কারণ সংবিধান সংস্কার বিষয়ক আলোচন করছি এমন একটি সময়ে আমাকে সরাসরি সংবিধান পড়িয়েছেন, সেই অধ্যাপক এখানে আছেন। আমার সরাসরি আরেক জন শিক্ষক, যিনি সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন তিনিও আছেন। সংবিধান সংস্কারের ব্যাপারে যে ধরনের কথা হচ্ছে- সবার আগে খুবই simply একটি কথা বলি, আমি এত বড় সংবিধান দেখতে চাই না। আমি এই সংবিধানের কলেবরটি খুবই ছোট্ট দেখতে চাই। এই কথাটি বলার পরে অনেকেই বিস্ফোরিত চোখে আমার দিকে তাকাতে পারেন। পৃথিবীর অনেক দেশের সংবিধান আছে অনেক ছোট। কিন্তু তাদের দেশে আইনের শাসন আমাদের দেশের তুলনায় কয়েক হাজার গুণ ভালো। অনেকেই মনে করেন সংবিধানে সবকিছু লেখা থাকা উচিত। সংবিধানে আসলে সবকিছু লেখা থাকার দরকার নেই। ব্যসিক কিছু আইডিয়া যদি সংবিধানে থাকে তাহলে অন্যান্য যে আইনগুলো আছে, সেই আইন দিয়েই সংবিধানের কাজকে খুব চমৎকারভাবে করা যায়। তখন আমাদের প্রত্যেকটি ইস্যু ধরে ধরে সংবিধান পরিবর্তনের দরকার হয় না। তা না হলে যেটি হবে দেশের বয়স ৫০ বছর না হলেই ১৭ বার সংবিধান পরিবর্তনের দরকারের মতো ঘটনা ঘটবে। এ কারণে আমি চাই যে, অন্যান্য যে আইনগুলো আছে, সেগুলোকে শক্তিশালী করে সংবিধানে basic mandateটি রাখলে সংবিধানের কলেবর যেমন ছোট হবে আমাদের কাজ করার জন্য বারবার করে সংবিধান সংশোধনের মতো জটিল প্রক্রিয়ায় যেতে হবে না। একেবারে শুরু যেটি করি preamble যেটি ছিল, সেই preamble এ যৌক্তিকভাবে ওই সময়ের perspective এ ১৯৭১ সালে খুব ধরনের বড় reflection রকমের ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালের সেই চেতনা দিয়ে আমরা তো আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারিনি। এ জন্য আমাদের ৯০ এ অভ্যুত্থানের দরকার হলো। ২০২৪ সালে আরও একটি গণঅভ্যুত্থানের দরকার হলো। নতুনভাবে সংবিধান যদি rewriteও করা হয় বা সংস্কারও করা হয়, তাহলে preamble এর ভিতরে অবশ্যই '৭১ এর পাশাপাশি ১৯৯০ এবং ২০২৪ এর স্পিরিটটি আছে, সেটি একদম লিখিতভাবে সংবিধানে থাকা উচিত বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। দেশের নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কখনোই থাকা উচিত নয়। যে দেশে নামের ভিতরে প্রজা নামে শব্দটি আছে, সেটি এখনো আমার কাছে মনে হয় আমাদের একটি colonized view দেয় এবং সেই জায়গা থেকে আমাদের দেশে বাংলা নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ থাকবে কিনা, এটি বিচার বিবেচনা করার দরকার আছে। বিদ্যমান সংবিধানের আর্টিকেল ৬ এর ২ যেখানে জাতি হিসেবে সবাইকে বাঙালি বলা হয়েছে। এ জায়গাটি অত্যন্ত আপত্তিকর। এ জায়গাটি এমন হওয়া উচিত ছিল যে, একটু আগে আলোচনায় আসছিল যে, চাকমা যে আছে, সেও তো আমার বাংলাদেশের মানুষ। একজন মারমা আছে, সেও আমার বাংলাদেশের মানুষ। সাওতাল একজন আছে সেও বাংলাদেশের মানুষ। কাজেই জাতি হিসেবে নিজ নিজ জাতিতে পরিচিত হবে এবং নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশি হবে, বোধহয় literary terms এ রকম হওয়া উচিত ছিল এবং এটির যদি সমাধান হয়ে যায় বিদ্যমান আর্টিকেল যেটি আছে, আর্টিকেল ৩ রাষ্ট্র ভাষার যে জায়গাটি। রাষ্ট্র ভাষা যদি বাংলাও থাকে অন্যান্য জাতিসত্তার ভাষা সেটিও যেন পূর্ণ মর্যাদা পায়, সেই reflectionটি সংবিধানে থাকা উচিত। আমি মূলনীতির জায়গায় চলে যাই। আর্টিকেল ৮ এটিও খুব পরিষ্কারভাবে বলা আছে। বারবার যেহেতু আলোচনায় এসেছে, সেহেতু আমি একটু সংক্ষিপ্ত করছি। আমাদের মূলনীতি চেঞ্জ করার দরকার আছে। এমনকি অনেক বিষয় আছে অযৌক্তিকভাবে ঢুকানোর চেষ্টা করা হয়েছে, এটির সাথে '৯০ আর ২০২৪ এ দুটির স্পিরিট যদি যুক্ত করা যায় তাহলে আমার কাছে মনে হবে এ জায়গায় সংযোজন এবং বিয়োজনের দরকার আছে। সংবিধানের সবচেয়ে মারাত্মক যে জায়গাটি ছিল, যেটির পরিপ্রেক্ষিতে একটি fasis racism গড়ে উঠতে পারে। আমার মনে হয় basic structure theory ৭বি দিয়ে যেটিকে generalize করা হয়েছে। এই basic structure theory এর মাধ্যমে সংবিধানে

আসলে অর্ধেকের মতো অংশ অপরিবর্তনীয় করে ফেলা হয়েছে। এই জায়গাটি অবশ্যই পরিবর্তনের যোগ্য। তবে basic structure theor কিছু কিছু কারণে থাকতে পারে। ওই প্রেক্ষিতে যদি পরিবর্তন করার দরকার হয়, সেই ক্ষেত্রে অবধারিতভাবে গণভোট চালু করা জরুরি। শুধু পার্লামেন্টে এটি চেঞ্জ করা হবে, ব্যাপারটি যাতে কোনো অবস্থাতেই না হয়। যেমন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যু, প্রেসিডেন্টশিয়াল ইস্যু। আরো প্রেসিং যেসব ইস্যু আছে, ওইগুলোর জন্য অবশ্যই গণভোটের বিধান রাখা অত্যন্ত জরুরি। একটি সময় ছিল। মাঝে বাতিল হয়ে গেছে। এটি আবার নতুন করে চালু হওয়া উচিত। সংবিধানের তৃতীয় ভাগ। মানে মৌলিক অধিকার বা মানবাধিকার আমরা যেটিই বলি। এ জায়গাতে প্রত্যেকটি কন্ডিশন যেটি আছে, এগুলো subjected to condition এবং এই কন্ডিশনের আদতে আসলে একটি সরকার যখন থাকে সে যেকোনো মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করতে পারে। কারণ এটির কোনো threshold আমাদের কাছে নেই। আমাদের এই সংবিধানে নেই। একই সাথে কার satisfactionএ কন্ডিশনগুলো থাকবে সেটিরও কোনো সুস্পষ্ট mandate নেই। কাজেই যে সংবিধান rewrite ইকরা হোক বা বিদ্যমান সংবিধানকে সংস্কার করা হোক, এই যে কন্ডিশনগুলো আছে, মানবাধিকারের পর সেটির satisfaction কার উপর নির্ভর করবে, কোন কোন কন্ডিশনের উপর সেগুলো খুবই সুস্পষ্টভাবে আমাদের এই সংবিধান যদি mandate না দেয়, তাহলে এটিকে বারবার করে অপ্রয়োগ করা হবে। একটু প্রেসিডেন্ট ইস্যুতে চলে যাই। সবার আগে আর্টিকেল ৪৯, existing constitution এর। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের এখতিয়ারকে একবারে বাধাহীনভাবে রাখা হয়েছে। বিগত দিনগুলোতে যেটি হয়েছে। এর কারণে প্রচণ্ড বাজে অপরাধীও রাষ্ট্রপতির মার্সি পেয়ে গেছে। কাজেই এই ক্ষমতা অসীম হওয়া উচিত না। বরং কাকে ক্ষমা করবে এটি অবশ্যই সুপ্রীম কোর্টের advisory মতামতের mandateটি রাখা উচিত। আরেকটি মতামত। আমি জানি না এটি কতটা যৌক্তিক। বাংলাদেশে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ তৈরি করা যায় কিনা এবং সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট পদটি এভাবেও চিন্তা করা যেতে পারে যে সংখ্যালঘু terms ব্যবহার করতে যদিও আমি খুব সাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। কিন্তু আমাদের যদি categorically বলা থাকে কারা কারা সংখ্যালঘু এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট পদটি যদি সংখ্যালঘুদের ভিত্তিতে আসে তাহলে তাদের একটি supreme representation থাকবে। তারা নিজেদের কখনো বঞ্চিত feel হওয়ার যে জায়গাটি বা কথা বলা ফোরামের যে অভাব সেই অভাব হয়তো feel করবে না। প্রধানমন্ত্রীর ইস্যুতে আমার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ argument আছে। প্রধানমন্ত্রীর ইস্যু একেবারেই নির্ধারিতভাবে সংবিধানে decide দেয়া উচিত যে, দুই বারের বেশি কেউই প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না। পর পর দুইবারও না। দুই বারের কেউই প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে এবং আরো একটি ব্যাপার যে, নির্ধারিত করে দেয়া দরকার আছে। রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং একই সাথে সরকারের প্রধান একই ব্যক্তি হওয়া উচিত না। আরেকটি ব্যাপার যে, যেটি হয়তো সংবিধানে specifically লেখার সুযোগ পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা আইনগুলো সাথে সংযুক্ত করতে পারি। নির্বাচন কমিশন আইনের ভিতরে যদি এটি থাকে যে, রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার শর্ত থাকতে হবে দলের ভিতরে যাতে democracy প্রতিষ্ঠিত হয়, এটি যদি না থাকে তাহলে দেখা যাবে যে, আমরা অতীতেও দেখেছি যে, বারবার করে একই ব্যক্তি দলের ভিতরে democracy না থাকা সত্ত্বেও সভাপতি হয়ে যাচ্ছেন, সাধারণ সম্পাদক হয়ে যাচ্ছেন।

এই আইন যদি নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নির্ধারিত করা হয় এবং সংবিধানে যদি এভাবে বর্ণনা করা থাকে যে, নির্বাচন কমিশন আইনের সাথে সামঞ্জস্য থাকলে তার উপর ওই দলগুলোর নিবন্ধন থাকবে। সে ক্ষেত্রে দেখা যাবে দলের ভিতরে democracy এর ব্যাপারটি কেউ exploit করতে পারবে না। যেটি অতীতে সবসময় হয়েছে। আর্টিকেল ৭০ particular দুইটি কেস বাদে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার horse-tradingটি বাদ দিয়ে এবং দু একটি বাজেট বাদ দিয়ে আর্টিকেল ৭০ এর যে embargo দেওয়া হয় এমপিদের ওপরে সেই জায়গাটি তুলে দেয়া উচিত। একটি গণতান্ত্রিক দেশে আর্টিকেল ৭০ যেভাবে ছিল, এভাবে যদি থাকে তাহলে এমপিদের ব্যক্তিগত কোনো স্বাধীনতা থাকে না এবং essentially শেখ হাসিনার মতো সরকারে রূপান্তর করে দেয়ার spaceটি তাদের থাকে। আর্টিকেল ৭৭। ন্যায়পাল নিয়ে যে কথাটি আছে, এ ব্যাপারটি আসলে সাংবিধানিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো একেবারে clear mandate না দিয়ে আইন করে দলীয় সরকারের অধীনে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এ কারণেই স্বাধীন বাংলাদেশে ন্যায়পাল নিয়োগ আজবধি হয়নি। কাজেই আমি চাই যে, নতুনভাবে যদি সংবিধান লিখিত হয়, তাহলে ন্যায়পালের ব্যাপারটি অন্যান্য সাংবিধানিক পদের মতো একেবারে সুনির্ধারিত দেয়া উচিত। এটি নতুন কোনো আইনের মাধ্যমে দেয়া উচিত না। বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে অনেক কথা হয়। আমাদের সংবিধানের একটি বড় অংশ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলে। আর্টিকেল ৯৫ এ বিদ্যমান আর্টিকেল নিয়ে কথা বলি। বিচারপতি নিয়োগ আমার কাছে মনে হয় রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্গানকে সবচেয়ে খেয়ালিপনা করা হয়েছে। কারণ আপনি সুপ্রীম কোর্টে ১০ বছর যদি প্রাকটিস থাকে অথবা বিচার বিভাগের কোনো ক্যাপাসিটিতে যদি ১০ বছর কাজ করা থাকে তাকে ইচ্ছা করলেই দলীয়ভাবে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন। এই জায়গাটি থাকা উচিত নয়। বরং আরো ভিন্নতর মাত্রায় তাদের যোগ্যতা নিশ্চিত করা উচিত। একই সাথে বলে রাখা ভালো যে, অ্যাটর্নি জেনারেলের যে অফিস আছে, including attorney general, assitant attorney general, deputy attorney general রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়ায় যে নিয়োগ পান, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া যেটি, সেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বর্ণনা কোথাও পরিষ্কারভাবে লেখা

নেই। বরং দলীয় সরকারের হাতেই দেয়া আছে। এই জায়গাটি আইন করে ঠিক করে দেয়া দরকার এবং সংবিধানে এই mandateটি অন্য কোনো আইনে দিয়ে দেয়া দরকার আছে বলে মনে করি। সাংবিধানিক কাঠামোর ভিতরে গণভোটের কথা আমি আগেই বলেছি। তফসিলগুলো যখন নির্ধারিত করা হয় অনেকগুলো তফসিল পড়লে মনে হবে যে, এটি কোনো দলীয় mandate এবং দলীয় বয়ানকে প্রতিষ্ঠা করার জায়গা। সেই ক্ষেত্রে এই তফসিলগুলো যাতে কোনো দলীয় বয়ানের reflection না থাকে সেই দিকে আমাদের মনোযোগী হওয়া দরকার আছে। আরেকটি সংকট বলেই আমি শেষ করছি। শেখ হাসিনার সরকারের সর্বশেষ তিনটি ইলেকশন যদি বিশ্লেষণ করা যায়, এই সংকট থেকে আমরা কিছু শিক্ষা বোধহয় নিতে পারি। ২০১৪ তে যেটি হয়েছে, অর্ধেকের বেশি আসনে ভোট হয়নি, কিন্তু দেশ চলেছে। ২০১৮ সালের ইলেকশন এবং ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির ইলেকশন দেশে মোটামুটি ২০ শতাংশও ভোট cast হয়নি, কিন্তু একটি সংসদ দাঁড়িয়ে গেছে। এ জন্য lower কোনো threshold ঠিক করে দেয়া যায় কিনা; এটি নিয়ে অধিকতর আলোচনার দরকার আছে। আমি লিখিতভাবে যেটি জমা দিব, সেখানে আমি বিস্তারিত বলব। এমন হতে পারে। দেশের মোট ৫০ শতাংশ ভোট যদি কাস্ট না হয়, তাহলে নতুন করে পুনঃ নির্বাচন দেয়া যেতে পারে। ২০১৪ সালের যে শিক্ষা অর্ধেকের বেশি আসনে ভোটই হয়নি। কিন্তু সংসদ চলছে। একটি hreshold বেঁধে দেয়া দরকার আছে কিনা যদি এত পার্সেন্ট আসনে নির্বাচন না হয় তাহলে ওই নির্বাচনে পুনঃ নির্বাচনের দরকার আছে কিনা। আমি শেষ করব আরেকটি কথা বলে। আমি যেখান থেকে শুরু করেছিলাম। আমাদের এই সংবিধানে সব লেখা থাকতে হবে, এটি জরুরি নয়। কিন্তু এই সংবিধানের এখতিয়ার যাতে অনেক widespread করা হয়, যেটির মাধ্যমে অনেক আইন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এবং একই সাথে মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, এই কমিশনগুলোকেও সাংবিধানিক কাঠামো দাঁড় করলে আমার মনে হয় সামনে যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি, আমরা একটু ভালো বাংলাদেশ দেখতে পারব। আর যে কথাটি বলা জরুরি। এই জায়গায় এসে কথা বলতে পারছি সম্ভবত আমার ফ্রেন্ড, আমার সিনিয়র, জুনিয়র, সহপাঠী যারা একসাথে আমরা রাজপথে ছিলাম। হয়তো তারা আজকে অনেকেই বেঁচে নেই। তারা বেঁচে নেই কিন্তু তাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা এসে কথা বলতে পারছি। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ সাইয়েদ আবদুল্লাহ।

এখন আমরা দীপক কুমার গোস্বামীর কথা শুনব।

জনাব দীপক কুমার গোস্বামী : আজকে আমাকে আলোচনা করার জন্য ডাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি মনে করি যে, ৫ আগস্ট অভ্যুত্থানে আপাতত একটি অবস্থানে এসেছি। আমরা অভ্যুত্থানে জয়ী হয়েছি। আমি মনে করি যে, আমরা বিপ্লবের পথে হাঁটছি বাংলাদেশ। এটি ৫৩ বছরে একটি বড় অর্জন। বড় অর্জন যে, আমরা অনেকেই কথা বলছি। আমি অভ্যুত্থানের পরবর্তী সময় গত পরশু দিন পর্যন্ত ঢাকার বাইরে অনেকগুলো জেলাতে ঘুরেছি। আমার থিয়েটারের প্রয়োজনে নিজেই ইচ্ছে করে ঘুরেছি। যেমন খুলনা বিভাগের অনেকগুলো জেলায়। এদিকে ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুরসহ বিভিন্ন জেলায় আমি ঘুরেছি এবং চেষ্টা করেছি যে, প্রান্তিক মানুষের যে আশা আকাঙ্ক্ষার কী পরিবর্তন ঘটেছে বা এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে কী চায় বা ৯০ তে অনেকে দেখেছে। অনেকে এখনো বেঁচে আছে যারা '৭১ দেখেছে। ২০২৪ এ এসে তাদের এখনকার আশা আকাঙ্ক্ষার জায়গাগুলো কী রকম? যেটি হয়েছে, এটি প্রথম মনে হয় আমার জ্ঞান সত্যে দেখেছি যে, বাংলাদেশের এত মানুষ সংবিধান শব্দটি উচ্চারণ করছে। কী কারণে? কারণ একটি আলোচনা হচ্ছে যে, সংবিধান সংস্কার হবে না সংবিধান পুনর্লিখন হবে এসবের মধ্যে আলোচনা সভার মধ্যে আছে। সংবিধান কী তারা জানে না। অধিকাংশ লোক সংবিধানে কী আছে না আছে, তারা জানে না। কিন্তু এটি নিয়ে কিছু একটি হচ্ছে। এ রকম একটি বিষয়। এটুকু নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে বলে আমার কাছে মনে হয়। এই এগিয়ে যাওয়া আমার কাছে মনে হয় যে, সমাজের গুটি কয়েক মানুষের সাথে কথা বলেছি। এটি যেমন সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু একেবারে সবার কথাটি কীভাবে শোনা যায় সেই প্রক্রিয়াটি আমার কাছে একটি সাজেশন এ রকম হয় যে, যদি এমন হয় যে, উপজেলা প্রশাসনকে দিয়ে উঠান বৈঠকের মতো সব মানুষের সাথে সংবিধান নিয়ে আলোচনাটি আপনারা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এখান থেকে লিংক করে প্রায় বাংলাদেশের সমস্ত উপজেলা ৪৬০-৭০টি উপজেলাকে উঠান বৈঠক প্রশাসন করছে। আপনারা এখান থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে লিংক করছেন। তাদের সাথে কথাবার্তা বলছেন। এভাবে অন্তত বাংলাদেশের সব জায়গার মানুষের কথা শোনা যায়। যারা না জানে তারাও যদি আলোচনার মধ্যে আসে আমার মনে হয় এটি একটি এগিয়ে যাওয়া হবে। আমি আসলে সংবিধান সম্পর্কে এত কিছু জানি না। অনেকে যেমন সারা বছর সংবিধান নিয়ে পড়াশুনা করেন এবং সংবিধান নিয়ে কাজ করেন। তবুও আমি আমার জায়গা থেকে কথা বলতে আসছি। সবার হয়তো কথা বলার জায়গা আছে। প্রথম হচ্ছে যে, সংস্কার বা পুনর্লিখন। এই নিয়ে যে তর্ক, এই তর্কটি নষ্ট দেয়া জরুরি বলে আমি মনে করি। এই তর্কটাকে একদম ভেনিস

করে দেয়া দরকার। কী রকম?

আমাদের বাড়িটি ইটের বিল্ডিং। আমাদের বাড়িটি যখন ভেঙে পড়ছিল, ওইটি পাকিস্তান আমলে ভিতরে মাটি দিয়ে গাথা দালান ছিল। উপরে প্লাস্টার করা। ওটা ভেঙে যাবে এ রকম একটি অবস্থা। আমার ছোট ভাইরা মিলে বাবা-মাকে প্রস্তাব করলাম যে, এটি ভেঙে নতুন করে বাড়ি করি। এত খরচ। ইত্যাদি ইত্যাদি। এটি আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবার ঝুকি নিবে বা এটি ভেঙে নতুন করে গড়া, এটি কল্পনারও ব্যাপার। এটি কল্পনার বাইরের ব্যাপার। এ ব্যাপারটি কল্পনাও করতে পারছে না। তারা বলল যে, এটি মেরামত করার জন্য। আমরা দুই নটরডেম কলেজে পড়ি। আমার ছোট ভাই স্কুলে পড়ে। আমরা তখন একটু বুঝতে শুরু করেছি। আমার বাবা মার প্রস্তাবে রাজি হলাম যে, ঠিক আছে ভাঙার দরকার নেই। যতটুকু মেরামত করা দরকার ততটুকু মেরামত করা যাক। এর মিস্ত্রি এসে প্লাস্টারে বাড়ি দিল। মাটির ভিতরে উঁইপোকাসহ বিভিন্ন পোকা মাকড় বসবাস করছে। এবার ভাঙতে ভাঙতে সবই ভেঙে ফেলল। আমার কথা হলো যে, বাবা মার সংস্কারের প্রস্তাবেই রাজি হলাম। আপনারাও জনগণের সংস্কারের প্রস্তাবেই রাজি হন। সংস্কার করতে করতে যদি শতভাগই সংস্কার ফেলতে হয়, তাহলে সেটি সমস্যা কী? কতটুকু সংস্কার করা যায় যে, বাড়ি দিয়ে দেখি না দালানটি। সমগ্রা দালানে যদি পুরুটাই পোকা ধরে যায়, পুরুটাই যদি ঘুন ধরে যায়, পুরুটাই যদি মেরামতের দরকার হয়, পুরুটাই মেরামত করি। ওই পুনর্লিখন যে, attacking ব্যাপার হয়ে গেছে। ওই attacking এর জায়গায় যেন না থাকি। ওকে আমরা সংস্কারই করি। পুরুটাই সংস্কার করতে হতে পারে। সে বিষয়ে গোটা বাংলাদেশের মানুষ কথা বলুক। সবাই মিলে সবগুলো সংস্কার চাচ্ছে। সবগুলো দালানই নষ্ট। সবগুলো দালানই পাল্টানো দরকার। সবগুলো সংস্কার করছি। পুনর্লিখন শব্দটি যেহেতু বিবেদ তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এটিকে বন্ধ করার জন্য। আসলে ভাষাতো প্রতি ১০ বছরে বিবর্তিত হয়। আমাদের সংবিধানের যে ভাষা সেটি ১৮০০, ১৯০০ সালের ভাষা দিয়ে লেখা আছে। এটিতো পড়ার জন্য শিক্ষিত মানুষের জন্য টাফ হয়ে গেছে। পড়ে বোঝা। আর যারা কেবল বাংলা শিখছে, তারা কী করে এ কথাগুলো বুঝবে? আমাদের দেশে বিষয়টিকে ধর্ম গ্রন্থের মতো বানিয়ে ফেলা হয়েছে। আমার বাবা কাব্য তীর্থ পাস। সেই সূত্রে আমি কিছুটা সংস্কৃত জানি। সংস্কৃত শব্দে বেশ দখল আছে। আমি বেদের কিছু বুঝি না। উপনিসত কিছুটা বুঝি। কিছুটা বুঝি রবীন্দ্র নাথের কল্যাণে। কিছুটা বুঝি ওটা নিয়ে অনেক লেখালেখি আছে। এ কারণে বুঝি। না হলে অতটা বুঝা যেত না। আমাদের সংবিধানের যে শব্দগুলো এত বেশি দূরবর্তী, গণমানুষের না, গণমানুষের ভাষা না। গণমানুষের ভাষার প্রতিফলন থাকা দরকার। ভাষা যে ১০ বছর পর পর বিবর্তিত হয়, ৫৩ বছরে অনেক দূর বিবর্তিত হয়েছে। দুঃখজনক ৫৩ বছর না।

অনেক কিছু ১৮০০ সালের কথা লেখা আছে। অনেক কিছু ১৯০০ সালের কথা লেখা আছে। ওই ভাষা, ওই শব্দগুলো দিয়ে। ওই শব্দগুলোর পরিবর্তন দরকার। এখানে কথা উঠেছে যে, প্রজাতন্ত্রী। রাজা থাকলে না প্রজা থাকে। রাজাই নাই। আমরা রাজাকে অস্বীকার করছি না। প্রথমেই লেখা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। তার মানে এখানে একজন রাজা আছেন। এই রাজাটাকে আমরাতো চাচ্ছি না। রাজা না থাকার পদ্ধতিটি কী; সেটি দরকার। ক্ষমতা। এমনকি মন্ত্রী শব্দটির সাথে আমার আপত্তি। আকবর বাদশার মন্ত্রী থাকে। বাদশার মন্ত্রী থাকে। সুলতানের মন্ত্রী থাকে। রাজার মন্ত্রী থাকে। মন্ত্রী আবার আধুনিক দেশে কী কথা! মানে মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এ সমস্ত পদগুলো নতুন করে ভাবা দরকার। যাতে করে সেটিকে ক্ষমতা না মনে করে দায়িত্ব মনে করে। মন্ত্রী মানেই ক্ষমতা। মন্ত্রী মানেই কোনো একজন বাদশা। কোনো একজন সুলতান। কোনো একজন রাজার পরবর্তী স্টেকহোল্ডার। যেখানে ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। তাকে ওই পদটির নামই এমন দেয়া দরকার সে যেন বুঝতে পারে যে, আমি সার্ভিস দিতে এসেছি। আমি দায়িত্ব পালন করতে এসেছি। পদের নামের মধ্যে তার মানসিকভাবে ওই বিষয়টি ঢুকে যায়। যখনই জানছে যে, সে মন্ত্রী আমি পাজরো গাড়ি চালাবই নিশ্চিত। মন্ত্রী তো পাজরো গাড়ি ছাড়া আরো বড় বড় রোল রয়েচসহ অন্যান্য গাড়ি চালাবে। আমার গাড়ি বিশেষ শুল্কে আসবে। মানে শুল্ক ছাড় দিয়ে আসবে। এসব ধারণা। এসব ধারণা ভেঙে সে কতটুকু সার্ভিস দিতে পারছে। পদের শব্দের মধ্যেই সমস্যা। বিস্তারিত যখন দায়িত্বে লেখা আছে। সেখানেও ভিষণভাবে শাসন, কর্তৃত্ব এসব ব্যাপারগুলো সংবিধানে যেগুলো, সেই শব্দমালাগুলো পাল্টে দিতে হবে। মাহা মির্জা যেটি বলেছেন আমাদের অধিকাংশ মানুষ শ্রমিক, কৃষক তাদের কথাগুলোই নেই। তারা সংবিধান নিয়ে interestedই না। তারা interested না কেন? তাদের ৫ বছর পর যে একবার ভোট হয়, সেই ভোটটিই তারা ঠিকভাবে দিতে পারছে না। ওই একটি মাত্র পয়েন্ট। আর অনেক অনেক পয়েন্ট তো পরের কথা। ওইটুকুই নিশ্চিত হচ্ছে না। আর সংবিধান তো অনেক দূরের কথা। কীভাবে সমস্ত প্রান্তিক মানুষের মতামত নিয়ে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে।

আমি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা বেশি বলছি। যারা আসলে সংবিধান সম্পর্কে কিছু জানে না। অন্তত জানা জানির প্রক্রিয়াটি শুরু হোক। যেহেতু আমরা ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের পরের সময়ে যাচ্ছি। এর চাইতে ভালো সময় আমাদের হয়তো আসবে আর। এতদিন যারা ক্ষমতা, ক্ষমতা, ক্ষমতা করেছে, সেই লোকগুলো যদি ক্ষমতায় কোনোভাবে চলে আসে তাহলে সমস্ত কিছু যা তা হয়ে যাবে। সাধারণ জনগণকে ভোটের হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু মনে করবে না কখনোই। সেই সুযোগটুকু যদি কাজে লাগানো যায়, সাধারণ মানুষকে

যদি একটু বোঝানো যায় যে, আমরা স্টেকহোল্ডার । আমরা সংবিধানেরও স্টেকহোল্ডার। এটি যদি কোনোভাবে করা যায়। আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজে থিয়েটারের লোক। আমি অবশ্যই মেইল করে দেব। আমি আরেকটু বলেই শেষ করব। শিল্পকলা আইন নিয়ে আমার একটু বলার আছে। শিল্পকলা আইনে যে পরিষদ গঠন হয়, সেই পরিষদ গঠন নিয়ে ২২ ধারার গ তে যেমন লেখা আছে, 'অর্থ, শিক্ষা, তথ্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিববৃন্দ। মানে কারা কারা থাকবেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ছাড়াও আরো অর্থ, শিক্ষা, তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন করে। এরপর 'ঙ' তে আছে 'জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের সভাপতি, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালকবৃন্দ' পদাধিকার বলে। 'চ' তে লেখা আছে, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক।' বাংলাদেশে এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে শিল্পকলা একাডেমি শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক। তার মানে ইনস্টিটিউট অন্য জায়গায় আছে। এগুলো লিখে দিয়েছে। এই বিষয়গুলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাংলাদেশে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নাই। এগুলো সুনির্দিষ্ট করা। 'জ' তে যেমন লেখা আছে যে, ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য পদাধিকার বলে' অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যই হবেন। 'ড' তে লেখা আছে যে, সরকার কর্তৃক মনোনীত সংগীত ব্যক্তি, সরকার কর্তৃক মনোনীত সংগীত নৃত্য। নাকটের ক্ষেত্রে স্বীকৃত ব্যক্তিগণের মধ্যগণের মধ্য হতে একজন করিয়া ৩ জন ব্যক্তি। এই সরকার কর্তৃক মনোনীত জায়গাটি বেশ ঘাপলার জায়গা, এটিকে কীভাবে চেঞ্জ করা যায়। সংগীত শিল্পী, নাট্যকার সরকার কর্তৃক মনোনীত হওয়ার চেষ্টা যে করে। ওই চেষ্টা কীভাবে রহিত করা যায়, আইন দিয়ে। সেটি চেষ্টা করা। আর হচ্ছে যে, একাডেমিক ক্ষমতা ও দায়িত্বের মধ্যে ৩টি জায়গায় আমি specific বলে শেষ করছি। আমি হয়তো সময় বেশি নিয়ে ফেলছি। আমি বিস্তারিত না বলি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হওয়ার পর বাংলাদেশ অনেক লড়াই সংগ্রাম পার করেছে। তারও আগে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসও আমাদের আছে। কিন্তু কোনো না কোনোভাবে আমাদের শিল্পকলা চর্চার সমস্ত কিছু দলীয় একটি এজেন্ডা বাস্তবায়নের জায়গা হয়ে গেছে এবং মুক্তিযুদ্ধ যে বাংলাদেশের সমস্ত জাতি গোষ্ঠীর অর্জন, এটি না শুধু আওয়ামী লীগের অর্জন। এভাবে বলে এবং এক ব্যক্তিকেন্দ্রীক উপসনাকেন্দ্রীক একটি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিল্প সংস্কৃতি চর্চাকে ঢালা হয়েছে একাডেমির দায়িত্ব ও ক্ষমতা যদি পড়া যায়। এটি আসলে কীভাবে গণমানুষের করা যায়। গণমানুষের শিল্প চর্চার ক্ষেত্র করা যায়।

আর একটি বিষয় যোগ করি যে, চলচ্চিত্র বিষয়ে আমার একটু আগ্রহ আছে। আমি নিজেও চলচ্চিত্র অভিনয় করি। Direction দেয়ার চেষ্টা করছি। আমি নিজে dubbing artist ও। শিল্পকলায় লেখা আছে, বিদেশ থেকে চলচ্চিত্র নিয়ে এসে দেখানো। আমাদের দেশে প্রেক্ষাগৃহসমূহে বিদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে চলচ্চিত্র নিয়ে এসে দেখানো। আমরা দেখেছি যে, বেশির ভাগ ভারত থেকে আমদানি করা দেখানো হয়। ওখান থেকে আমদানি করা হয়। অন্যান্য দেশ থেকে কিছু আমদানি করা হয়, সেটি ঢাকায় দেখানো হয়। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় হিন্দি ভাষার চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। আমি মনে করি না যে, কোনো দেশের চলচ্চিত্র আটকে দেয়া দরকার। চলচ্চিত্র আমাদের দেশে আসবে না। এটি পৃথিবীতে করার বাস্তবতাই নেই। এখন নানা রকম দেখবার মাধ্যম আছে। প্রেক্ষাগৃহ বা শিল্পকলা একাডেমি যে সমস্ত পাবলিক space এ সমস্ত জায়গায় গণমানুষের অধিকার কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, সেটিই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল, এক। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, বিভিন্ন ভাষাভাষির চলচ্চিত্র আমাদের দেখা উচিত। শুধু হিন্দি নয় এবং শুধু ইংরেজিও নয়। পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখা উচিত। আমাদের জীবনে সংগ্রাম আছে সেই সংগ্রাম আমরা জাতিগতভাবে যে আকাঙ্ক্ষায় পৌঁছাতে চাই, সে রকম আন্তর্জাতিকভাবে মিল আছে এ রকম। সাউথ কোরিয়া থেকে শুরু করে আফ্রিকা পর্যন্ত, ভুটান থেকে শুরু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা ভাষায় নানা ধরনের চলচ্চিত্র আছে। আমার মনে হয় বাংলাদেশে প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র প্রদর্শন সেটি যে চলচ্চিত্রই হোক। অস্কার বিজয়ের মুভি হোক, সেটি বাংলা ভাষায় ডাবিং করে প্রচার করা উচিত। দুটি কারণে। একটি হচ্ছে অধিকাংশ জনগোষ্ঠী বাংলা ভাষাভাষির। অবদান স্বীকার করেই বলছি ইংরেজি ভাষা বা হিন্দি ভাষার চাইতে বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র দেখানো হলে আমাদের এখানের সব জনগোষ্ঠী অন্তত সরাসরি সেটি communicate করতে পারবে। অন্য কোনো ভাষার চলচ্চিত্র আমাদের এখানে প্রেক্ষাগৃহসমূহে দেখানো যাবে না। এ রকম একটি আইন করে দেয়া উচিত। আমার মনে আমরা নিজেরাই oskar win অনেক movie. online platform এ ডাবিং করে প্রচার করেছি এবং সেটি কোনোভাবেই হলিউড মুভির চেয়ে কম কিছু হয়নি। আর যারা বাণিজ্যিভাবে যেটি সেটি তার quality এর নিচে নামলে তো ছাড় দিবেই না। শুধু হিন্দি ভাষার চলচ্চিত্র। যেটা আগ্রাসন বা আমাদের এখানে সাংস্কৃতিক উপনিবেশ তৈরি করার যে চেষ্টা করে, সেই জায়গা থেকে বের হবার জন্য অবশ্যই পৃথিবীর নানান দেশের চলচ্চিত্র এখানে যেন আসে এবং সেগুলো বাংলা ডাবিং করে প্রেক্ষাগৃহে প্রচার করা হয়। সেটি শুধু বসুন্ধরা সিটিতে নয়। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে প্রত্যেকটি প্রান্তরে বাংলা ভাষায় ডাবিং করে প্রচার করা। আমি মনে করি যে, একাডেমিক শিক্ষা বা স্কুল কলেজের শিক্ষা মানুষ দিয়ে যতটা না শিক্ষিত করা যায়, এই সময় তার চেয়ে অনেক বেশি অর্জন audio, visual মাধ্যম দিয়ে শিক্ষিত করা যায়। আমি মনে করি ভবিষ্যতে পৃথিবীর মানুষ audio, visual মাধ্যমে বড় বড় ডাক্তারসহ বড় বড় professional হয়ে যাবে। আমরা বন্ধুরা গল্প করি যে, এক সময় পৃথিবীতে হয়তো ৫০ কিংবা ১০০ জন লিখতে পারবে যার যার ভাষায় বা কিছু পড়তে পারবে। সবার টেক্স লেখা বা পড়ার দরকার পরবে না। audio, visual দিয়ে মানুষের সব যোগাযোগ করা সম্ভব। এখনই যে সমস্ত audio, visual content পৃথিবীব্যাপী ছড়ানো আছে, সেগুলো দিয়ে।

আমাদের যে নিরক্ষর জনগোষ্ঠী, যাদের আবার নতুন করে একাডেমিক শিক্ষা দেয়া হয়তো আর সম্ভব নয়। তাদেরকে বিনোদন বা এ রকম শিক্ষামূলক কোনো রকম audio, visual content মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় ডাবিং করে যদি গ্রামেগঞ্জে প্রচার করা যায় তাহলে ওই উত্তরণটি ঘটে যাবে।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

জনাব দীপক কুমার গোস্বামী : আমি এক লাইন কথা বলতে পারব একটু।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : জি, বলুন।

জনাব দীপক কুমার গোস্বামী : গণভোট নিয়ে আমার একটু কথা আছে এবং ভোট প্রসঙ্গেই কথা। আমরা বড় আকারে ভোটের আয়োজন করি এবং কোটি কোটি টাকা খরচ হয় আবার আরেকটি ভোটের জন্য যে, এত টাকা খরচ করতে হবে। কত লোকের কাছে মোবাইল ফোন আছে বা নেই, সেটি বিবেচনা করেই বলছি। এটি অনলাইনে বিভিন্নভাবে সরকার সুরক্ষিত গণভোট নিতে পারে প্রায় বিনা খরচে বা খুব স্বল্প খরচে। যেমন ধরেন বিকাশ বা নগদে অর্থনৈতিক transaction হয়, প্রত্যেকটি মানুষ নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে অর্থনৈতিক transaction করতে পারে। ভোটও নিঃসন্দেহে করতে পারবে। আমি ১০ হাজার আমার মতোই বুঝে পাব বিকাশে, সেটি যেমন নিশ্চিত করে। আমি আমার ভোটটি অনলাইনে দিতে পারব, এটি নিশ্চিত করা সম্ভব। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে অনলাইনে গণভোট আয়োজন করার কোনো রকম কিছু ব্যবস্থা। এখন যেহেতু আমরা অনলাইনের যুগে চলে এসেছি। কেউ না কেউ তাকে হেলপ করবে। তার বিশ্বস্ত কেউ। যে হেল্প করতে পারে। আমার ভোট কেউ দিয়ে দিবে। আমি না পারলে। কিন্তু সে তো তার বিশ্বস্ত কাউকে নিবে। যে কোনো বিষয়ে অনলাইনে। আমি সরোয়ার ভাইয়ের সাথে একমত। আমি যদি physically communication এ না যাই। শুধু অনলাইন এবং ওয়েবসাইটে পোল করতে থাকি, সেটিতে কিন্তু আগ্রহ কমতে থাকবে। অবশ্যই সরকার এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগের মধ্যে থাকা উচিত।

সবাইকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : আপনাকে ধন্যবাদ।

বেশ দীর্ঘ সময় ধরে আপনারা আমাদের সাথে থেকেছেন। এ জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের এই বক্তব্যগুলো লিখিতভাবে আমাদের দিন। এ কারণটি আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করি আপনাদেরকে। তাদেরও করেছি আপনাদেরও করছি এ কারণে আপনাদের যে মতামতগুরো এই সময়ের প্রতিনিধিত্ব করছে। আপনারা এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থেকেছেন। আপনাদের মতগুলো তৈরি হয়েছে এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। এগুলো documented হওয়া দরকার। এগুলো ভবিষ্যতে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা হওয়া উচিত। এডভোকেট আরিফ খান বলেছেন যে, 'রেনেসার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমরা।' রেনেসাটি কাগজে কলমে অন্ততপক্ষে ধারণ করি। আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে যতটা পারি বাস্তবায়নের চেষ্টাটি সরকারের। আমরা কেবলমাত্র recommendation দিতে পারব। আমরা সেটি করব। ২৫ তারিখের মধ্যে যদি আমাদের কাছে পৌঁছে দেন, আমাদের জন্য সুবিধা হবে। আপনাদের প্রত্যেকের চিঠিতে একটি ই-মেইল আছে, সেটিতে পাঠান। বিশেষ করে ওয়েবাসাইটে যেটি আছে, সেটি এক জায়গায় যাচ্ছে। আর আপনাদের কাছে যেটি, সেই ই মেইলটি আপনারা ব্যবহার করলে আমাদের জন্য categorized করা এবং বিশ্লেষণ করা সহজ হবে।

আপনারা সময় দিলেন এবং আমাদের সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আমাদের দিয়েছেন, সেগুলো আমরা বিবেচনায় নেব এবং আপনারা অনুমোদন দিলে আমি এখন এই অধিবেশন শেষ করতে চাচ্ছি।

ধন্যবাদ।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

পঞ্চদশ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ: ২৪ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময়: দুপুর ১২.০০ থেকে ২.১৫ পর্যন্ত

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:

১।	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক,	কমিশন প্রধান
২।	অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,	সদস্য
৩।	ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল	সদস্য
৪।	অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,	সদস্য
৫।	ড. শরীফ ভূঁইয়া, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	সদস্য
৬।	ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল	সদস্য
৭।	জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক	সদস্য
৮।	জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ, লেখক	

অংশীজন (ব্যক্তি) এর তালিকা

১। বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ
২। ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
৩। প্রফেসর মঈনুল ইসলাম
৪। নুরুল কবীর
৫। ড. মইনুল ইসলাম
৬। প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দীন খান

কার্যবাহ প্রস্তুতকারক:

মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) :উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাবসমূহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এ আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ, আমি এ কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে, সংবিধানের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তবর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়ে আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে, আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ। কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি, গত ১৬ বছরে বিশেষত, জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকে অংশীজনের এই মতামতের অধিবেশনের শুরুতে আমি কমিশনের পক্ষ থেকে সে সব শহিদদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যরা তাঁদের পরিচয় দিবেন।

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির সক্রিয় অংশীদার এবং সংবিধানের বিভিন্ন পর্যায়ে আপনাদের ভূমিকার কারণে সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা সংক্ষেপে ১২-১৫ মিনিটের মধ্যে বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে আমরা সকলের মতামত শুনতে পাব এবং কিছু বিষয় আলোচনাও করতে পারব। যদি এ বিষয়ে আপনাদের লিখিত কোনো প্রস্তাব থাকে, সেটি যদি পরে আমাদের সরবরাহ করেন, তাহলে সেটি রেকর্ড হিসেবে আমাদের কাজে সহায়ক হবে। এছাড়াও যদি আজকের পরে আপনাদের পক্ষ থেকে কোনও লিখিত প্রস্তাব দেওয়ার সময় এবং সুযোগ হয়, তাহলে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি আগামী ৩০ তারিখের মধ্যে হস্তগত হলে আমাদের কাজে সহায়তা হবে। আমি জানি যে, ব্যস্ততা থাকার কারণে অনেকেরই হয়ত একটু আগে যেতে হবে। তারপরও আজকে আমরা শুরু করব প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীম উদ্দিন খানের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে।

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান (অংশীজন): আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তাদের প্রতি যারা জুলাই-আগস্ট মাসের গণঅভ্যুত্থানে আত্মহুতি দিয়েছেন সংখ্যায় হাজারের বেশি মানুষ।আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যারা অন্ধত্ব এবং পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন, এদের অনেকেই চিকিৎসার অভাবে হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন। তাঁদের আত্মহুতি এবং আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমার এই প্রথম পার্লামেন্টে আসা। সুযোগ কিংবা সৌভাগ্য যেভাবেই দেখি না কেন, সেটি আগে কখনও সম্ভব হয়নি কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা এখানে এসে আজকে উপস্থিত হয়েছি। সেজন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং কমিশনের প্রতিও কৃতজ্ঞতা আমার নাম স্মরণ করার জন্য। শুরুতেই বলি, আমরা যে ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম কিংবা যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম, এর মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংবিধানের অপব্যবহারের মধ্য দিয়ে কিংবা সংবিধানকে একেবারে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে, তাদের বৈধতা নিশ্চিত করার চেষ্টা হয়েছে বিভিন্ন উপায়ে। সে আলোচনায় না যাই। আমি প্রথমেই বলতে চাই, সংবিধানে, বিশেষকরে, পরিচালনার ক্ষেত্রে যে মূলনীতি, সে মূলনীতিতে বোধহয় কিছুটা পরিবর্তন জরুরি। বিশেষকরে, জাতীয়তাবাদকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা; যেটিকে আমি সর্বজনবাদী জাতীয়তাবাদ হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই,সর্বজনবাদী বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, সেভাবে আমি দেখতে চাই। সমাজতন্ত্র শব্দটি নিয়ে যেহেতু আমরা অনেক রকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছি এবং গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রেও এটি সর্বজনবাদী হয়ে উঠতে পারেনি, সেজন্য আমার মনে হয়, সাম্য ও সর্বকল্যাণতন্ত্রে আমরা যেতে পারি কীনা? একইসাথে গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ইস্যুটি বিতর্ক তৈরি করেছে এবং এ ধর্মনিরপেক্ষতার বঙ্গানুবাদ যেভাবে হয়েছে, যেভাবে প্রচলিত হয়েছে, আলোচিত হয়েছে, সেটি অনেক রকম সেনসেটিভিটি তৈরি করেছে। যখন আমরা সর্বজনবাদী জাতীয়তাবাদ বলছি, তখন ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি গৌণ হয়ে যায়। যার কারণে আমার মনে হয় না, এটি এ মুহূর্তে খুব প্রয়োজনীয় একটি শব্দ। একইভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি এসেছে। যেহেতু আমরা সর্বজনবাদীতার কথা বলছি, এখানে সংবিধান কর্তৃক সর্বজনের পরিচয় স্বীকৃতি দেওয়া। সব ধরণের জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতি যাতে এই সংবিধান নিশ্চিত করে, সে আবেদন আমার পক্ষ থেকে থাকছে। ঠিক একইভাবে, আমরা যদি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির দিকে আসি, সেখানে ১৮(১)-এ বিপদজনক কিছু বিষয় আছে, সেটি মানুষের জন্য, বিশেষ করে কারো যদি রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি থাকে, তাহলে সেগুলোকে ব্যবহারের সুযোগ থাকে। যেমন–জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন। এটুকুই বোধহয় যথেষ্ট। এর পরের অংশে যা আছে, সেটি খুবই বিপদজনক। কারণ এতে রাজনৈতিকভাবে অপব্যবহারের একটি সুযোগ তৈরি হয়। পরের অংশটি আমি পড়ছি। বিশেষত আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধও প্রয়োজন ব্যতীত মদ ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রথম অংশের মধ্য দিয়েই সবকিছু নিশ্চিত হয়ে যায়। পরের অংশে এ রকম বর্ণনা থাকলে এখানে রাজনৈতিক অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়। সে কারণে এটুকু

পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। ঠিক একইভাবে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ উন্নয়নের কথা বলছি। সেখানে জীববৈচিত্র অনেকটাই western sustainable development-কে incorporate করা হয়েছে কিন্তু এর মধ্যে নদী নেই, সমুদ্র নেই, পাহাড় নেই। যার ফলে এটিকে অন্যভাবে replace করা; যেটি আমাদের নিজস্ব প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিবে। এক্ষেত্রে 'প্রাণ-প্রকৃতির কল্যাণ' শব্দটি এখানে ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করা। ঠিক একইভাবে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণের কথা বলছে, এর সাথে প্রতিবন্ধি নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা খুব জরুরি, যেটি হচ্ছে ১৯ (৩)। আমি খুব দ্রুত যাব। ২৩-এ রাষ্ট্র জনগণের না বলে, রাষ্ট্র সকল জনগোষ্ঠীর। রাষ্ট্র জনগণের বললে, কিছু বিপদ তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র সকল জনগোষ্ঠীর হবে। আমাদের ২৩ অনুচ্ছেদ যদি দেখি, তাহলে সেখানেও এটি আসতে পারে। ঠিক একইভাবে ২৩ (ক) নতুনভাবে বিবেচনা করা খুব জরুরি। বিশেষকরে, সকল জনগোষ্ঠীর একটি একক রাষ্ট্রীয় পরিচয়, সেটি হচ্ছে, বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা; এ ধরণের শব্দ পরিহার করা দরকার। কারণ এ ধরণের শব্দের মধ্য দিয়ে আরেকটি জাতির মনবলকে ধ্বংস করে দেওয়া ছাড়া আর কিছু হয় না। যেহেতু আমি প্রথমেই বলেছি, আমাদের প্রিন্সিপাল হওয়া উচিত সর্বজনবাদীতা। সে ক্ষেত্রে সর্বজন রাষ্ট্রের সবাই নাগরিক। এটি নিশ্চিত করা জরুরি। ঠিক একইভাবে অনুচ্ছেদ-৩০। ৮৮ সালে যে পরিবর্তনটি হয়েছিল, রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনও নাগরিক কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোনো খেতাব–এই ধরণের অনুচ্ছেদ খুবই অপ্রয়োজনীয়। যে কোনও রাষ্ট্র, বাংলাদেশের যে কোনও নাগরিককে খেতাব দিতে পারে। এটি রাষ্ট্রের জন্যও গৌরবের, যদি না এটি কোনও ষড়যন্ত্রের অংশ হয়ে থাকে। ঠিক একইভাবে, ৩২ এ যেটি আছে, সেটি হচ্ছে, ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে মত প্রকাশের স্বাধীনতা যুক্ত করা। এটি নিশ্চিত করতে হবে। আমি বলছি, এমন একটি অংশ থাকতে পারে। বিদ্বেষপ্রসূত ঘৃণা এবং প্রতিহিংসা ছড়ানো যাবে না। আমরা এই মুহূর্তে যেটি দেখছি যে, অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে। ৩৩ এর ৩ (খ) এর কোনও প্রয়োজন নেই। এটিকে বাতিল করা যেতে পারে। যেহেতু এটি আর থাকছে না, তাই ৩৩ এর ৪, ৫ এর আর প্রয়োজন হচ্ছে না। এগুলোও বাতিল করা যেতে পারে। সম্পত্তির অধিকার বলে আরেকটি আলোচনা আছে অনুচ্ছেদ ৪২ এ। রাষ্ট্রের দিক থেকে সংবিধানে খুবই বিপদজনক কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যেটি দখলদারিত্বকে আরও উৎসাহিত করে। এর মধ্যে এই শব্দটি আছে যে, দখল–এই অনুচ্ছেদের ১ দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্বকরণ বা দখলের বিধান করা যাইবে। রাষ্ট্রে এ ধরণের শব্দের ব্যবহার দখলদারিত্বকে বৈধতা দেয় এবং এ ধরণের শব্দ পরিহার করা জরুরি। সেটিকে আমরা রাষ্ট্রায়াধীন বলতে পারি কিংবা রাষ্ট্রের কোনও প্রয়োজনে কোনও সম্পত্তির গ্রহণ আমরা বলতে পারি। ঠিক একইভাবে ৪৩ এ আরেকটি আলোচনা আছে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় জনশৃঙ্খলা। এর সাথে যুক্ত হয়েছে জনসাধারণের নৈতিকতা। এই নৈতিকতা শব্দটি রাজনৈতিকভাবে দুষ্টামির জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এই নৈতিকতার সংজ্ঞা কে দিবে এবং কোনটাকে নৈতিকতা বলা হবে, সেটি সুস্পষ্ট নয়। যার ফলে এখানে রাজনৈতিক অপপ্রয়োগ হতে পারে। সে কারণে আমার মনে হয়, শব্দটি পরিহার করা কখনো কখনো জরুরি। ৪৪ এর ২ আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। এটিকে বিলোপ করা যেতে পারে। একইভাবে ৪৫ এবং ৪৬ এর যে দায়মুক্তি আইন, দায়মুক্তি বিধানের ক্ষমতা এবং শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন; এগুলো আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে আরও ঝুটকিতে ফেলে দেয়। এগুলো পুনর্বিবেচনা খুব জরুরি। রাষ্ট্রপতির ভূমিকার ক্ষেত্রে আমরা যদি ৪৮ এর ৩ দেখি, সেটি নিয়েও আমাদের ভাবনার প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি তাহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন। এটি খুবই অপ্রয়োজনীয় এবং এ ধরণের অনুচ্ছেদ প্রধানমন্ত্রীকে একচ্ছত্রভাবে শক্তিশালী করে তুলে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার আছে। সেটিও পুনর্বিবেচনা জরুরি। এই অনুচ্ছেদটিকে আরও কীভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, সেটি নিয়েও আমাদের ভাবনা দরকার। একইভাবে রাষ্ট্রপতির পদশূন্য হলে যে আলোচনাটি আছে, আমি যখন লিখিত দেব, তখন বিকল্প কি হতে পারে, সেটি আমি জানিয়ে দেব। তবে এটি আমাদের পুনর্বিবেচনা করা দরকার। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হতে পারবেন, আমরা যদি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যাই, সেটিও স্পষ্ট করা দরকার। যে কোনও পর্যায়ে দুই বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হতে পারবেন না। সেটি পরপর হোক কিংবা গ্যাপ দিয়ে হোক, কখনও দুই বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হওয়া যাবে না। যখন কেউ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পাবেন, তখন তিনি দলীয় সর্বোচ্চ পদের দায়িত্বে থাকতে পারবেন না। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য, তিনি দলীয় সদস্য হিসেবে থাকতে পারবেন। একই কথা প্রযোজ্য, স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের ক্ষেত্রেও। প্রধানমন্ত্রী যদি তাঁর মন্ত্রিসভায় পরিবর্তন আনতে চান, যারা মন্ত্রী হচ্ছেন, তারা কী যোগ্যতায় মন্ত্রী হচ্ছেন, সেটির বর্ণনা থাকতে হবে। কাউকে যদি মন্ত্রিসভা থেকে সরাতে হয়, সুনির্দিষ্ট কারণ বর্ণনা ছাড়া নতুন কাউকে মন্ত্রী নিয়োগ দিলে কী যোগ্যতায় তাকে মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ দিচ্ছেন, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে তিনি ওই দায়িত্ব নিতে পারবেন। একইভাবে যে বিষয়টি আলোচনায় এসেছে যে, সংসদ ভাঙ্গার পর সহজভাবে একটি অদলীয় উপদেষ্টা সরকার। আমি নির্দলীয় বলছি না। কারণ নির্দলীয় শব্দটি নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। বরং আমি অদলীয় বলতে চাই। অদলীয় একটি উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচনিব্যবস্থা এবং সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করবেন। পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে দুই কক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট আমার পক্ষ থেকে সাজেশন। তবে উচ্চ কক্ষের প্রতিনিধিত্ব অঞ্চলভিত্তিক করা যায় কিনা? চারটি অঞ্চল থাকবে। মধ্যাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল এবং পার্বত্যঞ্চল। সেখানে অঞ্চলভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব একই সাথে পেশাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে এবং থাকতে পারে নারী পুরুষের

সমান প্রতিনিধিত্ব। আমি মনে করি, যদি ৮০ জন উচ্চকক্ষের সদস্য হন, সেখানে ৪০ জন নারী এবং ৪০ জন পুরুষ থাকবেন এবং প্রতি অঞ্চল থেকে দুই জন; একজন নারী এবং একজন পুরুষ নির্বাচিত হতে পারেন। এটি হচ্ছে, আপাতত একটি প্রস্তাব। পার্লামেন্ট ইলেকশনের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের সংখ্যা আমাদের জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অনুপাতে নিশ্চিত করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ৬৭-তে সংসদ অনুমতি না লইয়া তিনি একাধিক্রমে ৯০ বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন, তার সংসদ পদ বাতিলের ক্ষেত্রে; সেটিও কমিয়ে আনা জরুরি। সেটি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। ৭০ এর ক্ষেত্রে বিশেষকরে, পার্লামেন্টে তার পার্টির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। কেউ যদি সদস্য পদ হারায়, তাহলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পার্লামেন্টে কার্যকর থাকবেন। কেননা পার্টির সমর্থন হারালেও জনসমর্থন থাকতে পারে। নতুন ব্যবস্থায় সেটির স্বীকৃতি থাকা উচিত। ৭৮ এ যেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, সংসদ এবং আদালতের সম্পর্কের ইস্যুটি, সেখানে আমার আরেকটি আইডিয়া হচ্ছে যে, সংসদ-সদস্যরা কেবিনেটে থাকতে পারবেন না। কেবিনেটে যারা থাকবেন, তারা সংসদ-সদস্য হতে পারবেন না। কারণ সংসদ সদস্যরা lawmaker. lawmaker-রা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবেন, যারা কেবিনেটে থাকবেন। কেবিনেটে যারা থাকবেন তারা সংসদ-সদস্য হতে পারবেন না। সংসদ সদস্যরা কেবিনেটে যারা থাকবেন, তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবেন। ৭৮ এ যেটি আছে, আদালতের সাথে সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোনও আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। তবে এখানে আমার একটু ভিন্নতা আছে। সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলে, যদি সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এ প্রশ্ন আমার যে কোনও জায়গায় তুলতে পারা উচিত। না হলে, গণতান্ত্রিক সংবিধান কীভাবে হবে? এই হচ্ছে মোটামুটি আমার এই মুহূর্তের ভাবনাগুলো। পরবর্তীতে যদি মনে হয়, আমি আমার ভাবনা কাজে লাগাতে পারি, আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি, আমি প্রস্তুত। লিখিত বক্তব্য পাঠিয়ে দেব। ধন্যবাদ সবাইকে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) :ধন্যবাদ, অধ্যাপক তানজীমউদ্দীন খান।

এখানে সকল বক্তব্য আমরা রেকর্ড করছি এবং সেগুলোর transcribe করব। কিন্তু আপনাদের লিখিত বক্তব্য ৩০ তারিখের মধ্যে পৌঁছালে আমাদের কাজ সহজতর হবে। আমি এখন অনুরোধ করব বিচারপতি আব্দুর রউফকে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য।

বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ (অংশীজন): বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুল্লিাহ।

কমিশনের সবাইকে ধন্যবাদ, মুবারকবাদ ও শুভেচ্ছা।

প্রফেসর মান্নান অনেক সুদুরপ্রসারী চিন্তা করে কতগুলো কথা তুলেছেন। এগুলো দরকার আছে। বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট নিয়ে চিন্তা করলে কথা বলা এখন খুব অসুবিধাজনক। সংবিধানের উপর কতগুলো কেস সুপ্রিম কোর্টে pending আছে। কী হবে, god knows. কে কি দিবেন? কারণ দীর্ঘদিন যাবত একটি জিনিস প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, অনেকে freestyle-এ কথা বলছেন। ঠিক একইভাবে freestyle-এ কাজকর্ম করে যাচ্ছেন। যার জন্য আজকে এগুলো পুঞ্জীভূত হয়েছে। আমি যেটি মনে করি, বাংলাদেশের সবচেয়ে সমস্যা we have got only one problem and indiscipline is the problem.এই indiscipline-কে discipline-এ যদি না নেওয়া যায়, আমরা সংবিধান যতভাবেই লিখি না কেন; অন্য যা কিছু করি না কেন, সেগুলো আমাদের খুব একটা দানা বাঁধবে না। বাংলাদেশ সম্পর্কে বাংলাদেশিদের জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে অপ্রতুল। বাংলাদেশ কী?

বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়, আমি বাইরে গেলে অনেকে প্রশ্ন করেন যে, তোমরা ঘুমানোর জায়গা পাও কী করে? আমি ওদেরকে বলি, now we are practicing three shifts sleeping but we are thinking of the fourth one.আট ঘন্টা ঘুমাতাম, ছয় ঘন্টা ঘুমাব। কিন্তু বাংলাদেশের যে সমৃদ্ধতা রয়েছে, সেটিও তার সঙ্গে চিন্তা করা দরকার। মাটির নিচে কী আছে, জানি না; এখনও বের করতে পারিনি। উপরে যেটুকু আছে, সেটুকু ভালো করে চিনতে হবে। একটি লাউ গাছের গোড়া কত স্কোয়ার ইঞ্চি দখল করে, তার ফলন বাড়ানোর জন্য যদি পুকুর পাড়ে গাছটি লাগানো হয়, পুকুরের উপর মাচা করে দেওয়া হয়, সেখানে ২০০/২৫০ জন্মে। এই productivity এটি পৃথিবী সব জায়গায় পাওয়া যাবে না। কারণ বাংলাদেশ হয়েছে life centered country. light air and water-এর proper distribution আছে। এখানে জীবন বাড়বে। জীবনধর্মী কর্মকাণ্ড চলবে। মশাও বাড়বে, মানুষও বাড়বে। স্রষ্টা একটি ecological balance-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ মশার লার্ভাগুলোকে খাওয়ার জন্য ছোট ছোট মাছ করে দিয়েছেন, ব্যাঙ করে দিয়েছেন, সাপ করে দিয়েছেন। তাদেরকে আরেকজনে খেয়ে বাঁচে। কাজেই এই balance তারা রক্ষা করছে। সেভাবে তারা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এগুলোকেও চিন্তার মধ্যে আনতে হবে যে, আমাদের কী আছে? চারদিক থেকে চিন্তা করলে যেটি দেখা যায় যে, এই indiscipline এক দিনের নয়। বিগত ৫০ বছরের পুঞ্জীভূত সমস্তকিছু এর সঙ্গে জড়িত হয়েছে। কারণ ১৯৭১ সালে যার বয়স ১০ ছিল he is now the senior citizen, leading citizen of the country. তিনি ইউনিভার্সিটিতে পাড়াচ্ছেন, তিনি বিজনেস ম্যাগনেট, তিনি পলিটিশিয়ান what not everything. কিন্তু তার বয়স যখন ১৮ হলো, ১৯৭৮ এ যখন সে বুঝতে শিখল, তখন সে শিখেছে দেখেছে শুনেছে যে, তার সিনিয়র

একজন বলছেন যে, আমার অঞ্চলে বিড়ি সিগারেট বিক্রি করবা, আর আমাকে ওই বিড়ি সিগারেট পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হবে? তা হবে না। আমার অঞ্চলে দোকানদারি করতে হলে আমাকে দিয়েই খেতে হবে। That is an understanding. এখনও যেটি দেখা যাচ্ছে যে, একই প্যাটার্নে প্রায় চলছে। এটি সমস্যা। politician আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার ৯১ বছর বয়স। second world war-এর কিছুটা ধাচ পেয়েছিলাম। তারপর বাকি যেগুলো হয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে মোটামুটিভাবে সম্পৃক্ততা হয়েছিল। এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না যে, তাদের ভিতরে চিন্তার কোনও পরিবর্তন এসেছে। নতুন politician গড়ে উঠছে, সেটিও আমার চোখে পড়ছে না। politician গড়ে তুলতে যে পরিবেশ দেওয়া দরকার, সে পরিবেশ আমরা দিতে পারিনি। তারপরেও কথা হয়েছে, যারা নাকি politics করছেন, তাদের মন থেকে কিছু কথা বেড়িয়ে আসছে। তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গ যারা আছেন, তারা বলছেন, চড়ে খাও। দেখেও না দেখার ভান করব। তবে ডাক দিয়ে প্রয়োজনে অস্ত্র নিয়ে চলে আসবে। যদি না আসো, জেলখানায় পুরে দেব। that is a trend of politics.শুধু তাই নয়, এখন যেটি দেখা যাচ্ছে young generation বা তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গ যারা আছে, যে চাঁদা তোলাটাই মূল politics. সংস্কারের জন্য কথা হয়েছে। সংগ্রাম হয়েছে, প্রয়োজন আছে, সেটিও সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু তাড়াহুড়া হচ্ছে যে, ইলেকশন তাড়াতাড়ি করো। ইলেকশন তাড়াতাড়ি যে করবেন, কারণটা কী? কারণ হচ্ছে, ভোট যেদিন পারেন করেন কিন্তু আগে একটি declaration দেন যেন আমরা ভালোভাবে চাঁদা তুলতে পারি। এই একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যেটি সংঘাতিক। এটাকে কী করে দমানো যায় সেটিও চিন্তা করতে হবে।

শুধু সংবিধান rewrite করলেই যে একটি কিছু হয়ে যাবে, তা কিন্তু কথা নয়। কারণ আমার নিজের experience বলছে, আমি ২০ বছর প্র্যাকটিস করেছি ঢাকা হাইকোর্ট, পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট, দেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট। ২০ বছর পর আবার প্রায় ২০ বছর জজিয়তি করেছি। তার মধ্যে সাড়ে চার বছর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। এসব করতে গিয়ে যেগুলো হয়েছে একবার ১৯৭৪ সালের কথা মনে আছে, ভাসানী এবং অন্যান্যরা পল্টনে মিটিং ডাকলেই ১৪৪ জারি করে দেয়। কয়েকবার ১৪৪ জারি হয়েছে, মিটিং করতে দেয়নি। এরপর আরেকটি মিটিং যখন ডেকেছে, তখন দেখা গেল আরেকটি ১৪৪ দেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে একটি কেস করব। আমি কেস একটি করে দিলাম। আমার সঙ্গে ডা. আলীমুর রাজী আছেন, আতাউর রহমান খান আছেন, কেস করে আমি বললাম যে, দেখ একটি basic rights-কে বারেবারে এভাবে নেওয়া ঠিক হবে না। fortunately high courts sides decision of 1872 of calcutta high court. calcutta high court-এ একটি কেস হয়েছিল জামালপুরে দুই জমিদারের মধ্যে মঙ্গলবার হাট বসানো নিয়ে ঝামেলা। সেখানে জামালপুরের ইউরোপিয়ান এসডিও তখন ১৪৪ তার প্রভিশন ছিল ৫১৮ সিপিসি, সিআরপিসি একসঙ্গে merge করার জন্য। সে কেস হওয়ার পরে একটি civil suit হয়। civil suit কলকাতা হাইকোর্টে যায়। তখন একটি ফুল বেঞ্চ তৈরি হয়। ১৮৭২ সালে judgements দেওয়া হয়। সেখানে একটি observation দিয়েছিল। The majesty of India especially in the law summary many of imposing restrictions over the civil rights of the subject. এ civil rights of the subject কথাটি এসেছে। আমি সেটিই বললাম কোর্টকে। আমারই সিনিয়র ছিলেন দেবেশ ভট্টাচার্য, দেবপ্রিয়ের বাবা। তারপর আব্দুর রহমান চৌধুরীও ছিলেন। আমি বললাম যে, ১০২ বছর পর আমি এই ডিসিশন sign করছি। ১০২ বছর পর আগে যখন প্রজার রাজা ছিল, কোনও rights বলতে কিছু ছিল না। তখন ইউরোপিয়ান জাজরা একটি civil rights-এর recognition দিয়েছিল যে এটির civil rights আছে। এতদিন পরে আমরা সংবিধান লিখেছি, অনেককিছু করেছি, rights এনেছি, satisfied না। fundamental rights করেছি। we cloth it with golden clothes keep it intact. We are so much intelligent. We have put a wooden facial not value more than taka three at then of the literate megistrate. তাহলে এটি করে আমাদের কী হলো? ১০০ বছরে আমরা কী ডেভেলপ করতে পারলাম! কাজেই constitutional development mental development-এর সাথে merge করে এটাকে করবে। আমরা সেভাবে নাগরিকদের trainup করতে পারিনি। আমাদের education system সেভাবে গড়ে ওঠেনি। কাজেই সবকিছু মিলিয়ে আমার কথা হচ্ছে, constitution-কে বদলাতে হলে, change করতে হলে, rewrite করতে হলে, amend করতে হলে কতগুলো endress আছে। কোর্টে কতগুলো কেস আছে। কী হবে god knows. চট করে কিছু বলা মুশকিল। কারণ জাজরা যারা আছেন, তারাও আমার মতো বয়স্ক নন। বয়স্ক হলে একটু ঠান্ডা থাকে। এখন তারা অনেক ক্ষেত্রে গরম হয়ে যান কথাবার্তায়। আগে যারা ছিলেন, তাদের ঠিক এরকম দেখেছি। সবচেয়ে বড় কাজ যেটি i crave your kind indulgence to maintaining. সিস্টেম একটি superior court maintain করতে একটি নেশনের জন্য virtually maintaining a white elephant. একজন জাজের পেছনে গড়ে প্রতিমাসে ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা খরচ হয়। এখন এর আউটপুট কী আসলো?

এই যে খরচ হচ্ছে, কেন এই institution-টি maintain করা হয়? maintain করা হয় একটি মাত্র কারণে। কারণ এই কোর্ট থেকে যে অর্ডারটি তেতুলিয়াতে যায়, সেই অর্ডার টেকনাফেও যায়। তখন তেলুলিয়া, টেকনাফের লোকজন মনে করে আমরা একটি দেশের নাগরিক। executive order depends up on the particular circumstances of particular area. তাতে এক দেশের নাগরিক

হিসেবে মনে করার কোনও কারণ থাকে না। একত্রে থাকার জন্য দেশটিকে একসঙ্গে সুষম অবস্থায় রাখা জন্য এই white elephant-কে maintainকরা হয়। মাঝে মাঝে অনেকেই আসেন। এরশাদের সময় এসেছিলেন, বাড়ির কাছে কোর্ট নেওয়া। বাড়ির কাছে কোর্ট নেওয়ার যে চিন্তা, এটি ছিল সাংঘাতিক খারাপ চিন্তা। খারাপ চিন্তা এজন্য যে, মানুষ পৃথিবীতে আসার পর থেকেই খুনোখুনি হয়েছে। খুনের পরিবর্তে অলিখিত খুনের আইনও হয়েছে। লিখিত খুনের আইনও হয়েছে। তাকে কী খুন বন্ধ হচ্ছে? they are the disease. কাছাকাছি কোর্ট আনলে কী হয়? এর একটি উদাহরণ দেই, please don't mind, i beg to the excuse. বাবা যে ঘরটা করে গেছে, সে ঘরের বাইরে আর কোনও জায়গা নেই। চার ভাই। চার ভাই সেটিকে বন্টন করে নিয়েছেন। চার জায়গা থেকে তারা বিয়ে করেছে এবং তাদের মধ্যে খুব একটা সৌহাদ্য নেই। একজন আরেক জনের সাথে কথা বলে না। চার জনের চারটি রান্নাঘর। একজনের ঘরে আগুন লাগলে বাকিরা সবাই মিলে নিভাতে যায়। কারণ ওরটা পুড়ে আমারটা পুড়বে। তারা হয়ত মুরগি পালন করছে। সকাল বেলা ঘর খুললে এর মুরগি আরেকজনের ঘরে যাচ্ছে। বাচ্চারা তাড়াতে গিয়ে হয়ত কোনও মুরগির ঠ্যাং ভেঙ্গে দিল। কতক্ষণ ঝগড়াঝাটি হলো। বাড়ির কাছে কোর্ট থাকলে এক টাউট এসে বলবে, মামলা কর। মামলা করলে কী হবে? হয়ত ৫০ টাকা জরিমানা হবে। সারা জীবন কেয়ামত পর্যন্ত বলবে, তোর বাবা কিংবা তোর দাদা আমার দাদার অ্যাগেইস্টে মামলা করেছিল। কেয়ামত পর্যন্ত আপোষ নেই। ইন্টিগ্রেটেড এফোর্ডকে একেবারে smash করে দেওয়া। সেটি তো এ দেশ নয়। কাজেই দেশকে নিয়ে ধরে রাখতে হবে। নানানভাবে নানান অবস্থায় দেশ আছে। সবগুলো চিন্তা করতে হবে। হিলে কিছু এলাকায় সমস্যা হচ্ছে। কারণ ১৯৯৩ সালে I adviced this our prime minister। Hill Tracts নিয়ে আপনি কিছু করেন। ওপেন রেখে খুব একটা শান্তিতে থাকতে পারবেন না। কারণ troubles হবে। কারণ ওখানে international politics আছে। সেভেন সিস্টার প্লাস এলাকা নিয়ে একটি christian state করো। christian state-এ sea entry পায় না। সেজন্য বাংলাদেশের ভিতরে ফেনী দিয়ে ফেনী রিভারকে টার্গেট করে তারা এদিক দিয়ে নিবে এমন একটি পরিকল্পনা আছে; যাতে করে বাংলাদেশের একটি mejor অংশ হয়ত বাইরে চলেও যেতে পারে। এগুলোকে মাথায় রাখতে হবে। মাথায় রেখে চিন্তা করতে হবে, ছোট্ট বাংলাদেশকে পরিবহন করতে হলে যেগুলো দরকার। বাংলাদেশ constitution এবং বাংলাদেশ নিয়ে আরেকটি জিনিস মনে রাখতে হবে, কারণ এরিয়াল সার্ভে থেকে যে রিপোর্ট আসছে, সে রিপোর্টে দেখা যায়, আগামী ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে total bay of bengal will come up as land. এটিকে ইন্ডিয়ান কর্মকাণ্ড তরান্বিত করেছে। যে রিভারগুলো আছে, তার প্রায় ৫ হাজার ফুট উপর থেকে পানি পড়ে। সে পানিগুলো এখানে এসে শক্তি অর্জন করে, স্রোত হয়। এখানকার gerbage ফেলার মতো কোনও জায়গা নেই। রিভারগুলো gerbage carry করে। স্রোত থাকার কারনে ইন্ডিয়ান ওশানে নিয়ে ফেলে দিত। এখন বাঁধ দিয়ে রিভারগুলোকে প্রায় স্থবির করে দেওয়া হয়েছে। এখানকার gerbage যেটি আছে, deposition per second bay of Bengal-এ deposit হচ্ছে, billions and billions tons. আমি অনেক জায়গায় চেষ্টা করেছি, প্রাইভেট ইউনিভার্সিগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল, পাবলিক ইউনিভার্সিগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগের সূত্র রয়েছে।

তাদের request করে বলি, দেশটাকে ভবিষ্যতে গড়তে হলে oceanology সাবজেক্টাকে এনে তোমরা একটু চেষ্টা কর। কিছু ম্যানপাওয়ার তৈরি কর। না হলে, তারা কীভাবে এটি করবে? এই দৃষ্টিকোণগুলো আমাদের আগামী দিনের জন্য, আজকের যে young generation সংগ্রাম করল, তাদের frustration-এর মধ্যে যেন পড়তে না হয়। আমার চোখের সামনে যেটি ভেসে উঠছে, frustration-এতাঁরা পড়তে বাধ্য। কারণ আমি তাদেরকে চাকুরি দিতে পারব না। আমি সেভাবে গড়ে তুলিনি। তাহলে তাদের economic celebration-এর জন্য কী করতে হবে? social disorder-টাকে order-এ আনতে হলে, তাকে কাজে লাগাতে হবে। তাদের সেভাবে দিতে হবে। কাজেই আমি যেভাবে চিন্তা করি না কেন, democracy ছাড়া আমার অন্য কোনও রাস্তা নেই। কোন democracy? Bangladeshi democracy not the European democracy,not the American democracy. Bangladeshi democracy আনতে হবে। সেটি আনতে হলে পরে first principle of democracy, যেটি আমরা কন্সটিটিউশনেও বলেছি যে, জনগণ হলো দেশের মালিক। কিন্তু ভোটটি আমরা কেউ জনগণের কাছে দিতে রাজী নই। I tell everybody frankly. I have a bitter experience A as a chief election commissioner for four and half years. i had tried my best in ১৯৭৪, ১৯৯৪। আমি সেজন্য একটি প্রজেক্ট দিয়েছিলাম। ফিল্ড ওয়ার্ক করেছিলাম। দুইটি জায়গায় ইলেকশন করিয়েছিলাম। ভোটারদেরকে দিয়ে ভোটার ইলেকশন। ভোটাররা ইলেকশন চালাবে। ভোটাররা ভোটার রেজিস্ট্রেশন esure করবে। সবকিছু ভোটাররা করুক কারণ এটি তাদের দায়িত্ব। তাদের সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। দুইটি জায়গায়ই খুব ফেয়ার ইলেকশন হয়েছিল। আমি কোনও পুলিশ নেইনি, ম্যাজিস্ট্রেট নেইনি। আবার administrative offices they are very much against it. কারণ ইলেকশন তার হাত থেকে ছুটে যাবে। এটি তারা সহ্য করতে পারেন না। কেন পারে না, সেটিরও নানান কারণ আছে। আমি ফান্ড করে দিয়ে আসলাম। সাড়ে তিনশত কোটি টাকা sanction করিয়ে দিয়ে আসলাম, সাড়ে ৬০০ কোটি টাকার প্রজেক্ট ছিল। তারপর পোস্ট দিয়ে রেখে আসলাম। কিন্তু সবগুলোই বৃথা গেল। আজকে ইলেকশন কমিশনে গিয়ে ওই প্রজেক্টের

একটি কাগজও পাওয়া যায় না। কারণ দুই এক জন পিএইচডি করতে গিয়েছেন। ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত আমার কাছে এসেছিল। আমি বললাম দেখ, এ রকম ফাইল আছে। তোমরা দেখ, ওখানে কী করা যেতে পারে। এসে আবার বলল যে, স্যার একটি কাগজও নেই ইলেকশন কমিশনে। এটি হলে আমি যতই সংস্কার করে দেই না কেন, সে সংস্কার দানা বাধবে না। কাজেই আমার রিকুয়েস্ট থাকবে, subject to the decision given by the courts so far caretaker government, so far other thing. কতগুলো রিট, কতগুলো আপিল রিভিউ pending রয়েছে। সে রিভিউগুলোর কী ফল আসবে, এখনও আমি অনুমান করতে পারছি না। কারণ আমাদের সময়ে আমার সময়ে যে রকম কোর্ট রেখে এসেছিলাম, আজকে ২৫ বছর আমি রিটায়ার করেছি। ২৫ বছর পরে যখন যাই, কোর্টের দিকে যখন যাই, তখন খুব খারাপ লাগে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) :সময়ের বিবেচনা করে যদি একটু সংক্ষেপে...। আমরা আবার আপনার কাছে আসব।

বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ (অংশীজন) : আমার request হচ্ছে, আমরা যা কিছু করি না কেন, পূর্বাপর অবস্থা বুঝে, আমাদের population measure করে, পপুলেশনের যে প্রয়োজন, যে তাগিদ, সেগুলো কঠিন না করে যতটা সোজা পারেন। অর্থাৎ নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সরলীকরণ। সবেচেয় বড় কথা হলো, পলিটিক্যাল পার্টিকে যদি আমরা democratization scale-এর মধ্যে ফেলতে না পারি, পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে যদি democracy না থাকে, তাহলে আমাদের এখানে democracy আসবে না। এটি আনার জন্য আইনে যে পরিবর্তনের দরকার, আইনের সে পরিবর্তন করতে হবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ(কমিশন প্রধান) : অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আমি এখন যাব ড. মইনুল ইসলামের কাছে। স্যার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজকে সকালে এসেছেন। প্রথমত কমিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ যে আপনি এ আলোচনায় অংশ নেয়ার জন্য ঢাকা এসেছেন। অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম।

অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম (অংশীজন) :ধন্যবাদ, প্রফেসর আলী রীয়াজ।

প্রফেসর আলী রীয়াজের আমন্ত্রণ আমি পেয়েছি ২১ তারিখ। তার সাথে আমার দু-একবার দেখা হয়েছে। আমরা একসাথে একটি বইও লিখেছি। অতএব পরিচিতি আছে। আমি ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলাম। তারপর আমাকে দুই বছরের জন্য ইউজিসি প্রফেসর করা হয়েছিল। সেটি ২০১৮ সালের জুন মাসে শেষ হওয়ার পর আমি অবসরে আছি। আমি অর্থনীতির প্রফেসর হলেও ১৯৭২-৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে এলএলবি সম্পন্ন করেছিলাম। তখনকার আমাদের ডিন লুৎফুল কবীর আমাকে পরীক্ষা দিতে দেননি। তিনি বললেন, এখন খুব নকল হচ্ছে। তোমাকে আমরা ফার্স্ট ক্লাস দিতে পারব না। একটু অপেক্ষা কর। পরে আমি ১৯৭৫ সালে বিদেশে চলে যাওয়াতে আর এলএলবি পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। আমি ১৯৮১ সালে পিএইচডি সম্পন্ন করি। তারপর থেকেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি। আমি ২০০০ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ছিলাম। ১৯৮১ সাল থেকেই আমি বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লিখে চলেছি। এখন আমি প্রথম আলো, সমকাল, আজকের পত্রিকা, বনিকবার্তা এবং কালবেলা; এই পাঁচটি ঢাকার পত্রিকা এবং চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীতে রেগুলার ১৫ দিন পর পর কলাম লিখি। এটি নিয়েই আমার সময় কেটে যায়। আমি আমাদের সংবিধানকে কমপক্ষে ১০ বার পড়েছি। যার কারণে এর ভালো এবং খারাপ দিকগুলো আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত হয়ে উঠেছে। আমার যে বক্তব্য সেটি আমি ২২ তারিখ প্রফেসর আলী রীয়াজকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমি আশা করেছিলাম,আজকে সেটি circulate হবে কিন্তুcirculate হয়নি। এটি attachment হিসেবে আমার ই-মেইলে রয়ে গেছে। আশা করি এটি হেল্প করবে। আমি যে কথাগুলো বলছি সেগুলো গুরুত্বের নিরিখে বলা। আমি ধারা উল্লেখ করিনি কিন্তু আমি মনে করি, ১৯৭২ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পটভূমিতে যেহেতু এই সংবিধানটি রচিত হয়েছিল, সেজন্য এর প্রতি দূর্বলতা আমার সবসময় থাকবে। তবে এতবার কাটাছেড়ার পর বর্তমান অবয়বে এ সংবিধানকে আমি স্বৈরশাসক সৃষ্টির সহায়ক এবং স্বৈরশাসকদের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে অকার্যকর রক্ষাকবচ মনে করি। অতএব এখানে অনেকগুলো বড় ধরণের সংস্কার প্রয়োজন রয়েছে। একটি ভুল ধারনা আমাদের অনেকের মধ্যে আছে যে, আমাদের সংবিধান অত্যন্ত ভালো একটি সংবিধান। আমি বহুদিন ধরে আমার অনেকগুলো কলামে আমি এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে দৃঢ়ভাবে বলে চলেছি যে, আমাদের সংবিধানে এমন কতগুলো মারাত্মক ত্রুটি রয়ে গেছে কিংবা নতুনভাবে ত্রুটিযুক্ত হয়েছে, যেগুলো এ দেশের রাষ্ট্র চরিত্রকে স্বৈরাচারী এবং গণবিরোধী একনায়কত্বে পরিণত করছে বারবার। এ আলোচনায় আমি সেগুলোকে গুরুত্ব অনুসারে উল্লেখ করব। আমাদের সংবিধানে প্রধান ত্রুটি আমি যেটি মনে করি, সেটি হলো আমাদের সংবিধানে ৭০ ধারার বিধান। ৭০ ধারার বিধান এটি সরকারি দল হোক বা বিরোধী দল হোক, সকল দলের নির্বাচিত সংসদ-সদস্যদের উপর দলীয় ফোরামের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগের এ ধারাটি সদস্যদের ভিন্ন মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে পুরোপুরি হরণ করে নিয়েছে। দলীয় প্রধানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বললে কিংবা ভোট দিলে সংসদের সদস্য পদ বাতিল হওয়ার এ বিধান সংসদকে

একেবারেই খয়ের খার ফোরাম করে ফেলেছে। অতএব ৭০ ধারার বিধানটি সংশোধন করে শুধু no confidence motion এবং বাজেট পাসের ক্ষেত্রে দলকে সমর্থন করার বাধ্যবাধকতা বহাল রেখে অন্য সকল আইন প্রণয়ন ও মত প্রকাশের বিধি নিষেধ তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেই হবে। এটিই আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমি তুলে ধরছি।

সেটি হলো, সংবিধানের আরেকটি মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচিত একনায়কের ক্ষমতা দিয়ে সর্বশক্তিমান করে ফেলার ব্যবস্থা করা। ১৯৭২ সালে যখন সংবিধান প্রণয়ন করা হয়, তখন প্রধানমন্ত্রী আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে যে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল, সে কমিটি সংবিধানে খসড়া প্রণয়ন করে যখন সেটি বঙ্গবন্ধুর কাছে পেশ করেছিল, তখন সংবিধানের যেখানেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই বঙ্গবন্ধু নিজের হাতে কেটে সেগুলোকে পরিবর্তন করে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে রাষ্ট্রপতির তুলনায় একচ্ছত্র absolute unchallenged করার ব্যবস্থা করেছিলেন। যার ফলে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাহীন শিখন্ডী বানিয়ে ফেলা হয়েছিল। এ ব্যাপারটি আমাকে বলেছিলেন ওই কমিটিরই সদস্য চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীর প্রয়াত সম্পাদক সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রফেসর খালেক। তিনি ওই কমিটির সদস্য ছিলেন। কমিটির কাছে কাটাকুটি করা খসড়াটি যখন ফেরত এসেছিল তখন ড. কামাল হোসেন কিংবা কমিটির অন্য কারও সাহস হয়নি বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে করা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কিছু করার। তারপর যখন ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাষিত সরকার ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল, তখন একদলীয় বাকশাল পদ্ধতিকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর সকল ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল এর সাথে আরও অনেকগুলো ক্ষমতা যোগ করা হয়েছিল রাষ্ট্রপতি যাতে কথিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কোনভাবেই বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন না হন। অতএব ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে যখন বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন, তখন অপরিসীম ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাগুলো ভোগ করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল ১৯৭৫ এবং ১৯৯০ সালে অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা জবরদখলকারী খন্দকার মুশতাক আহমেদ, জিয়াউর রহমান এবং স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার। ১৯৯১ সালে নির্বাচনে জিতে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বেগম খালেদা জিয়া প্রথম পছন্দ ছিল বিদ্যমান রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা বহাল রেখে দেওয়া। যার জন্য তিনি দীর্ঘ পাঁচ মাস তার স্বাক্ষরিত তিন জোটের রূপরেখা অনুসারে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নেননি। কিন্তু যখন অন্তবর্তীকালীন সরকারের রাষ্ট্রপতি জাস্টিস শাহাবুদ্দিনের প্রবল চাপ ও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের কাছে নতি স্বীকার করে বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালের আগস্টে আবার সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী খসড়া প্রণয়নের ভার পরে ব্যরিস্টার মওদুদ আহমেদ, ব্যরিস্টার সালাম তালুকদার এবং কর্ণেল ওলী আহমেদের উপর। এ তিনজন মিলে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রপতির সকল ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়ার ব্যবস্থা সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বরং প্রধানমন্ত্রী আরও অনেকগুলো অতিরিক্ত প্রসিডিউরাল ক্ষমতা এর সাথে যুক্ত করেছিলেন এই তিন জন; যাতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেগুলো ভোগ করতে পারেন। অতএব প্রধানমন্ত্রীকে সাংবিধানিক একনায়ক বানানোর কৃতিত্ব বিএনপির এই তিন জন ধুরন্ধর নেতার উপর সবচেয়ে বেশি বর্তাবে। এই তিন জনের মধ্যে ব্যরিস্টার মওদুদ আহমেদ এবং সালাম তালুকদার মৃত্যুবরণ করেছেন। বেঁচে আছেন শুধু কর্ণেল ওলী আহমেদ। বছর খানেক আগে কর্ণেল ওলী এ ব্যাপারে তাঁদের ভুল স্বীকার করে পত্রিকায় বক্তব্য দিয়েছিলেন। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে শেখ হাসিনা অনেকখানি গণতান্ত্রিক আচরণ মেনে চললেও ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর আজীবন ক্ষমতায় আসীন থাকার সর্বনাশা খায়েশ তাকে পেয়ে বসেছিল। বিশেষত ২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বিচারপতিদের ৪/৩ সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অনির্বাচিত বিধায় অসংবিধানিক বলে রায় দিলেন, তখন ওই রায়ের শেষে সংসদ চাইলে আরও দুইটি নির্বাচন ওই ব্যবস্থার অধীনে করা যায় বলে আপিল বিভাগের পরামর্শ পাশ কাটিয়ে হাসিনা সম্পূর্ণ নিজের সিদ্ধান্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনসংক্রান্ত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীটি ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করে দিলেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার পর ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত তিনটি একতরফা নির্বাচনি প্রহসনের মাধ্যমে হাসিনা তার আজীবন ক্ষমতায় থাকার খায়েশ পূরণের পথে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন। সংবিধানের বর্তমান অবয়বে সাংবিধানিকভাবে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর প্রধানমন্ত্রীর অফুরন্ত ক্ষমতাকে লাগাম পরানোর ব্যবস্থা না করলে রাষ্ট্র সংস্কার আদৌ সম্ভব হবে না। এখানে আমি একটু ইঙ্গিত দিয়েছি যে, বর্তমানে ফরাসি সংবিধানে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসম্যের ব্যাপারে আমাদের পথ দেখাতে পারবে। কোথায় কোথায় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ রাষ্ট্রপতির জন্য অপরিহার্য, আমার মতে সেটিও সংস্কারে সুনির্দিষ্ট করতে হবে। আরেকটি সাংবিধানিক পরিবর্তন একেবারে ফরজ হয়ে গিয়েছে। সেটি ইতোমধ্যে সারা দেশে খুব আলোচিত হচ্ছে। সেটি হলো, দুই বারের বেশি কাউকে প্রধানমন্ত্রী হতে না দেওয়া। এর সাথে আরেকটি বিষয় যোগ করা উচিত সেটি হলো, পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন দেওয়ার পরিবর্তে চার বছর পর পর সংসদীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এরপর

যে বিষয়টি আমি গুরুত্ব দিয়ে তুলে এনেছি। সেটি হলো, সংবিধানে নির্বাহী বিভাগের কাছে যেভাবে বিচার বিভাগকে নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে, সেটিও অবিলম্বে সংশোধন করতে হবে। বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল স্তরের বিচারকদের নিয়োগ, বদলি, বেতন ভাতাদি ও চাকুরিচ্যুতি জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে করতে হবে। যে কমিশন গঠিত হবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সিদ্ধান্তে। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি এসব নিয়োগ দিবেন। যে কাউন্সিল গঠিত হবে প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের দুই জন সিনিয়র বিচারপতির সমন্বয়ে। প্রধান বিচারপতির নিয়োগ রাষ্ট্রপতির একক সিদ্ধান্তে হলে সেটি আপিল বিভাগের বিচারপতিদের চাকুরির জেষ্ঠতা লঙ্ঘন করতে না দেওয়াই কাম্য। আরেকটি বিষয় আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। সেটি হলো–জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এখন যেভাবে সংসদের মাধ্যমে হচ্ছে, সেটির পরিবর্তে সরাসরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। আরেকটি বিষয়, সেটিও খুব আলোচিত হচ্ছে সারা দেশে। সেটি হলো–সংসদ নির্বাচনে সংখ্যানুপাতিক সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা। এখানে আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো–প্রয়োজনে সংসদে দুইটি কক্ষ রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আপার হাউস, যেটিকে আমি সিনেট বলতে বলেছি। যেখানে সংখ্যানুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে ১০০ সদস্যের উচ্চ কক্ষের সদস্য সংখ্যা রাজনৈতিক দলগুলোই পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। যে রাজনৈতিক দল যত শতাংশ ভোট পাবে, উচ্চ কক্ষে ১০০ জনের মধ্যে সে তত শতাংশ সদস্য পাবে। ৩০০ সদস্যের নিম্নকক্ষে বর্তমান পদ্ধতিতে সংসদ-সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উচ্চ এবং নিম্নকক্ষের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবিধান আমাদের পথ দেখাতে পারে। এ বিষয়ে আমার মনে হয় যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ভারত আমাদের সামনে উদাহরণ হিসেবে চলে আসবে। আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি তুলে ধরতে চাই। সেটি হলো–সংসদে ৫০ জন নারী সদস্যের রিজার্ভ সিট রাখার বিধান বাদ দিয়ে এক তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য থাকতে হবে। ৩০০ জনের মধ্যে ১০০ জন নারী সদস্য সরাসরি নির্বাচিত হবেন। যেখানে নারীরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। রোটেশন ভিত্তিতে প্রত্যেক নির্বাচনে দেশের প্রতিটি জেলায় এক তৃতীয়াংশ আসনে শুধুমাত্র নারীদের নির্বাচন করার বিধান করতে হবে। প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক বছর এক তৃতীয়াংশ আসন শুধুমাত্র নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। যাতে প্রত্যেক তিনবারে দেশের সব অঞ্চল নারীদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করতে পারে। আমার মনে হয়, এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী, যেটি আমাদের নারীদের সত্যিকারভাবে জনপ্রতিনিধিত্বশীল করার ৫০ জন অলঙ্কার-এই বদনাম থেকে তারা মুক্ত হতে পারবেন এবং নারীদের জনপ্রতিনিধিত্ব থাকার একটি বিধান আবার চালু হবে।

আরেকটি বিষয় আমি এখানে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতে চাই। সেটি হলো–নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আনলে এক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টা নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে বিচার বিভাগকে কোনওভাবেই জড়ানো যাবে না। আমরা দেখেছি যে, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৬-০৭ সালে বিচার বিভাগকে কীভাবে এর সাথে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল এবং বিচারপতিদের অবসরের বয়স দুই বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মওদুদ আহম্মদের ধুরন্ধর বুদ্ধির কারণে। যার ফলে ২০০৬-০৭ সালে আমাদের দেশ প্রচণ্ডরকম একটি সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। আরেকটি বিষয়, আমি মনে করি যে, কমিশনের সুপারিশগুলোকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি গণভোট অনুষ্ঠানের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আমি যেটি বলতে চাই, আমি আসলে সংবিধান পুনর্লিখনের পক্ষে নই। তবে এগুলো বড় বড় সংস্কার। এই সংস্কারগুলো ছাড়া মারাত্মক ভুলগুলো যদি আমরা সংশোধন না করি, তাহলে রাষ্ট্র সংস্কার হবে না। এ বিষয়গুলো যদি আপনারা সুপরিকল্পিতভাবে সংবিধান সংস্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন, আমি মনে করি যে, আমাদের বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী যে নির্বাচিত একনায়ক হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন, স্বৈরশাসক হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন, সে সুযোগ ভবিষ্যতে কেউ পাবেন না। আমি মনে করি, এ বিষয়গুলো আপনাদের কাছে গুরুত্ব পাবে। অলরেডি আমার লিখিত বক্তব্য আমি অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে আলী রীয়াজের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আপনারা আমার সেই সুপারিশমালা যদি নিজেদের মধ্যে circulate করে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহলে আমি খুশি হব। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) :ধন্যবাদ, স্যার।

আমি ই-মেইল আবার চেক করব। কোনো কারণে হয়ত এটি অন্য কোথাও চলে গেছে। এটি অবশ্যই আমরা বিবেচনায় নেব। আমরা কিছু প্রশ্নের জায়গায় আসব। আমাদের সহকর্মীদের কিছু প্রশ্ন আছে। তবে আমরা সকলের কথা শুনতে চাচ্ছি। এখন আমি অনুরোধ করব জনাব নূরুল কবিরকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য।

জনাব নূরুল কবির (অংশীজন) :প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই, আপনাদের এই বৈঠকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। এ দেশের সংবিধানের ব্যাপারে গোটা সমাজের মধ্যে কথা উঠেছে। যেগুলো বদলানোর অনেক প্রয়োজন, সেগুলোর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ এখন আর নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে বদলাবো আমরা? কী কী বদলাব? পদ্ধতিগত যেমন কয়েকটি ব্যাপার আছে, তেমনি কনটেন্টের দিক থেকে কিছু ব্যাপার আছে। কনটেন্টের ব্যাপারগুলো পৃথিবীতে যে কোনও sustainable পরিবর্তনের জন্য তার ঐতিহাসিকতার উপর

নির্ভর করতে হয়, তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয়। আমরা যদি খুব পেছনে না যাই, বাংলাদেশের রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে হয়েছে। তবে আমাদের চিন্তা-ভাবনার baseline সেটি রাজনৈতিক, দার্শনিক এবং ঐতিহাসিকতাসহ অন্তত এর নিচে যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই; আমার কাছে নেই, তবে অন্য কারও কাছে থাকতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র যখন গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়, সেটি খুব ত্রুটিপূর্ণভাবে হয়। এই অর্থে যে, একটি রাষ্ট্রের সংবিধানকে হতে হয়, যেটি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানে এখনও পর্যন্ত যেটি সেই preamble-এ এক ধরণের কথা আছে general will-এর expression হিসেবে সংবিধান তৈরি করতে হয়। এর পেছনে যে বাক্যগুলো এসেছে social contract-এর কারণে। একটি দেশের মধ্যে অনেক শ্রেণি থাকে, অনেক সম্প্রদায় থাকে। এদের মধ্যে conflicting interests থাকে।

সেই conflicting interests মীমাংসা না হওয়ার কারণে একটি social contract-এর দরকার পড়ে। যেটুকু বুঝি, সেটিই রাষ্ট্রীয় সংবিধান হিসেবে কাজ করতে পারে। social contract বিভিন্ন ক্লাস এবং সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে নিয়ে আসার পদ্ধতি কি, সে আলোচনা আমরা একটু পরে করব আগে যদি আমরা কনটেন্টের দিকে থাকি। এক দিক থেকে overlapping কিছু করতে পারে। একটি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যখন বাংলাদেশ রাষ্ট্র তৈরি হয়, সেই যুদ্ধের মধ্যে তখনকার সরকারের statistics অনুযায়ী, পরবর্তী কোনও সরকার সার্ভে করেনি, সেখানে দেখা যায় যে ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ গরীব মানুষ এদেশের জন্য রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন। যার যত contribution সে অনুযায়ী যদি fair share হয়, তাহলে ঐ দেশের তাদেরই rule করার কথা। সেটি হয়নি। এমনকি সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে তাদের কোনও মতামতও নেওয়া হয়নি। সংবিধান রচনা করার জন্য বা এটিকে exercising পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে তাদের একটি consent লাগবে, এই ধারনাটা পর্যন্ত ১৯৭২ সালের সংবিধানে উপস্থিত ছিল না। একমাত্র পথ ছিল referendum. referendum-এর প্রভিশনই ছিল না ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের মধ্যে। দ্বিতীয়ত জাতীয় মূলনীতির কথা বলে সেখানে কতগুলো প্রতারণার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেমন ধরুন, এটিকে representative হতে হলে তৎকালীন রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত নানান ব্যক্তি, বিরোধী দল নানান প্রস্তাব করেছিলেন। একটি ছিল, লিডিং পলিটিক্যাল পার্টি আওয়ামী লীগের বাইরে যারা ছিলেন, তারা কমপক্ষে একটি constitution convention ডাকার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এটিকে রেসপেক্ট করা হয়নি। কেন constitution convention ডাকতে বলেছিলেন? খুব ন্যাচারালভাবে তাদের যুক্তি ছিল যে, আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা এ সংবিধান লিখবেন বলে ঠিক করেছেন, তারা আসলে ইউনাইটেড পাকিস্তানের। ছয় দফার ভিত্তিতে একটি সংবিধান তৈরি করার জন্য ম্যান্ডেট নিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে একটি যুদ্ধ হয়েছে। সেই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানুষের রাজনৈতিক চেতনার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছে। তার আশা আকাঙ্খার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের ন্যায্যতার স্বীকৃতি না দেওয়ার কোনও কারণ ছিল না। ফলে আওয়ামী লীগ এটিকে চায়নি। চায়নি বলে গায়ের জোরে এ কাজটি করেছে, নিজেরাই তৈরি করেছে এবং সেখানে জনগণের ম্যান্ডেট নেওয়ার জন্য কোনও referendum-এর ব্যবস্থা করা হয়নি। এক ধরণের প্রতারণামূলক ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেমন–ধরুন, সমাজতন্ত্র। আওয়ামী লীগ কখনো সমাজতান্ত্রিক দল ছিল না, থাকতে হবে এমন কথা নেই। কিন্তু তারা যে এটির মধ্যে সমাজতন্ত্র ঢুকালো, এর কারণ ছিল। রাজনৈতিকভাবে অনেক গবেষণা আছে, এখন পাওয়া যায়। আজকের দিনে বামপন্থা যেটি রাজনৈতিকভাবে এর অবস্থা ৬০ এবং ৭০ দশকের অবস্থায় বোঝা যাবে না। ৭১ এবং ৭২ সালে বাংলাদেশে একটি formidable force হিসেবে বামপন্থার অস্তিত্ব ছিল। মাওলানা ভাষানীর মতো লোক যেখানে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ভীষণভাবে কৃষককে politically radicalized করেছিলেন। সেখানে সমাজতান্ত্রিক আকাঙ্খা তৈরি হয়েছিল। এটি এক ধরণের বামপন্থাকে sabotage করার জন্য সমাজতন্ত্রের কাজটি আমরাই করে দেব। এটি তারা mean করেননি। সেখানে বামপন্থী সংগঠনগুলোকে, নেতাদেরকে Political disomed করার জন্য সমাজতন্ত্রের কথাটি ঢুকানো হয়েছিল। আরো একটি জিনিস, যেটি চিন্তা করা হয়নি, যার পরিণিতি সম্ভবত আমরা আজকের দিন পর্যন্ত ভোগ করছি। এ কথা সত্য ঐতিহাসিকভাবে যে, ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রধান স্বায়ত্তশাসনের রাজনীতি অগ্রসর হয়েছিল। এর পাশাপাশি আরেকটি শ্রেণি সংগ্রামভিত্তিক যে স্রোতধারা ছিল, সেটি ৭০ সালে পরাজিত হয়। এটি বাস্তব। তারপর এটিও সত্য যে শুধু বাঙালিরাই যুদ্ধ করেনি। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার চট্টগ্রামে দুই জন নন বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাকে বীর বিক্রম উপাধি দিয়েছিল। অন্যসব কথা বাদ দিয়ে, এই উপাধি দেওয়ার মধ্য দিয়ে এটি প্রমাণিত হয় যে শুধু বাঙালি যুদ্ধ করে এ ভূখন্ড স্বাধীন করেনি। কিন্তু ১৯৭২ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক রাষ্ট্রের কথা বলে, আমি ঐতিহাসিকভাবে জানি যে বাংলাদেশ যখন নয়া উপনেবেশিক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করা রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যখন লড়াই করে তখন ন্যাশনালিজমের গুরুত্ব থাকে। নেশন স্টেট ফরমেশনের পর্যায়ে যদি অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীগুলোকে আমি accommodate করতে না পারেন, তাহলে সেই রাষ্ট্র ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হতে বাধ্য। এক ধরণের সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী রাষ্ট্রে বাংলাদেশ অধপতিত হয়েছিল। এ অভিজ্ঞতা থেকে আজকে বিষয়ে আমার প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে যে, বাংলাদেশ একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র, এটির স্বীকৃতি দেওয়া। তাতে আমরা অনেকগুলো বাস্তব সমস্যা, নৈতিক সমস্যা এবং ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান করতে পারি। অন্যদিকে কেউ তুলতে পারেন যে, বিএনপি এবং অন্যরা যারা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ বলে এক বস্তুর কথা আমাদেরকে প্রস্তাব করেছিলেন। আইডিয়ার দিক

থেকে সেটি খারাপ ছিল না। তারা বলেছিলেন, inclusivity-এর জন্য এটি করা হয়েছে। কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখেছি, শেষ পর্যন্ত একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে এক্সারসাইজ হয়েছে। তাতে কী হয়েছে আমাদের ক্ষতি? সেটি হলো–ইসলামের কোনও উপকার হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ এ সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টির আর্বিভাবের বহু আগে ধর্ম হিসেবে ইসলাম তার অন্তর্গত শক্তি দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছে। জেনারেল এরশাদ, জিয়াউর রহমান কিংবা শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়ার উপর নির্ভর করে ইসলামের বিকাশ আশা করা খুবই অবান্তর। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলে অবাঙালি জাতিগোষ্ঠী রাষ্ট্রের কাছে সমান অধিকার পাওয়ার ন্যায্যতা থেকে বঞ্চিত হলো। আর বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ যখন বাস্তবে শেষ পর্যন্ত মুসলিম জাতীয়তাবাদে পরিণত হলো, তখন অমুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। আমাদের যেটি দরকার মুসলিম, অমুসলিম, বাঙালি এবং অবাঙালি সকল ধর্মালম্বী কিংবা সমস্ত জাতিগোষ্ঠী, sociologically যে সকল জাতিগোষ্ঠীর কথা আছে, তাদেরকে augmented করা। আমি মূলনীতি প্রশ্নে আরেকটি কথা বলতে চাই, এমনকী বাংলাদেশের নামকরণ প্রসঙ্গেও। ইতোমধ্যে আমাদের অনেক পন্ডিতগণ এ কথা বলেছেন যে, অনেক সময় শব্দ তার অর্থ বদলায়। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে কবে অর্থ বদলাবে তার উপর নির্ভর করা ঠিক হবে না। প্রজাতন্ত্র হিসেবে আমরা ইংরেজিতে যেটিকে বলি, রিপাবলিক; এই প্রজাতন্ত্রের চিন্তার মধ্যে জমিদারি ব্যবস্থার একটি ছায়া আমরা দেখতে পাই। সাধারণ মানুষ যুদ্ধ করে যখন একটি রাষ্ট্র তৈরি করে প্রজার মর্যাদা পাওয়ার জন্য নয়। সেখানেও আরেকটি ফাঁকিবাজি ব্যবস্থা ছিল, কেন প্রজাতন্ত্র করা হয়েছিল? কারণ হচ্ছে, তখনকার বামপন্থীরা, বিশেষত মাওলানা ভাসানীর একটি স্লোগান ছিল–জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ তৈরি করতে হবে। যদি ফরাসি বিপ্লবের স্পিরিটের কথা আমরা চিন্তা করি, এটি আসলে একটি জনগণতান্ত্রিক বা রিপাবলিকান স্পিরিট। সেভাবে তারা চিন্তা করেছিলেন। ভাসানীর উচ্চারিত জনগণতন্ত্র মুজিবের আওয়ামী লীগ গ্রহণ করতে পারে না। আমরা নাম বলতে চাই না, কাদের দিয়ে এগুলো বাংলা করিয়েছেন? এই দেশের নাম বদলাতে হবে। এটি ইতিহাসের দাবি। বাস্তবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টগণ এ দেশে আসলেই একটি জমিদারি ব্যবস্থায় নাগরিকদের প্রজায় অধপতিত করেছিলেন। যেহেতু প্রজা হিসেবে একটি জিনিস আমাদের ইতিহাসের মধ্যে আছে, অন্তত পূর্ব বাংলার মানুষ তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, এ অঞ্চলের কৃষক ব্রিটিশদের সঙ্গে collaborate করেনি, সেখানে আমাদের প্রজা নামটি সরানো দরকার। এটি ইতিহাসের দাবি। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ছিলাম। মূলনীতির মধ্যে সেটি থাকা দরকার। একটি জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিলাম। সমাজতন্ত্রের দাবি কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছিল। এখানে যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তৈরি করা যায়, তারপরও সেটি কোনও ক্লাসের এখানে মার্কসবাদী আছেন, তারা জানেন, any state for that matter. আমরা কথা বলছি, গণতান্ত্রিক পর্যায়ে সমস্ত ক্লাসের মধ্য দিয়ে একটি social contract তৈরি করার জন্য।

সমাজতন্ত্র একটি ভালো জিনিস কি মন্দ জিনিস সেটি আরও কয়েক যুগ পর আলাপ করলে বা অন্য কোনও নামে সেটি আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়ত তৈরি করতে পারে। তার জন্য এখনও পর্যন্ত কেউ কাজ করতে পারেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের ইতিহাস বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে আমাদের একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার। সমাজতন্ত্র বললে আজকের দুনিয়াতে কতগুলো stigma হয়, একই রকম stigma হয় যদি আমরা একটি ধর্ম রাষ্ট্র তৈরি করি। অথচ বাস্তবে আমরা না ধর্মরাষ্ট্রের জন্য কাজ করছি, না সমাজতন্ত্রের জন্য কাজ করছি। পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর কর্মসূচিগুলোর দিকে যদি দেখেন, কারণ আপনি কর্মসূচির বাইরে গিয়ে, ইতিহাসের বাস্তবতার বাইরে গিয়ে, দাবি উত্থাপনের কোনও অর্থ হয় না। এখানে এমনকী যারা বামপন্থী আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের ঘোষণাপত্র এবং কর্মসূচিতে দেখবেন তারা by essence একটি ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক আমাদের ইতিহাস বিকাশের এ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করতে চান। ফলে ভরণ বাদ দিয়ে সত্য কথা এখানে বলে রাখা ভালো, এটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। জনগণতান্ত্রিক কোনও রাষ্ট্র আমরা চাই না। এটির সঙ্গে যুক্ত রাষ্ট্রধর্ম। এই দুই জিনিস থাকার কোনও দরকার নেই। রাষ্ট্রের কোনও উপকার কিংবা ইসলাম ধর্মের কোনও উপকার সংবিধানের মধ্যে লেখা হয়নি। কিন্তু stigmatized হয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদেরকে অসম্প্রদায়িক নাগরিক মনে করে। আর একটি ধর্মের যদি অন্তর্গত শক্তি না থাকে, তাহলে এতদিন ধরে টিকতে পারে না। বড় বড় রাজনৈতিক সংগঠন ৫০-৬০ বছরে শেষ হয়ে যায়। একটি মতাদর্শ হিসেবে আছে। তার অন্তর্গত শক্তির কারণে এখানে বিকশিত হয়েছিল। সেটির কারণে এটি হয়ত sustain করবে। এটি এই রাজনীতির ধুলার ধরনীতে কর্দমাক্ত করার কোনও দরকার নেই। তৃতীয় বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, সমাজে আলোচনা হচ্ছে। সেপারেশন অব পাওয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন শেখ মুজিব ১৯৭০, ৭১ ও ৭২ সালে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা ছিলেন, এটি ইতিহাসসম্মত বক্তব্য। তার সামনে যে সমস্ত গিনিপিগরা ছিলেন, তাঁকে কেন্দ্র করে constitution চিন্তা করেছেন। করতে করতে কোন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, এর একটি উদাহরণ দেই। কারণ এই প্রক্রিয়াটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাকশাল যখন করা হয়, আপনি লক্ষ্য করুন, ফোর্থ অ্যামেনমেন্টের মধ্যে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা কীভাবে ছিল?সংবিধান পরিবর্তন করতে বলছেন দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটি লাগবে। প্রেসিডেন্ট পরিবর্তন করতে তিন-চতুর্থাংশ লাগবে। একদিকে যখন people sovereignty-র কথা স্বীকার করছে preamble, people sovereign. অথচ এই sovereignty exercise করার জন্য কোনো গণভোটেরও ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে বলছেন এই সংবিধান

যেটি manifestation of the general will of the people. সেটির চাইতেও বড় হচ্ছে একজন প্রেসিডেন্ট। তার মানে একজন ব্যক্তিকে মাথায় রেখে কিছু অগণতান্ত্রিক মানষযুক্ত মানুষ এটি visualize করতে পারেননি। আমার মনে হয়, ৫৩ বছর পর সবার একটি সুযোগ এসেছে, যখন কথাবার্তা হচ্ছে, তখন এ বিষয়গুলো কতটুকু পারব বা আপনারা কতটুকু পারবেন, এটি আমরা জানি না। তবে বিষয়গুলো পরিস্কারভাবে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত যে ওখানে এই ক্রটিগুলো ছিল, এগুলো দিয়ে আমরা ফল পাইনি। অফল, কুফল আমরা পেয়েছি। এগুলো থেকে বের হওয়া দরকার। একজন ব্যক্তির হাতে যদি সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলের প্রধানের ক্ষমতা থাকে, যদি leader of the house হয় অর্থাৎ লেজিসলেচারের প্রধান হন, যদি রাষ্ট্রের executive authority তার হাতে থাকে, এই তিনটি যদি তার হাতে থাকে, তাহলে আপনি জুডিশিয়ারিকে যেভাবে লিখে দেন না কেন; সেটিকে তার পক্ষে প্রভাবিত করা সম্ভব। সেখানেও আপনার এই suppression মুখে বলা থাকল বা কিতাবে লেখা থাকলেও বাস্তবে হবে না।

এই দেশেই কিন্তু আইন ছিল, আওয়ামী লীগের মধ্যেও ছিল ১৯৫৪ সালে। যখন রাস্ট্রের কোনও নির্বাহী দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, মন্ত্রী হবেন, তখন পার্টির পদ ছাড়তে হয়। এটি এখানেই ছিল পাকিস্তান আমলে। ৫৪ এবং ৫৬ সালের পরের মন্ত্রিসভায় এগুলো ঘটেছিল। সে দিক থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা আরও পিছিয়ে গেছি। একইসঙ্গে মন্ত্রী আবার পার্টির পদ, particularly যখন রুলিং পার্টি থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানে যেহেতু রাজনৈতিক দলের একটি সংজ্ঞা দেওয়া আছে, আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে, কিছুসংখ্যক মানুষ যদি একত্রিত হয়ে কোনও particular কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যদি সমাজের মধ্যে কাজ করে, সেটিই রাজনৈতিক দল। কতজন সদস্য হিসেবে সেটিও লেখা নেই। তাহলে রাজনৈতিক দলের ডেফিনেশন যদি সংবিধানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে তার কিছু modus operandi ও থাকতে পারে। কারণ আমাদের বিশ্বাস করার কোনও যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে না। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল নিজের দলের ভেতর গণতান্ত্রিক চর্চা করে না, সে কি করে একটি নেশনকে নেতৃত্ব দিবে? কারণ রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞার মধ্যে এই compersion আইন দিয়ে করা যায়, আইন দিয়ে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞাও নির্ধারণ করা যেত। যেহেতু সংবিধানের ভেতরেই একটি রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা আছে। এর modus operandi কী হবে? কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত তাকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত অফিস বেয়ারার মতো কাজ করতে হবে, এটি একটি compersion তৈরি করা যায় এবং সে জন্য কোনও বৈপ্লবিক ব্যাপার লাগে না। কারণ অলরেডি অর্ধেক সেখানে আছে। সেপারেশন অব পাওয়ার ভেরি ইমপর্টেন্ট। প্রেসিডেন্ট এবং প্রাইম মিনিস্টারের মধ্যে checks and balances দরকার। আট কোটি ভোটারের ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। ৩০০ জন এমপির ভোটে হন প্রেসিডেন্ট। অবশ্যই এটি একটি ঝামেলার মধ্যে ঐ পদে যিনি আসীন থাকবেন, তার সেটি হবেই। কারণ হচ্ছে, automatically by nature তার ম্যান্ডেটের পরিমাণ ছোট। সেখানেও সরাসরি ইলেকশনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে আলাপ আলোচনা সাপেক্ষে। তাতে checks and balancesএর একটি ন্যায্যতাও থাকে checks and balances এর সঙ্গে balance of power অঙ্গাআঙ্গিভাবে জড়িত। ইসলাম এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে আমি মনে করি রাষ্ট্রধর্ম বাতিল করা দরকার। গণতন্ত্রের সঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে জড়িত। সেখানে ইলেকটোরাল লজ এবং constitutional democracy-এর মধ্যে কীভাবে কী করা যাবে, সে ব্যাপারে আমাদের আইনজ্ঞ আছেন। সেটি টেকনিক্যাল ইস্যু কিন্তু সংবিধান একটি রাজনৈতিক ইস্যু। এখানে আইনের আলেম ওলামা লাগবে; ব্যাপারটি এমন নয়। আইন হচ্ছে, codification of political will of the people. এটি কীভাবে codifz করবেন, সেটি তাদের ব্যাপার। কিন্তু এটির সঙ্গে সম্পর্কটা কী? আমরা এতবছর ধরে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের কথা বললাম কিন্তু হল না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, কমিশনের চার জন, পাঁচ জন যদি অথরিটিক্যালি স্বাধীন থাকেনও you don't need receive phone calls from the executive wings of the state or major political parties during election. রিটার্নিং অফিসার কে হয়? আপনার প্রিজাইডিং অফিসার কে হয়? bureaucrats. এই civil bureaucracy কাদের আন্ডারে কীভাবে ফাংশন করে? যাদের সরকার ক্ষমতায় থাকে, তারা সেভাবে সাজিয়ে রাখে। যখন কেয়ারটেকার ব্যবস্থা ছিল, তখন যাওয়ার আগে ওভাবে সাজিয়ে যেত। তাহলে ইলেকশন কমিশনের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত নির্বাচন কর্মকর্তাকে অবশ্যই ইলেকশন কমিশনেরই কর্মকর্তাই থাকতে হবে। they will preside over the election, not DC and UNO. আমি নিজে এই আলোচনা বহু বছর ধরে করছি, প্রায় ২০-২২ বছর হল। এখানে এক্সিকিউটিভ উইং থেকে যে বিরোধীতা আসে, সেটি হচ্ছে, ওরা ওই পরিমান competent না। ওদের হাতে resources নেই। কারণ গাড়ি লাগে, বন্দুক লাগে; এগুলো ইলেকশন কমিশনের হাতে নেই। এটি খুবই contradictory even under the present constitution. কারণ constitution লেখা আছে, নির্বাচনের সময় এন্টার স্টেট প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশনের অধীনস্থ থাকবে। তাহলে তাই যদি হয়, তাহলে তার অফিসারদের যা দরকার, তারা সে হুকুম দিবে, তারা পালন করবে। as simple as that.এ হুকুমের এখতিয়ার ইলেকশন কর্মকর্তারা যারা মাঠপর্যায়ে আছেন, তাদের হাতে থাকতে হবে।

তখন সেটি যদি একটি independent of political party হয় of the executive wing of the state হয়, তার পক্ষে একটি স্বাধীন নির্বাচন করা সম্ভব হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি partisan bureaucracy-এর হাতে থাকবে, government control bureaucracy-র

হাতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি বাস্তবে আশা করা কঠিন ব্যাপার। আমি আর বেশি সময় নেব না। পৃথিবীর বহু জায়গায় আছে এজন্য কমিউনিজম হতে হয় না, সমাজতন্ত্র হতে হয় না, ন্যায্যতা এবং গণতান্ত্রিক ধারার কথা চিন্তা করলেই হয়। পাঁচ বছর ধরে আমি একজনকে এমপি বানিয়ে দিলাম, তারপর তিনি যা ইচ্ছা করলেন, নাগরিক হিসেবে, ভোটার হিসেবে আমাকে অসহায়ের মতো থাকতে হলো, এটি হতে পারে না। recall system should be introduced. একটি particular টাইমের পর, একটি particular ভোটার যদি মনে করেন আমাদের এমপি not delivering. তখন তাকে মেরে পিটিয়ে দরকার নেই, ভোটের মাধ্যমে রিকল করার জন্য ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাতে accountability of people's representative তৈরি হবে। আরেকটি জিনিস খুব পরিস্কারভাবে সংবিধানে গুছিয়ে লেখা দরকার। এমপিদের সংবিধান বদলানোর কোনও অধিকার থাকতে পারে না। কারণ হচ্ছে, it's a clear case of conflict of interest. সংবিধান যদি হয় জনগণের আকাঙ্খার দলিল, আইন যদি হয় এর অধীনে প্রণীত ব্যবস্থা, তাহলে যিনি সংবিধান পরিবর্তন করবেন, তিনি আইন-প্রণয়ন করবেন। it's a conflict of interest. খুব সহজ এক্সামপল দেই, যাতে মানুষের বুঝতে সুবিধা হয়। যেমন-একটি কোম্পানীর যে শেয়ারহোল্ডারগণ থাকেন, এর যে আর্টিকেলস থাকে, এর একটি আর্টিকেল বদলাতে একটি এজিএম লাগে। যার কোম্পানীর এক পার্সেন্ট শেয়ার আছে, সারা বছর ধরে এটির যে ম্যানেজমেন্ট কমিটি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা তার যা কাজ করতে পারেন, পলিসি মেক করতে পারেন, পলিসি বদলাতে পারেন। তবে articles of memorandum বদলাতে হলে এজিএম লাগে, এক টাকার শেয়ার যার আছে, তারও। ধরেন, এটি পাঁচ কোটি টাকার একটি কোম্পানী। অথচ একটি দেশের সংবিধান বদলানোর জন্য একটি memorandum লাগবে না? বিষয়টি অদ্ভুত। কোনও গণতান্ত্রিক মন এটি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আমাদের এমপি সাহেবরা সংবিধান বদলিয়ে দেন। এর জন্য রেফারেন্ডামের দরকার পড়ে না। অথচ তারা জনগণের তৈরি করে দেওয়া সংবিধানের অধীনে আইন-প্রণয়ন করবেন। যেটির অধীনে আইন-প্রণয়ন করেন, যেটি supreme law, সেই supreme law তার বদলানোর অধিকার থাকতে পারে না। এটি পরিস্কারভাবে উল্লেখ থাকা দরকার। আমার মনে হয়, নীতিগতভাবে এর বাইরে আমার তেমন কিছু বলার নেই। কিন্তু ছোট একটি ব্যাপার আছে তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ। particularly এ মুহূর্তে বাংলাদেশ যে অবস্থায় আছে। এ মুহূর্তে বাংলাদেশ একটি অদ্ভুত অবস্থায় আছে। এ গর্ভমেন্টের political legitimacy আছে। end of the day legal legitimacy derived from political legitimacy. কিন্তু তারা এক দিক থেকে এই সংবিধান মেনে চলার ওথ গ্রহণ করেন। এখনও পর্যন্ত কোনও রকম অর্ডিন্যান্স ছাড়া কী কী আইনে এই দেশ চলছে, সেটির ব্যাপারে pronounced কোনও ব্যাপার নেই। আবার এ সংবিধানও বদলাতে চান। এটি সত্যি একটি আধাকাচড়া অবস্থা। সংবিধান তৈরি করার নিয়ম-কানুন পৃথিবীতে আছে। দক্ষিণ এশিয়ায় নেপাল হচ্ছে একমাত্র দেশ যে constituent assembly সংবিধান তৈরি করেছে। এ অঞ্চলে আর কেউ এটি করেনি। তারা পার্লামেন্টকে constituent assemblyনাম দিয়ে constitution তৈরি করে আবার সেটি নিজের হাতে বদলানোর ক্ষমতা রেখে ১৯৪৭ সাল থেকে চলছে। যদি আমরা মনে করি যে, এমপি সাহেবরা আইন তৈরি করতে পারেন, আইন বদলাতে পারেন under the dictress of constitution.তাহলে সংবিধান কে লিখবে?এর জন্য একটি নির্বাচিত constituent assembly লাগবে।constituent assembly কে ডাকবে? এগুলো বাস্তব প্রশ্ন। এটি enforce করার পলিটিক্যাল পাওয়ার আছে কিনা? ধরুন, ভালো কাজ। তাকে যদি বাস্তবায়ন করার জন্য political mobilization না থাকে, তাহলে আপনাদের এখানে আমি কী আসতাম? জানি, করে ফেললাম! কেন পারি না? Because i don't have political forces to implement and guard. আমরা এখানে এমন কিছুই বলিনি, যা পৃথিবীর কোনও না কোনও কিতাবে লেখা নেই। কিতাব আছে, কিতাবে ভালো কথা লেখা থাকে। অবশ্য খারাপ কথাও থাকে। enforce করার জন্য political mobilization of the people, আমরা যে এটি করব, যারা একটি ইতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, তাদের ক্ষমতা ঐ পর্যন্ত আছে কিনা যেটি enforce করা এবং sustain করতে পারেন remains a very important thing. constituent assembly না করলে আপনি কী করতে পারেন? যদি আদার পলিটিক্যাল এক্টট্রেসদের একমত করতে পারেন, তাহলে একটি রেফারেন্ডামে যেতে পারেন। রেফারেন্ডাম ছাড়া কোনও সংবিধান হতে পারে না, ইভেন constituent assembly করলেও। সে বিষয়ে এখানে অনেক পন্ডিত লোক আছেন। একটি মডেল Thomas paine common sense যে কলাম লিখতেন, যেটি পরবর্তীতে rights of man নামে অন্তর্ভুক্ত আছে। আমেরিকানরা ফিলাডেফিয়ার অঞ্চলে একটি অঞ্চল থেকে এই ট্রাম্পল আছে যে, কেন lawmaker এবং constituent assembly এর মেম্বার এক নয়। কী করে হয়, সেখানে details বর্ণনা আছে। আর আপনারা separation of judiciary-র জন্য যদি মডেল খুজতে যান ১৮ শতকে deMontesquieu বলে এক লোক ছিলেন, স্পিরিট অব ল বলে একটি কিতাব আছে। সেখানে once again constitution নামে একটি চ্যাপ্টার আছে। ২০০ বছর আগের একটি নাম যদি মনে রাখতে হয়, তাহলে লোকটি নিশ্চয়ই কিছু করেছিল। আমার মনে হয়, একটি সিস্টেমের কারণে এই লোকটি আরও ১০০ বছর বেঁচে থাকবেন। ১৩ বছর রিসার্চ করে তিনি কিতাবটি লিখেছিলেন। সেখানে এগুলো পড়লেই পাওয়া যাবে। কিন্তু যারা একটি করবেন, আপনারা recommendation লিখে দিবেন। তারা পড়তে রাজী আছেন কিনা, নাকি আপনারা তাদের হয়ে পড়ে দিয়ে লিখে দিলেই মানবে? that's a matter of political decision.

কিন্তু আপনারা মনে রাখবেন, শুধু শুভেচ্ছার উপর পলিটিক্যাল লেভেলে রাষ্ট্রগঠণ প্রক্রিয়ায় কিছু করা যায় না; যদি না you can mobilize political support from that. আমরা এটি চাইতে পারি। যতক্ষণ না পর্যন্ত রেডি হবে, আমৃত্যু চাইব। বাট এগুলো ছাড়া যে গণতন্ত্র হয় না, সেটি বোধহয় আমরা সারা জীবন ধরে যে যেখানে থাকি, বলে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। thank you.

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, নুরুল কবির।

ক্রমাগতভাবে আমরা সময়ের স্বল্পতার মধ্যে পড়ছি। কিছু কিছু প্রশ্ন আছে, আমাদের ফেরত আসতে হবে। সে রকম প্রেক্ষাপটে আমি ড. মোহাম্মদ মানজুর এলাহী আপনাকে অনুরোধ জানাব সংক্ষেপে আপনার বক্তব্যটি উপস্থাপনের জন্য।

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী (অংশীজন) : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের সম্মানিত সভাপতি, সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত অভিজ্ঞ, সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, সবাইকে ধন্যবাদ।

আলহামদুল্লিাহ্ আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম। আমি সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করছি। সেজন্য আমি আমার পরামর্শগুলো সংক্ষেপে এখানে বলছি। লিখিত ব্যক্তব্যের কপি আমি কমিশনে পাঠিয়ে দেব ইনশাল্লাহ্। প্রথমে যেটি বলতে চাই, সবাই সেটি বলেছেন, তবুও আমি একটি বলি। পঞ্চদশ সংশোধনী এখানে বাতিলের কথা বলা হয়েছে। কারণ এখানে অনেকগুলো অযৌক্তিক এবং মুসলিম চেনতাবিরোধী ধারা রয়েছে। এটি বাতিল হলে আমার মনে হয়, সে দিকটি একটি সংগতিপূর্ণ অবস্থানে আসবে। আমরা দেখেছি, এখানে কেয়ারটেকার সরকার বাতিলের কথা বলা হয়েছিল। সংবিধানে কিছু অংশকে সংশোধনের অযোগ্য ঘোষণা করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হয়েছিল। এটি আমাদের একটি recommendation. পাশাপাশি আমরা যদি দেখি, আমাদের দেশের সংবিধান আছে কিন্তু তার পরেও সত্যিকার অর্থে ধর্মীয় স্বাধীনতা কি আছে? আমার পয়েন্ট হচ্ছে এখানেই যে, আসলে সংবিধানের কথাগুলো এমন হওয়া উচিত, যাতে সকল ধর্মের অধিকার সুনিশ্চিত হয়।

আমরা গত কয়েক বছর দেখেছি, অনেক মসজিদ পেড়ানো হয়েছে। হয়ত মসজিদ পেড়ানোর খবর তেমন আসে না। বাট অনেকগুলো মসজিদ পোড়ানো হয়েছে, মন্দির পোড়ানো হয়েছে, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি বিশ্বদ্যিালয়ে মেয়েদের হিজাব পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে অধিকার থাকলো কোথায়? ধর্ম পালনের বা ধর্মীয় অনুশাসন পালনের বিষয়টি আমি মনে করি, সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত। যে কোনও বিশুদ্ধ এবং প্রমাণিত ধর্মীয় আচারকে যে কোনওরূপ কটাক্ষ করা অথবা ধর্ম পালনকারী ব্যক্তিকে হেনস্থা করা বা অপবাদ দেওয়া নিষিদ্ধ করা উচিত। দ্বিতীয় হচ্ছে, আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থান ও সম্প্রীতি। মূলত বাংলাদেশে সম্প্রীতি আছে বলেই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। তারপরেও মাঝে মাঝে আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থান লজ্জিত হয়। তাহলে সংবিধান কীভাবে এর বিপক্ষে অবস্থান নেবে? বা এটাকে বন্ধ করার জন্য কীভাবে নিয়ম-কানুন করবে? আমরা বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দেখেছি, এখনও আছে। পার্শ্ববর্তী দেশে যখন অনেক বেশি সংঘর্ষ হয়, সেখানে বাংলাদেশ হয়ত কোন স্বার্থন্বেষী মহল করে কিন্তু সাধারণ জনগণ তাতে অংশগ্রহণ করে না। এর পরের বিষয়টি হচ্ছে, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা সংবিধানে যেটি দেখেছি, মূলত দুইটি জিনিস লেখা হয়েছে। এগুলো হলো, মানুষের জান এবং মাল। অর্থাৎ প্রাণ এবং সম্পদ সংরক্ষণের কথা। ইসলামের শরিয়তে আরও তিনটি জিনিসের কথা বলা হয়েছে এবং সেগুলো মৌলিক অধিকার হিসেবে কনসিডার করা হয়েছে। সেটি হলো, মানুষের ডিগনিটি বা সম্মান। তাঁর বংশধারা সংরক্ষণ এবং তাঁর বিবেক বুদ্ধির সংরক্ষণ। এটির উপর অনেক আলোচনা আছে। আমি সংক্ষেপে বলব যে, এ তিনটিকেও আমরা মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের আওতায় আনতে পারি কীনা? এরপর চতুর্থ বিষয়টি হচ্ছে, আইন প্রয়োগে সমতা। মনে হয়, আমাদের কথাবার্তা ঠিক আছে। কিন্তু আইন প্রয়োগে সমতা আমরা দেখি না। দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশে আমরা সেটি লক্ষ্য করেছি। আমাদের সংবিধানে যে সংস্কার হবে, সেখানে আইন প্রয়োগ সবার জন্য কীভাবে সমান হবে? এটি কীভাবে নিশ্চিত হবে। আমার মনে হয়, সেটি খেয়াল করে দেখা দরকার। এরপর আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আসতে চাই, সেটি হচ্ছে, আমাদের বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলিম। যদি এদেশের সকল জনগোষ্ঠীর কথা আসে, তাহলে মুসলিমদের কথা এক নম্বরে আসে। মুসলিম হিসেবে আমি নিজে সকল ধর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি এবং তাদের অধিকার যাতে সমানভাবে সংরক্ষিত হয়, সেটিও আমি প্রবলভাবে সমর্থন করি। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার সংরক্ষিত হচ্ছে? এটি নিয়ে চিন্তা এবং গবেষণা করার দরকার আছে। যদিও কোনও সন্দেহ নেই, ইসলাম হোক বা অন্য কোনও ধর্ম হোক, এটিকে হাতিয়ার হিসেবে বাংলাদেশের বাইরে অনেকেই ব্যবহার করেছেন। এমনকী কোনও কোনও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বও সেটি করেছেন। এটি অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? যদি আমরা একটু চিন্তা করি, তাহলে দেখব, যে ইসলাম অনেক মানুষ পালন করেছে, সেটি আসলে একাডেমিক ইসলাম না। যেমন ধরেন, আমাদের গুলিস্তানে যে মাজার আছে, প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০ লাখ লোক সেখানে টাকা দেয়। আমি অনেক রিকসাওয়ালাদের দেখেছি, যাদের ইনকাম খুব সামান্য, দিন আনে দিন খায়, সে কেন সেখানে টাকা দেয়?এটি কোন ইসলাম বলেছে? মাজারের লোকটি এমনিতেই মৃত্যু। তাকে কেন টাকা দেয় আর টাকা কোথায় যায়? এভাবে দরগাভিত্তিক আমরা যে ইসলাম চর্চা দেখি,

মাজারভিত্তিক গাজা খাওয়া, লালন শাহের মাজার-এসমস্ত বিষয়গুলো আমরা দেখি, তাহলে বুঝতে হবে যে একাডেমিক এবং knowledge based ইসলাম হলো একটি বিষয়। আরেকটি হলো, মানুষের আবেগের ইসলাম অথবা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা ধর্ম। এ জায়গায় আমরা একাডেমিক এবং knowledge based ইসলামের সাপোর্ট দিতে পারি, তাহলে মানুষের মধ্যে যেমন ধর্মীয় উগ্রতা থাকবে না ঠিক তেমনি মানুষ ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে না। তবে সচেতন জনগণ এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে পারে। আমি বেশ কয়েকটি বিষয় বলব, যেটি আমি একজন মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে আমি recommend করব। যদিও অতীতে কেউ কেউ ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছে। তারপরও মুসলিম জনগোষ্ঠীর একমাত্র চাহিদা হলো, আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা, বিশ্বাস, পরিপূর্ণ আনুগত্য যেন আমাদের সংবিধানে থাকে।

আমরা দেখেছি, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, কুয়েত, মিশর এসব দেশের মধ্যে এটি আছে। এটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর যেমন স্বার্থ রক্ষা করে ঠিক তেমনি অমুসলিমদেও স্বার্থ রক্ষা করে। সৌদি আরবে অনেক ইহুদি আছে আবার অনেক খৃস্টানও আছে। আমরা কখনও তাদের appressed হতে কুনিনি। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, যে মুসলিম এবং মুসলিম স্কলারদের চাওয়া, আমাদের আইনগুলো যদি কিবাং সংবিধানকে যদি এমনভাবে রচনা করা হয়, যাতে করে মুসলিমদের চিরস্থায়ী যে নীতিমালাগুলো আছে কোরআন, হাদিস, ইজমা সেগুলোর সাথে যেন বিরোধীতা তৈরি না হয়। প্রসঙ্গত এখানে আরেকটি কথা বলি, আল্লাহ্ কোরআনে বারবার উল্লেখ করেছেন যে, ইসলাম এসেছে সবার কল্যাণের জন্য, সকল মানবতার কল্যাণের জন্য। এ কারণে ইসলামের মেইন এবং কোর অবজেক্টিভ হচ্ছে, প্রত্যেকের জন্য কল্যাণকে নিশ্চিত করা এবং অকল্যাণ ও ক্ষতিকে প্রতিহত করা। এটির উপর ভিত্তি করে সমস্ত কার্যক্রম। কিন্তু ধর্মচর্চা অনেক সময় অন্যদিকে চলে যায়। ফলে মানুষ সেখানে ভুল কাজ করে। কিন্তু আমাদের আইন-কানুনগুলো যদি সুন্দর হয়, তাহলে আমার মনে হয়, মানুষ হয়ত সুন্দর ব্যবস্থাপনা পেতে পারে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, মদীনা সনদকে এখানে আমরা কোনওভাবে reference হিসেবে নিতে পারি কিনা? আমরা জানি, মদীনা সনদ হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান। এ সংবিধানে রাসুলুল্লাহ (স.) যে multirational যে সোসাইটি ছিল, multireligious সোসাইটি ছিল, যেখান pagans ছিল, ইহুদিরা ছিল, খ্রিস্টানরা ছিল; তাদের সকলকে মিলে এ ম্যাগনাকার্টাটি করেছিলেন এবং সেখানে সবার অধিকার তিনি নিশ্চিত করেছিলেন। আমাদের বাংলাদেশেও multicultural, multireligious country এবং এথনিক একটি দেশ। ফলে সেখানেও এ সনদ থেকে কিছু নেওয়া যেতে পারে। আরেকটি জিনিস আমি বলব, আমাদের আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে শরিয়াহ্-এর একটি স্পেস তৈরি করা যায় কীনা? যেটি মালয়শিয়া এবং সিঙ্গাপুরে আছে। সিঙ্গাপুর হচ্ছে, complete constitutional secular country.পৃথিবীতে অল্প কয়েকটি constitutional secular দেশ আছে, সিঙ্গাপুর এর মধ্যে একটি। আমরা ২০১০ সালে সেখানে গিয়েছিলাম। দুই সপ্তাহ অবস্থান করেছি এবং সেখানকার ইসলামিক অর্গানাইজেশনগুলো দেখেছি। সেখানে মুইস ১১ তলা একটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন আছে। এর ফিফথ এবং সিক্সথ ফ্লোরে একটি শরিয়াহ্ কোর্ট করেছে, just for who those wish. যাদের ইচ্ছা আছে অথবা যারা শরিয়াহ্ কোর্টের কিছু law, মুসলিম পারিবারিক আইন, সম্পত্তি এবং তাদের মধ্যে যে বিরোধগুলো হয়, এর সমাধান এরা শরিয়াহ্‌ভিত্তিক নেয় but এটি optional, যারা চায়। এর পাশাপাশি conventional law system ও আছে। এ জায়গায় আমার মনে হয়, মুসলিম দেশ হিসেবে আমরা এটিকে চালু করতে পারি কিনা? ইসলাম এবং অন্যান্য যে কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে যে কটুক্তিগুলো হচ্ছে বিদ্বেষমূলক, ব্যাঙ্গাত্মক, যেগুলো ফেসবুকে বা অন্যখানে হচ্ছে, আমার মনে হয়, এ ব্যাপারেও একটি সাংবিধানিক বক্তব্য থাকা উচিত। কারণ আমরা এখানে সুন্দরভাবে সহাবস্থান করতে চাই। কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে আমরা অবস্থান নিতে চাই না। নৈতিকতার মানদন্ডের বিষয়ে আমাদের প্রথম আলোচক কথা বলেছিলেন। আমরা যখন সংবিধান পড়লাম, তখন দেখলাম যে নৈতিকতার বিষয়ে কোনও explanation নেই, এটি কীসের based হবে? আমরা এটিকে ধর্মীয় মূল্যবোধভিত্তিক করতে পারি কিনা? যারা যে ধর্ম পালন করেন, সে ধর্মের ভিত্তিতে। কারণ সব ধর্মই ভালো মূল্যবোধের কথা বলে। এই জায়গায় নিজ নিজ ধর্মের মূল্যবোধকে সামনে রেখে এ নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কীনা? সর্বশেষ আমি আরেকটি বলব, সেটি হচ্ছে, দেশের জনগোষ্ঠীর মুখপাত্র হিসেবে যে কোনও আইনি প্রক্রিয়ায় বা সংবিধান সংস্কার প্রক্রিয়ায় তাদেরকে include করা যায় কিনা, এক জন দুইজন কিংবা যে কোনও পর্যায়ে যদিও এটি ঠিক যে, আমি আজকে আমার আলোচনা পেশ করলাম তারপরও এক্সপার্ট হিসেবে মুসলিম কোন exclusive কোনও প্রতিনিধি সংযুক্ত করা যায় কীনা, সেটি ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করব। সর্বশেষ অন্যদের সাথে মতামত ব্যক্ত করে বলব, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকারসহ যারা দেশের এক্সিকিউটিভ, তারা যেন দুই বারের বেশি নির্বাচিত না হন। নিরপেক্ষ, সুন্দর নির্বাচন ব্যবস্থার জন্য দলীয় সরকারের অধীনে যাতে নির্বাচন না হয় এবং সর্বক্ষেত্রে ন্যয়বিচার ও জবাবদিহিতা যাতে নিশ্চিত হয়, আমরা এমন একটি সুন্দর সংবিধান চাই। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

জনাব নূরুল কবীর (অংশীজন): আপনি অনুমতি দিলে আমি ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে শেষ করতে চাই। আমার একটু কথা বাকি ছিল।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের যে চ্যাপ্টারটি আছে, সেখানে পৃথিবীসুদ্ধ আন্তর্জাতিকভাবে যে পাঁচটি points আছে, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান, শিক্ষা; এটিই মৌলিক অধিকারের চ্যাপ্টারে নেই। যেটি আছে, অন্যত্র গিয়ে সেটির দিকে যাবে। ১৯৭২ সালে যখন সংবিধান হয়, তখন কেউ কেউ এটি আনতে দাবি করেছিলেন। তখন রুলিং পার্টির দিক থেকে যুক্তি ছিল যে, কথাটি ভালো। কিন্তু রাষ্ট্রের খাজাঞ্চিখানায় এত পয়সা নেই। পয়সা যখন হবে তখন আস্তে আস্তে আমরা সেখানে যাব। এখন ৫৩ বছর বয়সে দেখলাম, আমাদের এত পয়সা প্রায় ৯৩ বিলিয়ন ডলার এক বছরে আমার পাচার করতে পারি। এখানে আমার প্রস্তাব হচ্ছে, ৫৩ বছর পর এই জিনিসগুলো মৌলিক অধিকারের জায়গায় নিয়ে আসা হোক এবং সেটি legally enforceable করা হোক। যেমন–একটি সভা করতে না দিলে আমরা কোর্টে যেতে পারি। মৌলিক অধিকারের জায়গায় রাষ্ট্র কীভাবে করতে সেটি, economist এবং politician মিলে করবে। এটি একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সেটি legally enforceable করার একটি প্রস্তাব রাখছি।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম (অংশীজন) : সবাইকে ছালাম এবং শুভেচ্ছা।

আমার মনে হয় অনেক সময় চলে গেছে। মোটাদাগে একটি বড় প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলাম কীভাবে বলব। কিন্তু এখন মনে হয়, যেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলাম, সেভাবে বলতে পারব না। খুব দ্রুত বলে যাই, যাতে ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে। প্রথমেই আমি বলব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে যে জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের ক্ষমতায়ন; এ তিনটি variable আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে চাই। কারণ আপনারা যে পত্রটি পাঠিয়েছেন সে পত্রের মধ্যে যে উদ্দেশ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন হয়েছে, সে কমিশনকে আমি ব্যক্তিগত জায়গা থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। এ ব্যাপারে মতামত প্রকাশে সুযোগদানের জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

আমি বিগত ২২ বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি। জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন বিষয়ে আমি কাজ করি। আমি মূলত একজন learner. এখানে আমার শ্রদ্ধাভাজন মইনুল ইসলাম স্যার উপস্থিত রয়েছেন। পত্র-পত্রিকায় আমিও কিছু লেখালেখি করি। অনেক সময় স্যারের ফোন আমার কাছে চলে আসে। স্যার রাগ করে অনেককিছু বলেন। আমার ইচ্ছা ছিল, স্যারের সাথে সাক্ষাৎ হবে। তিনি অনেকগুলো কথা বলে দিয়েছেন। সেজন্য আমি কিছু জায়গায় repeat করব না। যেহেতু জনসংখ্যা নিয়ে আমি কাজ করি, আমার সুনির্দিষ্ট কিছু পয়েন্ট রয়েছে। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ চারটি component-এর মধ্যে একটি হচ্ছে, population. আমি unfortunately এই ৫৩ বছরের বাংলাদেশে একদম শুরুতে যখন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছিল, তখন জনসংখ্যাকে গুরুত্বের আকারে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল। এরপর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিংয়ের মধ্যে জনসংখ্যার বিষয়টি ওভাবে আসেনি। সে প্রেক্ষাপটে আমি বলব, আমাদের অনেক ক্ষেত্রে জনসংখ্যা সম্পর্কে ধারণা এবং চিন্তাও অনেকক্ষেত্রে পরিষ্কার নয়। জনসংখ্যার দুইটি dimension. একটি পরিমাণগত একটি গুণগত। ১৯৯৫ সালে কায়রোতে পৃথিবীর ১৭৫টি দেশ যৌথভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে মানুষের অধিকার, যেটি নুরুল কবির ভাই বললেন, এই রাইটস এবং ডেভেলপমেন্টের জায়গাটি একসাথে যেতে হবে। সেই জায়গাতে দেখা যায়, সংখ্যা বাড়ানো নয়, পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে তার জীবনের গুণগত মানোন্নয়ন। সেখানে আমরা খুজে পেলাম কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, gender equality, empowerment of women, reproductive rights, reproductive health এবং এই population growth structure যাই বলি না কেন, national action plan–এগুলোর প্রেক্ষাপট নিয়ে যদি সংবিধানকে দেখতে চাই, দেখেন আমাদের বিদ্যমান সংবিধানের মধ্যে, আজকে সকালে ইকরাম ভাইয়ের একটি আর্টিকেল পড়ছিলাম, বলা হচ্ছে constitutional recognition হচ্ছে human rights protection দেওয়া এ দুইটি কিন্তু দুই জিনিস, ভিন্ন জিনিস। কিন্তু সে জায়গাতে আমার মনে হয় ঘাটতি রয়ে গেছে।

এ প্রেক্ষাপটে আমি বলব, এই ৫৩ বছরের বাংলাদেশে যখন এ মুহূর্তে কথা বলছি, প্রতি দুই জন নারী যাদের বয়স হচ্ছে, ২০ থেকে ২৪ বছর কিন্তু বিয়ে হয়ে গেছে ১৮ বছরের মধ্যে এই বর্তমানের বাংলাদেশে। এই মুহুর্তে বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে, প্রতি তিন জন কিশোরীর মধ্যে একজন কিশোরী মা হয়ে যাচ্ছে। এই বাস্তবতার মধ্য দিয়ে যখন আসছি, আমার constitution-এর রাইটসের জায়গায়, দেখেন ২০১৩ সালে UN human rights council-এ ভোটাভুটি হয়েছে যে, আমরা বাল্য বিবাহকে মানবাধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে স্বীকৃতি দেব কিনা? unfortunately বাংলাদেশ এবং ভারত দুইটি দেশ ভোটই দেয়নি। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ভোট দিয়েছে। আমরা এই জায়গায় স্বীকৃতিই দেইনি। আমি যেহেতু পপুলেশন নিয়ে কাজ করি, আমি বলতে চাই, ডেমেগ্রাফিক প্রতিনিধিত্ব এই constitution-এর মধ্যে কতটুকু রয়েছে? প্রথম কথাই হচ্ছে, demography and gender এই দুটি শব্দ এক সাথে নেই, যদিও আমাদের আলোচনায় চলে এসেছে। সর্বশেষ যে জনশুমারি ঘটল ২০২২ সালে, এর সাথে আমারও অনেক দ্বিমত আছে। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেছি,

এটি নিয়ে কোনও doubt নেই। কিন্তু সে উপাত্ত যদি সত্য হিসেবে ধরে নেই, আমি দেখতে পেয়েছি যে, সে উপাত্তে নারীর সংখ্যা for the first time in বাংলাদেশ পুরুষের সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়ে গেছে। কিন্তু এর প্রেক্ষাপটে যদি মনে করেন যে, বাংলাদেশে পুরুষের সংখ্যার চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি, তাহলে এর প্রেক্ষাপটে সংরক্ষিত নারী আসনের কথা বলা হয়েছে, এটির proportional distribution কেমন হওয়া উচিত? দ্বিতীয়ত হলো, কিছুদিন আগে কোটা নিয়ে যে আন্দোলন হলো, মহামান্য কোর্ট থেকে যে রায়টি আসলো, সেটির মধ্যেও যে distribution করা হয়েছে, সেখানে জনসংখ্যার true প্রতিনিধিত্ব ঘটেনি। কাজেই আমি যেটি মনে করি, প্রথম জায়গা হচ্ছে demography and gender জায়গাটি আমার মনে হয়, এই সংরক্ষিত নারী আসনের জায়গাটি রয়েছে, এটি পরিমাপের ক্ষেত্রে আমাদের আরও সংযত হতে হবে এবং সরাসরি নির্বাচনের বিধান, যেটি আলোচনায় এসেছে, সেটি বাস্তবায়ন করতে হবে। পাশাপাশি দেখেন, transgender বলে একটি শব্দ আছে। হিজড়াদের আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি। transgender নিয়ে একটি প্রবলেম রয়েছে। এই যে শব্দচয়নের জায়গাগুলো আমাদের সংবিধানে কীভাবে আসবে? জনসংখ্যার উপ-গোষ্ঠীগুলোকে আমাদের identifz করতে হবে। তারপর আমি যাব rights choice -এর জায়গায়। দ্বিতীয় আমি যেটি বলতে চাই, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা। ২০২২ সালে আমাদের সর্বশেষ যে জনশুমারী হলো, ৫০ নৃগোষ্ঠীকে for the first time স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাহলে এই ৫০টি মধ্যে যদি proportion সংখ্যা দেখি, তাদের সংখ্যা দেশি proportionally কমছে এবং interesting বিষয় হচ্ছে, সেখান থেকে সঠিকভাবে নৃগোষ্ঠীকে আমরা বিবেচনায় আনতে পেরেছি কিনা, সেটি নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও সংবিধানে ২৩ (ক) তে যেখানে বলছে, রাষ্ট্র, উপজাতি, ক্ষুদ্রজাতিস্বত্ত্বার নৃগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়। তাহলে এই যে শব্দগুলো–উপজাতি বলছি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলছি, ক্ষুদ্রজাতিসত্তা বলছি, এগুলোর terminological ব্যাখ্যা লাগবে। সুতরাং definition যদি ক্লিয়ার না থাকে, নৃ গোষ্ঠীরা কেউ কেউ আদিবাসী দাবি করছেন। তাহলে এই জায়গায় আমাদের খেয়াল করার ব্যাপার রয়েছে। তৃতীয়ত আমার যেটি মনে হয়েছে যে, জাতীয় সংসদে সাধারণ মানুষের জনপ্রতিনিধিত্বের যে জায়গাটি, সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি, পার্লমেন্টে ব্যবসায়ীদের একটি বড় অংশ ঢুকে গিয়েছে। তাহলে অধিকারের জায়গা থেকে তাকে আমি কীভাবে বিরত করব? আমি কি শুধু পার্লামেন্টে ব্যবসায়ীদের বেশি দেখব? নাকি জনসংখ্যার other proportion যারা রয়েছে, তাদেরকে কীভাবে আনব? সে জন্য আমার মনে হয়, আমাদের এ ভাবনাটি মাথায় নিতে হবে। just an example. এখানে আমার আরেকটু বলার রয়েছে, সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের যোগ্যতা নিয়ে। তাদের যোগ্যতা এবং তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আইনের বিধান কী হবে, সংবিধান আইন তৈরি করবে না কিন্তু সংবিধান একটি রূপরেখা প্রদান করবে। সে আলোকে আমার মনে হয় চিন্তা করা যেতে পারে। চতুর্থত হচ্ছে, আমরা কখনও পরিকল্পনার মধ্যে জনঘনত্বের বিষয়টি আনছি না। নাগরিকের সম্পত্তি অধিকার, এ মুহূর্তে বাংলাদেশের কথা বলছি, প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৪০০ এর বেশি মানুষ বসবাস করছে। অথচ ভারতে মাত্র ৪৫০ জন, চীনে ১৫৭ জন। আর আমাদের একটি ছোট্ট territory, পৃথিবীর অষ্টম জনবহুল দেশ, এখানে density নিয়ে আমাদের কোনও প্ল্যান নেই, আমরা পরিকল্পনা করছি না। সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে একজন মানুষ কতটুকু প্রোপার্টির মালিক হতে পারে। আমার মনে হয়, সম্পত্তির ক্ষেত্রে সীমারেখার বিষয়টি পর্যালোচনা করা এবং এ সংক্রান্ত বিধান যদি সংযোজন করা যায় কিনা, সেটি আপনারা ভেবে দেখতে পারেন। পঞ্চমত আমি বলতে চাই যে, জনসংখ্যার কতগুলো উপগোষ্ঠী আছে। এই উপগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আমাকে identifz করতে হবে। এখন দেখেন প্রবীণ জনগোষ্ঠী বাড়ছে, ইয়াং যারা revolution করল, যারা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল, আমরাও ছিলাম। এই ইউথদের definition নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়ে গেছে। সরকার বলছে এক রকম, youth policy, বিবিএস বলছে এক রকম। একেক জায়গায় একেক রকম তথ্য রয়েছে। সরকার বলছে, ১৮ থেকে ৩৫। আবার কোনও জায়গায় বলা হচ্ছে, ১৫ থেকে ২৪। আবার কোনও জায়গায় বলা হচ্ছে, ১৫ থেকে ২৯।

এই definition-এর শব্দচয়ন, even বয়স্ক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, definition-এর জায়গায় একটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই যে জনগোষ্ঠী রয়েছে, সেখানেও আমরা properly হিসাব করতে পারিনি। এ নিয়ে কথা বলার পরও কাজ হচ্ছে না, আশা করি হবে। আমার মনে হয়, এই জায়গাগুলোতে vulnerable যে জনগোষ্ঠী, তাদেরকে বিবেচনায় নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এ জায়গাগুলো ছিল population proportion-এর জায়গা থেকে। দ্বিতীয় যে জায়গাটি থেকে আমি বলতে চাই, সংবিধানের কার্যকারিতা নিয়ে। আমাদের সংবিধান আছে কিন্তু কার্যকারিতার ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছি? একটু আগে নুরুল কবির ভাই মূলনীতির কথা বললেন। মূলনীতির কথা বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে কী রূপায়িত হয়েছে? এ কার্যকারিতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমরা অনেকক্ষেত্রে পারিনি। এ সংবিধানের বিধানসমূহে মুক্তিযুদ্ধ হল এবং জুলাই-আগস্টের বিপ্লবের চেতনা আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাস্তবায়নের পথ আমাদের সুগম রাখতে হবে। যেহেতু আমি জনসংখ্যা নিয়ে কাজ করি, একটি example দেই শুধুমাত্র আপনাদের জানার জন্য যে দেশ কীভাবে চলছে? ২০১২ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি হয়েছে। এটির একটি সাংবিধানিক বডি আছে national population council. আমাদের prime minister হচ্ছেন এটির সভাপতি। বিগত ১৩ বছরে ২৬টি সভা হওয়ার কথা ছিল। একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়নি। এর মানে কী দাড়াল? এর মানে হচ্ছে, আমরা নীতি তৈরি করি এবং এ নীতির বাস্তবায়ন করি না। এক্ষেত্রে আমি categorically বলতে পারি, অনেকগুলো পলিসির ক্ষেত্রে

সমস্যা রয়েছে। এখন যে কথাটি সেটি হচ্ছে, এখানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান হবে নাকি প্রজাতন্ত্র হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, প্রজাতন্ত্র শব্দটি বাদ দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত। এখানে নাগরিকের অধিকারের জায়গাটি properly reflected হচ্ছে বলে আমি মনে করি না। যদি আলী রিয়াজ স্যারের মতো আমি political scientist নই। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হচ্ছে, এখানে অধিকারের জায়গাটি কোনও না কোনওভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। আজকে আমরা সংবিধান সংস্কার নিয়ে যে আলোচনা করছি, সে আলোচনা অনেক সময় ক্ষুদ্র পরিসরে হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রের পর্যায় থেকে ঘটেনি। সেজন্য আমরা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকবে যে, প্রতি ১০ থেকে ১২ বছর পর পর অথবা নিয়মিত বিরতিতে সংবিধানকে আধুনিকীকরণ এবং যুগপযোগি করার জন্য পর্যালোচনা করার দরকার রয়েছে। কারণ সংবিধান এমন নয় যে এটিকে আর পরিবর্তন করা যাবে না। এর মধ্যে আলোচনা পর্যালোচনা থাকবে এবং এর ডিমান্ড থাকতে হবে। সে ডিমান্ডের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট টাইমের বিরতিতে অধুনিক এবং যুগোপযোগি করা। এছাড়া অনেক বক্তারা বলে গেছেন, ৭০ অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে আমারও মতামত রয়েছে। এখানে আমূল সংস্কার লাগবে। প্রধানমন্ত্রীর মতের বিরুদ্ধে গেলে সদস্য পদ চলে যাবে, এটি যাতে না ঘটে। আমি কথা না বাড়িয়ে শুধু একটি কথা বলতে চাই, সংসদ আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচিত হয়ে হয়ত পার্লামেন্টে যাবে, parliament law তৈরি হবে। এই ল'গুলো দেখা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো ঠিকমতো বাস্তবায়ন করে না। তাহলে এখানে এমন একটি mechanism রাখা যে মেকানিজমের মধ্য দিয়ে মনিটরিং থাকা, follow up করা, এটিকে কীভাবে দায়বদ্ধতার মধ্যে নিয়ে আসা যায়, সেটি চিন্তা করা। আমাদের এই যে রেভুলেশন ঘটলো এর স্পিরিট যাতে সংবিধানের মধ্যে থাকে, যেমন-কোটা সংস্কারের বিষয় ছিল, বৈষম্যহীনতার কথা বলা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে যে সংবিধান রয়েছে, সেটির সামগ্রিক সংশোধন করবেন, নাকি সংযোজন করবেন, নাকি বিয়োজন করবেন, পরিমার্জন করবেন নাকি পুনর্বিন্যাস করবেন, নাকি পুনর্লিখন করবেন। এই যে শব্দচয়নগুলো দেখি, সেগুলোর প্রত্যেকটির অন্তর্নিহিত মর্মার্থ রয়েছে। সে জায়গাগুলো আমাদের আরও বড় পরিসরে ভাবার সুযোগ রয়েছে। একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আমাদের পার্লামেন্টে যারা lawmakers হবেন, তাদের দায়িত্ব রয়েছে। তাদেরকে কীভাবে আরও বেশি দায়িত্ব সচেতন করা যায় এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার জায়গা থেকেও আমার মনে হয়, ভাবনা চিন্তার বিষয় রয়েছে। দেশ কীভাবে চলবে, সেখানে জনগণের মতামত মূখ্য, অন্য কারও নয়। আপাতত আমার কথা এটুকুই। আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের প্রত্যাশা রয়েছে কিন্তু প্রাপ্তি কতটুকু ঘটবে, সেখানে ব্যবধান আমরা যত কমিয়ে আনতে পারব, ততোটাই হবে আমাদের জন্য মঙ্গলজনক। অনেক ধন্যবাদ আমার কথা শোনার জন্য।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আপনার বক্তব্যে আমি বুঝতে পারছি, আপনার বক্তব্য অনেক সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। আপনার যদি লিখিত থাকে, সেটি যদি নোট আকারে আমাদের সরবরাহ করেন, তাহলে আমাদের সহায়তা হবে।

জনাব মো: মুসতাইন বিল্লাহ (কমিশন সদস্য): একটু জানার জন্য আমার একটি প্রশ্ন রয়েছে, আপনি জনমিতিক representation-এর যে ডায়মেনশনগুলোর কথা বললেন, আমাদের existing parliament যে সদস্যসংখ্যা আছে, এটি কী আমাদের demography থেকে governable minimum unit সেটির সাথে একটি adequate অথবা differently ভাবার বা চিন্তার কোনও গবেষণা আপনার আছে?

অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম (অংশীজন): আপনাকে ধন্যবাদ।

আপনি চমৎকার প্রশ্ন করেছেন। আমাদের জনসংখ্যার উপগোষ্ঠীগুলোর খাত থাকে কিন্তু পরিকল্পাগুলো সেভাবে করি না। তবে অবশ্যই এর মধ্যে সুযোগ রয়েছে। এটি ভাবা দরকার যে, সময়ের ব্যবধানে একটি জায়গার জনসংখ্যার আকার পরিবর্তন হয়ে যায়। সময়ের ব্যবধানে সেখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর ঘটে। জন্ম, মৃত্যু, স্থানান্তর–এগুলো একটি dynamics সেখানে কাজ করে। এ বিষয়গুলো যদি আমি বিবেচনা না নেই এবং লোকাল যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে, তাদের মধ্যে যদি সক্ষমতা না থাকে, সেটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে যাবে। আমি আপনাকে বলছিলাম যে, আমার দেশের জনসংখ্যার আকার কত? এটি নিয়েই একটি ডিবেট রয়েছে। এই ডিবেটের মধ্যেও যদি scientific mechanism-এ আমরা যাই, আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন যে এখানে আনুপাতিক হারে বন্টন করার সুযোগ রয়েছে। এটি করতে গেলে বয়সভিত্তিক, লিঙ্গভিত্তিক কতগুলো parameter রয়েছে, সে প্যারামিটারগুলো দিয়ে আমরা calculate করে দিতে পারব।

জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য) : ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহীর কাছে আমার ছোট একটি জিজ্ঞাসা। আপনি জ্ঞানভিত্তিক ইসলামকে সংবিধানে incorporate or accommodate করার কথা বলেছেন। অতীতে দেখা গেছে যে,terminologically ইসলাম শব্দটিকে ব্যবহার করে, political benefits নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সন্নিবেশিত হয়েছে। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম যদি একটু ঘুরিয়ে বলি যে, ধর্মভিত্তিক আইডিয়া যাদের মাথায় আসে যে, ইসলামি মূলনীতি না মূল বিষয়ে সংবিধানে কাঠামো হবে। এ রকম যদি হত, তাহলে একটি ধারনা করা যেত যে, যারা ইসলাম নিয়ে কাজ করেন, সংবিধানের সাথে তাদের সামঞ্জস্যতা। আমাদের এখানে উল্টো

হয়েছে। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম terminologically ব্যবহার করে এর সাথে সম্পর্কবিহীন সংবিধান অতীতে তৈরি হয়েছিল। আপনার জ্ঞানভিত্তিক ইসলামকে রেখে সংবিধানের আইডিয়াটি প্রপোজ করেন, সেক্ষেত্রে কী আমরা রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম terminologically এর এই ডিবেট থেকে সরে আসার সুযোগ আছে কিনা?

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী (অংশীজন): ধন্যবাদ।

আসলে আমি যেটি মিন করেছি, সাধারণ জনগণের চর্চায় আমরা যে ইসলামকে পাই, অনেক সময় সেগুলোর মধ্যে দারুন বিচ্যুতি আছে। মানুষ সেগুলো নিয়েই ঝগড়া করে মাজার নিয়ে কিংবা মাজার ভাঙ্গা-এসব বিষয় নিয়ে। সংবিধানে মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রতিনিধিত্ব কীভাবে হতে পারে, আমার প্রশ্নটি ছিল মূলত সেটিই। এজন্যই আমি নলেজবেজড ইসলামের কথা বললাম। মুসলিমদের ঈমান, আস্থার প্রতিনিধিত্ব; পঞ্চদশ সংশোধনীর আগে যেটি ছিল, আস্থার কথা ছিল, আমি জানি না সেটি কেন তারা বাতিল করল? এটির মাধ্যমে এখানকার অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর যেমন প্রতিনিধিত্ব তেমনি অন্য ধর্মের লোকজনদের সাথে কোনও contradiction হচ্ছে না। এটি একটি বিষয়। আমি আসলে সেটি মিন করিনি যে, ইসলামের সমস্ত আইনগুলো এখানে incorporate করবেন। এখানে স্পেসেফিক কয়েকটি কথা বলা হয়েছে। যেমন–ইসলামের মূলনীতির বিরোধী কোনও আইন যাতে রচনা না করা হয়। যেহেতু বড় একটি জনগোষ্ঠী তাতে আহত হবেন। দ্বিতীয় হচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং আস্থা আগে include ছিল। সেটিকে আবার include করা। আরেকটি বিষয়, মুসলিমদের যেহেতু কোরআনভিত্তিক সমস্ত আইন এবং বিধান রয়েছে, সেখানে সিঙ্গাপুর মডেলে কিংবা মালয়শিয়া মডেলে এমন কোনও স্কোপ কিংবা স্পেস রাখা যায় কিনা, যেটি রাখা উচিত বলে আমরা মনে করি, যাতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যকার কেউ আল্লাহ্‌র বিধানগুলো ফলো করতে পারে। এটি হয়ত সংক্ষিপ্তসারে আছে। যেমন succession law-এর ক্ষেত্রে আছে, বিবাহের ক্ষেত্রে আছে, তালাকের ক্ষেত্রে আছে। কিন্তু এটিকে আরেকটু বড় করা যায় কিনা, যেটি সিঙ্গাপুর করেছে অথবা মালয়শিয়া করেছে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমার ছোট ছোট দুই তিনটি প্রশ্ন আপনার কাছে, বোঝার স্বার্থে। একটি জিনিস আপনি বলেছেন, রাষ্ট্রপতি পদে সরাসরি নির্বাচন করার কথা। সেক্ষেত্রে অনেকের একটি আশংকা থাকে যে, রাষ্ট্রপতি যদি সরাসরি নির্বাচিত হন, যেহেতু তিনি গোটা দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন, অন্যপক্ষে প্রধানমন্ত্রী আসলে একটি constituency represent করেন, সেক্ষেত্রে ক্ষমতার এক ধরণের সংঘাতের তৈরি হয় কিনা? পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে অনেকেই এই ভীতির মধ্যে আছেন। সেটি হ্রাস করার উপায় কী?

ড. মইনুল ইসলাম (অংশীজন): এখানে আমি ফরাসি সংবিধানের সাহায্য নেওয়ার কথা বলেছি। ফরাসি সংবিধানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সরাসরি ভোটে হয়ে থাকে। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে আমাদের পথ দেখাতে পারে ফরাসি সংবিধান। সেখানেও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসম্য অত্যন্ত সুন্দর অবস্থায় আছে। একটু মনে হয়, ফরাসি রাষ্ট্রপতিকে বেশি ক্ষমতা দিয়ে ফেলেছে। এটি চার্লি ডেঘলের সময় কিছুটা সংশোধন করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। আমার মনে হয়, যদি আমরা এই নির্বাচনটিকেও সরাসরি নির্বাচনের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে হয়ত একেবারে ৫০-৬০ শতাংশ ভোট পড়বে না কিন্তু আমার মনে হয়, বর্তমানে যে সংসদের মাধ্যমে ৭০ ধারার অধীনে কেউ প্রধানমন্ত্রীর কথার বাইরে যেতে পারে না। বর্তমানে আমাদের সংসদ একটি dividing house, প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্ব। ৭০ ধারার কারণে এখানে প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্বই আছে। প্রধানমন্ত্রী আমাদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। আমাদের স্বৈরশাসক হাসিনার সাথে বর্তমান রাষ্ট্রপতির যে সম্পর্ক, শেষের তিন মাসে তাদের মধ্যে কোনও কথাই হয়নি এবং যাওয়ার সময় গণভবন থেকে রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়ে তার পদত্যাগ পত্র দেওয়ার কথা ছিল। কলও করেছিলেন। কিন্তু তিনি যাননি। তিনি এর আগেই চলে যান। এরজন্য তিনি এখনও দাবি করছেন যে, তিনি প্রধানমন্ত্রী রয়ে গেছেন। এই যে স্বৈরশাসন ডেকে এনেছে, সেখানে আমাদের রাষ্ট্রপতিকে একেবারে শিখন্ডী বানিয়ে ফেলা হয়েছে। জাস্টিস শাহাবুদ্দিনকে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ যখন রাষ্ট্রপতি করেছিল, তখন বলেছিলেন, মাজার জিয়ারত করা ছাড়া বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কোনও ক্ষমতা নেই। এই কথাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি মনে করি, আমাদের রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতায়িত করা দরকার, ব্যালেন্স আনা দরকার। আমি সেজন্যই ফরাসি সংবিধানের কথা আমার লেখাতে উল্লেখ করেছি। আমার মনে হয়, সেখানে আপনারা কিছুটা গাইডলাইন পেয়ে যাবেন। এই নির্বাচনটি মনে হতে পারে অত্যন্ত ঝামেলাপূর্ণ। কিন্তু আমি মনে করি, বাংলাদেশে গণভোট বেশ কয়েকবার হয়েছে। সর্বশেষ দ্বাদশ সংশোধনীর উপর যে গণভোট হয়েছে প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন রাষ্ট্রপতি থাকার সময়ে ১৯৯১ সালে গণভোটটি হয়েছিল। সেখানে ৩৫ শতাংশ ভোট পড়েছিল। এরচেয়ে ভালো গণভোট বোধহয় বাংলাদেশে একটিও হয়নি। কারণ এর আগে জিয়াউর রহমান এবং এরশাদ গণভোটের নামে প্রহসন চালিয়েছিল। আমার মনে হয়, সংবিধানে যদি সরাসরি আপনি গণভোটের ব্যবস্থা রাখেন এবং নির্বাচন সংস্কারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পুরো কাঠামো যদি তুলে ধরেন, আমার মনে হয় যে, একটি ভালো নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে পারব। এখানে আমি মনে করি, ১০০ জন নারী সদস্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। one third of the total members rotation basis-এ প্রত্যেক তিনবারের নির্বাচনে প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক

আসনে নারীদের প্রতিনিধিত্ব এনশিওর হবে। আমি মনে করি, বর্তমানে আমরা নরীদের জন্য যে ৫০টি আসন সংরক্ষণ করছি, সেটি মোটেও তাদের ক্ষমতায়িত করছে না। আমার মনে হয়, আমরা ওয়ান থার্ড মেম্বার যে constitution-এ ব্যবস্থা রাখি। প্রত্যেকবার নির্বাচনে ২০০ জন পুরুষরা থাকবে, ১০০ জন rotation basis নারী থাকবে। তাহলে আমার মনে হয়, নারীদের সত্যিকার অর্থে জনপ্রতিনিধিত্বশীল করার জন্য এটি বিশাল একটি পদক্ষেপ হবে। আপনাকে ধন্যবাদ।

জনাব ফিরোজ আহমেদ (কমিশন সদস্য): আমি একটি প্রশ্ন করে রাখি, এখনই উত্তর দিতে হবে না। আপনারা যখন লিখিতভাবে দিবেন, তখন থাকলেই হবে। আজকে সময় সংক্ষিপ্ত। দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হয়েছে এবং আমরা আপনাদের মতামত জেনেছি। আমি ছোট চোট কয়েকটি প্রশ্ন করে রাখি, যখন আমরা বলছি যে, দুই বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী যাতে নির্বচিত না হন, তেমন একটি বিধান রাখা। যদি এমন হয় যে প্রধানমন্ত্রীকে একবছর কিংবা ছয় মাসের মাথায় পদত্যাগ করতে হচ্ছে কিংবা বিদায় নিতে হচ্ছে, সংসদীয় গণতন্ত্রে সেটি হতে পারে, সেজন্য তার জন্য একটি সীমা যেটিতে তিনি থাকতে পারেন, পাঁচ বছর হয়ত তিনি থাকতে পারলেন না দুই বার মিলিয়ে, সেক্ষেত্রে একটি সময় নির্ধারণ করা যায় কিনা, এত বছরের বেশি তিনি থাকতে পারবেন না। আমি জানি না, তবে এ বিষয়ে একটি সমাধান আমাদের লাগবে। এ বিষয়ে প্রস্তাব আমরা আপনাদের কাছ থেকে চাইব। দ্বিতীয় স্যার অধ্যাপক আলী রীয়াজ যে প্রশ্নটি করেছেন, রাষ্ট্রপতি সরাসরি নির্বাচনের ব্যাপারে। এখানে ফরাসি মডেলে নির্বাচনের কথা এসেছে। সেখানে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থা। আমাদের দেশে যদি সংসদীয় পদ্ধতির একটি শাসন রাখি, যেমন ভারতে কার্যত রাষ্ট্রপতির হাতে যদি মাজার জিয়ারত ছাড়া কোনও ক্ষমতা না থাকে, কেউ যদি বলেন যে তাতে সমস্যা কী? কারণ ভারতের রাষ্ট্রপতি কার্যত তাই। সেটি একটি আলঙ্কারিক পদ। যেটির কথা এখানে বিচারপতি আব্দুর রউফ বলেছেন, ৭২ এর সংবিধানের এত সমস্যার পরও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী ছিল বলে যে উদাহরণ দিলেন যে ১৪৪ ধারা জারির বিরুদ্ধে আদালত একটি রায় দিয়েছিল, এ রকম আরও কিছু রায়ের কথা আমরা জানি অরুণা সেনের মামলাটিতে যেখানে তার জবানবন্দীতে বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্য তার একটি remedy দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করে আমরা একই কাজ করতে পারি কীনা যে প্রধানমন্ত্রীকে দায়বদ্ধতায় আনা, সেটি আমরা ভাবব কীনা এবং সে বিষয়ে আপনাদের ভাবনাগুলো আমরা জানতে চাইব। এছাড়া তত্ত্বাবধায় সরকারের বিষয়ে আপনাদের ভাবনাগুলো আমাদের জানা জরুরি যে আপনারা কী সুপারিশ করছেন। কারণ এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তত্ত্বধায়ক সরকার ব্যবস্থা আমরা স্থায়ীভাবে চাই কীনা? নাকি কয়েকটি বারের জন্য চাই কিংবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়টি আগেও যেভাবে নানান জটিলতায় পড়েছে, সে রকম জটিলতায় পড়বে কিনা? যেহেতু আমরা ভবিষ্যতে দিকনির্দেশনা তৈরি করতে চাই, সে বিষয়ে আপনাদের সুচিন্তিত মতামতগুলো লাগবে। আমরা আশা করব এটিও আপনারা লিখিতভাবে যখন দিবেন, এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখবেন। ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী যেটি বলেছেন যে মাজার ভাঙ্গা কিংবা মাজারভিত্তিক যেহেতু এটি জ্ঞানভিত্তিক ইসলাম নয়, ফলে এ সমস্যাটি হয়। আমি ভুলও হতে পারি সম্ভবত প্রধান সংকটটি মাজারবিরোধী ইসলামের মধ্যে দেখি না। এর বাইরেও নানান রকম দ্বন্দ। যেমন দেওবন্দী বনাম হানাফি, হানাফি বনাম সালাফি আরও নানান রকম বিতর্ক আমরা দেখি। এটি কখনও কখনও সংঘাতের জায়গায় যায়। যেহেতু মাজার একটি পলিটিক্যাল প্রশ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যদি মাজার নিয়ে না থাকে তখন দেখা যাবে অন্য আরেকটি বিষয় একইভাবে অথবা আরেকভাবে তৈরি হবে। প্রত্যেককে তাদের মতাদর্শের স্বাধীনতা দিয়ে ধর্মচর্চা করুক। কাউকে নির্ধারণের শক্তি না দেই, সেটি আরেকটি সমাধান হতে পারে কীনা যে, এটি জনপ্রিয় কিন্তু ভুল ইসলাম, এটি অজনপ্রিয় কিন্তু একাডেমিক ইসলাম–এই বিভাজনে আমরা যাব কীনা বা এর এখতিয়ার কার থাকবে? সেটি হয়ত ভবিষ্যতে সমস্যা হিসেবে আসবে। সে বিষয়ে আপনাদের লিখিত মতামত আমাদের কাজে লাগবে। আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের সহযোগিতা করবেন। ধন্যবাদ।

ড. মইনুল ইসলাম (অংশীজন): আমি একটু যোগ করি, আসলে ভারত আমাদের এ ব্যাপারে খুব ভালো guideline দিবে না। আমাদের জন্য ভালো guideline দিবে ফিলিপাইন, যেখানে রাষ্ট্রপতি দুই বারের বেশি পারে না। ইন্দোনেশিয়ায় সরাসরি জনগণের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং সেখানে দুইবারের বেশি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা যায় না। এ দুইটি মডেল অত্যন্ত ভালোভাবে কাজ করছে। ১৯৯৮ সালে সুহার্তোর পতনের পর থেকে ইন্দোনেশিয়ায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দুই বারের বেশি পারেন না। আমরা জানি, ফিলিপাইনেও মার্কোসের পতনের পর একুইনো অত্যন্ত জনপ্রিয় থাকা স্বত্ত্বেও তিনি দুইবার নির্বাচন করেছিলেন। আমাদের সাড়ে ১৭ কোটি মানুষের দেশ কিন্তু ইন্দোনেশিয়া প্রায় ৩০ কোটি মানুষের দেশ। তারা যদি এ নির্বাচন করতে পারে, আমরা সাড়ে ১৭ কোটি মানুষের দেশ হয়ে পারব না কেন?

আমার মনে হয়, এ প্রশ্নটি আমার মনে হয় সংবিধানে যদি যথেষ্ট guideline দিয়ে দেই নির্বাচন সংস্কার কমিশনের মাধ্যমে বা আপনাদের মাধ্যমে হতে পারে। তাহলে আমার মনে হয়, এটি অসুবিধা হবে না। আরেকটি বিষয় যেটি আপনি উল্লেখ করেছেন, সেটি হলো যে, আমরা এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলছি, আমরা অনেকেই খেয়াল করি না যে, সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের চার তিন সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল হয়েছিল including আপিল বিভাগের একমাত্র যে নারী বিচারপতি ছিলেন জেসমিন সুলতানা, তিনিও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন এবং যে ১৫ সদস্যের সংসদীয় কমিটি করা হয়েছিল, তারা তত্ত্বাবধায় সরকার রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং তা পুরো রূপরেখা পঞ্চদশ সংশোধনীর খসড়া সংশোধনীতে রয়ে গেছে। অতএব সেটি

আপনাদের পথ দেখাতে পারবে যে সত্যিকারভাবে আমরা যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা রাখতে চাই, তাহলে কী হতে পারে সেটি সংসদীয় কমিটির প্রসিডিংগুলো যদি আপনাদের হাতে থাকে, তাহলে সেখানে আপনারা অত্যন্ত ভালো একটি guideline পেয়ে যাবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): সবাইকে ধন্যবাদ।

দীর্ঘ সময় ধরে আপনারা আমাদের সাথে থাকলেন। ঢাকায় যানচলাচল একটি দুরুহ কাজ; এরমধ্যেও আপনারা এসেছেন, সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের অনুমতি পেলে এখনকার অধিবেশন শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

ষোড়শ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ২৭ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : দুপুর ২:৩০ থেকে ৫:১৫ পর্যন্ত

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:

১। অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক, কমিশন প্রধান

২। অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য

৩। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য

৪। ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিকী, বার-এট-ল সদস্য

৪। ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল সদস্য

৫। জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক সদস্য

৬। জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ, লেখক সদস্য

অংশীজনদের তালিকা:

১। জনাব রোমান উদ্দীন,

২। জনাব আখতার হোসেন খান, সাধারণ সম্পাদক (প্রতিনিধি), নোয়াব।

৩। প্রফেসর মোঃ রবিউল ইসলাম, চেয়ারম্যান, আইন ও বিচার বিভাগ ডিপার্টমেন্ট অব ল' এন্ড জাস্টিস, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববদ্যালয়।

৪। জনাব রোমান উদ্দীন, সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস)।

৫। জনাব আপন জহির, সিনিয়র রিসার্চ এ্যাসোসিয়েট, সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস)।

৩। প্রফেসর মির্জা তাসলিমা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক।

৪। প্রফেসর কাজী মারুফুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক।

৫। সানজিদা ইসলাম তুলি, অর্গানাইজার, মায়ের ডাক।

৬। জনাব মোঃ জুনাইদ, সহকারী মহাসচিব, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন।

৭। জনাব মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন রিসার্চ অ্যান্ড রেফারেন্স অফিসার (যুগ্ম জেলা জজ) আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

৮। মুশফিকুর রহমান জোহান, প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, মায়ের ডাক।

৯। তামান্না সিং বারাইক, প্রজেক্ট অফিসার, দলিত নারী ফোরাম।

১০। পূজা রানী, দলিত নারী ফোরাম।

১১। নাদিরা পারভীন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, নাগরিক উদ্যোগ।

১২। সুলতান মোঃ সালাউদ্দিন সিদ্দিক।

১৩। জয়া শিকদার, সভাপতি, সম্পূর্ণা।

১৪। সুদীপ কুমার দাস (শাওনী), সম্পূর্ণা।

১৫। নাজমা আক্তার, সভাপতি, সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন।

১৬। মাসরুর সালেকীন, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন।

কার্যবাহ প্রস্তুতকারক:

১। ফারজানা আক্তার, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সম্পাদনায়:

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহ

কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক আলী রিয়াজ (কমিশন প্রধান): সবাইকে ধন্যবাদ।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ, আমি এই কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে, সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা গত ৩ দিন যাবৎ বিভিন্নভাবে ছোট ছোট আকারের অধিবেশনে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করছি যাতে করে সকলের কথা শোনার সুযোগ হয়। আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকের এই অধিবেশন শুরু করার আগে সেইসব শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় প্রদান করবেন।

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে এবং বিভিন্ন সংগঠনের যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। সময় স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আপনারা ১০ থেকে ১২ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে সকলের মতামত শোনার সুযোগ হবে। আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব লিখিত আকারে আজকে আমাদের কাছে দিতে পারেন অথবা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ, বক্তব্যের শুরুতে আপনাদের নাম এবং আপনি যদি কোনো সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করেন তবে সংগঠনের নাম বললে আমাদের জন্য নোট গ্রহণ এবং রেকর্ডিং এ সহায়ক হবে।

[এ পর্যায় অংশীজন নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমরা আজকে শুরু করব প্রফেসর মোঃ রবিউল ইসলামের বক্তব্য দিয়ে। আমরা সকলের কথা শুনতে চাই। হয়তো আমাদের কিছু প্রশ্ন থাকবে। সকলকে অনুরোধ করি, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যদি ১০ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, তাহলে এক ধরণের interaction এর মধ্যে যাওয়া যাবে। প্রফেসর মোঃ রবিউল ইসলাম।

প্রফেসর মোঃ রবিউল ইসলাম : ধন্যবাদ, স্যার। আমি প্রথমেই মনে করি যে, Constitution শুধুমাত্র the highest law of the state না। Constitution is a symbol. Constitution is a manifesto and that was the very landmark statement given by the English Jurist K. C. Wheare. সুতরাং This Constitution utterly failed to uphold the democracy, the republican character and the equality. সুতরাং এই Constitution scrap করার পক্ষে আমি। আমার কথা হচ্ছে, একটি নতুন সংবিধান করা দরকার। একটা নতুন republican journey হওয়ার দরকার ছিল আরও আগেই। যদিও it has been too late but not any end. অর্থাৎ এখনও সম্ভব। Preamble এর জায়গাটায় আমি বলি, ২০২৪ এ যে গণঅভ্যুত্থান হলো সেখানে preamble এর মধ্যে এখনও অনেক ধরণের religious plethora আছে। সুতরাং preambleকে যতবেশি simplified করা যায়, অবশ্যই historical eventগুলোকে খুব বেশি specifz না করে abstract way তে যদি recognize করা যায় যে, "all the struggle for the Independence and for establishing democracy" এভাবে যদি রাখা যায়, তাহলে ভালো হয়। আমেরিকান যে দৃষ্টান্ত "We, the people" একটা inclusive society এর জন্য করা হয়েছিল। সেখানে এই সংবিধান বলা যায় যে, এটা শুধু rhetoric হিসেবেই থেকে গেছে। We the people এটা inclusive society তৈরি করে নাই। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে, Bengali nationalism এর dogma. সুতরাং একটা inclusive society তৈরি করার জন্য Bengali nationalism, nationalism, ethnicity, religious supremacy, all sorts of belonging or this kind of stuff should be the abrogated and should be avoided. সুতরাং তা না হলে আমরা আবার হয়তো inclusive society তৈরির পরিবর্তে একটা dividing society এর মধ্যে ঢুকব।

সুতরাং Preamble এ এটা খুব consciously maintain করা দরকার বলে আমি মনে করি। Existing Constitution একটা alarming clause carry করে সেটা হচ্ছে 7(B). বাংলাদেশের সংবিধানে এটা খুবই interesting যে, basic একটা structure

‘doctrine’ যেটা ইন্ডিয়া থেকে travel করল বাংলাদেশে। যদিও ইন্ডিয়ানরা এটা জার্মান ও আমেরিকার কাছ থেকে ধার করেছিল। That’s the different story. কিন্তু basic structure এ Constitution যেভাবে ৫৩ Constitutional clauseকে unamendable by turnell clause বানিয়ে দিলো এতে আমেরিকান concept যে, Constitution grow করবে, তা সম্ভব না। Constitution নিয়ে *ওঁংঃরপব ঝপধষরধ ধহফ ওঁংঃরপব* ইৎবুবৎ সাথে যে debate ছিল সেটা যদি আমরা খেয়াল করে দেখি তাহলে দেখা যাবে, the growing constitutionalism এর জন্য এটা একটা বড় প্রতিবন্ধকতা। সুতরাং এই টাইপের eternal clause একমাত্র থাকতে পারে শুধুমাত্র Democracy, Republican character and equality সংরক্ষণের জন্য। এর বাইরে আর কোনো eternal clause থাকার কোন মানে হয়না। Bengali Nationalism, আমি আগেই বলেছি যে, ethnic supremacy কোনো একটা certain state এর religion দিয়ে হয় না। হ্যাঁ, বিশ্বের ৪৭টি দেশের সংবিধানের মধ্যে হয়তো রাষ্ট্রধর্ম আছে। কিন্তু সেইসব দেশের ধরন আর বাংলাদেশের ধরন এক না। একইসাথে আমি যখন secularism রাখছি সেখানে state religion রাখাটা quite conflicting. এটা অবশ্যই equality-এর যে principle বা equality-এর যে fundamental rights হিসেবে আছে সেটার সাথে conflicting. আমি মনে করি, secularism বাংলাদেশের সংবিধানে যেভাবে constitutional narrative হিসেব দাঁড় করানো আছে, framework-এর ভিতর দেয়া আছে এবং আর এর যে political narrative দাঁড়িয়ে আছে সেটা একটু ভয়ঙ্কর ব্যাপার। বহুদিন ধরে secularism বাংলাদেশে একটি anti-Muslim sentiment বা anti-Muslim প্রচারণার দিকে আগানো। বিষয়টি majoritian muslim community-কে অনেকভাবে aggravated করেছে বলে আমার কাছে মনে হয়। এটার বিভিন্ন ধরনের political backlash আমরা দেখেছি। সুতরাং আমার মনে হয়, ধর্মনিরপেক্ষতার যে ধারণা তার চেয়ে ভালো হতো multiculturalism যদি রাখা যেতো তাহলে সেটা ভালো হতো। যেটা কানাডিয়ান নীতি হিসেবে রয়েছে। যেকোন ধরণের ethnic community এখানে consicularism একটি negative impression বহন করে। বাংলাদেশে মনে করা হয়, secularism মানে হচ্ছে anti-religion, anti-Muslim এবং practically এই জিনিসগুলো practice হয়েছেও। সুতরাং এই সমস্ত backlash থেকে বের হতে হলে multiculturalism establish করা উচিত ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে। কারণ যেগুলো কাজ করেনি দীর্ঘদিন ধরে সেগুলো আমি abrogation এর পক্ষপাতি। আমি মনে করি, American Constitution এতদিন ধরে টিকে থাকার অন্যতম কারণ হচ্ছে structure. অর্থাৎ governmental structure, governmental power. সেদিকে তাদের বেশি concentration ছিল। They didn’t pay enough concentration to the rights of the people. এগুলো বিভিন্নভাবেই implement করা সম্ভব। আমি সে জায়গায় পরে আসছি। আমি শুধু বলি, Semi-Presidential system is quite important for Bangladesh. কারণ বাংলাদেশে Presidential and Prime Ministerial both type of government system failed, miserably failed. সুতরাং বাংলাদেশকে যদি একটি new constitutional journey করতে হয়, তাহলে অবশ্যই power structureটা balance করার জন্য Semi-Presidential শাসন পদ্ধতি খুবই প্রয়োজন। এটাকে অনেকে মনে করতে পারে যে, Semi-Presidential is pro-western concept. আসলে এটা না। Asian some of the states, they have already adapted this practice. সুতরাং Semi-Presidential system এর ভিতর আমি আরও পরিষ্কার করতে চাই, Prime Minister and President both will have the power sharing. তাদের ভিতরে ক্ষমতার ভাগাভাগি থাকবে। এখানে খুব crucial যে জিনিসটা হয়, যেটা French cohabitation practice. আমি cohabitation practice rather না থাকারই পক্ষপাতী। আমি মনে করি যে, President should come one political sector, one political group. Prime Minister should have. হ্যাঁ হতে পারে যে, সেখানে অনেক ধরণের tussle হতে পারে। But there is a huge chance of balancing. যদি Semi-Presidential system চালু করা যায়, তাহলে অবশ্যই President election and Parliament election should not be at the same time. ২০২৫ সালে যদি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়, তাহলে সংসদ নির্বাচন হতে হবে ২০২৭ সালে। দুটোরই tenure এ পার্থক্য থাকা দরকার যেন একই সময়ে নির্বাচন না হয়। কারণ peoples mandateটা যেন পরিবর্তন হতে পারে। ক্ষমতার ক্ষেত্রে যেন people’s perception বিভিন্নভাবে কাজ করতে পারে। সুতরাং Semi-Presidential পদ্ধতি can be the very ideal arrangement. At least we can experiment that.

বাংলাদেশের সিস্টেম কোনদিন ভালো হবে না যদি people ভালো না হয়। কারণ party system. সুতরাং আমরা যে political party system পড়েছি comparative constitutional law এর মাস্টার্সে সেখানে দেখেছি যে, democracy তে party system কীভাবে কাজ করে। সুতরাং party system এর বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে একাধিক Constitutional Clause থাকা উচিত। এটা শুধুমাত্র Peoples republic order দ্বারা করা সম্ভব না। Constitution এর ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দলের ভিতরে যদি democracy চালু করা না যায় তাহলে সেই state democratic হবে না। That is quite clear. বড় দুটো দল কোনভাবেই dynastic politics থেকে বের হতে পারছে না। সে কারণে যাবতীয় ধরণের দুর্নীতির অন্যতম কারণ হচ্ছে dynastic politics. সুতরাং পার্টি সিস্টেম সম্পর্কে পরিষ্কার করে আরও পরে বলব। কারণ এখন খুব সংক্ষেপ করে বলতে হচ্ছে। আমি মনে করি, Prime Minister tenure should be one time, not even for two

times. বাংলাদেশে এটা কাজ করে না। বাংলাদেশে Prime Minister even for one times থাকা উচিত from the new constitutional journey এর শুরু থেকে। এটা আমেরিকার মতো ২ টার্মস সিস্টেমের ভিতর না যাওয়াই উচিত। Rather American first constitutuion অনুযায়ী one term Constitutional tenure থাকা উচিত for the Prime Minister even for the President. রাষ্ট্রের জন্য যদি কেউ কাজই করতে চায় তার যে শুধু Prime Minister বা President পদে থেকে কাজ করতে হবে not necessary that. সে যেকোন জায়গা থেকেই কাজ করতে পারে। সুতরাং tenure two terms রাখতে হবে, এটা আমি মনে করি না। কারণ tenure এর repetition বাংলাদেশে authoritarian nature এর দিকে ঢেলে দেয়। এটা party democracy ensure করে **না**। আর একটা জিনিস আমি মনে করি, সেটা হচ্ছে, basic needs. যে দেশের বাজেট ৮ লক্ষ কোটি টাকা সে দেশের basic needsগুলোকে Fundamental Rights এ না রেখে Basic Principle এ রাখা it's a bluff with the people. It's a hypocrisy. সুতরাং রাষ্ট্র তার নিজস্ব privilege community-এর জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে যেমন-একজন Minister-এর জন্য হেলিকপ্টার উড়িয়ে আনা হয়, বিশেষ ডাক্তার আনা হয়। অন্যদিকে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ পাবলিক হাসপাতালের রাস্তার সামনে পরে থাকে। তার বৃদ্ধ মা স্যালাইন ধরে পরে থাকে। সুতরাং basic needsগুলোকে যদি Fundamental Rights না করা হয়, তাহলে এই ৮ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট শুধু corruption-এ যাবে। আর some people and some sectors এর development-এ যাবে। নির্দিষ্ট কিছু বেসামরিক বা সামরিক কমিউনিটির development এ যাবে। কিন্তু কখনও সাধারণ জনগণ রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে কোনো রাষ্ট্রীয় সুবিধা পাবে না। সুতরাং এটাই উপযুক্ত সময় যেন অন্তত basic needsগুলোকে Fundamental Rights-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমি theoretical perspective থেকে বলছি না, আমি খুব practical জায়গা থেকে বলছি। যদি corruption-কে reduce করতে হয় তাহলে অবশ্যই basic needs-গুলোকে Fundamental Rights-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অন্ততপক্ষে education, healthcare, shelter, food, clothing. অন্তত minimum rationing system-এর ভিতর দিয়ে যাওয়া উচিত। Socialism আমি মনে করি, That is quite conflicting with the democratic regime. Socialism কেন রাখা হয়েছিল সেই কাহিনীটা আমরা মোটামুটি ভালোভাবে সবাই জানি। সুতরাং Socialism is quite conflicting with the democratic morality. । পৃথিবীতে যেখানে Socialism কাজ করছে না সেখানে Socialism কে theoretically একটা ornamental clause হিসেবে রাখার কোন মানে হয় না। একটি রাষ্ট্র govern করে শুধুমাত্র তার গাছপালা, মাটিকে না। In terms of the landscape, Bangladesh might be the smaller state but in terms of the population its a very big state. তাই আমি মনে করি federal structure না দিলে কখনও accountability আসবে না। There would be no decentralization, no accountability, no rules of law, no good governance. সুতরাং আমি decentralization এর পক্ষে। সেটা বিভিন্নভাবে হতে পারে। Fiscal federalism হতে পারে। Of course not ethnic federalism যেগুলো ইথিওপিয়ান মডেল। অবশ্যই না।

আর সবশেষে আমি বলতে চাই, Supreme Judicial Council -এর বিষয়। Supreme Judicial Council –এর পরিবর্তে বর্তমান সময়ে যে, Parliamentary resolution of removing the Supreme Court judge, আমরা জানি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটার ভয়াবহতা কত। পার্লামেন্টে যখন one party system থাকে সেটা কাজ করে না। Supreme Judicial Council could be the standard one, standards practice. কিন্তু বাংলাদেশে collegial biasness এর একটি বড় জায়গা রয়েছে এর composition এ। এখানে Chief Justice and with other two senior judges when they are actually, I mean dealing with the allegation against the fellow colleague. So there is a huge chance of collegial biasness. সুতরাং Supreme Judicial Council should be composed and for appointing and removal both. Supreme Judicial Council এর একটা balancing composition দরকার। So there would be the judges, there would be the academics, I mean the law makers, there would be the civil society people. So that is for my side.

Thank you, sir.

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, প্রফেসর মোঃ রবিউল ইসলাম।

আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন রাজা দেবাশীষ রায়। আমরা তাঁর কাছ থেকে এখন শুনব। পরে আমরা সংগঠনগুলোর কাছ থেকে শুনব।

রাজা দেবাশীষ রায় : ধন্যবাদ, আজকের কমিশনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং এর প্রধান সম্মানিত অধ্যাপক আলী রীয়াজ। একটু নির্দেশনা পেলে ভালো হতো যে, কত সময় নিতে পারি বা নেওয়া উচিত?

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): সকলেই প্রাথমিকভাবে ১০ মিনিট কথা বলবেন। তারপরে আমরা আবার ফেরত আসবো

অন্য বিষয়ে।

রাজা দেবাশীষ রায় : ধন্যবাদ।

এখানে এসে আমার সৌভাগ্য হয়েছে পূর্ববর্তী বক্তার কিছু শোনার। আমি লিখিতভাবে কিছু এনেছি। এটা সম্পূর্ণই আমার ব্যক্তিগত। আমি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবেই পেশ করব। যদিও আমি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান, সংগঠনের নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত, যেমন-চাকমা সার্কেল, আমি এর প্রধান ৪৭ বছর ধরে যেটার। তারপরে আমি Bangladesh indigenous peoples network on biodiversity and climate change এর সাথে সম্পৃক্ত আছি। আবার আমি ৮০ এর দশক থেকে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন আইনজীবী। এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। তবে অবশ্যই কিছু তো আমার ব্যাগেজ থাকবে এসব পরিচয়ের কাছ থেকে। আমি লিখিতটাতে পরে যাচ্ছি। সেটা পুরো পড়ব না। আমি দিয়ে যাব। আমাদের এখানে কিছু ক্রুটি থাকতে পারে। আমি একটা অনুরোধ রাখব, দুই-চার দিনের মধ্যে আরও কিছু সম্পূরক বক্তব্য ই-মেইল বা অন্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসে পাঠানোর সুযোগটা যেন থাকে, যাতে যে দলিল রেখে যাচ্ছি সেটা ব্যাখা দিতে পারি।

প্রথমেই প্রক্রিয়ার বিষয়ে আমি বলতে চাই। সমাজে যারা অধিকার বঞ্চিত, সুযোগ বঞ্চিত বিশেষ করে আদিবাসী, চা বাগানের জনগোষ্ঠী ও দলিত এবং বর্তমান সংবিধানে তথাকথিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আমি এখানে আদিবাসী শব্দটা ব্যবহার করতে পছন্দ করছি। তাদের অন্তর্ভূক্তির বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমরা সত্যিকারার্থে আছি সংখ্যাগরিষ্ঠতা বনাম গণতন্ত্রে। এখন সংখ্যার দিক থেকে যদি ধরেন তাহলে আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য আদিবাসীসহ তাদের সংখ্যা কতই বা হবে। হয়ত মোট জনসংখ্যার ১-১.৫%। ওখানে ৩টা পার্বত্য অঞ্চলে সংসদ-সদস্য বর্তমানে আছে। খাগড়াছড়িতে বর্তমানে অপাহাড়ী বাংলা ভাষাভাষীও হয়েছিল। আর সমতলের মানকিন ফ্যামিলির দুইজন যদি না আসতো তাহলে গত ৩০ বছরে বোধ হয় কোনো এমপি দেখেন নাই সমতলের আদিবাসীরা। চা জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা এবং তাদের সুযোগটা সংবিধান পুনর্লিখন হোক বা সংস্কারই হোক সেখানে থাকতে হবে। ভবিষ্যতে যদি একটা constituent assembly হয় বা কোন representative body চলে আসে যারা ultimately সেই সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করবে তাদের ভূমিকাটা কী হবে? আমি শ্রদ্ধেয় রীয়াজ ভাইয়ের সামনে একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলাম যে, মানবেন্দ্র নারাছু লারমা '৭২ এর constituent assembly থেকে নির্বাচিত। তিনি পাকিস্তানের সর্বশেষ নির্বাচন অর্থাৎ বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানের অংশ ছিল সেই '৭০ নির্বাচনে গণপরিষদ সদস্য ছিলেন। তিনি constituent assembly থেকে ওয়াক আউট করেছিলেন আদিবাসী প্রেক্ষিত, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রেক্ষিত '৭২ এর সংবিধানে না আসার কারণে। এখন সেটার কী হবে, কে নির্বাচিত হবে, না হবে constituent assembly. কিন্তু কথাটা হলো যে, সংখ্যার বিচারে না একটি জাতিকে যদি তার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দিয়ে বিচার করি, তাহলে সকলকে তো আনতে হবে। চা বাগানের জনগোষ্ঠী কয়জনই বা আছে, দলিত কয়জনই বা আছে। নারীরা সংখ্যা ৫০% হলেও আমরা সকলে জানি যে, এর প্রতিনিধিত্ব কীভাবে হয়? এটার ব্যাপারে আমার একটা আর্জি থাকবে যে, সেই প্রক্রিয়াতে এই কমিশন কী বলে যায় বর্তমান সরকারের কাছে এবং ভবিষ্যতে যে সরকার নির্বাচিত হয়ে আসবে সেখানে যাতে সেই দরজাটা খোলা থাকে। আমি আগেও কিছুটা কৌতুক করে বলেছি, কিছুটা হয়তো cynically বলেছি, সংবিধান একটি রাষ্ট্রের 'Architectural Structure'. ঐ রাষ্ট্রের মধ্যে আদিবাসী, দলিত, চা জনগোষ্ঠী ড্রইং রুমে আসতে পারবে কীনা, নাকি পাশের একটি out house-এ থাকবে, না বারান্দায় থাকবে? ড্রইংরুমের সোফাতে বসবে নাকি মোড়ায় বসবে, না পিড়ায় বসবে? এগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্র আছে। সেখানেই সংবিধানটাই হচ্ছে একটি প্রাক্কলন। সেখানে যদি এগুলো না থাকে নির্বাচিত যে সরকারই আসুক না কেন এখানে তো আমাদের পরিবারতন্ত্র, পার্টিতন্ত্র, আমলাতন্ত্র এগুলো থেকে রেহাই পেতেই হবে। আমি একটা যায়গায় বলেছি যে, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, not necessary। ফ্রান্স বা জার্মানির কথা বলছি না। আমাদের কাছের একটা রাষ্ট্র নেপাল ইদানিংকালে করেছে। আমাদের চেয়ে আর্থসামাজিকভাবে অন্তত অর্থনৈতিক বিবেচনায় নিম্ন পর্যায়ের। নিম্নটা আমি অন্যভাবে বলছি না। তাদের কাছ থেকেও নিতে পারি। তাই এগুলোর জন্য একটা বিষয় যাতে থাকে।

এখন এই সংবিধান কার জন্য? প্রথমত এটা হচ্ছে, আমাদেন যারা সরকার চালাবেন সরকারের নির্বাহী। What are the parameters? যেখানে তারা এটার বাইরে যেতে পারবেন না। এটার মধ্যেই তাদেরকে থাকতে হবে। তারপরে আছে, আমাদের আইনসভা। তারা কী ধরণের আইন প্রণয়ন করতে পারবে যাতে সেটা হাইকোর্টে গিয়ে অসাংবিধানিক বিবেচিত না হয়। তাদের কতখানি এখতিয়ার রয়েছে? তৃতীয়ত, অবশ্যই বিচার বিভাগ। কোন কোন আইনকে সংবিধান বহির্ভূত বলবেন যে, এর বাহিরে আইন বিভাগ করতে পারে না এবং শাসন বিভাগর করতে পারে না? আমার মনে হয়, এই জিনিসগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণ অস্পষ্টতা আছে। ইন্ডিয়ান সংবিধান আমাদের কাছাকাছি। কিন্তু আমাদের দেশে যেভাবে সাজানো হয়েছে- প্রস্তাবনার অংশ, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, মানবাধিকার এছাড়া অন্যান্য যেগুলো চলে এসেছে সেই বিন্যাসের বিষয়ে আমাদের কোন কিছু বলার নেই। এছাড়া এটাকে আমি পুনর্লিখন বলব নাকি সংস্কার বলব সে বিষয়েও কিছু বলতে চাচ্ছি না। কথাটা হচ্ছে যে, ভিতরে কী থাকবে?

আমি এখন মূল পয়েন্টে চলে আসি। আমার মনে হয়, প্রস্তাবনার অংশে প্রস্তাবনাটা খুবই সংক্ষিপ্ত। আমার পূর্ববর্তী বক্তার কয়েকটি বিষয় আমার মনে আছে। এর মধ্যে আমি বলব যে, ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত তিনি যা বলেছেন আমি তার সাথে একমত। এছাড়া এখানে যে অসাম্প্রদায়িকতার বিষয় আছে আমি সে বিষয়েও একমত। '৭২ এর সংবিধানের এই বিষয়গুলোর সাথে নীতিগতভাবে আমার কোন দ্বিমত নেই এবং রাখার পক্ষে আমি। এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রাম অবশ্যই থাকবে। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের spirit-এর অনেক কিছুই বর্তমানের প্রস্তাবনাতে আসি নাই। এটার বহুমাত্রিকতাসহ অনেক কিছুই আছে যেটা আসে নাই। এটা আসা উচিত। আমি সাংবিধানিক আইনের কোনো কিছু সেভাবে দাবি করছি না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। প্রস্তাবনার প্রথম প্যারায় স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলা আছে। তার আগে একটি প্যারা আমরা প্রস্তাব করছি যে, "আমরা বাংলা ভাষাভাষী জাতিসহ ভিন্ন ভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী, ভাষা, ধর্ম, আধ্যাতিকতা, কৃষ্টীয় ঐতিহ্য সম্বলিত জাতিসমূহ বাংলাদেশের জনমানুষের সামাজিক একতা অটুট রাখিয়াছি। আমরা আমাদের ভূখন্ডের অখন্ডতা রক্ষা করিয়া দেশের ভূমি, জলাশয়, প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ করিয়া সমগ্র দেশের ভূখন্ডের প্রতিবেশ পরিপোষণ করিয়া একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করিয়াছি।" স্বাধীনতার আগেও তো ছিল, '৭১ এর আগেও তো ভূখন্ড ছিল। এখানে তো আমরা পাশাপাশি ছিলাম। চাকমা, সাঁওতাল, ওরাওঁ ছিলাম। মোগল আমলে যাই হোক। বৃটিশ আমলে we are there together and that peace of - সেই ভূখন্ড, সেটাই তো এখন বাংলাদেশ। ২৬ শে মার্চ সেটা ঘোষণা হয়েছে এবং ১৬ই ডিসেম্বর হতে সেটা কার্যকর হয়েছে। সেটাতে আমাদের যে centuries of contribution to the ecosystem, আমি আর বেশি বলব না। আমি একটা উদাহরণ দেই, পার্বত্য চট্টগ্রামের ৯০% এর বেশি নদীর জন্ম বাংলাদেশে, ভারত থেকে আসে নাই, নেপাল থেকে আসে নাই বা তিব্বত থেকে আসে নাই। এটা না করলে কুর্ফুলি নদী, চট্টগ্রাম বন্দরের কী হবে? এই জিনিসগুলো তো আনতে হবে। আমি একটা চাকমা হিসেবে, পাংখোয়া হিসেবে বলছি, এই পাহাড়, পর্বতগুলো তো বাংলাদেশের পাহাড় পর্বত। এগুলো ভারতের না, বার্মার না। আমরই রক্ষা করব সার্বভৌমত্ব। কিন্তু এই জিনিসগুলো তো সংবিধানে আসতেই হবে। so ecology and this territory called Bangladesh. এখানে তো আমরা ছিলাম শত শত বছর ধরে। It doesn't matter যে, কে বার্মা থেকে এসেছে, কে শেখ না সৈয়দ বংশের? সেখানে আরবের রক্ত আছে না কাশ্মীরের রক্ত আছে না কি বার্মার, it doesn't matter. আমরা এসেছি এবং আমরা এখানেই আছি। এই জিনিসগুলো আসতে হয়।

তারপরে আমরা বলছি, রাষ্ট্রীয় মূলনীতির বিষয়ে। একটু আগেই বলেছেন এবং যারা আইনের ছাত্র আছেন বলছেন, it is unjustifiable. আপনি হাইকোর্ট বিভাগে একটা মামলা করে রায়ের মাধ্যমে এটা কার্যকর করতে পারবেন না। সুতরাং একটু বুঝতে হবে যে, কোন আর্থসামাজিক অধিকারগুলো শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার জন্য কার্যকর করতে পারছি না । এই যে কৃষক, শ্রমিক, মেহেনতি মানুষকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্ত করার কথাটা, নাকি আমাদের রাজনৈতিক ইচ্ছার মধ্যে নেই। এখানে আমার মনে হয় একটা ব্যালেন্স করা দরকার- রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, মৌলিক নীতি, মৌলিক অধিকার একগুলোর মধ্যে যেগুলো ন্যায়সঙ্গত। সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে আমরা হাইকোর্টে গিয়ে এটা কার্যকর করতে পারি। এই ব্যালেন্সটা একটু প্রয়োজন। ভারতের সংবিধান ও অন্য কয়েকটা দেশের সংবিধানে আমরা দেখি যে, certain fundamental freedom, freedom of movement, freedom of speech, বিশেষ করে freedom of movement থেকে শুরু করে কিছু স্বাধীনতা আছে। যদিও বর্তমানে আমাদের সংবিধানে আছে subject to reasonable restriction imposed by law । আইন হতে হবে, আদেশ না এবং সেটা জনগণের কল্যাণে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে লেখা আছে, for the protection of the scheduled tribes. ভূমি আইন যেটা প্রজাস্বত্ব আইনে সমতলে আছে গারোর জায়গা। এ জায়গা ডিসি সাহেবের অনুমতি ব্যতিরেকে অআদিবাসী কিনতে পারবে না। এগুলোকে যদি সাংবিধানিক সুরক্ষা না দেওয়া হয়, তবে এটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। এটি একদিকে রাজনৈতিক সমস্যা অন্যদিকে আইনও সমস্যা। এই জাতিসমূহের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এরকম কিছু কিছু যে বিধান, যেখানে মৌলিক অধিকারের ক্লসগুলো আছে সেগুলোতে কিছু বিধিনিষেধ দেওয়া উচিত for the protection of the scheduled tribes. যে নামেই অবিহিত হোক না কেন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩, ৪, ১৪, ২৮, ২৯সহ প্রভৃতি অনুচ্ছেদে এগুলো থাকা উচিত বলে আমরা মনে করছি।

ধর্মের ব্যাপারে আমি গেলাম না কারণ আমি ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করি। ভাষার ব্যাপারে বলা আছে, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' কিন্তু অন্যভাষার কথা কিছু লেখা নেই। '৫২ এর ভাষা আন্দোলনে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভরে বলব, বাংলা ভাষাভাষী বাংলাদেশের মানুষের মতো ভাষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার বেদনা পৃথিবীতে অন্য কারো জানার কথা না। এটা ইউনেস্কো কিন্তু স্বীকৃতি দিয়েছে "২১ শে ফেব্রুয়ারি"কে। ঠিক আছে, মাত্র ৫টি আদিবাসী ভাষায় প্রাইমেরী স্কুল হচ্ছে। বাকীদেরও তাদের মাতৃভাষা যথাযথভাবে চর্চা করার প্রেক্ষিত নেই। এটা আমাদের সংবিধানে থাকা উচিত যে, বাংলা যদি রাষ্ট্রভাষা হয়, অন্য ভাষাকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। নেপালে যেমন আছে তাদের ভাষাগুলো সকলের ভাষা।

আমার কী আরও ২-৩ মিনিট সময় আছে?

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : সংক্ষেপ করে ২ মিনিট বলুন।

রাজা দেবাশীষ রায় : অনুচ্ছেদ ২(ক) তে রাষ্ট্রভাষার কথা বলা আছে। অনুচ্ছেদ ২(ক) তে কিছু পরিবর্তন আনা উচিত। যেমন ধর্মের সাথে আধ্যাত্মিকতা ও বিশ্বাসও যোগ করা উচিত। কেউ যদি কোন ধর্ম না করতেও চায় সেটাও তার অধিকারে থাকা উচিত।

অনুচ্ছেদ ৯-তেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। আমরা সে বিষয়ে কিছু বলব না। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা থাকা উচিত বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ৯-এ।

অনুচ্ছেদ ১২ যেভাবে আছে সেভাবে থাকার সমর্থন করছি।

অনুচ্ছেদ ১৪-তে আদিবাসী বা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন রাখতে হবে। যাদেরকে বর্তমানে তথাকথিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বলা হয়েছে। তাদের বিষয়গুলো অনুচ্ছেদ ১৪-তে আসা উচিত।

অনুচ্ছেদে ২৩ আমরা মনে করি যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর কথাটা আসলে শুধু বাঙালি বা বাংলা ভাষাভাষীর কথাও এসে যায়। অনুচ্ছেদে ২৩(ক)-এ যেটা ২০১১ সালে ঢুকানো হয়েছে সেখানে যে শব্দগুলো আছে সে শব্দের পরিবর্তে ভাবধারা ঠিক রেখে অন্যকোনো গ্রহণযোগ্য শব্দ ব্যবহার করাটাই যথাযথ হবে। আমরা 'আদিবাসী' শব্দটা প্রস্তাব করছি। আমরা কীভাবে সংক্ষেপ করে বলছি।

অনুচ্ছেদে ২৮(৪) এবং অনুচ্ছেদ, ২৯(৩)-এ 'কেবল সমাজের অনগ্রসর অংশ' বললে সমস্যা হয় একারণে যে, হাইকোর্ট বিভাগ বলেছে. আমি কীভাবে জানি যে গারোরা সমাজের অনগ্রসর অংশ। Socio-economic data কোথায়? তাদের শিক্ষা, পানীয়, জল, ইত্যাদি। এটা বলে দিলে ভালো হয়। কোন একটা সময় সংশোধন করাই যেতে পারে সংবিধানিকভাবে এবং সেরকম একটা ব্যবস্থা থাকতে পারে যে, এখন আর সে তথাকথিত অনগ্রসর নয়। অধিকান্ত আমি ব্যারিস্টার সারা হোসেনের কথাটাও সমর্থন করি। তিনি অন্য একটি জায়গায় বলেছেন, তারা অনগ্রসর না। তারা সুযোগবঞ্চিত বা সুবিধাবঞ্চিত বা প্রান্তিক। এটা একটা সম্মানজক শব্দ। অনগ্রসর না। কারণ backward কেউ হতে পারে না।

অনুচ্ছেদ ৩৬এর কথাটা বলেছি। অনুচ্ছেদ ৩৬ freedom of movement.

অনুচ্ছেদ ৩৭-এ আদিবাসী বা অন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ থাকা উচিত, যাতে রাষ্ট্রও জানে এবং হাইকোর্ট বিভাগও জানে যে, সরকার কোথায় কোথায় এই স্বাধীনতাগুলোকে ক্ষেত্র বিশেষে আইন দ্বারা আরোপিত যৌক্তিক বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৪২ থেকে শুরু করে এরকম কিছু কিছু প্রস্তাব এনেছি।

আর একটি বিষয় হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন। ১৯৬৪ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতি এলাকা ছিল। যেমন পাকিস্তানের চিত্রাল, দির এসব এলাকা ছিল। আমি সময় নেবো না। ভারত সরকার ১৯৩৫ সালে প্রথম প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন হলো। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম, মিজোরামকে সেই নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকারের আয়ত্তের বাহিরে রাখা হয়েছিল। তবে কিছু রক্ষণমূলক ব্যবস্থা ছিল এবং এখানে কিছু প্রথাগত আইন আছে। এটাকে একটা normal registration এর মাধ্যমে চট করে বিলুপ্ত করতে পারব না। কিছু কিছু অধিকার আছে প্রথাগত আইন থেকে শুরু করে সেগুলো সংরক্ষণের জন্য আমরা বলছি যে, *Chittagong Hill Tracts regulation 1900* থেকে শুরু করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' ৯৭ উত্তর কিছু আইন প্রণীত হয় ১৯৯৮ সালে। এগুলোকে সংবিধানের প্রথম তফসিলে রেখে দিলে সংরক্ষণ হয়। তাতে করে চট করে এগুলোকে বিলুপ্ত করা যায় না।

আমি একটু সমতলের আদিবাসীদের কথা এবং annex-এর কথা বলে আমি শেষ করছি। বিভিন্ন উপায়ে আমাদের কিছুটা স্বীকৃতি আছে। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ২০০০ গ্রামে কারবারি মোড়লের মতো এর মধ্যে আমরা ৫০০ জন নারী করেছি, প্রায় ২৫% নারী। তারা সুবিচার করছে। তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি নিয়ে কাজ করছে। এগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে আছে। সমতলে গারোদের নকমা, সাওতাঁলের মাঝি স্বীকৃত না। তারা সার্টিফিকেট দিবে, কোথায়, কোন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবে। ডিসি সাহেব দিবেন, কিন্তু কীভাবে জানবেন ? এগুলোর যে কোনো ধরণের স্বীকৃতি প্রয়োজন। ড. এম এম এম শওকত আলীর নেতৃত্বে একটি কমিশন বা কমিটি হয়, যে কমিশন স্থানীয় সরকারকে একটি প্রতিবেদন দিয়েছিলেন ২০০৬ বা ২০০৭ সালে। প্রতিবেদনে বলেছিল যে, সমতলের আদিবাসীদের জন্য আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত এবং সেটা ওয়ার্ড পর্যায়েও হতে পারে। আমাদের বর্তমান সংবিধানে শুধু নির্বাচিত হওয়ার কথা আছে। নির্বাচিত ছাড়াও হতে পারে। ইন্ডিয়ার peninsular ইন্ডিয়াতে পঞ্চায়েত রাজে দেখবেন কিছু নির্বাচিত, কিছু মনোনিত আছে। কারণ নির্বাচন হলে আপনি জানেন যে, কে টাকা দিয়ে নির্বাচিত হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : জনাব দেবাশীষ, আমি দুঃখিত সময় স্বল্পতার জন্য।

রাজা দেবাশীষ রায়: ৩০ সেকেন্ড।

সমতলের আদিবাসীদেরও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সুযোগ যেন থাকে। বর্তমান স্থানীয় সরকারের যে কাঠামো আছে সেই কাঠামোতে।

স্থানীয় সরকারের যে বিধানটি বর্তমানে আছে now it is a matter yet less whether you will call it federal or unitary. মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইনে মুসলিম মিন্দনাওতে এখন বানসামুরা স্বায়ত্তশাসন আছে। it is a unitary state. এছাড়া বৃটেনে স্কটল্যান্ড আছে। তাই আইনগত যাই লেখা থাকুক federal or unitary- কিন্তু devolve power থাকা উচিত এবং এগুলোতে নির্বাচন ছাড়াও যাতে আদিবাসীসহ সেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের একটা ভূমিকা থাকে।

আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কমিটিকে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, রাজা দেবাশীষ রায়। আমি দুঃখিত যে, সময় স্বল্পতা আছে। আপনার একটা লিখিত বক্তব্য আছে, সেটা আপনি আজকে দিয়ে যাবেন। এরপরেও যদি আপনি সংযুক্ত করতে চান আমাদেরকে ই-মেইলে জানাবেন। আমরা এখন বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের কাছে যাব। আমরা শুরু করব সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি বেগম নাজমা আক্তারকে দিয়ে। আমি আবারও অত্যন্ত বিনয়ের ও দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, যদি সময়ের দিকে আপনারা একটু নজর রাখেন তাহলে আমরা সকলের কথা শুনতে পারব।

বেগম নাজমা আক্তার (সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন) : ধন্যবাদ, সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদের।

আসলে সংবিধান বিষয়ে আমরা অনেক কিছু জানিনা বা বুঝিনা। যতোটুকু আমাদের পক্ষে সম্ভব সেটাই আমরা বলব। আমরা বলতে চাচ্ছি, সংবিধানে দল, মত নির্বিশেষে সকল মানুষের নির্বাচন করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা ভিন্ন। এখানেই আমাদের সংবিধানের বড় সমস্যা। আমাদের সংসদে রাজনৈতিক দল বলেন বা প্রধান বলেন ৮০ শতাংশই ব্যবসায়ী। এটাকে আমাদের একটা জায়গায় আনতে হবে। আজকে দেখেন সংসদ ভেঙে গেছে, ব্যবসায়ীরা পালিয়ে গেছে। ইন্ডাষ্ট্রিতে কেওয়াজ লোগছে, গ্রেফতার করেছে। এতে দেশের মানুষের বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার খর্ব হচ্ছে। আর দুর্নীতির কথা বলি, একজন ব্যবসায়ী তার মুনাফার বাহিরে আর কিছুই ভাবে না। যদি বাংলাদেশের শ্রম আইনের কথা বলি, ১৯৬৫ সালের শ্রম আইন, ২০০৬ সালে সংশোধন হয়েছিল। তখন এক ধরণের পরিবর্তন হয়েছিল, যেটা শ্রববান্ধব ছিল। কিন্তু এরপর প্রতিনিয়ত যখন ২০২২ সাল পর্যন্ত সংশোধন হলো তখন শ্রমবান্ধব হলো কিন্তু শ্রমিক বান্ধব হয়নি। আমাদের এটা দেখতে হবে যে, মানুষের অধিকার, যে মানুষটি কাজ করছে তার পরিবার এবং রাষ্ট্রের অর্থনীতি চলার যে শক্তি সে মানুষগুলো বঞ্চিত হচ্ছে কী না। আমি একজন নারী শ্রমিক হিসেবে বলতে চাই যে, বাংলাদেশের সংবিধানে সবার সমান সুযোগ আছে। যারা রাষ্ট্রীয় খাতে কাজ করে তারা ৬ মাস মাতৃত্বকালীন সুবিধা পাচ্ছে। কিন্তু যে নারীটি কায়িক পরিশ্রম করছে সে পায় ১২০ দিন তাও সম্প্রতি আমরা ১৮ দফা দাবিতে করেছি। তাহলে ৬ মাস মাতৃত্বকালীন সুবিধাটা কার জন্য? সামিয়া আপা, আপনি যে কাজটা করেন তার জন্য নাকি যে মেয়েটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে, কৃষি খামারে কাজ করছে তার জন্য। এই বিষয়টা আমাদের দেখতে হবে। আমার পাশের ভাই বলছিলেন যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সুবিধা বঞ্চিত বা সুযোগ না পাওয়া দলিত কমিউনিটি, প্রবাসী শ্রমিক, চিংড়ি ঘেরের শ্রমিক, গৃহ শ্রমিক এবং অনেক অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি আছে এইখানে বাংলাদেশে কোনো নূন্যতম মজুরী বা স্ট্রাকচারের জায়গা নেই। আমরা চাই, এটা সংবিধানে থাকতে হবে। আমরা চাই যে, সবাই ড্রইং রুমে বসবেন কীনা? দলিত সম্প্রদায়, ডোম এবং এই প্রবাসী শ্রমিক থেকে শুরু করে সবার সাথে আমার কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। আমি নিজেই গার্মেন্টস শ্রমিক। তারা রেস্টুরেন্টে গিয়ে নিজের টাকা দিয়ে খেতে পারবে না। তাহলে এই সংবিধান কেমন সংবিধান? এই দেশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মী যদি জায়গা, ম্যানহোল, ট্যাংকি পরিষ্কার না করে তাহলে কী হবে? যারা ডোম ঘরে গিয়ে মানুষ কাটার কাজ করে। ডাক্তারদের সাথে তাদেরও বড় ভূমিকা থাকে। তদের কোন মজুরি, কোন নিরাপত্তা নেই। সিটি কর্পোরেশনগুলোতে কালচারালগতভাবে এই কাজ তারা যুগের পর যুগ ধরে করছে। কিন্তু এখন আউট সোর্সিং করার ফলে মুসলিম বা হিন্দু বা যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা কাজগুলো পাচ্ছে। আর সেই মানুষগুলো পাচ্ছে না। সেখানকার নারীর সুশিক্ষা বা তাদের জমি কেনার অধিকার, তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে না। গৃহ শ্রমিকরা তারা বেতন পাচ্ছেন না। যৌন হয়রানি বা নির্যাতনের শিকার প্রতিনিয়ত এই গার্মেন্টস শ্রমিক থেকে শুরু করে সবাই হচ্ছে। এই বিষয়গুলো আমাদের একটু দেখতে হবে। আমরা informal economyকে কীভাবে আনুষ্ঠানিক করতে পারি? এজন্য যুগপযোগী আইন চাই। এখন ডিজিটাল আইন হয়েছে, অনেক টেকনলোজি এসেছে। অনেক কিছু হয়েছে কিন্তু আমাদের আইনের তেমন পরিবর্তন হয়নি। আমরা সেই সামাজি সুরক্ষা চাই না যে, কোভিডের সময় যে চেয়ারম্যানের কাছে ধান চাল দিয়েছে সেটা তার খাটের নীচে বা তার অন্য বাড়িতে রেখেছে। যে জিনিসটা সরাসরি শ্রমিককে impact করবে, সেটা চাই। আমরা কোভিডের সময় দেখেছি, সামাজিক সুরক্ষার জন্য শুধু গার্মেন্টের মালিকদের ৫ হাজার কোটির মতো টাকা দেওয়া হয়েছিল। সেট কী শ্রমিকরা পেয়েছে? প্রতিদিন কাজ না করলে তাদেরতো বেতনই দেয়নি। তাই আমাদের দরকার ক্ষতিপূরণ আইন। যেভাবে দুর্ঘটনা বাড়ছে তাতে যথাযথ ক্ষতিপূরণ না পাবার কারণে সেই পরিবার ধ্বংস হচ্ছে। সেই পরিবার হারিয়ে যাচ্ছে।

শ্রমনীতিকে যেভাবে শ্রমিকদের উৎপাদন ও উন্নয়ন হবে সেভাবে করা উচিত। আমাকে অন্যভাবে নিবেন না। আমরা দেখেছি, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। আমি ছোটবেলায় প্রাইমেরি স্কুলে পড়েছি, এরপর হাইস্কুলে এবং তারপর কলেজে ও পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছি। কারণ তখন মেয়েরা কম কাজ করতো কিন্তু ছেলেরা বেশি কাজ করতো। কিন্তু আজকের ধারাবাহিকতায় নারীর শ্রমবাজার অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু দেখা গেছে নারী তার বাচ্চা রাখার জায়গা পাচ্ছে না। যদিও আইনে ডেকেয়ার সেন্টার বা শিশু পরিচর্চাকেন্দ্র রাখার কথা আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটা যথাযথভাবে পালন হচ্ছে না। তাই যখন বাচ্চাদের মাদ্রাসায়, এতিমখানায় বা বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানো হচ্ছে, সেখানে তারা অনেক ধরণের যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। শিশুর মানবিক বিকাশ ঘটছে না এবং আমরা যারা নিম্ন আয়ের মানুষ তারা শারীরিক, মানসিক বিভিন্ন ধরণের প্রতিকূলতার মধ্যে পরেছি। এইজন্য ২ মাসের বাচ্চা গ্রামে রেখে এসে কাজ করতে হচ্ছে, বুকের দুধ খাওয়ার অধিকার, শিশুর তারা মায়ের কাছে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের সংবিধানে সেগুলো থাকা দরকার। আমাদের দেশে যৌন হয়রানি বা নির্যাতন প্রতিরোধ আইন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নেই। আমরা চাই, এগুলো আমাদের সংবিধানে আসুক। বাংলাদেশে Alternative Dispute Resolution or National Arbitration System নেই। এইগুলোকে বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ আমাদের কোর্টে মামলা খুব জটিল। শ্রম আইনে আছে, একটা মামলা ৬ মাসের মধ্যে মীমাংসা করতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটা ৬ বছরেও মীমাংসা হচ্ছে না। আর একজন বিচারক কখনও শ্রম আইনের নীচে সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগই শ্রমিকদের শ্রম আইনের নীচে এবং কম ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে। এগুলো সংবিধানে থাকতে হবে যে, লেবার ইন্সপেক্টর যখন চুক্তি করবে, শ্রম আইনের নীচে চুক্তি করতে পারবে না। কিন্তু সবসময় শ্রমিক ঠকিয়ে চুক্তি করে। এগুলো সংবিধানে থাকতে হবে। সুশাসন থাকতে হবে। আমাদের কথা বলার অধিকার, freedom of movement, freedom of expression, freedom of association, freedom of speech, ইউনিয়ন করার অধিকার এগুলো থেকে প্রতিনিয়তই আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। নারী হিসেবে রাষ্ট্রের যেসব জায়গায় টিসিসি হয় বা পরামর্শ কমিটিগুলো থাকে সেইখানে নারীর অংশগ্রহণ নেই। এগুলো আমাদের দেখতে হবে।

আমরা যদি সংসদের কথা বলি, মা বাংলাদেশি আর বাবা বিদেশি হলে সেই সন্তানের নাগরিকত্ব নাই। এটা আমাদের দেখতে হবে। মানিলন্ডারিং হয়ে আমাদের দেশের টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে নাকি সরাসরি টাকা পাঠানো যায় না, শুধু আনা যায়। এটা একটা সিস্টেমে আনতে হবে। যদি কেউ এই সিস্টেমের বাইরে যায় বা মানি লন্ডারিং করে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ আমাদের দেশটা ঝালাপালা হয়ে গেছে। আজকে যদি আমরা দুইটা বড় দলের কথা বলি, তাদের সবার সন্তানই বিদেশে থাকে। এখান থেকে কীভাবে টাকা যায়? কীভাবে তারা ঐখানে নির্বাচন করে এগুলো আমাদের সংবিধানে থাকতে হবে।

বাজারে সিন্ডিকেট হচ্ছে, দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ছে। মানুষ খেতে পারছে না। মুরগির ডিম, আলু, পেয়াজের দাম, বাড়ি ভাড়া এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমাদের দেশের কর্মজীবী মানুষ ৪০-৪৫ বছরের পরে আর কর্মক্ষম থাকে না। সে স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে চলে আসতে পারে। কারণ সে ৮ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা বিনোদন, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম করতে পারে না। তাকে দিনে ১৪ ঘণ্টার উপরে কাজ করতে হয় এবং তার মজুরী প্রতিনিয়তই কমছে। ব্যবসায়ীরা যারা বিদেশে কাজ, ব্যবসা করে, রেমিটেন্স আসে। ডলারের অবমূল্যায়ন হচ্ছে। এই বিষয়গুলো দেখতে হবে।

সর্বোপরি শ্রমবাজারে নারী এসেছে এবং নারীর শ্রমবাজারটা এখন বৃদ্ধি হচ্ছে। এটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। তাই তার দক্ষতা, তার শিক্ষা, তার পদমর্যাদা এগুলোকে মর্যাদা দিতে হবে। শুধু সংবিধানে সমান অধিকার, সমান অধিকার বললে হবে না। সমান অধিকারটা যেন চর্চা করতে পারি, সমান অধিকার যেন তারা পায়, সে দিকে নজর দিতে হবে। জাতীয় নূন্যতম মজুরী একটা জরুরি বিষয়। সম্মানজনক কাজ, মাতৃত্বকালীন বিষয় এবং কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের হয়রানি এগুলোর দেখতে হবে। পক্ষান্তরে ব্যবসায়ীদের অনেক সুবিধা দেওয়া হয়। সেই ক্ষেত্রে আমরা বলব, শ্রমজীবি মানুষের শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ এগুলো নিশ্চিত করতে হবে। যারা দেশের বাইরে গিয়ে কাজ করছে তারা আমাদের রেমিটেন্স যোদ্ধা। তারা শুধু কর্মক্ষেত্রে নয় প্রতিটি ক্ষেত্রে যুদ্ধ করে এই দেশে টাকা পাঠায়। বেআইনিভাবে যে যাবে সে হলো অবৈধ শ্রমিক। আর যে বোয়েসেল বা অন্য মাধ্যমে যাবে সে হবে বৈধ। ভাই ইউরোপে তো বৈধভাবে যাওয়া যায় না। সমুদ্র পার হয়ে গিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। তারাও বাংলাদেশের রেমিটেন্স যোদ্ধা। আর সে যখন জেলে চলে যাচ্ছে তখন তার পক্ষে সরকার কাজ করছে না। এই সংবিধান আমরা চাই না। আপনি যদি মধ্যপ্রাচ্যে যান, দেখবেন কত নারী, কত পুরুষ জেলখানায় আছে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : বেগম নাজমা আক্তার, আমি দুঃখের সাথে বলছি যে, আপনি একটু সংক্ষেপ করুন।

বেগম নাজমা আক্তার (সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন) : কত মানুষ কীভাবে আছে, কত কষ্টে দেশে ও দেশের বাইরে এগুলো বিচার করে আমরা একটি সংবিধান চাই। দেশের মানুষ যেন সুস্থভাবে খেয়েপড়ে বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারটা পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, বেগম নাজমা আক্তার। এরপরেও আপনাদের কোনো লিখিত বক্তব্য থাকলে আমাদের কাছে পৌঁছে দেন, তাহলে সেটা আমাদের জন্য সহজ হবে।

আমি এরপর অনুরোধ করব নিউজ পেপার ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) এর প্রতিনিধি জনাব আখতার হোসেন খান।

জনাব আখতার হোসেন খান (সাধারণ সম্পাদক, নিউজ পেপার ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)): শ্রদ্ধেও কমিশন প্রধান ও অন্যান্য সদস্যগণ, উপস্থিত সুধিমন্ডলী আস্‌সালামু আলাইকুম।

আমি ৩ জনেরই খুব সারগর্ভ এবং আমার জন্য জ্ঞানবর্ধক বক্তব্য শুনলাম। খুব ভালো লাগলো। আমার সেরকম কোনো বক্তব্য নেই। আমারা প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি এবং আপনার অফিস থেকেও বিভিন্ন সময়ে আমার কাছে ফোন এসেছে যে, আগের মিটিংয়ে ডাকা হয়েছিল। আমাদের এসোসিয়েশনটা এমন একটা এসোসিয়েশন যে, নিউজপেপার মালিকদের একটা অংশ এবং এডিটররা এত ব্যস্ত থাকেন যে, তারা একটা মিটিং এর ডেট দিতে পারেন না। একটা মিটিং দিয়েছিলেন আমাদের প্রেসিডেন্ট, ৪-৫ টা পয়েন্ট সাবমিট করেছেন। কালকে যখন প্রেসিডেন্টকে বললাম যে, আগামীকাল তো ওখানে যেতে হবে। তিনি বলেন যে, আমরা যে পয়েন্টগুলো নিয়ে আলাপ করা শুরু করছিলাম, সেটা জমা দিয়ে আসেন। তারপরে দরকার হলে একটু সময় নিয়ে আসেন আমরা পরে দিবো। আপনি যদি চান ৪-৫টা পয়েন্ট বলতে পারি তবে এতো বিস্তারিত না। আপনি যেহেতু আমাদের সুযোগ দিচ্ছেন পরে আমরা পাঠিয়ে দিতে পারি।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : আপনারা যেহেতু বলছেন যে, এটা সম্পূর্ণ নয়। তাহলে আপনারা ৪-৫ দিন সময় নেন।

জনাব আখতার হোসেন খান (সাধারণ সম্পাদক, নিউজ পেপার ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)): আপনি চাইলে এটাও জমা দিতে পারি।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): এটা আমাদের কাছে জমা দিন। পরে বিস্তারিতটা যদি আগামী ৭দিনের মধ্যে ই-মেইল করে পাঠিয়ে দিতে পারেন, তবে সেটা আমাদের জন্য সহায়ক হবে।

ধন্যবাদ, আপনাকে।

জনাব আখতার হোসেন খান (সাধারণ সম্পাদক, নিউজ পেপার ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)): Thank you very much.

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): এখন সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস) এর প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্য রাখবেন।

জনাব রোমান উদ্দীন (সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস): ধন্যবাদ, সুযোগ প্রদান করার জন্য। আমি রোমান উদ্দীন, সহযোগী গবেষক। গবেষণা সহযোগী হিসেবে কাজ করছি সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ এ।

এই আলোচনা থেকে আমাদের প্রথম আহ্বানটা হলো, পরবর্তীতে যদি পুনর্লিখন অথবা সংস্কার যে নামেই আমরা সংবিধান করি না কেন সেটি যেন আধুনিককালের চলিত ভাষায় লেখা হয়। সেটা যেন সাধু ভাষায় না লেখা হয়। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বুঝতে অসুবিধা হবে যদি সংবিধান চলিত ভাষায় না লিখে সাধু ভাষায় লিখি। আমার মনে হয়, আমরা যদি সংস্কার করি তবে সেটা যেন চলিত ভাষায় হয়।

সংবিধান সংস্কার বিষয়ক যে কমিশনটি গঠিত হয়েছে আমার মনে হয়, বাকি যতগুলো কমিশন রয়েছে তারমধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে এই কমিশনটি। এই কমিশনের কাছে আমাদের যে আহ্বান, প্রত্যাশা সেটা হলো, গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা যেন এখানে প্রতিফলিত হয়। সেটা কীভাবে? যেমন একটা অংশের মানুষ মনে করছে যে হয়তো এই সংবিধানের মধ্য দিয়ে '৭১কে ছাপিয়ে '২৪কে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হতে পারে। এটা একটা উপলব্ধির কথা বললাম। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শব্দটা ব্যবহার করা খুব কঠিন। আমরা spirit ব্যবহার করছি। কারণ চেতনা শব্দটি ৫ বার অর্থাৎ এত বেশি ব্যবহার করা হয়েছে যে, সেটি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে যে, '২৪ এর চেয়েও বড় বিষয় হচ্ছে, আমাদের '৭১ এর যে spirit সেই spiritটা যেন পরবর্তীতে সংবিধানের যে সংস্কার বা পুনর্লিখনটা হবে সেখানে থাকে। আর '৭২ এর সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছি তার একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। এই ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটা নিয়েও আমরা অনেক রাজনীতি দেখেছি। আমরা মনে করি, শব্দগতভাবে এটাকে একটু পরিবর্তন করে ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় ধর্মীয় সমতা এই জাতীয় কোনো শব্দ ব্যবহার করতে পারি কী না? যেটি আমাদের দেশের সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু যারা রয়েছেন প্রত্যেককে নতুন একটা insight দিবে। ধর্মনিপেক্ষতা বুঝতে আমাদের একটু সমস্যা হতে পারে। আমরা সব মানুষকে জড়িত করে কথা বলার চেষ্টা করছি। সেইক্ষেত্রে ধর্মীয় সমতা শব্দটি আর একটু বেশি আকর্ষণ করতে পারে। অনেক কথাই আমরা এতদিন যাবৎ অনুসরণ করছি। সব ধরণের স্টেকহোল্ডারদের মধ্য থেকে একই রকমের আলোচনা আসছে। হয়তো পুনরাবৃত্তি করলে এটা হবে যে,

একই বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হবে। এজন্য আমি যে বিষয়গুলো একটু কম আলোচিত হয়েছে, সেগুলো নিয়ে আমি প্রথমে কথা বলি। আমি ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করব।

প্রথমত আদিবাসীদের স্বীকৃতির বিষয়টি। যেটি আমি রাজা সাহেবের কাছ থেকে আশা করেছিলাম সেটি হলো যে, আমাদের বর্তমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬(২) এ বলা আছে, "বাংলাদেশের সব মানুষ বাঙালি বলিয়া বিবেচিত হইবে।" আমার মনে হয়, এটি বাঙালিদের জন্য, আমাদের দেশের আদিবাসী অথবা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী যাদের বলি এটি তাদের পরিচয়ের জন্য সংকট তৈরি করবে। আমরা মনে করি, আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী আপনি যে নামেই তাকে স্বীকৃতি দেন তাদের বাঙালি না বলাটা অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সব জাতিকে বাঙালি বলার বিষয়টা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়াটা আমাদের পরিবর্তন করতে হবে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দ্বৈত নাগরিকত্ব। অনুচ্ছেদ ৬৬(২) অনুযায়ী হয়তো আমরা বলতে পারি যে, বিদেশী নাগরিকরা এদেশে নির্বাচন করতে পারবেন না বা সাংবিধানিক কোনো পদে থাকতে পারবেন কী পারবেন না? কিন্তু দ্বৈত নাগরিকত্বের ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট কোনো ধারণা এখনও আছে কীনা আমরা জানি না। যদি বাংলাদেশী কোনো নাগরিক একইসাথে অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব পেয়ে যান অর্থাৎ দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকে তার যদি প্রজ্ঞা থাকে এবং তার যদি বাংলাদেশের প্রতি সেই ownershipটা থাকে, তবে আমরা মনে করি যে, তাকেও বাংলাদেশে নির্বাচন করার মতো সাংবিধানিক অধিকারটা দেওয়া উচিত।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, floor crossing. Floor crossing নিয়ে খুব আলোচনা হয়, অনুচ্চেধ ৭০ এ। আমার মনে হয়, সব স্টেকহোল্ডার এটা নিয়েও কথা বলেছেন। এখানে একটি বিষয় রাখা যেতে পারে। যেটা আমরা হয়তো বা পাকিস্তানের সংবিধানে দেখেছি। বিশ্বের অন্যকোনো সংবিধানেও থাকতে পারে- সেটা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। দলের প্রতি অনাস্থা বিষয়ক ভোট বা জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক ভোট ছাড়া বাকি বিষয়গুলোর প্রতি অনুচ্ছেদ ৭০ কে একটু পরিবর্তন করা যায়। কিছু বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করে বাকি বিষয়গুলোর জন্য আমরা সাংবিধানিকভাবে floor crossing-এর সুযোগটা দিতে পারি। এটা আমাদের প্রস্তাব।

এছাড়াও রয়েছে যে, ২ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী না হওয়ার বিষয়টা। আমরা যদি রাশিয়ার দিকে তাকাই সেখানে আমাদের একটা আশঙ্কা থাকে। আমরা বলছি যে, ২ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হওয়া যাবে না। দেখা গেলো একটা দল ক্ষমতায় আসলো ২ বার প্রধানমন্ত্রী হলো। তারপর সে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাকে প্রধানমন্ত্রী শাসিত না করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সমাজ ব্যবস্থা করলো। তারপর সে রাষ্ট্রপতি হয়ে গেলো। যদি সংবিধানে পরপর ২ বার বা ২ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী না হওয়ার একটা provision আমরা যোগ করি, তাহলে সেটি যেন Head of the Country হয়। যে শাসিত সরকার ব্যবস্থা হয়, সেই শাসিত সরকার ব্যবস্থাতেই যেন ২ বারের বেশি না হতে পারে। সেটা হোক প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা।

গণভোটের বিষয়েও অনেক আলোচনা হয়েছে। আমরা জোর দিয়ে বলছি, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যেমন- সংবিধান পরিবর্তন করা বা এ জাতীয় বিষয়ে অবশ্যই গণভোটের আয়োজন রাখতে হবে। কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধি মিলেই যদি সংবিধান পরিবর্তন করে ফেলে তা তো হতে পারে না। সেজন্য আমাদের মনে হয়, গণভোটকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যেটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪(১) এ ছিল। এছাড়া আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকতে পারে, যেমন CHT. আমরা স্বায়ত্তশাসন দিব কি দিব না বা সংবিধান পরিবর্তন করব কি করব না এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে গণভোটকে ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি বলে আমরা মনে করি। সময় খুবই কম। তাই সংক্ষেপে শেষ করছি।

গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার যদি আমরা বাংলাদেশে নিশ্চিত করতে পারি, সেক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রীয় ধর্ম থাকাটা আমি মনে করি সেই ধর্মকেই অবজ্ঞা করা হয়। রাষ্ট্রীয় কোনো ধর্ম থাকতে পারে এবং এরকম কিছু আছে সেটা আমরা এখন মনে করতে পারছি না। সার্বিকভাবে আমরা যদি গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারকে নিশ্চিত করতে পারি তাহলে রাষ্ট্রীয় ধর্ম থাকার কোন প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখছি না।

পাশাপাশি স্বাধীন বিচার বিভাগের নামে অনুচ্ছেদ ৯৪(৪)-এ একরকম বলেছে। সেটিকে আবার অনুচ্ছেদ ১১৬ অনুযায়ী আমরা রাষ্ট্রপতির অধীনে দিয়ে দিলাম। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে আমরা এমনভাবে কুক্ষিগত করলাম অনুচ্ছেদ ৫৬(২) অনুসারে যে, তাকে আবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। অর্থাৎ আমরা সাংবিধানিকভাবেই জুডিশিয়ারিটাকে মন্ত্রিপরিষদের অধীনে নিয়ে আসলাম। এভাবে না করে বিচার বিভাগটাকে স্বাধীন রাখা হোক। সেটা যেন সংসদের উপর নির্ভরশীল না করা হয়। আর ক্ষমতার ভারসাম্যটা যেন করা হয়। যেটা সবাই বলেছেন। উপপ্রধানমন্ত্রীর ব্যবস্থা এখানে সংযুক্ত করা যেতে পারে। একইভাবে উপরাষ্ট্রপতিও সংযুক্ত করা যেতে পারে। শুধুমাত্র ক্ষমতার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে নয়, যদি সার্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়, যেমন-প্রধানমন্ত্রী কোনো কারণে উৎখাত হলেন বা কোনো কারণে তিনি চলে গেলেন তখন যেন উপপ্রধানমন্ত্রী আসতে পারেন এবং ক্ষমতার একটা ভারসাম্য যেন থাকতে পারে। এই ছিল মোটামুটি আলোচনা। বাকি যে আলোচনাগুলো ছিল সেগুলো হলো, মেয়াদ চার বছরের বেশি হওয়া যাবে না, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

সেগুলোর সাথে আমরা সহমত পোষণ করছি।

স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সবাইকেও ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, জনাব রোমান উদ্দীন, সিজিএস-এর পক্ষ থেকে আপনার দাবিগুলো উপস্থাপন করার জন্য। আমরা অনুরোধ করব আপনাকে যদি সম্ভব হয় যে দাবিগুলো করলেন সেগুলো যেন লিখিতভাবে আমাদের কাছে দেন, তাহলে সেটি রেকর্ডের জন্য আমাদের সুবিধা হবে। এখন আমরা আসব মায়ের ডাকের প্রতিনিধি মিসেস সানজিদা ইসলাম তুলি এর কাছে।

সানজিদা ইসলাম তুলি (অর্গানাইজার, মায়ের ডাক): সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সংবিধানের যে পরিবর্তন বা সংস্কার সেই ক্ষেত্রে আমাদের জায়গা থেকে একজন নাগরিক হিসেবে আমি বিগত অভিজ্ঞতা থেকে যেগুলো বলতে চাই সেগুলো সংবিধানে সংযুক্ত থাকা দরকার। আমরা যেহেতু পরিবর্তন চাচ্ছি।

প্রথম যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র। প্রথমেই মৌলিক অধিকার রক্ষার কথা বলি, অনেক মানুষকে আমরা বেঁচে থাকার অধিকারও দিতে পারিনি। তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া, গুম করে ফেলা, হত্যা করে ফেলা হয়েছে। সেই সময় আমরা দেখেছি রাষ্ট্র চুপ ছিল এবং জুডিশিয়ারিকে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখিনি। তাদের যে এখতিয়ার যেটা তাদের নিজ জবাবদিহিতা ছিল সেই প্রতিফলনটা আমরা পাইনি। আমাদের মতো এখন হাজারও victim বাংলাদেশে। যার ফলশ্রুতিতে এই সময়টা আমাদেরকে পার করতে হচ্ছে। গত ১৬ বছর ধরে মানবাধিকারের ভয়াবহ লঙ্ঘন হয়েছে। যতো victim ছিল তাদের ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু ব্যবস্থা নিতে পেরেছি, সেটা বিচারিক বলেন, পুনর্বাসন বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য যে ক্ষেত্রেই বলেন। মৌলিক অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে বলব যে, অবশ্যই সংবিধানে যেন এর প্রতিফলন থাকে এবং এর পরিধির ব্যপ্তি যেন অনেক থাকে। যে ক্রান্তিকালীন সময় বাংলাদেশ পার করছে সেই ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থাগুলো নিশ্চিত করতে হবে। যে মানুষগুলোর বিচার এখনও নিশ্চিত করা যায়নি, যাদের সন্তান হারিয়ে গেছে বা হত্যা করা হয়েছে তাদের এখনও চিকিৎসার আওতায় আনা হয়নি, তাদেরকে এখনও রাষ্ট্রীয় কোনো সাহায্য প্রদান করা হয়নি। তাদের নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। আমার মনে হয়, সেই জায়গাগুলোতে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কারণ আমরা সংবিধান সংস্কার করব এই কথাটা যে আজকে আলোচনা করতে পারছি সেই জায়গাটা আসলে এদের ত্যাগের বিনিময়ে এসেছে। আর একটা বিষয় বলতে চাই, কার্যনির্বাহী বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে একটা সুষম বণ্টন থাকা দরকার। এই সুষম বণ্টন না থাকার কারণে ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলেই চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছিল। আমরা জানি যে, ৭ হাজারেরও বেশি মানুষ যারা গুমের শিকার, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার- এর থেকে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন আসলে হয় না। এটাকে বিবেচনায় আনা দরকার। সুষম বন্টন, ক্ষমতার বন্টন। আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো যখন কাজ করে তাদের কার্যপরিধি কোন জায়গায় কতটুকু হবে সেটা কখনই সুনির্দিষ্ট করে ব্যাখ্যা করা থাকে না। যে ক্ষমতার ব্যবহার তারা করে। সেখানে দেখা যায় যে, মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং privacy label ভঙ্গ করে কাজ করতে পারে এবং মানুষকে নির্দ্বিধায় অবৈধভাবে তুলে নিতে পারে। এগুলো বন্ধ করার জন্য আমাদের বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে, আইন বিভাগের ক্ষেত্রে আরও কি কি সংযুক্ত করতে হবে সে বিষয়ে আমাদের আরও আলোকপাত করতে হবে। জুডিশিয়ারি, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ছাড়াও অন্য যতো প্রতিষ্ঠান যেমন মানবাধিকার কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এমন জায়গায় রাখা, তাদের কাজের প্রতিফলন কী হচ্ছে? মানবাধিকার কমিশন ছিল বাংলাদেশে। তারা আসলেই মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেছে কীনা, কোনো দিন কোনো কথা বলেছে কীনা- ১৬ বছরে আমরা কোনো দিন দেখিনি। ১৬ বছরে কখনও সামনে আনেনি যে কয়টা মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। জুলাই-এর অভ্যুত্থান নিয়েও তাদের কোনো কথা ছিল না। সেই জায়গা থেকেও আমাদের অনেক বড় প্রত্যাশা থাকবে।

আর একটা হচ্ছে, freedom of expression and freedom of speech. এগুলোকে স্বাধীন জায়গায় যদি আমরা নিয়ে যেতে চাই সেই জায়গা থেকে আমাদের রাষ্ট্রের যেসব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কথা বলতে চাচ্ছে, তাদেরকে বৈধতা দিতে হবে। আমরা যখন victim ছিলাম কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারিনি। আমাদের কোনো ভেন্যু বুকিং দেওয়া হয়নি। এই অবৈধ practiceটা যেন পরবর্তীতে কোন মানবাধিকার সংস্থার সাথে করতে না পারে।

আমাদের সবচেয়ে বড় reflectionটা হয় রাজনৈতিক দলগুলো যখন সংসদীয় প্রতিনিধি নির্বাচন করে তখন। আমরা দেখি যে, যখন ব্যবসায়িক সিন্ডিকেটদেরকে ক্ষমতায় আনা হয় এবং তারা সেভাবেই বাংলাদেশকে চিন্তা করে। সেখানে সাধারণ মানুষের আশার প্রতিফলন হলো কীনা সেটা দেখা হচ্ছে না। সেটা অবশ্যই আনা দরকার। পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ যেমন- গত জুলাই এর গণঅভ্যুত্থানে নারীদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে আমরা এটার প্রতিফলন সংসদে দেখতে পাব কীনা সেটাও সংবিধানে আসা দরকার। ৪০% মহিলাদের সেখানে দেখতে পারছি না। তাদের জন্য সংরক্ষিত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কেন? নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে

সংসদে কেন নারীদের অবস্থা আমরা দেখতে পারছি না? সেখানে ৪০% প্রতিফলন নেই। বাংলাদেশের ইতিহাসে অধিকারের আন্দোলন বলেন আর গণঅভ্যুত্থান বলেন সেখানে আমাদের নারীদের অংশগ্রহণ কত মাত্রায় ছিল? কিন্তু আমরা কখনও দেখিনি যে, সংবিধানে এটার প্রতিফলন ছিল। আমরা আশা করি, এই প্রতিফলনটা আমরা দেখতে পাব।

আর একটা অনেক বড় বৈষম্য আমরা দেখতে পাই যে, উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত আয়ের ক্ষেত্রে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ব্যবধানটা আমরা কমাতে পারব, সংবিধানে যদি সেটার প্রতিফলন না থাকে, তাহলে অমার মনে হয়, আমরা বাকি যত প্রক্রিয়াতেই যাই না কেন আমরা আমাদের জনতার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পারব কী না সন্দেহ রয়েছে।

অনেক বড় একটা অব্যবস্থাপনা আমরা দেখেছিলাম। বহির্বিশ্বের সাথে, পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক কেমন হবে? ভারতের হস্তক্ষেপ আমরা দেখেছি। অনেক সময় আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যেও তারা কাজ করেছেন। System ভঙ্গ করার জন্য, আমাদের দেশের মানবাধিকার লঙ্ঘন করার জন্য যেভাবে তারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভিতরে কাজ করেছে এই সমস্ত অবৈধ এখতিয়ার যেন আমরা আর কোনো দিন কোনো রাষ্ট্রকে না দেই। ভারতেকে তো নাই এছাড়াও অন্য কোনো রাষ্ট্রকেও যেন না দেওয়া হয়। এটা যেন আমাদের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে থাকে। আরও বলতে চাচ্ছিলাম যে, জনপ্রশাসন যখন নির্ধারন করে যে, কারা এর প্রতিনিধি হবে বা কাজ করবে, তখন লেজুড়বৃত্তিক ব্যবস্থা যেন কাটিয়ে উঠতে পারে বা ব্যবস্থাটা যেন নিরপেক্ষ থাকে, তাহলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, জনগণ যারা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে এসেছেন বা যোগ্য তাদেরকে সেখানে আনা সম্ভব হবে। অন্যথায় লেজুড়বৃত্তিক যে অব্যবস্থা সেটার মধ্যেই আমরা থেকে যাবো। আমাদের পক্ষ থেকে এটাই আমাদের মূল বক্তব্য ছিল। সময় স্বল্প। আমরা চেষ্টা করব পরবর্তীতে আরও কিছু যোগ করার।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, মিসেস সানজিদা ইসলাম তুলি। আপনারা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য বা লিখিত বক্তব্য যদি আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারেন, তাহলে এটা আমাদের রেকর্ডের জন্য বিশেষ সহায়ক হবে। আপনারা প্রত্যেকেই বলছেন, এখানে সেগুলো রেকর্ড হচ্ছে সেগুলোরও অনুবাদ করা হবে। আমরা ভবিষ্যতে কোনো এক সময় এগুলো সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে চাই। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট হিসেবে এটা থাকবে যে, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় সংবিধানের বিষয়ে মানুষের কী আকাঙ্ক্ষা ছিল? এর কতটা audit হবে কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা জানি না। কমিশনের TORটা খুব স্পষ্ট। আমরা কিছু সুপারিশ সরকারের কাছে পৌঁছে দেবো। কিন্তু এই রেকর্ডগুলো থাকা দরকার এবং তা মানুষের আকাঙ্ক্ষা মনে করেছি এবং সেজন্য আমরা এই consultation process করছি, রেকর্ড করছি। আপনাদের বক্তব্যগুলো লিখিতভাবে দিলে আমাদের জন্য সহজ হবে।

এরপর আমরা যাব বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের কাছে।

প্রফেসর মির্জা তাসলিমা (বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক) : ধন্যবাদ।

আমি একটুখানি বলব। আমরা আসলে সংবিধান নিয়ে যে অনেক কাজ করেছি তা না। প্রাথমিকভাবে আমি কিছু বলব। এরপরে আমার সহকর্মী মারুফুল ইসলাম বলবেন। ১০ মিনিটের মধ্যেই আমরা শেষ করব। অনেক আলোচনা হয়েছে। আমরা সংক্ষেপে বলতে চাই যে, এটাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয় কিন্তু এটা প্রজাতন্ত্র না। জনতন্ত্র বলা যায় কীনা সেটা নিয়ে ভাবা দরকার। সংবিধানে অনেক কিছু আছে কিন্তু আসলে বাস্তবে অনেক কিছু প্রয়োগ নেই। সেটা কীভাবে নিশ্চিত করা যায় আমি জানিনা। সেটা সংবিধানের এখতিয়ারভূক্ত কীনা সেটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন। আর বলতে চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা হতে পারে কিন্তু অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ আছে সেটা আমাদের সংবিধানে প্রতিফলিত হয়নি। সেটা থাকতে হবে। এরপরে জাতির পিতার প্রশ্ন। জাতির পিতা আসলে খুবই পিতৃতান্ত্রিক একটি ধারণা। জাতির স্থপতির প্রশ্ন থাকতে পারে। স্থাপতি একজন নাও হতে পারেন। আসলে তো জাতির স্থপতি একজন হয় না। অনেকে মিলেই জাতিধারণা তখন কাজ করেছিল। সেটাও চিন্তা করা যেতে পারে। রাজা দেবাশীষ রায় বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি না। আমরা বলতে চাই যে, এখানে বহুজাতির বসবাস আছে সেটা সেভাবেই লেখা থাকা দরকার। বহুজাতির কথা এখানে বলার কথা। কিন্তু নাগরিকত্বের জায়গায় বাংলাদেশি বলতে পারি। ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে। আমরা একটা প্রস্তাব করতে চাই। বহু ধর্মের কথা বলা যায়। ধর্মনিরপেক্ষতা শুনলে মনে হয়, ধর্মহীনতার কথা বলা হয়েছে। যদিও তা না আমরা জানি। যেহেতু এটা নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা অস্বস্তি রয়েছে সেজন্য বহুধর্মের কথাও বলা যেতে পারে। এছাড়া সমাজতান্ত্রিকতা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। এটার মানে কী ? আমাদের যে উদারনৈতিক অর্থনীতি এখানে চলছে সেটা তো সমাজতন্ত্রের সাথে যায় না। এইরকম পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা আছে। সেটাও পরিষ্কার করা দরকার। সংবিধানে যেটা ছিল সেটাতে কী দেখছিলাম? সেখানে "প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হইবে" এটা বলা হয়েছে। এটা বলার মাধ্যমে মনে হতে পারে যে, জনগণ তাহলে কিছু

বলতে পারবে না। সবসময় নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমেই বলতে হবে। এটা মনে হয় চিন্তা করার দরকার আছে। এছাড়া জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে নৈতিকতা নিয়ে যেসব কথা আছে, যেমন-জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে চিকিৎসকের কী নৈতিকতা হবে ইত্যাদি নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে ওখানে যেসব কথাবার্তা বলা আছে সেটা আমার মনে হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় কিছু কথাবার্তা। অনুচ্ছেদ ১৯(৩)-এ আছে, নারীদের প্রসঙ্গে। এখানে বিভিন্ন জায়গায় নারী-পুরষের প্রসঙ্গে বলা আছে। এখানে শুধু নারী না বলে নারী-পুরুষ ও লিঙ্গবৈচিত্র্যের মানুষের কথা যুক্ত করা দরকার। যতগুলো জায়গায় আছে। শুধু নারী ও পুরুষ না নারী ও পুরুষের বাইরেও মানুষ আছে। সেটা রাখতে হবে। প্রান্তিক নৃগোষ্ঠী বলা যেতে পারে যেটা আসলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলা আছে। রাজা দেবাশীষ রায় যেটা বলেছেন যে, সেখানে আমরা জাতিগোষ্ঠী অথবা ethnicity-এর কথা বলতে পারি। Ethnicity সংখ্যায় কতটুকু সেটা তো গুরুত্বপূর্ণ নয়। জাতিগোষ্ঠী হিসেবে তাদেরকে আলাদা করা। সেটা রাখা যেতে পারে। আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থা কী হবে এটা নিয়ে একটুখানি আলোচনা আছে। প্রফেসর কাজী মারুফুল ইসলাম এখানে যোগ করবেন।

প্রফেসর কাজী মারুফুল ইসলাম (বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক) : ধন্যবাদ। সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্যার আপনার নেতৃত্বে গঠিত কমিশন সভার সবাইকে শুভেচ্ছা। আমরা সরাসরি পয়েন্টে চলে যেতে চাই। আমরা মৌলিক অধিকারের মধ্যে একটা বিষয় সংযোজন করার কথা প্রস্তাব করতে চাই। মানুষের সম্মানজনক নূন্যতম মজুরী পাওয়া, এটা একটা মৌলিক অধিকার হিসেবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা দরকার বলে আমরা মনে করছি।

সংবিধান সংস্কারে অনুচ্ছেদ ৭(খ) এর যে বিধান যুক্ত আছে তাতে, এই আলোচনাকে একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা একেবারে criminalise করা হয়েছে। তাই অনুচ্ছেদ ৭(খ) এর পুনর্বিবেচনা বা পুনর্লিখন দরকার। অর্থাৎ এই সংবিধান সংক্রান্ত বা জাতীয় পতাকা বা রাষ্ট্রভাষা ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনাকে খোলাখুলি করার সুযোগ যেন থাকে সেটি করার প্রস্তাব করছি।

সংসদীয় ব্যবস্থা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করার জন্য প্রস্তাব করছি। সেক্ষেত্রে আমাদের জায়গা থেকে ভেবেছি যে, বাংলাদেশের সংস্কৃতি বা রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিবেচনা করে দুটো কক্ষের। প্রথম কক্ষ নির্বাচন আমাদের first past the post পদ্ধতি অনুসরণ করে করা যেতে পারে। কিন্তু নিম্নকক্ষে যেরকম ভোট পাবে তার সমানুপাতে উচ্চকক্ষের একটা মনোনয়নের ব্যবস্থা/নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু একই সাথে আমরা এটাও মনে করছি যে, সম্পূর্ণভাবে যদি আমরা একটা আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির দিকে যাই সেটিও দ্বিতীয় বিকল্প হিসেবে থাকতে পারে। অর্থাৎ বর্তমান পদ্ধতির বাতিল চাই। আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন দরকার, সেভাবে সংসদে প্রতিনিধিত্ব দরকার। সেট নিয়ে আমাদের একটা বিস্তারিত আলোচনা আছে। আমরা পেশ করে যাব। সংসদের মেয়াদের ক্ষেত্রে আমরা ৪ বছরের প্রস্তাবটাকে সমর্থন করছি। একইসাথে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সংকোচন, সেই জায়গাতে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে চাই, যে ২ মেয়াদের প্রশ্ন এসেছে আমার মনে হয়, ইতোমধ্যে একটা সম্মতি তৈরি হয়েছে। আমরা সেটা সমর্থন করছি। একই সাথে যিনি প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তিনি যেন দলের দায়িত্বে না থাকতে পারেন। দলের প্রধানের দায়িত্বে থাকার যে রেওয়াজ আছে সেটি বিধান যুক্ত করা দরকার।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে আমি কাজ করেছি। আমি দেখেছি যে, এখানে অনেক দুর্বলতা আছে। আমি নিশ্চিত না যে, এটা সংবিধানে স্পষ্ট আনতে হবে নাকি আমাদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে আনতে হবে। কিন্তু caucus তৈরি করার বিধান এবং স্থায়ী কমিটিগুলো যেন গণশুনানি করতে পারে যে বিধানগুলো এখনে নেই, কার্যপ্রণালী-বিধিতে নেই সাংবিধানিকভাবে এই জায়গাগুলোর জন্য opening creat করা হয়।

অনুচ্ছেদ ৫৯ এবং ৬০ এ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নিয়ে বলা হয়েছে। সেই জায়গায় ভাষাগত এবং অর্থগত পরিবর্তন চাই। যেটি স্থানীয় শাসন বলা আছে। local self governance বা স্থানীয় স্বশাসন এর স্থলে স্বায়ত্তশাসন শব্দটা প্রতিস্থাপন করা দরকার। যেটা আসলে উৎসাহিত করবে বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থার।

বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটা প্রস্তাব। বর্তমান উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের যে প্রক্রিয়া সেটি সংশোধন করা দরকার। সংশোধন করার জায়গাটি হচ্ছে, নিয়োগের জায়গাতে একটা জনশুনানির আয়োজন করা যেতে পারে। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সাথে বা তার আগেই একটা জনশুনানির আয়োজন করা যেতে পারে। আর দ্বিতীয়ত, বলতে চাই যে, সংবিধান বা এর ব্যাখ্যায় আমরা একটি special constitutional court যদি নাও পারি একটা বেঞ্চের ব্যবস্থা করতে পারি কীনা? কোর্ট হলে ভালো হয়। তবে সেটি যদি বেশি প্রত্যাশা মনে হয়, তাহলে কমপক্ষে বেঞ্চের কথা বলতে চাই। Constitutional bench থাকা দরকার যারা constitutional explanation and rights-এর বিষয়ে বলবে।

শেষ প্রস্তাব হচ্ছে, বৈদেশিক চুক্তির স্বচ্ছতা। আমরা বলতে চাই, কোনো বৈদেশিক চুক্তি সংসদে আলোচনার বাইরে অনুমোদন হওয়া উচিত না। নির্বাহী অনুমোদনের কোনো সুযোগ থাকা উচিত না। ফলে সকল বৈদেশিক চুক্তি সংসদে আলোচনা করে এর অনুমোদনের ভিত্তিতে কার্যকারিতা নির্ধারণ করা দরকার।

এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে আমাদের প্রস্তাব। আমরা যেটা লিখে এনেছি সেটা আমরা দিয়ে যাবো এবং আমরা আরও কিছু সংশোধন করে ই-মেইলে পাঠাতে চাই।

ধন্যবাদ সবাইকে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আপনাদেরকে আরও একটা কারণে ধন্যবাদ যে, আপনারা ১০ মিনিটের চেয়েও কম সময় নিয়েছেন। আমি প্রফেসর মির্জা তাসলিমা এবং প্রফেসর কাজী মারুফুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমরা এখন শুনব বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশনের বক্তব্য। আছেন মাসরুর সালেকীন এবং মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন। যিনি বলবেন, তিনি প্রথমে নামটা বলে শুরু করেন তাহলে আমাদের রেকর্ডের জন্য সুবিধা হবে।

জনাব মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন (সদস্য, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন) : ধন্যবাদ স্যার।

শুরুতে আমি ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ এর জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি। আমরা একটি সংগঠন হিসেবে এখানে এসেছি আমাদের যে mandate সেটা হচ্ছে জুডিশিয়ারি সংক্রান্ত। এই প্রসঙ্গে আমাদের যে প্রস্তাবগুলো থাকবে সেগুলো দেখার জন্য অনুরোধ করব। শুরুতে ২-৩টি ইস্যুতে সাধারণ একটা মতামত দিতে চাই। আমরা মনে করছি যে, সংবিধানের ভাষাটা সাধু ভাষা থেকে জনগণ যাতে বোঝে এমন চলিত ভাষায় লেখা যেতে পারে।

এরপর সংবিধানে আছে প্রজাতন্ত্র, এগুলো আমাদের ইতিহাস সচেতন মানুষের মধ্যে এক ধরণের allergy তৈরি করে। এক ধরণের অধঃস্তনতার স্মারক বহন করে। এগুলোকে বদলানো যেতে পারে। এছাড়া খাদ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এই তিনটাকে আমি সরাসরি মৌলিক অধিকারে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া অন্যান্য যেসব মৌলিক অধিকার থাকবে সেসবের ক্ষেত্রে এখন যেরকম আছে যে, কোনো শর্ত আরোপ করা যাবে না। এবার আমি অনুচ্ছেদ ভিত্তিক আলোচনায় প্রবেশ করছি।

প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের বদলে আমাদের দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাচের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, *federal state*-এ জুডিশিয়ারির কার্যক্রম খুব ভালো করে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের চেয়ে। এতে ক্ষমতার ভারসাম্যটা ভালো থাকে। আমাদের দেশের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করছি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩-এ অনুচ্ছেদে ভাষার কথা আছে। আমরা এখানে আদালতের ভাষা হিসেবে বাংলা করার প্রস্তাব করছি।

পরবর্তী প্রস্তাব হচ্ছে, অনুচ্ছেদ ২২ নিয়ে, যেখানে আছে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ সম্পর্কিত। এখানে আমরা প্রস্তাব করছি যে, শুধু নির্বাহী অঙ্গগুলো থেকে নয়, আইন সভা থেকেও বিচারবিভাগ পৃথকীকরণ এবং অর্থবহ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র- এগুলো অন্তর্ভূক্তির জন্য। এটা কেন তার ব্যাখ্যা আমরা লিখিত এনেছি। সেটা আমরা দিয়ে যাব, ব্যাখ্যা করছি না।

পরের প্রস্তাব হচ্ছে, মৌলিক অধিকারের অনুচ্ছেদ ৩৩, যেখানে প্রিতিরোধের কথা বলা আছে। আমরা এই অনুচ্ছেদের বিলুপ্তি প্রস্তাব করছি। কারণ হচ্ছে আমাদের আমরা দেখেছি যে, গুম খুন, আয়নাঘর এর আইনিক একটি কাঠামো হচ্ছে preventive detention.

এরপরের প্রস্তাব হচ্ছে, অনুচ্ছেদ ৩৮ সংগঠনের স্বাধীনতা। এখানে সংবিধান পরিপন্থি কোনো উদ্দেশ্যে কোনো সংগঠন তৈরি করা, এর সদস্য হওয়া, নিষিদ্ধ করার, রদ করার প্রস্তাব করছি। এর কারণ হচ্ছে, এর মাধ্যমে রাষ্ট্রে সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব তৈরি করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রে শুধু জনগণই সার্বভৌম। জনগণ চাইলে সংবিধান প্রত্যাখান করতে পারে, অন্য সংবিধান প্রস্তাব করতে পারে, পুনর্লিখন করতে পারে। এ অধিকার জনগণের organic intrinsic. এটা আমরা রদ করার প্রস্তাব করছি।

এর পরের প্রস্তাব হচ্ছে, অনুচ্ছেদ ৩৯ এ। চিন্তা, বিবেকের স্বাধীনতা বা বাক স্বাধীনতার বিষয়ে। এখানে অনুচ্ছেদ ৩৯(২ বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং আদালত অবমাননা-এ দুটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করছি। কারণ আদালতের রায়ের যুক্তিসঙ্গত পর্যালোচনা করা হচ্ছে জনগণের অধিকার। একইসাথে বিদেশি রাষ্ট্র সে রাষ্ট্র যতোই বন্ধু রাষ্ট্র হোক না কেন, এটা deal করার দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তার সমস্ত apparatus and mechanism দিয়ে এ দায়িত্ব নিয়ে deal করবে। জনগণের উপর এর দায় নেই যে কোনো রাষ্ট্রের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে পারবে না।

এর পরের প্রস্তাব হচ্ছে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪ এ। অনুচ্ছেদ ৪৪(২) হলো এমন একটি অনুচ্ছেদ যেটা এই ৫৩ বছরে কখনও ব্যবহার করা হয়নি। সবচেয়ে unused provisions আমাদের সংবিধানের। সেখানে "মৌলিক অধিকার আদালত" স্থাপনের একটা বিধান আছে প্রায় ৫২ বছর ধরে। এখন যদি হাইকোর্টের রীট আকারে দেখি তাহলে অনুচ্ছেদ ৪৪(২) অনুযায়ী রীট মামলা দায়ের করার এখতিয়ার হাইকোর্টকে রেখেই অন্য আদালতে দেওয়া যায়। আমরা সেটার প্রস্তাব করছি। একই সাথে আরও একটা বিষয় কাভার করবে বলে আশা করছি সেটা হচ্ছে,উচ্চ আলাদতের বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে। ৮ম সংশোধনীর যে রায়ের বাধা এটা একটা মনোস্তাত্ত্বিক বাধাও বটে এবং এটা আমরা পেরোতে পারছি না কোনো ভাবেই । এখন বিভাগীয় পর্যায়ে বা পুরাতন জেলা সদরগুলোতে যদি আমরা মৌলিক অধিকার আদালত স্থাপন করতে পারি, তাহলে উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রীকরণের একটা ধাপ আমরা করতে পারব।

এর পরের প্রস্তাব হচ্ছে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৯, ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার। এখানে আমি আইন সাপেক্ষে যোগ করার প্রস্তাব করছি।

এর পরের প্রস্তাব হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। এটা আমরা পুনঃপ্রবর্তনের প্রস্তাব করছি। তবে একই সাথে এখানে আগের যে বিধান ছিল, প্রাক্তন বিচারকদের এখানে যে বাধ্যতামূলকভাবে বিবেচনা করার বিধান সেটা রহিত করা সাপেক্ষে প্রস্তাব করছি এবং সেটা উন্মুক্ত থাকবে। সবাই মিলে আলোচনা করে যদি বিচার বিভাগের প্রাক্তন কোনো সদস্যকে বানাতে চান, তাহলে বানাতে পারেন। কিন্তু সেটা উন্মুক্ত থাকবে।

এর পরের প্রস্তাব হচ্ছে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৪, এটর্নী জেনারেল এর বিষয়ে। বাংলাদেশে আমরা এটর্নী জেনারেল বলছি। কিন্তু আমাদের সংবিধানে অন্যান্য যে বিধান আছে সেখানে সরকারের এটর্নী জেনারেল হিসেবে কাজ করতে দেখি। তাই প্রস্তাব করছি যে, এটর্নী জেনারেল হবে বাংলাদেশের এটর্নী জেনারেল এবং তার মেয়াদ থাকবে নির্ধারিত। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তাঁকে অভিশংসন করা যাবে। এর পরিপূরক হিসেবে সরকারগুলো solicitor general নিয়োগ করতে পারবেন। তিনি সরকারের সন্তোষজনক সাপেক্ষে পদে বহাল থাকবেন। সেক্ষেত্রে আমরা প্রাদেশিক স্তরে এটর্নী জেনারেল থাকবেন তিনি এটর্নী জেনারেলের ভূমিকা পালন করবেন এবং chief prosecutor of pleader থাকবেন যিনি solicitor general-এর ভূমিকা পালন করবেন এবং সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবেন। আর একটি স্থায়ী এটর্নী সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করছি আমরা। এখন পিপি, এপিপি, জেপি পদে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশের কারণে যে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হচ্ছে সেটার সাথে সম্পর্কিত এটা।

এর পরবর্তী প্রস্তাব হচ্ছে, রাষ্ট্রের সংযুক্ত তহবিলের উপর যে দায় আছে সেখানে বিচার বিভাগকে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করছি। এতে বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যাবে। এটা হচ্ছে অনুচ্ছেদ ৮৮ (গ)। এটা সংযুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

পরের প্রস্তাব হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্ট বা উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠা করা। প্রথমে আমি প্রস্তাব করছি যে, আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট ইত্যাদি ইংরেজি শব্দ বাদ দিয়ে বা এর পরিপূরক হিসেবে রেখে সুপ্রিম কোর্টের জায়গায় 'সর্বোচ্চ আদালত' হাইকোর্টের জায়গায় 'উচ্চ আদালত' নাম করা যেতে পারে। যেহেতু আমরা ফেডারেল স্টেটের প্রস্তাব করেছি, তাই প্রাদেশিক স্তরেও একটি করে হাইকোর্ট থাকবে এবং প্রত্যেকটি হাইকোর্টে এক একজন প্রধান বিচারপতি থাকবেন।

এর পরের প্রস্তাব হচ্ছে, অনুচ্ছেদ ৯৫, বিচারক নিয়োগ। এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্য ছাড়া সর্বোচ্চ আদালতের কর্মে প্রবীণ বিচারকই হবেন প্রধান বিচারপতি। আর অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা একটা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশনের প্রস্তাব করছি। সেখানে সদস্য কারা হবেন সেটা লিখিত আছে। আমরা কী সেটা বলব স্যার?

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : আপনি যেহেতু উল্লেখ করেছেন যে, আপনারা একটি লিখিত দিচ্ছেন তাই আমার মনে হয়, এটা রেকর্ডে থাকছে যে, আপনারা এই বিষয়টাতে মনোযোগ দিয়েছেন। এখন সময়ের দিকেও একটু মনোযোগ আকর্ষণ করব।

মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন (সদস্য, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন) : ধন্যবাদ স্যার।

এর পরের প্রস্তাব হচ্ছে, বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে জুডিশিয়াল সার্ভিস থেকে ৬০% ও বার থেকে ৪০% বিচারক নিয়োগের। কারণ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ করা হচ্ছে। তাই যাদের বিচারিক অভিজ্ঞতা বেশি তাদের নিয়োগ করলে তারা ভালো করবে বলে আশা করা যায়। আরও অন্যান্য কারণ আছে, সেগুলো আমি ব্যাখ্যা করছি না। সুপ্রিম কোর্টের উচ্চ আদালতের বিচারকদের অবসর গ্রহণের পরে অন্য কোনো পদে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। সেটা যে কোন কমিশনে হতে পারে। স্থায়ীভাবে কোনো কমিশন বা ল' কমিশন, তথ্য কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন কোথাও নিয়োগ দেওয়া যাবে না এরকম প্রস্তাব করছি।

অনুচ্ছেদ ১০০ এ প্রস্তাব করছি যে, সুপ্রিম কোর্টের একটি পৃথক সচিবালয় থাকতে হবে। বিচার বিভাগ স্বাধীনতা ও পৃথকীকরণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের একটি পৃথক সচিবালয় স্থাপন করা জরুরি।

এর পরের প্রস্তাব হচ্ছে অনুচ্ছেদ ১১৬, যেখানে অধঃস্তন আদালত সম্পর্কে বলা আছে। অধঃস্তন আদালত একটা ভুল শব্দ বলে আমি মনে করি। এটা হচ্ছে জনগণের কোর্ট। কারণ জনগণ সবার আগে যে আদালতে দ্বারস্ত হয় সেটাই হচ্ছে অধঃস্তন আদালত। পৃথিবীতে কোনো আদালতই অধঃদস্তন নয়। এ অর্থে এটা একটা misnomer. আমি প্রস্তাব করছি, অধঃস্তন আদালতের জায়গায় জনআদালত বা ইংরেজিতে people’s court নামকরণ করার জন্য। people’s cour-এর যারা বিচারক থাকবেন তাদেরও কর্মে, নিয়োগ, শর্ত এবং তাদের আর্থিক বাজেটগুলো সুপ্রিম কোর্টের হাতে ন্যস্ত করার প্রস্তাব করছি।

এর পরের প্রস্তাবটি হচ্ছে, সংবিধান সংশোধন বিষয়ে। এটা একটু বিস্তারিত আছে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আপনি কি এক লাইনে উল্লেখ করতে পারেন যে, সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে আপনাদের প্রস্তাবটা কি?

মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন (সদস্য, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন) : আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, সংবিধান সংশোধনের যে কোনো প্রস্তাব প্রথমে জনগণের জানার জন্য বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করতে হবে এবং কমপক্ষে ৩০ দিন সময় দিতে হবে জনগণকে সেই বিষয়ে মতামত দেওয়ার জন্য। এরপর জাতীয় নির্বাচনে কমপক্ষে ৫০ ভাগের অধিক ভোটপ্রাপ্ত দলের endorsement থাকা সাপেক্ষে সংবিধান সংশোধনের কোনো প্রস্তাব সংসদে ওঠাতে গেলে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : এটাই কী আপনার শেষ?

মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন (সদস্য, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন) : আর একটা আছে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): সংক্ষেপে সমাপ্ত করেন।

মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন (সদস্য, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন): শেষ প্রস্তাবটা হচ্ছে, অনুচ্ছেদ ১৫২। এখানে অনেকগুলো সংজ্ঞা আছে। সেখানে একটা মজাদার বিষয় আছে, রাষ্ট্র বলতে বিচার বিভাগকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। আমি এই প্রস্তাব করছি যে, রাষ্ট্র বলতে নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগের সাথে বিচার বিভাগকে অন্তর্ভূক্ত করা হোক। এই ছিল আমার প্রস্তাব। আমি লিখিতটা জমা দিয়ে যাব।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ। মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন। আমি জানি যে, আপনাকে অনেক সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। কিন্তু আপনাদের কাছে যেহেতু একটি লিখিত ভাষ্য আছে আমরা আশা করছি এটা আমাদের কাছে দিয়ে যাবেন এবং বিভিন্ন বিষয় আমরা সেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারব। এখন আমি অনুরোধ করব সম্পূর্ণা সংগঠনের প্রতিনিধি জয়া শিকদার এবং সুদীপ কুমার দাস (শাওনী)কে কিছু বলার জন্য। এখন বলবেন জয়া শিকদার।

জয়া শিকদার (সভাপতি, সম্পূর্ণা) : ধন্যবাদ, আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং এখানে এসে কথা বলার জন্য। আমি সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের ছাত্র আন্দলনের যে ভাই বোনরা গণআন্দোলন তৈরি করে এবং জুলাই এর ৫ তারিখে আমাদের যে স্বাধীনতা হলো এটাকে আমি স্বাধীনতাই মনে করি। আমি কখনও ’৭১ দেখিনি গল্প শুনেছি। ’৫২ এর ভাষা আন্দোলন দেখিনি গল্প শুনেছি, বিজয় কেমন হয় সেটাও দেখিনি কিন্তু এবারের বিজয় দেখলাম যে, বিজয় কীভাবে অর্জন করি, তাদের আত্মার প্রতি এবং যে শহিদরা রক্তের বিনিময়ে এটা অর্জন করেছি তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। সেই সাথে বৈষম্যের জন্য একটি আন্দোলন হয়েছে। আমরা এমন একটি জনগোষ্ঠী জন্ম থেকেই বৈষম্যের শিকার, বেড়ে ওঠা থেকে বৈষম্যের শিকার। আমি যে শব্দটি চছু করি। এখানে আমি যখন পরিচয় দিলাম transgender নারী। এই শব্দটা যখন বলি তখন এটাকে নিয়ে বিভিন্ন মানুষ কথাবার্তা বলে। বিভিন্ন ধরণের বিষয় আমি যখন ইউটিউব চ্যানেলে দেখি, বিভিন্ন ধরণের লেখাগুলো যখন আমি দেখি- এগুলো শুনতেও বাজে লাগে। এমন একটি সভ্য দেশে বসবাস করি- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। এখানে আমরা গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করি। এখানে সকল নাগরিকের কেন সুনাগরিক অধিকার নেই? আমি যদি নাগরিক হিসেবে সকল সুবিধাই না পাই তাহলে কী করব? পড়াশুনা পাচ্ছি না, কাজ পাচ্ছি না, ভিক্ষা আমার পেশা না তারপরও আমাকে ভিক্ষা করতে হয়। এই ভিক্ষার হাতটা কারা দিয়েছে? তথাকথিত এই সমাজ, এই রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করে, রাষ্ট্রের যারা নিয়ম কানুন তৈরি করে- তারাই তো দিয়েছে। তারা যদি সামাজিকভাবে আমাদের পরিচয়টা গ্রহণ করতো, রাষ্ট্রীয় সকল নথিপত্রে আমাদের পরিচয়কে অন্তর্ভূক্ত করে নিত, তাহলে আজকে আপনাদের চোখের সামনে আমরা ভিক্ষুক হতাম না। বরং আমাকে ভিক্ষে করতে হচ্ছে। আমার হাত আছে, পা আছে সমস্যা কোথায়? সমস্যা আমার লিঙ্গ পরিচয়ের। লিঙ্গ পরিচয়টাই যদি সমাজ গ্রহণ করতে না চায়, রাষ্ট্র গ্রহণ করতে না চায়, সমাজ, ধর্ম

যদি তকমা লাগিয়ে দেয় লিঙ্গ পরিচয়ের সাথে, তাহলে কি ভিক্ষে ছাড়া উপায় আছে? এই ভিক্ষে থেকে ফিরে আসতে হলে তাদেরকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭ এ যে কথাটি বলা আছে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার আছে"। এখানে কয়েকটি শব্দ যুক্ত করে দিতে হবে, "লিঙ্গ, ধর্ম এবং সকল মানুষকে"।

তারপর অনুচ্ছেদ ২৮। এখানে বলা আছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষবেদ বা জন্মস্থানের কারণে"। এখানও লিঙ্গ উল্লেখ করে দিতে হবে। অর্থাৎ "লিঙ্গ, ধর্ম. বর্ণ.. .." এভাবে যদি সংশোধনী নিয়ে আসেন তাহলে কিছু মানুষের উপকার হবে।

অনুচ্ছেদ ২৮ এর অনেকগুলো জায়গায় লিঙ্গ অন্তর্ভূক্ত করলে অনেক ভালো হবে। আমি আর যাচ্ছি না।

এখন আমি নাজমা আপার কথা ধরি। নাজমা আপা আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত। শ্রম আইন এবং যে শ্রম অধিকারগুলো আছে সেখানে এগুলো সংযুক্ত করতে হবে। সকল লিঙ্গের মানুষ যেন কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্র যদি কমংসংস্থানের ব্যবস্থা না কও, কর্মকান্ডের যদি কোনো সুযোগ না দেয় তাহলে কীভাবে কাজ করে খাব? সেখানেও আমাকে ভিক্ষে করতে হচ্ছে। কারণ ভিক্ষা তো আমার পেশা নয়। তাই এগুলো অন্তর্ভূক্ত করে দেওয়া। একই সাথে নাগরিক স্বায়ত্তশাসিত কোনো স্পষ্ট সাংবিধানিক গ্যারান্টি নেই। এখানে একটা বিষয় হচ্ছে, transgender নারীদের কোনো অধিকার নেই। inter sex children, অর্থাৎ যারা আন্ত লিঙ্গ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, তাদের জন্মগ্রহণের পরপরই তাদের বাবা মা তাদেরকে মেরে ফেলতে চায়। কেন মেরে ফেলতে চায়? কারণ সমাজে তাদেরকে অন্যভাবে দেখা হয়। আমি যদি ইসলাম ধর্মের কথা বলি। ইসলাম ধর্ম মানুষকে ৩টা ভাগে ভাগ করেছে। তার মধ্যে আমি যতটুকু অনলাইন বা বিভিন্ন গবেষকদের সাথে কথা বলে জেনেছি। 'খুসনায়ে মুসকিলা' এই লিঙ্গের মানুষদের শনাক্ত করতে পারে না। খুসনায়ে জানানা, খুসনায়ে আকুয়া। খুসনায়ে আকুয়া ও জানানা বলতে বুঝায় নারীরা পুরুষ হলেও মানসিক দিক দিয়ে তিনি একজন নারী। আবার পুরুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি মানসিকভাবে নারী। এটা তো এই ব্যক্তির সমস্যা না সেটা তো সৃষ্টিকর্তার রহস্য। সৃষ্টিকর্তা কেন আমাকে এই দায়ভার দিয়ে পৃথিবীতে এনেছে? আমি তো চাইনি সৃষ্টিকর্তার কাছে যে, এভাবে আমাকে পাঠিয়ে দাও। কেন পাঠিয়েছে? সে উত্তরটা সে দিতে পারবে। সে উত্তরের দায়ভারটা সমাজ, ধর্ম কেন আমাকে চাপিয়ে দেয়? সেজন্য এই জায়গাটা আপনাকে স্পষ্ট করতে হবে। এইজন্য আমার এটা বলা যে, 'শারীরিক ও স্বায়ত্তশাসন'।

এরপর হচ্ছে আইন প্রয়োগে বৈষম্য। ভোটার যোগ্যতা ও সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত নিয়মাবলি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষত transgender এবং যাদেরকে আপনারা 'হিজড়া' হিসেবে চিনেন। আমি হিজড়া শব্দটির সাথে এত ভালো পরিচিত না। কেননা হিজড়া একটি পেশা। এই পেশায় কেন এই মানুষগুলো নামে। আমি একটু আগে বললাম যে, ভিক্ষে হচ্ছে তাদের পেশা। এই ফ্যাসিবাদি সরকার অমি বলছি, যে অন্যায় করে তাকে অন্যায়কারীই বলব। তারপরও ঐ সরকারের সময় ২০১৩ সালে তারা একটি গেজেট পাস করে। সেই গেজেটে হিজড়াদেরকে 'হিজড়া লিঙ্গ' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতিতে অনেক ভুল ছিল। হিজড়াদের body politics, তারা কোন লিঙ্গের বা জন্মসূত্রে তারা কী? এই জনগোষ্ঠীর যারা আছেন তারা কেউই জন্মসূত্রে লিঙ্গ পরিচয়ের স্পষ্টতা বলতে পারে না সামাজিকভাবে। তারজন্য transgender মানুষেরা হিজড়া পেশার সাথে সংযুক্ত। হিজড়া পেশা নিয়ে তারা বেঁচে আছে। সেজন্যই আমি আপনাদেরকে বললাম যে, আমাকে যদি রাষ্ট্র সমান সুযোগ সুবিধা না দেয় , চাকরি না দেয় তাহলে তো আমাকে ভিক্ষা করতে হবে। ভিক্ষা তো আমার পেশা না। তাহলে সেই জায়গায়টি অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে যে transgender মানুষ কারা? transgenderরা কী? সেটা করে তাদেরকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। এই transgender মানুষকে সামাজিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। তাদের সুযোগ সুবিধার বিষয়গুলো সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত থাকতে থাকবে। বিভন্ন মানুষের যৌন অভিমুখী পরিচয়গুলোকে সংবিধানে স্পষ্ট করতে হবে। এই পরিচয় স্পষ্ট না থাকলে মানুষগুলো না পারবে সমাজে টিকে থাকতে, না পারবে বেঁচে থাকতে। এক পর্যায়ে সে গিয়ে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যা না করা পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িয়ে যায়। কারণ সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র যদি তাকে গ্রহণ না করে তাহলে সে কী করবে? তার তো পেট আছে, ক্ষুধা আছে, তাকে খেতে হবে। কাজেই সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রের এই বিষয়গুলো সঠিকভাবে সংস্কার করে সংবিধানে এগুলো উল্লেখ করে নিতে হবে। সেইসাথে ধর্মীয় নেতাদের সাথে বসে এ সম্পর্কিত ধর্মীয় বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করতে হবে। কারণ ধর্মীয় নেতাদের কাছ থেকে অনেক সময় অনেক রকম অপব্যাখ্যা বেড়িয়ে আসে। এই অপব্যাখ্যাগুলোর সমাধান দরকার। বাংলাদেশের মানুষ transgender মানুষকে অনৈক রকম যৌনতা দিকে নিয়ে যায়। আমি মনে করি যে, যৌনতার অধিকার থাকা দরকার। কারণ যৌনতার মাধ্যমেই আমরা পৃথিবীতে এসেছি। সেজন্য এটা আমার বলা। যৌনতা যদি না থাকত তাহলে প্রাণিকূল পৃথিবীতে থাকত না। তাহলে সেটাকে আমরা অবহেলার দৃষ্টিতে দেখবো কেন? সেই জায়গাটা স্পস্ট করে যৌনতার কারণে বা যৌন আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে মানুষকে কেন আলাদা করা হয়? একজন transgender মানুষকে প্রায় সময় বলা হয় তারা homosexual. But I am Transgender woman- আমি কোনক্রমেই homosexual না। আমার যে gender indentity, আমার sexual indentity তো কেউ প্রকাশ করতে চায় না। প্রত্যেকটা মানুষের sexual indentity তার ঘরের ব্যাপার। তার বাড়িতে সে কি করে না করে সেটা কি কেউ আমরা দেখতে যাই? বাড়ির কাজটা কি কেউ কখনও দেখি? কাজেই কেন সেটা বিভিন্ন জায়গায় লেখালেখি হবে? পত্রপত্রিকায়, ওয়াজ মাহফিল এবং ধর্মশালায় এগুলো কেন উল্লেখ হবে? সেই জায়গা থেকে

সংবিধানে এগুলো স্পষ্ট থাকা দরকার।

আমি আর কথা বাড়াতে চাই না। আমি আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব আমার যে দাবিগুলো ছিল সেগুলো যদি আপনারা সংবিধানে সংযুক্ত করতে পারেন, তাহলে আপনাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

ধন্যবাদ, আপনাদেরকে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ জয়া শিকদার আপনার বক্তব্যের জন্য।

হ্যাঁ আপনি ১০ মিনিটের কম সময় নিয়েছেন সেজন্য অতিরিক্ত একটি ধন্যবাদ আপনি প্রাপ্য।

এখন বক্তব্য রাখার জন্য আনুরোধ করব মিসেস নাদিরা পারভীন, নাগরিক উদ্যোগ।

মিসেস নাদিরা পারভীন (নাগরিক উদ্যোগ): ধন্যবাদ, স্যার আপনাকে। সাথে সাথে নাগরিক উদ্যোগ পরিবারের পক্ষ থেকে শুভকামনা, অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংবিধান সংস্কার কমিশনের অন্যান্য সম্মানিত সদস্যগণকে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রের যে সকল প্রতিনিধি রয়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জনাচ্ছি। আমরা জানি যে, sixteen days activism চলছে- ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এবং ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবসে এই পক্ষটা শেষ হবে। সেই পক্ষেরও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি।

প্রথমই বলতে চাই যে, অন্তবর্তীকালীন সরকারের অভ্যুত্থানের পরপরই ১০টি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। আমরা মনে করি, যতগুলোর সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে এরমধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কমিশন। আমরা বিশ্বাসও করি যে, রাষ্ট্র সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংবিধান সংস্কার। সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। তাই সংবিধানের সঠিক সংস্কারের মাধ্যমেই আসলে একটা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সরকার এবং সেই সরকার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আসলে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সংবিধানে আমরা ১০টি এরিয়া চিহ্নিত করেছি যেখানে সংবিধান সংস্কার করা প্রয়োজন। আমার সাথে আমার সহকর্মী রয়েছেন। আমি ৫টি উল্লেখ করছি এবং তিনি ৫টি আপনাদের সাথে শেয়ার করবেন।

প্রথমটি হচ্ছে, সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর ভিত্তি কেন্দ্রিক যে সংস্কারগুলো সেখানে প্রস্তাবনায় এনেছি যে, "১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই হোক সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর ভিত্তি"। এর অর্থ আপনারা নতুন করে সংবিধানের যে সংস্কার করবেন তার মূলভিত্তি যেন এটাই থাকে। নীতি বলি আর মতাদর্শ বলি সেখানে এটাই যেন থাকে এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত করা।

আমরা মনে করি যে, জনগণের ইচ্ছাকে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিশ্চিত করতে হবে, effective and true sense-এ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের ভোটাধিকার প্রদান হলো গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সুরক্ষা কমিশনগুলোর স্বাধীনতা থাকতে হবে। স্বাধীনতা বলতে বুঝিয়েছি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আর্থিক সক্ষমতাকে নিশ্চিত করা।

আমার আর একটি পয়েন্ট হচ্ছে, আইন প্রণয়ন, বিচার ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। আমদের আশা যে, আমরা এগুলোর একটা প্রতিফলন সংবিধান সংস্কারের মাধ্যমে দেখতে পাব।

এছাড়া আমরা প্রথমেই সংবিধানে বাংলাদেশের নামের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, বাংলাদেশের নাম হচ্ছে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। এর পরিবর্তে আমাদের একান্তই মতবাদ যে, 'জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ' রাখার প্রস্তাব করছি। এটা বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছি। এটা আমাদের নিজস্ব মতামত।

নির্বাচন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও আমরা কিছু প্রস্তাব এনেছি। প্রথমেই বলব, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে আবার অন্তর্ভূক্ত করতে হবে বা এটা অন্তর্ভূক্ত করা। এটা আমাদের একটি জোরালো দাবি। একব্যক্তি সর্বোচ্চ ২ বার প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন। এ বিধানটি সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা প্রস্তাব করছি। রাজা বাবুও বলে গেছেন যে, সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা। এটা খুবই দরকার। কারণ SDG তেও আমরা বলি, "No one living behind". এখানে যদি minority, social excluded community, জয়া দি আসলে বললেন, এদের শতকরা ভাগ তাদের অনুপাতেই সংবিধানের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে নারীদের জন্য প্রত্যক্ষ এবং একইসাথে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়া পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী দলিত, আদিবাসী, উর্দু ভাষাভাষি জনগণ এবং transgender এই ধরনের জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সংরক্ষিত আসন রাখতে হবে জাতীয় সংসদে। এটার জন্য সামাজিক অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তিটাও সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করাসহ এটার একটা ধারাবাহিক বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াও থাকতে হবে। দ্বৈত নাগরিকের ক্ষেত্রে সকল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিধানটাকে পুরোপুরি restricted রাখা বা নিষিদ্ধ করা পক্ষে। বিদেশে অবস্থানকারী

প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের ভোট প্রয়োগ করার অধিকারের সুযোগটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিবেচনায় রাখা। সবচেয়ে বেশি যেটা আলোচনা হয়েছিল এবং এ বিষয়ে সবাই একমতও হয়েছিলাম যে, কীভাবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করা যায় এবং তাদের roles and responsibilities-এর মধ্যে যেন একটা ভারসাম্য থাকে।

আমাদের আর একটা প্রস্তাব হচ্ছে যে, যারা সংসদ-সদস্য হবেন তারা আইন ও নীতি প্রণয়ন করবেন। কিন্তু স্থানীয় উন্নয়নে যে, অতিমাত্রার অংশগ্রহণ এটা বন্ধ করতে হবে। তাহলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি যারা আছেন তাদের অংশগ্রহণদ, গুরুত্ব ও সিদ্ধান্তটাকে স্থানীয় পর্যায়ে আরও জোড়ালো করা যাবে। আর বর্তমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০কে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব আমরা রাখছি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কী হতে পারে সেটা আপনাদের বিবেচনার জন্য আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার জন্য, সমন্বিত আইন প্রণয়ন এবং স্থানীয় সরকারের কর্মকাণ্ডে সংসদ-সদস্যের হস্তক্ষেপের বাইওে রাখার জন্য আমরা প্রস্তাব করছি।

সবশেষে একটা কথা বলে আমি আমার সহকর্মীকে আহ্বান জানাব সেটা হচ্ছে যে, আমরা এই কদিন ধরেই মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ইউএনডিপি, ইউএনওমেন, because beijing 30 is approaching near. একটা বিষয় কথা খুব হয়েছে যে, নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার ও সমমর্যাদা। এক্ষেত্রে সংবিধানে তো বলাই আছে যে, "সকল নাগরিক সমান অধিকার ও সমান আইনের সুযোগ পাবে"। যদি CEDAW দুই নাম্বার কলামের reservationটা তুলে দেওয়া যায় এবং যখনই এই equal term হয়ে যাবে, সম্পত্তির অধিকার হয়ে যাবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন করতে হলে নারীকে অর্থনৈতিক কাজের সাথেও সম্পৃক্ত করতে হবে। সেক্ষেত্রে ঋ পাওয়ার ক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত শর্তারোপ করা হয়, collateral দিতে হবে, দুইজনের সাইন করতে হবে, এতে অনেক বিজনেসে তো কেউ রাজিই হয় না। সেক্ষেত্রে স্বামী বা ভাই কোথা থেকে ম্যানেজ করবে। তাহলে এই বিষয়টা আইনে atleast equal term থাকলো।

জনাব সুলতান মোঃ সালাউদ্দিন সিদ্দিক (নাগরিক উদ্যোগ): ধন্যবাদ সবাইকে । আমরা অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি তাই to the point-এ শেষ করব। আমরা মৌলিক অধিকারের বিষয়ে একটি সুপারিশ রাখতে চাই সেটা হচ্ছে, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসা, শিক্ষা, খাদ্যপ্রাপ্তি এসকল অধিকারসমূহেরক সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। বিচার ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের যে সুপারিশ সেটি হচ্ছে, বিচারপতিদের নিয়োগের জন্য যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা এবং বিচার বিভাগের আওতায় পৃথক একটি সচিবালয় প্রতিষ্ঠার বিধান রাখা। একই সাথে বিচারবিভাগকে রাজনীতিমুক্ত করতে সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান করা জন্য সংবিধানে একটি সুরক্ষার বিধান তৈরি করা। অথনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের যে সুপারিশগুলো এসেছে সে সুপারিশগুলো হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনসংস্কার ও যুগোপযোগী সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারি যে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলোর বিকাশে যথাপযুক্ত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা এবং সেই সংশ্লিষ্ট একটি বিধান সংবিধানে যুক্ত করা এবং আর্থিকভাবে দরিদ্রদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি সংবিধানে যুক্ত করা। ধর্মনিরপেক্ষা, ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা এই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের একটা সুপারিশ আছে। সেটি হচ্ছে, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে বিশেষভাবে রাজনৈতিক মর্যাদা প্রদান না করা। ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার বন্ধ করা। যেহেতু বাংলাদেশ একটি বৈচিত্রময় দেশে এবং এদেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং বিশ্বাসের মানুষ বাস করে। তাই আমরা মনে করি, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম যেটি রাখা হয়েছে সেটি আসলে ঠিক না। এছাড়া রাষ্ট্রের আসলে নিজস্ব কোনো ধর্ম থাকতে পারে না । তাই বিষয়টি এমন হওয়া উচিত যে, সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র কাজ করবে। এ ধরণের একটি বিধান সংবিধানে রাখা। আমরা সংবিধানিক কমিশন নিয়ে একটি সুপারিশ রাখতে চাই সেটি হচ্ছে, একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তার সুরক্ষার জন্য বর্তমানে যে কমিশন আছে দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য অধিকার কমিশন এই কমিশনগুলোকে স্বাধীন সাংবিধানিক কমিশন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। এর পাশাপাশি আমরা আরও ৩টি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করছি। নারী ও শিশু কমিশন, আদিবাসী ও দলিত কমিশন এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু কমিশন। যেহেতু নাগরিক উদ্যোগ আদিবাসী ও পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীদের নিয়ে প্রায় দুই দশকের মতো সময় ধরে কাজ করছে তাই এই সুনির্দিষ্ট এরিয়াতে আমাদের কিছু প্রস্তাবনা আছে। সেগুলো হচ্ছে, আদিবাসী, জুম্ম জাতি এবং দলিতদের সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদান এবং এটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা। অর্থাৎ তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা। আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ভাষা, রীতি, প্রথা ও ঐতিহ্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, ঐতিহাসিক নিদর্শন ইত্যাদি সংরক্ষণ করা এবং উন্নয়ন তথা বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করার জন্য একটি বিধান সংবিধানে সংযুক্ত করা। সমষ্টিগত মালিকানা প্রথাগত, আইনভিত্তিক আদিবাসীদের যে সমষ্টিগত মালিকানার বিষয় আছে এটির সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এমন আইন প্রণয়নে সমতল অঞ্চলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহের সহিত নির্ধারিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে আইন যেন প্রণয়ন করা হয় সেই সংশ্লিষ্ট একটি বিধান রাখা। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে মেহেনতি মানুষ অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক এবং জনগণের মধ্যে যে পিছিয়ে পরা অংশ আছে এবং আদিবাসী ও দলিত এসকল জাতিগোষ্ঠীকে সকল প্রকার শোষণের হাত থেকে মুক্ত করা এই ধরণের একটি

অঙ্গিকার সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করার দাবি জানাচ্ছি। এছাড়া দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য রাষ্ট্রীয় পাঠ্যসূচিতে দেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতির যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোর একটি বিধান আমরা সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করার দাবি জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ সবাইকে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান)ঃ ধন্যবাদ। আমরা এখন শুনব দলিত নারী ফোরামের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে।

তামান্না সিং বারাইক (প্রজেক্ট অফিসার, দলিত নারী ফোরাম)ঃ ধন্যবাদ, আয়োজকবৃন্দ এবং এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সকলকে। আমি তামান্না সিং বারাইক। আমি চা বাগানের মেয়ে। দলিত এবং চা জনগোষ্ঠী নিয়েই আমি কাজ করছি। আপনারা জানেন যে, বাংলাদেশে চা জনগোষ্ঠী যারা আছেন প্রায় ২০০ বছর হচ্ছে এখানে আমরা migrated. ভারতের ঝাড়খন্ড, উত্তর প্রদেশসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। আসামে migrate করে সিলেট এবং চট্টগ্রামে আমাদের চা শ্রমিকের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। আপনারা জানেন প্রায় বৃটিশ আমল থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় ১০ লক্ষ চা জনগোষ্ঠী নিয়োজিত আছে। Overall যদি দলিত জনগোষ্ঠী বলি আমরা প্রায় ৭৫ লক্ষের মতো দলিত সম্প্রদায়ের বসবাস। চা জনগোষ্ঠী প্রায় সিলেটসহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলেই আছে। এরা বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার। শুধু যে স্বীকৃতি তা কিন্তু না। বিভিন্ন মৌলিক অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার, মানবাধিকার বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং চা জনগোষ্ঠী স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার পাচ্ছে না। আমরা বলতে পারি না যে, আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা বলি যে, আমরা শ্রমিক, শ্রমিক নিয়ে আসা হয়েছে, দাসত্বের মধ্যে আছি। আমাদের দিনে চা পাতা তুলতে হবে। চা পাতা তুলে যে টাকা পাব ১৭০/১৮০ টাকা যেটা এখন মজুরী দিচ্ছে বর্তমানে সেটাই আমাদের জীবন। বাংলাদেশে এত বছর ধরে আমরা শ্রম দিচ্ছি। এখনও আমরা সুনাগরিক হিসেবে বিভিন্ন ধরণের যে অধিকার পাওয়ার কথা, বাংলাদেশে স্বীকৃতি পাওয়ার কথা সেটা আমারা পায়নি। বাংলা সংবিধান শব্দটি সম্পর্কে জানেন না। মৌলিক অধিকার কি সে সম্পর্কে জানেন না। মানবাধিকার কি সে সম্পর্কে জানেন না, ভোটাধিকার কি সে সম্পর্কে জানেন না। এছাড়া শিক্ষা যে বাধ্যতামূলক। যে শিক্ষিত হতে হবে, শিক্ষিত হয়ে সমাজে কাজ করতে হবে, দেশের জন্য কাজ করতে হবে সেটাও আমাদের জনগোষ্ঠীর ভিতরে এখনও তৈরি হয়নি। আমি বলব যে, শুধু চা জনগোষ্ঠী না বাংলাদেশে যারা দলিত, যারা জন্ম ও পেশাগত কারণে পিছিয়ে আছে, যাদের স্বীকৃতি নেই তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া। দলিত চা জনগোষ্ঠী যারা আছেন তাদের সাংবিধানিক একটা স্বীকৃতি দেওয়া সমান মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা। এটা হচ্ছে আমার প্রস্তাবনা এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ না করা। তাদেরকে তাদের কাজ দিয়ে যেন বিচার করা না হয়। যেমন দলিতরা বিভিন্ন পরিচ্ছন্নতা কাজের নিয়োজিত আছেন। ড্রেন পরিষ্কার করেন, ময়লা পরিষ্কার করেন। সারা বাংলাদেশকেই আমাদের জনগোষ্ঠীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখছে এবং শিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি বড় ভূমিকা রাখছে। আমি মনে করব, তাদের প্রতি যাতে কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ না থাকে সেটা সংবিধানে উল্লেখ করতে হবে। তাদের মৌলিক অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আপনারা জানেন, এক কেজি চালের দাম বর্তমানে ৭৫ টাকা, সেখানে একজন শ্রমিকের মজুরী মাত্র ১৭৮ টাকা। তাও যদি কোনো কারণে সে কাজ করতে না পারে তাহলে সে দিনে সে হাজিরা পাবে না, সে টাকাও পাবে না। সেজন্য তারা যাতে তাদের নূন্যতম মজুরীটুকু পায় এবং তারা যাতে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এত কিছু লাগবে না তারা যাতে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে সে অধিকারটুকু নিশ্চিত করতে হবে। তাদের প্রতি যে সহিংসতা হয় তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। অঅপনারা দেখেন, আপনারা শুনেছেন যে, রবি দাস কমিউনিটির একটি ছেলে কিছু দিন আগেই মারা গেছে। তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। চা বাগানে অনেক সহিংসতা হয়। পুরো দলিত কমিউনিটিতে বিভিন্ন কারণে নির্যাতনের শিকার হয়। তাদের জমি বা অন্যান্য যে বিষয় এবং রাজনৈতিক কারণেও দলিতরা বেশি নির্যাতনের শিকার হয়। তাদের ভূমি নিয়ে মারামারি, তাদেরকে ছোট জাত বলে গালিগালাজ দেওয়া এই বিষয়গুলো যাতে না হয় এবং তারা যাতে থানায় অভিযোগ করতে পাওে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সেইটুকু অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া। আপনারা জানেন, ২০১৩ সালে anti discrimination act আইনটি পাসের জন্য সুশীল সমাজ, নাগরিক উদ্যোগ, অন্যান্য অনেক সংগঠন, ল' কমিশন সকলেই আইনটি নিয়ে কাজ করছে প্রায় অনেক বছর ধরে এবং আমরা আন্দোলনও করছি এই আইনটি যাতে পাস হয়। আমরা চাচ্ছি, এই আইনটির বিষয়ে যাতে সংবিধানে লেখা হয়। আপনারা জানেন, নেপালের সংবিধানে দলিতদের নিয়ে খুব সুন্দরভাবে লেখা আছে যাতে দলিতরা বৈষম্যের শিকার হতে না পারে। সেখানে আইনের বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, অফিস আদালতে কোথাও যাতে এই জনগোষ্ঠী কোনো কারণে বৈষম্যের শিকার না হয়। আমরাও চাই, আমাদের সংবিধানে আমাদের জনগোষ্ঠীগুলোকে স্পষ্টভাবে লিখে দিতে হবে যে, তারা যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা কোনো কারণে কোনো বৈষম্যের শিকার না হয়। আইনটি যাতে দ্রুত পাস হয় সে ব্যবস্থা করার অনুরোধ করব। আরেকটি বিষয় আমি বলব, শিক্ষা ও চাকুরিতে তাদের অভিগম্যতা সৃষ্টি করা। একটা জাতিকে যদি বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ শিক্ষার দিক দিয়ে পিছনে রাখা হয়, তারা তাদের ভাষা ও অধিকার তারা বলতে পারবে না। আমাদের

জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। তাকে যদি আপনি শিক্ষিত না করেন, তাদের নিজের ভাষা এবং বাংলা ভাষায় চর্চা না করতে পারে, তাহলে সে তার অধিকারগুলো কীভাবে বলবে? এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখা। যারা স্কুলে পড়াচ্ছেন, শিক্ষকরা আমাদের ছেলেমেয়েদের সাথে সুন্দরভাবে আচরণ করা। তাদের সাথে খারাপভাবে আচরণ না করা। না হয় ছোট থাকতেই কিন্তু বাচ্চাদের স্মৃতিতে ঢুকে যায় যে, আমি পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠী, আমি বৈষম্যের শিকার, আমি নির্যাতিত, আমি এই কমিউনিটির। সে নিজেকে মানুষ হিসেবে বলতেই পারে না যে, আমি একজন নাগরিক, আমি একজন মানুষ। ঐ জিনিসগুলো খেয়াল রাখা। ভূমিতে অধিকার নিশ্চিত করা, নাগরিক অধিকার এবং ভোটাধিকার নিশ্চিত করা, শ্রম আইন, মানবাধিকার, সংবিধান এগুলো চর্চা করার অধিকার দেওয়া। আমাদের চা জনগোষ্ঠী ও দলিতদের মধ্যে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীও আছে। এছাড়া অন্যান্য জনগোষ্ঠীও কিন্তু আমাদের ঐ গোষ্ঠীর ভিতরেই আছে। সেই জনগোষ্ঠীগুলোকে সুযোগ সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা। আমাদের নিয়ে সুশীল সমাজ কথা বলবে। সবাই আমাদের নিয়ে কথা বলবে। এখানে স্যার দেবাশীষ রায় আমাদের নিয়ে কথা বলেছেন। এছাড়া, নাজমা আপাসহ আরও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সবাই আমাদের নিয়ে কথা বলেছেন। এটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে।

আর একটি বিষয় হলো, federal government. আপনারা জানেন যে, নেপালে federal government আছে। বাংলাদেশে যদি ঐরকম federal government-এর ব্যবস্থাটা আসে যেমন সিলেটের মানুষ যেমন সিলেটেই থাকে, শান্তিতে থাকে, ঢাকায় যাতে তাদের আসতে না হয় এইরকম একটা ব্যবস্থা তৈরি করলে ভালো হবে। কারণ তখন দেখা যাবে যে, সিলেটের মানুষ নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবে। তাদেরকে আর ঢাকায় আসতে হবে না। তারা তাদের অধিকার এবং মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।

আমার সহকর্মী পূজা রানী কিছু কথা বলবে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): জি বলুন।

পূজা রানী (দলিত নারী ফোরাম): ধন্যবাদ, তামান্না দিদিকে। আমি বলতে চাই, সংবিধানে এমন ভাষাটাই লিখতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে। কিছুক্ষণ আগে একজন দাদা বলেছেন যে, কিছু সাধু এবং কিছু চলিত ভাষা। মাঝে মধ্যে দেখা যায় আমরা যারা পড়াশুনা জানি, আমরাও একটু দ্বিধাগস্ত হই। আর সাধারণ মানুষ তো আরও বুঝতে পারে না। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ ছিল পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও আমরা শোষণমুক্ত হয়নি। তার মধ্যে আমরা দলিতরা আরও পিছিয়ে। আমাদের কথা সংবিধানে বলা নেই। এছাড়া নারীদের একটা বড় অংশ পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত। রাত ১২টা থেকে ২টার মধ্যে অর্থাৎ গভীর রাতে বের হয়ে রাস্তায় কাজ করতে হয়। এটা বিশেষ করে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের অধীনে। আমি বলতে চাই, এই রাতের কাজটা নারীদের জন্য বন্ধ করতে হবে। কারণ নারীদের কোনো নিরাপত্তা নেই। ধরেণ ১০ জন নারীকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাবে রাত ১২-১টায় উত্তরে। সেখানে ৪০ জন নারীকে নেতৃত্ব দেয় একজন পুরুষ। সে পুরুষের কাছ থেকেও তারা ধর্ষণের শিকার হয়। ধর্ষণের শিকার শুধু শারীরিকভাবে হয়না, মানসিক, ভাষাগত এইসব দিক থেকেও হয়। তখন সে নারীরা কাদেরকে বলবে? তখন তো সে গিয়ে কোনো পুরুষকে বলতে পারবে না। যদি তার স্বামী এটা জানে, তাহলে তাকে কাজে বের হতে দিবে না। তাই এইদিকে একটু নজর দিলে আমাদের নারীরা এটা থেকে নিরাপদ হবে এবং আমরা চাই, সিটি কর্পোরেশনের রাতের কাজগুলো বন্ধ করতে হবে। যেখানে নেতৃত্ব পুরুষ দিচ্ছে সেখানে নারী প্রতিনিধির একটি ব্যবস্থাপনা দরকার। আর একটু বলব, নারী ও কিশোরীদের নিয়ে। আমি যেহেতু দলিতদের নিয়ে কাজ করি তখন দেখি আমাদের কিশোর কিশোরীদের যৌন প্রজননের বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া হয় স্কুলে ক্লাস সেভেনে। একটা বই আছে সেখানে শিক্ষকও আমাদের এ বিষয়ে খোলাখুরিভাবে সেটা বলে না। বলে যে, এটা বাসা থেকে পড়ে আসবে। কিন্তু এই বিষয়টা এত গুরুত্বপূর্ণ যে, এটা না জানলে সামনে আমাদের অনেক স্বাস্থ্য ঝুঁকি হতে পারে। তার সাথে আমি যোগ করব, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। আমাদের নারীরা প্রতিবছর অনেক মারা যাচ্ছে। কারণ তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিষয়ে জানেন না। এছাড়া স্বাস্থ্যকর্মী যারা আছে তারাও সঠিক তথ্য দেয়ে না। এটার সুবিধা, অসুবিধাসমূহ না জানিয়ে ব্যবহার করতে বলে। এইসব ক্ষেত্রগুলো সংবিধানে এসে গেলে আমাদের নারী এবং কিশোরীরা শিখবে এবং তাদের নিজেদের স্বাস্থ্য এবং মৃত্যু ঝুঁকিটা কমবে। আমি ভূমি অধিকারের বিষয়ে একটু বলতে চাই। আমরা দলিত এবং হরিজন যারা আছি তাদের সংখ্যা বাংলাদেশে প্রায় ৬৫ লক্ষ। আমরা প্রত্যেক জেলাতে আছি। আমাদের বাপ দাদারা কাজ করত। মাথায় ময়লা নিয়ে গিয়ে ফেলে আসতো। এখন কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে ডিজিটালেও পড়াশুনা করছি। আমাদের এই দলিতদের মধ্যেও কিন্তু অনার্স গ্রাজুয়েটও আছে। কিন্তু আমরা যখন কর্মক্ষেত্রে যাই তখন দেখা যায় আমরা লিখিততে টিকলাম, ভাইবাতেও টিকলাম। কিন্তু আমাদের দলিত নাম দেখে নেওয়া হয় না। এছাড়া আমাদের কাছে তো সেই মোটা অংকের টাকা নেই যা দিয়ে আমরা সেই পর্যন্ত যেতে পারি। আমরা সেই ৪০০ বছর ধরে এই ভূমিতে আছি। ইডেন ভবনেও আমাদের কিছু সংখ্যা ছিল। ইডেন ভবন ও আজিমপুর যখন উন্নত হয়, তখন আমাদেরকে অবৈধভাবে উচ্ছেদ করে আরেকটা জায়গা দেয়। এমন

জায়গা দেওয়া হয়েছে যে, সেখানে থাকার মতো পরিবেশ থাকে না। যখন সেই জায়গা থাকার মতো হয় তখন আবার আমাদের উচ্ছেদ করে। আমাদেরকে বেশিরভাগ এই উচ্ছেদ করে সিটি কর্পোরেশন ও রেল মন্ত্রণালয়। আমরা চাই, এই জনগোষ্ঠীকে স্থায়ী ভূমি দেওয়া হোক। গত জুন মাসের ১০ তারিখে আমরা ভূমি উচ্ছেদ হয়েছিলাম। আমরা তখন কার কাছে যাব? তখন সংসদে আমাদের পক্ষে বলার মতো কেউ নেই। আমাদের মিরনজিল্লা সিটি কলোনি। ইতোমধ্যে বিভিন্ন মিডিয়ায় আপনারা দেখেছেন। তখন আমরা না পেরে সেই ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে বুলডোজারের সামনে শুয়ে ছিলাম। সংসদে দুইবার এই বিষয়ে কথা বলার পরেও সাবেক সরকারে যারা ছিল তারা সেই জায়গায় একবার গিয়েও দেখেনি। আমাদের থাকার ঘর যদি আপনারা দেখেন দেখবেন যে, ৬-৭ বাই। এই রকম ঘরে আমরা তিন পরিবার বসবাস করি। টিনশেড কলোনি। সরকার কয়েকটা জায়গায় বিল্ডিং করে বলে যে, এদের জন্য বরাদ্দ। কিন্তু যখন দিতে যায় তখন সিটি কর্পোরেশন বলে যারা সরকারি চাকরি করে তাদের। আমার ঘর জুন মাসের ১০ তারিখে ভাঙছে। কিন্তু আমাকে তো জিজ্ঞেস করেনি যে, তুমি চাকরি করো কী না? আমি তো এই দেশের নাগরিক। ভোট দেই সরকারকে। কিন্তু আমাকে যখন ঘর দিবে তখন চাকরি আছে কী না? তাই আমার দুঃখ, আমার কথা যতটুকু আমি বলতে পারব অন্য কেউ তো বলতে পারবে না। তাই আপনারা এখানে সংবিধানর কিছুটা পরিবর্তন করছেন এই জনগোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধি থাকলে আমার পক্ষে কথা বলার প্রতিনিধি থাকবে। আমি সংসদের একজনকে বলতে গেলে তার কিন্তু পকেট গরম করতে হয়। বাংলাদেশের এই যে অবস্থা। সেই রকম পকেট গরম করতে গেলে আমার কিন্তু টাকা নেই। তাই বিশেষ অনুরোধ আমাদের এই জনগোষ্ঠীদের একটু আসন দেন। আমরা নিজের কষ্টগুলো বলি এবং কাজ , খাদ্য, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা এগুলো কিন্তু মৌলিক অধিকার। কিন্তু আমরা এটাই পাই না। চিকিৎসা, আমি যদি মেডিকেল যাই একটা রোগীকে নিয়ে সেখানে গিয়ে এটা করতে সেটা করতে আইসিইউতে আমরা জায়গা পাইনা। আমাদের পাশে মিটফোর্ট, বিশেষ করে যখন একটা রোগীকে নিয়ে যাই তখন সেখানে কারখানা আছে, সেই বড় বড় বাসস্ট্যান্ড সাধারণ মানুষ ওখানে যেতে যেতেই সেখানে মারা যায়। বিভিন্ন বিভাগ থেকে রোগী নিয়ে আসতে আসতে তাদের মৃত্যু হয়। সেদিকে একটু নজর রেখে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও যদি একটু সুব্যবস্থা করা হলে ভালো।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমি আপনাকে সময়ের দিকে একটু মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

পূজা রানী (দলিত নারী ফোরাম): সর্বশেষে আমি এটাই বলব, সংসদে দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি রাখতে একটি প্রস্তাব আমরা দিচ্ছি। কারণ আমরা অনেক পিছিয়ে। আরেকটা কথা যেটি কয়েকজন বলেছেন। বলা হয়, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। আমরা সংখ্যালঘুরা সবদিক দিয়েই পিছিয়ে। একটা ধর্ম যদি থাকে তাহলে আমরা আবারও হুমকির শিকার হব। তাই কোনো ধর্মকে ইঙ্গিত না করে সবার ক্ষেত্রে যেন হয় সেদিকেই আপনারা একটু নজর দিবেন।

ধন্যবাদ, সবাইকে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

মিসেস নাজমা আক্তার: স্যার, ১ মিনিট। আমি পূজার সাথে একটু যোগ করতে চাচ্ছিলাম। আসলে ধর্মের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো শ্রেণিবিন্যাসটা। এই জায়গায় ক্লাস, কাস্ট এগুলো বোধ হয় বেশি সমস্যা। এইখানটা আমার মনে হয় দেখা দরকার। কারণ পরিচ্ছন্ন কর্মীর সাথে আমাদের অনেক কাজ হয়। একটা মানুষ মারা গেলে তার ক্ষতিপূরণ ৫০০০ টাকা। তাকে পোড়ার জন্য দেওয়া হয়। কিন্তু সে যে এত বছর কাজ করছে তার চাকরির সুবিধা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বীমা পলিসি এই জিনিসগুলো বিবেচনায় নিতে হবে। বিষয়গুলো আমি লিখে দিব। তারপওে একটু বললাম।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, নাজমা আক্তার। আপনার বক্তব্য লিখিতভাবে প্রদান করলে আমাদের রেকর্ডের মধ্যে থাকবে। আমি জানি অনেকেরই সময়ের দিকে নজর ৫টা বেজে যাওয়ার করণে। নিউজপেপার এসোসিয়েমনের আক্তার হোসেন খান বলেছিলেন যে, লিখিতটা দিবেন কিন্তু আপনি পড়তে চাচ্ছেন রেকর্ডের জন্য। আপনি যদি দ্রুত লিখিতটা পড়ুন।

জনাব আখতার হোসেন খান (নিউজ পেপার ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব): ধন্যবাদ, কমিশন প্রধান, অন্যান্য সদস্যগণ এবং সুধীমণ্ডলী। আমি সংক্ষেপে পড়ছি। অন্যান্যরা বলেও গেছেন। আমরা সভা সম্পন্ন করতে পারিনি। নোয়াব সভাপতির কিছু পয়েন্টস।

১. রাষ্ট্রপতির ন্যায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালও ২ মেয়োদের হবে। তবে প্রতিটি মেয়াদ বর্তমান ৫ বছরের স্থলে চার বছরের হবে। একইভাবে সংসদের মেয়াদও হবে ৪ বছরের।

২. দুটি সংসদ নির্বাচনের মধ্যে ৩ মাসের মেয়াদ সম্পন্ন তত্ত্বধায়ক সরকার থাকবে;

৩. এখন সময় হয়েছে বাংলাদেশে একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠনের। কমিশন বিষয়টি নিয়ে সুপারিশ রাখতে পারে;

৪. সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০০ মোতাবেক সুপ্রিম কোর্টকে প্রয়োজন বোধে দেশের বিভিন্ন স্থানে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন আয়োজন করতে হবে যাতে জনদুর্ভোগ লাঘব হয়;

৫. উপজেলা প্রশাসনকে গতিশীল ও ক্ষমতাসম্পন্ন করার জন্য তাদেরকে সংসদ-সদস্যদের সর্বপ্রকার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে;

৬. সংসদ-সদস্যদের মূল কাজ হবে আইন প্রণয়ন। তারা কোনোভাবেই উপজেলা প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করতে পরবেন না;

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমার সহকর্মীদের হয়তো ছোট ছোট প্রশ্ন থাকবে ব্যাখ্যার জন্য। এজন্য আমি শুরুতে সামান্য ব্যাখ্যা হিসেবে জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের কাছে একটি বিষয় জানতে চাই। যদিও আমি অনুমান করছি তাদের তো একটি ব্যাখ্যা লিখিততে থাকবে। কিন্তু আমি শোনার ক্ষেত্রে সঠিক শুনলাম কী না যে, তাদের একটি বক্তব্য এসেছি সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে নির্বাচনে কমপক্ষে ৫০% এর অধিক ভোটপ্রাপ্ত দল এরকম? বিষয়টা আমি উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, বাংলাদেশের গত নির্বাচনগুলোতে এমন কি বৈধভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনেও কোনো দল ৫০%এর অধিক এর অধিক ভোট পায়নি। সেটাকে বিবেচনায় রেখে আপনারা এই প্রস্তাবটা দিয়েছেন কীনা আমি তা বুঝতে চাচ্ছি?

জনাব মাসরুর সালেকীন (বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন): আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে যে, এই রকম দল বা দল সমষ্টি বা স্বতন্ত্র প্রার্থী সব মিলিয়ে ৫০% অধিক হতে হবে। সেটা একটা দল হতে হবে এমন না। ৫০% এর অধিক যদি ভোট থাকে কারো বা কোনো গোষ্ঠীর বা কোনো দলের, যদি দলের না থাকে তাহলে জোট করে আনতে পারে ৫০% এর অধিক ভোট তাহলে কেবল তারা সংশোধনীর প্রস্তাবটা উপস্থাপন করতে পারবে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): এছাড়াও সংসদে উত্থাপনের পর সেটার বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে?

জনাব মাসরুর সালেকীন (বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন) বিজ্ঞপ্তিটি আগেই দিতে হবে। যেহেতু ৫০% এর অধিক থাকার পর। যদি এটা সংগ্রহ করতে পারে কোনো রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী, জোট তারপরে তারা সেটাকে প্রথমে উপস্থাপন করবে জনগণের কাছে। ৩০ দিনের মতো সময় থাকবে। জনগণ এটা দেখবে, পড়বে ও মতামত দিবে। ৩০ দিন পর তারা সেটা উপস্থাপন করতে পারবে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমার দ্বিতীয় সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের কাছে। আপনারা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের কথা বলছেন। আপনারা নিম্নকক্ষের ক্ষেত্রেও কি সংখ্যানুপাতিক বলছেন নাকি শুধুমাত্র উচ্চ কক্ষের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংখ্যানুপাতিকের কথা বলছেন।

কাজী মারুফুল ইসলাম (বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক) : স্যার, আমরা নিম্নকক্ষের ক্ষেত্রে সংখ্যানুপাতিক বলছি না। উচ্চকক্ষের কথা বলছি। তবে এটা সংখ্যানুপাতিক হতে পারে। এটা হচ্ছে প্রথম প্রস্তাব। কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে, যদি হয় যে আমরা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন সভায় যাচ্ছি না তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা পুরো নিম্নকক্ষের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, ব্যাখ্যাটির জন্য।

জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ (কমিশন সদস্য): প্রাসঙ্গিকভাবে আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন, আপনি জুডিশিয়াল সার্ভিসের দিক থেকে বেশকিছু কথা বলেছেন। সেখানে একটা স্থায়ী এটর্নী সার্ভিসের কথা বলেছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, একটা পেশাদরিত্ব এটর্নী সার্ভিস যেটা সরকারকে সার্ভিস দিবে। তাই কী না? তাই যদি হয় তাহলে এতে নাগরিকদের কী লাভ? অর্থাৎ এতে নাগরিক অধিকার কীভাবে রক্ষা পাবে? আরেকটা পেশা তৈরি করা যেটা আমাদের প্রশাসন ক্যাডারের মতো হবে। এখান থেকে নাগরিক অধিকার রক্ষায় আলাদা কী যুক্ত হবে বলে আপনার মনে হয়?

জনকাব মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন (বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন): সরকার তো আসলে নাগরিক। সরকারকে তো আমরা নাগরিকের বাইরে ফেলতে পারি না। অর্থাৎ নাগরিকদের প্রতিনিধিরাই তো সরকার করেন, সে অর্থে তারা যে সেবাটি দিবেন, সেটা আসলে জনসেবাই।

মোঃ জুনাইদ (বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন): আর একটা বিষয় আছে, আমরা যারা বিচারক হিসেবে কোর্টে কাজ করি বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে, রাজনৈতিক নিয়োগের কারণে পপি, জিপি বা হাইকোর্টের এটর্নী জেনারেল বা ডেপুটি এটর্নী জেনারেল সরকারের পক্ষেই কাজ করে এবং আমাদের বিচারিক কোর্টগুলোতে প্রায় কাছাকাছি। সরকারের বাইরে কোনো বিষয় না। তাই যদি

পেশাদার লোকজন এখানে আসে তাহলে জনগণ ভালো সেবা পাবে বলে আমরা আশা করি।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক (কমিশন সদস্য): আমি একটা সম্পূরক প্রশ্ন করি। আপনি কি মনে করেন যে, অধঃস্তন আদালতের বিচারক বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যারা স্বতন্ত্রভাবে আছেন তারা কী নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পেরেছেন? আমি কীসের জন্য এটা বিশ্বাস করব যে, একটি এটর্নী সার্ভিস নতুন করে করলে এরা অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে।

জনাব মাসরুর সালেকীন (বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন): এখানে মূল প্রশ্নটা হচ্ছে, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাকে আমি deter করতে চাই। সরকার যখন হয়ে যাচ্ছে তখন সেটা আবার পুরো রাষ্ট্রের। সত্যিকার অর্থে আমাদের সরকারগুলোতো রাজনৈতিক এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করে। আমি এইভাবে ভাবছি না। সরকার তো সারা দেশের। সে নিজেই নিজেকে শুদ্ধ করবে যে, আমি জনগণের কাজটি করাব। সেক্ষেত্রে এখন যেটা আছে যে, সরাসরি রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা। যেমন- যে দলের স্লোগান দিচ্ছে, এরকম ২/৪ জনকে ধরে এনে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা তো আমরা সবাই দেখছি পুরো ক্ষেত্রে। তাই এইটাকে deter করতে চাইছি।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক (কমিশন সদস্য): টাকা পযসার বিষয়ে আর একটি কথা তুলেছেন আপনারা যে, consolidated fund charges. ওখানে সুপ্রীম কোর্টের আছে আর আপনারা অধঃস্তন আদালতেরটা চাচ্ছেন। এটার ন্যায্যতা কী? হঠাৎ করে কেন অর্থাৎ অন্য যারা আছে রাষ্ট্রের তারা যদি বলে যে, আমরা কেন না?

জনাব মাসরুর সালেকীন (বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন): এটা হচ্ছে, বিচার বিভাগ পৃথিকীকরণ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত। এখন বাজেট যেটা হয় সুপ্রিম কোর্টের জন্য এর পুরোটাই consolidated fund বাজেট। যেটা অধঃস্তন আদালতের জন্য বলছি, সে বাজেট কিন্তু ওখানের না। এটা হচ্ছে সরকারের একটা ইচ্ছাধীন। এখন charge expenditure আসলে এটার ব্যয় বা চাহিদা অনুযায়ী দেওয়ার পর সরকার আর এটাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যেটা এখন পারে। সে ইচ্ছা কর ২ টাকা দিল। যেহেতু মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আসে তাই সে ইচ্ছে করলে বরাদ্দ আটকে দিতে পারে। এছাড়া আদালতের যে দৈনন্দিন খরচগুলো আছে, যেমন- কাগজ, কলম, কালি, প্রিন্টার, কম্পিউটার, ফরমস প্রভৃতি দ্রব্যদি লাগছে। এগুলোর জন্য কিন্তু আমাকে সরকারের কাছ থেকে টাকা চেয়ে চেয়ে নিতে হয়। সরকার কিন্তু আমাকে প্রয়োজন মতো দেয় না। কারণ যেহেতু তার কাছে বাজেটটা থাকছে। কিন্তু এটা charge expenditure-এর মধ্যে না। ফলে এটা তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, দিবে কী দিবে না।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): জি, আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন। আপনার নামটা বলুন রেকর্ডের জন্য।

জনাব রোমান উদ্দীন (সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস)): স্যার, আমি রোমান উদ্দীন।

আমরা একটা পয়েন্ট মিস করে গিয়েছিলাম। সেটা হচ্ছে, আমাদের সংবিধান সংস্কারের পিছনে একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, আর যেন কোনো ফেসিস্ট সরকার তৈরি না সেটা নিশ্চিত করা। সেক্ষেত্রে নির্বাচন একটা বড় বিষয়। আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু নির্বাচনে কত শতাংশ মানুষ ভোট দিলে সেটাকে আমরা একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন বলব? আমার মনে হয়, ঐরকম একটা শতাংশ সংবিধানের মধ্যে যোগ করতে পারি। যেমন আমরা দেখি যে, বিগত সরকারের অন্তত ২০১৪ ও ২০২৪ এর সরকারি হিসেবেই সেটা ৪০% এর কম ছিল। সেক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে ৫১% মানুষের ভোট যদি না পরে তাহলে পুনর্নির্বাচন হতে পারে কীনা? এই ধরণের একটি প্রস্তাবনা আমরা রাখতে চাই। সার্বিকভাবে জনগণের বিচারে অন্ততপক্ষে ৫১% ভোটার যদি ভোট না দেন তাহলে পুনরায় নির্বাচন হবে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আসনভিত্তিক বলছেন নাকি একেবারে পুরো নির্বাচনের কথা বলছেন।

জনাব রোমান উদ্দীন (সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস)) : পুরো নির্বাচনের কথা বলছি।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): অর্থাৎ ৩০০ আসনের সবমিলিয়ে ৫০ শতাংশের নীচে ভোট হলে সেক্ষেত্রে পুরো নির্বাচনটা বাতিল হবে।

জনাব রোমান উদ্দীন (সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস)) : অংশগ্রহণমূলক হয়নি বিবেচনায় নির্বাচনটি পুনরায় হতে পারে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ : জি, প্রফেসর মির্জা তাসলিমা, আপনি কছিু বলতে চেয়েছেন। বলুন।

প্রফেসর মির্জা তাসলিমা (বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক) : আমাদের সংবিধানে ন্যায়পালের কথাটা আছে। কিন্তু আসলে ন্যায়পাল আমরা দেখি না। নানান রকম সমস্যা হয়। সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যটি সংবিধানে স্পষ্ট হওয়া দরকার। আর যে সরকার যখন আসে সে নানাকিছু করল তার কিন্তু কোনো মূল্যায়ন হচ্ছে না। ন্যায়পাল সরকারের কার্যক্রম মূল্যায়ন করে জনগণের কাছে দিতে পারে। এটা নির্বাচনের আগেই সে দিবে। তাতে জনগণের সিদ্ধান্ত নেওয়াতে সহজ হতে পারে। এইরকম ন্যায়পালের জায়গাটা প্রতিষ্ঠা করা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ন্যায়পালের ভূমিকা থাকতে পারে। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে ন্যায়পাল কাজ করবে এইরকম কিছু যদি স্থির করা যায়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, প্রফেসর মির্জা তাসলিমা আপনাকে।

আবারও সবাইকে ধন্যবাদ আপনারা সময় দিয়েছেন। আমরা একটা বড় রকমের পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। প্রক্রিয়া হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই ভূমিকা আছে। সেই অর্থে কমিশন আপনাদের সমস্ত বক্তব্যগুলো শুনছে। তারই আলোকে আমরা কিছু সুপারিশ তৈরি করব। আমরা আশা করছি, আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সুপারিশ দেওয়ার চেষ্টা করব। এই প্রক্রিয়ায় আপনাদের সবার সহযোগিতার জন্য আবারও ধন্যবাদ। আপনাদের অনুমতি নিয়ে অধিবেশনটি এখানেই শেষ করছি।

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

সপ্তদশ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ০৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল ৯.৩০ থেকে ১১.০০ পর্যন্ত

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:

১।	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক	কমিশন প্রধান
২।	অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল	সদস্য
৪।	অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫।	ব্যারিস্টার এম. মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল	সদস্য
৬।	জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ, লেখক ও মানবাধিকার কর্মী	সদস্য

অংশগ্রহণকারী অংশীজনদের এর তালিকা:

১। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান নাসির, জাস্টিস ফর কমরেডস (জেএফসি)
২। লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিনুর রহমান বীর প্রতীক, জাস্টিস ফর কমরেডস (জেএফসি)
৩। লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমান, জাস্টিস ফর কমরেডস (জেএফসি)
৪। কমান্ডার (বিএন) নাসির আহমেদ জুলিয়াস, জাস্টিস ফর কমরেডস (জেএফসি)

কার্যবাহ প্রস্তুতকারক :

(১) মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
(২) মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সম্পাদনায়:

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অংশীজনের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহ

কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ(কমিশন প্রধান): উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমার নাম আলী রীয়াজ, আমি এই সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে সংবিধানের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকের এই অধিবেশনের শুরুতে আমরা সেইসব শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং যারা আহত হয়েছেন তাঁদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যরা তাঁদের পরিচয় দেবেন।

(কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ(কমিশন প্রধান): আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির সক্রিয় অংশীদার হিসেবে সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। সময় স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা ১২ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে আমাদের পক্ষ থেকে যদি কোনো ধরনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় তাহলে সে প্রশ্নগুলো আমরা করতে পারব। আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব ইতোমধ্যেই লিখিত আকারে দিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ এবং এটি কমিশনের অন্যান্য ডকুমেন্টের সাথে যুক্ত থাকবে। আজকে আপনাদের সাথে বসার কারণ হচ্ছে যাতে আপনাদের বক্তব্যগুলো রেকর্ড থাকে এবং ট্রান্সক্রাইব হবে। ভবিষ্যতে আমাদের কমিশনের পক্ষ থেকে পরিকল্পনা হচ্ছে এই কনসালটেশন মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা যে বক্তব্যগুলো পাচ্ছি, সেগুলোর ট্রান্সক্রিপশন সকল সংগঠনের এবং ব্যক্তির, আমরা সেগুলো এক পর্যায়ে সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে আগ্রহী।

[উপস্থিত অংশীজন নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।]

অধ্যাপক আলী রীয়াজ(কমিশন প্রধান): আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে, বক্তব্যের শুরুতে আপনার নাম এবং সংগঠনের নাম উল্লেখ করলে আমাদের পক্ষে নোট নেওয়া সহজ হবে। প্রথমেই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান নাসির-এর বক্তব্য দিয়ে শুরু করছি।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান নাসির (জাস্টিস ফর কমরেডস, জেএফসি): ধন্যবাদ।

আমরা এখানে মূল যে বিষয়টি উপস্থাপন করতে যাচ্ছি সশস্ত্র বাহিনীতে গত ১৬ বছরে যা ঘটেছে, সেটি দেশের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সশস্ত্রবাহিনীর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। সে কারণে এই বিষয়গুলো কমিশনের দৃষ্টিতে আনার আগ্রহ প্রকাশ করছি। মূল বিষয়টি হচ্ছে গত ১৬ বছরে সশস্ত্র বাহিনীর সকল বিভাগে অফিসার এবং all ranks; বিশেষ করে যারা দেশপ্রেমিক এবং প্রফেশনাল অফিসার ছিল, তাদেরকে বিভিন্নভাবে চাকরি থেকে বের করার জন্য একটি তৎপর প্রক্রিয়া জারি ছিল। সেটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল। যেমন- চাকরি থেকে বরখাস্ত করা এবং সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে ভুয়া সম্পৃক্ততা প্রতিষ্ঠা করা, বিডিআর হত্যা মামলার সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত করা প্রভৃতি। বিভিন্ন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত ঘটনার সাথে মিথ্যা সম্পৃক্ততা দেখিয়ে সেনাবাহিনীর আইন অনুযায়ী যে কোর্ট সেখানে সেনাবাহিনীর প্রশাসনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর কোনো সদস্য রিভিউর কোনো সুযোগ পাবে না। এই সুযোগে তাদেরকে একতরফাভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। যার ব্যাপ্তিটা গত ১৫ বছরে প্রায় ৪০০ জনের বেশি অতিক্রম করেছে। যদি সঠিক পরিসংখ্যান নেওয়া যায় তবে এ সংখ্যা ৬০০ এর অধিক হবে। সরাসরি বা পরোক্ষভাবে তাদেরকে চাকুরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে বা চাকুরি শেষ করে বাড়ি যেতে না পেরে অবসর নিতে বাধ্য হয়েছে। যে যে বিষয়গুলোর কারণে এ বিষয়টি ঘটেছে, যে যে মাধ্যমে হয়েছে সেটি হচ্ছে unjust dismissal. অকারণ বা কোনো flimsy ground-এ বরখাস্ত করা হয়েছে। একজন অফিসার ২ বছরের প্রশিক্ষণ বা বর্তমানে ৪ বছরের মিলিটারি ট্রেনিং দিয়ে গ্রাজুয়েশন, মাস্টার্স করার পর সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদে প্রশিক্ষিত করার পরে শুধু সত্যি কথা বলে বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার কারণে তাদেরকে চাকুরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। তাকে বরখাস্ত করে তার চাকরি জীবনের সমস্ত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সোসালি তাকে embarrass force করা হয়েছে। তাকে বেইজ্জতি করা হয়েছে এবং তার পরিবারকেও বেইজ্জতি করা হয়েছে। অনেককে force করা হয়েছে চাকরি হতে অবসর নিতে। কখনও কখনও একজন অফিসারকে বাধ্য করা হয়েছে অবসর নিতে বা অবসরে যেতে। যেটির আমি একটি উদাহরণ। disproportionate

punishment. খুব অল্প অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। Illegal distraction impose. PNG-নামে একটি সিস্টেম আর্মিতে চালু হয়েছে। এটি কূটনীতিবিদদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেটি কোনো কূটনীতিবিদকে দেশে প্রবেশের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। সেই বিষয়টি সশস্ত্র বাহিনীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়েছে। কোনো অফিসার বা কোনো সৈনিকের বিরুদ্ধে যদি PNG জারি করা হয় বা Persona non grata ঘোষণা করা হয়, তাকে সেনানিবাসে প্রবেশ এবং চাকুরির কারণে তার যে অধিকারগুলো- চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্যতা বা কোনো অনুষ্ঠানে ডাকা, তার উপস্থিতি, এগুলো থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। Absolutely চাকরি করার কারণে সে এ যোগ্যতাগুলো অর্জন করেছে। আবার অনানুষ্ঠানিক একটি পিএনজি আছে। অফিসিয়াল ঘোষণায় কোনো পিএনজি নেই। কিন্তু তাকে কোনো অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হয়নি বা তাকে কোনো প্রোগ্রামেও ডাকা হয়নি। যেটিতে তার থাকা উচিত বা সেনাবাহিনীর প্রথায় তার উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। সেগুলো থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। Influence of politician and agencies. গত ১৫ বছরে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এবং রাজনৈতিক সংস্থা বা দলগুলো সশস্ত্র বাহিনীর ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা প্রত্যেক অফিসারকে চিহ্নিত করে সে কোন ভাবধারার, সত্যি কথা হলো, বিরোধী মতাবলম্বী কি না? তারপর পরিকল্পিতভাবে তাদেরকে চাকুরি থেকে বের করার এবং সেটি বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়। গত ১৫ বছরে আরও যেটি করা হয়েছে, সামরিক বাহিনীর মূল যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি, দেশ রক্ষার জন্য প্রস্তুতি, এগুলো থেকে তাদেরকে divert করে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে চাকুরির বাইরে বিভিন্ন বড় বড় প্রকল্প এবং অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন, বড় বড় রোড নির্মাণ কাজ, ব্রিজ নির্মাণ, ড্রেজিং যেটির সাথে সামরিক বাহিনীর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এটির কারণে সামরিক বাহিনীর অফিসাররা দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়া বা রাজনীতিবিদদের সাথে মিলে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে বা অধিক সংখ্যক অফিসার এটির দিকে inclined হয়েছে। এর কারণে গোয়েন্দা সংস্থা বা র‍্যাব-এর মতো সংস্থাগুলোতে কেউ গেলে political masterদের সাথে সম্পৃক্ততা সৃষ্টি হয়। ঐ সমস্ত পদে অফিসাররা যাওয়ার জন্য বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে। বেশি সংখ্যক অফিসার বিশেষ করে বর্তমানে যারা সিনিয়র লট আছে, তারা নিজেদেরকে সামরিক বাহিনীর অতিরিক্ত কাজে যাকে বহির্ভূত কাজ বলা যেতে পারে যেমন- সিভিলিয়ান প্রজেক্ট, টাকাপয়সা, দুর্নীতি এবং অবৈধ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততা দেখিয়ে তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করে সেনাবাহিনীর উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে নেয়। পরবর্তীতে যেটি দেখা গেছে, এই অফিসাররা যারা দুর্নীতিগ্রস্ত হচ্ছে বা যারা অবৈধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে তারা তাদের চাকুরি এবং ঐ অবৈধ অর্থকে রক্ষা করার জন্য, ঐ regimeটাকে রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে গেছে। অদ্যাবধি তারা এই কাজে লিপ্ত আছে। তারা যে কোনো মূল্যে ঐ শাসন ব্যবস্থাকে ফেরত আনার প্রচেষ্টায় লিপ্ত আছে বলে আমরা মনে করছি। এই কাজটি সম্ভব হয়েছে, আমার ধারণা বা আমরা যারা ভুক্তভোগী তারা অনুভব করি যে একজন সামরিক কমান্ডার শৃঙ্খলা রক্ষার নামে আমাদের সংবিধানের ৪৫ ধারাতে যে immunity দেওয়া হয়েছে, একজন সামরিক বাহিনীর সদস্যের ওপর দেওয়া শাস্তি বা শৃঙ্খলামূলক কোনো শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করার কোনো সুযোগ সে পাবে না। এটি বাহিনীর শৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ধরা হয়েছে। এই কমান্ডারের সিদ্ধান্তটিই শেষ সিদ্ধান্ত হিসেবে ধরা হয়। এই সুযোগ নিয়ে সামরিক অফিসাররা বা কমান্ডাররা তাদের অধীনদের নিয়ন্ত্রণ করছে। এটি অতীতে স্বল্প মাত্রায় হলেও গত ১৬ বছরে আমরা দেখেছি, এটির ব্যাপক অপব্যহার হয়েছে। অধিক সংখ্যক দক্ষ ও যোগ্য অফিসার যারা তাদের নীলদাঁড়া খাড়া করে সত্য কথা বলতো বা professionally efficient বা তাদের যোগ্যতার মাধ্যমে অনেকের ওপরে যাওয়ার সুযোগ ছিল তাদেরকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আগে সিনিয়র পদে যাওয়ার পরে বরখাস্ত করা বা বের করে দেওয়া হতো অসুবিধা দেখে। কিন্তু এই অফিসারদেরকে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট বা লেফটেন্যান্ট পদে থাকতেই বিভিন্ন ব্যাচের প্রথম যারা, sword of honor প্রাপ্ত যারা প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় এরকম অনেক অফিসারকে খুব সামান্য অপরাধে বা ভুল তথ্য ও মিথ্যা অভিযোগের কারণে তাদেরকে চাকুরি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। সিনিয়ররা তাদের প্রভাবের কারণে তাদের বিষয়টি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ বা রাজনৈতিক দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট বা লেফটেন্যান্টরা এই সুযোগটি পায়নি। যার ফলে ব্যাপক একটি গোষ্ঠী trainee military officers বা most of them special trainee অফিসারদের বের করে দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় টার্গেট ছিল গত ১৬ বছরে যারা special forces, Bangladesh commando battalion, commando trainee যারা ছিল তাদেরকে ব্যাপক ভিত্তিক বহিষ্কারের মধ্যে রাখা হয়েছে। সবচেয়ে খারাপ বিষয়টি ছিল ‘তাপস’ হত্যা মামলার যে ৫ জনকে গুম করে তাদেরকে দীর্ঘ সময় অন্তরীণ করে, দীর্ঘদিন অত্যাচার করে সামরিক আদালতে ৫ বছর জেল দেওয়ার পরে তাদেরকে ছাড়া হয়। গত এক মাস আগে মতিঝিল থানায় যেখানে মামলাটি রুজু হয়েছিল, পুলিশ রিপোর্ট, সেই অভিযোগটিই মিথ্যা প্রমাণিত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সামরিক আদালত যে ৫ জন অফিসারকে ৫ বছর জেল দিল,দীর্ঘদিন তাদেরকে অন্তরীণ রাখল, তাদের এই বিষয়টি কীভাবে সামরিক কর্তৃপক্ষ সামলাবে? বর্তমান সংবিধানের ৪৫ ধারায় এই অফিসারেরা কিন্তু কোনো বিচার দাবি করতে পারে না। এ জন্যই আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। এরকম অনেক মামলা আছে, যে মামলাগুলোকে সামরিক আদালতে বিচার করা হয়। আমি উদাহরণস্বরূপ বলব, প্রথম যাকে প্রদান করা হলো সে বিচার করতে ব্যর্থ হলো, সে কোনো অভিযোগ প্রমাণ করতে পারল না। কমিটি পরিবর্তন করে

অন্য একজনকে দেওয়া হলো। সেও ব্যর্থ হলো। এরকম অনেক উদাহরণ আছে। তারপর ওর পদোন্নতি পাওনা আছে, ওকে আমি আগে প্রস্তুত করে নিচ্ছি যে, তোমার পদোন্নতি ফেব্রুয়ারি মাসে, তুমি এটির কোর্ট পরিচালনা করবে। তুমি যদি তাকে বরখাস্ত কর, তাহলে তুমি পদোন্নতি পাবা। ২০১৮ সালের নির্বাচনের পরে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রমোশন বোর্ডে ব্যাপক সংখ্যক অফিসারকে সুনির্দিষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আগামী ২০১৮ সালের নির্বাচনে যদি তোমরা সরকারের ইচ্ছামত কাজ কর, তাহলেই তোমরা পরবর্তীতে পদোন্নতি পাবা। এভাবে ব্যাপক সংখ্যক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যকে দূষিত করা হয়েছে। আমি মনে করি যে, এই ব্যাপক কার্যক্রমের কারণে এই মুহূর্তে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা একটি ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ফিল করছে। যারা সত্যিকার দেশপ্রেমিক এবং যারা professional army বা একটি দেশরক্ষার কার্যকর বাহিনী যারা আশা করে, আমরা যেটি অনুভব করছি গত এক সপ্তাহে, আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব আবারও ব্যাপক হুমকির মুখে। এ পর্যায়ে আমরা চাচ্ছি যে, সশস্ত্র বাহিনীকে যেন আবার পূর্বের অবস্থায় ফেরত নেওয়া হয়। সেজন্য আমরা চাচ্ছি যে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৫ সংস্কার করে পৃথিবীর অন্যান্য অধুনিক সেনাবাহিনী যেরকম আইনের মাধ্যমে শৃঙ্খলা রক্ষা করে, সেরকম যুগোপযোগী একটি আইন যেন আমাদের জন্য করা হয় এবং যে কেউ যেন শাস্তি দেওয়ার আগে চিন্তা করে যে তার রায়টাই শেষ রায় না। রিভিউর মুখে পড়ে পুনর্বিবেচনা করা হলে তার যোগ্যতার ওপর প্রশ্ন রাখবে।

আরেকটি বিষয় এই ব্যাপক অন্যায় অবিচারের সাথে যারা জড়িত ছিল তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হোক। সেনাবাহিনীর বর্তমানের উচ্চ পর্যায়ের অফিসাররা, যাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও শুধু গত স্বৈরশাসনকে সমর্থন করার কারণে তারা উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে তারা সবাই কিন্তু এখনও জবাবদিহিহীন রয়ে গেছে। তাদেরকে হিসাবের সম্মুখীন করতে হবে। তাদেরকে হিসাবে নিয়ে এসে তাদের যোগ্যতা এবং কার্যকলাপ রিভিউ করে সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে একটি শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আমাদের দেশের মতো গরিব দেশের সেনাবাহিনীকে সত্যিকার অর্থে ceremonial আর্মি না করে যুদ্ধ উপযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সংবিধানে যা কিছু সংশোধন প্রয়োজন তা দ্রুত করা প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়। এই সুযোগ আমরা যদি হারাই, আমার মনে হয় না যে রাজনৈতিক সরকারের পক্ষে এটি করা সম্ভব হবে।

আমরা কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিব। সেটি হচ্ছে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৫ পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী করা। এটিই হচ্ছে আমাদের মূল চাহিদা। পর্যালোচনা করে এটিকে সংস্কার করতে হবে এবং আধুনিক সেনাবাহিনী এমনকি ভারতেও সেনাবাহিনীর কোর্টের বাইরে হাইকোর্টে একটি রিভিউ কোর্ট আছে। Any disposal by the military court they can come for review. এটি হলে আমার মনে হয়, বাংলাদেশে এই মুহূর্তে কয়েক হাজার মামলা পাওয়া যাবে যারা তাদের disposalকে বাতিল করতে পারবে এবং তারা চাকুরি পাবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে যাদেরকে অন্যায়ভাবে বিশেষ করে আমি যে ৫ জন অফিসারের কথা বললাম, এরকম ৩০০-৪০০ অফিসার তালিকাভুক্ত আছে আমাদের ফোরামে। আমি সবাইকে বলব না, ১০০% নির্ভেজাল। আমাদের সেই সক্ষমতা নেই যে বিচার বিশ্লেষন করব। কিন্তু তাদের মামলাগুলো পুনর্পর্যালোচনা করলে এদের হয়ত সুবিচার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বেশিরভাগের ক্ষেত্রে। ৪০০ এর মধ্যে ৩০০ এর অধিক অফিসার পাবে। আমি গতকাল পেপারে দেখলাম ১০০ সিভিল অফিসারকে ডেপুটি সেক্রেটারি, এডিশনাল সেক্রেটারিকে সচিব পর্যন্ত পদমর্যাদায় তার সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়টি নিয়ে সেনাবাহিনীতে আজ পর্যন্ত কোনোরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সবচেয়ে বেশি এবং কঠিন সত্য যে, আমলারা কেউ জেলে যায়নি, কেউ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়নি, গুম হয়নি। কিন্তু সেনাবাহিনীর সদস্যরা জেল খেটেছে। দুজন অফিসার অদ্যাবধি missing আছে। মেজর জিয়া, সে জীবিত না মৃত কেউ জানে না। He is the sword of honored of his course. First man of his course. সে missing. কয়দিন পর পর তার voice message ছাড়া হয়, only to prevent his family from filing a gome case. বলা হচ্ছে সে জীবিত আছে, voice message দিচ্ছে। যদি সে জীবিত থাকে He should show his face in video and he should call for interview. এইভাবে মানুষগুলোকে অত্যাচার করা হয়েছে। যা একটি হিসাবে আসা উচিত। যে অফিসারদের বের করে দেওয়া হয়েছে আমাদের অনুরোধ থাকবে তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হোক। এরা কিন্তু সবাই গ্র্যাজুয়েট, মাস্টার্স। আমাদের এখানে অনেকে আছে ২ ও ৩টি বিষয়ে মাস্টার্স করা, পিএইচডি করা। এই সমস্ত অফিসারেরা শুধু বরখাস্ত করার কারণে কোথাও চাকুরি পাচ্ছে না। তারা অত্যন্ত কঠিন জীবনযাপন করছে। এদেরকে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজে লাগানোর অনেক সুযোগ আছে। সেনাবাহিনীর uniform পরা প্রতিষ্ঠান যেখানে রাস্তা নির্মাণের বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করে। আমার পরামর্শ হলো সেই সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদেরকে সেখানে কাজে লাগানো। তাহলে uniform দূষিত হবে না সিভিলের সাথে contract-এর কারণে। সেনাকল্যাণ সংস্থায় কমপক্ষে ২০ থেকে ৩০ জন অফিসার আছে। তারা চাল,ডাল, আটা, ময়দা হিসাব করে। তাদের এ কাজ না আমি মনে করি। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বা সেনাকল্যাণ সংস্থায় অতীতে একজন সার্ভিং অফিসার থাকত, অন্য ক্ষেত্রে সমস্ত সিভিলিয়ান এবং অবসরপ্রাপ্ত যোগ্য লোক রাখা হতো। গত ১৫ বছরে এখানে দেখা যাচ্ছে ১০-১৫ জন কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার এবং আরও ১০-২০জন uniform অফিসারদেরকে রাখা হয়। তিন বছরে তারা সমস্ত ব্যবসায়ীদের

সাথে বিভিন্নরকম কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে আর্মিতে গিয়েও তারা ঐ কাজে লিপ্ত থাকে। তারা এখানে এসে চুক্তি করে, ব্যবসা শুরু করে, সেনাবাহিনীতে গিয়ে তারা তাদের কাজের দিকে মন না দিয়ে এই ব্যবসাটিকে জারি রাখে। যে জিনিসটি অতীতে কখনও ছিল না। আমি মনে করি যে দ্রুত সেনাবাহিনীকে এ সমস্ত কাজ থেকে বের করে প্রকৃতপক্ষেই professional এবং দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে একটি ছোট বাহিনীকে গড়তে যেভাবে সম্পৃক্ত করা লাগে সেভাবে এটিকে গড়ে তুলতে হবে। আমি একটিই উদাহরণ দিতে চাই, '৭১ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়া বা তার সমসাময়িক যারা ছিল তাদের চাকরি ১২ বছর ছিল। এখন একজন মেজরের চাকরি ১৫ বছর। তখন তাদের বড়জোর qualification ছিল graduation. ২বার selected east pakistan vacancy কোটাতে তারা যোগ দিয়েছিল। এখন কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনীর সদস্যরা very well qualifzed, very well trained এবং তাদের জাতিসংঘের অভিজ্ঞতাসহ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আছে। তাদেরকে সমাজে অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে পূনর্বাসন করা যেতে পারে। আমি মনে করি যে, uniform পড়ে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, সিটি কর্পোরেশন, রাজউকসহ এসব জায়গায় কেন মিলিটারি অফিসাররা কাজ করবে। He should be some retired officer. He has engineering officer. Appropriate অফিসারদেরকে আমরা সেখানে দিতে পারব। তাকে আইনের আইওতায় রাখব, সে অপরাধ করলে, যোগ্য না হলে তাকে বের করে আরেকজনকে দেব। কিন্তু uniform অফিসারদের দিয়ে আমি সেনাবাহিনীকে দূষিত করছি। আমি মনে করি এর বিরুদ্ধে একটি আইনগত ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমরা আইন সংশোধন চাচ্ছি। যে সমস্ত আর্মি অ্যাক্ট, রুলস, রেগুলেশন আছে এগুলো ব্রিটিশদের দেওয়া। এটি পাকিস্তান আমলে শুধু ব্রিটিশ কেটে পাকিস্তান করেছিল, আমরা পাকিস্তান কেটে বাংলাদেশ করছি। ১৯৩২, ১৯৪৫, ১৯৪৮ সালের আইন এখনও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আছে। এটির ব্যাপক সংশোধন ও পরিমার্জন করার জন্য আমি মনে করি অন্যান্য Refrom Commission- এর মত সেনাবাহিনীতেও Refrom Commission করা দরকার। এটি করলে পরে আমাদের যে কষ্টার্জিত কর যেটি আমরা প্রতিরক্ষা খাতের জন্য ব্যবহার করছি সেটি দিয়ে শুধু সর্বশেষ প্রযুক্তির অস্ত্র কিনলেই হবে না, সেটি চালানোর জন্য যোগ্য জনবল আমাদেরকে প্রস্তুত করতে হবে। আরেকটি বিষয় অনুচ্ছেদ ৪৫ বাতিলের জন্য একটি মামলা হাইকোর্টে আছে। একজন নেভি অফিসারকে attempt to murde-এর অভিযোগে বের করে দেওয়া হয়। সে হাইকোর্টে গিয়ে ৯০টি শুনানির পর একটি রায় পায়। Rule absolute করে ৪৫ ধারা বাতিলের পক্ষে একটি রায় দেওয়া হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে নৌবাহিনী বা সরকার পক্ষ মামলা করে সেটি এমন সিরিয়াল দিয়েছে যে আগামী ১০ বছরে সুপ্রিম কোর্ট এটি বিচারের আওতায় আনবে না। আমি মনে করি, কমিশনের জন্য এটিও একটি সুবিধা। সুপ্রিম কোর্টের শুনানির বিস্তারিত তথ্যাদি নিলেও জানা যাবে কেন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৫ বাতিল করা উচিত। মানে একজন অফিসারকে attempt to murder মামলায় বরখাস্ত করা হয়, শুধু মানবাধিকার বিবেচনায় সে মামলাটি করে। আমিতো service existence-এর কারণে চাকরিটা হারালাম। কিন্তু আমার মানবিক দিকটি আছে। আমি attempt to murderer হয়েছি, এখন আমি যে মারিনি বা মারতে চাইনি এটি আমি প্রমাণ করার জন্য কোথায় যাব? কোনো জায়গায় যাওয়ার সুযোগ সেনাবাহিনী বা নৌবাহিনী আমাকে দেয়নি। হাইকোর্ট সেটি শুনে. তার পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেটিকে indefinite period এর জন্য সেটিকে রেখে দিয়েছে। আমার অনুরোধ থাকবে, আমি মনে করি সংবিধান সংস্কার কমিশন অত্যন্ত জরুরি কিছু কাজ করছে, justice restoration এর জন্য যা যা recommendation আছে, আমরা লিখিত দিয়েছি, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা ব্যাখ্যা করব।

আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, ব্রিগেডিয়ার নাসির। আপনাদের লিখিত বক্তব্যটি আমরা পেয়েছি। আপনার কাছে ছোট একটি প্রশ্ন। আপনি বলেছিলেন ২জন মিসিং আছে। এর মধ্যে একজনের কথা উল্লেখ করেছেন মেজর জিয়া। আরেকজনের নাম কি আপনি উল্লেখ করতে চান?

কর্নেল হাসিনুর রহমান(জাস্টিটস ফর কমরেডস,জেএফসি): আমি কর্নেল হাসিন, আমি সেনাবাহিনীতে চাকরি করেছি। কোনো অপরাধ আমার ছিল না এই ২৮ বছরে। হঠাৎ করে চাকরীরত অবস্থায় আমাকে গুম করা হয়। আমি ২বার গুম হই। বর্তমানে প্রচলিত প্রক্রিয়ার মধ্যে আমি আছি। অনুচ্ছেদ ৪৫-এর কথা বলা হয়েছে, এটি আমাদের ন্যায্য দাবি। মৌলিক অধিকার আমরা ফেরত চাই।

২য় জন মেজর জাইদ, যাকে রূপনগরে মেরে ফেলা হয়েছে। মেজর জাইদ ছিল অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। তাকে জঙ্গী তকমা দিয়ে মেরে ফেলা হয় রূপনগরে, তার বাসার সামনে। এটি ছিল একটি সাজানো নাটক। আমরা বিশ্বাস করি এটি তদন্ত হওয়া উচিত। তার পরিবারও নেই যে আবেদন করবে। তাই সুযোগটি নেই।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক (কমিশন সদস্য): ধন্যবাদ, আপনাদের বক্তব্যের জন্য। আমি শুধু একটু ক্লারিফিকেশন চাই। আপনি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৫-এর কথা উল্লেখ করেছেন। অনুচ্ছেদ ৪৫ এর মূল বাধাটি দেওয়া হয়েছে আসলে অনুচ্ছেদ ৪৭(ক) এর মাধ্যমে। অনুচ্ছেদ ৪৪ (১) বলেছে, কারও যদি মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন হয় তাহলে হাইকোর্ট ডিভিশনে প্রতিকারের জন্য যেতে পারবে

অনুচ্ছেদ ১০২ এর অধীনে। অনুচ্ছেদ ৪৪ (১) এ যে ক্ষমতাটি দেওয়া হয়েছে অনুচ্ছেদ ৪৭(ক) এর মাধ্যমে সেটি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৪৪(৩) এর অধীনে যে আইনের কথা বলা হয়েছে সেটি enforce করার জন্য disciplinary force-এর কেউ অনুচ্ছেদ ৪৪(১) এর অধীনে ১০২-এর প্রতিকারটি চাইতে পারবে না। যে কারণে মূলত fundamental rights enforcement এর জন্য যেতে পারে না। এটি নিয়ে একটি বিতর্ক অনেক দিন ধরেই আছে। আপনারা যেহেতু এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন, আমি শুধু জানতে চাই, এটি কি fundamental rights violation এর জন্য কোর্টে যাওয়া, এটি একটি অধিকার। আরেকটি হচ্ছে, আর্মির ভিতরে কোনো একটি decision that involve possible violation of fundamental rights. আপনারা কি সেটিকেও কোর্টে নিতে চান?

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান নাসির (জাস্টিস ফর কমরেডস,জেএফসি): আমরা সংবিধান বিশেষজ্ঞ না, সেজন্য হয়ত অনুচ্ছেদসমূহ সঠিকভাবে নোট করি নাই। আমরা এটিকে কমিশনের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি, সংবিধানের যা কিছু সংশোধন প্রয়োজন হয়, সেনাবাহিনীর ভিতরেও fundamental rights এবং human rights, যে কোনো সিদ্ধান্তের বিষয়ে একটি রিভিউ কমিশনে যাতে সবাই যেতে পারে। তাহলে হবে কি, অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়াটা কমবে। এখন অনেকেই বলতে পারে যে, তাহলে তো হাজার হাজার সৈনিকরা মামলা দায়ের করবে। পুরো কোর্ট জ্যাম হয়ে যাবে। যেভাবে দাবি দাওয়া শুরু করেছে বিভিন্ন সংস্থা। এখন হয়ত হবে, তবে ভবিষ্যতে কমান্ডাররা শাস্তি দেওয়ার আগে একশত বার চিন্তা করবে যে, আমার রায়টি পুনর্বিবেচনা হতে পারে। আমি যদি অন্যায় করি আমার শাস্তিও হতে পারে। শুধু রিভিউ না, যদি অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়, তার বিচারের সুযোগও রাখতে হবে। আমি শুধু একটি উদাহরণ দেই, একজন পাইলটকে তার minimum qualifz করাতে ১০০ ঘণ্টা ফ্লাইং করতে ৫ থেকে ৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়। তার স্ত্রী যদি তাকে পছন্দ না করে বা অফিসারকে যদি চিফ পছন্দ না করে, He can just decide and within seven days he goes home. তাকে বলা হবে, তুমি কোনো সুযোগ সুবিধা পাবে না। সরকার অবসর দিবে কিন্তু কোনো টাকা দেবে না। আটকিয়ে রাখবে। সরকার অ্যালাউ করে এক বছর বাসায় থাকতে, বলবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তুমি বাসা ছাড়। এমন উদাহরণ রয়েছে সন্ধ্যা ৬ টার সময় তাদের চাকরিচ্যুতির ফ্যাক্স এসেছে, বলছে রাত ১২ টার মধ্যে তুমি বাসা খালি কর। সে কোথাও যেতে পারে না যে আমার অধিকার আছে আমি এক বছর থাকতে পারি বাসায়। আমি বরখাস্ত হলেও আমাকে কমপক্ষে ৭ দিন সময় দিতে পারে। আমি আমার পরিবার পরিজনসহ থাকছি। এই জিনিসগুলো। আমার পরিবার যে tortured হয়, socially embarrass হয়। আমি "তাপস হত্যা" মামলার কথা বলব, এই যে ৫ বছর জেল খাটল, তার আগে ১-২ বছর অন্তরীণ ছিল, unrecorded disappeared ছিল, tortured হয়েছে। ঐ পরিবার socially embarrassed হয়েছে, এটির cost, ঐ অফিসারের চাকুরির cost, One of them is a professor in Malaysian University. The other one is in UK. He is also doing and he has completed his Ph.D. এই ধরনের অফিসারদেরকে army has lost, the nation has lost. এ বিষয়টির ওপর আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এইভাবে শুধু ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে the nations is losing its bright soldier.

অধ্যাপ মোহাম্মদ ইকরামুল হক (কমিশন সদস্য): আরেকটি বিষয় বলতে চাই যে, অনুচ্ছেদ ৪৫ বিষয়ে যেটি বলেছেন, আপনি সঠিকই বলেছেন, বর্তমান ৪৫ অনুচ্ছেদ যেটি আছে, এখানে সেই অধিকারটি দেওয়াই হয়নি। কারণ এখানে বলেছে, লঙ্ঘন করতে পারবে, তবে একটি provision আছে, being a provision limited to the purpose of ensure the proper discharge of their duties of the maintain of their discipline in that force. এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী discrimination করতে পারে না, equality ভাঙতে পারে না, cruel punishment দিতে পারে না। এগুলোর exemption কিন্তু দেওয়া হয়নি। এটিও এক ধরনের misuse. একটি বিষয় আমি জানতে চাই, আপিলের বিধান চাইলেন, আপিলের বিধানটি কি আর্মির বিচারের সিস্টেমের মধ্যে চান, নাকি বাইরে?

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান নাসির (জাস্টিস ফর কমরেডস,জেএফসি): Its has to be outside Military. কারণ যে কোনোভাবে উচ্চপদাধিকারীরা এক হয়ে যায়, যেমন রসুনের গোড়া এক। They have interest of purpose. তারা একজন আরেকজনকে অসন্তুষ্ট করবে না। এমন কি চাকরির মধ্যে আর্মি চীফ চাইবে না, নেভির কোনো অফিসারকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। Navy chief must maintain command. বলবে যে, কৃংখলা রক্ষার জন্য তাকে বেরিয়ে যেতে হবে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী সবাই এটিকে সমর্থন করবে। এই জিনিস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমি ন্যায় বিচার করব, তাতে যদি কেউ বেকসুর খালাস হয়ে যায়, আমার কোনো আপত্তি থাকবে না।

কর্নেল হাসিনুর রহমান (জাস্টিস ফর কমরেডস,জেএফসি): আমাদের 'JAG Branch' বলে একটি বিভাগ আছে। এরা সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট, লেফটেন্যান্ট, ক্যাপ্টেন আর্মির নিয়মের মধ্যে পদোন্নতি পায়। যে সংশোধন করার কথা ছিল তাদের, তারা আসলে করে না। সিনিয়রের মর্জিমতো সে আইনটি দাখিল করে। আমাদের আসলে JAG Branchটি দরকার নেই। আমাদের যদি তিন বছর করে দেন, দায়রা জজ বা এ পর্যায়ের একজন জজ আসে সুপারভাইজ করার জন্য,আমরা ন্যায় বিচার পাব।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান নাসির (জাস্টিস ফর কমরেডস,জেএফসি): অর্থাৎ He become a baby of the chief. Chief

যেখানে থাকে, তার baby হিসেবে থাকে। তার আদেশের বাইরে কখনও যাবে না। এটির অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি বিডিআর হত্যা মামলা তদন্তের সময় JAG-এর যে senior most representative, he never utter a single word throughout to wants of inquiry. তার কিন্তু সবচেয়ে বেশি কথা বলার কথা ছিল। সেনাবাহিনীর অফিসারদের হত্যার বিরুদ্ধে তার অবদান রাখার সুযোগ ছিল। আর্মির অফিসাররা যারা involve ছিল, তাদের বিচারের ব্যাপারেও তার কোনো বক্তব্য ছিল না যে, এদের সেনাবাহিনীর কোর্টে বিচার করতে পারি। এদের সিভিল কোর্টে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার FGCM -এর authority আছে। They are in uniform. তারা অন্যান্য অপরাধে লিপ্ত হলে আমি তাদের ফেরত এনে আর্মিতে বিচার করি, court martial করি। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত হওয়ার কারণে আমি কেন তাকে বিচার করব না। এই বিষয়ের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ধন্যবাদ।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): আমার প্রশ্ন হলো, আপনাদের general grievance আমি যতটুকু বুঝেছি, চাকুরিচ্যুত করার context থেকে। মৌলিক অধিকার যতগুলো আছে, সংবিধানের তৃতীয় ভাগের সমস্ত বিষয়গুলোই অনুচ্ছেদ ৪৫ এ curtail করে দেওয়া হয়েছে। তাই আমি যদি আপনাদের বাহিনীর নিয়োগ, পদোন্নতি, service condition, যেগুলো অন্যান্য discipline বা সরকারি সিস্টেমে যারা তাদের প্রত্যেকেরই সার্ভিস সম্পর্কিত অনেক বিষয়েই মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলো exercise করে হাইকোর্টে। আপনাদের বিষয়ে আপনারা শুধু বরখাস্তের বিষয়টিই বেশি তুলে ধরেছেন। আপনারা এটি চিন্তা করছেন কি না যে মৌলিক অধিকারের পুরো সিস্টেমটাই সংযুক্ত হোক। So that in every stage of disciplinary measures or internal other service measures-এ এটির কোনো implication হয়?

আর যে বিষয়টি আমাদের সহকর্মী বলেছেন যে, অনুচ্ছেদ ৪৭ এ আপনাকে কোথাও যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দিয়ে দিয়েছে। ফলে আপনি কোথাও যেতেই পারবেন না। কিন্তু অনুচ্ছেদ ৪৫ এ robust যে, আপনার কোনো অধিকারই নেই। এটি applyই করেনি। শুধুমাত্র ১টি বা ২টি নয়, পুরো বিষয়টিই আপনার জন্য প্রযোজ্য নয়। So that is my question are you talking about the whole things or just a specific review for dismissal only.

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান নাসির (জাস্টিস ফর কমরেডস,জেএফসি): আমাদের প্রস্তাবের প্যারা ৪(ই)তে যেটি লিখেছি যে, total reform. ব্রিটিশ রুলস এন্ড রেগুলেশন যেটি পাকিস্তান সংযুক্ত করেছিল এবং বাংলাদেশ ১৯৭১ সাল থেকে সংযুক্ত করছে; এটিই আমাদের জন্য সব থেকে আক্ষেপের বিষয়। পৃথিবীতে সবকিছুই পরিবর্তন হয়েছে, বাংলাদেশের এই আইনটি পরিবর্তন হয়নি। আমরা এখনও ১৯১৯, ১৯২১, ১৯৩২ সালের আইন অনুসরণ করছি। Because it goes in favor of the authority. অথরিটি একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে তার খুব শক্তি দেখাতে পারে। তাকে কেউ প্রশ্ন করতে পারে না, তাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। কিন্তু এটি শুধু dismissal-এর ক্ষেত্রে না। প্রত্যেকটি পর্যায়ে যদি একটি সুযোগ থাকে তাহলে ভালো। কারণ অন্যান্য ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনার সুযোগ আছে। সেনাবাহিনীর ছোট ইউনিট পর্যায়ে যে শাস্তিগুলো হয়, পরবর্তী উচ্চতর কর্তৃপক্ষ সেটি পুনর্বিবেচনা করে। সেজন্য আমিও মনে করি একটি সুযোগ থাকতে হবে, যে কোন ধরনের মামলা হলে সেটি উচ্চতর কোর্টে যেতে পারবে। অর্থাৎ serious type-এর।

আর নিয়মিত কৃংখলা কোর্ট হলে সেনাবাহিনীর কোর্টই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। আমি বলছি যে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী যেন আমাদের রুলটি পরিবর্তন করা হয়। তাহলে এটি আমাদের জন্য সঠিক হবে।

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (কমিশন সদস্য): আমার একটি ছোট্ট প্রশ্ন আছে। আপনি বার বার বলছেন যে, law reform করার কথা। আপনি বলছেন, আগেও কমবেশি হয়েছে। কিন্তু গত ১৬ বছরে সবচেয়ে বেশি হয়েছে। তাই আমি জানতে চাচ্ছি যে, আগে যখন হয়েছে আপনারা আইনসমূহ সংস্কারের জন্য কোনো উদ্যোগ নিয়েছিলেন কি না? similar, dissimilar, grater, indegree আপনি বলেছেন এই ১৬ বছরে, আপনারা কি এর আগে কোনো উদ্যোগ নেননি, to challenge this statuesque?

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান নাসির (জাস্টিস ফর কমরেডস,জেএফসি): এ বিষয়টি আগে যেটি হতো ৫ বছর সময়ে একটি সরকার ক্ষমতায় আছে, সে বিরোধী পক্ষের অফিসারদের চাকুরি থেকে বের করত। আবার যখন সরকার পরিবর্তন হয়েছে তারা এসে আবার তাদেরকে reverse করেছে।

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (কমিশন প্রধান) : এটি কি norm?

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান নাসির (জাস্টিস ফর কমরেডস,জেএফসি): না না। Norm, it is a bad practice. আগে যে সংখ্যাটা ছিল ৫ বছরের একটি রাজনৈতিক সময়ে, এই সংখ্যাটি ছিল হয়ত ৩০ জন, ৪০ জন বা ৫০ জন। Most of the cases এটি

ছিল সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে। তাদেরকে remove করে সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে আনা হত। কিন্তু এবার দেখা গেছে আমি যেহেতু চিরস্থায়ীভাবে দেশকে নিয়ন্ত্রণ করব, সুতরাং যে ছেলেটা বিরোধী, একেবারে কুঁড়ি থেকে আমি তাকে ধ্বংস করে দেব, যে উপরে উঠে আমার জন্য risk হতে পারে। গত ১৫ বছরে যেটি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। যে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পর্যায়ে Sword of Honour ইউনিটে এসেছে, এক বছরের মধ্যে তাকে বের করে দিয়েছে। যে এ বেটা বেশি কথা বলে সবসময়। সে ২টি কোর্সে গেছে খুব ভালো করে এসেছে। একে রাখা যাবে না। সবচেয়ে মজাদার হচ্ছে ডিফেন্স পার্সোনালদের জন্য ৬ বছর হচ্ছে বিয়ের বয়স। এটি অতীতেও যেটি হয়েছে, কেউ যদি সোস্যাল কারণে বিয়ে করতে বাধ্য হয় তাকে একটু সতর্ক করে, এটা করো না। আমি আমার সুযোগ সুবিধাগুলো পাব না। That can be the rule. আমরা দেখলাম যে, about 63 of this 400, they were the dismissed from service because forgetting married before 6 years. তাদের criteria হচ্ছে অন্য। They were that list to be thrown out. কারণটি কী, তুমি বিয়ে করেছ, যাও। বাড়ি চলে যাও। দেখা গিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে, স্ত্রী অভিযোগ করেছে যে আমার স্বামীর extra marital affair আছে। যখন 'কোর্ট মার্শাল' অর্ডার করা হয়েছে, স্ত্রী আর হাজির হয় না। অনেক বলার পরে যখন কোর্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন এসে বলে যে, আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমার খালা শিখিয়ে দিয়েছে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে। খালাটা কে? জেনারেল মঈন ইউ আহমেদের স্ত্রীর বড় বোন। খালা বলেছে আমার স্বামীকে তালাক দিতে হবে, আমি অভিযোগ করে দিয়েছি। সে চাকুরিচ্যুত হয়ে গিয়েছে। অথচ মামলাটি নিষ্পত্তি হয়েছে। তার কোর্টে হাজির হতে হয় এবং ৯টায় কোর্ট বসে। সে ট্র্যাফিক জ্যামে পড়ে সাড়ে ১০টায় কোর্টে হাজির হয়েছে। দেড় ঘণ্টা দেরিতে আসার জন্য তার চাকরি চলে গিয়েছে। অর্থাৎ মূল মামলা কিন্তু অপ্রমাণিত। এই বিচার কিন্তু সিভিল কোর্টে কখনও হয় না। আমি অপ্রমাণিত হলে I go back to service. যেহেতু সে কারও কাছে সুবিচার চাইতে পারে না, রিভিউ চাইতে পারে না, এইভাবে কোর্ট পরিবর্তন করে, তদন্ত করে প্রমাণিত হয়নি, তদন্ত করে পায়নি, আরেকজনকে তদন্তকারী করা হয়, সেও পায়নি, আরেক জনকে হুমকি দেয় যে তোমার পদোন্নতি আছে তুমি এটি কর, তা না হলে কিন্তু তুমি পদোন্নতি পাবে না। এরকম খুবকম অফিসার আছে যে তার পদোন্নতি ত্যাগ করবে। ফলে সে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার পক্ষে কাজ করে। সে তার নিজের চাকরি বাঁচানোর জন্য করে দেয়। ঐভাবেই তাকে নির্ধারণ করা হয় যে তার কথা শুনবে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ(কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। সময়ের জন্য আমাদের এখন wrap up করতে হবে। একটি অনুরোধ, আপনারা একটি লিখিত দিয়েছেন তার ৪নং পৃষ্ঠাটি আমি লক্ষ্য করেছি, আপনারা উল্লেখ করেছেন যে, আন্তর্জাতিকমানে আনার জন্য। আপনারা ৩টি দেশের কথা উল্লেখ করেছেন। USA, UK and India. এই লিখিত বক্তব্যটি আমাদের কাছে থাকছে। বিশেষ করে যেহেতু আন্তর্জাতিক মানের কথা বলছেন, আপনারা কি আরেকটু সুনির্দিষ্ট করে বর্ধিত আকারে একটি লিখিত প্রস্তাব আমাদেরকে দিতে পারেন কি না আগামী ২/১ দিনের মধ্যে? এটা সম্ভব। আপনারা যেটি বলেছেন এবং আমরা যা বুঝেছি, এছাড়া আমি আপনাদের লেখাটি পড়া থেকে যা বুঝেছি তা হলো অন্য দেশে আপনাদের জানামতে আন্তর্জাতিক মানটি আমাদের দেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৫-এর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। সেটিতে এক ধরনের বিরোধ আছে, সাংঘর্ষিক। সেক্ষেত্রে সেই উদাহরণগুলো যদি আমরা referenceসহ পাই, তাহলে আমাদের কাজের জন্য সুবিধা হবে। আপনাদের বক্তব্যের সারাংশটি ডকুমেন্ট হিসেবে থাকছে কমিশনের রেকর্ডে। আপনারা দীর্ঘদিন ধরে এটি নিয়ে কাজ করছেন, সেহেতু আপনাদের জন্য সময়টি স্বল্প হলেও খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই ডকুমেন্টের এই অংশটুকুর বিষয়ে বিস্তারিত করে আমাদেরকে ই-মেইলেও পাঠিয়ে দেতে পারেন, যাতে মনে হয় এট একটি extend version. তাহলেই যথেষ্ট হবে। আপনাদেরকে যে চিঠি পাঠানো হয়েছে সেখানে একটি ই-মেইল আছে, সেই ই-মেইলে পাঠিয়ে দিলে আমাদের জন্য খুব সহায়ক হবে বিষয়টি বুঝার জন্য।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমান (জাস্টিস ফর কমরেডস,জেএফসি): বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। Sir, we are really proud of you and your team. I know many things about you. I will take our together to discuss about your professionalism and your knowledge.

আমি প্রথমেই শুরু করতে চাই, USA-এ বিগত নির্বাচনের সময় যখন ডোনাল ট্রাম্প এর টিম যখন হোয়াইট হাউজে ঢুকল, তখন তাদের Joint chief of Army staff he gave his speech delivered with five minutes. He only told, "we take oath to the constitutions not to the individual". Every one we know. Sir I was commissioned in 1986. আমি অনেক ups and down দেখেছি। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর যখন এরশাদের পতন হয়, তখন আমি ঢাকায় ছিলাম। আমি তখনকার পতন দেখেছি। এরপর ১৯৯১ সালে আমরাই কিন্তু নির্বাচন করেছিলাম। আমরাই main force ছিলাম। আমি তখন ঢাকার একটি ইউনিটের একজন ক্যাপ্টেন ছিলাম। গত শাসন ব্যবস্থায়ও দেখেছেন কীভাবে army has to take over. This is the force. It is a national force. Please remember, it

is a national force is not the individual force. So, this force has to be the purpose fully use for the nation. So, no one should be able to use it for their own purpose. Change, we have the scope. আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে একটি বড় ধরনের সুযোগ দিয়েছে। আমরাতো সবাই আশাহত হয়ে গিয়েছিলাম যে আমরা বোধ হয় এ থেকে রেহাই পাব না। যেহেতু আল্লাহ আমাদের সুযোগ দিয়েছে, সে জন্য এখানে যে বিষয়গুলো রয়েছে, যা আমাদের স্যারও বলেছেন, এটি বিশ্বমানের করে নিতে হবে যাতে করে আর পিছনে তাকাতে না হয়। আমি সত্য কথাটি বললে, সত্য কাজটি করলে যেন আমাকে বের করে না দেয়। আর স্যার যেটি বলেছেন, কত অমানবিক যে আমি এখন বাসার ভিতরে আছি, আমাকে বলছে রাত ১০ টার মধ্যে তোমাকে বাসা খালি করে দিতে হবে। I have my children, I have my wife and I have my parent with me. There were many things. Please take seriously because it's a national force. এই ফোর্সটিকে uphold করার জন্য, যে কোনো সংকটে যাতে ব্যবহার করতে পারে। Back to the **১৯৭১**, আপনি historian আমি জানি। **১৯৭১** সালে first revolt করে this is the force, second Bengal Rajendrapur. This force, we have to think, that is a force of everyone. National crisis -এর সময় আমরা পরিক্ষিত। আপনি দেখেছেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আমাদের যে কর্মদক্ষতা, পৃথিবীর সেরা কর্মদক্ষতা দেখিয়েছি, স্যার। UN-এ আমাদের সেরা কর্মদক্ষতার নজির আছে। এটি পরীক্ষিত। এখানে আমার বলার কিছু নেই। আপনারা জানেন, শুধু মনে করিয়ে দেওয়া। কাজেই এই ফোর্সটিকে ধরে রাখতে হবে। যাতে কারো ব্যক্তিগত কাজে এটিকে কেউ ব্যবহার করতে না পারে। That is my expectation.

Thank you very much.

অধ্যাপক আলী রীয়াজ(কমিশন প্রধান): আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। স্বল্প সময়ের অনুরোধে আপনারা আমাদের এখানে এসেছেন। আপনাদের অনুমতি পেলে এখন আমি এখনকার অধিবেশন শেষ করব।

ধন্যবাদ।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

অষ্টাদশ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ০৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল ১১.৩০ থেকে ২.০০ পর্যন্ত

অংশীজনের তালিকাঃ

১। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনঃ-

(ক) জাহিদ আহসান

(খ) আরিফ সোহেল

(গ) আনিকা তাহসিনা

২। জাতীয় নাগরিক কমিটিঃ-

(ক) আখতার হোসেন

(খ) সামান্তা শারমিন

(গ) সারোয়ার তুষার

(ঘ) অ্যাডভোকেট মুকুল মুস্তাফিজ

(ঙ) সালেহউদ্দিন সিফাত

(চ) আতিক মুজাহিদ

(ছ) অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা।

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকাঃ

১।	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক	কমিশন প্রধান
২।	অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	জনাব ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল	সদস্য
৪।	অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫।	জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল	সদস্য
৬।	জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক	সদস্য
৭।	জনাব মুসতাইন বিল্লাহ	সদস্য

কার্যবাহের রিপোর্ট প্রস্তুতকারকঃ

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহের রিপোর্ট

কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : আজকের এই অধিবেশনে জাতীয় নাগরিক কমিটি এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিত থাকার কথা। ইতিমধ্যে জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ পথে আছেন। আশা করি কিছুক্ষণের মধ্যে তারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন। প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে আমি একটি স্ট্যান্ডার্ড বক্তব্য দেই। সেটি উল্লেখ করব। পাশাপাশি আজকের অধিবেশনটিকে আমরা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। সেটি আমি সকলকেই স্মরণ করিয়ে দিই।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রিয়াজ, আমি এই সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে, সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আমরা আপনাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি এবং খুব কম সময় দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দিয়েছেন। সেজন্য কমিশন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি আপনাদের অবদানের জন্যে।

গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের আপনারা অংশীজন। আপনারা নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি। আজকের এই অধিবেশনের শুরুতেই আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করব সেসব শহিদদের এবং যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করব। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় প্রদান করবেন।

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আপনারা এই গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিলেন, অংশগ্রহণ করেছেন। সে কারণে নিঃসন্দেহে সংবিধানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কিছু বলার আছে। অনেক প্রস্তাব আছে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা বিবেচনা করে আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে, আপনারা ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে প্রথম বক্তব্য উপস্থাপন করলে আমরা এ নিয়ে আপনাদের সাথে কথাবার্তা বলতে পারব। পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত মতামত আমাদের কাছে লিখিতভাবে দিলে কমিশনের জন্য সহায়ক হবে। আপনারা হয়তো জানেন যে, এখানে কনসালটেশন প্রসেসে যে-সমস্ত বক্তব্য, সেগুলো রেকর্ড করা হচ্ছে। আমরা আশা করছি যে, কোনো এক সময় কমিশনের পক্ষ থেকে সেগুলো সর্বসাধারণের জন্য repository হিসেবে আমরা এগুলো উন্মুক্ত করে দিতে পারব। যাতে কী আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা ছিলাম, সেটি বোঝা যায়। বক্তব্যের শুরুতে আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে, প্রথমে আপনারা সংগঠনের সকলের পরিচিতি দিয়ে শুরু করলে আমাদের রেকর্ডের জন্য সুবিধা হবে। সামান্তা শারমিন, আপনি যদি সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন।

জনাব সামান্তা শারমিন (জাতীয় নাগরিক কমিটি) : সকলকে শুভ সকাল এবং আস্‌সালামু আলাইকুম।

আমরা জাতীয় নাগরিক কমিটি থেকে এসেছি এবং আমাদের ৭ সদস্যের একটি দল আজকে উপস্থিত হয়েছি। আমি সামান্তা শারমিন। আমি জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখপাত্র।

[তিনি জাতীয় নাগরিক কমিটির উপস্থিত সকল-সদস্যবৃন্দকে পরিচয় করিয়ে দেন।]

আজকে আমরা আমাদের প্রস্তাবনা নিয়ে এখানে আলোচনা করতে এসেছি। আমাদের প্রস্তাবনা লিখিতভাবে নিয়ে এসেছি। আমাদের পক্ষ থেকে প্রথমে আলোচনা শুরু করবেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য এবং প্রস্তাবনা তৈরিতে যাঁর নেতৃত্বে আমরা কাজ করেছি জনাব সারোয়ার তুষার।

জনাব সারোয়ার তুষার (জাতীয় নাগরিক কমিটি) : সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, আপনারা আমাদেরকে এখানে এসে সংবিধান নিয়ে আমাদের যে ভাবনা সেটি তুলে ধরার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি আগে একবার এসেছিলাম। আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আজকে আমি আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে কথা বলব। আপনাদের আমন্ত্রণ পাওয়ার পর থেকে নয় সদস্যের একটি টিম কাজ করেছিলাম।

সবাইকে আমরা এখানে রাখতে পারিনি। তবে আশা করি, তারা এটি বুঝবেন যে আমরা তাদের হয়েও প্রতিনিধিত্ব করছি। আমাদের এই সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাবগুলো আপনারা দেখতে পাবেন, যেটি আমরা একটু পরে আপনাদের কাছে লিখিতভাবে হস্তান্তর করব। এখানে আমাদের মূল ব্যাপারটি ছিল, এই গণঅভ্যুত্থানের আগে থেকেই বাংলাদেশের সমাজে সংবিধান নিয়ে যে কথাবার্তা বা যে আলোচনাগুলো ছিল, বিদ্যমান সংবিধানে যে সমালোচনাগুলো ছিল, সেগুলোর ব্যাপারে আমাদের যে সচেতনতা এবং রাজনৈতিক বোঝাপড়া তার একটি রিফ্লেকশন আপনারা এখানে দেখতে পাবেন। অভ্যুত্থান হওয়ার পরে এই সংবিধানের ব্যাপারে আমরা যে আরও একধাপ এগিয়ে গেছি, সংবিধানের সমালোচনার ব্যাপারে, সেটিরও একটি রিফ্লেকশন আপনারা এর মধ্যে পাবেন। কারণ এই অভ্যুত্থানের আগে সাধারণত সংবিধান সংস্কারের কথা বলা হতো। বিদ্যমান যে সংবিধান আছে, সেটির সংস্কারের কথা বলা হতো। যেটি তখন অনেক পক্ষকেই, বিশেষত রাজনৈতিক দলগুলোকে বোঝানো খুব কঠিন হতো যে, সংবিধান আসলে সংস্কার করা যায়, তারা এটি মানতে চাইতেন না। Thanks to be July surprising. কিন্তু এখন সংবিধান সংস্কার কথাটি অনেক কম মনে হচ্ছে। আর যারা বিদ্যমান সংবিধান রাখতে চাচ্ছে, তাদেরকে তো আর প্রাসঙ্গিকই মনে হচ্ছে না। আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় প্রথমেই আমরা যেটি বলেছি, সেটি হচ্ছে, বিদ্যমান সংবিধানের সংস্কার নয়, এটা একেবারেই completely নতুন একটি সংবিধান করতে হবে। কারণ আমরা মনে করি যে, এই সংবিধান আর সংস্কার করার মত অবস্থায় নেই। ফলে একটা completely নতুন সংবিধান হতে হবে। এটি হচ্ছে আমাদের প্রথম কথা। আমি সবগুলো পড়ব না। যেগুলো আমাদের মূল কথা, সেগুলো আমি শুধু এখানে উল্লেখ করব। আমার ১৫ মিনিট সময় লাগবে না। আর ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আমি আমার টিমের আরেকজন সদস্য অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা আছেন। একটু পরে তারও হেল্প নিব। যেমন: আমরা বলেছি মুক্তিযুদ্ধের যে ঘোষণাপত্র আছে, আমাদের এই ঘোষণাপত্রকে সংবিধানের preamble-এ যুক্ত করতে হবে। বিদ্যমান যে preamble আছে, এটিকে বাদ দিতে হবে। আমরা সেকেন্ড রিপাবলিকের কথা বলে এসেছি। এটি আমাদের পলিটিক্সের একটি বড় বিষয়। সুতরাং জুলাই uprising-এর একটি proclamation জারি করে সেই proclamation- কেও preamble-এ যুক্ত করতে হবে ঘোষণাপত্রটিকে সাথে add করে দিয়ে। এবার আমরা বলছি যে, একটি নতুন Legal Frame Order বা LFO -এর অধীনে গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। গণপরিষদের মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন সম্পন্ন হলে উক্ত গণপরিষদই পার্লামেন্টে রূপ নেবে। অর্থাৎ এখানে দুটো ইলেকশনের দরকার নেই। একটি ইলেকশনই হবে, যারা জিতবেন, তারা প্রথমে সংবিধান প্রণয়ন করবেন এবং যতদিন তারা সংবিধান প্রণয়ন করবেন, করার পরে ঐ গণপরিষদ থেকেই আইনসভা তথা পার্লামেন্টে রূপ দেওয়া যেতে পারে। এটি আমাদের প্রস্তাব। আমরা আরেকটি বিষয়ে বলেছি, সেটি হলো, এই সংবিধান সংস্কার কমিশন বিভিন্ন অংশীজনের মতামত নিচ্ছেন এবং মতামতের ভিত্তিতে তারা একটা খসড়া প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠাবে। এটিকেই গণপরিষদ যেটি গঠিত হতে যাচ্ছে, তার মূল দলিল বা ভিত্তি দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কারণ গণপরিষদ তো শূন্য থেকে কথা শুরু করতে পারবে না। এই যে তিন মাস সংবিধান সংস্কার কমিশন কাজ করছে এবং আমরা বিভিন্ন অংশীজন মতামত দিচ্ছি। এটিকে যদি acknowledge করতে হয়, তাহলে সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি হচ্ছে এটিকে গণপরিষদে পাঠাতে হবে এবং তার ভিত্তিতে গণপরিষদ সদস্যরা বিতর্ক করে একটা নতুন অবস্থায় পৌঁছাবে। এরপরে আমাদের কথার মধ্যে একটি প্রধান কথা হচ্ছে যে, বাংলাদেশের নাগরিকদের আইনের দ্বারা বাংলাদেশি হিসেবে বলা উচিত। আর সংবিধানে গণসার্বভৌমত্ব, এই কথাটির acknowledgement থাকতে হবে। আপনাদের সংবিধান সংস্কার কমিশনের একজন সদস্যকে দেখতে পাচ্ছি না। তার একটি খুব ইন্টারেস্টিং argument আছে, যেটিতে আমি অনেক convinced. ড.শরীফ ভূইয়া, তিনি সাংবিধানিকতার একটি তর্ক করছিলেন। আমরা মনে করি যে, এই সাংবিধানিকতার তর্কের মধ্য দিয়ে আমাদের একটি অবস্থান হচ্ছে যে, এই বিদ্যমান সংবিধান আসলে অসাংবিধানিক। আর গণঅভ্যুত্থান সাংবিধানিক। আমাদের সাংবিধানিকতার যে আইডিয়া আছে, সেটি সম্পর্কে আমাদের যে বোঝাপড়া আছে, তার ভিত্তিতে বলছি এবং সার্বভৌমত্বের আইডিয়াটি কনস্টিটিউশনে থাকা উচিত। তাতে করে ভবিষ্যতে আমরা যে গণতান্ত্রিক সংবিধান করব, সেই সংবিধানের মাধ্যমে যারা দেশ পরিচালনা করবেন, তারাও যদি স্বৈরাচারী কিংবা ফ্যাসিবাদী হয়ে যায়, তাহলে যেকোনো ধরনের গণঅভ্যুত্থান কিংবা আন্দোলন যে আসলে legitimate, সেটি সংবিধান দ্বারাই তখন আমরা validated করতে পারব। এরপর আমরা বলেছি যে, গণভোট থাকতে হবে সংবিধানে। আইনসভায় কিংবা পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশ থাকলেই কেউ কোনো সংবিধান সংশোধন করতে পারবে না। সংবিধান সংশোধন করতে হলে গণভোটের মাধ্যমে করতে হবে।

আমরা পাঁচটা মূলনীতি প্রস্তাব করেছি। বিদ্যমান যে মূলনীতিগুলো আছে, সেগুলোকে আমরা মনে করি যে, এগুলো থাকা উচিত না। কারণ এগুলো দলীয় মূলনীতি। সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার যেটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে ছিল। এছাড়াও নাগরিক অধিকার এবং গণতন্ত্র–এই পাঁচটি। তারপরে আমরা রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে বলেছি যে, দুইবারের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবে না এবং একজন রাষ্ট্রপতি পরবর্তীতে আর কখনো প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। এরপর আমাদের উল্লেখযোগ্য যেগুলো আছে ,তার মধ্যে

একটি হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবেন। এছাড়া আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেবেন। অন্যান্য সাংবিধানিক পদও আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দিতে পারবেন। রাষ্ট্রপতির কাস্টিং ভোট থাকবে এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য সংসদের উভয় কক্ষের সভায় পাস হওয়া প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে আসতে হবে। নিম্নকক্ষের অনুপস্থিতিতে কেবল উচ্চ কক্ষ প্রস্তাব পাঠাতে পারবে। জরুরি অবস্থার সময় মৌলিক অধিকার রদ করা যাবে না। এখন এটি মনে হতে পারে যে, জরুরি অবস্থার কী অর্থ থাকে? এই কথাটিতে আপনারা দেখতে পারেন আমাদের একটি পলিটিক্যাল অবস্থান যে, আমরা যেন জরুরি অবস্থা কখনো জারি করতে না হয়, সেই ধরনের পরিস্থিতি যেন রাষ্ট্রকে না পড়তে হয়, সেটিই আসলে এক ধরনের এসার্ট করার একটি চেষ্টা যে, জরুরি অবস্থা যদি ডাকতেও হয়, মৌলিক অধিকার যেন হরণ করা না যায় । কারণ আমরা দেখেছি যে, জরুরি অবস্থা যতটা না জরুরি অবস্থা থাকে, তার চেয়ে বেশি থাকে যখন কোনো পরিস্থিতি একটি সরকার dill করতে পারে না, তখন তারা নাগরিক অধিকার খর্ব করার জন্য সকল ধরনের সভা, সমাবেশ,গণতান্ত্রিক অধিকারকে বন্ধ করতে চায়। এজন্যই আসলে জরুরি অবস্থা ডাকা হয়। সেটি যদি ডাকেও আমরা বলতে চাচ্ছি যে, সেই সময়েও নাগরিকের যে মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধান স্বীকৃতি দেয়, সেগুলো অক্ষত্ন থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নে আমরা বলেছি যে, আমাদের একটি পরিষ্কার অবস্থান যে, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ব্যাপকভাবে খর্ব করা দরকার এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে আসলে কোনোভাবেই আটকানোর কোনো রাস্তা নেই। আমাদের প্রস্তাবের মধ্যে সংবিধানে যেন প্রধানমন্ত্রীকে সংবিধানের অধীন accountable করা যায়, সে-রকম কিছু প্রস্তাব আছে। তার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে, যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন, তিনি দলের প্রধান হতে পারবেন না। আরেকটি হচ্ছে, পরপর দুইবার না; জীবনে কেউ দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না। একজন মানুষ দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না। অনেক রাজনৈতিক দল পরপর দুইবার বলতে চাচ্ছে। কিন্তু আমরা এর ফাঁকিটা বুঝতে পারি। ফলে জীবনে দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না এবং সাংবিধানিক পদে আসীন কাউকে অপসারণ করার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকবে না। ৭০ অনুচ্ছেদের ব্যাপারে আমরা বলেছি যে, ৭০ অনুচ্ছেদ একেবারে বাতিল করার দরকার নেই। কিন্তু এটির কঠোরতা খর্ব করতে হবে। তার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে যে, ফ্লোর ক্রসিংয়ের যে কথাটি বলা হয়, দলের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট দেওয়া যাবে না। এছাড়া সংসদ-সদস্যরা যেকোনো ব্যাপারে তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রয়োগ করতে পারবেন। আমাদের সবচেয়ে বেশি ambitious প্রস্তাব, সেটি হচ্ছে সরকারের মেয়াদ চার বছর হতে হবে। পাঁচ বছর নয়। ক্যাবিনেটের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে, প্রধানমন্ত্রী এখন যেভাবে আছে অনুচ্ছেদ ৫৫-তে। সেটির একটু পরিবর্তন করে আমরা বলতে চাচ্ছি, তিনি আসলে First among the equals. আমরা বাংলায় বলতে চাচ্ছি যে, সমব্যক্তিদের মধ্যে তিনি প্রথম। এর বাইরে তাঁকে সেখানে আলাদা priority দেওয়ার দরকার নাই। তিনি ক্যাবিনেটের সকলের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। যদি তিনি কোনো কেবিনেট মেম্বারকে অপসারণ করতে চান, তাহলে তাঁকে আসলে সংসদের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়ার অধিকারী হবেন। তবে তা পালন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বাধ্য থাকবেন না। সেটি আবশ্যকীয় হবে না। অর্থাৎ এটি একটি non-binding effect. তিনি শুনবেন পরামর্শ। এখন যেভাবে পরামর্শটি আছে, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শই আসলে হুকুম। এটি পরিবর্তন করে আমরা বলতে চাচ্ছি যে, প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দিতে পারবেন, কিন্তু সেটি রাষ্ট্রপতির বিচার বিবেচনা করার সুযোগ থাকবে। এখন তো সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর অভিশংসনের কোনো ব্যবস্থা নাই। আমরা এক্ষেত্রে বলছি যে, কোনো আদালতই প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণের রায় ঘোষণা করতে পারবেন না। মানে আদালতের কাছে এটি থাকা উচিত হবে না। সংসদ কর্তৃক আস্থাভোটে প্রধানমন্ত্রী অপসারণ হতে পারবেন। এটাই একমাত্র বৈধ উপায় হবে। কোর্ট যদি এটি করতে চায়, তাহলে সেটি আসলে এক ধরনের জুডিশিয়াল ক্যু হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। নির্বাহী বিভাগ পরিচালনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। তবে নিয়োগের ক্ষমতা থাকবে না প্রধানমন্ত্রীর হাতে। যে কোনো নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা তো দুই কক্ষ বলেছি। ফলে উচ্চকক্ষের হাতে থাকবে। নিম্নকক্ষ বা প্রধানমন্ত্রীর কোনো অনুমতি এক্ষেত্রে আবশ্যকীয় হবে না। পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের কথা বলেছি। উচ্চকক্ষের নাম জাতীয় পরিষদ এবং নিম্নকক্ষের নাম আইনসভা করার প্রস্তাব আমরা করেছি। উচ্চকক্ষ রাষ্ট্রপতির অধীনে এবং নিম্নকক্ষ প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থাকবে। আমরা দ্বিকক্ষের ক্ষেত্রে যেটি বলেছি, এটি হচ্ছে একটি mixed election. আমরা যেভাবে দ্বিকক্ষ ভাবি, সেটির সাথে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। কারণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো ইদানীং দ্বিকক্ষের কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের কাছে মনে হচ্ছে, তারা এটি একটি rhetoric আকারে ব্যবহার করছে। যেহেতু সমাজে কথাটা আছে, আমরা এটি গ্রহণ করলাম। এরকম একটি ব্যাপার। তাদের প্রস্তাবিত দ্বিকক্ষ আমাদের কাছে মনে হচ্ছে এটি এখন যেভাবে সংরক্ষিত মহিলা আসন আছে, অনেকটা সেরকম। আসলে তাদের যারা বঞ্চিত হবে কিংবা তাদের ওই পন্থি যেসমস্ত বুদ্ধিজীবী কিংবা সিভিল সোসাইটির মেম্বার থাকবে, তাদেরকে একটি জায়গা দেওয়া। এর বেশি কিছু মনে হচ্ছে না। আমাদের কথা হচ্ছে, দ্বিকক্ষের ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষে আনুপাতিক হারে নির্বাচন হতে হবে PR system-এ। আর নিম্নকক্ষে এখন যেভাবে হয় সংসদীয় আসনে। এই মিক্সড ইলেকশন না হলে যদি উভয় কক্ষে PR হয় কিংবা উভয় কক্ষে যদি সংসদীয় আসনে হয়, তাহলে এটি আসলে কাজ করবে না। এ কারণে আমরা একটি mixed election-এর

কথা ভেবেছি। যেখানে ১০০ আসন থাকতে পারে উচ্চকক্ষে। এখন যেভাবে ৩০০ কিংবা ২০০ আসন থাকতে পারে নিম্নকক্ষে। যে দল নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে আসনের ভিত্তিতে, তাদের যে ভোট পার্সেন্টেজ ৩৮ বা ৩৯ পার্সেন্ট, যদি ১০০টি আসন থাকে তাহলে one percent against-এ একটি করে sit। এভাবে করে উচ্চকক্ষের আসন বরাদ্দ করা যেতে পারে এবং তারা আগেই জানাবে যে আমাদের উচ্চকক্ষের মেম্বার হিসেবে আমরা এদেরকে ভেবেছি ১০০ জন। তারা তালিকা প্রকাশ করবে। এটি করার গুরুত্বটি হচ্ছে এই ধরনের যেমনঃ আমাদের মত যারা rising সংগঠনগুলো আছে বা যে দলগুলো আছে, এক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে অনেক যোগ্য লোক আছে যারা আসলে আসনভিত্তিক যে নির্বাচন, সেটি হলে কখনোই আমরা সংসদে যেতে পারব না। কিন্তু আমরা মনে করি যে, আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যাদের আসলে পার্লামেন্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে। কিন্তু সেটি সম্ভব, যদি পিআর সিস্টেম থাকে। আমাদের দল থেকে যে ১০০ জনের নাম ঘোষণা করা হবে, তার মধ্যে ক্রমানুসারে তারা যেতে পারবে এই কারণে এবং তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে পার্লামেন্টে। এই কারণে আমরা এই প্রস্তাবটি করছি। কিন্তু সংসদীয় আসন নিয়ে আপনারা জানেন যে, কীভাবে ইলেকশন হয়। সেখানে টাকা এবং আরও অন্যান্য factor কাজ করে। জনপ্রিয়তা মানে যেটি আসলে পপুলিজম থাকে এক ধরনের। এই পপুলিজম-এর হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য অন্তত সংসদের আপার হাউজটিতে ঐ ধরনের লোকগুলোর বেশি প্রাধান্য থাকা উচিত যাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, আইন শাস্ত্র, সংবিধান ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যাপক জানাশোনা আছে। তাদের জন্য এই PR-টি খুব important role play করতে পারে। আমরা বলেছি যে, উভয় কক্ষে পৃথকভাবে পাস হওয়ার পরেই আইন-প্রণয়ন করা যাবে। আইনসভা ও জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব বছরে দুইবার জনগণের সামনে হাজির করতে হবে। সম্পদ বৃদ্ধির উপায় যৌক্তিকভাবে হয়েছে কিনা, তা দুর্নীতি দমন কমিশন নির্ধারণ করবে। সংসদ-নেতার ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে, প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা এবং রাজনৈতিক দলের প্রধান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন। সংসদীয় কমিটি গঠনে নিজ সংসদীয় দলের পক্ষে তিনি প্রস্তাব আনবেন এবং সংসদ তা চূড়ান্ত করবে। বিরোধীদলীয় নেতার ক্ষেত্রে বলেছি, এটি আমাদের আরেকটি ambitious proposal যে, তারা ছায়া মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারবে। যেটি শ্যাডো কেবিনেট বলা হয়ে থাকে। এটা বিরোধীদলের নেতৃত্বে গঠন করা যাবে এবং সংসদীয় কমিটিগুলোতে তারা সরকারের নীতির সমালোচনা করতে পারবে। এখন এ পর্যায়ে আমাদের যে বিচার বিভাগ এবং প্রধান ন্যায়পালসহ বাকি যে বিষয়গুলো আছে, সেগুলোর জন্য আমি আমাদের সম্মানিত সদস্য অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসাকে অনুরোধ করছি, এটি ব্যাখ্যা করার জন্য।

অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা (সদস্য, জাতীয় নাগরিক কমিটি) : ধন্যবাদ।

আসসালামু আলাইকুম।

আমরা বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে প্রথমেই যেটি বলেছি যে, বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে। আলাদা সচিবালয় থাকবে এবং এখানে নির্বাহী বিভাগের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। এটি থাকতে পারবে না এবং বিচার বিভাগের যে সচিবালয়, সেই সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী হিসেবে প্রধান বিচারপতিই দায়িত্ব পালন করবেন। এটি আমরা বলছি। আমরা দ্বিতীয় যেটি বলছি, সেটি হচ্ছে যে, একটি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল থাকবে। সে কাউন্সিলের সদস্য হবেন প্রধান বিচারপতি, আপিল বিভাগের দুইজন বিচারপতি এবং হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুইজন বিচারপতি। যার একজন অধস্তন আদালতের বিচারক থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং একজন যিনি আইনজীবী থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। এভাবে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ফরমেশনটি গঠিত হবে এবং তারাই মূলত বিচারক নিয়োগের জন্য যে প্রস্তাব, সেটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবেন। আমাদের যে বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামো, সেখানে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতির কাছে তিনি পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। আমরা এটিকে উল্টোভাবে বলছি যে, নতুন যে কাঠামো হবে স্বাধীন বিচার বিভাগের, সেখানে এই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল অ্যাপয়েন্টিং অথরিটি হিসেবে কাজ করবে এবং তারাই নামগুলো একটি আইনি কাঠামোর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবেন নিয়োগ প্রদানের জন্য। এরপরে আমরা যেটি বলছি যে, আপিল বিভাগে যখন alleviation হবে, তখন শুধু আপিল বিভাগের alleviation-এর জন্য যে বিচারকদের নাম আসবে তাদেরকে পার্লামেন্টের যে উচ্চকক্ষ অর্থাৎ সেই জাতীয় পরিষদে তাদের শুনানির মাধ্যমে তাদেরকে নিয়োগ প্রদান করতে হবে। আপিল বিভাগে বা সুপ্রিম কোর্ট যেটিকে বলছি। আমরা বলছি যে, এখন যেভাবে আমাদের জন্য আলাদা করে আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ নামে দুটি বিভাগ আছে, এভাবে বিভাগ থাকবে না। একটি সুপ্রিম কোর্ট থাকবে। যিনি চিফ জাস্টিস থাকবেন, তিনি সুপ্রিম কোর্টে বসবেন। এছাড়া হাইকোর্টর বেঞ্চ থাকবে সকল ডিভিশনে। এটি আমরা বলছি যে, সুপ্রিম কোর্ট নামে একটাই কোর্ট থাকবে। হাইকোর্ট নামে একাধিক কোর্ট থাকবে। তারা ডিভিশনে বসবে। কিন্তু আলাদা করে কোনো আপিল বিভাগ বা হাইকোর্ট বিভাগ এভাবে থাকবে না। যিনি প্রধান বিচারপতি থাকবেন, তিনি সুপ্রিম কোর্টে বসবেন। তাঁর নেতৃত্বে অন্যান্য বিচারপতিরা সুপ্রিম কোর্টে বসবেন, যেটি ঢাকায় বসবেন। এই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের ক্ষেত্রেই আমরা বলছি যে, তাদের alleviation-এর ক্ষেত্রে সরাসরি উচ্চকক্ষে, যেটি জাতীয় পরিষদে শুনানির মুখোমুখি হতে হবে। এরপরে আমরা বলছি যে, সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারপতিদের বিরুদ্ধে যদি

বিচারকাজ চলাকালীন সময়ে অর্থাৎ বিচার চলাকালীন সময়ে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তাহলে সেটির তদন্ত শুধু সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করবে। অন্য কোনো সরকারি সংস্থা বা কোনো পুলিশ বা অন্য কোনো অথরিটির করার ক্ষমতা থাকবে না। বিচার সংশ্লিষ্ট যদি ফৌজদারী বা অন্য কোনো অপরাধের দায়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে, তাহলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা করবে। আরেকটা মৌলিক কথা আমরা বলছি যে, যদি সংবিধানের কোনো সংশোধনী অথবা কোনো বিধান বা কোনো অনুচ্ছেদকে চ্যালেঞ্জ করে কোনো মামলা দায়ের হয়, সেই মামলা সরাসরি বৃহত্তর বেঞ্চে শুনানি শুরু করতে হবে। সেই মামলাটি এখন যেভাবে শুনানি শুরু হয়, একটা দ্বৈত বেঞ্চে writ jurisdiction হয়। আমরা সেটি বলছি যে, এরকম কোনো মামলা যদি আসে, যেখানে কোনো সংশোধনী অথবা কোনো ধরনের বিধান বা অনুচ্ছেদকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির শুরু থেকেই একটি বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করে দেবেন। ওই বেঞ্চেই সাংবিধানিক এই বিষয়গুলোর শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। এরপরে আমরা বলছি যে, অধস্তন আদালতের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং তাদের যে পদায়ন, বদলি এগুলো সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের অধীনে অর্থাৎ স্বাধীন বিচার বিভাগের অধীনে পরিচালিত হবে। আমরা বলছি যে, উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত অধস্তন আদালতকে প্রসারিত করতে হবে। এটি শুধু জেলা পর্যায় পর্যন্ত রাখা যাবে না। এছাড়াও আমরা হাইকোর্টের বেঞ্চের কথা বলেছি। যেটি সকল বিভাগে বেঞ্চ থাকতে পারবে এবং সুপ্রিম কোর্ট নামে একটি কোর্টই থাকবে। যেটি চিফ জাস্টিসের নেতৃত্বে বসবেন। আর পৃথক সেক্রেটারিয়েটের কথা আমরা ইতোমধ্যেই বলেছি যে, সেখানে আলাদা করে একজন সেক্রেটারি থাকবেন। তাদের যে পরিমাণ বাজেট দরকার হয়, সেটি আলাদাভাবে দিতে হবে। যাতে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ এই দেশে দাঁড়াতে পারে। প্রধান ন্যায়পালের কথা আমরা বলেছি যে রাষ্ট্রের একজন প্রধান ন্যায়পাল এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত আরও নির্দিষ্ট সংখ্যক ন্যায়পাল থাকবেন। তারা বিচারবিভাগ ছাড়াও অন্যান্য সাংবিধানিক পদের যে বিষয়গুলো আছে, সেই বিষয়গুলোর সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বা আইনানুগ বিধিসম্মতভাবে কর্মপ্রক্রিয়া সম্পাদন করেছেন কিনা; তা ন্যায়পাল তদন্ত এবং নিরীক্ষা করতে পারবেন। শুধু বিচার বিভাগের সুপিরিয়রিটির কারণে আমরা ন্যায়পালের এই ক্ষমতাকে বিচার বিভাগের উপর চাচ্ছি না। এটি আলাদাই থাকবে। এছাড়া প্রধান ন্যায়পাল বা ন্যায়পালদের অপসারণ এবং অভিশংসন জাতীয় পরিষদের উচ্চকক্ষে নির্ধারিত হবে। তিনি জাতীয় পরিষদ এবং তার অধীন যে কমিটিসমূহ থাকবে, তাকে জবাবদিহিতা করতে থাকবেন। মহাহিসাব নিরীক্ষক জাতীয় পরিষদে রিপোর্ট পেশ করবেন। হিসাব নিরীক্ষকদের যে কোনো সময় উচ্চকক্ষের কমিটি তলব করে শুনানি করতে পারবে। অর্থাৎ আমরা তাদের জবাবদিহিতা জাতীয় পরিষদের কাছে রাখার চেষ্টা করছি। আমরা মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলতে চাচ্ছি। আমাদের বিদ্যমান সংবিধানে যেভাবে যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপের কথা আছে কিছু কিছু মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো শর্ত সাপেক্ষে কোনো যৌক্তিক বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে না। মৌলিক অধিকার একেবারে নিরঙ্কুশ থাকতে হবে। এটিই আমাদের প্রস্তাবনা। স্থানীয় সরকারের ব্যাপারে আমরা বলেছি যে, স্থানীয় শাসন নয়, আইনসভার প্রভাবমুক্ত স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রয়োজন হবে। সেখানে রাজনৈতিক দলের যে জাতীয় প্রতীক রয়েছে, সেই প্রতীক অনুযায়ী নির্বাচন করা যাবে না। সংসদ-সদস্যদের দায়িত্ব থাকবে শুধু আইন-প্রণয়ন করার। এজন্য আমরা নামটাও প্রস্তাব করেছি আইনসভা। অর্থাৎ তারা এখন যেভাবে অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করেন, এমনকি স্থানীয় সরকার পর্যায়েও তারা যে প্রভাবটি রাখেন, সেটি যেন আইনগতভাবে খর্ব করা হয়। শুধু স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা যাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা আমরা রাখার জন্য বলছি। আমরা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারেও বলছি যে, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আলাদা সচিবালয় থাকবে এবং তাদেরকে নির্বাচনকালীন আলাদা বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। কমিশনার নিয়োগের জন্য আলাদা নীতিমালা বা আইন থাকবে। কমিশনার যারা নিয়োগ হবেন, নিয়োগের আগে তাদেরকে উচ্চকক্ষের Parliamentary hearing-এর মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমরা প্রস্তাব রাখছি। অর্থাৎ সরাসরি শুধু কোনো আইন বা বিধিমালার আলোকেই কাউকে সরাসরি নাম প্রস্তাব করে তাকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে ঘোষণা করা যাবে না। তাদের এই নিয়োগ অনুমোদন হওয়ার আগেই উচ্চকক্ষের hearing-এর সম্মুখীন হতে হবে। এরপরে আমরা বলছি যে, সরকারের নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপের বাইরে আনা গেলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার আর দরকার হবে না। তবে আগামী দুই নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে বলে আমরা মতামত প্রকাশ করছি। এ বিষয়ে আমরা প্রস্তাব পেশ করছি। কিন্তু আমাদের অবস্থান হচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদি আমরা উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারি, তখন আর নতুন করে আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা নিয়ে ভাবতে হবে না। এরপরে আমরা বলছি যে, সকল পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভোট গণনা করতে হবে। রেজাল্ট শিটে সকল পোলিং অফিসার ও স্থানীয় প্রার্থীদের এজেন্টদের স্বাক্ষর থাকতে হবে। আমরা মৌলিক একটা প্রস্তাব নতুন করে আনছি সেটি হচ্ছে, ভোটাধিকার প্রাপ্ত যেকোনো নাগরিক, যেকোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অর্থাৎ সংসদ নির্বাচনসহ অন্যান্য অনেক নির্বাচনে বয়সসীমা দিয়ে দেওয়া হয় পঁচিশ বছর বা নির্দিষ্ট একটি বয়স। আমরা এই বয়সসীমার পক্ষে না। আমরা চাচ্ছি যে, তরুণদের যে একটি আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে এবং তরুণরা আরও বেশি যাতে এই রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে, সেজন্য তাদের ক্ষেত্রে এই বয়সের embargo তুলে দিতে হবে। যিনি ভোটার হতে পারবেন, তিনিই যেকোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তিনি যদি নির্বাচনী

প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারেন, তিনি যেন রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। এটিই আমাদের প্রস্তাব। আরেকটি প্রস্তাব আমরা করতে যাচ্ছি, বিদেশে যারা রয়েছেন, প্রবাসী বাংলাদেশি, তাদেরকে ভোটাধিকার দিতে হবে এবং তাদেরকে ভোট দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। যাতে তারা সকল ধরনের নির্বাচন তথা স্থানীয় সরকার নির্বাচন বা জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন। সেই ব্যবস্থাটিও আয়োজন করতে হবে। আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের সদস্য-সচিব জনাব আখতার হোসেনকে। আমাদের অন্যান্য বক্তব্যগুলোর সমাপনী দেওয়ার জন্য।

জনাব আখতার হোসেন (জাতীয় নাগরিক কমিটি) : ধন্যবাদ সকলকে। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত, এই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে বাংলাদেশের লাখো মানুষ রাজপথে হাজির হয়েছিলেন। দুইহাজারের উপরে শহিদ এবং হাজার হাজার আহত, পঙ্গু এবং লাখো লাখো আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী, তাদের সকলের যে সম্মিলিত সুর বাংলাদেশে যাতে কোনোভাবেই অতীতের মতো কোনো ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা আর প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। সে ব্যাপারে মানুষের যে আগ্রহের জায়গাটি ছিল, সেই বিষয়টি নিয়ে জাতীয় নাগরিক কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। আজকে সংবিধান সংস্কার প্রশ্নে আমাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। আমরা কিন্তু বরাবরই একটি কথাই বলছি যে, বর্তমান যে সংবিধান আছে, এই সংবিধান ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাতিল হয়ে গেছে এবং এর জায়গায় নতুন করে আমাদের একটি নতুন সংবিধান প্রয়োজন। বর্তমানে যে সংবিধানটি আছে, এই সংবিধানের দিকে যদি আমরা তাকাই, এই সংবিধানের সজ্জা, এই সংবিধানের প্রকাশ এমন যেন এটি আওয়ামী লীগের কোনো একটি রাজনৈতিক দলিল। আমরা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দলিল থেকে আমাদের জনগণের যে সংবিধান, সেটিকে আমরা পৃথক করতে চাই। এ কারণে আমাদের একটা নতুন সংবিধান প্রয়োজন। আমরা গণপরিষদ নির্বাচনের কথা বলেছি। যাতে নতুন করে বাংলাদেশের মানুষ, তাদের যে অভিপ্রায়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, সেটিকে আমরা লিখিতরূপে একটি নতুন সংবিধানে পরিণত করতে পারি। আমরা বরাবরই মানুষের যে মৌলিক অধিকার আছে, সেই অধিকার অক্ষুন্ন রাখার কথা বলেছি। এমনকি জরুরি অবস্থাতেও যেন মানুষ তাদের মৌলিক অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত না হয়, সে ব্যাপারে আমরা আমাদের শক্ত অবস্থান ব্যক্ত করেছি। এমনকি বর্তমান সংবিধানে যে অবস্থায় আছে, সেখানে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান অর্থাৎ অর্থনৈতিক যে অধিকারগুলো আছে, সেগুলোকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি পর্যন্ত সেখানে দেওয়া হয়নি। নতুন যে প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে আমরা মনে করি, এই বিষয়গুলোকেও অর্থাৎ অর্থনৈতিক যে অধিকারগুলো আছে, সেগুলোকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। একই সাথে আমরা মনে করি রাষ্ট্রের যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আছে। এই তিনটি অঙ্গের মাঝে যেন ক্ষমতার ভারসাম্য থাকে। সে ব্যাপারে আমরা খুবই জোরারোপ করছি। আমাদের সংবিধানে বর্তমান যেটি আছে, সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে এমন সব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যার ভিতর দিয়ে তিনি স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন, ফ্যাসিস্ট হয়ে ওঠেন। বর্তমান সংবিধান একজন প্রধানমন্ত্রীকে ফ্যাসিস্ট প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, ফ্যাসিস্ট ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলার একটি মোক্ষম সুযোগ তৈরি করে রেখেছে। আমরা সে জায়গায় প্রধানমন্ত্রীর যে ক্ষমতা আছে, সেটিকে আমরা খর্ব করার পক্ষে। একই সাথে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। বর্তমান সংবিধানে যিনি রাষ্ট্রপতি আছেন, তাঁকে রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে গণ্য করা হলেও তাকে একজন titular head হিসেবে রাখা হয়েছে। তার আসলেই তেমন কোনো কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার কোনো কিছুই নেই। আমরা যে সংবিধান প্রস্তাবনা নিয়ে এসেছি, সেখানে রাষ্ট্রপতি; তিনি যেমন জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। একই সাথে তিনি কিছু ক্ষমতাও এক্সারসাইজ করতে পারবেন। আমাদের যারা তরুণ আছেন, সে তরুণরা যেন বাংলাদেশের স্থানীয় যে সরকারগুলো আছে, সে নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারে। অনূর্ধ্ব ৩০ যারা আছেন, তাদের জন্য আলাদা নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা। আলাদা পোস্ট, পজিশন তৈরি করার ব্যাপারে আমরা গুরুত্বারোপ করেছি। আমরা একটি কথা জোর দিয়ে বলি যে, বর্তমান ছাত্র-জনতার যে অভ্যুত্থান ঘটে গেছে, সেখানে বাংলাদেশের মানুষ নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কথা বলছে। পুরোনো যত ব্যবস্থাপনা আছে, সেগুলো থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে চাই। আমাদের জাতিগত পরিচয় নিয়ে আমাদেরকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগানো হয়েছে। বাঙালি, বাংলাদেশি, নানা ধরনের কথার ভেতর দিয়ে আমাদেরকে যেতে হয়েছে। আমরা স্পষ্ট করেই বলেছি যে, আমাদের জাতীয়তা এবং জাতিগত পরিচয়, আমরা বাংলাদেশি হিসেবে পরিচিত হতে চাই। এটিই আমাদের পরিচয় হবে। আমরা সংসদ শব্দের মধ্য দিয়ে আসলে এর কার্যাবলি কী, সেটি সম্পর্কে মানুষের আসলে তেমন জানবার বিষয়টি থাকে না। আমরা সংসদের দুইটি পার্টের কথা বলেছি। উচ্চকক্ষের কথা বলেছি এবং নিম্নকক্ষের কথা বলেছি। নিম্নকক্ষকে আমরা আইনসভা বলেছি। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো বা অন্যান্যরা যেভাবে প্রস্তাব করছেন উচ্চকক্ষের, সেখানে যেন টেকনোক্রেট পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ নির্বাচিত হবে। এরকম ধরনের একটি আভাস আমরা লক্ষ্য করি। আমরা তেমনটি না করে জনগণের সরাসরি ভোটে PR system-এ সংসদের উচ্চকক্ষে যাতে নির্বাচিত হতে পারেন এবং সংসদের উচ্চকক্ষের অনেকগুলো বিষয়ে আমরা check and balance-এর জন্যে কিছু ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষপাতিত্ব আমরা নিয়েছি। একই সাথে আমাদের যে বিচার বিভাগ আছে, বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে আমরা বলতে চাই, বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অ্যাপিলেট ডিভিশন এবং হাইকোর্ট ডিভিশন। আমরা এইভাবে রাখতে চাই না। সুপ্রিম

কোর্ট, সেটি একটা স্বতন্ত্র বডি হবে এবং হাইকোর্ট একটি স্বতন্ত্র বডি। কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যেকটি বিভাগে যেন হাইকোর্টের বেঞ্চ থাকে। যাতে করে মানুষ খুব সহজেই হাইকোর্টের কাছে আসতে পারেন। তাদের বিচার প্রাপ্তির যে অধিকার আছে, সেটি যাতে নিশ্চিত হয়। সেটি আমরা প্রস্তাব আকারে পেশ করেছি। একই সাথে আলাদা সচিবালয়ের কথা বলেছি এবং উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আমাদের যে অধস্তন আদালতগুলো আছে, সেগুলোকে সম্প্রসারিত করা হয়, সে ব্যাপারে আমরা প্রস্তাব রেখেছি। বিরোধীদলীয় যিনি নেতা হবেন, তিনি যেন ছায়া মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন। সে ব্যাপারেও আমাদের প্রস্তাব আছে। আমরা সব মিলিয়ে বাংলাদেশের মানুষ এই ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানে নতুন যে বন্দোবস্তের স্বপ্ন দেখেছে, সে স্বপ্ন যেন বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশের মানুষ যাতে নতুন একটি সংবিধান পায়। আমাদের যে অধিকারগুলো আছে, সে অধিকারগুলোকে আমরা যেন এই সংবিধানে দেখতে পাই এবং একই সাথে এই সংবিধান যেন কোনোভাবেই পরবর্তীতে বাংলাদেশের মানুষের অভিপ্রায়ের জন্যে বাধাস্বরূপ না হয়, এ কারণে আমরা popular sovereignty-র কথাও এই সংবিধানে যুক্ত করার জন্যে প্রস্তাব পেশ করেছি। আশা করছি, আমাদের এই প্রস্তাব ও অন্যান্য অংশীজনের প্রস্তাব জনগণের সামনে উপস্থাপিত হবে এবং এই প্রস্তাবগুলো একটি ভিত্তি হয়ে গণপরিষদের বিতর্কের মধ্য দিয়ে নতুন সংবিধান প্রণীত হবে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

আপনাদের এই প্রস্তাবগুলোর একটি লিখিত ভাষ্য আপনারা আজকে দেবেন। ফলে সেটির জন্য অগ্রিম ধন্যবাদ। তাতে আমাদের কাজের সহায়তা হবে। আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে। আমি এবং আমার সহকর্মীরা একটু পরে আসব। ইতিমধ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আমরা তাদের কথাগুলো শুনব। শোনার পরে কিছু প্রশ্ন ও ব্যাখ্যা হয়ত আমাদের আছে, সেগুলো আমরা তুলব। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে যারা যোগ দিয়েছেন আমরা আশা করছি যে, সংক্ষেপে আপনারা ২০ মিনিটের মধ্যে আপনাদের প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করলে সময়ের বিবেচনায় এবং প্রশ্নগুলো করার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সহায়ক হবে। প্রাথমিকভাবে আপনারা যদি আপনাদের পরিচয়টি দেন এবং তারপরে আপনাদের পক্ষ থেকে যিনি উপস্থাপন করতে চান, তিনি বলতে পারেন। আমি এখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানাব তাদের পরিচয় এবং তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য।

[অতঃপর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যগণ তাদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন]

জনাব আরিফ সোহেল (বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আমাদের প্রাথমিক প্রস্তাবনার ভাবনাগুলো উত্থাপন করব। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংবিধান সংস্কার কমিশনকে। আজকে যে উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে আমাদের কাছ থেকে সংস্কার প্রস্তাবনা নেওয়ার, সেটিকে আমরা যথোপযুক্ত মনে করছি। তবে আমরা এটি উল্লেখ করছি যে, এই কাজটি আরো দ্রুত এবং আরো আগে হলে হয়ত ভালো হতো। আমরা আজকে বেশ কিছু খসড়া ভাবনা নিয়ে এসেছি। কারণ আমরা মনে করি যে, কোনো লিখিত প্রস্তাবনা, অফিশিয়াল প্রস্তাবনা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে কমপক্ষে দিতে হলে সারা দেশের মানুষকে সম্পৃক্ত করে দিতে হবে। অন্ততপক্ষে সারাদেশের ছাত্রদেরকে সম্পৃক্ত করে সেই প্রস্তাবনাটি নিয়ে আসা উচিত। আমরা মূলনীতির দিক থেকে প্যানেল বেইজড কোনো প্রস্তাবনা তৈরি করার বিপক্ষে এবং এ কারণে সংস্কার কমিশনগুলো সংবিধান সংস্কার তো অবশ্যই। এছাড়া অন্যান্য সংস্কার কমিশনগুলো যেভাবে কাজ করছে, সেখানে আমাদের নীতিগত কিছু প্রশ্ন আছে, কিছু দ্বিমত আছে। প্রথমে বর্তমান সংবিধানে যে সংকট, সেই সংকটগুলো থেকে কীভাবে আমরা উত্তরিত হতে পারি। সেটি একটি প্রশ্ন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আমাদের বর্তমানে একটি রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী নির্মাণ করে সেটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যে ধরনের গঠনমূলক ব্যাপারগুলো দরকার, সেগুলোকে কীভাবে সংবিধানে নিয়ে আসা যায়? এই দুটো পয়েন্টে আমার মনে হয় যে, আমরা আলোচনা করতে পারি। প্রথম দিকে আমাদের সংবিধানে বেশ কিছু বিতর্ক আছে। যেটি ১৯৭২ সাল থেকে শুরু হয়েছে বৈধতার বিষয়ে। যেহেতু LFO-র অধীনে যে গণপরিষদ নির্বাচনটি হয়েছিল ১৯৭০ সালে, তারাই সংবিধান রচনা করেছেন। তাই এখানে বৈধতার একটি প্রশ্ন চলে এসেছে ১৯৭২ সাল থেকেই। আমরা মনে করি যে, এটি থেকে উত্তরণ প্রয়োজন এবং সংবিধানের মূলনীতি বা preamble এমন হওয়া উচিত, যেটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হবে মানুষের মধ্যে এবং এটি নিয়ে বৈধতার কোনো প্রশ্ন যাতে না উঠে। সেই জায়গা থেকে ২০২৪-এর যে গণঅভ্যুত্থান, সেই গণঅভ্যুত্থানকে একটি proclamation-এর মাধ্যমে বা ঘোষণাপত্র বা বিভিন্ন ফর্ম হতে পারে, সেটির legal frame কীভাবে হবে? আরও এক্সপার্ট যারা আছেন, তারা বলতে পারবেন। কিন্তু ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানকে যদি মূলনীতি হিসেবে ধরা হয়, ১৯৭১ এবং আমাদের পূর্ববর্তী যে সংগ্রাম আছে, সেগুলোকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং অবশ্যই তার ধারাবাহিকতা হিসেবে। তাহলে আমরা মনে করছি যে, সংবিধানের একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপ তৈরি হতে পারে এবং বৈধতার যে প্রশ্নটি বা সংকটটি আছে, সেটি থেকে উত্তরণ সম্ভব হতে পারে। পরবর্তীতে যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি, সেটি হচ্ছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর পদটিতে যে নির্বাহী ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে এবং সেখানে রাষ্ট্রপতিকে যেভাবে একটি অলঙ্কারিক পদে রাখা হয়েছে। এককক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থা। বিচার বিভাগে আমরা দেখেছি, নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপের শিকার হতে হয়েছে এবং এটি নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক চলছে। এক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রস্তাবনা আমরা চিন্তা করেছি।

রাষ্ট্রপতির যে ভেটো পাওয়ার যে কোনো বিলের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রী যেটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাস করেন। সেটি বৃদ্ধি করা যেতে পারে কিনা? সংসদকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করা যেতে পারে কিনা এবং বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে একটি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করা যেতে পারে কিনা; এই ব্যাপারটি আমরা বিবেচনা করছি। এখানে check and balance প্রক্রিয়াটি নির্বাহী, বিচার এবং আইন বিভাগের মধ্যে কীভাবে কাজ করবে, সেটি আরও ডিটেইলসে হয়তো বা আমরা সকলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে উত্থাপন করতে পারব। সংবিধানের ক্ষেত্রে পরবর্তী যে প্রশ্নটি আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, সেটি হচ্ছে এই পরিবর্তনগুলো কীভাবে আসবে? এ প্রক্রিয়াটি আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এবং বর্তমান সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশে আমরা চাচ্ছি যে এই প্রক্রিয়াটি, সংস্কারগুলো কীভাবে হবে সেটিও যাতে উল্লেখ করা থাকে। আমরা দুটি উপায় চিন্তা করেছি। প্রথমটি হচ্ছে গণপরিষদ নির্বাচন। আমরা চাই না কোনো একটি সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে যে সংসদটি নির্বাচিত হবে বর্তমান সংবিধানের মাধ্যমে যে এটিই পরবর্তীতে সংবিধান সংস্কারগুলো করবে। আমরা মনে করি যে, এই কাজটি করা হলে বৈধতার বিতর্কসহ আরও বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই আমরা চাই গণপরিষদ নির্বাচন এবং তার মধ্য দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন। অথবা সারা দেশের মানুষকে সম্পৃক্ত করে সংবিধান সংস্কার কমিশনকে এমপাওয়ার করে সংবিধান সংস্কারের কাজটি করা। সারা দেশের মানুষ এবং সকল রাজনৈতিক দলকে সম্পৃক্ত করে। দ্বিতীয় যে উপায়টি সেটি সম্ভবত খুব কঠিন। এই ২-৪ মাস পরে। আগে শুরু করা গেলে হয়ত সম্ভব হতো। এখন হয়ত গণপরিষদ নির্বাচনের দিকে আমাদের যেতে হতে পারে। কিন্তু আমরা এই দুটি উপায়কে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। আবার আমরা মনে করি যে এই দুটি উপায় ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে যদি সংবিধানকে সংস্কার করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বৈধতার সংকটটি উত্তোরণ করতে পারবে না। সংবিধান প্রশ্নে আরও যে বিষয়টি উল্লেখ করা উচিত সেটি হচ্ছে আমাদের যে মৌলিক অধিকারগুলো সেখানে বর্তমানে পরিবেশ নিয়ে যে কথা উঠছে এবং লৈঙ্গিক সমতার ব্যাপারে যে কথাগুলো উঠছে এগুলোকে অ্যাড্রেস করা উচিত। অবশ্যই সারাদেশের গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে। এই বিষয়গুলো আরও গভীরভাবে সেখানে অ্যাড্রেস করা উচিত। মৌলিক অধিকারগুলোর ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বাকস্বাধীনতা থেকে শুরু করে সভা সমাবেশের অধিকার, এগুলোকে মনে হয়েছে যে ইন্টারপ্রিটেশনের জায়গাটি অনেক বেশি উন্মুক্ত। যার কারণে দেখেছি যে বারবার এটিকে লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং সেটির আইনি যৌক্তিকতা উত্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। দেখা গেছে যে যার হাতে নির্বাহী ক্ষমতা আছে তিনি একটি সুনির্দিষ্ট ইন্টারপ্রিটেশন বিচার বিভাগের মাধ্যমে চালিয়ে দিচ্ছেন, বাক স্বাধীনতা লঙ্ঘন করছেন। সেটি অসাংবিধানিক কেন নয়, সেটির একটি ব্যাখ্যা তারা উত্থাপন করতে পারছেন। আমরা মনে করি মৌলিক অধিকারগুলো এতটাই inviable ভাবে সংবিধানে উপস্থাপিত হওয়া উচিত যে, এ ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের সুযোগ সেখানে না থাকাই ভালো। এটি কীভাবে করা যেতে পারে সেটির আলোচনা অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু এ জায়গায় ইনভায়েবলিটি, বাক স্বাধীনতা, সভা সমাবেশের অধিকার, জীবনের অধিকার, চলাফেরার অধিকার এই মৌলিক অধিকারগুলোর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। আমেরিকার সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধন বা এ ধরনের যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলোকে আমরা ধরতে পারি একটি ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে। আর সংবিধান সংস্কারের প্রশ্নে দুই তৃতীয়াংশ ভোটে যে সংস্কার, এর বাইরে গণস্বাক্ষর বা ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কারের কোনো প্রস্তাবনা পরবর্তীতে হাজির করা যেতে পারে কি না সেটি বিবেচনা করা যেতে পারে। সংবিধানের প্রশ্নে যাতে করে সেটি শুধু সংসদে সীমাবদ্ধ না থাকে, সংবিধান সংস্কার,পরিবর্তন,পরিমার্জনের প্রশ্নটি যাতে গণমানুষ সম্পৃক্ত হয় সে ধরনের বিভিন্ন উদ্যোগ থাকা উচিত। উদ্যোগের স্বীকৃতি থাকা উচিত সংবিধানে, সেটি আমরা মনে করি। রাজনৈতিক দলগুলোর ফাংশনারিজের ক্ষেত্রে সংবিধানে বেশ কিছু মূলনীতি উত্থাপিত থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি। কারণ আমরা দেখেছি যে, আওয়মী লীগের মত একটি একনায়কতান্ত্রিক, ফ্যাসিস্ট একটি দল রাজনৈতিক দল হিসেবে দীর্ঘদিন তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছেন। সেই জায়গা থেকে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা কী হবে, রাজনৈতিক দল কীভাবে ফ্যাংশন করবে সেটি নিয়ে বেসিক কিছু মূলনীতি, খুব বেশি ডিটেইল না, সেটি অবশ্য সমস্যা সৃষ্টি করবে, কিন্তু এটি থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি। রাজনৈতিক আচরণ এবং রাজনৈতিক পরিসরের যে বৈশিষ্ট্য, সেটি নিয়ে কিছু ব্যাখ্যা সংবিধানে থাকা উচিত। যাতে করে রাজনৈতিক পরিসরে অন্যদের কোনো জায়গা থাকে না, যেটি ইনক্লোসিভ না, এ ধরনের কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দেওয়ার কোনো সুযোগ না থাকে সামাজিকভাবে বা আইনিভাবে। মূলত এইগুলো হচ্ছে আমাদের মেইন প্রস্তাবনা। এগুলো আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। আমাদের যে লিখিত দলিলটি আমরা প্রস্তাবনা আকারে উত্থাপন করব সংবিধান সংস্কার কমিশনের কাছে। সেটির কাজ চলমান আছে। আমরা ইতোমধ্যে যা বলেছি সেগুলোকেই হয়ত আরও বিস্তারিতভাবে সেখানে উত্থাপন করব এবং আমরা আশা করব যে, সংবিধান সংস্কার কমিশনও সংস্কার প্রক্রিয়ায় সারা দেশের মানুষকে সম্পৃক্ত করার একটি উপায় বের করবেন। সবাই এখানে এসে সম্পৃক্ত হবে এরকম না হয়ে বরং কীভাবে আমরা মানুষের কাছে যেতে পারি সে প্রক্রিয়াটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। ধন্যবাদ।

আনিকা তাহসিনা (বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন) : আরিফ সোহেল ভাইয়ের সাথে আমি কিছু বিষয় এড করতে চাই। যখন আমাদের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় গেল তখন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আমরা একটি মনোভাব লক্ষ্য করেছি যে, তারা সব সময় একটি

বিষয়ে বার বার নিজেদেরকে মনে করিয়েছে যে, never again, এই জিনিসটির আসলে মানে কী? সংবিধানের ভাষাতেও গণমানুষের যে চেতনা, গণমানুষের যে চাওয়া সেটি সম্পুর্ণভাবে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। আমরা ছাত্ররা এবং ছাত্রজনতা যেভাবে রক্ত দিয়ে গেলাম, সেই রক্তের বিনিময়ে যে সংবিধানটি আমরা পেলাম, সেই সংবিধানে যাতে কোনোভাবেই কোনো স্বৈরাচার আবার সংবিধান কাটা-ছেঁড়া করে একইভাবে আগের মত বলপ্রয়োগ করে আমাদের ওপর অত্যাচার করতে না পারে। স্বৈরাচার বিরোধী কোনো ক্লজ বা কোনো উপায়ে এই জিনিসটিকে অ্যাড্রেস করা যায়, এটি আমাদের একটি প্রস্তাবনা। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আমাদের সংবিধানের preamble-এর পার্টটি যদি, preambleটিকে আসলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বা এটিকে অপারেটিভ পার্ট হিসেবে ধরা হয় না। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরে সংবিধানে preamble-এর যে স্পিরিট, সেটিকে ধারণ করার একটি সুযোগ আছে মুক্তিযুদ্ধের পাশাপাশি। এই বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আমার সহকর্মীরা নিশ্চয়ই কিছু কিছু প্রশ্ন তুলবেন, ব্যাখ্যার জন্য আপনাদের কাছ থেকে। যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। আমি শুরুতে দুটি প্রশ্ন করছি, জাতীয় নাগরিক কমিটির বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে, বুঝার জন্য। আপনারা একাধিকবার বলেছেন যে, বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে আপিল বিভাগে যাদের নাম প্রস্তাব হবে, তাঁদের উচ্চ কক্ষে শুনানির মোকাবিলা করতে হবে। একই বিষয় আপনারা বলেছেন নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে কি আপনারা এটিই প্রস্তাব করছেন যে, ধরুন আপিল বিভাগের নাম উচ্চ কক্ষে প্রস্তাব হলো, শুনানির পর কি তাদের এ বিষয়ে ভোট হবে? উচ্চ কক্ষ সিদ্ধান্ত নেবেন? নাকি তারা শুধুমাত্র শুনানির ব্যবস্থা করবেন। যাতে সকলে বুঝতে পারেন যে, তিনি আপিল বিভাগে মনোনীত হয়েছেন। কিংবা ধরুন নির্বাচন কমিশনে যিনি মনোনীত হয়েছেন তার সম্পর্কে আমরা একটি ধারণা পেলাম। সেক্ষেত্রে আপনাদের প্রস্তাবটি কী? সম্ভবত আপনাদের লিখিত প্রস্তাবে আছে, সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সেটি নেই। সেটি যদি একটু সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন।

অ্যাডভোকেট মুকুল মুস্তাফিজ (জাতীয় নাগরিক কমিটি): ধন্যবাদ।

আমরা আসলে এই বিধানটিতে যেটি বলতে চাচ্ছি যে, supreme judiciary council is the authority of appointment. কিন্তু more accountability ensure করার জন্য এবং তার কমিটমেন্ট দেখার জন্য, যাচাই করার জন্য, যেন জনগণের কাছে তার দায়বদ্ধতা প্রকাশ পায়, এজন্য একটি শুনানির ব্যবস্থা করতে চাচ্ছি। এই শুনানি করলে বিষয়টি ক্লিয়ার হবে যে তাঁর স্ট্যান্ডটি কোথায়? তিনি আসলে এ উচ্চ পর্যায়ে যাওয়ার যোগ্য কি না? এই শুনানির মাধ্যমে জনগণ জানতে পারবে, যাকে আমরা উচ্চ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, তাকে অ্যাসেস করার একটি সুযোগ পাবে।

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (কমিশন সদস্য): মনে হয় আমরা সবাই আইডিয়াটা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমরা রেজাল্ট কীভাবে ডিটারমাইন করব? ধরেন যে আপার চেম্বার বলব যে না, যোগ্য না। হবে না তখন? আমাদের চীফ যেটি বলেছেন যে, ভোটিংয়ের কোনো সিস্টেম থাকবে কি না? নাকি জাস্ট হেয়ারিং।

অ্যাডভোকেট মুকুল মুস্তাফিজ (জাতীয় নাগরিক কমিটি): না, ভোটিং না। জাস্ট হেয়ারিং। এখানে হয়ত তাকে open question করা হবে, তার কমিটমেন্ট, তার জানাশোনা অ্যাসেস করা হবে। তার স্বচ্ছতা, তার নৈতিকরা, এভরিথিং যেন জনগণ বুঝতে পারে, যিনি বিচার করবেন, এই বিচারকটি কেমন মানুষ, তিনি আসলে বিচারক হিসেবে কতটা expectable বা তাকে আমরা কীভাবে অ্যাসেস করছি। জনগণের কাছে তার কমিটমেন্টটিও প্রকাশ পাবে।

জনাব ফিরোজ আহমেদ (কমিশন সদস্য): আমি কয়েকটি বিষয় আপনাদের কাছে জানতে চাচ্ছি যে, জনাব সারোয়ার তুষার বলেছেন যে, ক্যাবিনেট সদস্যদের অপসারণে সংসদের অনুমতি নিতে হবে। সাধারণত এটি নিয়োগের বেলায় প্রয়োজন থাকে। অপসারণের বেলায় এটির প্রয়োজনীয়তা কতখানি এটি যদি ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয় হচ্ছে, জরুরি অবস্থায়ও মৌলিক অধিকার হরণ করা যাবে না। এটি জরুরি এবং বাংলাদেশে বারবার দেখা গেছে যে, এটির ভিষণ রকমের অপব্যবহার ঘটে। এটি একদমই জানার জন্য। যদি সত্যি সত্যি এরকম একটি জরুরি অবস্থা তৈরি হয়, ধরলাম কেউ একজন সাম্প্রদায়িত সংকট তৈরি করার চেষ্টা করছে, কিংবা এরকম পরিস্থিতিতে মৌলিক অধিকারের কিছু কিছু অংশ আছে যেমন চলাফেরার স্বাধীনতা সীমিত করতে হয়। যেমন- প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়। পরামর্শটি কী এরকম হতে পারে কি না, এটি ভাবার জন্যই বলা যে, জরুরি অবস্থাতে মৌলিক অধিকারের এই অংশটি কোনভাবেই হরণ করা যাবে না। যেমন জীবনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার কিংবা অন্য কোনো অংশ। কিন্তু কিছু কিছু সীমিত করা যাবে যেটি পরবর্তীতে কোনো না কোনো স্বাধীন কমিশন সেটির সমস্ত কার্যক্রমকে তদারক করবে যে এটি ঠিক উপায়ে করা হচ্ছে কি না? কারণ রাষ্ট্রকে তো ফ্যাংশন হতে হবে। কোনো কোনো জায়গায় তাকে নিশ্চয় এরকম পরিস্থিতিতে, দুর্যোগও হতে পারে বা সাম্প্রদায়িক সংকটের বেলায়। তৃতীয় যে প্রশ্নটি আমি জানতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে, অনেকেই এই প্রস্তাবটি করেছেন, যে কারণে বিষয়টি জানা, যেটি আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে

সামনের দিনে আসবে। রাষ্ট্রপতিকে যদি সরাসরি ভোটে নির্বাচিত করি কিংবা তার হাতে যদি আমি কিছু বাড়তি ক্ষমতা দেই, এটির ফলে প্রধানমন্ত্রীর যে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করা দরকার স্বাধীনভাবে, সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি না? আমাদের কারও কারও মনে হচ্ছে এটির কারণে দুটি সংকট হতে পারে। যেজন্যই বলা। না কি প্রধানমন্ত্রীকে উচ্চ কক্ষ এবং নিম্নকক্ষের কাছে দায়বদ্ধ করা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে তাকে জবাবদিহিতায় আনাটা বেশি জরুরি। কারণ একটি বাস্তব বিপদ হচ্ছে যে, এটির ফলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যক্রম সীমিত হতে পারে। দুই হচ্ছে রাষ্ট্রপতির মত একটি পদ যদি নির্বাচিত থাকে, কিংবা শক্তিশালী একটি পদ থাকে, তাহলে সামরিক শাসন কিংবা অন্য কোনো হস্তক্ষেপে সুযোগ তৈরি করবে কি না? এটি আপনারা বিবেচনা করতে পারেন। আপনাদের মধ্যে যেহেতু এই প্রশ্নটি ছিল, আপনারা এটি নিয়ে ভাবতে পারেন বা আমাদের সাথে আলোচনা করতে পারেন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির এই নির্বাহী বিপদগুলো নিয়ে। আপনাদের এই বিষয়টি খুবই পছন্দ হয়েছে যে, কমিশনের গঠন প্যানেলভিত্তিক হওয়াটা আসলে একটি বিপদজনক। কারা কিসের ভিত্তিতে এই কমিশন তৈরি হচ্ছে বা তার বৈধতা কি, বা তার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? এটির ক্ষেত্রেও ভবিষ্যতে বিবেচনা করা উচিত। এটি সংবিধান নিয়ে কমিশনের আলোচনার বিষয় না নিশ্চয়ই। কিন্তু আলোচনাটা জরুরি। ফলে এটির বিষয়ে আপনাদের যদি ভাবনা থাকে, আপনারা আপনাদের লিখিত বক্তব্যে কিংবা এখনও আমাদরেকে আরেকটু বিস্তারিত করে জানান, এই সমস্যাটি নিয়ে আমরাও কেও কেও ভেবেছি, যারা এসেছেন তারাও ভেবেছেন। ফলে এটি ভবিষ্যতে নিশ্চয় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠবে, কারণ কমিশনের মতো বা কমিটির মতো নানান জিনিসতো তৈরি করতেই হয়। সেটিকে কীভাবে গ্রহণযোগ্য করা যাবে?

ধন্যবাদ।

জনাব সারোয়ার তুষার (জাতীয় নাগরিক কমিটি): আমাদেরতো এগুলো প্রস্তাব। কিছু বিষয় আছে যেগুলো হয়ত বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন- দ্বিতীয় প্রশ্নে জরুরি অবস্থার বিষয়ে জনাব ফিরোজ আহমেদ যেটি বলেছেন, এটি ঠিক আছে, আমাদের অ্যাসেসটি হচ্ছে এরকম, যেগুলো inalienable rights মানে যা কোনো অবস্থাতেই আপনি হরণ করতে পারেন না, সেগুলো, এমনকি জরুরি অবস্থায়ও অক্ষত্ন থাকতে হবে, যেটি আপনি ব্যাখ্যা করেছেন সঠিকভাবেই। সত্যি সত্যি যদি জরুরি অবস্থাটি জাস্টিফাইড হয়, কিছু জিনিস এমনিতেই জনগণ তথা নাগরিকরা মেনে নেবে যে এই অধিকারটি এই মুহূর্তে আমি প্রয়োগ করতে পারব না। সেটি farther clarification -এর জন্য আপনার বক্তব্যটিতে আমাদের মৌলিক কোনো দ্বিমত নেই। আর মন্ত্রিসভার অপসারণের ক্ষেত্র আমরা এটি এই উপলব্ধি থেকে বলেছি যে, বিদ্যমান সংবিধানে যেভাবে আছে সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী আসলে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে যে কাউকে যে কোনো কিছু করতে পারেন। সেক্ষেত্রে যদি আমরা এটিকে পার্লামেন্টে কোনো না কোনোভাবে অ্যাকাউন্টেবল করতে পারি বা পার্লামেন্টকে এখানে involve করতে পারি, তাহলে হয়তো অপসারণ প্রক্রিয়াটা অনেক বৈধ বা অনেক গণতান্ত্রিক হতে পারে। এই ভাবনা থেকে আমাদের এটি বলা। আর রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সরাসরি আমরা এ কারণে বলেছি যে, আমরা মনে করেছি, আমাদের একজন সদস্য যেটি বলেছেন যে, রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশে একেবারেই প্রতীকি একটি পদে পরিণত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা যদি পার্লামেন্টকে সত্যিকার অর্থে ফাংশনাল করতে পারি, সেক্ষেত্রে সরাসরি নির্বাচন যদি নাও হয়, অন্তত আপার হাউজের প্রতিনিধিদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারে এবং সেটি হওয়া উচিত। সরাসরি নির্বাচিত হলে সেটি আরও ভালো হয়। হয়ত আমাদেরকে আস্তে আস্তে সেদিকে যেতে হবে। কারণ আমরা তরুণরা যখন এগুলো নিয়ে আলোচনা করি, তখন আমরা মনে করি যে, প্রধানমন্ত্রীর পাওয়ারটিকে যদি একটু চেক-এ রাখতে হয় তাহলে রাষ্ট্রপতির পদটির আরও একটু ক্ষমতার চেক এন্ড ব্যালেন্স দরকার। আর সরাসরি নির্বাচন হলে ভালো। না হলে অন্ততপক্ষে আপার হাউজের ভোটে তাকে নির্বাচিত করা উচিত। এরকম একটি জায়গা থেকে আমরা ভাবি। এগুলো নিয়ে আরও বিবেচনার বিষয় থাকতে পারে। আমরা এটি একটি খসড়া প্রস্তাব আকারে আপনাদের কাছে দিয়েছি। এসব বিষয়ে সমাজের আরও যারা গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন সেগুলোর কাছ থেকেও আমরা নিজেদেরকে এডজাস্ট করার ক্ষেত্রে আমরা সেক্ষেত্রে flexible আছি।

অ্যাডভোকেট মুকুল মুস্তাফিজ (জাতীয় নাগরিক কমিটি): আমি একটু অ্যাড করব। মৌলিক অধিকারের যে প্রশ্নটি করলেন, খুবই ভেলিড প্রশ্ন। আমাদের বর্তমান সংবিধানে আমাদর মৌলিক অধিকারটি তিনভাবে আমরা দেখছি। কিছু আছে Non-derogable rights to life. আর কিছু আছে subject to reasonable restriction আর কিছু আছে subject to any restriction. এই তিনটির মধ্যে আসলে ব্যালেন্স করা যেতে পারে। আমরা প্রস্তাব করছি যে কোনো মৌলিক অধিকারই যেন স্থগিত না হয়ে যায়। কিন্তু এটির মধ্যে একটি ব্যালেন্স করা যেতে পারে। যেমন-subject to any restriction এই জায়গায়তো আসলে মৌলিক অধিকার কোনো গুরুত্ব বহন করে না। subject to reasonable restriction এর জায়গায় হয়ত আমরা আইন করে বা বিধি করে একটু টাইট করে দিতে পারি যে reasonable বলতে কী বোঝাবে। কোন কোন situation-এ গিয়ে এটিকে ভায়োলেট করা যাবে বা স্থগিত করা যাবে। আমার মনে হয় যে আমরা ব্যালেন্সটি এই জায়গায় করতে পারি। সবগুলোকে non- derogable rights করে দিলে সমস্যা হতেই পারে। তাই reasonable restriction এর

মধ্যে সবগুলোকে এনে এই reasonable restriction-কে একটু এক্সপ্লেইন করে দিতে হবে। আরেকটি বিষয় যেটি আমি জনাব ফিরোজ আহমেদের প্রস্তাবের বিষয়ে বলতে চাই, আমাদের যে ৮ নম্বর প্রস্তাব, সেখানে আমরা অলরেডি এটি লিখেছি যে, তবে জরুরি আইন বা আদেশ সর্বোচ্চ আদালতের কাছে পাঠাতে হবে। আদালত আইনটির সাংবিধানিকতা কিংবা অসাংবিধানিকতা সম্পর্কে রায় দিবেন। ফলে এটি যদি যুক্ত থাকে, যে কেউ যদি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে হয় এবং তাকে যদি এ ধরনের হিউম্যান রাইটসকে ভায়োলেট করতে হয়, তাহলে এই সম্পর্কেও তার ভিতর যদি একটি সচেতনতা থাকে যে আদালত যে কোনো সময় এটিকে অসাংবিধানিক বলে রায় দিতে পারেন। ধন্যবাদ।

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (কমিশন সদস্য): আপনি বলেছেন যে, any restriction বা reasonable restriction এগুলোতো আইন করে করা আছে। কিন্তু আমরা যদি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড দেখি সেখানে কিন্তু restrictionগুলোর ইন্টারপ্রিটেশন আছে। ঐটি ফলো করলেই চলবে না we have need our contextualized to interpret what is mean be any and what is mean by reasonable.

অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম (জাতীয় নাগরিক কমিটি) : আমরা যে জায়গাটিতে বেশি গুরুত্ব দিতে চাচ্ছি, সেটি হচ্ছে যখন জরুরি অবস্থা জারি হয় তখন দেখা যায় যে আদালতের যে মৌলিক অধিকার বিষয়ে এন্টারটেন করার ক্ষমতা সেটিকেই খর্ব করে দেওয়া হয়। আমাদের জায়গাটি থাকবে যে ঐ জায়গাটি যেন খর্ব না হয়। অর্থাৎ কোনটি reasonable restriction হচ্ছে কি হচ্ছে না? জনাব ফিরোজ আহমেদও প্রশ্নটি এনেছেন যে আলাদা কোনো কমিশন থাকবে কিনা ? আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আলাদা কমিশন থাকবে না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের যে ক্ষমতাটি আছে সেটি যেন খর্ব করা না হয়। তখন আদালতই একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন তার দৌড়টি যেন বন্ধ করে না দেওয়া হয় যে কোন নাগরিক এই কোর্টের কাছেই আসতে পারবে না জরুরি অবস্থায়। আমাদের কথা হচ্ছে কোর্ট ওপেন থাকবে, কোর্ট তখন সিদ্ধান্ত নিবে যে এটি হচ্ছে কি হচ্ছে না।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক (কমিশন সদস্য): এটি খুব ইন্টারেস্টিং ডিবেট যে, restriction থাকবে কি থাকবে না। আমার মনে হয় এই ডিবেটের গোড়াটা আরও ইন্টারেস্টিং যে, ফান্ডামেন্টাল রাইটস আসলেই সংবিধান দিবে কি না? আমেরিকান অরিজিনাল এপ্রোচ যেটি ছিল, সেটি হচ্ছে fundamental rights constitution দিবে না। এটি হচ্ছে নেগেটিভ মডেল যে, Congress shall not pass any law infringing fundamental rights press and other freedom. আমরা যদি ঐ মেথডে যাই, তাহলে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই নাই। এটি ন্যাচারাল জুডিসপ্রুডেন্স-এর থিউরি অনুযায়ী যে রাইটের মালিক হচ্ছে মানুষ, সুতরাং রাষ্ট্র মানুষকে রাইট দিতে পারে না। রাষ্ট্র কেবলমাত্র বলতে পারে যে আমি রাইট নেব না, খর্ব করব না। এটি একটি মেথড হতে পারে। আমাদের সংবিধানে বিদ্যমন যে মডেলটি এটি আমরা পজিটিভ, নেগেটিভ দুটি মডেল এডপ্ট করেছি। at the same time. আমেরিকানরা শুধু নেগেটিভ মডেলটি এডপ্ট করেছে। আমরা আর্টিকেল ২৬ (২) তে নেগেটিভ মডেলটি নিয়েছি। আবার পজিটিভ মডেলে বলে দিয়েছি এই এই রাইট থাকবে। একটি খুব sophisticative approach হতে পারে যে, ঐ বিতর্কটি এড়ানোর জন্য যে আমরা কি restriction দেব না কি দেব না। যেহেতু ইন্টারন্যাশনালি এটি এক্সেপটেড যখন রাইট দেওয়ার কথা বলে, with restriction আসে generally. Right comes with restrictions. এটি avoid করা যেতে পারে more sophisticative approach-এ গেলে। কিন্তু আমরা যদি contextual theory থেকে দেখি তখন আবার বাংলাদেশের জন্য বিপদজনক হয়ে যেতে পারে যে লোকে ভাবতে পারে বা সরকার ভাবতে পারে যো কোনো রাইটতো দেওয়া হয়নি। এটি নিয়ে আপনাদের কোনো রিসার্চ থাকলে সেটি আমাদের কাছে লিখিতভাবে জমা দিতে পারেন। এটি আমরা চিন্তা করছি। আর আমি ছোট ছোট কয়েকটি প্রশ্ন করছি। একটি হচ্ছে জনাব তুষার সারোয়ারের কাছে। আমার মনে হয় আমি বুঝেছি কি না ঠিকমত একটু ক্লারিফিকেশন চাচ্ছি।

সময়-১২.৩০

আপার হাউজের মেম্বারদের মধ্যে যাতে ফিলোসফি, পলিটিক্স এ-সমস্ত ভালো জানাশোনা মানুষ যায়, এটি আপনি বলেছেন। এটির রূপরেখা আসলে কেমন? আমরা তাহলে কী বলব? কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে দেব? সুশিক্ষিত, স্বশিক্ষিত, কীভাবে এটি ডিফাইন করব? আমরা একটু জটিলতার মধ্যে পড়তে পারি, এটি একটু ক্লিয়ার করতে পারেন। দুই নম্বর যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে, পিআর এর ক্ষেত্রে ১% ভোট নিয়েও কি পিআরটি সাজেস্ট করেন কি না আপার হাউজে। নাকি সেখানে কোনো minimum threshold থাকা উচিত যে, একটি গ্রুপ ৩%,৭% ভোট পেয়েছে, এটি একটি বিষয় থাকতে পারে। অ্যাডভোকেট মুসার কাছে প্রশ্ন, এখানে কয়েকটি প্রশ্নের মধ্যে একটি হচ্ছে যে, উচ্চ কক্ষের নাম কি আপনি জাতীয় পরিষদ প্রস্তাব করেছেন? এটি বুঝার জন্য। দুই নম্বর হচ্ছে কেয়ার টেকার গভর্নমেন্ট। এটির আন্ডারে দুটি নির্বাচন চান, পরে কেন চান না? কেননা আমরা দেখেছি কোর্টও এরকম কথা বলেছে। এর পরে কি আরও ঝামেলা বাড়ে কিনা বা দুইটি পর্যন্ত দিয়ে আপাতত সমাধান করছি কি না। প্রবাসী ভোটারদের কথা বলেছেন, তাদের যাতে ভোটাধিকার

থাকে। তারা ইলেকশনে candidate হতে পারবে কি না, এ সম্পর্কে কোনো মতামত থাকলে আমাদের জানাতে পারেন। জনাব আক্তারের কাছে আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে, হাইকোর্ট ডিভিশনের ডিসেন্টালাইজেশনের কথা বলেছেন। এই ডিসেন্টালাইজেশন কেমন ভাবে? এটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হাইকোর্ট ডিভিশন হবে প্রত্যেক ডিভিশনে, নাকি existing high court division এর সিট এবং সেশন বা বেঞ্চ এরকম হবে। এ সম্পর্কে যদি বিস্তারিত দিতে চান। আর সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব এর কাছে। সেটি হচ্ছে, আপনি বলেছেন যে new constitution-টি অ্যাসেম্বলি করে করা যায় অথবা এই কমিশন সভার সাথে সারাদেশে আলোচনা করে করা যায়। এই সভার সাথে সারাদেশে আলোচনা করে কীভাবে করা যেতে পারে, সুনির্দিষ্ট কোনো রূপরেখা থাকলে আমাদেরকে জানাতে পারেন। আর ফান্ডামেন্টাল রাইটস কেমন চান, আপনার প্রশ্নটি আমার মনে হয় ঐ প্রশ্নের সাথে যুক্ত। এটি নিয়ে আমরাও গভীরভাবে চিন্তা করছি এবং মোটামুটি পৃথিবীর সব দেশ আমরা দেখার চেষ্টা করছি যে কোন স্ট্যান্ডার্ড এ রাখব। এটি নিয়ে আরও বিস্তারিত মতামত দিতে পারেন। পলিটিক্যাল পার্টি সম্পর্কে আমরা আলাদা একটি ক্লজ রাখার হয়ত চিন্তা করছি। কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টি কেমন হবে এটি যখন বলছি, তখন কিন্তু আবার ঐ ফ্রিডম অব অ্যাসোসিয়েশনের সাথে কিছু রেসটিকশন চলে আসবে। এ দুটি একসাথে হয়ত দেখার বিষয় আছে। আর আনিকার কাছে একটি প্রশ্ন করব যে, এই প্রস্তাবটি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে, কারণ আমাদের কমিশনের একটি স্পিরিট হচ্ছে, এন্টি ডিকটেটরশীপ ফর্মুলা, যেটি এপ্লাই করি, এই ফর্মুলাটি দুইভাবে এপ্লাই করা যায়। একটি হচ্ছে, সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান আমরা দিয়ে দিলাম। আরেকটি হচ্ছে গোটা সংবিধানটিই এমনভাবে ডিজাইন করা হলো, কোনো জায়গায় আমি বলিনি যে ডিকটেটরশীপ তৈরি হতে পারবে না। কিন্তু পুরো সিস্টেমটিকে এমনভাবে ডেভেলপ করলাম যে ডিকটেটরশীপ এ সিস্টেমে তৈরি হতে পারবে না। কোনো সুনির্দিষ্ট মতামত থাকলে বলতেও পারেন, লিখিতও দিতে পারেন। ধন্যবাদ।

জনাব সারোয়ার তুষার (জাতীয় নাগরিক কমিটি): ধনাবাদ।

আমাদের বক্তব্যটি বলার পেছনের চিন্তাটি ছিল এরকম, আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর কথা মাথায় রেখে বলেছি। আমরা নিজেরাও যেহেতু অদূর ভবিষ্যতে একটি রাজনৈতিক দল হতে চাই। যদি পরিবেশ পরিস্থিতি সবকিছু অনুকূলে থাকে এবং জনগণ সমর্থন করে। সেক্ষেত্রে আমাদের কথা ছিল একটি দল যখন তার প্রার্থী মনোনয়ন দিবে, তখন আপার হাউজের ক্ষেত্রে যদি আমরা এধরনের বিধান রাখি সেটির ইমপ্লিকেশনটি যদি এমন থাকে যে তারাই যাবে যারা পলিটিক্যাল সাইন্স, সংবিধান, দর্শন এসব বিষয়ে জানাশুনা আছে কিংবা অন্যান্য বুদ্ধিভিত্তিক বা তাত্ত্বিকভাবে যারা একটু সাউন্ড এ ধরনের লোকগুলোর কথা আমরা ভাবি। দলের মধ্যেই এরকম লোক থাকে, যাদেরকে যদি একটি আসন থেকে প্রার্থী করে দেন, সে হয়ত জিতে আসবে না। কিন্তু যদি পিআর সিস্টেম থাকে তাহলে দল তাকে ঐভাবেই মনোনয়ন দিবে। ঐরকম ব্যক্তিদেরকেই তালিকাভুক্ত করবে। আমাদের চিন্তাটা সেখান থেকেই এসেছে। এর বাইরে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদেরকে, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে এখানে কীভাবে ইনকরপোরেট করা যায়, সেটির ব্যাপারে আমরা এখনও খুব একটি decisive জায়গায় আসতে পেরেছি সেরকম না। ভাবতে হবে যে, দলের বাইরেও যারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আছে, আইন বুঝেন, সংবিধান বুঝেন, তাদেরকে আপার হাউজে কীভাবে আনা যায়, যেহেতু আমরা ভোটের কথা বলছি, এটি হয়ত আমাদেরকে আরও ভাবতে হবে।

অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম(জাতীয় নাগরিক কমিটি): ধন্যবাদ। স্যারের যে প্রশ্নটি, আমাদের নিজেদের মধ্যেও যখন বিতর্ক হয় তখনও এই প্রশ্নটি এসেছিল যে, মৌলিক অধিকারকে কীভাবে ডিল করব, কীভাবে দেব। সেই জায়গা থেকে সাউথ আফ্রিকার সংবিধানে যেভাবে দেওয়া হয়েছে, সেই মডেলটি আমাদের খুব পছন্দ হয়েছিল। সেটি নিয়ে আমরা নিজেরা অনেকক্ষণ আলোচনাও করেছি। অনেক বিতর্কও হয়েছে। তারপরেও নতুনকরে আবার ভাববার সুযোগ থাকবে। এটিও আমরা দেখব। তবে আমরা প্রস্তাব আকারে যেভাবে দিয়েছি, সেখানে কিন্তু এটি স্পষ্ট করে বলেছি যে, বিদ্যমান সংবিধান মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় না। এরকম শব্দ কিন্তু আমরা ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ এটি যেভাবে আছে সেটি এক অর্থে ত্রুটিপূর্ণ বলা যায়। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায়, এটিও ঠিক যে বাংলাদেশে যদি স্পষ্ট করে বলে দেওয়া না হয়, তখন এটি বাস্তবায়ন করতে গেলে নানা ধরনের ঝামেলায় পড়তে হয়। বোঝাপড়ায় ঝামেলা হয়।

সময়-১২.৩৫

এটিও আমরা বিবেচনা করব। আর ভোটে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে, ভোটাধিকারপ্রাপ্ত যে কোনো নাগরিক, তিনি যেখানেই বসবাস করেন না কেন, তিনি বাংলাদেশে ভোটে প্রার্থী হতে পারবেন। প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চয় কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাকে হয়ত এসে কোনো কাগজে স্বাক্ষর করা লাগতে পারে বা তিনি যদি নির্বাচিত হন তাকেতো এসেই করতে হবে। এই পারফরমেন্সতো আর বিদেশে বসে করা সম্ভব না। কিন্তু শুধু তিনি বিদেশে থাকেন, এ কারণে আমরা তাকে প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত রাখার পক্ষে না। আমরা চাচ্ছি যে, বাংলাদেশের সকল নাগরিক প্রার্থী হতে পারবেন, যেখানেই বসবাস করেন না কেন।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

ছোট একটি প্রশ্ন। প্রথমত জাতীয় নাগরিক কমিটির কাছে। আপনারা বলছিলেন যে, এলএফও এর মত করে মানে এটি প্রথমে গণপরিষদ হিসেবে কাজ করবে, পরে পার্লামেন্টে রূপান্তরিক হবে। এখন এই যে গণপরিষদ হিসেবে অ্যাক্ট করবে, তাকে তো একটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাহলে কি আপনারা বলছেন যে বিরাজমান সংবিধানে যে ব্যবস্থায় নির্বাচন হয় এবং পার্লামেন্ট তৈরি হয়। কারণ আমরা যদি আর কিছুই এখন না করি, তাহলে কী দাড়াবে? আপনি বলছেন যে, একটি গণপরিষদ তৈরি করতে হবে যেটি পার্লামেন্টে রূপান্তরিত হবে। তার নির্বাচনি প্রক্রিয়াটা কী হবে? তাহলে কি এই সংবিধানের আওতায় ৩০০ প্লাস ৫০ দিয়ে যে সংসদ তৈরি হয়, এই ভবনে বসে, সেটিই কি প্রক্রিয়া হবে? ঐভাবে নির্বাচন করে তারাই কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলি হবে কি না, সেই প্রশ্নটি যদি একটু বুঝতে সাহায্য করেন।

জনাব সারোয়ার তুষার (জাতীয় নাগরিক কমিটি): মানে এখানে গণপরিষদ ইলেকশন যদি হয়, তাহলে সংবিধান প্রণয়নের পর সেই সংবিধানের অধীনে সংসদ নির্বাচন, এরকম যখন রোডম্যাপটি হয় তখন দুইটি নির্বাচন আমরা দেখতে পাই। সেইক্ষেত্রে আমাদের ভাবনাটি হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোকে এক্ষেত্রে রাজি করানোটি একটু কঠিন হতে পারে। যদি দুইটি ইলেকশন হয় তখন ধরা যাক বাংলাদেশের বড় দল হয়ত ততটা আগ্রহী হবে না। কারণ তারতো পার্লামেন্টে যেতে হবে। এটির জন্য তাদের সাথে যাতে এক ধরনের নেগোশিয়েশন করা সম্ভব হয়, সেকারণে আমরা বলেছি যে, একটি ইলেকশনের মধ্যেই এটির ব্যবস্থা করতে হবে। কীভাবে করা যাবে সেটির আরও টেকনিক্যাল দিক হয়ত পরে আমাদের বুঝতে হবে। কিন্তু একটি নির্বাচনই করতে হবে, যেটি গণপরিষদ হিসাবে ভূমিকা রাখবে এবং পরবর্তীতে পার্লামেন্ট হয়ে যাবে। তাহলে আমার মনে হয় যে, রাজনৈতিক দলগুলো যে ভয়টি পাচ্ছে,তাদেরকে কোনোভাবে মাইনাস করা হচ্ছে কি না, সেই আশঙ্কাটি দূর হতে পারে। এই ভাবনা থেকে আমরা এই কথাটি যুক্ত করেছি। এর বাইরে টেকনিক্যাল দিকগুলো, আইনের দিকগুলো হয়ত আরও যাচাই বাছাই করা দরকার হতে পারে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): একদম শেষ প্রশ্নটি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কাছে।

আপানারা বলেছেন, গণপরিষদ অথবা এই কমিশন যদি সকলের মতামত গ্রহণ করে। কমিশনের দিক থেকে দুটো বিষয় দাঁড়িয়েছে। একটি হচ্ছে স্বল্প সময়ে যতদূর সম্ভব আমরা মতামতগুলো সংগ্রহের চেষ্টা করছি ওয়েব সাইটের মাধ্যমে। এখন একটি জরিপও শুরু হবে সারাদেশে। তাতে করে আমরা আশা করছি যে মতগুলো পাব। আর দীর্ঘসময় হলে সেটি হয়ত আরও সুযোগ থাকত। একেবারে তৃণমূল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য। কিন্তু সেটি যদি না থাকে তাহলে গণপরিষদের যে ধারনার কথা আপনারা বলছেন, এটি কি আলাদা করে গণপরিষদের নির্বাচন করে গণপরিষদ তৈরি করে সেখানে সংবিধান তৈরি করা। আপনারাতো নতুন সংবিধানের কথা বলছেন, সেটিই কী আপনারা বিবেচনা করছেন?

জনাব আরিফ সোহেল (বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন): যে কয়টি প্রশ্ন এসেটি, আমরা সবগুলোই অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব আমাদের সামর্থ অনুসারে। সংবিধান সংস্কারের যে প্রক্রিয়া, সে প্রক্রিয়ায় গণপরিষদ বর্তমানে সবচেয়ে ভায়াবল অপশন। আর যদি তার বাইরে যেতে হয় তাহলে গণমানুষের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারা পলিটিক্যাল অ্যাক্টর। তাদেরকে সম্পৃক্ত করে যদি বৈধতাটা আমরা অর্জন করতে পারি, যারাই বাংলাদেশের পক্ষে গণঅভ্যুত্থানের পক্ষ শক্তি, জনগণের পক্ষ শক্তি, সেই পলিটিক্যাল অ্যাক্টর সবাই একমত হয়েছেন যে, সংবিধান সংস্কার কমিশনই সংবিধান কীভাবে তৈরি হবে সে ব্যাপারে মতামত দিতে পারেন, সেই ক্ষমতা তাদের আছে, তাহলে এই ক্ষমতাটি তৈরি হবে। এক্ষেত্রে একটি বেসিক ইন্টারপ্রিটেশন আমরা উত্থাপন করতে চাচ্ছি, আমরা আমাদের জায়গা থেকে মনে করি যে বাংলাদেশে নির্বাহী ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ বা প্রধান হয়ে উঠেছে বর্তমান স্ট্রাকচারে এবং যেহেতু বর্তমান যে সংবিধান, সেটি পুরোনো সংবিধানই, এখনও নির্বাহী ক্ষমতাই আসলে প্রধান চালিকাশক্তি, আইন না।

সময়-১২.৪০

সেই জায়গা থেকে বর্তমান যে অন্তবর্তী সরকার ও তার অধ্যাদেশসমূহ, এগুলোই বর্তমান সরকারকে বৈধতা দিচ্ছে। নির্বাহী ক্ষমতা অন্য কারো কাছে চলে গেলে খুব সহজেই এগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করা সম্ভব, সেধরনের ইন্টারপ্রিটেশনের কোনো অভাব হবে না। সেই জায়গা থেকে নির্বাহী ক্ষমতার মাধ্যমে বা অধ্যাদেশগুলোর মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার কমিশনকে অ্যামপাওয়ার করা যায়, যদি পলিটিক্যাল অ্যাক্টররা রাজী থাকে, যদি সম্ভব হয়, রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে এটি নিয়ে আলাপ করা যেতে পারে। আর গণপরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে, হ্যা, আমরা গণপরিষদের একটি নির্বাচন চাচ্ছি, যেটি ইতোমধ্যে নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব এসেছে। আমাদের প্রস্তাবনাও অনেকটা সেরকম। একটিই নির্বাচন এবং সেটি গণপরিষদ নির্বাচন হবে। এই গণপরিষদ নির্বাচনের বৈধতা বর্তমান সংবিধান থেকে নিতে হবে সেই আইনি প্রশ্নের চেয়ে নির্বাহী ক্ষমতা বা অধ্যাদেশগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়াটা জরুরি। কারণ আমাদের

ইন্টারপ্রেটেশন অনুসারে বাস্তবতা হচ্ছে এটিই যে, নির্বাহী ক্ষমতার মাধ্যমে বর্তমান সরকার চলছে এবং সেখানে জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা বা popular sovereignty যেটি প্রকাশিত হয়েছে ২০২৪ এ তার ওপর ভিত্তি করেই আসলে বর্তমান সরকারটি চলছে এবং সেখান থেকেই বৈধতাটি এসেছে। এটি হচ্ছে ফ্যাক্ট। সে জায়গা থেকে অধ্যাদেশের ওপর ভিত্তি করে এটি হতে পারে। গণপরিষদের রূপরেখা হতে পারে LFO এবং তার অধীনে গণপরিষদ নির্বাচন হতে পারে। পরবর্তীতে ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর যে প্রকৃতি নিয়ে আলাপ হয়েছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই এটি স্পষ্ট থাকা দরকার। এখানে বিষয়টি হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস কীরকম হবে, সেটি স্পষ্ট করলে restriction টিও একইভাবে স্পষ্ট করতে হবে। আমাদের কাছে মনে হয়েছে, interpretation-এর জায়গা যদি খোলা রাখতে হয় তাহলে দুইদিকেই খোলা রাখতে হবে। এখানে কোর্টের যাতে একটি জায়গা থাকে intervein করার এটি নিশ্চিত করতে হবে জনগণের পক্ষে এবং সেজন্য রেসটিকশনগুলোকে এমনভাবেই রাখা উচিত বা কোন জায়গাটা restriction এবং পজিটিভ যে বর্ণনা, রাইটস যেমন-চলাফেরা করতে পারবেন, কোন পরিস্থিতিতে করতে পারবে না, এ ধরনের জায়গায় interpretation-এর জায়গাটি এমনভাবে রাখা উচিত যাতে সেটি জনগণের পক্ষে biased হয়। ইন্টারপ্রিটেশনটি যাতে জনগণের দেওয়াটা সহজ হয়। আমাদের কাছে মনে হয়েছে বর্তমান সংবিধানে এ জিনিসটি উল্টোভাবে কাজ করে। এটিকে এমনভাবে ইন্টারপ্রেট করা যায়, যাতে জনগণের বিপক্ষে যায়। এটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। মুলত এগুলোই আমরা চিন্তা করেছি। এন্টিডিকটরশীপ যে ক্লজগুলোর কথা বলা হয়েছে, অবশ্যই সংবিধানটি holistically এমন একটি সিস্টেম ডেভেলপ করা উচিত সংবিধানের মধ্য দিয়ে যেটি ডিকটরশীপ এলাও করবে না। এটিই নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত আমরা বলছি। কিন্তু এখানে anti dictatorship clause specifically থাকলে কোর্ট এখানে ক্ষমতাশালী হবে আরও এবং এটিকে রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ধরে কোর্টের পক্ষে বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক আচরণকে থামিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে বা আটকে দেওয়া সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি। তাই এটি আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপক ইমরান সিদ্দিক (কমিশন সদস্য): ধন্যবাদ।

আমার প্রথম প্রশ্ন, সারোয়ার তুষারের কাছে যে, রিজার্ভ সিট নিয়ে আপনাদের কোনো রিকমেন্ডেশন আছে কি না? কারণ এ ব্যাপারে অনেক কথাই এসেছে নারীদের সংরক্ষিত আসনের বিষয়ে। এখন যে অবস্থায় আছে সেটি কি আপনারা রাখার পক্ষে না কি আপনারা কোনো মডিফিকেশন সাজেস্ট করছেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসার কাছে, আপনি বলেছেন যে, একটি সুপ্রিম কোর্ট থাকবে, চীফ জাস্টিস থাকবে এবং ৮টি ডিভিশনে ৮টি হাইকোর্ট। সেটি কি আপনি হাইকোর্ট বেঞ্চ বলছেন? with permanent bench in each division. না কি There will be eight high court eight setup, eight chief Justis, eight attorney general in eight divisions. এটি বলছেন? নাকি হাইকোর্ট একটি পার্মানেন্ট বেঞ্চ থাকবে প্রতিটি ডিভিশনে? এটি একটি প্রশ্ন। আরেকটি প্রশ্ন আপনি বলেছেন যে ভোট দিতে পারবে তার ইলেকশনও করার অধিকার থাকবে। ডুয়েল সিটিজেনদের ক্ষেত্রেও আপনারা কি এটি প্রযোজ্য করবেন? যারা ডুয়েল সিসিটিজেন, তারাতো ভোট দিতে পারে। ব্রিটিশ নাগরিক, বাংলাদেশি নাগরিক তারাতো ভোট দিতে পারে কিন্তু তারা ইলেকশন করতে পারে না। অনেকে বলছেন রেসটিকশন থাকা উচিত, আবার কেউ কেউ বলেছেন উচিত না। এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কী? ধন্যবাদ।

জনাব সারোয়ার তুষার (জাতীয় নাগরিক কমিটি): ধন্যবাদ।

আমাদের সংরক্ষিত মহিলা আসন এখন আছে, কিন্তু আমরা মনে করি একটি পর্যায়ে এটি আর থাকা দরকার নেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে যেটি করা দরকার হতে পারে, প্রত্যেকটি দল যখন প্রার্থী মনোনয়ন দেবে তখন ২০ থেকে ২৫% সরাসরি নির্বাচনের জন্য নারীদের মনোনয়ন দিতে হবে। এটি এরকম করা যায় কিনা, আমরা জানিনা, এটি আমাদের প্রস্তাব। ধরা যাক, কোনো একটি পার্টিকুলার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো নারীরাই নারীদের সাথে কমপিটিশন করবে। তাতে করে যেটি হবে, এটি এ কারণে যে ঐ প্রার্থী যিনিই সংসদে যাক না কেন, তিনি নারীই হবেন। ƴƴ

অধ্যাপক ইমরান সিদ্দিক (কমিশন সদস্য): এটি করা যায় কিন্তু এটির সবচেয়ে বড় counter argument হচ্ছে যেটি আসে, তারা বলে যে আমি একজন পুরুষ হয়ে এ জায়গায় আমি নির্বাচনে দাঁড়াতে পারছি না।

সময়-১২.৪৫

এই counter argument টি কিন্তু সবসময় করে। আপনি চিন্তা করতে পারেন, যদি কোনো modification থাকে।

অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম(জাতীয় নাগরিক কমিটি): ধন্যবাদ।

আমরা ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে বলছি যে, যদি ডুয়েল সিটিজেনশীপ থাকে তিনি প্রার্থী হতে পারবেন না, কিন্তু তিনি ভোট দিতে

পারবেন। কিন্তু যিনি বাংলাদেশের নাগরিক, বিদেশে বসবাস করছেন, আমাদের দেশেও কিন্তু এভাবে হচ্ছে। যেমন- আমি ঢাকায় বসবাস করি, আমি পটুয়াখালীতে কিন্তু প্রার্থী হতে পারছি। এটিকে এরচেয়ে বড় করে দেখার সুযোগ নেই। অর্থাৎ ডুয়েল সিটিজেন হলে আমাদের আইনেও এটি নিষিদ্ধ আছে, সেটিকেই আমরা সাপোর্ট করছি। দ্বিতীয় হচ্ছে, সব বিভাগেই আলাদা হাইকোর্ট থাকবে, কিন্তু সেখানে চীফ জাস্টিস থাকবেন কি না, এটর্নি জেনারেল থাকবেন কি না, এগুলো আরও আলোচনা এবং বিতর্কের বিষয়। সে বিষয়ে এখনই আমরা concrete মতামত দিচ্ছি না। কিন্তু আমরা মনে করছি যে স্থায়ীভাবেই আলাদা হাইকোর্ট থাকা দরকার প্রতিটি বিভাগেই।

জনাব মোঃ মুস্তাইন বিল্লাহ (কমিশন সদস্য): ধন্যবাদ।

অনেকগুলো জানবার বিষয় ছিল, কিন্তু সময়ের স্বল্পতা আছে। আমরা আশা করি লিখিত প্রস্তাবে বেশ কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। স্পষ্ট করে আপনারা বলেছেন যে, আপনারা নতুন সংবিধান চান। কী হলে নতুন সংবিধান হবে বলে আপনারা মনে করেন। আমি বোঝার সুবিধার জন্য বলছি। একটি হচ্ছে সাবস্টেন্স, নতুন করে এমন কিছু বিষয় যুক্ত করা, অনেক বিয়োজন থাকতে পারে, পুনর্বিন্যাস থাকতে পারে, তার আওতায় আমরা যদি এটিকে নতুন একটি রূপ দেই, সেটি কি নতুন সংবিধান বলছেন, নাকি এই ধরনের একটি ডকুমেন্ট প্রক্রিয়াগতভাবে নতুন করে সূচনা হওয়া দরকার, সে অর্থেও আপনারা এটি মিন করছেন। আমার মনে হয় এ বিষয়টি একটু বোঝা দরকার। একটি হচ্ছে সাবস্টেন্স আরেকটি হচ্ছে ফর্ম কিংবা প্রসেস। এই দুইয়ের প্রার্থক্যটি। এটির সাথে যুক্ত আপনাদের একটি প্রশ্ন এসেছে যে, একটি লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার। আমাদের হিস্ট্রিতে এটির একটি এক্সপেরিয়ান্স আছে। আপনারা জানেন যে, ১৯৭১-এ সবচেয়ে বড় ampersand যেটি তৈরি করেছিল, Elected representative, why they should be bound to any previous legal agreement. এ তর্কটি এসেছিল। ১৯৭১ এ আমাদের যে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা ছিলেন, জাতীয় পরিষদের এবং গণপরিষদের, তাদের সাথে কিন্তু বিতর্কটিই শুরু হয়েছিল যে আমরা এটি মানতে বাধ্য কি না? কারণ আমরাতো গণপরিষদ। এটির একটি লিগ্যাল এবং কনস্টিটিউশনাল প্রবলেম আছে। আমরা বুঝতে পারি সমস্যাটি কোথায় এবং আপনাদের কোন কনসার্ন থেকে এসেছে। কিন্তু এই ধরনের একটি এগ্রিমেন্টের পরে তাদের যদি কোনো popular mandate অর্জন করা না যায়, ঐ এগ্রিমেন্টের পেছনে, তাহলে এই প্রবলেমটি থাকতে পারে। সেটি নিয়ে আপনারা কিছু ভাবছেন কি না, সেটিকে একটি popular mandate দেওয়ার কোনো প্রক্রিয়া। তারপর আমার যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে, আমি আমাদের আলোচনায় যেটি পেলাম, সেটি হচ্ছে আমাদের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য আপনারা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্যের জায়গাটিকে একটি গুরুত্বপুর্ণ উপাদান মনে করছেন, সেটি ঠিক। কিন্তু আরও যে জায়গাগুলো আমাদের, নির্বাহী ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা। নির্বাহী ক্ষমতার কর্তৃত্ব, প্রশাসনিক ক্ষমতার কর্তৃত্ব একইসাথে আমাদের আইন পরিষদে upper chamber এবং lower chamberকে মোস্টলি কিন্তুসেন্টালাইজ সিস্টেমের মধ্যে থাকছে। এটি কিন্তু খুব বেশি ইফেক্টিভ ডিসেন্টালাইজেশন হচ্ছে কি না, সেটি আপনাদের ভাবনা আছে কি না, আপনারা ভেবেছেন কি না, সেটি জানা দরকার। আরেকটি বিষয়ে প্রশ্নটি এসেছে, সেটি হচ্ছে নারীদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা এবং প্রক্রিয়া। এটি কি সরাসরি হবে কি না? আমরা আপনাদের কাছ থেকে আরেকটি বিষয় জানতে চাই সেটি হচ্ছে, বর্তমান ব্যবস্থায় তরুণদের বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের বিষয়ে আপনাদের কোনো ভাবনা আছে কি না? সেটির জন্য কোনো specific measure নেওয়া দরকার কি না? সকল পর্যায়ে নির্বাচনি ব্যবস্থার মধ্যে সেটি কীভাবে হতে পারে? ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে আপনারা যেটি বলেছেন, বয়সের কোনো লিমিট থাকা উচিত না। সেটি আমার মনে হয় একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হতে পারে, বিষয়টি করা যায়। কিন্তু তরুণদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আপনাদের এ ধরনের কোনো ভাবনা বা প্রস্তাবনা আছে কি না, সেটিও আমাদের জানা দরকার।

ধন্যবাদ।

জনাব সারোয়ার তুষার (জাতীয় নাগরিক কমিটি): গণঅভ্যুত্থানের পরে আমরা মনে করি যে, গণঅভ্যুত্থানের যে স্পিরিট, কমিটমেন্ট, সেগুলোর যদি কনস্টিটিউশনে রিফ্লেকশন থাকতে হয়, কারণ এটির কোনো গ্যারান্টি নেই যে গণপরিষদ ঐ রিফ্লেকশনটি করবে। এটির একটি ক্যু ও হতে পারে। ধরা যাক যে ভয়গুলো থাকে যে, এটি কি একটি শরিয়া রাষ্ট্র হয়ে যাবে কি না, কিংবা ধরা যাক কোনো ultra বা extremist কোনো কিছু হয়ে যাবে কি না? Both in left terms and right terms. সেক্ষেত্রে আমরা legal frame order টির কথা এ কারণে ভাবি যে, যদি আপনি একটা legal frame work-এর অধীনে গণপরিষদে গেছেন এবং তারপরে তার যে clause গুলো, সেটাকে যদি আপনি violet করেন, তখন আমাদের যে মুভমেন্ট আমরা যদি রাস্তায় নামতে চাই, সেটির legitimate থাকবে। কারণ আপনি এটাকে ভায়োলেট করেছেন। এই চিন্তা থেকেই আসলে এটা করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, যে আপনি আরেকটা কথা বলছেন সেটা হলো প্রার্থীদের ক্ষেত্রে, আমরা এটা এখানে আনি নাই কিন্তু আমরা যদি কোন রাজনৈতিক দল হয়ে উঠি, সেক্ষেত্রে এটি আমাদের ইশতেহারের মধ্যে পরিষ্কারভাবে থাকবে যে, আমাদের ৭০-৭৫% যাদেরকে আমরা প্রার্থী ঘোষণা করব তাদের বয়স ৫৫ এর মধ্যে থাকবে। এটা আমরা

এখানে বলি নাই। কিন্তু যেহেতু আমরা তরুণদের নিয়ে একটা রাজনীতি করতে চাচ্ছি, সেক্ষেত্রে তাদের প্রার্থী যারা হবে তাদের বয়স ৪৫ থেকে সর্বোচ্চ ৫০ বছর এরকম হতে পারে। এর বেশি যারা তাদেরকে আমরা হয়ত অন্যভাবে ইনভলব করতে চাইব। কিন্তু আমরা চাইব যে তরুণদের বেশি বেশি আনার ক্ষেত্রে এরকম একটা ক্লজ যদি আমরা দিই, তাহলে আমাদের সাথে বেশি বেশি তরুণরা হয়ত involved হওয়ার কথা ভাববে। এটা আমরা এখানে বলি নাই। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক ইশতেহারে হয়ত আসতে পারে।

জনাব মোঃ মুস্তাইন বিল্লাহ (কমিশন সদস্য): আপনারা রাজনৈতিক দল হিসেবে সেটা করবেন। কিন্তু সাংবিধানিকভাবে তরুণদের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তার জন্য কোনো measures আপনারা ভাবছেন কি না, সেটা সবার জন্যেই প্রযোজ্য হতে পারে। স্পেসিফিক্যালি ওইটাই আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম।

জনাব সারোয়ার তুষার (জাতীয় নাগরিক কমিটি): এটির ক্ষেত্রে আমরা এখানে কোনো প্রস্তাব দিইনি। কিন্তু আপনি যেহেতু বলেছেন, সেক্ষেত্রে স্থানীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এরকম বলেছি যে, যেমন উপজেলা চেয়ারম্যান থাকে কিংবা মহিলা চেয়ারম্যান থাকে, সে ক্ষেত্রে তরুণদেরকে এমন কোনো পদ সৃষ্টি করা যায় কিনা যেটা তারা সিলেক্টেড হয়েই তরুণরা আসবে। সেই কথা স্থানীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলা আছে। কিন্তু জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা স্পেসিফিক করে বলি নাই এখন পর্যন্ত। আপাতত আমরা একটা কথা স্থানীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলেছি যে সকল স্থানীয় নির্বাচনে অনূর্ধ্ব ৩০ বছর বয়সীদের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করে তাদেরকে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এটি হলো স্থানীয় পর্যায়ে, জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এরকম কিছু আমরা স্পেসিফিক করে বলিনি এখন পর্যন্ত।

জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কাছে একটা প্রশ্ন, আপনারা বলেছেন যে, বিশেষ করে গণঅভ্যুত্থানকে এক ধরনের সাংবিধানিক বৈধতা দেওয়ার কথা। এখানে প্রশ্নটির আগে একটু ছোট্ট ব্যাখ্যা দরকার। সেটা হলো যেহেতু mass appraisal idea টা নরমালি আসে যখন এন্টি এস্টাবলিশমেন্ট এর ক্ষেত্রে ইস্যুটা আসে। অথবা কনস্টিটিউশনাল অর্ডারটা যদি দেখা যায় স্বৈরতান্ত্রিক কোনো রূপ নেয় তখনই এই প্রশ্নটা আসে। জনগণের আকাঙ্ক্ষাটা তখন একটা অভ্যুত্থানের মতো রূপ নেয়। ভ্যালিডেশনটা যদি কনস্টিটিউশনে দিয়ে দেই তাহলে যেটা একটা কাউন্টার আর্গুমেন্ট বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে, সেটা হলো যে, অন্যরা এটির অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার চেষ্টা করে। বিশেষ করে অন্য ফোর্স গুলো যারা থাকে বিভিন্ন ধরনের। আপনারা হয়ত বুঝতে পারছেন যে তারা এইটাকে সংবিধানে এই জিনিসটা আছে। সুতরাং আমরা এটাকে ক্যাপিটালাইজেশন করি। এটিকে এভাবে চিন্তা করা যায় কি না যে, আমরা যে-সব ফান্ডামেন্টাল রাইটসগুলো আমাদের রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত, সেগুলোকেই আন কন্ডিশনাল করে দিয়ে রাইট টু মুভমেন্ট, ফ্রিডম অব অ্যাসেম্বলি আমাদের স্বাধীনতা, পলিটিক্যাল স্বাধীনতা এবং এর রিলেটেড যতগুলো আছো সেইভাবেই জিনিসটাকে কনস্টিটিউশনে আনা যায় কিনা rather than any validation clause in the preamble or any otherwise.

জনাব আরিফ সোহেল (বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন) : আমরা যেটা মনে করছি সেটা হচ্ছে, বর্তমানে সংবিধান যদি সংস্কার বা পুনর্লিখন এর দিকে যেতে হয়র তাহলে এই পুনর্লিখনটি কেন হয়েছে এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এটা এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল মনে হতে পারে। হয়ত এটা কনস্টিটিউশনের মধ্যে লেখার জরুরত টা কি সেটা একটা প্রশ্ন হতে পারে। কেন এই কনস্টিটিউশন তৈরি করা হচ্ছে? কিন্তু আমরা মনে করি যে, যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এটি তৈরি করার পথে ঐতিহাসিক ভাবে আমরা উপনীত হয়েছি। সেটা সংবিধানে থাকা উচিত। নাহলে এখানে বৈধতার যে প্রশ্নটা সেটা হাজির হবে এক সময়। তাই ২৪ এর গণঅভ্যুত্থান থেকে যে নতুন একটি সংবিধান লেখার প্রক্রিয়াটির সূচনা হয়েছে, এটা একটা রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে অন্তত সংবিধানে উল্লেখ থাকা যায় কিনা এবং সেক্ষেত্রে অন্যান্য বিভিন্ন গ্রুপের যদি এখানে সুযোগ নেওয়ার সম্ভাবনা থাকেও, তাহলে আমরা মনে করব যে, সেটা সামাজিকভাবে বা রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে। যারা রাজনৈতিক শক্তি বা সামাজিক শক্তি। কিন্তু এখানে কিছুটা ঝুঁকি থাকলেও আমরা মনে করি যে ২৪ কে একটা রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈধতার প্রশ্নে জায়গা থেকে। কারণ সংবিধান বা একটি রাষ্ট্র, রাজনৈতিক পরিসর, কীভাবে তৈরি হবে এটি নিয়ে একটি জনগোষ্ঠী নতুন করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কিন্তু কেন ওই জাতিটি ওই নতুন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলো? কোন প্রক্রিয়ায় সে ওখানে উপস্থিত হলো, এটি সংবিধানে যদি উল্লিখিত না থাকে, যেটি ৭২-এর সংবিধানে রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ৭১ আছে, এপ্রিল মাসের যে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, সেটি কিন্তু যুক্ত আছে। যদিও শেষের দিকে। যথাযথ জায়গা দেওয়া হয়নি। কিন্তু তারপরও এটি আছে। আমরা মনে করি যে এরকম কিছু থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পুরোনো যে লড়াইগুলো আছে সেগুলোকে স্বীকৃতি দিবে, একাত্তরকে স্বীকৃতি দিবে। আর ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর ক্ষেত্রে একমত, আমরা চাচ্ছি ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে যতটুকু সম্ভব inviable হিসেবে উপস্থাপন করা যায়।

জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): আপনি ভেলিডেশন বলতে স্পিরিটটিকে মিন করছেন। স্পিরিটিটি যাতে reflection হয় ঐভাবে। একটি recognition থাকবে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, আমরা প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে আমরা আলোচনা করেছি, আপনারা আমাদের সাথে থেকেছেন। আমাদের বিভিন্ন রকম প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এজন্য ধন্যবাদ। আমি যেটি আগেও বলেছি, যে কোনো অংশীজনদের সাথে আলোচনায় আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকি, আপনাদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। গণঅভ্যুত্থানে আপনাদের ভূমিকার জন্য। কেননা, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের অস্তিত্বই ঐ অর্থে আপনাদের আন্দোলনের সাফল্যের কারণে। সেজন্য আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাদের অনুমতি পেলে আমি অধিবেশনটি শেষ করব।

জনাব জাহিদ আহসান (বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন): একটা ব্যাপার ক্লিয়ার করতে চাই। আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির,কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে মনে করি এই কথা বলা পর্ব শেষ না হলে আমরা কোনো লিখিত খসড়া তৈরি করতে পারব না। এজন্য এটি দিতে আমাদের একটু সময় লাগবে। আশা করি কমিশন সেটি মেনে নেবে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমরা আপনাদের লিখিত বক্তব্যের জন্য অবশ্যই দেরি করব। দেরি করব মানে আমাদের সীমিত সময়ের মধ্যে। আপনারা সকলেই জানেন, অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে একটি তারিখ বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করছি এবং আমি বারবার যেটি গণমাধ্যমকেও বলছি, আমাদের কমিশনের সহকর্মীরা বিভিন্নরকম ব্যস্ততাকে সরিয়ে রেখে যে পরিমাণ সময় দিয়েছেন, দিচ্ছেন, আমরা চাচ্ছি যেন ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমরা কাজটি করতে পারি। সেক্ষেত্রে আপনারা একটু সহযোগিতা করবেন। কারণ আপনাদের মন্তব্য, আপনাদের বক্তব্য, আপনাদের সুপারিশগুলো আমরাতো দেখতে চাই, অন্তর্ভুক্ত করতে চাই যেখানে সম্ভব হবে। ফলে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের লিখিত ভার্সনটি দিলে আমাদের জন্য সহজতর হবে। এই কথা বলে আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এই অধিবেশনের সমাপ্তি টানছি। ধন্যবাদ।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

উনবিংশ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ০৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : দুপুর ১.০০ টা থেকে ২.৩০ পর্যন্ত

উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:

১।	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক	কমিশন প্রধান
২।	অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল	সদস্য
৪।	অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫।	ব্যারিস্টার এম. মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল	সদস্য
৬।	জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক	সদস্য

অংশগ্রহণকারী অংশীজনদের তালিকা:

১। ড. মোঃ আনোয়ার উল্যাহ, এফসিএমএ (সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়), বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন।

২। এটিএম সিদ্দিকুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন।

৩। ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন।

৪। মোঃ আশরাফ হোসেন, যুগ্মসচিব, বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন।

৫। কে এম বদরুল হক, বিসিএস কৃষি, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ।

৬। জনাব মোঃ আরিফ হোসেন, বিসিএস কৃষি, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ।

৭। জনাব মোঃ জামিলুর রহমান, বিসিএস গণপূর্ত, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ।

৮। মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, বিসিএস সমবায়, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ।

৯। মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন, বিসিএস প্রাণিসম্পদ।

১০। জনাব মাইকেল চাকমা।

১১। জনাব শহীদুল্লাহ ফরায়জী।

কার্যবাহ প্রস্তুতকারক:

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং),বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সম্পাদনায়:

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং),বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহ

কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ, আমি এই সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে সংবিধানের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকের এই অধিবেশনের শুরুতে আমরা সেইসব শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং যারা আহত হয়েছেন তাঁদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যরা তাঁদের পরিচয় দেবেন।

(কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির সক্রিয় অংশীদার হিসেবে এবং পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করার অর্থে সংবিধানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা ১০ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে সকলের মতামত শোনা এবং আলোচনা করার সুযোগ হবে। আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব লিখিত আকারে দিলে আমাদের সহায়ক হবে। বক্তব্যের শুরুতে আপনার নাম এবং আপনি যে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করছেন তার নাম উল্লেখ করলে আমাদের পক্ষে নোট নেওয়া সহজ হবে। আমরা আজকের অনুষ্ঠান শুরু করব মাইকেল চাকমার বক্তব্য দিয়ে।

মাইকেল চাকমা: ধন্যবাদ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষ থেকে আমাকে আজকে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সভায় বক্তব্য তুলে ধরার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, একজন নাগরিক হিসেবে আমি সংবিধান সংস্কার কমিশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগস্টের চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষ থেকে অধ্যাপক আলী রীয়াজসহ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৯৭২ সালের সংবিধানের আগ পর্যন্ত ঐতিহাসিকভাবে একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত ছিল। ব্রিটিশ আমলে ১৮৭৪ সালের "Scheduled *Districts Act 1874*"এর অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি "Scheduled *Districts*", ১৯১৫ সালের "ভারত সরকার আইন"-এর অধীনে "Backward Track", ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের অধীন ও ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে excluded area এবং ১৯৭২ সালেও পাকিস্তানের অধীনের "Tribal Area" হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর দেশের নতুন সংবিধানে অর্জিত ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ শাসনতান্ত্রিক মর্যাদাদানের দাবি জানানো হলেও তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে এ অঞ্চলের জনগণের অধিকার ও মর্যাদা ক্ষত্ন হয়। ফলে রক্তক্ষয়ী এক সংঘাতের জন্ম হয়। আমরা আশা করি, এই ইতিহাসগুলোর পুনরাবৃত্তি আর ঘটবে না। আপনাদের নেতৃত্বে সংবিধান সংস্কার বা পুনর্লিখন হবে। তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের তার বিশেষ শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা ফিরে পাবে এবং এই অঞ্চলের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। এই আশা নিয়েই আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি।

একই সাথে আমি আরও কিছু বিষয় যোগ করছি। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়ে আমাদের কিছু সুনির্দিষ্ট লিখিত প্রস্তাবনা আছে। এই প্রস্তাবনা আমি যথাযথ সময়েই আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। সেটি বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, সেটি আমি বিস্তারিত বলছি না। তবুও এখানে সংক্ষিপ্তভাবে যেটুকু বলতে হয় ততটুকই তুলে ধরছি। ১৯৭২ সালে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল, আমরা আশা করেছিলাম, সেখানে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। কিন্তু দেখা গেল বাস্তবে সেরকম কিছু ঘটেনি। বরং আমরা দেখেছিলাম এখানে তিক্ত হলেও সত্য যেটি পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে মর্যাদা ছিল, দেশ স্বাধীনের পর যে সংবিধান হয়েছে সেটুকুও রাখা হয়নি। যদিও আমরা দেখেছিলাম, ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানের সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ উপজাতি এলাকা যে মর্যাদা ছিল সেটি বাতিল করেছিল তারা। তারপর ১৯৬৬ সালে ঢাকা হাইকোর্ট কর্তৃক Hill-tracts manual-এর ৫১ ধারা বাতিল করে দেয়। এরপর যা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত অনুপ্রবেশের যে বিধিনিষেধ ছিল, সেটি উঠে যায় এবং সেখানে বাইরে থেকে বহিরাগত অনুপ্রবেশ বড় আকারে শুরু হয়। মূলত ৫১ বিধিতে বহিরাগত প্রবেশের নিয়ন্ত্রণ আরোপ ছিল। এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশের ফলে সেখানে পাহাড়িরা

চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনুপ্রবেশ বা বসতিস্থাপন ব্যবস্থা পাহাড়িদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিকাশের জন্য অপরিহার্য হলেও তা ক্ষত্ন হয়ে যায়। এজন্য আমি মনে করি, ১৯৭১ সালে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে পার্বত্যবাসীদের সাথে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব মীমাংসার দায়িত্ব বর্তেছিল তখন যারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে ছিল তাদের ওপর বা রাষ্ট্রের ওপর। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদের জোয়ারে ভেসে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অধিকতর ফ্যাসিবাদী নীতি বা চেহারা বা রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পাকিস্তান আমলে শেখ মুজিব লাহোর প্রস্তাবেরভিত্তিতে পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন। লাহোর প্রস্তাবে সংখ্যালঘুদের যে অধিকার স্বীকৃত ছিল স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান তা ভুলে গেলেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের যে দাবি সে দাবিকে নাকচ করে দিলেন। শুধু তা নয়, উপরন্তু আমরা দেখেছি, শেখ মুজিব কীভাবে তার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে ১৯৭৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটিতে পুরাতন কোর্ট ভবনে যে বিশাল সমাবেশ হয়েছিল সেদিন তিনি তার সকল দর্শক শ্রোতাদের হতাশ করে তিনি বলেছিলেন, পাহাড়িদেরকে বাঙালিতে পদোন্নতি দিচ্ছি। শেখ মুজিবুর রহমানের এই যে বক্তব্য ছিল, সে বক্তব্যে কিন্তু পাহাড়ি জনগণ বা সেখানকার স্থানীয় যারা জনগণ ছিলেন তারা সহজভাবে গ্রহণ করেনি। তারপর এই যে সংবিধান রচিত হলো, তারপর থেকে যতবার সংশোধন আনা হয়েছিল, ততবারই কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে বৈষম্য হয়েছে। অন্তত পাকিস্তান পিরিয়ডের যে অধিকারগুলো ছিল সে অধিকারগুলো কোনোভাবেই এখনও প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। এমনকি সেখানকার জনগণের যে সাধারণ আশা আকাঙ্ক্ষা, দাবি, সেই দাবিকে কখনও যথাযথভাবে মেনে নেওয়া হয়নি। আমি একজন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আজকে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলব, এই যে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন হয়েছে, নতুন বাংলাদেশের কথা বলা হচ্ছে, দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে, আমরা আশা করি এই নতুন বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ যথাযথ ন্যায়বিচার পাবে এবং তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এই নতুন বাংলাদেশে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে আমরা নিজেদের মতো করে সম্মান ও মর্যাদার মধ্য দিয়ে এই দেশে বসবাস করতে পারব। সেই প্রত্যাশা আমি রাখছি। আমাদেরতো অনেক চাওয়ার আছে। সমতলের মানুষজন যেভাবে আশা আকাঙ্ক্ষা করেছে ঠিক সেরকম আশা আকাঙ্ক্ষা আমরাও করি। আমি আরেকবার সেই আকাঙ্ক্ষার কথা পুনর্ব্যক্ত করে আমার লিখিত প্রস্তাব যেটুকু আছে যথাসময়ে আমি এই কমিশনকে হস্তান্তর করব। সেই সুযোগ আশা করি পাব। সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আপনার লিখিত বক্তব্যের জন্য আমরা অপেক্ষা করব। নিশ্চয় আপনি লক্ষ্য করবেন যে, আমাদের সময়ের স্বল্পতার একটি বিষয় আছে। কারণ ৩০ তারিখের মধ্যে আমাদের সুপারিশগুলো দেওয়ার কথা। আপনি যদি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এগুলো সরবরাহ করেন, আমাদের কাজে সহযোগিতা হবে। আমি এখন আহ্বান জানাব জনাব শহীদুল্লাহ ফরায়েজিকে তাঁর বক্তব্য দেওয়ার জন্য।

জনাব শহীদুল্লাহ ফরায়জী (অংশীজন): জনাব আলী রীয়াজসহ সংবিধান সংস্কার কমিশনের সম্মানিত সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ভালোবাসা জ্ঞাপন করছি। আমি ১০ মিনিটের মধ্যেই আমার সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনা শেষ করব এবং লিখিত প্রস্তাবনা আপনাদের কাছে হাজির করব।

আজকে বক্তব্যের শুরুতেই অগণিত ছাত্র-জনতা, শিশু ও নারীর মূল্যবান জীবনের বিনিময়ে আজ আমরা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র বিনির্মাণের স্বপ্নের স্থাপত্য সংসদ ভবনে মিলিত হয়েছি। যাদের আত্মত্যাগ, যাদের অঙ্গ হারানো, যাদের দৃষ্টিশক্তি হারানো, যারা গুপ্ত হত্যার শিকার, যারা রাষ্ট্রের গোপন বন্দিশালায় বন্দী থেকে আমাদের মুক্তি করেছেন তাদের প্রতি অগণিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করছি। এই অঞ্চলের মানুষ বিশেষ করে শোষিত, নিপীড়িত বাঙালি জনগোষ্ঠী নিজেদের মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭১ সালে নিজেরা নিজেদের সংবিধান প্রণয়নের জন্য অভূতপূর্ব, অসম সাহসিকতা, অনন্য সাধারণ বিপ্লবী ভূমিকার কারণে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের জনগণ সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এবং জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা এবং দৃঢ় বিশ্বাসে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য ও মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার এই ত্রয়ী দার্শনিকভিত্তিতে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নকালে স্বাধীনতার মর্মবস্তুকে উপেক্ষা করার ফলে রাষ্ট্রগঠন এবং পুনর্গঠনের বিরাট সম্ভাবনা হাতছাড়া হয়ে যায়। একটি কঠিন বাস্তবতা আপনাদের সামনে হাজির করার সুযোগ পেয়েছি। সেটি হলো আমাদের রাষ্ট্রগঠনের দার্শনিকভিত্তিকে উপলব্ধি করার সীমাবদ্ধ বিপদটাই আমাদের রাষ্ট্রের বিপর্যয়ের প্রধান শত্রু। আমাদের বিপর্যয়ের কারণ কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়। বরং এর কারণ ঐতিহাসিক। যার বাস্তবতা হলো রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তিকে পুরোপুরি না বুঝার ফের। এই দার্শনিক ভিত্তি যথার্থ উপলব্ধি এবং চর্চা করতে পারলেই জাতীয় রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। ত্রয়ী দার্শনিক ভিত্তিকে প্রজাতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা না করে তা ধারণ এবং লালন না করায় রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক মডেল

অক্ষত থেকে যায়। অর্থাৎ পুরানো শাসন এবং শোষণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা জনগোষ্ঠীর উচ্চতর আশা আকাঙ্ক্ষা এবং অভিপ্রায়ভিত্তিক রাষ্ট্র অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতা, জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রবণতা প্রকট হয়, রাজনৈতিক সংকট গভীরতর হয়ে, একদলীয় বাকশাল ১৯৭২ সালে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। পরবর্তীতে সামরিক শাসন, রাষ্ট্রপতি হত্যাসহ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও রক্তাক্ত অধ্যায়ের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে অগণতান্ত্রিক, ব্যক্তিতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক অপরাজনীতির উত্থান ঘটে। গত ১৫ বছরে রাষ্ট্রকে আইন বহির্ভূত দুর্বৃত্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে গড়ে তোলা হয়েছে। সমগ্র দেশকে কারাগারে পরিণত করা হয়েছিল। ৮টি গোপন বন্দিশালা নির্মিত হওয়ায় এবং বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ায় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি রাষ্ট্রের চরিত্র হারিয়ে ফেলা একটি ভূখণ্ডে পরিণত হয়। বিপুল অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন ও অর্থসম্পদ পাচারের ফলে এবং নির্বাচনি প্রতারণার মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে রাখার দীর্ঘ প্রক্রিয়া রাষ্ট্রকে নৈতিক এবং আর্থিকভাবে ধ্বংস করে। বাংলাদেশ যে একটি প্রজাতন্ত্র তা অতীত স্মৃতিতে পরিণত করে দেয়। রাষ্ট্র এবং জনগণের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় শিকার এবং শিকারির। মুক্তিযুদ্ধের নামে, স্বাধীনতার চেতনার নামে ভয়ঙ্কর অপরাধী এক অনমনীয় অবিনশ্বর বয়ান হাজির করে শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী সরকার। আমাদের প্রিয় ছাত্র জনতা মৃত্যুকে সংবর্ধিত করে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, হাজার প্রাণ, হাজার স্বপ্ন, হাজার দৃষ্টিশক্তিকে নৈবেদ্য দিয়ে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের এক স্বপ্ন হাজির করেছেন। সংবিধানকে যদি নৈতিকভাবে লালন করা না হয়, তাহলে শাসকদের খেলার পুতুলে পরিণত হয়। শুধু আইন দ্বারা রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হবে না, যদি রাষ্ট্র পরিচালনাকারীরা গণতন্ত্রের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রদর্শন না করে। কারণ আইন হচ্ছে যান্ত্রিক যা মানুষের সংস্পর্শে সচল হয়। আমি কমিশনের আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনাদের সংবিধান সংস্কারের মূল ভিত্তি হবে রাষ্ট্রকে দর্শনগতভাবে উপস্থাপন করা। জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং আইনগত সার্বভৌমত্ব সংগত উপায়ে ও ন্যায়সংগতভাবে বণ্টন করা। সংবিধান সংস্কার কমিশনের এবং আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে দীর্ঘ ফ্যাসিবাদ আমাদের ন্যায্য উপলব্ধির সামর্থ্যকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। শুভ চিন্তার সামর্থ্যকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। তাই আমাদের আত্মঘাতী প্রবণতা ও যৌক্তিক সংস্কৃতির হ্যাজিমনি অন্ধ দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় রেখে আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বেশ কিছু বিষয় বিশেষ করে রাষ্ট্রের দার্শনিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতি নির্দেশনা উল্লেখ করা খুবই জরুরি। তাই আমার প্রস্তাবে ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তে দার্শনিক ভিত্তিকে বারবার পুনর্ব্যক্ত করেছি। সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করেছি, রাষ্ট্রের আদর্শ হবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার। এই ত্রয়ী হচ্ছে রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি। গণতন্ত্র হবে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি এবং নাগরিক জীবনের সুরক্ষা হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এই ৫টি হবে রাষ্ট্রের দার্শনিক ও প্রায়োগিক ভিত্তি। প্রস্তাবনায় আরও উল্লেখ করতে হবে যে আমরা কীসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা কীসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মানুষের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের স্বৈরাচার বা ফ্যাসিবাদ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র কখনও ফিরে আসবে না। প্রজাতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রূপান্তর করে বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থাই হবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আমাদের দৃ ঢ়প্রতিজ্ঞা, determined শুধু জনগণের অভিপ্রায়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। কোনো বাইরের শক্তি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সংবিধানের দর্শন অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনায় আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের জাতীয় ঐক্য, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জাতীয় ঐক্য হবে সকল অপশক্তি মোকাবেলা করার প্রেরণা। আর আমরা guided থাকব, আমরা কী দ্বারা নির্দেশিত হবো। আমরা guided থাকব সাম্য মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এই ত্রয়ী দর্শনের ভিত্তিতে দেশজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে ১৯৭১ ও ২০২৪ এর নির্দেশনায় পরিচালিত হওয়া। আমরা ঘোষণা করব, রাষ্ট্রের সকল আইনের উৎস হবে মানবিক মর্যাদা সুরক্ষা করা। রাষ্ট্র সকল মানুষের পূর্ণ মানবিক মর্যাদা সুনিশ্চিত করবে। রাষ্ট্র কোনো অবস্থায় মানুষের মর্যাদা বিপন্ন করবে না। এছাড়া আমি ৩৯টি অনুচ্ছেদের সংশোধন বা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করেছি। নতুন কয়টি অধ্যায় যোগ করেছি। রাষ্ট্রের আইনগত, দর্শনগত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারির ১০ এপ্রিলকে প্রজাতন্ত্র দিবস ঘোষণার দাবি করেছি। জাতীয়তাবাদ প্রশ্নটিকে স্থায়িত্ব বিকাশের স্বার্থে এবং পরাশক্তির সীমান্ত অতিক্রমের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিরোধ করার জন্য বেশ গুরুত্ব দিয়েছি। সংবিধান লঙ্ঘন করে যারা অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসীন হবে তাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থানকে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাবনা দিয়েছি। বিদ্যমান সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতি বলে যে অপব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে আমি রাষ্ট্রের নির্দেশনামূলক নীতি বলে উল্লেখ করেছি। রাষ্ট্রপতি, সংসদসহ নির্বাচিত সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ ৪ বছর করার প্রস্তাব করেছি। আমি মন্ত্রিপরিষদকে যৌথভাবে এবং এককভাবে সংসদের নিকট জবাবদিহিতার প্রস্তাব দিয়েছি। ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করেছি। সংসদের উচ্চকক্ষ সৃজন এবং উচ্চকক্ষে শ্রমজীবী, কর্মজীবীদের প্রতিনিধিত্ব চেয়েছি। বিদ্যমান সংকুচিত গণতন্ত্রকে আরও সম্প্রসারিত করে অংশীদারিত্বের গণতন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছি। আমি প্রধান বিচারপতিকে বেঞ্চ গঠন এবং ভেঙে দেওয়ার মত অসীম ক্ষমতাকে আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দিয়েছি। রাষ্ট্রপতি শপথ গ্রহণ করবেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির নিকট, বিদ্যমান ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি শপথ গ্রহণ করেন স্পীকারের নিকট। যা রাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের সাথে আত্মঘাতী। প্রধান বিচারপতি শপথ পড়াবেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে। দুইটি প্রজাতন্ত্রের পদ আছে। একটি হচ্ছে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং অন্যটি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি। কিন্তু আমাদের বিচার বিভাগকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি স্পীকারের কাছে শপথ নেয়। এটি আমাদের মৌলিক প্রশ্ন। প্রধান বিচারপতির নিকট রাষ্ট্রপতি শপথ নেবেন। আর স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারও প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ নেবেন।

আমি বাংলাদেশের সংবিধানে একটি নতুন বিষয় উত্থাপন করেছি। যেটি আমাদের সংবিধানে নেই। সেই হচ্ছে জনগণেরও একটি মৌলিক দায়িত্ব আমাদের দেওয়া দরকার। জনগণের কর্তব্য। আমরা শুধু রাষ্ট্রের মৌলিক কর্তব্য দিয়েছি। জনগণের মৌলিক কর্তব্য হিসেবে আমি ১০টি মৌলিক কর্তব্য সংযোজন করেছি। মৌলিক অধিকারের পরে এই নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছি মৌলিক কর্তব্য হিসেবে। আমি শৃঙ্খলাবাহিনী থেকে পুলিশ বাহিনীকে অব্যাহতি চেয়েছি। আমি শপথ লঙ্ঘনকারীদের আইনের আওতায় আনার প্রস্তাব দিয়েছি। যারা শপথ গ্রহণ করেন কিন্তু শপথ লঙ্ঘন করার পর তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। এটি আমাদের সংবিধানকে আরও জটিল করে তুলেছে। যারা শপথ গ্রহণ করবেন, তারা শপথ লঙ্ঘন করলে তাদের আইনের আওতায় নিতে হবে। অগণিত আত্মত্যাগ এবং লড়াইয়ের পর ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আপনারা সংবিধান সংস্কারের মহান দায়িত্ব পেয়েছেন। আমি আশা করি. রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি হবে সংবিধান প্রণয়নের পূর্ব শর্ত। সুতরাং সংবিধানের প্রস্তাবনা দার্শনিক ভিত্তি, অঙ্গীকার, নির্দেশনা এবং ঘোষণার বিষয়েও উল্লেখ থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই প্রস্তাবনা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করবে এবং যুগের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। এতে সংবিধান হবে অতীত এবং ভবিষ্যতের সেতু এবং সময়ের দর্পণ। আমাদের জনগোষ্ঠীর একমাত্র মন্ত্র, ধ্যান, জ্ঞান হচ্ছে গণতন্ত্র। উচ্চতর গণতন্ত্রকেই রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং ক্ষমতায়নে কার্যকর করতে হবে। সর্বশেষ কথা হচ্ছে কোনো প্রস্তাবই নিরঙ্কুশ নয়। কোনো তত্ত্বও স্বতঃসিদ্ধ বা চিরন্তন নয়। আর মানুষ হিসেবে আমরাও সর্বজ্ঞ নই। তবুও আমি আশা করি সংবিধান সংস্কার কমিশন জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় তথা প্রজাতন্ত্রের ওপর জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে একটি সাংবিধানিক প্রস্তাবনা উপহার দিয়ে ঐতিহাসিক সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করার মহৎ নৈতিকত্ব সম্পন্ন করবেন। আমি আরাও আশা করি, বহু মতের বহু কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনির মাঝে আমার প্রস্তাবগুলো আপনাদের সুবিবেচনায় থাকবে, সুনজর থেকে বঞ্চিত হবে না। আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): আন্তঃক্যাডার প্রতিনিধিদলের একটি প্রতিনিধিদল এখানে উপস্থিত আছে। আমি অনুমান করছি আপনাদের পক্ষ থেকে একজন বক্তব্য রাখবেন। আপনারা যদি আপনাদের প্রত্যেকের পরিচিতি দেন তাহলে রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।

(অতঃপর সকলে তাদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)

আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনাদের একটি লিখিত বক্তব্য আছে। তার সারসংক্ষেপ যদি উপস্থাপন করেন এবং আপনাদের লিখিত বক্তব্যটি আমাদের কাছে দেওয়া হলে রেকর্ডে যুক্ত হবে। কমিশন সেগুলো বিবেচনা করবে। আপনাদের প্রস্তাবগুলোর সারসংক্ষেপ যদি উপস্থাপন করেন।

জনাব আরিফ হোসেন (বিসিএস কৃষি, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ): ধন্যবাদ স্যার।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রথমেই আমরা আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা জনাচ্ছি এবং আমরা আশা করছি আপনার নেতৃত্বে যে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে এটি অত্যন্ত সুন্দর এবং প্রাঞ্জল একটি প্রস্তাবনা আমাদের অন্তর্বর্তী সরকারের নিকট পেশ করবে। বিশেষ করে অধ্যাপক আলী রীয়াজ স্যারের প্রতি আমাদের অনেক আস্থা, আপনি অনেক দূর থেকে অনেক কিছু ত্যাগ করে দেশপ্রেমের কারণে এখানে এসেছেন। আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আপনার সুস্বাস্থ্য এবং কমিশনের একটি সার্থক রূপকার হিসেবে আপনাকে কামনা করছি।

মাননীয় কমিশন, গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৭১ এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদদের। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ২০২৪ সালের অকুতোভয় ছাত্র জনতাকে যারা বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। হাজারো প্রাণ এবং কোটি মানুষের দীর্ঘশ্বাসের বিনিময়ে বৈষম্যহীন দেশ গঠনে গঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বৈষম্যহীন ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের জন্য রাষ্ট্র সংস্কারে মনোনিবেশ করেছে। সরকারের সকল সেক্টরের পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের কাজ করে থাকে সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাগণ। বিগত দিনে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডারগুলোর মধ্যে সীমাহীন বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। স্ব স্ব পেশাজীবীদের সেবা থেকে দেশকে বঞ্চিত করা হয়েছে। প্রতিটি সেক্টরে নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন অদক্ষ ও অপেশাদারদের হাতে থাকায় দীর্ঘদিনেও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হয়ে ওঠেনি বাংলাদেশ। ফলে একদিকে বৈষম্যের শিকার ক্যাডার সদস্যগণ তাদের দায়িত্ব পালনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন অদ্যদিকে মেধার যথাযথ মূল্যায়ন না থাকায় স্বাধীনতার ৫৩ বছর পেরিয়ে গেলেও জনবান্ধব সরকার কাঠামো গড়ে উঠেনি। যেহেতু রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সিভিল

প্রশাসন, তাই টেকসই উন্নয়নের জন্য জনবান্ধব সিভিল সার্ভিস প্রয়োজন। আবার চাকুরিতে প্রবেশকালে কোটা বৈষম্য দূর করতে গিয়ে ছাত্ররা তাদের বুকের রক্ত ঝড়ালো ঠিক একই রকম চাকরিতে প্রবেশ করার পর বৈষম্য দূর করে তাদের সুন্দর একটি কর্মপরিবেশ উপহার দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমাদের পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ২৫ ক্যাডারের সমস্যা সমাধানে গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের অন্তরায়সমূহ পর্যালোচনা করতে গিয়ে ৩টি মূল সমস্যা আমরা চিহ্নিত করেছি।

১। মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ ও অপেশাদার কর্মকর্তা পদায়ন

২। আইনের ব্যত্যয় ঘটিকে উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদে কোটা পদ্ধতি প্রয়োগ

৩। আন্তঃক্যাডার বৈষম্য।

উল্লিখিত ৩টি সমস্যা সমাধান করলে সিভিল সার্ভিসের ক্যাডারগুলোর মধ্যে বৈষম্য দূর হবে ও জনবান্ধব রাষ্ট্রকাঠামো তৈরি হবে। বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধান ও সংবিধানের যে অনুচ্ছেদ, উপ-অনুচ্ছেদের সাথে বিদ্যমান ব্যবস্থা সাংঘর্ষিক আমরা তার ব্যাপারে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই।

বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ রাষ্ট্রপরিচালনারর মূলনীতি-এর অনুচ্ছেদ-১৯ এর (১) এ বলা হয়েছে ''সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে।''

অনুচ্ছেদ ২০(১) এ ''কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্ম অনুযায়ী"- এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।''

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগ মৌলিক অধিকার-এর অনুচ্ছেদ ২৯(১) এ বলা হয়েছে, '' প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।''

বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ভাগ, বাংলাদেশের কর্মবিভাগ প্রথম পরিচ্ছেদের অনুচ্ছেদ ১৩৩ এ ''এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এই উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিধিসমূহ-প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোনো আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে অনুরূপ বিধিসমূহ কার্যকর হইবে।'' বাংলাদেশ সংবিধানের উল্লিখিত ধারারসমূহের অস্পষ্টতা থাকায় মূলনীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রতিটি ক্যাডারের অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তাদের স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে নিয়োগ না দিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ ও অপেশাদার কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে। এমনকি কিছু কিছু ক্যাডারের মহাপরিচালক পদেও প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হয়ে থাকে। যা সুস্পষ্টভাবে সংবিধানের মূল চেতনার পরিপন্থি। এমতাবস্থায় আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ আশা করে, সংবিধানের ধারাগুলোকে আরও স্পষ্ট করে বৈষম্যগুলোকে দূর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ ও অপেশাদার কর্মকর্তা পদায়নে যে সমস্ত সমস্যা হয় আমরা তা চিহ্নিত করেছি। এর ফলে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সমস্যা হয়। জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার অভাব ঘটে। দৈনন্দিন কাজে দীর্ঘসূত্রিতা হচ্ছে। বিভিন্ন খাতে ব্যর্থতা ও জনগণের অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে। সিভিল সার্ভিসে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মাধ্যমে রাজনীতিতে স্বৈরাচারীত্ব কায়েমে সহযোগিতা করা হচ্ছে।

এরপর ২নং সমস্যায় যেটি উল্লেখ করেছি। উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদে কোটা পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে বিরাজমান সমস্যাসমূহ। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"। বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ যেখানে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিতে যে সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা, সংবিধানের তৃতীয় ভাগে যেখানে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে ২৯(১) অনুচ্ছেদে যে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ ও পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। ২৯ (৩) অনুচ্ছেদে নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশ যাদের প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। অথচ সংবিধান লঙ্ঘন করে প্রশাসন ক্যাডার উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদে কোটা পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে অন্যান্য ক্যাডার সদস্যদের সাংবিধানিক অধিকার হরণ করে চলেছে। প্রজাতন্ত্রের প্রশাসন সংস্কারে এ যাবত যতগুলো কমিশন গঠিত হয়েছে তারা প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি পদসমূহে উন্মুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়োগের কথা বলেছেন। অথচ ২০১৮ সালের ১৪ নভেম্বর Services Reorganization and Conditions act 1975 রহিত করে এবং ২০২৪ সালে প্রশাসন ক্যাডারভুক্ত সকল কর্মকর্তাদের জন্য সরকারের উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদ তফসিলভুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে সরকার উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদে পদোন্নতির জন্য প্রশাসন ক্যাডার সদস্যদের আর কোনো পরীক্ষা বা এসএসবি বোর্ডের সম্মুখীন

হতে হবে না। অন্য ক্যাডারের জন্য এসব পদ অঘোষিতভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদে কোটা পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে যে সমস্ত সমস্যা হচ্ছে তা হচ্ছে কোটার প্রাধান্য, মেধার অবমূল্যায়ন ও জনসেবা বিঘ্ন যা ছাত্র জনতার আন্দোলনের চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। মন্ত্রণালয়গুলোতে ভারসাম্যহীনতা ও একটি ক্যাডারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। মন্ত্রণালয়গুলোতে একটি ক্যাডারের সদস্যদের জবাবদিহিবিহীন সংস্কৃতি, কোটায় নিয়োগ পেয়ে সকল মন্ত্রণালয় বা সেক্টরে আধিপত্যের মনোভাব, সিভিল সার্ভিসের উদ্দেশ্য ব্যাহত, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য সৃষ্টি ও সংবিধান পরিপন্থি কর্মকাণ্ড।

আন্তঃক্যাডার বৈষম্যের ৩ নম্বর দাবিতে আমরা বলেছিলাম, বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি, সেখানে অনুচ্ছেদ ২১(২) এ সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা, প্রজাতন্ত্রে কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। জনগণের সেবক কখনই প্রশাসক হতে পারে না। তাই কোনো ক্যাডার বা পদের নামের সাথে প্রশাসক থাকা অসাংবিধানিক বলে আমরা মনে করি। বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগ, নির্বাহী বিভাগ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, স্থানীয় সরকার। ''আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।'' এই ধারা অনুসারে জেলা উপজেলার সকল দপ্তরসমূহকে স্থানীয় সরকারের ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে এবং সমন্বয়ের নামে এককভাবে কাউকে অতিক্ষমতায়িত না করার জন্য আমরা সবিনয়ে অনুরোধ করছি।

যাতে স্থানীয় সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতি কমানো সম্ভব হবে এবং জনগণ সহজেই কাঙ্ক্ষিত সেবা পাবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদে ৫৯(২) এ বলা হয়েছে যে ''এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যে-রূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয়সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে:"

৫৯(২)(ক) বলা হয়েছে, 'প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য;" এখানে প্রশাসন শব্দটি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশ সংবিধানের সপ্তম ভাগ নির্বাচন। ''এই ভাগের অধীন নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যে-রূপ কর্মচারী প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করিলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ কর্মচারী প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।'' নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে। অথচ শুধু একটি ক্যাডার সহায়তার নামে সকলের ওপর খবরদারি করে এবং অন্য সকল দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রিজাইডিং, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়। নির্বাচনকালীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনার দায়িত্বে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ন্যস্ত করলে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে।

বাংলাদেশের সংবিধানের নবম ভাগ। বাংলাদেশের কর্মবিভাগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। অনুচ্ছেদ ১৩৭ এ বলা হয়েছে, '' আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারি কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাইবে এবং একজন সভাপতিকে ও আইনের দ্বারা যে-রূপ নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ অন্যান্য সদস্যকে লইয়া প্রত্যেক কমিশন গঠিত হইবে।'' অনুচ্ছেদ ১৩৮ (১) এ বলা হয়েছে, '' প্রত্যেক সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতি ও অনানা সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন- তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অর্ধেক (তবে অর্ধেকের কম নহে) সংখ্যক সদস্য এমন ব্যক্তিগণ হইবে, যাহারা কুড়ি বৎসর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন সময়ে কার্যরত কোন সরকারের কর্মে কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।'' এই ধারার অপব্যবহারের মাধ্যমে সকল কমিশনে প্রশাসন ক্যাডার প্রাধান্য পায়, কারণ কমিশনগুলো কোনো না কোনো মন্ত্রণালয় প্রস্তাব করে থাকে। অথচ বিগত সকল পিএসসিতে এবং অন্য সকল কমিশনে এমনিক বর্তমান সময়ে গঠিত বিভিন্ন কমিশনেও একটি বিশেষ ক্যাডারের সদস্যদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানে বিষয়সমূহের ওপর সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হলে সংবিধানের অপব্যবহার রোধ করে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ ও জনসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি। প্রশাসন ক্যাডার ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি, সুপার নিউমারারি, ইনসিটু ও ভূতাপেক্ষিক পদোন্নতির ব্যবস্থা করে নিজেদের সময়মতো পদোন্নতির ব্যবস্থা করে নিয়েছে। অথচ অন্য ক্যাডারের ক্ষেত্রে এসব সুবিধা অনুপস্থিত। বিভিন্ন ক্যাডারকে নিম্নপদে আটকে রেখে প্রতিষ্ঠানসমূহের এক বা একাধিক পদে একটি ক্যাডারের আধিপত্য রয়েছে। শুধু প্রশাসন ক্যাডারের জন্য গাড়ি ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করে অন্য ক্যাডারের সঙ্গে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, উচ্চতর গবেষণা ও শিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হয়েছে। Warrant of Precedence যথাযথ পদক্রমের অনুপস্থিতি। আমরা বিশ্বাস করি জনবান্ধব ও জনগণের সরকার নিশ্চিত করতে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এসব বৈষম্য নিরসনে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। সেক্ষেত্রে আমরাও সরকারের সাথে থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার এ কর্মযজ্ঞে সরকারকে সহযোগিতা করতে আগ্রহী।

ধন্যবাদ, সকলকে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমরা এর পরে বাংলাদেশ Bangladesh *Administrative Service Association* এর যে দল আছে তাদের কাছে যাব। আমি প্রথমেই অনুরোধ করব উপস্থিত যারা আছেন তারা নিজেদের পরিচয় দেবেন এবং পরবর্তী সময়ে *Association*-এর পক্ষ থেকে আপনাদের বক্তব্য যদি সংক্ষেপে ১০ মিনিটের মধ্যে তুলে ধরেন। লিখিত বক্তব্যটি আমাদেরকে পরে সরবরাহ করেন তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে। Bangladesh *Administrative Service Association*

(উপস্থিত সকলেই তাদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।)

ড. মোঃ আনোয়ার উল্লাহ্‌, এফসিএমএ (সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় এবং সভাপতি, Bangladesh *Administrative Service Association*): সংবিধান সংস্কার কমিশনে শ্রদ্ধেয় আলী রীয়াজ স্যারের নেতৃত্বে যে কমিশন দীর্ঘ দুই মাস থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন এবং মাননীয় সদস্যবৃন্দ যারা স্যারের সাথে কাজ করছেন আমি তাঁদেরকে অভিবাদন জানাচ্ছি এবং আজকে আমাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমরা একটি পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আজকে এই আলোচনার টেবিলে বসেছি। এই যে তরুণ ছাত্র জনতা বিশেষ করে তরুণরা যে পরিবর্তিত বাংলাদেশ আমাদের সামনে আজকে তৈরি করে দিয়েছেন, তারই ধারাবাহিকতায় আজকে এই সংবিধান সংস্কার কমিশনের যে কনসালটেশন মিটিং সেই সুযোগ আমরা পেয়েছি এবং সেই পরিবর্তনের ধারাটিকে আমরা কীভাবে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাব এবং একটি পরিবর্তিত বাংলাদেশ তৈরি করব। আমি Bangladesh *Administrative Service Association*-এর পক্ষ থেকে যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করব, বিশেষ করে আমাদের কর্মবিভাগে অর্থাৎ প্রশাসনের যে অংশটুকু, আমাদের আন্তঃক্যাডারের যে সমস্ত সহকর্মী এখানে এসেছেন, তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাদের কথা শুনেছি, আমার কাছে মনে হয়েছে তাদের বক্তব্যগুলোর ক্ষেত্রে অনেক যৌক্তিকতা থাকতেই পারে। বিশেষ করে যেহেতু আমরা প্রশাসন ক্যাডারের সদস্য, প্রশাসন ক্যাডারের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনের প্রধান, আমি মনে করি আমাদের এই বৈষম্যের জায়গাগুলো দূর করার জন্য সংবিধান সংশোধনে যে সমস্ত জায়গাগুলোতে হাত দেওয়া দরকার, সেটিকে আমি অবশ্যই স্বীকার করি। বিগত কয়েক বছরে বিশেষ করে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আমরা যে সামগ্রিক অপরাজনীতির শিকার হয়ে আমাদের যে আদর্শ, আমাদের যে নৈতিকতা, সিভিল সার্ভিসের যে morality সে জায়গা থেকে বিচ্যুত হয়েছি। হয় আমরা হয়েছি অথবা আমাদেরকে বিচ্যুত করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময়েও সরকারি কর্মী বাহিনী তাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। যেটি আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা নিজেরাও কিন্তু ছাত্র জনতার কাতারে গিয়ে দাঁড়াতে পারিনি। সেজন্য আমি নিজে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি যে, আমরা কেন পারিনি, কেন হয়নি, কেন করা যায়নি তার কিছু বিষয় হয়ত নানাভাবে উপস্থাপিত হতে পারে। আমাদের অন্যান্য সহকর্মীরাও এখানে উপস্থাপন করেছেন। আমি বিস্তৃত কলেবরে সেদিকে যাব না।

আমরা জানি, রাষ্ট্র পর্যায়ক্রমিকভাবে ১৯৭২ সালের পর থেকে যখন রাষ্ট্রপরিচালনার মূল কার্যকাঠামো শুরু হলো তার পরবর্তীতে আমাদের সংবিধান বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয়েছে। বাজার অর্থনীতির সাথে যে সমস্ত জায়গায় সংশোধন অথবা পরিমার্জন করার কথা ছিল হয়ত সেটুকু করতে পারিনি। যার কারণে আমার কাছে মনে হয়েছে, মূলনীতি এবং মৌলিক অধিকারের জায়গায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের পর্যবেক্ষণ আছে। একইসাথে কর্মবিভাগ নিয়েও আমার সহকর্মীরা বলেছেন। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৩ থেকে ১৩৭ এবং ১৩৮ নিয়েও কথা বলেছেন। আমরা যদি রাষ্ট্রের মূলনীতির কথা বলি, যেটি প্রথমেই বলা হয়েছে আমাদের মূলনীতির সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১, যেখানে ক্লজ (১) এবং (২)। দ্বিতীয় ক্লজে আমরা জানি যে বেসরকারিকরণের কারণে আমাদের অনেক সেবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দিয়ে থাকে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। সেখানে একটি শব্দে আমার আপত্তি আছে। সেখানে সরকারি কর্মচারী কথাটি লেখা আছে। আমি মনে করি, সরকারি কোনো সেবা যদি বেসরকারিকরণ করা হয় তখন তারাও একই আইনের আওতায় আসা উচিত। পরবর্তীতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েই সেই সংশোধনের কথাটি বা সেই পরিমার্জনের কথাটি বলব। একইসাথে আমরা জানি যে অনুচ্ছেদ ২২ এ ক্ষমতার ভারসাম্যের কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রের ৩টি অঙ্গ আছে। আমাদের কর্ম বিভাগের যে balance of power এবং Intrigation of power among three organ এই জায়গাটিতে আমাদের কিছু কিছু observation আছে। আমরা এটি লিখিত দেব। আমার সহকর্মীরা হয়ত আরও বিস্তারিত বলবে। একই সাথে মৌলিক অধিকারের অনুচ্ছেদ ২৯, অনগ্রসর শব্দটি নিয়েই কিন্তু এই কোটা আন্দোলন বলি অথবা বৈষম্যের কথা বলি এই জায়গাটিতেও আমাদের কিছু observation আছে। অনগ্রসর বিষয়টি আমাদের অনুচ্ছেদ ১৫২ তে ঠিক সঠিকভাবে ব্যাখ্যায়িত বা সংজ্ঞায়িত বা ব্যাখ্যামুলক স্মারক সেখানে না থাকার কারণে আইন কানুন তৈরি করার সময় রাজনৈতিক সরকার তাদের সুবিধাজনক অবস্থান তৈরি করে।

আরেকটি বিষয় বলব, যদিও এটি আমার কর্মবিভাগের আলোচনার মাঝখানে পড়ছে, এটি অনুচ্ছেদ ৭৯। আমি আমার সংসদ সচিবের পরিচয়টি এ কারণে দিয়েছি কারণ আমি এখানে গত ২ মাস কয়েকদিন হলো কাজ করছি। "বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়" নামে সরকার একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। কমিশন আইন দ্বারা জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম প্রশাসনিক এবং আর্থিক পরিচালিত হয়। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের জন্য "Bangladesh *Institute of Parliamentary. Studies*" নামে একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গঠন করার কথা ছিল এবং ২০০১ সালে প্রজ্ঞাপনও হয়েছে। সেটি না হওয়ার কারণে এখানে একটি পেশাভিত্তিক সার্ভিস তৈরি হয়নি। সংসদ বিষয়ে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৯-এ বিভিন্ন বর্ণনা আছে। আমি প্রস্তাব করছি, "বাংলাদেশ সংসদ সার্ভিস" নামে আলাদা একটি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা যাতে করে এখানে পেশাদারিত্ব তৈরি হয়। এখানে আমাদের মতো অন্যান্য সার্ভিস থেকে অফিসার আসে। কিন্তু সংসদের নিজস্ব পেশাদারিত্বের জন্য একটি সার্ভিস প্রয়োজন।

আমি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৩ থেকে ১৩৬ এর মধ্যে একটি ধারাকে আমি বেশ প্রাধান্য দিতে চাই। সেটি হচ্ছে অনুচ্ছেদ ১৩৪। এ অনুচ্ছেদে এমন একটি বিধান রাখা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী যে কোনো সরকারি কর্মচারীকে without any cause, any explanation চাকুরি থেকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। অর্থাৎ এই সুযোগে আমরা বিগত সময়ে দেখেছি প্রত্যেকটি রাজনৈতিক সরকারই অনেক কর্মকর্তাকে অকালিন অবসর দিয়েছে-২৫ বছর চাকরি পূর্ণ হলে। আবার দেখা গিয়েছে আরেকটি সরকার আসলে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, তাদের পদমর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, টাকা দিয়ে ফেরত দেওয়া হচ্ছে। তাই অনুচ্ছেদ ১৩৪কে অনুচ্ছেদ ১৩৩ এর সাথে মিলিয়ে এরকম সমন্বয় করতে পারি যে, "কোনো কারণ দর্শানো ছাড়া"। আর এটিও একটি দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, রাজনৈতিক সরকারের মাধ্যমেই প্রস্তাবটি মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যায় এবং তিনি সেটি অনুমোদন করেন। তার অর্থ রাজনৈতিক একটি প্রভাবমুক্ত সিভিল সার্ভিস যদি পেশাদারিত্বের মাধ্যমে তৈরি না হয়, তাহলে কিন্তু সেটি আগের অবস্থায়ই থেকে যাবে। আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, we should work for the political government but we should never own them. সেটি যদি করি তাহলে আমাদের চরিত্র কিন্তু বদলিয়ে যায়। আমি কিন্তু রাজনীতির অংশ হয়ে যাই এবং রাজনৈতিক নেতার চরিত্র ধারণ করে ফেলি। আমলাতন্ত্র তখন আর থাকে না। আন্তঃবৈষম্য ক্যাডারের কথা বলি, প্রশাসন ক্যাডারের কথা বলি, বিগত ২০-২২ বছরে আমাদের এই চরিত্রের অবয়ব দিয়েই আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম করছি। সিভিল সোসাইটি থেকে শুরু করে বিশ্বের গ্লোবাল সিভিল সার্ভিসের সমস্ত জায়গায় আমাদের বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের স্বরূপটি এরকম হয়ে গেছে। আমরা একটি স্বাধীন পাবলিক সার্ভিস চাই। বিদ্যমান পাবলিক সার্ভিস কমিশন একক পাবলিক সার্ভিস কমিশন হওয়ার কারণে এখানে তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে, দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে প্রথম শ্রেণিতে এবং প্রতিদিন ৭০-৮০ জন কর্মকর্তা সেখান থেকে বের হয়ে যান বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়ে নিয়োগের জন্য। তাদের সারাদিন আর কোনো কাজ করার সুযোগ থাকে না অফিসে বসে। আমার জানামতে ৭০-৮০ জন লোক চলে যায়। তাহলে একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন কি করে সিভিল সার্ভিসের নিয়োগ কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনে কাজ করবে? নাকি শুধু তৃতীয় শ্রেণির নিয়োগ বা তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির পদে পদোন্নতি বা তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করবেন, নাকি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ঘুরে ঘুরে তারা কাজ করবেন? আমাদের দুটি কমিশন এক সময় ছিল। আমি বিশ্বাস করি, আলাদা দুটি কমিশন হওয়া উচিত এবং এই কমিশনগুলো স্বাধীন হওয়া উচিত। এই কমিশনগুলো নিয়োগ প্রক্রিয়াকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাবে। শুধু নিয়োগ প্রজ্ঞাপন জারি করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করবে। তার আগ পর্যন্ত একটি স্বাধীন কমিশন যদি কাজ করে, নিয়োগের সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে সিভিল সার্ভিসের মর্যাদা রক্ষা হবে এবং সিভিল সার্ভিস একটি অবস্থানে থাকবে। একইসাথে আমি এটিও বলতে চাই, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে সমস্ত কাজগুলো আমরা এখন জানি তারা পুলিশ ভেরিফিকেশন- সকল ক্যাডারের নিয়োগের বিষয় যখন জনপ্রশাসনে যায় বা অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ে যায়, তখন সেখানে একটি কলাম রাখা হয় পুলিশের মাধ্যমে ভেরিফিকেশন করা। সেখানে রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়। আমি মনে করি, এই কাজটি যদি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হাতেই থাকে, অর্থাৎ নিয়োগ প্রক্রিয়ার সমস্ত প্রক্রিয়া তাদের কাছে থাকে, একটি স্বাধীন কমিশনের সত্তা যদি থাকে তাহলে আমরা এটি সহজভাবে পাব। কারণ শপথ গ্রহণ করেই সেই কমিশনের দায়িত্ব পালন করেন। আমরা সরকারি কর্মচারীরা সেরকম করি না। এখানে আরেকটি বিষয় আছে, কিছু কিছু বিষয় আমরা বিগত সময়ে লক্ষ্য করেছি, এটি যদিও জনসংস্কার কমিশনের সাথে আমাদের আন্তঃক্যাডার ভাইয়েরা যারা আছেন তারা বলেছেন, জনসংস্কার কমিশন এবং আপনাদের এই বিষয়গুলো হয়ত একসাথে বিবেচনা করেই আমাদের সংবিধানের যে অনুচ্ছেদগুলো পরিবর্তিত হবে, সংশোধিত হবে বা পরিমার্জিত হবে। সংবিধান হচ্ছে, আমাদের রাষ্ট্রের রক্ষাকবচ। জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি মৌলিক দলিল। সেই জায়গাটিতে হয়ত আমরা এত বিস্তারিত যেতে পারব না। কিন্তু আমাদের নিরপেক্ষতার প্রটেকশন থেকে সিভিল সার্ভিসকে কীভাবে রক্ষা করা যায়, সেরকম প্রস্তাবনা আমাদের কাছে আছে। সেটি কমিশনের নিকট আমরা পেশ করব। আরও ২/১টি বিষয় আছে, আমার সহকর্মী এখানে আছেন, তিনি জনপ্রশাসন নিয়ে গবেষণা করেছেন। আপনি অনুমতি দিলে আমাদের অতিরিক্ত সচিব ড. মিজানুর রহমানকে অনুরোধ করব সংক্ষেপে উপস্থাপনের জন্য।

ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (অতিরিক্ত সচিব): ধন্যবাদ। আমি কয়েক মিনিটেই শেষ করব। Sir already context বলে ফেলেছেন। আমি জাস্ট আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আপনার একটি বিখ্যাত আর্টিকেল আটলান্টিক কাউন্সিলে প্রকাশ করেছিলেন ২০২২ সালে- "How did we get here". সেখানে আপনি অনেকগুলো কথা বলেছেন। Economic point of view থেকে সেটি বিশ্লেষণ করেছে। আমরা যদি institute analystদের কথা বলি বা political scientistদের কথা, আমাদের latest conclusion হচ্ছে একটি Professional civil service is the bed rock for good governance and development. আমরা সেই point of view থেকে একটি পাবলিক সার্ভেন্টকে কীভাবে রক্ষা করা যায় সেই জায়গাটায় আমরা দেখছি যে, বিশ্বের অন্যান্য দেশে, আমেরিকাতে "Merit Protection Board" আছে- ফেডারেল অ্যাক্ট এর আওতায়, ১৯৭৮ এ। অস্ট্রেলিয়ান পাবলিক সার্ভিস অ্যাক্ট আছে ১৯৯৯ এ। সেটি দ্বারা রক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়াতে বল্লব ভাই প্যাটেল ১৯৪৯ সালে constituent assemblyতে যখন ১০ অক্টোবর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন তিনি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। যেটি আমরা ১৯৭২ সালে দুর্ভাগ্যবশত অনুসরণ করতে পারিনি- ১৯৪৭ এর ২৫ বছর পরে। তিনি বলেছিলেন যে, ইউনাইটেড ফেডারেল ইন্ডিয়াকে যদি রাখতে হয়, তাহলে এই আমলাতন্ত্র হবে তার একটি Protective rim. এই কনটেক্সটি আমাদের জন্য বুঝা খুব জরুরি। দুর্ভাগ্যবশত আমরা ১৯৭২ সাল থেকে আমলাতন্ত্রকে এক ধরনের Colonial Instrument হিসেবে বিবেচনা করেছি। এটিকে যে একটি চেঞ্জ এজেন্ট হিসেবে, একটি গুড গভর্নেন্স এবং ডেমোক্রেসির যে একটি বড় ধরনের প্রটেকশন এজেন্ট হিসেবে এটি কীভাবে সাহায্য করতে পারে সেভাবে academicianরাও খুব বড় মাপের কাজ করেনি। এটি আমি দায়িত্ব নিয়েই বলছি এবং আমরা ওভাবে দেখিনি। যার কারণে আজকে ক্যাডার সংকট থেকে অনেক বিষয়গুলো হচ্ছে। আমরা একটি কাগজ আপনাকে দেব। ১৯৭২ সালেই আমাদের এই সংকটটি শুরু হলো যখন আমাদের পিও ৯ এর আওতায় আমরা লোকদেরকে বিদায় দেওয়া শুরু করলাম। তারপর ১৯৭৪ এ যে আইনটি করলাম *Retirement Act*, সেখানেও ২৫ বছরে অবসরের সুযোগটি তুলে দেওয়া হলো সরকারের হাতে। অনুচ্ছে ৩৩ এবং ৩৪ এ সরকারের খুব অসীম ক্ষমতা আছে। সরকারকে কোন restrain করা হচ্ছে না কোন প্রভিশন দিয়ে। জনস্বার্থের কোনো ব্যাখ্যা নেই। জনস্বার্থের কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই লোকদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যার কারণে বাংলাদেশে একটি ভালো মাপের আমলাতন্ত্র তৈরি কখনই হয়নি। ৫০ বছরে আমাদের যে অভিজ্ঞতা, সে অভিজ্ঞতা খুবই দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা।

আজকে ইলেকশন নিয়ে আমরা কথা বলছি। দায় দায়িত্ব আমলাদেরকে নিতে হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত আমরা যদি কনটেক্সটিকে বিবেচনা না করি এবং এটির যে magnitude তাহলে আমাদের মনে হয় যে আমরা খুব বেশি ন্যায় করতে পারব না। এজন্য অন্যান্য দেশের মতো, ইন্ডিয়াতেও আছে অনুচ্ছেদ ৩১১(২)। এখানে এক ধরনের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দেওয়া আছে আমলাতন্ত্রকে। রাজনীতিকরণ থেকে আমাদের এটিই মৌলিক সমস্যা যে, বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রকে রাজনীতিকরণ করা। ২৫ বছরে যে অপসারণ করা যায় এটি আমি দেখলাম যে কোনো উন্নত দেশে তো নয়ই উপমহাদেশেও এই প্রভিশনটি নেই। এটি আমরা কীভাবে আনলাম আমরা জানিনা। আমরা কয়েকটি সুস্পষ্ট সুপারিশ যেটি broader public service point থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট ক্যাডার বা এভাবে না, আমরা মনে করি যে সংবিধানে সরকারি চাকুরির শর্ত নির্ধারণটি clearly spelled out করতে হবে। কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ বা শুনানি ছাড়া কাউকে চাকুরিচ্যুত করা যাবে না। সকলেই যাতে ন্যাচারাল জাস্টিস পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৩ থেকে ১৩৫ নতুন করে পুনর্গঠন করতে হবে। এটি হচ্ছে আমাদের বক্তব্য।

সরকারি চাকুরি আইনে সরকার কর্তৃক অবসরদানের বিধানকে স্পষ্ট শর্তসাপেক্ষ করতে হবে। যদি সরকারের কোনো অধিকার থাকেও সেটি কোন্ গ্রাউন্ডে তা দিতে হবে। ইন্ডিয়াতে যেমন আছে, একজন পাবলিক সার্ভেন্ট জানবে যে কোন কারণে তাকে চাকুরি থেকে অপসারণ করা হচ্ছে। সে সুযোগটি আমাদের এখানে স্পষ্টভাবে নেই। সেটি করতে হবে। আরেকটি বিষয় হলো, আমাদের সিভিল সার্ভিসের স্ট্যাটাস বাংলাদেশে খুবই বেলার্ড। সবকিছুতে সরকারি চাকুরিজীবী হিসেবে বা সরকারি কর্মচারী বলে খুব undermining attitude থেকে পাবলিক সার্ভিসকে দেখা হয়। এটি সিভিল সোসাইটির পক্ষ হতেও দেখা হয়। এটির একটি ঐতিহাসিক কারণও আছে। আমরা মনে করি যে, ইন্ডিয়াতে আছে, অস্ট্রেলিয়াতে আছে, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ সিভিল সার্ভিস। *OACT*-র সব দেশে এখন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ সিভিল সার্ভিস আছে। সেজন্য আমরা মনে করি যে, সিভিল সার্ভিসের একটি আলাদা পরিচিতি সংবিধানে থাকতে হবে। That should be different from the public service. পাবলিক সার্ভিস এবং সিভিল সার্ভিস যেন conflated না হয়, আমরা মনে করি যেহেতু আপনারা খুবই informed একটি কমিশন, এই জিনিসটি আমাদের মনে হয় যে বিবেচনা করা দরকার। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাগুলো যেন আমরা বিবেচনায় নেই।

দ্বিতীয় হলো মেধা সংরক্ষণের জন্য যেটি স্যার অলরেটি বলেছেন যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশন যেটি এখন করে অনুচ্ছেদ ৪১ এর আওতায়, সে সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু নিয়োগটি দিচ্ছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। তখনই রাজনীতিকরণ শুরু হয়ে যায়। সেজন্য আমরা বলছি যে, পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াটি ফাইনাল করে দেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় শুধু সেই তালিকাটি বাস্তবায়ন করবে। তাই পাবলিক সার্ভিস

কমিশনকে আমাদের শক্তিশালী করা দরকার। আরেকটি বিষয় আমাদের সিনিয়র সিলেকশন বোর্ড যেটি আছে (এসএসবি), ডেপুটি সেক্রেটারি থেকে উপরের পদসমূহে কেবিনেট সেক্রেটারির নেতৃত্বে একটি কমিটি করে থাকে। আমরা বলছি যে, এখানে আরেকটি সংকট হয়। যেহেতু নির্বাহী এবং তারা প্রধানমন্ত্রীর অফিসের গাইডেন্সেই কাজটি করে থাকে, তখনই রাজনীতিকরণটি শুরু হয়। এজন্য আমরা বলছি যে, এসএসবি-এর সুপারিশটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক ভেটেড হতে হবে। যেহেতু পাবলিক সার্ভিস কমিশন আমাদের নিয়োগের সময় একটি মেধা তালিকা তৈরি করে এবং এটি হচ্ছে আমাদের খুব বটম লাইন। এই মেধা তালিকাটি, অর্থাৎ যদি আমরা ফ্যাংশনাল লেবেল থেকে চিন্তা করি, সেই ভেটিং এর ক্ষমতাটি যদি আমরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে দেই, যখন আরেকটি stage তৈরি হচ্ছে, আমরা অনুমান করি তখন গভর্নমেন্ট একটু frustrated হবে। তখন হয়ত রাজনীতিকরণটি হয়ত না হওয়ার ক্ষেত্রে এই জায়গাটা কিছুটা সাহায্য করবে। আর স্পষ্টভাবে আমরা বলতে চাই যে, অস্ট্রেলিয়া বা যুক্তরাষ্ট্রের মত merit protection board আমাদের থাকতে হবে। যাতে কেউ victimized হলে সে যেন আপিলের একটি জায়গা পায়। আমাদেরতো এখন *administrative tribunal* আছে, সেটি দিয়ে সাপোর্ট হচ্ছে না। এটি পদোন্নতির সাথে আমরা সরাসরি লিংক করতে চাই, এই merit protection boardকে। এটি অস্ট্রেলিয়াতে খুব বিস্তারিত আছে, আমেরিকাতেও আছে।

তারপর হচ্ছে একাধিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন। আমরা মনে করি at least ৩টি কমিশন দরকার। সিভিল সার্ভিস কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন আর সাপোর্ট স্টাফদের জন্য জুনিয়র সার্ভিস কমিশন। এই ৩টি সার্ভিস কমিশন যখন হবে তখন আমরা দ্রুত নিয়োগ দিতে পারব এবং খুব ভালো মানের লোকদেরকে আমরা নিয়োগ দিতে পারব। আমরা অলরেডি বলেছি যে, জনস্বার্থের একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আমরা চাই।

আরেকটি জিনিস আমরা চাচ্ছি। একদিক থেকে যেমন আমরা সার্ভিসের প্রটেকশন চাই, অন্যদিকে সার্ভিসগুলোকে যেভাবে আমরা জবাবদিহি করতে পারি, সেজন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একটি মানদণ্ড দরকার। সেই জায়গাটিতে যদি কেউ মনদণ্ড ভঙ্গ করে তাহলে যেন শাস্তির মুখোমুখি হয়, সেই জিনিসটি অনেক দেশে আছে। মানদণ্ডের প্রতি কমিটমেন্ট আছে। দরকার পড়লে সেটি যে শপথ হিসেবে নিতে পারে, দরকার পড়লে নাও নিতে পারে। কিন্তু মানদণ্ডের ব্যাপারটি থাকতে হবে। সিঙ্গাপুর সাংঘাতিকভাবে মানদণ্ডভিত্তিক পাবলিক সার্ভিস। সে মানদণ্ডটিকে তারা যদি সামান্যতম contravene করে তাহলে তাকে সাংঘাতিকভাবে penalty দিতে হয়। এটির মধ্য দিয়ে আমাদের জবাবদিহিতা আসবে। চূড়ান্তভাবে যে বিষয়টি নির্ধারিত এবং স্পষ্ট উল্লিখিত শর্তের বাইরে নিয়োগ ও পদোন্নতিতে কোনো নিরাপত্তা এজেন্সিকে ব্যবহার করা যাবে না। এটি আমরা underline করতে চাই আপনাদের সামনে এবং কোনো সরকারি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক, রাজনৈতিক বিশ্বাসকে recognized করা যাবে না। বিগত ১৫ বছর ধরে সাংঘাতিকভাবে আমরা যেটির ভিকটিম হচ্ছি। কার বাবা কী করল, কার চাচা কী করল, সেটির দায় দায়িত্ব সংবিধান আমাকে দেয়নি। অথচ আমরা সেটির ভিকটিম হয়ে যাচ্ছি।এই কয়েকটি broader perspective থেকে আমাদের recommendation.

আরেকটি বিষয় যেহেতু কথা উঠল, আমাদের সহকর্মীরা অন্য সার্ভিস থেকে এসেছেন, তাঁদের অধিকারের প্রতি আমরা সংবেদনশীল। কিন্তু আমরা ছোট এবং বিনয়ের সাথে অনুরোধ করব, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা যেটি বলে, যে জায়গাটি থেকে আমরা এই অনুরোধটি করছি, আপনারা সিভিল সার্ভিসের ব্যাপারে সুপারিশের ক্ষেত্রে দয়া করে আমাদের উপমহাদেশ এবং উন্নত দেশসমূহের অভিজ্ঞতাগুলোকে বিবেচনা করে দিবেন। প্রফেশনাল সার্ভিসগুলো কীভাবে আছে, নির্বাহী সার্ভিস কীভাবে আছে, এই জিনিসগুলো একটু বিবেচনা করে সুপারিশগুলো করবেন।

সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আমার সহকর্মীরা হয়ত ২/১টি প্রশ্ন করবেন। আমি ছোট করে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদের কাছে জানার জন্য আপনাদের এই বক্তব্যগুলো কি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন করা হয়েছে বা তাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন?

জনাব মোঃ জামিলুর রহমান (বিসিএস গণপূর্ত): আমরা জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কাছে লিখিত বক্তব্য প্রেরণ করেছি। কিন্তু আমরা বার বার চেষ্টা করেও কমিশন প্রধানের সঙ্গে এখনও দেখা করতে পারিনি। সর্বশেষ যেটি জানলাম, তিনি বলে দিয়েছেন, আমাদের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করবেন না। তবে আমরা বিভিন্ন উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনা করেছি। অন্যান্য কমিশনের ২/১জন সদস্যের সঙ্গেও আনঅফিসিয়ালি আমরা এই তথ্যগুলো দিয়েছি। সবার কাছে আমরা এই তথ্যগুলো পৌঁছে দিয়েছি। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সকল সদস্যের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য পৌঁছিয়েছি। কিন্তু গতকালকে আমরা জানলাম যে, কমিশন প্রধান আমাদের সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

জনাব শাহাদত হোসেন (বিসিএস প্রাণিসম্পদ): আমরা এই দাবিগুলোর বিষয়ে ২৫টি ক্যাডারের প্রতিনিধিবৃন্দকে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনে ডাকা হয়েছিল, সেখানে *Bangladesh Administrative Service Association*-ও ছিল এবং অন্য ২৫টি ক্যাডারও ছিল। সেখানে আমরা রাইট আপ আকারে দিয়েছি, যদিও বলার খুব বেশি সুযোগ হয়নি। পাশাপাশি আমরা দুইটি দরখাস্ত মাননীয় কমিশন প্রধানকে দিয়েছিলাম যেন আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি। কোনো সাড়া আমরা পাইনি। গতকালকে আমাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে যে তিনি আলাদাভাবে কারও সাথে বসবেন না।

ব্যরিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী(কমিশন সদস্য): আমার দুটো প্রশ্ন। সরাসরি ঠিক প্রশ্ন না। একটি হচ্ছে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন কমিটির কাছে আপনারা লিখিত যেটি দিয়েছেন, এখানে অনেক কিছু মিক্সড আছে? বিদ্যমান প্রভিশনগুলো কী সংবিধানে বা আইনের কথাও এনেছেন এবং একই সাথে আপনাদের সমস্যার জায়গাগুলোও বলেছেন। আপনারা যদি সংবিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলাদা করে দিতে পারতেন, তাহলে আমাদের জন্য কাজটা একটু সহজ হতো। যেহেতু আমরা কাজের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি।

আমার প্রধান প্রশ্নটি হচ্ছে জনাব শহিদুল্লাহ ফরায়েজির কাছে। আপনি দার্শনিক ভিত্তিটাকেই মূল হিসেবে সংবিধানে এনেছেন। দার্শনিক ভিত্তি এটি অনেক ক্ষেত্রে abstract idea হিসেবে আমরা দেখি। আপনি যদি সুস্পষ্টভাবে একটু বলেন যে, রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তিটা অল্প কথায় কীভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। পুরো সংবিধানটিই একটি দার্শনিক ভিত্তির ওপর হবে- এটা বোধগম্য। কিন্তু সংক্ষেপে যদি জিনিসটার ফ্রেমটা করে দেন।

জনাব শহীদুল্লাহ ফরায়জি: ধন্যবাদ।

প্রথম হচ্ছে দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে যেমন-সাম্য। সাম্যটি হচ্ছে প্রতিটি নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে তার সাম্যটি থাকবে কি না? নিশ্চিত হবে কি না? এমন কোনো বৈষম্য থাকতে পারবে না যে, কোনো নাগরিকের অর্থনৈতিক কাজে, রাজনৈতিক কাজে, সাংস্কৃতিক কাজে তার অংশগ্রহণে বাঁধা থাকতে পারে। এটি হচ্ছে, নাগরিকের প্রথমত সাম্য নিশ্চিত করা। আর এই সাম্য থেকেই গণতান্ত্রিক অধিকার যে অধিকারটিও একটি সাম্য। প্রতিটি মানুষের ভোটাধিকার থাকবে ১৮ বছর হলেই। এই ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা কিন্তু সাম্যের ধারনা থেকে এসেছে। ১৮ বছর হলেই সে ভোটাধিকার পাবে। সকল মানুষের একই ভোট, একই মূল্যায়ন, সেটিও কিন্তু এক ধরনের সাম্য। আর human dignity হচ্ছে রাষ্ট্রের বাইরে। যেমন আমার অনুভূতি, আমার ব্যক্তিত্ব, আমার উৎকর্ষ, আমার জ্ঞান, আমার প্রজ্ঞা এবং আমার নৈতিকতা এটিতে রাষ্ট্র স্পর্শ করতে পারবে না। আমাদের দেশের বিচারকরা প্রায়ই দেখবেন আদালত অবমাননা মামলায় যে যায় তাকে বলে দাঁড়িয়ে থাকতে। অর্থাৎ শাস্তির আগেই শাস্তি। আমাদের একজন সম্মানিত বিচারপতি আশরাফ উদদৌলাকে নিয়ে বলেছিলেন, বিচারপতিরা, আপনি নিজেকে কী মনে করেন? আপনি নিজেকে কতটুকু জ্ঞানী মনে করেন? আমার বিচারপতিদের কোনো এখতিয়ার নেই আমার human dignity আক্রমণ করার, আঘাত করার। সুতরাং আমরা যদি দিতে পারি যে, human dignity বিনষ্ট করা যাবে না, তাহলে রাষ্ট্রের চেতনা উন্নত করবে যে কোনো মানুষের human dignityকে বিনষ্ট করা যায় না। এই চেতনাবোধ রাষ্ট্রকে উচ্চতর নৈতিকতায় নিয়ে যাবে। আর একটি হচ্ছে সোশ্যাল জাস্টিস। আমাদের সকল ক্ষেত্রে যদি ন্যায্যতা থাকে, সকল ক্ষেত্রে যদি আমরা বৈষম্য নিরসন করে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলে সামাজিক যে ন্যায়বিচার, সেটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়েই একটি রাষ্ট্র ক্রমাগতভাবে বৈষম্যমুক্ত হবে, একটি রাষ্ট্র ক্রমাগতভাবে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার অভিপ্রায় অনুযায়ী গড়ে উঠবে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের (কমিশন সদস্য): আমার প্রশ্ন আপনারা যে কোনো একজন নিতে পারেন। আপনি বলেছেন যে, সিভিল সার্ভিসকে political influence থেকে protect করার ব্যবস্থা করা। আমরা যেটি দেখে এসেছি অনেক বছর ধরে bureaucracy seriously politicized. আপনাদের কাছে কি কোনো ফরমুলা আছে? কারণ আপনারা কিন্তু অনেকগুলো পরীক্ষা, induction, নিয়োগ ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। By and large the politicization has gone very deep. এখন এটি থেকে বের হয়ে আসতে হলে মূলমন্ত্র কী হতে পারে? Have you got any suggestion for us. যেটি সংবিধানে ধারণ করা যাবে। সাধারণ সবকিছুই আপনাদের সার্ভিস রুলে থাকবে। Public administration যে গভর্ন্যান্স paradigm সেখানে থাকার কথা।কিন্তু সংবিধানে আমরা introduce করতে পারি এমন কোনো ফরমুলা কি জানা আছে।

দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি আপনাদের যে সার্ভিস রুলস আছে এগুলোকে আরও একটু পরষ্কার করা, আরও একটু coherent করা। আমি সার্ভস রুলস যতটুকু পড়েছি আমার কাছে যথেষ্ট unambiguous মনে হয়েছে। যদি কোনো particular example দিয়ে বুঝাতে পারেন, That would be helpful.

ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান(অতিরিক্ত সচিব)ঃ ধন্যবাদ।

একটি হতে পারে যেটি আমরা বললাম যে merit protection commission যেটি অস্ট্রেলিয়াতে আছে এবং আমেরিকাতে আছে। That could be one way. Practically you bar the politician to politicize the system. এটি একটি হতে পারে। End of the day they have to account for the reason why someone has not been promoted. So this is one way we can deal with this.

The second way could be particularly যেটি আমি বললাম ২৫ বছর হয়ে গেলে you can get someone retired. যেটি সরকারের সাংঘাতিক discretionary power. যদি সরকার discretionary power hold করতে চায় ভালো। সেটি যদি পার্লামেন্ট অনুমোদন করে। তাহলে সেটি clearly spelled out করতে হবে যে, এই কারণে আপনাকে চাকুরিতে রাখতে পারছি না। এ কারণে তাকে অধিকার দিতে হবে যে so that one can go to the court for remedy. এটি এই মুহূর্তে নেই। That is the infect as well as ill for the public service that eventually infect leads someone to become politicized. যখন আপনার ২৫ বছর হয়েছে, you have to understand, you are reaching a high level. You are becoming Joint secretary, Additional Secretary, Secretary may be sometimes. You are become more vulnerable, because at any time government can get move from the service. এটি সাউথ এশিয়াতেতো নেই, OACT কোনো দেশে নেই। Yes, it is only existing in Bangladesh. তাহলে এটিকে সরকারকে ব্যাখ্যা করতে হবে কেন ২৫ বছরের পর একজনকে without hearing, unheard, natural Justice এর বাইরে গিয়ে তাকে চাকুরি থেকে সরাতে করতে হবে।

ড. মোঃ আনোয়ার উল্লাহ্‌, এফসিএমএ (সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়): স্যার যেটি বলেছেন যে, আমলাতন্ত্রকে রাজনৈতিক মুক্ত করার ক্ষেত্রে সংবিধানে কোনো শব্দ ব্যবহার করা যায় কি না? অনুচ্ছেদ ১৩৪ এ যেটি বলা হয়েছে, সেখানে কিন্তু আমরা এ শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। সেখানে বলা হয়েছে যে, “মহামান্য রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি অনুযায়ী”। এই সন্তুষ্টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্টি তবে তিনি কিন্তু রাজনীতির উর্ধ্বে নন। আমরা বিগত দিনে দেখে এসেছি, মহামান্য রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক বিশাল ক্যারিয়ার থেকে বের হয়ে এসে হঠাৎ করেই একদিন নিরপেক্ষ ব্যক্তি হয়ে মহামান্যের চেয়ারে বসে গেলেন। With due respect to the chair and the opposition আমি মনে করি, তাঁর যে ক্ষমতাটি আছে সেই ক্ষমতাটি রাজনৈতিক বলয় থেকেই এসেছেই কিন্তু তাঁর কাছে নথিটি যায় এবং কাউকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। আবার সেই একই নথি আরেকজন রাষ্ট্রপতি এসে সেটিকে আবার ভেলিগেট করে। এটি যেন “রাজনৈতিক কারণে যাতে না হয়” সেজন্য অনুচ্ছেদ ১৩৪ এর মধ্যে এই শব্দগুলোকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। আমার কথা হচ্ছে যে, আমাদের *Conduct Rules* আছে, *Discipline and Appeal Rules* আছে, সে জায়গায় কিন্তু বলা আছে সরকারি কর্মচারীরা কোনো রাজনীতির অংশ হতে পারবে না। *Freedom of association*-এর কথা বলা আছে। আমি আজ administrative service association-এর সভাপতি। আমি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি ঠিক এই পর্যায়ে যেন এই সময়ে আমার কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই। আমার বিগত সময়েও রাজনৈতিক পরিচয় নেই, এখনও কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই। আমি কোনো রাজনৈতিক দলের তল্পিবাহক হয়ে ঠিক এই মুহূর্তে কোনো প্রতিনিধিত্ব করছি না। কিন্তু আজকে যদি একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকত, আজকে আমার পরিচয় কিন্তু ঐভাবে নির্ধারিত হয়েই এই পদে বসতে হতো। সুতরাং ভবিষ্যতে আমরা এটি চাই না। এটি চাই না বলেই, আমাদেরকে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে কোনোভাবে, আমরা নিরপেক্ষ যারা থাকি, তারা যাতে অন্তত এগিয়ে আসতে পারি মেধার ভিত্তিতে সেজন্যই অনুচ্ছেদ ১৩৪ কে সংশোধন করার জন্য প্রস্তাব দেব।

ধন্যবাদ।

জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন (যুগ্মসচিব): ধন্যবাদ।

আমি একটু বলতে চাচ্ছি। একটি হচ্ছে আমাদেরকে conceptually demoralized করে দেওয়া হয়েছে। সিভিল সার্ভিসে প্রত্যেকটি দেশের একটি স্টিলল ফ্রেমওয়ার্ক যেখানে জনগণ এবং রাজনীতিবিদদের মাঝে একটি সেতু হিসেবে আইনানুগভাবে মানুষ যাতে সেবা দিতে পারে। আমাদের এখানে যেটি করা হয়েছে, চাইনিজ এবং ভারত থেকে এনে আমাদের সিভিল সার্ভিস করা হয়েছে। পরে সেটি আরেকটু degrade করে পাবলিক সার্ভিস করা হয়েছে। তারপর আবার করা হয়েছে গভর্নমেন্ট সার্ভিস। সর্বশেষ করা হয়েছে সরকারি কর্মচারী। এই যে conceptually degradation-এ এনে মানসতাত্ত্বিকভাবে আমাদেরকে একটি degradation-এ ফেলানো হয়েছে। যদি দেখেন, service to the republic, এটিকে আরও একধাপ নিচে এনে সরকারি কর্মচারী আইন, ২০১৮ বানানো হয়েছে। এখানে republic শব্দটি নেইএ এখানে পিপলস এর পালসের কথা নেই। আমি যে জনগণের কাছে থেকে বেতন নিচ্ছি, আমি যে জনগণকে সেবা দিতে

নৈতিকভাবে এবং কনসেস থেকে বাধ্য, সে জায়গাটি না হয়ে আমার মনে হয় যে রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য আমাকে মসনদে বসানো হয়েছে। এই একটি জায়গা।

আর ম্যাডাম যেটি বলেছেন, protection mechanism. আপনি যদি দেখেন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন শুধু সুপারিশ করছে। কিন্তু পুলিশ ভেরিফিকেশনের সময় ২৮ থেকে ৪২তম ব্যাচ পর্যন্ত ২৪৩ জন সুপারিশপ্রাপ্তদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। কারণ পুলিশ ভেরিফিকেশনে রাজনৈতিক মতাদর্শের একটি কলাম জুড়ে দেওয়ার কারণে মনে হয় যে সিটিজেন হিসেবে তার পলিটিক্যাল রাইটস থাকবে না, সিভিল রাইটস থাকবে না, ভোটিং রাইটসও থাকবে না। এরকম একটা মানুষ পৃথিবীতে কোথায় পাওয়া যায়। এই জায়গাটা আমাদের বন্ধ করা দরকার। এখানে আমাদের একটি stringent সুপারিশ হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন যেন শুধু সুপারিশ না করে পুলিশ ভেরিফিকেশনের যে জায়গাটি আছে, এখানে যদি পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে আরেকটু শক্তিশালী করে পুলিশ ভেরিফিকেশনসহ তারা যেন চূড়ান্ত নিয়োগের সুপারিশ করে প্রশাসনে দেন। আমার মনে হয়, তাহলে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের স্বাধীনতাটা থাকে।

আরেকটি জায়গায় আমাদেরকে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। Warrant of Precedence বিভিন্ন সময় খর্ব করতে করতে ট্রানজিশন পিরিয়ডে আমাদেরকে অনেক নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি অনুরোধ করব Warrant of Precedence ইন্ডিয়াতে যেভাবে আছে সেভাবে করার জন্য। যেহেতু আমাদের একই ভৌগলিক অবস্থান, একই ধরনের রাজনেতিক এবং ঐতিহাসিক কালচার রয়েছে। তাই Warrant of Precedence যাতে ইন্ডিয়ার মতো হয়, তাহলে আমরা একটু দাঁড়াব।

ম্যাডাম সুনির্দিষ্ট যেটি আপনি বলেছেন যে, আপনাদের রক্ষার জন্য কি করণীয়? আমরা যদি সংবিধানটি দেখি, সংবিধানের অনুচেদ ১৩৪ এ রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী সময়সীমা। পরবর্তীতে এসে বলা হয়েছে, যুক্তিসংগত সুযোগদানের একটি সুযোগ অনুচ্ছেদ ১৩৫এ রাখা হয়েছে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অনুচ্ছেদ ১৩৫ (২) এর (আ) তে বলা হয়েছে ''কোন ব্যক্তিকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কারণে-যাহা উক্ত কর্তৃপক্ষ লিপিবদ্ধ করিবেন- উক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর সুযোগদান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব নহে;'' তিনি আমাকে বাদ দিতে পারবেন। আরেকটি বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের যদি নিরাপত্তাজনিত বিষয় হয় তিনি আমাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দেবেন না।

সর্বশেষ যেটি বলা হয়েছে, সেখানে আসলে এই যুক্তিসংগত কারণ আর রাখা হয়নি। '' অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত কারণ দর্শানোর সুযোগদান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব কি না, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সেই সম্পর্কে তাঁহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।'' আসলে কিন্তু কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বা কারণ দর্শানোর সুযোগ এই সংবিধানেও বিলুপ্ত করা হয়েছে।

ধন্যবাদ।

জনাব মোঃ জামিলুর রহমান (বিসিএস পূর্ত): আমি দুটি বিষয় একটু আলোকপাত করতে চাই। আমাদের স্যারেরা অনেক কথা বললেন। আমি বলতে চাই, আমাদের যে মূল সমস্যা, জাতিগতভাবে যে মূল সমস্যা, সেটি হলো nepotism. এটির একটি বিহিত করতে হবে। আমি আরেকটি জিনিস বলতে চাই, পদোন্নতির ক্ষেত্রে যদি মেধা তালিকাটি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়, সেক্ষেত্রে এই তদবিরটি কমে যাবে। কেউ তদবির করতে পারবে না যে, তদবির করেই পদোন্নতি নেওয়া যাবে।

আরেকটি হলো, পদের অতিরিক্ত পদোন্নতি। আমি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, পরিসংখ্যানটি এই মুহূর্তে মনে নেই, তবে উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং সচিব প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পদের দ্বিগুণ, তিনগুণ পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে যে সমস্যাটি হচ্ছে, প্রত্যেকেই তদবির করছে নির্দিষ্ট পদে যাওয়ার জন্য বা ভালো জায়গায় যাওয়ার জন্য। এই তদবিরটা এত তীব্রভাবে হচ্ছে, যারা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাদের পক্ষেও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

আরেকটি এসেছে বাধ্যতামূলক অবসর, এটিও একটু পরিষ্কার করতে হবে। এ বিষয়গুলো একটু নজরে রাখলে আমার মনে হয় আরেকটু ফলপ্রসু হবে।

ধন্যবাদ।

জনাব ফিরোজ আহমেদ (কমিশন সদস্য): ধন্যবাদ। আপনাদের সবার কথা আমরা শুনলাম। এগুলো রেকর্ডেড থাকবে। ফলে ভবিষ্যতে আর্কাইভ হিসেবে মানুষ জানবে আপনারা এই সময়ে কী কী প্রস্তাব করেছিলেন বা ভেবেছেন। আমি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রশ্ন করছি, এখন উত্তর দিতে পারেন বা পরে বিস্তারিত আমাদের লিখেও জানাতে পারেন। সেগুলো সংবিধানের সাথে সম্পর্কিত। একটি হচ্ছে যে, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ বলেছেন যে, সমন্বয়ের নামে একজনকে অতি ক্ষমতায়িত করা হয়। এটির মধ্য দিয়ে তারা আসলে

বলেছেন যে, একটি ক্যাডারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতি কমানো সম্ভব হয় না। আপনাদের পরামর্শটা কী? এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে চান, নাকি আপনাদের ক্যাডার সার্ভিসের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য চান। স্থানীয় সরকার বিষয়ে কোনো প্রস্তাব এখানে পাইনি, সেজন্য বলা।

দ্বিতীয়ত আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যে, রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার কথা বলেছেন, administrative service association সদস্যরা। তাদের কাছেও আমার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এটিই যে, রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার একটি বিকল্প স্থানীয় সরকারে থাকে যে জনপ্রতিনিধিদের কাছে স্থানীয় সরকারের কর্তৃত্ব থাকে, তাদের অধীনে এটি পাওয়া যায়। আপনারা সেরকম কিছু প্রস্তাব করছেন কি না বা সে বিষয়ে আপনাদের কোনো ভাবনা আছে কি না?

পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের বিষয়ে আপনাদের ভাবনাটাও আমরা জানতে চাই। এ প্রশ্নটি এখানে এসেছে। আরেকটি জিনিস হচ্ছে, আমার মনে হয় খুব ভালো একটি প্রস্তাব আপনারা করেছেন, মেধা সংরক্ষণ। মেধাকে সংরক্ষণ করা। একইভাবে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান সংরক্ষণ এবং কাজে লাগানো। এবিষয়ে আপনাদের ভাবনা কি, সংক্ষেপে এখানেও আপনারা বলতে পারেন বা পরেও বলতে পারেন।

ধন্যবাদ।

জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন (যুগ্মসচিব): আমার মনে হয়, Woodrow Wilson এর Dichotomy of Public Administration theoryটি এখানে খুব কাজ হতে পারে। নীতিনির্ধারণকারীরা, আইন প্রণয়নকারীরা আইন প্রণয়ন করবেন। কিন্তু আইন যখন বস্তবায়ন করব, আমলাতন্ত্রে তখন তারা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। এজন্যই উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে যে সভাপতি রাখা হয় বা ডি.ও লেটারের প্রভিশন দিয়ে দিয়ে আইনগুলোকে তচনছ করে দেওয়া হয়। এই Dichotomy of Public Administration theoryটি আমার মনে হয় খুব প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

আর আন্তঃক্যাডারের যে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে, সে বিষয়টি আমরা ইতোমধ্যে অনুভব করেছি। **১৯৭৯** সালে এই **২৮**টি ক্যাডার করা হয়েছিল। আপনি যদি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট **১৯৫১** দেখেন, তাহলে দেখবেন যে, সমগ্র ভারতে মাত্র **৩**টি সিভিল সার্ভিস রয়েছে। ইন্ডিয়ান প্রশাসনিক সার্ভিস, পররাষ্ট্র সার্ভিস এবং পুলিশ সার্ভিস। আমাদের ভৌগলিক অবস্থানে আমার যে ভাবনাটা রয়েছে, আসলে শাসনের জায়গাটি একটি এবং সেবার জায়গাটি আরেকটি। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় সিভিল সার্ভিস এবং পাবলিক সার্ভিস আর আমাদের সাপোর্টিং স্টাফের জন্য জুনিয়র সার্ভিস কমিশন অর্থাৎ **৩**টি কমিশন যদি থাকে, তাহলে নিয়োগ প্রক্রিয়াগুলো দ্রুত হয়, তাদের পদোন্নতিগুলোতে গতি আনয়ন করা যায় এবং তাদের সুযোগ সুবিধা পৃথক আইন দ্বারা যদি লিপিবদ্ধ থাকে, তাহলে আজকে যে আন্তঃক্যাডার পদোন্নতির বিষয় হচ্ছে, আমরাও যারা প্রশাসনে আছি, মাথাভারী প্রশাসন বলি, যেটিই বলি, আমাদের এ জায়গাগুলোও মসৃণ হয়। এ ব্যাপারে আমরা আপনাদেরকে একটি লিখিত পরামর্শ দেব।

ধন্যবাদ।

জনাব এ টি এম সিদ্দিকুর রহমান (অতিরিক্ত সচিব): আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বাংলাদেশ সংবিধানের আর্টিকেল ৩৪ ও ৩৫। বিশেষকরে অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের ম্যাডামের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে On the satisfaction of the Hon'ble President. How to measure satisfaction. what are the indicator of measuring satisfaction. It should be visible. যেমন জুডিশিয়ারিতে যে স্তরবিন্যাস করা হয়েছে, অধঃস্তন কোর্ট, উচ্চ কোর্ট, এ্যাপেক্স কোর্ট। অধঃস্তন কোর্টের রায় আপিল বিভাগে যাবে, আপিল হবে। এখন আপিল কীভাবে হবে? what are the indicators of appeal. সেখানে বলা আছে question of fact. আপিল বিভাগে look into the all papers, question of fact এবং question of law দেখবেন। Question of law এর ক্ষেত্রে অধঃস্তন কোর্টের বিচারকের আইনগতভাবে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে কি না বা কোনোকিছু তার overlook হয়েছে কি না বা কোনো ধারা সঠিকভাবে Interpretation হয়নি, এটি দেখতে হবে। If he is more interested to look into the case. question of fact তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন কি না? এ বিষয়গুলো বিবেচনা করেই তাকে রায় দিতে হবে। এখন একজনকে compulsory retirement দেওয়া হচ্ছে, তার সমস্ত কাগজপত্র সেখানে আছে, সকল প্রসেস করা হয়েছে, তাকে so cause করা হয়েছে, সে উত্তর দিয়েছে, প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে। এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতি যখন satisfied হবেন তখন রায়ে সকল কিছু থাকতে হবে যে I have interpreted and I have seen or look into such and such paper. সকল কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তিনি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। কোনো বিষয় যখন আমরা পরিমাপ করি তখন দুইটি বিষয় থাকে, qualitative entity এবং quantitative. আমরা quantitativeকে more emphasis দেই। কারণ It is visible. সবাই বুঝতে পারে যে, এই quantitative ছিল, এই indicator ছিল। তার ওপর ভিত্তি করে একটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কাজেই এই বিষয়গুলিকে abstract রাখা যাবে না বা invisible রাখা যাবে না। It should be visible.

ড. মোঃ আনোয়ার উল্যাহ, এফসিএমএ (সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়): মাননীয় সদস্য তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। স্থানীয় সরকারের ইস্যু, specialization এবং expertiseকে কীভাবে আমরা সিভিল সার্ভিসে accommodate করতে পারি। আরেকটি হলো আন্তঃক্যাডার বৈষম্য দূরীকরণ। এ তিনটি বিষয়ইতো আপনাদের ছিল। এখানে স্থানীয় সরকারের বিষয় এবং প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ এ দুটোর মধ্যে কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত স্থির করতে পারিনি স্থানীয় সরকারের কাঠামোগত দিকটা। এই কাঠামোগত দিকটি এখন পর্যন্ত আমাদের যে প্রক্রিয়া আছে এটি কিন্তু trial and error basis চলছে। কখনও প্রতীক দিয়ে নির্বাচন হয় কখনও প্রতীক ছাড়া নির্বাচন হচ্ছে। কখনও একজনকে মেয়র বানানো হচ্ছে, কখনও নানান রকম হচ্ছে। স্থানীয় সরকারকে আমি মনে করি একটি দেশের উন্নয়নের জন্য bottom and top down approach এ যদি চলতে হয়, তাহলে স্থানীয় সরকার পদ্ধতিকে শক্তিশালী করতে হবে। সেখানে অবশ্যই specialized এবং expertise লোকজনদেরকে Integrate করতে হবে।

আমাদের এখানে আন্তঃক্যাডার বৈষম্যের একটি বড় জায়গা হলো যারা specialization নিয়ে আসেন, ডাক্তার এসে প্রশাসন ক্যাডারে ঢুকে গেল। বুয়েট থেকে পাস করল, তিনি প্রশাসন ক্যাডারে ঢুকে গেল। তিনি পররাষ্ট্র সার্ভিসে ঢুকে গেল। অর্থাৎ যে সাবজেক্ট থেকে পড়াশুনা করে আসল ইউনিভার্সিটি থেকে, ঠিক ওই লাইন থেকে বিচ্যুত হয়ে বা যে কারিগরি দক্ষতা নিয়ে তিনি আসছেন, তিনি ওই লাইন থেকে বিচ্যুত হয়ে আরেক জায়গায় তিনি সাধারণের কাজ করছেন। তার অর্থ হলো রাষ্ট্রের অর্থ অপচয় হচ্ছে। তার যে অর্জিত জ্ঞান বা দেশকে দেওয়ার মতো যে সুযোগ সেটিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের সময় এসেছে, আমাদের এতগুলো ক্যাডার রেখে আমাদের এই স্থানীয় সরকার, প্রশান বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ জনস্বার্থের এই সেবাগুলো আমরা বন্টন করব কি না- এই জায়গাটি। এই জায়গাটিতে যদি আমরা চলে যেতে পারি, তাহলে আমাদের আন্তঃক্যাডার বৈষম্যের জায়গাটিও কিন্তু এমনিতেই নিরসন হয়ে যাবে। আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার বা কারিগরি দক্ষতা ভিত্তিক লোককে কেন জেলা প্রশাসকের চেয়ারে বসাব। আমার মনে হয়, এটুকুই আমার বলার। এই জায়গাটুকুতে এখন ভাববার সময় এসেছে। হয়ত সংবিধানে সবকিছু থাকবে না। কিন্তু প্রত্যেকটি জায়গায় এই SOP তৈরি করতে হবে সরকারকে। আমরা যদি রুলস অব বিজনেস এর কথা বলি, ৫৫, ৫৬। যেটির ভিত্তিতে ১৯৯৬ তে আমাদের অনেক কিছু পরিবর্তন হলো। অর্থাৎ মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী হবেন মন্ত্রী আর প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিং অফিসার হবেন সচিব। সমস্ত দায়দায়িত্ব সচিবের ঘাড়ে। অর্থ কমিটিতে, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে এসে কিন্তু সচিবকেই জবাবদিহি করতে হয়। এই জায়গাটিতেও আমাদের কিছু ক্ষমাত পৃথিকীকরণ যেটি আমরা করেছি, মন্ত্রী এবং সচিবের মধ্যে, কর্মবিভাগের মধ্যে, এখানেও কিন্তু একটি দ্বন্দ্ব আছে। রাজনৈতিক ইচ্ছা আছে এখানে। এই ইচ্ছাগুলোর যেগুলো মেলাফাইড, যেগুলো উদ্দেশ্যমূলক, যেগুলো not inline with the ideal conditions, conflicting সেগুলোকে আমার মনে হয় operational activities এর মাধ্যমে কিছু করতে হবে। ম্যাডাম যেটি বললেন অনেক রুলস ভালো আছে, সেগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে না। because of understanding or the other kinds of intention. that's the issue. আমিতো সবকিছু সংবিধানে নিয়ে আসতে পারব না। আপনারা জানেন যে এটি একটি মৌলিক দলিল। এখান থেকে সবকিছু in toto, যেমন এই আন্তঃক্যাডার বৈষম্যের কথাতো সংবিধানে নিয়ে যেতে পারব না। সরকারকে এটি বাস্তবায়ন করতে হবে। আদর্শবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদেরকে সেটি করতে হবে। আমি মনে করি, যিনি generalist তাকে generalis-এর জায়গায় দেওয়া। যিনি দক্ষ বা কারিগরি বিদ্যা নিয়ে এসেছেন তাঁকে ঐ জায়গায় কাজ করতে দেওয়া।

ধন্যবাদ।

জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন (বিসিএস প্রাণিসম্পদ): ধন্যবাদ স্যার। আমরা কিন্তু বলার সুযোগ পাচ্ছি না। অধ্যাপক আলী রীয়াজ স্যার একটি প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমরা কি আসলে উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করতে যাচ্ছি নাকি কোনো ক্যাডারের ক্ষমতা কমাতে চাচ্ছি। আসলে যেটি হচ্ছে, বাংলাদেশে ৩টি স্তরে স্থানীয় সরকার আছে। উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং সিটি করপোরেশন। আর যদি পৌরসভা ধরি। উপজেলা পরিষদে ১৭টি দপ্তর এবং সংস্থা ন্যস্ত আছে। এখানে যদি এরকম করা যায় যে, উপজেলা পরিষদে আমরা যারা আছি, আমরা আমাদের মতো করে কাজ করব। উপজেলা পরিষদে যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি থাকবেন তাদের সাথে সমন্বয় করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদে যেমন সচিব রয়েছে সেরকম করে আলাদা লোক নিয়োগ দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে কাজের গতিশীলতা যেমন বাড়বে, ধারাবাহিকতা থাকবে। আমরা দেখি যে সরকারি কর্মকর্তারা আজকে একজন আছেন, কালকে চলে যান। ধারাবাহিকতা থাকে না।

দ্বিতীয় যেটি বলেছেন যে, মাতব্বরি কিছুটা হলেও কমে আসবে। আমাদের মনোমালিন্যের যে বিষয়টি সেটি অবশ্যই কমবে। আরেকটি ইস্যু জেলা পরিষদকেও যদি আমরা একইভাবে কার্যকর করি, সেক্ষেত্রে এরকম করা যেতে পারে। আমার আরেকটি প্রশ্ন আমার সহকর্মীদের কাছে, যারা প্রশাসন ক্যাডার থেকে এসেছেন। বার বার ভারতের উদাহরণ দিচ্ছেন। আমরা কেন ভারতের উদাহরণ দেব।

দুনিয়াতে অনেক দেশ আছে। আমরা সেগুলোকে অনুসরণ করব না। ভারত এক সময় ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে ছিল, তাদের প্রশাসন সার্ভিস নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। আমরা সেদিকে না গিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার উদাহরণ দিতে পারি। আর যদি আমরা উপমহাদেশের উদাহরণ দেই, সেক্ষেত্রে নেপাল আছে। নেপালে কিন্তু বিশেষজ্ঞ বেইজ মন্ত্রণালয়গুলো হয়।

আলী রীয়াজ স্যার আরেকটি প্রশ্ন করেছেন যে, বিশেষজ্ঞ জ্ঞান কীভাবে কাজে লাগানো যায়। আমি যদি লাইভস্টক সার্ভিসের কথা বলি, আমি আজ পায় ১৬ বছর ধরে লাইভ স্টক সার্ভিসে কাজ করছি। আমি সর্বোচ্চ হয়ত তৃতীয় গ্রেডে পদোন্নতি পেয়ে চলে যাবো। অথচ আমার মন্ত্রণালয় লাইভ স্টকের উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত তারা এক সময় ধর্ম মন্ত্রণালয়, এক সময় বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়, এক সময় কৃষি মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ঘুরে ঘুরে ৬ মাস বা এক বছরের জন্য আসে। সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানটি যদি কাজে লাগাতে হয় যে ক্যাডারটি আমি ধারণ করি যে ক্যাডারে আমি যোগদান করেছি সেই ক্যাডারের মন্ত্রণালয়ে যদি আমি উচ্চতর পদে যাই তাহলে আমার ২৫, ৩০ বা ৩৫ বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে পারব। এখন আমার অনুরোধটি হচ্ছে সংবিধানে এটিকে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেটা বিবেচনা করা। আপনারা আমাদের চেয়ে অনেক জ্ঞানী, এগুলো নিয়ে অবশ্যই দীর্ঘদিন পড়াশুনা করেছেন, এটিকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, এটি আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি।

আরেকটি ছোট বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আমরা জানি যে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রাজনীতিবিদরা। রাজনীতিবিদের কাছে কারা থাকে, সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রশাসন ক্যাডার। রাষ্ট্রপতির পিএস, এপিএস, প্রধানমন্ত্রীর পিএস, এপিএস, মন্ত্রীর পিএস, এপিএস, উপদেষ্টার পিএস, এপিএস এবং আপনাদের যদি কোনো পিএস, এপিএস থাকে সেটিও সম্ভবত প্রশাসন ক্যাডারের। আপনাদের তথ্যগুলো যারা বিস্তারিতভাবে লিখবে তারাও হয়ত প্রশাসন ক্যাডারের। ফলে আমাদের দাবি দাওয়া কোনোভাবেই আমরা সরকারের কাছে পৌঁছতে পারি না। এটি যদি আলাদাভাবে কোনো ব্যবস্থা করা যায়। রাষ্ট্রপতির কাছে কোনো ক্যাডার সার্ভিস থাকবে না, প্রধান মন্ত্রীর কাছে কোনো ক্যাডার সার্ভিস থাকবে না। কোনো মন্ত্রীর কাছে কোনো ক্যাডার সার্ভিস থাকবে না। তাদের নিজস্ব লোকবল থাকবে, তারা কাজ করবে। আমার মনে হয়, তাতে আমাদের কথাবার্তা, তাদের কথাবার্তা, সবার কথাবার্তা সমভাবে তাদের কাছে পৌঁছানো যাবে বলে আমরা মনে করি।

ধন্যবাদ।

ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (অতিরিক্ত সচিব): আমি জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শেষ করব। unfortunately তাঁদের কথা আমার বলার ইচ্ছা ছিল না, দু একটি বিষয়। একটি হলো কিছু misnomer আছে, যেগুলো আমাদেরকে একটু debunk করা দরকার। একজন অফিসারের পিএইচডি আছে, কিছু প্রকাশনা আছে, ঘটনাক্রমে তিনি প্রশাসন সার্ভিসে চাকুরি করে, is he not an specialist? আর একজনের কোনো প্রকাশনা নাই, কিছু নাই, সরকারি কলেজের প্রফেসর হলেন, is he a specialist? আমাদের এই জায়গাগুলোর বাস্তবতা যাচাই করা দরকার। আমরা generalist অর্থ মনে করি কোন লেখাপড়া জানে না। সিএসপিদের সময় থেকে এই সংকট ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মনে করত, সব সিএসপিরাই বোধ হয় কম শিক্ষিত।

দ্বিতীয়ত হলো আমার সহকর্মী বললেন যে, ইন্ডিয়া বাদে। ইন্ডিয়া বাদে আপনি শ্রীলঙ্কা দেখবেন, সিঙ্গাপুর দেখবেন, কোরিয়া দেখবেন, জাপান দেখবেন, ভিয়েতনাম দেখবেন এমনকি চীন দেখবেন। আমাদের এই অনুরোধটি রইল।

তৃতীয় যেটি, সেটি হলো আমরা যেন আমলাতন্ত্রকে অবমূল্যায়ন না করি। তাহলে সবাই অবমূল্যায়িত হবে। এই জায়গাটিকে আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে। আমার আবারও আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল, আপনারা সবাইকে শোনেন। তবে বিদ্যমান চিত্রগুলো দয়া করে একটু খেয়াল রাখবেন।

ধন্যবাদ।

জনাব মোঃ জামিলুর রহমান (বিসিএস গণপূর্ত): আমাদের শ্রদ্ধেও সচিব মহোদয় একটি কথা বলেছেন, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কেন জেলা প্রশাসক হবে। আমাদের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারদের জেলা প্রশাসক হওয়ার দরকার নাই। কিন্তু আমরা যদি দেখি সেতু বিভাগ একটি উচ্চতর কারিগরি জায়গা, স্পারসো বিজ্ঞান ভিত্তিক একটি সর্বোচ্চ জায়গা- এসব জায়গায় ননটেকনিক্যালগণ চেয়ারপারসন হয়ে বসে আছেন। তাহলে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তারদের যে সর্বোচ্চ মেধা, সেই মেধার প্রকাশটি কোথায় হবে? তাদের জায়গায়তো তাদেরকে সর্বোচ্চ পদে যেতে দিতে হবে। তাদের সচিবালয়ে তাদের জায়গা দিতে হবে। এই জায়গাগুলো address করলে আমার মনে হয় যে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াররা জেনারেল ক্যাডারে যাবে না।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমি জানি প্রত্যেকেরই আরও অনেক কথা আছে। কিন্তু আমাদের সময়ের বিবেচনা করতে হচ্ছে। কারণ আমাদের ৩.০০ টার সময় আরও একটি মিটিং আছে। আপনাদের বক্তব্যগুলো আমরা খেয়াল করেছি। এগুলো রেকর্ডেড হচ্ছে। এগুলো আমরা বিবেচনা করছি। যেটি আমার সহকর্মী ফিরোজ উল্লেখ করেছেন, সেটি হচ্ছে যে, এগুলো রেকর্ডেড থাকছে ভবিষ্যতের জন্য যে, এই সময়ে আপনাদের প্রত্যাশাগুলো কী ছিল। আমরাতো সিভিল সোসাইটিসহ বিভিন্ন অংশীজনের সাথে কথা বলেছি। ফলে তাদের প্রত্যাশাগুলো রেকর্ডেড থাকছে। এই প্রত্যাশাগুলোর অনেকটাই আমাদের চেষ্টা থাকবে কমিশনের পক্ষ থেকে সুপারিশে প্রতিফলিত করার জন্য। আমাদের বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে সংবিধান। সব আইনতো আমরা দেখতে পারব না, দেখার অধিকারও আমাদের নেই। এই সমস্ত বিবেচনা করেই আমরা আপনাদের বক্তব্যগুলো শুনলাম। আপনাদের যাদের লিখিত বক্তব্য আছে, সে লিখিত বক্তব্যগুলোতো আমাদের কাছে থাকছেই। এগুলো আমাদের deleveration-এর অংশ হচ্ছে। এই কথা বলে আপনাদের অনুমতি পেলে আমি অধিবেশনটি এখন শেষ করতে চাচ্ছি। ধন্যবাদ।